যাযাবরী

সমরেশ মজুমদার

'তারপর শুধু যাওয়া-আসা। য়ুরোপ-আমেরিকার অনেকটাই তো দেখে ফেললাম। একটু-একটু করে দেখার চোখ বদলে গেল।...ল্যুভরে ঢুকে মোনালিসাকে দেখে মন খারাপ করে ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু কেউ যদি বলেন প্যারিসের পিগ্যালের ব্যাপারে আমার কোনও অভিজ্ঞতা আছে কিনা, তাহলে বলব আমি আমার হাতের রেখাদের মতো জায়গাটা চিনি। এমনকী আমাদের কলকাতার উপকণ্ঠে গড়িয়ার মেয়ে বাসন্তী যে ওখানে আরও তিনটে বিদেশিনীর সঙ্গে ঘর ভাড়া করে থাকে তাও আমার জানা। সানফ্রান্সিসকোর চিনে পাড়ার ছোট্ট দোকানের মালিক বৃদ্ধের কাছে কলকাতার গল্প শুনেছি। সেই কলকাতা পঞ্চাশের দশকের। আগ্রার তাজমহলের একটু ও পাশের এঁদো গলিতে সাধারণ দোকানে যে কাবাব খেয়েছি, তার তুলনা কোথাও খুঁজে পাইনি।

কোনও দেশে গেলে দ্রষ্টব্য বলে প্রচারিত ঐতিহাসিক সৌধগুলো দেখার চেয়ে সেখানকার মানুষদের সঙ্গে মিশতে বেশি ভালো লাগে। আমি মনে করি, মাটি, জলহাওয়া যেমন গাছেদের চরিত্র বদল করে তেমনি মানুষকেও আলাদা চরিত্র দেয়। মরুভূমিতে যারা জলের জন্যে সংগ্রাম করে তাদের সঙ্গে সুন্দরবনে জলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা মানুষের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। হয়তো মিল আছে হৃদয়ে। কিন্তু তার প্রকাশও তো আলাদা।

এই মানুষদের দেখার অভিজ্ঞতা যাযাবরী।...

সমরেশ মজুমদার

একালের বরণীয় কথাশিল্পীর চোখ দিয়ে বৈচিত্র্যময় পৃথিবী ও বিচিত্রসব মানুষকে দেখার এক অনাস্বাদিত ছবি **যাযাবরী**। সুবৃহৎ এই গ্রন্থে একত্রিত হয়েছে আকাশ না পাতাল, না আকাশ না পাতাল, বিনিসুতোয়, পায়ে পায়ে পাহাড়ে, নরওয়ের কবি সম্মেলন এবং নিউ ইয়র্কে রহমান...ভ্রমণ উপাখ্যান।

যাযাবরী

সমরেশ মজুমদার

যাযাবরী

পত্র ভারতী
৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ২০০৯

JAJABORI VRAMAN SAMAGRA
by
Samares Majumder

ISBN No. 978-81-8374-060-9

প্রচ্ছদ নীলমণি রাহা ও দূর্বানন্দ জানা

অলংকরণ সুদীপ্ত দত্ত

মূল্য
৩০০.০০

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009 Phones 94330 75550, 98308 06799
e-mail patrabharati@gmail.com Website bookspatrabharati.com
Price Rs. 300.00

'পত্র ভারতী'র পক্ষে ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস,
১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

মনোজ ভৌমিক,

যাঁর টানে প্রথম বিদেশে গিয়েছিলাম,

যে এখন লৌকিক সব সুখদুঃখের বাইরে,

তবু যার টান এখনও অনুভব করি—

যে বলেছিল, এই দ্বীপ এই নির্বাসন,

তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধায়

নিবেদন

সেই দিনগুলো ভারি মজার ছিল। কলকাতার কলেজে পড়তে আসার আগে জীবনের প্রথমবার স্বাধীনভাবে ট্রেনে চেপে গিয়েছিলাম রাঁচির কাছে, এনসিসি ক্যাম্পে। তখন আমার চোদ্দো বছর বয়স। যে ট্রেনে যাব তার ইঞ্জিনের নাম কী, কোন-কোন স্টেশনে সেই ট্রেন থামে তা আগাম জেনে যাওয়ায়, পথে মিলিয়ে নিয়ে রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। সেই প্রথম বাড়িছাড়া এই আমি যাবতীয় খিস্তিখেউড় এত শুনেছিলাম যে ফিরে আসার সময় মনে হয়েছিল বয়স বেড়ে গিয়েছে অনেক।

প্রথমবার বিদেশে যাই চুরাশি সালে। তখন আমার বয়স চল্লিশ। যাওয়ার পথে ফ্রাঙ্কফুর্টে আমার পাসপোর্ট-ডলার সমেত ব্যাগ হারিয়ে গিয়েছিল। কী ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা! তারপর থেকে প্রতি পদে-পদে নার্ভাসনেস, ভয়। ফিরে এলাম যখন, তখন অনেক গল্প জমে গিয়েছিল কয়েক সপ্তাহেই।

তারপর শুধু যাওয়া-আসা। য়ুরোপ-আমেরিকার অনেকটাই তো দেখে ফেললাম। একটু-একটু করে দেখার চোখ বদলে গেল। আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে প্যারিসের ল্যুভর মিউজিয়ামের কোন তলায় কী কী আছে, বলতে পারব না ল্যুভরে ঢুকে মোনালিসাকে দেখে মন খারাপ করে ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু কেউ যদি বলেন প্যারিসের পিগ্যালের ব্যাপারে আমার কোন অভিজ্ঞতা আছে কিনা, তাহলে বলব আমি আমার হাতের রেখাদের মতো জায়গাটা চিনি। এমনকী আমাদের কলকাতার উপকণ্ঠে গড়িয়ার মেয়ে বাসন্তী যে ওখানে আরও তিনটে বিদেশিনীর সঙ্গে ঘর ভাড়া করে থাকে তাও আমার জানা। সানফ্রান্‌সিসকোর চিনে পাড়ার ছোট্ট দোকানের মালিক বৃদ্ধের কাছে কলকাতার গল্প শুনেছি। সেই কলকাতা পঞ্চাশের দশকের। আগ্রার তাজমহলের একটু ওপাশের এঁদো গলিতে সাধারণ দোকানে যে কাবাব খেয়েছি, তার তুলনা কোথাও খুঁজে পাইনি।

কোনও দেশে গেলে দ্রষ্টব্য বলে প্রচারিত ঐতিহাসিক সৌধগুলো দেখার চেয়ে সেখানকার মানুষদের সঙ্গে মিশতে বেশি ভালো লাগে। আমি মনে করি, মাটি, জলহাওয়া যেমন গাছেদের চরিত্র বদল করে তেমনি মানুষকেও আলাদা চরিত্র দেয়। মরুভূমিতে যারা জলের জন্যে সংগ্রাম করে তাদের সঙ্গে সুন্দরবনে জলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা মানুষের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। হয়তো মিল আছে হৃদয়ে। কিন্তু তার প্রকাশও তো আলাদা।

এই মানুষদের দেখার অভিজ্ঞতা 'যাযাবরী'। ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় যত্ন করে তাদের একত্রিত করেছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ।

আমার পাঠকরা খুশি হলে এই চেষ্টা সার্থক হবে।

মহালয়া ২০০৯
কলকাতা

সমরেশ মজুমদার

যা যা ব রী র চো খে

আকাশ না পাতাল	১১
না আকাশ না পাতাল	১৭৯
বিনিসুতোয়	২৬৫
পায়ে পায়ে পাহাড়ে	৪০৭
নরওয়ের কবি সম্মেলন	৪১৯
নিউইয়র্কে রহমান	৪২৫

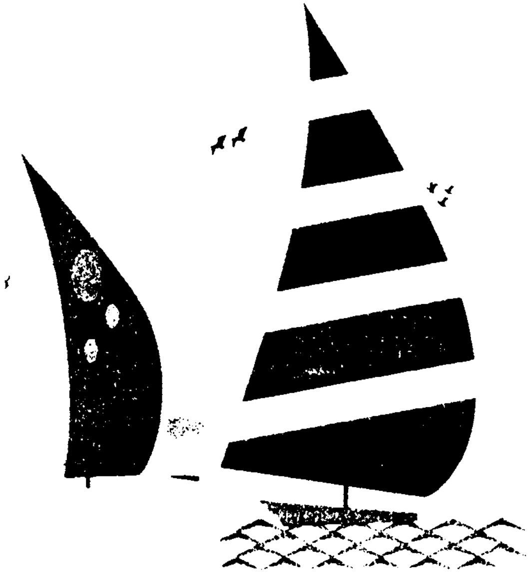

আকাশ না পাতাল

এমনটা কথা ছিল না। এই আমি, যার জন্ম উত্তর বাংলার একটা নির্জন চা বাগানে, যার নাড়ি কেটেছিল মদেশিয়া ধাই, যার বন্ধুরা এখন ছড়িয়ে রয়েছে চা বাগানের বাবুর চাকরি, ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায় ট্যাক্সি ড্রাইভারি অথবা কাঠের ব্যাবসায়, যার পিতামহ প্রায় অনেক বছর ধরে চা-বাগানের চাকরি করে গেছেন শান্তিতে, তার ললাট-লিখন লিখতে গিয়ে ঈশ্বর যে এমন মারাত্মক ভুল করে বসবেন তা কে জানত। কিংবা আরও পরে যখন জলপাইগুড়ি শহরে স্কুলের জীবন তখন পৃথিবী বলতে চায়ের বাগান আর তিস্তার চর, ফুটবল মাঠ আর সাইকেলে শহর তোলপাড় করা তখন শেষ পরীক্ষার ফল ছিল অতি সাধারণ। এ-অবস্থায় আর পাঁচটা ছাত্রের মতো তার ভরতি হওয়া উচিত ছিল জলপাইগুড়ির কলেজে। কোনওরকমে দু-তিনটে পাশ দিয়ে মাস্টারি পাওয়াই তো ভবিতব্য ছিল। পিতার আর্থিক অবস্থা এমন ছিল না যে সাধারণ মানের একটি ছাত্রকে তিনি কলকাতায় পড়তে পাঠাবার বিলাসিতা করতে পারেন। অতএব এখন আমি 'বেলাকোবা'র একজন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক অথবা চা বাগানের একজন বাবু হয়ে বেঁচে বর্তে বসতে পারতাম, যিনি কলকাতায় বেড়াতে আসতে গেলে তিনমাস ধরে পরিকল্পনা করেন, প্রতিটি পয়সার অস্তিত্ব আলাদা করে ভেবে নেন। এমনটাই তো হওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু সেই ভদ্রলোক যিনি আশি বছর আগে এনট্রান্স পাশ করে চা বাগানের চাকরিতে ঢুকেছিলেন, তিনি, তাঁর সাধ পুত্রদের মাধ্যমে মেটাতে না পেরে বেছে নিলেন এই নাতিকে। চা-বাগান অথবা জলপাইগুড়ির কুয়ো ছাড়িয়ে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতা নামক বিশাল দিঘিতে। অনেকদিন আগে একটা গল্প লিখেছিলাম। বিধাতাপুরুষ যখন একজনের কপালে ভবিষ্যৎ লিখছিলেন তখন এক সাধু সেটা জেনে গিয়েছিলেন। ফলে এই সাধুর জন্যে বিধাতাপুরুষকে দারুণ নাকানিচুবুনি খেতে হয়েছিল। আমি জানি না আমার পিতামহ সেই সাধুর মতো জন্মক্ষণেই ললাট-লিখন পড়ে ফেলেছিলেন কি না। কিন্তু তিনি বিধাতার সব হিসেব পালটে দিয়েছেন, বারেবারে নইলে স্রোতের বিপরীতে নৌকো তো সচরাচর বয়ে যায় না।

সেই ছোট্ট চা-বাগান আর তার গণ্ডি-এলাকা, শ-মিল পাহাড়ি নদীতে যার পৃথিবী শুরু সে জলপাইগুড়ি নামক জনাকীর্ণ শহরে যখন দাদুর হাত ধরে পড়তে এসেছিল তখন রুমালে নিজের উঠোনের মাটি বেঁধে এনেছিল। যেন নিজেকেই নিজের গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখা। অথবা স্মৃতি বয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু যেহেতু জল বা মাটি চট করেই নতুন জায়গায় নিজেদের স্বতন্ত্রতা হারায় তাই সেই কিশোরের পৃথিবীটা একটু-একটু করে ছড়িয়ে পড়ল মফস্সল শহরের সিনেমা হলের সামনে, তিস্তার কাশবনের চরে, জেলাস্কুলের মাঠে আর একটু পরে সাইকেল চেপে সারা শহর টহল দেওয়ায় পথের পাঁচালি যতটা নয় তার চেয়ে দস্যু মোহনের পোস্টার তাকে বেশি আকর্ষণ করে। কালো ভ্রমর থেকে শুরু করে মোহন সিরিজ, কিরীটী দিয়ে যার যাত্রারম্ভ, দু-তিনবছরেই সে উঠে আসে 'কিনু গোয়ালার গলি'তে। একটি লাইব্রেরির আলমারিগুলো তাকে এমন হাতছানি দিতে থাকে অনবরত যে সে ভুলে যায় খেলার মাঠ, নদীর চর। যখন নাকের তলায় হালকা রোমের রেখা তখনই মাঝরাতে রাজলক্ষ্মী তার সঙ্গে গল্প করে, কিরণময়ী হেসে ওঠার ছলে বুকের আঁচল লুটিয়ে দেয়। সে সন্দেহের চোখে তাকায় লাবণ্যের দিকে। একটু-একটু করে সমরেশ বসু মায় বিমল কর পর্যন্ত যখন সঙ্গী তখন শহর 'জলপাইগুড়ি'টাকে খুব ছোট মনে হয়। আর বেশিরভাগ লেখকদের লেখায় যেহেতু কলকাতা, উত্তমকুমারের সব ছবিই কলকাতার পটভূমিতে, দাদুর শাসনে ইংরেজি যে কাগজ পড়তে হয় প্রতি সন্ধ্যায় তাও আসে কলকাতা থেকে, সেখানকার খবর নিয়ে। তাই কৈশোর

পেরোতে-পেরোতে বুঝে নেয় কলকাতা ছাড়া তার মুক্তি নেই। চা-বাগান বা মফস্‌সল শহর নয়, পৃথিবী বলতে ওই কলকাতা। যে কলকাতার রাস্তায় হাঁটলে বড়লোকের মেয়ে গাড়ি থামিয়ে লিফট দেয়, মেসের ছেলে প্রাইভেট টিউশনি করতে গিয়ে হৃদয়ের রসদ পায়, ফুটপাতে নেমে এসে সত্যজিৎ রায় পরের ছবির নায়ককে নির্বাচন করেন, সেই কলকাতা তাকে টানতে লাগল। জলপাইগুড়ি শহরে সে ইতিমধ্যে শম্ভু মিত্রের নাটক দেখেছে, হেমন্ত মুখার্জির গান শুনেছে। স্কুলের অনুষ্ঠানে নাটক করে অথবা গান গেয়ে ইতিমধ্যেই ধারণা তৈরি হয়ে গেছে কলকাতায় পৌঁছোতে পারলেই সত্যজিৎ রায় তাকে ডেকে নেবেন অথবা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে 'শোনো বন্ধু শোনো' গাইলেই হেমন্ত মুখার্জি পরের ছবিতে গাইতে দেবেন

মনে-মনে যে অন্য পৃথিবীতে যাওয়ার জন্য তৈরি, তার স্কুলের শেষ পরীক্ষার ফল যদি হয় সাধারণ তাহলেও মন খারাপ হয়নি যেহেতু পিতামহ পিতার দ্বিধাকে নস্যাৎ করলেন। উচ্চ শিক্ষার্থে তাকে তিনি বিদেশে পাঠাবেনই। এই বিদেশ, যার নাম কলকাতা, যেখানে কোনও আত্মীয়স্বজন নেই, থাকার মধ্যে পিতার এক বাল্যবন্ধু যিনি বউবাজার নামক স্থানে মেসজীবন যাপন করেন, তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি করা হয়েছে। এই জেলা থেকে প্রতিবছর কিছু মেধাবী তরুণ কলকাতায় পড়তে যায় অতএব তাদের সঙ্গী হতে অসুবিধা নেই। কিন্তু যাত্রার আগের উত্তেজনা যাত্রার সময়ের বিপরীত হয়ে গেল। সেই সকাল থেকেই তরুণের মনে ভয় তিরতিরিয়ে উঠেছিল। চেনা গণ্ডি, আজন্ম পরিচিত মুখগুলো ছেড়ে অনিশ্চিত এবং অপরিচিত পরিবেশে পা বাড়াতে শেষ মুহূর্তে দ্বিধা এল। কিন্তু পিতামহ—। হ্যাঁ, সেই দৃশ্যটি অনেকটাই এইরকম।

'দাদু, আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।'

'হয় ভাই। সহ্য করে নিলেই আনন্দ।' পিতামহ তরুণকে নিয়ে এলেন ট্রেনের কম্পার্টমেন্টের সামনে। তারপর ধীরে-ধীরে একটা হাত রাখলেন ওর কাঁধে 'আমি গরিব, পড়াশুনাও বেশি করতে পারিনি। কিন্তু আমার পিতাঠাকুর বলতেন মানুষের মতো বাঁচতে। আমি চেষ্টা করেছি, তোমাকেও সেই চেষ্টা করতে হবে। তুমি কলকাতায় গিয়ে শিক্ষিত হও, স্থিতি হোক, সেইটেই আমার আনন্দ। আমি যা পারিনি, আমার ছেলেরা যা করেনি, নাতি হিসেবে তুমি সেটা পূর্ণ করো। যাও, তোমার গাড়ি হুইসেল দিচ্ছে'।

একটা-একটা করে সিঁড়ি ভেঙে সে ট্রেনের কামরায় উঠে এল। পিতামহ এক পা এগিয়ে এলেন, 'নিয়মিত চিঠি লিখবে।'

তরুণ ঘাড় নাড়ল। এই সময় ট্রেনটা দুলে উঠে চলতে শুরু করল। পিতামহ লাঠি হাতে প্লাটফর্ম ধরে পাশাপাশি হাঁটার চেষ্টা করছেন। তরুণ ভাঙা গলায় বলে উঠল, 'দাদু!'

'এসো ভাই।' কিন্তু তাঁর পক্ষে আর তাল রাখা সম্ভব হল না গতির সঙ্গে। সন্ধের অন্ধকার নেমে এসেছিল পৃথিবীতে। অনেক মানুষের ভিড়ে প্লাটফর্মের প্রান্তে দাঁড়ানো দীর্ঘ শরীরটা মিশে গেল। হঠাৎ সমস্ত চরাচর যেন অস্পষ্ট, একটা সাদা পর্দার আড়ালে চলে গেল। স্টেশনের আলো এবং মানুষ মিলেমিশে একটা পিণ্ড হয়ে ছিটকে সরে গিয়েছে ততক্ষণে। জলপাইগুড়ি শহরের বাড়িঘরদোর কেমন ছায়াছায়া, পান্ডাপাড়ার রেলক্রসিং হুস করে বেরিয়ে গেল। যে কালো রাতটা চুপচাপ জলপাইগুড়ির ওপর নেমে এসেছিল ছুটন্ত ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে সে যেন তাকেও দেখতে পাচ্ছিল না। দৃষ্টি যখন অগম্য হয় তখন কল্পনা স্রষ্টা হয়ে ওঠে। সন্ধে পার হওয়া বাতাস তার গালে শুধুই শীতলতা আনছিল। হুহু ট্রেন ছুটে যাচ্ছিল তরুণকে বুকে নিয়ে কলকাতার দিকে। চোখের জল তখন চোখের আড়াল। সারাজীবনের এই সত্যি ওই মুহূর্তে অনুভব করার ক্ষমতা অবশ্য সেই তরুণ অর্জন করেনি।

সে বড় সুখের সময় ছিল। কারণ তখন অল্পেই কান্না পেত। ভয় আসত। কষ্ট পেতাম। যা কিছু ভালো তাকেই ভালো বলতাম। খারাপের মধ্যে ভালো আবিষ্কারের জটিলতায় জড়াতাম

না। বাঁকা জীবনকে সোজা করে দেখার প্রবণতা এনে দিল শহর কলকাতা। যে শহরে গত আঠাশ বছর থেকেও আমি প্রবাসী। আঠাশ বছর বিবাহিত জীবন যাপন করার পরও স্ত্রীকে কি মাঝে-মাঝে অন্য বাড়ির মেয়ে বলে মনে হয় না? আঠাশ বছর পরেও মায়ের কাছে একান্তে বসলে নিজের জায়গায় এলাম বলে মনে হয় না? স্ত্রী আপত্তি করতে পারেন কিন্তু তাঁরও কি ওই একই সময় ঘর করার পর নিজের বাড়ি গুলিয়ে যায় না? তবু মিলেমিশে থাকা, তাই আছি। থাকতে-থাকতেও তো থাকার অভ্যেসটা তৈরি হয়ে যায়।

এই কলকাতা শহর যার প্রায় প্রতিটি গলি আমি চিনি, যার রহস্য আর আমার কাছে তেমনভাবে নেই তার সঙ্গে বাস জীবিকার কারণে। অথচ এম এ পাশের পর চলে যেতে পারতাম জলপাইগুড়ির কলেজে। নিদেনপক্ষে বেলাকোবার স্কুলে। অথচ কষ্ট করে পিতার আর্থিক সাহায্য ছাড়া শুধু নাটক করার বাসনায় এই শহরে থেকে গেলাম। নষ্ট করে দেওয়ার সমস্ত ক্ষমতা রাখে এই শহর। কোনও সত্যজিৎ বা হেমন্ত মুখার্জির দর্শন পাইনি, কিন্তু অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কষ্ট করে নাটক করার ঘটনা চোখের সামনে দেখছি। আর তাই অনুসরণ করে বাহান্ন সপ্তাহের মধ্যে খবরের কাগজের বিশেষ পাতায় যদি কখনও চিলতে খবর বা ছোট্ট ছবি বেরিয়ে যায় তাহলে তো কথাই নেই কেউ দেখল কি দেখল না ছবি তো রয়েই গেল কিন্তু নেশাটা আপাদমস্তক পড়ল ছড়িয়ে।

সেই যে থেকে যাওয়া, একটু-একটু করে শ্যাওলার মতো পাথরের গায়ে সেঁটে পড়ায় যার নুড়ি, ক্ষুধা কিংবা অভাব যে বয়সে পাত্তা পায় না, সেই বয়সেই আচমকা নাটক লিখতে গিয়ে গল্প লিখে ফেলার ব্যাপারটাও সম্ভবত বিধাতার ইচ্ছাতালিকায় ছিল না। ফলে বারংবার ভদ্রলোক বাধা দিয়েছেন, এমন ঘটনা ঘটিয়েছেন যাতে লেখক হওয়ার বাসনা যা সাতষট্টি থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত মনের কোণে উঁকি মারছিল তার উধাও হয়ে যাওয়ার কথা।

অনেক ভেবে দেখেছি, আমার সঙ্গে বিধাতার একটি চমৎকার সমঝোতা আছে। যে জিনিস আমি আগ্রহী হয়ে চাইব তা তিনি কিছুতেই দেবেন না। যে মানুষের সান্নিধ্য আমি কামনা করব তিনি আমাকে ভুল বুঝবেনই। ইচ্ছে ছিল ছবিতে অভিনয় করব অথবা গান গাইব, ও দুটোর ক্ষমতাই তিনি কেড়ে নিলেন। যে ইচ্ছে কখনওই ছিল না সেটাই হতে হতেও হচ্ছে না। এই যে লেখক আমি, এ তো নিরন্তর ঝড়ের সঙ্গে, টালমাটাল স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাওয়া, কিন্তু কতখানি লেখক তাই নিয়ে আমার সংশয়। মোটামুটি লোকে নামটাম জানে, সভাসমিতিতে ডাক পড়ে, দু-দুটো পুরস্কার তো জুটে গেল, যা কিনা অনেক লেখকের মোক্ষলাভ। কিন্তু মনে-মনে তো জানি, হচ্ছে না কিছুই। এই আমি একজন লেখকের প্রক্সি দিয়ে যাচ্ছি। কিংবা বলা যায় একজন লেখকের ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছি। আর কে না জানে অভ্যেস এমন জিনিস যে এভাবে অনেকদিন বেশ চালিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু খ্যাতি পুরস্কার এবং অর্থের বাইরে এই আমি যখন আমার পূর্বসূরীদের বই পড়ি তখনই নিজের অক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হই। এই টানাপোড়েনের মধ্যে বেশ বেঁচে বর্তে আছি। তিরিশ বছর ধরে একজন লেখক তাঁর বোধবুদ্ধি এবং হৃদয় দিয়ে যে লেখাগুলো লিখে গেলেন, এদেশে জীবনের প্রথম একটি অর্ডারি উপন্যাস লিখে তাঁকে টপকে যাওয়া যায়।

বোধহয় এই কারণেই আমার পক্ষে লিটল ম্যাগাজিন করা হল না। এই কারণেই লেখকবন্ধুদের সঙ্গে নিয়মিত আড্ডা মারার বা গোষ্ঠী তৈরি করার প্রবণতা এল না। এই কারণেই সকাল দশটার পর লেখার টেবিলে ধরে বেঁধেও কেউ আমাকে বসিয়ে রাখতে পারে না। অথচ অদৃষ্টের এমন পরিহাস ছেষট্টি সালে নাটকের জন্য যাকে তিরিশ টাকায় মাস কাটাতে হত, তার গাড়ি-বিলাস-সংসার চালাচ্ছে লেখার টাকা। যে তার জীবনযাত্রায়, আচরণে এবং ভাবনায় লেখক ছাপটা চমৎকার মুছে ফেলতে পেরেছে, বিধাতা তাকেই জুড়ে দিয়েছেন সাহিত্য নামক গাড়িটার সঙ্গে। এখন শুধু টেনে নিয়ে যাওয়া। নিস্তার নেই। গ্রুপ থিয়েটার সম্পর্কে আগ্রহ এবং মোহ ধাক্কা খেয়েছিল বাস্তবের

মাটিতে দাঁড়িয়ে। ইতিমধ্যে 'দৌড়' উপন্যাস ছবি হয়েছে। প্রায় আকস্মিকভাবেই 'দেশ' পত্রিকায় নাটক ছবির সমালোচনার দায়িত্ব কাঁধে চেপেছে। আর সঙ্গে-সঙ্গে সেই বিখ্যাত মানুষগুলোর সঙ্গে একই টেবিলে বসতে শুরু করেছি, যাঁরা জলপাইগুড়ি শহরে আমার কাছে নক্ষত্রের মতো ছিলেন। যাঁর অনুষ্ঠান দেখার টিকিট জোগাড় না করতে পেরে সারারাত বন্ধুদেব সঙ্গে খোলামাঠে দাঁড়িয়ে গান শুনেছি রেসকোর্স পাড়ার মাঠে, তার সঙ্গে এখন আমার সমীহ করার সম্পর্ক। এও কি কথা ছিল?

মনোজ ভৌমিকের সঙ্গে আমার আলাপ কফি হাউসে। সে একটা সময় ছিল যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়ে পারতাম এক কাপ কফি নিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি, সবার একসঙ্গে কথা বলার একটুও অসুবিধা হত না। তখন শুধু স্বপ্ন দেখার বয়স কিন্তু উদ্যোগ নেওয়ার বাসনা ছিল না। কফি হাউস হয়ে গিয়েছিল অভ্যেসের মতো। যা হয়, নানান চাপে যখন সেই অভ্যেস স্তিমিত তখন কালেভদ্রে যাওয়া আর যে হট্টগোলে এককালে ভ্রূক্ষেপ ছিল না তাই বিরক্তিকর মনে করা এইরকম সময়ে মনোজের সঙ্গে আলাপ। মাঝারি মাপের স্বাস্থ্যবান চেহারা। গালে সযত্নে রাখা দাড়ি কথা বলছে কফিহাউসি কায়দায়। এককালে নাটক করত এখনও করে। তবে সেটা আমেরিকায় সেখানেই বসতি। কল্যাণ সর্বাধিকারীর সঙ্গে 'আন্তরিক' নামের একটা কাগজ বের করে। যার কম্পোজ চলে কলকাতায়, ছাপা হয় নিউইয়র্ক থেকে। এ ছেলে নকশাল হতে পারত, গ্রুপ থিয়েটারের দাদা হয়ে নাম কিনতে পারত, কিন্তু তার বদলে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে রয়েছে নিউইয়র্কে। সেখানেই বাংলা থিয়েটার করছে বাঙালি জড়ো করে। বাংলা কাগজ বের করে পৌঁছে দিচ্ছে প্রবাসী বাঙালির ঘরে-ঘরে। বেশি বয়সে নাকি সচরাচর বন্ধুত্ব হয় না। কিন্তু মনোজকে আমার ভালো লাগল। 'আন্তরিক'-এর একটি সংখ্যায় ও আরম্ভ করেছে নিউইয়র্কের বাঙালিদের নিয়ে একটি লেখা। সেটা আমার অভ্যস্ত গল্প উপন্যাস থেকে একটু আলাদা। মাত্র দু-সপ্তাহের ছুটিতে এসেছিল মনোজ, কিন্তু আমার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি করে দিয়ে গেল 'আন্তরিক' পত্রিকার। যাওয়ার আগে ও আমার বেশ কিছু বই নিয়ে গিয়েছিল। চিঠিপত্রে প্রায়ই সেই বইগুলো সম্পর্কে অভিনব মন্তব্য লিখে পাঠাত। এই পর্যন্ত আমি জেনে নিয়েছি নিউইয়র্ক আমেরিকায় হলেও তার বাঙালিরা দিল্লি বা বম্বের মতো সংস্কৃতি, পুজো এবং ঝগড়া-ঝাঁটি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। এখানকার মতনই কেউ কারও ভালো সহ্য করতে পারেন না। তাঁরা ওদেশে গিয়েছিলেন অর্থ রোজগারের বাসনায়। দেশের চেয়ে বহুগুণ অর্থ তাঁদের পকেটে আসছে। কিন্তু ক্রমশ পারিপার্শ্বিকের নিশ্চয়তা তাঁদের চারপাশে এমন দেওয়াল তুলেছে যে মাঝে-মাঝে ইচ্ছে হলেও ফেরার দরজাটা নিজেরাই বন্ধ করে রাখেন শক্ত হাতে।

লক্ষ করেছি, বাঙালি সাহিত্যিক বিদেশে বেড়িয়ে এলেই একটা বই লিখে ফেলেন। দুর্ভাগ্যবশত এই বইগুলোর কোনওটাই আমার পড়া হয়ে ওঠেনি। আমেরিকা সম্পর্কে আমার আগ্রহ হলিউডের ছবি দেখে এবং হ্যাডলি চেজের বই পড়ে। যে যাই বলুক, এই ভদ্রলোকর বই পড়তে আমার খুব আরাম লাগত। কিন্তু মনোজের চিঠিতে অবশ্য মজাদার খবর পেতাম। আন্তরিকে ছাপা ওর লেখাতেও অন্য আমেরিকার কথা থাকত। একবার ও আমায় লিখেছিল, 'সমরেশ কল্পনা করুন আপনি জীবনে প্রথমবার বয়স্ক অবস্থায় কলকাতায় এলেন। ওই শহরে কোনও আত্মীয়বন্ধু নেই। গ্র্যান্ড কিংবা পার্ক হোটেলে ওঠার সামর্থ্য না থাকলে আপনি লিটন জাতীয় হোটেলে উঠবেন। শিয়ালদার নীচু টাকার হোটেলের খবর পেতে আপনার সময় লাগবে। কিন্তু ভাড়ার ট্যাক্সি আপনাকে যা-যা দেখাবে তার মধ্যে কফিহাউসের আড্ডা নেই, গ্রুপ থিয়েটারের নাটক নেই, কলেজ স্ট্রিটের বই-এর দোকান নেই' কথাটা ঠিকই।

কিন্তু আমার পৃথিবীর আয়তন বেড়ে চলেছিল। চা-বাগান, জলপাইগুড়ি, কলকাতার পর একটু ভারতবর্ষের এদিক-ওদিক যাওয়া আসা চলছিল। কিন্তু কলকাতায় বাস করার পর আমার বিস্ময়বোধটাই উধাও হয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষের যেখানেই গিয়েছি সেখানেই মনে হয়েছে অপরিচিত আসিনি। অর্থাৎ পৃথিবীর আয়তন বেড়েছে কিন্তু চেহারা পালটায়নি। এই মুহূর্ত পর্যন্ত

আমি কখনই একই বিষয় নিয়ে দুবার লিখিনি। প্রতিটি বড় লেখার আগে যে ভাবনা কাজ করে তা হল কিছু নতুন চেহারার মানুষকে ধরা। সেই যে কবি লিখেছেন মনের পৃথিবী মাটির পৃথিবীর চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। এ বিশ্বাস আমারও। এই পৃথিবীর কোথায় কী আছে তার নব্বুই ভাগ ইতিমধ্যেই আবিষ্কার করা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মানুষের মন আবিষ্কারের কৃতিত্ব কেউ দাবি করতে পারেন না।

আমার পূর্ববর্তী দুই লেখককে জানি যাদের পায়ের তলায় সরষে আছে। তা না থাকলে বাংলার বিভিন্ন জেলার মানুষ তাঁদের কলমে এত জীবন্ত হয়ে উঠত না। একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া ঘরে বসে কেউ নিরন্তর মানুষের গল্প বলে যেতে পারে না। মানুষের কথা বলতে গেলে মানুষের মধ্যে মিশে যেতে হবেই। নইলে 'টানা পোড়েন'-এর মতো লেখা বেরুবে না কলম থেকে। কিন্তু দিল্লি, বোম্বাই অথবা মানালি ঘুরে এসেও কোনও লেখা এই মস্তিষ্কে প্রবেশ করেনি। সন্তোষকুমার ঘোষ সারা পৃথিবী ঘুরেছেন বারংবার। কিন্তু তাঁর কোনও বড়-ছোট উপন্যাসের পটভূমি বিদেশ নয়। অথচ তিনি গল্প করতে-করতে স্বচ্ছন্দে বলতে পারতেন, 'তোমাদের যে চা-বাগানে বাড়ি ছিল, সেটা ছাড়িয়ে মাইলকয়েক গিয়েই আমাদের গাড়ি বিগড়ে গিয়েছিল। এই যে বিনাগুড়ির দিকে যে রাস্তাটা ডাইনে বাঁক নিয়েছে সেখানে। হেঁটে চলে গেলাম বিনাগুড়ি। দশ টাকায় আশিটা কমলালেবু বিক্রি হত সে সময়।' আবার পরের মুহূর্তেই তিনি অক্লেশে বলে যেতেন নিউইয়র্কের ম্যানহাটন থেকে কুইনসে যাওয়ার পথে ক'টা আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন পড়ে এবং সেখানে নামলে কোথায় পৌঁছোনো যায়। এই মানুষ কেন বিদেশ নিয়ে কিছু লেখেননি। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'দেশের মানুষ নিয়ে যা লেখার আছে, তাই এখনও লিখে উঠতে পারলাম না তো বিদেশের মানুষ।'

মনোজ যখন দ্বিতীয়বার এদেশে এল তখন ওর সম্পর্কে অনেক তথ্য পেয়ে গেছি। নিউইয়র্কের উপকণ্ঠে 'কুইন্স' নামক জায়গায় ওর নিজের বাড়ি। গ্যারেজে স্বাভাবিক নিয়মেই গাড়ি আছে। যেখানে চাকরি করে সেখানে পদমর্যাদা কম নয়। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ছ'লাখ টাকার মতো বাৎসরিক মাইনে পায়। দুই ছেলে এবং স্ত্রী। প্রিয় গল্পকার বিমল কর। যেসব ভারতীয় দশ-পনেরো বছর আগে এদেশ ছেড়ে গেছেন তাঁদের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতির সম্পর্ক খুব ক্ষীণ। দু-তিন বছর বাদে দেশে ফিরলেও নেমন্তন্ন খেয়ে সময় কেটে যায়। স্মৃতিতে হেমন্ত-সন্ধ্যা-মানবেন্দ্র অথবা বিমল মিত্র, সমরেশ বসু নিয়েই ওরা আছেন। সত্যজিৎ-মৃণাল সেনের পর যাঁরা ছবি করছেন তাঁদের নামও এঁরা শোনেননি। লেখকদের তো কথাই ওঠে না। অথচ মনোজকে দেখে মনে হত ও যেন বর্ধমান বা মালদায় আছে। হালফিল সমস্ত খবর সে রাখত। এবার মনোজ এসে জানাল নিউইয়র্কের অফ ব্রডওয়ে থিয়েটারে সে অভিনয় করছে একটি ভারতীয় চরিত্রে। ইংরেজি নাটকটি সেখানে বেশ জনপ্রিয় ব্রডওয়ে এবং অফ ব্রডওয়ের তুলনা করা যায় অনেকটাই আমাদের প্রফেশনাল থিয়েটার এবং গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে। অবশ্য গঠনগত কিছু পার্থক্য থাকছেই। অত্যন্ত হাসিখুশি এই মানুষটি আমায় বলল, 'সমরেশ, স্থির করেছি আমি একটা ছবি করব।'

এরকম ভাবনায় সঙ্গে আমি ইতিমধ্যে বেশ পরিচিত হয়ে গিয়েছি। সত্যি বলতে কী সিনে-ক্লাবগুলোর দৌলতে দেশ-বিদেশের ছবি দেখতে-দেখতে ওরকম বাসনা যে আমার হয়নি তা নয়। কিন্তু ছবি করতে গেল অর্থ লাগে। অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। এ দুটোই আমার নেই। 'দৌড়' ছবি তৈরির আগে পরিচালকের সঙ্গে অনেকদিন বসেছিলাম চিত্রনাট্য তৈরিতে সাহায্য করতে। চিত্রগ্রহণও দেখেছি। কিন্তু ওই পর্যন্ত। তারপর থেকে মনে-মনে কত গল্পের যে চিত্রনাট্য লিখলাম তার কোনও ইয়ত্তা নেই।

কিন্তু মনোজ অন্য কথা বলল। ওর ছবির পটভূমি নিউইয়র্ক শহর। ছবির ভাষা বাংলা। 'এই দ্বীপ এই নির্বাসন' নামের একটি উপন্যাস সে লিখেছে 'আন্তরিক' পত্রিকায়। তাই হবে ছবির বিষয়বস্তু। খবরটা চমকপ্রদ। ভারতবর্ষের বাইরে বাংলা ছবি এর আগে তৈরি হয়নি। এক নিউইয়র্ক শহরেই বাঙালি থাকেন দশ হাজার। অতএব তাদের নিয়ে ছবি হতে পারে বইকি। মনোজের লেখাটা

আমার পড়া ছিল। সত্যি বলতে কী, আমার মনে হয়েছিল ওই লেখা যদি 'দেশ' কিংবা বড় কাগজে বের হত তাহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হত। চর্চা না থাকার ছাপ কোথাও-কোথাও রয়েছে বটে কিন্তু বিষয়বস্তু এবং ট্রিটমেন্টের দিক থেকে একটা নতুন স্বাদ পেতেন বাঙালি পাঠকরা। ক'দিন খুব উত্তেজনার মধ্যে কাটল। গল্পটা নিয়ে আমরা নানা দিক থেকে আলোচনা করে যাচ্ছিলাম। সব কিছু পাকানো হলে মনোজ ঘোষণা করতে রাজি নয়। মনোজের হিসাব অনুযায়ী ছবিটা তৈরি করতে দশ লক্ষ টাকা লাগবে। অঙ্কটা শুনে আমি চমকে উঠলাম কারণ ইতিমধ্যে জেনেছি কলকাতায় বসেও কোনও কোনও পরিচালক বারো চৌদ্দ লক্ষ টাকায় বাংলা ছবি করছেন। তাহলে নিউইয়র্কের মতো শহরে অত কম টাকায় কী করে ছবি হতে পারে? ওই প্রথম বুঝলাম তুলনামূলক আলোচনায় দশ লক্ষ টাকাকেও কম বলে মনে হতে পারে। মনোজ যে গল্প শোনাল তাও অভিনব। ওখানে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা অল্প পয়সায় ছবি তৈরি করতে চান তাঁদের সামনে পর্যাপ্ত সুযোগ আছে। আমেরিকার ছবি মানেই হলিউডি ছবি নয়। মাত্র দেড়শ টাকায় চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে ক্যামেরা পাওয়া যায়। শুক্রবার দুপুরের পর ক্যামেরা ভাড়া নিয়ে এসে সেটা সোমবার সকালে ফেরত দিতে হয় একদিনের ভাড়াসহ কারণ। শনিবার বারোটার পর আর রবিবার পুরো দিন দোকান বন্ধ থাকে৮ফেরত দেওয়ার সুযোগ থাকে না। অতএব ওই দেড়শো টাকায় আড়াইদিন চমৎকার স্যুটিং করে ফেলা যায়। ফিল্ম জমা দিলে তার প্রোজেকশন বৃহস্পতিবারেই দেখিয়ে দেয় ওরা। নিজেদের ভুলভ্রান্তি দেখে নিয়ে শুক্রবার থেকে আবার নতুন করে ছবি তোলা সম্ভব। অথচ এদেশে রঙিন ছবি তুলতে খরচ অনেক বেশি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কালার ল্যাব তৈরি হওয়ার আগে ফিল্মের কাজ বম্বে বা মাদ্রাস পাঠিয়ে হাঁ করে বসে থাকতে হত ফলাফলের জন্যে। দশ লক্ষ টাকা মানে তখন এক লক্ষ ডলার। নিজের সংগ্রহ ছাড়া মনোজকে সেদেশের অনেকেই সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমেরিকায় বাংলা ছবি তৈরির একটা বড় সুবিধা হল ছবিটাকে বাংলাদেশে পাঠানো সম্ভব। ভারত বাংলাদেশের ব্যাবসায়িকভাবে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর চুক্তি নেই। কিন্তু এ ছবি যেহেতু আমেরিকার সার্টিফিকেট পাবে তাই তা বাংলাদেশে দেখানোর কোনও অসুবিধা হবে না এর ফলে বাংলা ছবি আরেকটা নতুন বাজার পাচ্ছে। মনোজ ইতিমধ্যে আমেরিকার নাগরিকত্ব পেয়ে গেছে। অতএব ওর পক্ষে সার্টিফিকেট পাওয়া স্বাভাবিক।

এবার ফিরে যাওয়ার আগে মনোজ আমার কাছে আচমকা প্রস্তাব দিল, 'আপনি আমার ছবির চিত্রনাট্য লিখতে সাহায্য করবেন?'

একটু অবাক হলেও সাগ্রহে রাজি হলাম। কারণ ততদিনে আমি ওর গল্প নিয়ে অনেক কিছু ভেবে ফেলেছি। মাঝে-মাঝে টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা বলবে জানিয়ে মনোজ চলে গেল দায়িত্ব দিয়ে।

'এই দ্বীপ এই নির্বাসন' নিয়ে বসলাম এবার প্রচুর শাখা-প্রশাখায় ছড়ানো গল্পটিকে ছিমছাম করতে হবে। চরিত্রের ভিড় কমাতে হবে। উপন্যাসটি আমেরিকায় বসবাসকারী বাঙালিদের দুটি প্রজন্মকে ধরছে। ষাট সালের পর যেসব বাঙালি চাকরি নিয়ে ওদেশে গিয়েছিলেন তাঁরা ওই দেশটাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন অর্থ রোজগারের মাধ্যম হিসাবে। দেশের সংস্কার তাদের রক্তে জড়িয়ে ছিল। রুটি রোজগারের বাইরে আমেরিকানদের সঙ্গে মিশে যাওয়ার কোনও চেষ্টা ওঁরা করেননি। লক্ষ্মীর প্রতিমা, লুঙ্গি থেকে শুরু করে ঘরের মধ্যে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন, আবার ঘরের বাইরে এসে আমেরিকানদের নকল করেছেন। এঁরা সাদা চামড়ার লোকদের সান্নিধ্য চাইতেন কিন্তু কালো চামড়ার নিগ্রোদের এড়িয়ে যেতেন। নিরন্তর এঁদের মনে হত—নিজেদের দেশ ছেড়ে এসেছি, কিন্তু দেশে ফিরে গিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করার চিন্তা এলেই শিউরে উঠতেন। যে সুবিধে স্বাচ্ছন্দ্য বৈভব এদেশে ওরা পেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তা দেশে কোনওভাবেই পাওয়া যাবে না। তা তাঁরা বুঝে গিয়েছিলেন। প্রথম-প্রথম ঘন-ঘন দেশে আসতেন তাঁরা। কিন্তু ক্রমশ দেশের

টিকিটের দাম, দেশের জল অসহ্য হওয়া, গরমে শরীরে এলার্জি বেরুনো এত বড় কারণ হয়ে দাঁড়াল যে আসাটা অনিয়মিত হয়ে গেল। কিন্তু তাঁরা বাঙালিত্ব বলতে যেসব সংস্কারে বিশ্বাস করেন তা হারাতে কিছুতেই রাজি নন। এঁদের ছেলেমেয়েরা, যারা আমেরিকায় জন্মেছে, সাদা কালো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এক সঙ্গে বড় হচ্ছে তাদের মনে ওইসব সংস্কার থাকার কথাও নয়। বাবা-মায়ের বাড়িতে এক জীবন বাইরে অন্যজীবন তারা মেনে নিতে পারে না। তারা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে চায়। ফলে সংঘাত আসে, শ্রদ্ধা কমে যায়। যে দেশে সে থাকে না, একবার বেড়াতে গিয়ে ভয়াবহ স্মৃতি নিয়ে যে ফিরেছে তার সম্পর্কে কোনও স্বাদেশিকতা বোধ তার থাকতে পারে না। উচ্চবিত্ত পরিবারের কোনও ছেলেকে দিনতিনেক বস্তিবাসী কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে থাকতে বাধ্য করা যায় কিন্তু তার মন সেখানে শেকড় নামাতে পারে না। ঐতিহ্য-কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রতি মন ফেরানোর চেষ্টা তাঁদের আগের প্রজন্ম কখনওই করেন না কারণ তাঁরা নিজেরাই সেই ব্যাপার সম্পর্কে অজ্ঞ। অথচ সন্তান তাঁদের অবাধ্য হলে তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। ক্রমশ অত বিত্তের মধ্যে বাস করেও মানুষগুলো কী ভীষণ অসহায়, একা হয়ে যান। এই ছবি ওই দুই প্রজন্মের বিরোধের গল্প।

কিন্তু মুশকিলে পড়ে গেলাম আমি। মনোজের উপন্যাসে দেখছি নায়ক পেট্রোল পাম্পে সিগারেট খাচ্ছে। রাত দুটোয় ব্যাংক থেকে টাকা তুলছে। এসব আমার অভিজ্ঞতায় নেই। অতএব চিত্রনাট্য লিখব কী করে। ব্যাপারটা আমার দ্বারা সম্ভব নয় জানিয়ে ওকে যখন চিঠি লিখছি তখন এক রাতে মনোজের টেলিফোন এল। ও জানতে চাইল, আমি কতদূর এগিয়েছি? এক লাইনও লিখতে পারিনি। শোনামাত্র বলল, 'আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল। আপনি যদি কোনওদিন কলকাতায় না আসতেন তাহলে দৌড় লিখতে পারতেন না। এক কাজ করুন। আমি টিকিট পাঠিয়ে দিচ্ছি। সামনের মাসে প্রথম সপ্তাহে নিউইয়র্কে চলে আসুন। তখন এখানে পাতা ঝরার সময়। চমৎকার লাগবে। সব কিছু দেখে শুনে এখানে বসেই চিত্রনাট্যটা লিখে ফেলুন। আমি সঙ্গে থাকলে মনে হয় আপনাকে সাহায্য করতে পারব।' কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ও টেলিফোন ছেড়ে দিল।

তখন পর্যন্ত মনে হয়েছিল ব্যাপারটা খেয়ালে বলা। কিন্তু তার ক'দিন বাদেই ওর চিঠি এল, সঙ্গে কাগজপত্র পাঠিয়েছে যা দেখলে এখানকার মার্কিন দূতাবাস আমাকে ভিসা দেবে। এইবার অস্বস্তি শুরু হল। মনের মতো কাজ পেলে সেটা করতে কখনওই কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দশ লক্ষ টাকার ঝুঁকি আছে। তখন পর্যন্ত আমি একটি লাইনও চিত্রনাট্য লিখিনি। ব্যাপারটা নিয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা করতে পারছি না। কিন্তু বুঝতে পারছি আমার পৃথিবীটা বড় হতে চলেছে। তখন পুজো-উপন্যাস লেখার সময়। রাত জেগে লিখতে কখনও পারি না। এই দোটানায় যখন তখন সুপ্রিয়দার সঙ্গে দেখা। উনি খবর পেয়ে গেছেন আমি আমেরিকায় যাচ্ছি। বললেন, 'যাচ্ছ যখন তখন ও দেশটায় ভালো করে ঘুরে বেড়াও। ইউ এস আই এস প্রতিবছর বিভিন্ন বিভাগের কৃতী মানুষদের আমেরিকায় পাঠায় ভাবের আদানপ্রদানের জন্যে। তাঁরা সেখানকার বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আলোচনা করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন'।

আমার ক্ষেত্রে যাতায়াতের ভাড়া দিতে হচ্ছে না ওঁদের। কিন্তু পনেরো দিনের জন্য আমার ইচ্ছেমতন গোটা আমেরিকায় ঘুরে বেড়াবার ব্যবস্থা ওঁরা করে দেবেন। ব্যাপারটা ছিল আশাতিরিক্ত। তাই যখন ওঁরা জানতে চাইলেন আমি কোন-কোন শহরে যেতে চাই তখন গোলমালে পড়লাম। ইতিমধ্যে আমেরিকার ম্যাপটা ভালো করে দেখেছি। কোনটা ছেড়ে কোনটা রাখব? প্রথমেই মনে পড়ল লস এঞ্জেলেসের কথা। হলিউড। চলচ্চিত্রের রাজধানী। তারপরেই সানফ্রানসিসকো। অনেকগুলো ছবি দেখেছি ওই শহর নিয়ে। এবার শিকাগো। বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিয়েছিলেন এই শহরে। আমার এক স্বল্প পরিচিতা মহিলা থাকেন ওয়াহিয়া শহরে। মনোজের মাধ্যমেই আলাপ। অনেকবার বলেছিলেন ওদেশে গেলে ওঁর ওখানে উঠতে। তাঁর শহরটার নামও জুড়ে দিলাম। এইটুকুতেই দেখা যাচ্ছে পনেরো দিন কেটে যাবে। অতএব আর কী করা। এরপর জানতে চাওয়া

হল আমি কোন কোন বিখ্যাত মানুষের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমি কোনও লেখকের নাম করিনি। কারণ হীনমন্যতায় ভুগতে আমি রাজি নই। যাঁর সঙ্গে দেখা করব তিনি আমার বই কখনওই পড়বেন না। সুতরাং আলোচনা হবে একতরফা। তিনজন অভিনেতা, গ্রেগরি পেক, সিডনি পয়েটর, ডাস্টিন হফম্যান এবং দুজন থ্রিলার লেখক যেমন হ্যাডলি চেজ আর হ্যারল্ড রবিন্সের নাম করলাম। এই দুজনের বই ইংরেজি ও বাংলায় এদেশে হুহু করে বিক্রি হয়। লেখক হিসেবে এদের সঙ্গে আমি আলাপ করব না, পাঠক হিসেবে এদের কাছে যাব। হ্যাঁ, সেইসঙ্গে আর একটা বাংলাভাষী প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। তিনি শিকাগো ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এডওয়ার্ড ডিমক।

হঠাৎ প্রায় একসঙ্গে মনোজের টিকিট আর ইউ এস আই এস-এর কাগজপত্র হাতে এল। টিকিট অনুযায়ী আমাকে দিল্লি হয়ে ফ্রাঙ্কফুর্ট ঘুরে নিউইয়র্ক যেতে হবে প্যান অ্যামের প্লেনে চড়ে। আর ইউ এস আই এস জানাচ্ছে অমুক দিন অমুক সময় আমাকে ওয়াশিংটন হাউস হোটেলে রিপোর্ট করতে হবে ব্যাপারটা যেন এমন গ্র্যান্ড হোটেলে চলে এসো।

এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। বিধাতাপুরুষ যদি লিখেও থাকেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই কপাল গুলিয়ে ফেলেছিলেন। খুব হাসি পাচ্ছিল দু-কলম লেখার দৌলতে চা বাগানের সেই কিশোর বাক্স গোছাচ্ছে সাগরপাড়ি দেবে বলে। লাঠি হাতে প্লাটফর্মে দাঁড়ানো মানুষটি এখন আমার চোখে সামনে। যিনি সাতানব্বই বছরে দেহ রেখেছিলেন। স্মিতমুখে পিতামহ বলছেন, 'এসো দাদু।'

॥ ২ ॥

ভিসা পেতে একটু অসুবিধা হয়নি মনোজের পাঠানো কাগজপত্রের জন্যে। সেই কাগজের দৌলতেই মনোজের বাৎসরিক রোজগারটির পরিমাণ জানতে পারলাম। আমার জানাশোনা কোনও বঙ্গ সন্তান অত লক্ষ টাকা রোজগার করেও কফি হাউসে আড্ডা মারবে এমন ভাবতে অসুবিধা হয়। বন্ধু-বান্ধবেরা, যারা আমেরিকায় যায়নি তারা ওদেশ সম্পর্কে খুব জ্ঞান দিয়েছিল। সন্তোষকুমার ঘোষ বলেছিলেন 'আড্ডা মারার চেষ্টা করবে, নইলে গল্প পাবে না। আর ব্রিজ, বাড়িঘর, স্ট্যাচু, দেখে এসে গল্প শুনিয়ো না।'

সুনীল গাঙ্গুলি বললেন, 'একটি ছেলের টেলিফোন নাম্বার দিচ্ছি। কামাল ওয়াহিদ। পারলে ফোন করবে।'

সুনীল ওদেশে বহুবার গিয়েছেন, কোনও টিপস আদায় করতে পারিনি ওঁর কাছে থেকে।

মুশকিল হয়ে গেল পোশাক নিয়ে। কলকাতায় আমি যে জীবনযাত্রা করতাম তাতে আর যাই হোক পোশাকের চিন্তা কখনও করতে হয় না। তা ছাড়া ছেলেবেলা থেকেই জামাকাপড় সম্পর্কে সচেতন না থাকায় ব্যাপারটা পাত্তা পেত না। একটি দৃশ্য এখনও চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাই। ক্লাস এইট-নাইনে পড়ি। পিতামহের সঙ্গে জলপাইগুড়ির দিনবাজারে পুজোয় প্যান্ট কিনতে গিয়েছি। চিরকালই মিলের মোটা সুতির কাপড় কিনে প্যান্ট বানানো হত। সেবারও ব্যতিক্রম হল না। ফিরে আসার সময় পিতামহ হঠাৎ ভারী গলায় বললেন, 'তোমার একটাও ভালো জামাপ্যান্ট নেই। এ বছরও হল না। তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?'

আমি মাথা নেড়ে না বলেছিলাম। পিতামহ বলেছিলেন, 'আমার ক্ষমতা মতো তোমার পোশাক দিলাম। নিজের ক্ষমতাবলে তুমি দামি পোশাক করতে পারো।'

কিন্তু সেই বাসনা কখনই মনে উঁকি দেয়নি। কিন্তু এবার বন্ধুরা বলল, 'মার্কিন মুলুকে যেতে গেলে একটু সাজুগুজু করে যাওয়া উচিত।'

কিন্তু দমদম এয়ারপোর্টে যখন বাক্স নিয়ে পৌঁছোলাম তখন সাকুল্যে তিনটে ভালো শার্ট, প্যান্ট, দীর্ঘদিনের ব্যবহৃত সোয়েটার, বার করে নেওয়া জ্যাকেট এবং নিউমার্কেটের সামনে থেকে কেনা এক জোড়া সস্তার বুট জুতো ছাড়া কয়েকটা বই আমার সঙ্গী। সিডিউল যা তাতে দিল্লি থেকে আমার বিমান ছাড়বে ভোর সাড়ে চারটেয়। সন্ধে সাড়ে সাতটায় সেখানে পৌঁছে কী করে সময় কাটাব তাই নিয়ে দুশ্চিন্তা, তখন আই সি আই-এর বাসু সমাধান করে দিল। মনোজের পাঠানো টিকিট প্যান অ্যাম এয়ারলাইন্সের। ওরা দিল্লির এক পাঁচতারা হোটেলে আমার রাত কাটাবার ব্যবস্থা করে ছিল কলকাতা থেকেই। বলে দিল যাতায়াতের ট্যাক্সি ভাড়াটাও হোটেল দিয়ে দেবে। এয়ারলাইন্সের সঙ্গে নাকি হোটেলের সেরকম বন্দোবস্ত থাকে।

এর আগে প্লেন বলতে চড়েছি ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের, বাগডোগরা পর্যন্ত। ঠিক কত দিনের ট্যুর আমার জানা নেই। কিন্তু নিজের জায়গা ছেড়ে যাচ্ছি এই বোধটা হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ভি আই পি রোড দিয়ে যখন দলবল নিয়ে যাচ্ছি তখন মনে হল, আচ্ছা না গেলে কেমন হয়। এই আমি বেশ সুখে ছিলাম। কফি হাউসের আড্ডা, বন্ধুদের সঙ্গে তাস—বেশ তো কেটে যাচ্ছিল দিন এগুলো তো এখন থেকে আমি মিস করব। কী দরকার সুখে থাকতে ভূতের কিল খাওয়ার। সামনের সপ্তাহে একটা ভালো ছবি রিলিজ করবে, সেটাও তো দেখা হবে না। কথাটা খুব সিরিয়াসলি বলে ফেলতেই সবাই হইহই করে উঠল। হয় আমি ঠাট্টা করছি নয় মাথা খারাপ হয়েছে। এই জন্যই বাঙালির কিছুই হয় না। জাতটা ঘরকুনো রয়ে গেল এই কারণেই। এতো ইমোশনাল। কিন্তু বোর্ডিং কার্ড হাতে নেওয়ার পর দেখা গেল সেই মুখগুলোই গম্ভীর। যেন কথা বলতে পারছে না কেউ। প্লেনটা দাঁড়িয়েছিল খুব কাছাকাছি। রানওয়ের ওপর দিয়ে হেঁটে সিঁড়ির কাছে পৌঁছে অনেকদিন বাদে কলকাতার আকাশ দেখলাম। যাঁরা বলেন পৃথিবীর সব আকাশের চেহারা এক, তাঁরা সত্যি কথা বলেন না। জলপাইগুড়ির আকাশ এমন পুরোনো ছবির মতন হয় না তবু মনে হল এই আকাশ আমি আর দেখব না। মুখ ফিরিয়ে দূরের ব্যালকনিতে দাঁড়ানো আন্দোলিত হাতগুলো দেখলাম। ওখানে এত মানুষের ভিড় যে স্বজনদের আলাদা করে চেনা যায় না। কেমন একটা শূন্যতা নিয়ে নিজের সিটে গিয়ে বসলাম। দরজা বন্ধ হল। ইঞ্জিন চালু হওয়ার পর প্লেনের চাকা গড়াতে লাগল। ততক্ষণে সন্ধের অন্ধকার দমদমকে ঢেকে ফেলেছে। হঠাৎ মনে হল জলপাইগুড়ি থেকে প্রথমবার কলকাতায় আসার সন্ধ্যায় হুহু করে ছুটে যাওয়া ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে পরিচিত দৃশ্যগুলোকে পেছনে সরে যেতে দেখেছিলাম। চোখের জল শেষ পর্যন্ত আড়াল হয়ে গিয়েছিল। আর এ যেন চোখে ঠুলি পরে বসে থাকা। শুধু আচমকা নীচের রক্তচক্ষু আলোগুলো শেষবার জানিয়ে দিয়ে গেল তুমি আর কলকাতার নও।

সন্ধের পরও দিল্লিতে বড় অভিমানী আবহাওয়া থাকে। মালপত্র সংগ্রহ করে ট্যাক্সিতে বসে মনে হল আমি বিদেশে এসে গেছি। এতো চওড়া চওড়া রাস্তা, সুন্দর আলোর সারি, চারপাশে নির্জনতা ছড়ানো—বাঙালি কবে পাবে? ট্যাক্সিওয়ালাকে দুবার হোটেলটির নাম বললাম। শেষ পর্যন্ত লোকটি আমাকে একবার ঘুরে দেখল। গেট পেরিয়ে বিরাট বাঁধানো চাতালের ওপর ঘুমিয়ে থাকা সার সার গাড়ির মিছিল ডিঙিয়ে হোটেলের দরজায় পৌঁছোতেই সুবেশ একটি লোক ঢাউস সেলাম দিল। ট্যাক্সিওয়ালা জানতে চাইল ভাড়া আমি দেব না হোটেল থেকে নিতে হবে। উত্তরটা শুনে লোকটা মোটেই খুশি হল না। সুটকেস নিয়ে যখন ঝকঝকে সিঁড়ি ভাঙছি তখন সুবেশ লোকটি পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল, 'আপনার যদি খুব অসুবিধা না হয়, তাহলে ওটা আমার কাছে ছেড়ে যেতে পারেন।'

হকচকিয়ে গেলাম। হোটেলের পোর্টারটি তো আমার থেকেও স্মার্ট। হাতছাড়া করতেই লোকটি 'থ্যাংকু' বলে ওটাকে নিয়ে ভেতরে এগিয়ে গেল। ঘোরানো কাচের দরজা ঠেলে কোনও কার্নিভালে এসে পড়েছি। পাঁচতার হোটেল বলতে কয়েকবার গ্র্যান্ড হোটেলে গিয়েছি। সেখানেও এ দৃশ্য দেখিনি। খুব দামি পোশাকে মেয়ে পুরুষ চারটে টেনিস কোর্টের মতো হলঘরে দাঁড়িয়ে গপ্পো করছেন। লাল

নীল আলো জ্বলছে। গোটা পাঁচেক রেস্টুরেন্টের নাম দেওয়ালগুলোয় জ্বলছে। বাজনা বাজছে স্পিকারে। রিসেপশনিস্ট ভদ্রমহিলা আমার টিকিট এবং কুপন দেখে একদম পাত্তা না দিয়ে আর একজনকে বলতে লাগলেন একটু আগে রাজেশ খান্না তাঁর সঙ্গে কী ভঙ্গিতে কথা বলছিলেন। শেষ করলেন, 'হি ইজ সো সুইট ইউ নো।'

শেষ পর্যন্ত আমার তৈরি করা ইংরেজিতে তাঁকে বললাম, 'আমি কি একটা ঘর পেতে পারি।'

তিনি মাথা নোয়ালেন ঈষৎ, 'ও, সিওর। আপনি প্যান অ্যাম ফ্লাইট ধরবেন তো? ঠিক আছে, আপনাকে দুটোর সময় ডেকে দেওয়া হবে। এই নিন ডিনার কুপন। নীচের যে-কোনও রেস্টুরেন্টে এই কুপন দেখালে খেতে দেবে। তবে আশি টাকার মধ্যে খেতে হবে প্লিজ। এই নিন চাবি। এখানে সই করুন। রাতটায় চমৎকার ঘুম হোক আপনার।'

একটা বিরাট এবং ভারী চাবি নিয়ে যে লিফটে উঠলাম তাতে যাত্রী আমি একা। চাবির গায়ে ফ্লোরের নম্বর পড়ে বোতাম টিপে ছিলাম। সুদৃশ্য সেই বাক্সের তিনধারে আয়না। তিন সমরেশ আমার দিকে তাকিয়ে। এখনও আমার পরনে মহম্মদ আমিনের তৈরি প্যান্ট-সার্ট, যা পরে কফি হাউসে আড্ডা দিতাম। হঠাৎ মনে হল, এই তিন আমি খুব একটা পালটাইনি। ওই যে ভুরু ওপরে কাটা দাগটা যা চা-বাগানে তৈরি হয়েছিল শৈশবে তা এখনও স্পষ্ট। বরং বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে স্পষ্টতর হচ্ছে। দরজা খুলে গেল আপনা আপনি। লম্বা করিডোর নির্জন, দুপাশে ঘরের দরজায় নম্বর সাঁটা। খুঁজে পেতে সময় লাগল। দরজা খুলে ভেতরে পা দিতেই নীল আলোয় দেখতে পেলাম পাশে টেলিফোন। বাঁ-দিকে রঙিন টিভি সেট। ওপাশে কায়দায়দুরস্ত বাথরুম। টেবিলে অ্যাশট্রের ভেতর হোটেলের বিজ্ঞাপন ছাপা দেশলাই। দরজায় শব্দ হল। বেয়ারাটি স্যুটকেস নামিয়ে হাসল, 'আপনার ফ্লাইট ভোরে। হ্যাঁ?'

লোকটা হাসছে কেন? লোকটা মাথা নাড়ল, 'কোনও চিন্তা করবেন না, দুটোর সময় আপনাকে উঠিয়ে দেব আমি। চটপট খেয়ে শুয়ে পড়ুন।' লোকটা চলে গেল।

ঠিক বুঝতে পারছিলাম না ঘণ্টা চার সাড়ে-চারের মধ্যে খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুমিয়ে নিয়ে কী করে তৈরি হব। বন্ধুবান্ধব থাকলে রাতে জাগা যেত। দিল্লিতে মুখার্জির কথা মনে পড়ল। ওর টেলিফোন নম্বর সঙ্গে আছে। কিন্তু ফোন করলেও তো এতদূরে আসতে পারবে না। আচ্ছা, ভালো করে দাড়ি কামিয়ে স্নান করলে কেমন হয়। বাথরুমে ঢুকলাম। কল্যাণ বলেছিল যেসব হোটেলে আমি থাকব তার বাথরুমের বাক্স থেকে একটা করে সাবান যেন স্যুভেনির হিসেবে নিয়ে আসি অনেকে নাকি তোয়ালেও নিয়ে যায়। কিন্তু এত প্রসাধনী দ্রব্য, এত সাবান সামনে, কেমন বোকা-বোকা লাগল নিজেকে। এমনকী দাড়ি কামাবার নতুন সরঞ্জামও সামনে রাখা।

পুরোদস্তুর আগামীকালের জন্যে তৈরি হয়ে নীচে নামলাম। মোগল রান্নার রেস্টুরেন্টে ঢুকতেই যিনি ছুটে এলেন তাঁর রোজগার নিশ্চয়ই আমার পাঁচগুণ। অর্ডার নেওয়ার খাতা সঙ্গে না থাকলে বুঝতেই পারতাম না ভদ্রলোকের চাকরিটা কী। দুটো খাবার বলতেই আশি টাকা হয়ে গেল। সেটা পরিবেশিত হওয়ার পর মনে হল নিজের টাকায় এ জীবনে হয়তো কখনওই এখানে খাওয়া হবে না। আমার পাশের টেবিলে যে সুন্দরী পাঞ্জাবি মহিলা এত রাত্রে ছ'টা পদ নিয়ে নষ্ট করছেন তাঁর স্বামীর টাকার পরিমাণ কত?

বঙ্গসন্তানের একটা বড় খারাপ স্বভাব তারা সবসময় টাকার হিসেব করে। ফলে টাকাটাও থাকে না আবার উপভোগ করাও হয়ে ওঠে না। ঘরে ফিরে ক্রমে মনে হল পেট ভরেনি। কিন্তু আমার পকেটে এখন সাকুল্যে ভারতীয় টাকা বেশি নেই। শুনেছি এবারপোর্ট ট্যাক্স লাগবে একশো আর আঠারো-উনিশ ডলার পথখরচা বাবদ পাওয়া যাবে বোর্ডিং কার্ড দেখালে, তার জন্যেও রাখা আছে। কিন্তু তার বাইরে উদ্বৃত্ত সামান্য। বিদেশে তো এ টাকা আর পেপার ন্যাপকিনের দাম এক। টিভিটা খুলব-খুলব করেও খোলা হল না। আলো জ্বালিয়ে রেখেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি

না। হাতেয় ঠেলায় ঘুম ভাঙল। ধড়মড়িয়ে উঠে দেখি সেই বেয়ারাটি সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে, 'সাব, টেলিফোনকা রিংমে আপকো নিদ নেহি টুটা। দরয়াজামে নক কিয়া থা ফিরভি আপ নেহি শুনা। ওহি লিয়ে কামরামে আনা পড়া।'

এদের কাছেও যে চাবি থাকে খেয়াল ছিল না। ঘড়িতে এখন দুটো দশ। বললাম আমি তৈরি। কিন্তু মজা হল এই সাড়ে চার ঘণ্টায় দেখছি ঘরময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘড়ি, সিগারেট, টুকিটাকি। মানুষ যেখানে একটু বসে সেখানেই কি শেকড় গাড়ে। সুটকেস নিয়ে বেয়ারা নীচে নেমে গেল। আর আশ্চর্য, এই ঘরটা ছেড়ে যেতে আমার খারাপ লাগছে! যে ঘরে জীবনে ঢুকিনি, কখনও ঢুকব না তার জন্যে মায়া! মনে হচ্ছে কেন এই আমার শেষ ঘর? এ কি ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাচ্ছি বলে?

নীচের কাউন্টারে বিস্ময় জমা ছিল। সেই মহিলা মাঝরাতের ডিউটিতে নেই। যে পুরুষটি আছেন তিনি মেশিনের চাবি টিপে-টিপে আমাকে ছেষট্টি টাকা দিতে বললেন। অপরাধ জিজ্ঞাসা করতে তিনি জানালেন, যে খাবার খেয়েছি তার দাম ট্যাক্স নিয়ে একশো টাকা। অতএব কুড়ি টাকা বেশি হয়েছে। সেখানে আটটা টেলিফোন করেছি। এর জন্যে ষোলো টাকা। আর টিভি দেখার জন্য তিরিশ টাকা। একেবারে শ্যামবাজারি ভাষায় প্রতিবাদ করলাম—টেলিফোন এবং টিভি আমি স্পর্শ করিনি। থতমত খেয়ে গিয়ে লোকটি আবার মেশিন দেখে জানাল সবাই করে তাই একটা এভারেজ করে নিয়ে আমার ওপর চাপানো হয়েছিল। ঠিক আছে, আমি কুড়ি টাকা দিয়েই পার পেতে পারি। বেয়ারাটিকে দশ টাকা বকশিস দিতে খুব খারাপ লাগছিল। ওর ভূমিকাটা ঈশ্বরের মতো। যদি দুটোর বদলে পাঁচটায় জাগাত তাহলে আর বিদেশে যেতে হত না। কিন্তু এর বেশি দিতে যে আমিই পারি না। অভ্যেস বলেও তো একটা কথা আছে। ফেরার ট্যাক্সি ভাড়াটা চেয়ে আনার কথা খেয়াল ছিল না। ফলে পকেট আরও হালকা হল। এখন প্রায় তিনটে বাজে। কিন্তু এয়ারপোর্ট দেখে মনে হচ্ছে দিনদুপুর। আন্তর্জাতিক এই এয়ারপোর্টের ভিড় দেখে চক্ষু চড়কগাছ। সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার জন্যে মানুষেরা বিভিন্ন কাউন্টারের সামনে ভিড় করছে। প্যান অ্যামের কাউন্টারের ভদ্রলোক সুটকেস নিয়ে নিলেন। ওটা আমি ফেরত পাব নিউইয়র্কে। বোর্ডিং কার্ড নেওয়া মাত্র একটি লোক এগিয়ে এল কাছে। আপনি কি নিউইয়র্ক যাচ্ছেন? গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়লাম। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল, 'সেখানে কেউ আছে?' আবার মাথা নাড়লাম। লোকটি যেন নিশ্চিন্ত হল, 'তাহলে এই উনিশ ডলারের দরকার নেই আপনার। আপনি যদি আমাকে ডলারটা ক্যাশ করে দিয়ে দেন তাহলে খুব উপকার হয়। তখন পর্যন্ত ডলার নিজের চোখে দেখিনি। সঙ্গে আছে ট্রাভেলার্স চেক। কলকাতার মানি এক্সচেঞ্জে ডলার ক্যাশে দিতে পারেনি। শুনেছি আমি যে ক্লাসে যাচ্ছি সেখানে একটা বিয়ার কিনতে হলে ডলার দিতে হয়। ডলারের নোট চোখে দেখার আগ্রহ ছিল। তাই লোকটিকে নিরাশ করতে হল। একটা খাঁচার মধ্যে বসা ভদ্রলোকের দেওয়া কাগজে সইটই করে টাকা দিয়ে ডলার যখন হাতে পেলাম তখন হঠাৎ একটা কার্টুনের কথা মনে পড়ল। সম্ভবত অমৃতবাজারে বেরিয়েছিল সেটা। পাঁচজন ভারতীয় মানে একজন আমেরিকান। কারণ তখন পাঁচটাকায় একটা ডলার পাওয়া যেত। এখন সংখ্যাটা অনেক বেশি হয়ে গেছে। এ ডলার দেখলেই বোঝা যায় আমেরিকানরা কী শক্তিশালী

মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছিল প্যান অ্যামের যেসব যাত্রী নিউইয়র্ক যাবেন তাঁরা যেন অবিলম্বে ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস্ এনক্লোজারের দিকে এগিয়ে যান। এখন আমি ঝাড়া হাত-পা। শুধু কাঁধে একটা হালকা চামড়ার ব্যাগ যাতে কাগজপত্র পাসপোর্ট এবং ডলারের চেকগুলো রেখেছি। পাসপোর্টে ছাপ পড়ল। কোনও প্রশ্ন শুনলাম না। শুধু ওঁরা যন্ত্রে আমার পাসপোর্টের নম্বরটা তুলে দেখে নিলেন আমার নামে কোনও অভিযোগ আছে কি না। আরও এগিয়ে যাও। সামনেই কাস্টমস এনক্লোজার। অফিসাররা শান্তমুখে দেখছেন যাত্রীদের। হঠাৎ এক ভদ্রমহিলাকে মিষ্টি গলায় বললেন এক অফিসার, 'আপনার হাতব্যাগ একটু খুলবেন।'

ভদ্রমহিলা থতমত হয়ে বললেন, 'কেন?'

'আমরা একটু দেখব'। অফিসার আমার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। মন খারাপ হয়ে গেল। এরা আমাকে পাত্তাও দিল না? ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম ওঁরা ভদ্রমহিলার ব্যাগ থেকে গোছা-গোছা ডলার বের করছেন। এরপর সিকিউরিটির লোকেরা আমাকে পরীক্ষা করবেন। সঙ্গে কোনও অস্ত্র আছে কি না যাচাই করবেন। কিন্তু ভদ্রলোক বললেন, 'করেছেন কী আপনার সঙ্গে একটা ব্যাগ আছে তাতে লাগেজ ট্যাগ লাগাননি? তাড়াতাড়ি একটা লাগিয়ে আনুন প্যান অ্যামের কাউন্টার থেকে।'

কিন্তু আমি চলে এসেছি অনেক ভেতরে। দু-দুটো পাহারাদার পেরিয়ে সেখানে আবার যেতে দেবে? একজন অফিসারকে সেটা জিজ্ঞাসা করতে তিনি গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে চলে গেলেন। সামনে পেছনে ইলেকট্রিক বোর্ডে বিভিন্ন ফ্লাইটের নম্বর জ্বলছে। আমারটা তো ডাকাডাকি শুরু করবে এখনই। যা হওয়ার হবে এমন ভঙ্গিতে নেমে এলাম কাস্টমস এনক্লোজারে। কারও সঙ্গে কথা না বলে হেঁটে ঢুকলাম ইমেগ্রশন এরিয়ায়। গটগট করে বেরিয়ে এলাম লম্বা হল ঘরটায় যেখানে বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের কাউন্টার। প্যান অ্যামের লোকটি আমায় দেখে বললেন, 'কী সর্বনাশ। আপনি এখনও এখানে? যাবেন না নাকি?'

বললাম, 'এই ক্ষুদ্র ব্যাগটা যে আপনাদের ফ্লাইটে যাচ্ছে তার একটা পরিচয়পত্র দেবেন?'

ঘনঘন মাথা নেড়ে ভদ্রলোক বললেন, 'সেটা তো তখনই বলতে পারতেন। যান ছুটে যান।'

ট্যাগটা ব্যাগের স্ট্র্যাপের গায়ে গলাতে-গলাতে আবার ইমিগ্রেশনের এলাকায় চলে এলাম। ওঁরা মুখ তুলে তাকাতেই চিৎকার করলাম, ট্যাগ আনতে গিয়েছিলাম।'

আশ্চর্য, কেউ আমাকে আটকাল না। কাস্টমস এনক্লোজারে পৌঁছোতেই বলে উঠলাম, 'আমার প্লেন ছেড়ে যাচ্ছে। দাঁড়াতে পারব না।'

ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন, 'কে আপনাকে দাঁড়াতে বলেছে?'

সিকিউরিটির লোকজন শরীর ছেকে আমার ব্যাগ এক্সরে মেশিন থেকে বের করে বললেন, 'দৌড়ে যান।'

আমি দৌড়লাম। যেন শেষ তরী চলে যাচ্ছে আমাকে ছেড়ে। বিশাল রানওয়েতে অনেক প্লেন দাঁড়িয়ে। কোনটা নিউইয়র্ক যাবে? কে আমাকে নিয়ে যাবে? প্যান অ্যামের নাম দেখে এগিয়ে গেলাম একটার দিকে, 'এটা কি নিউইয়র্ক যাবে?'

সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে যিনি বোর্ডিং কার্ড পরীক্ষা করছিলেন প্যান অ্যামের উর্দি পরে তিনি বললেন, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলেন'? প্রশ্নটা পরিষ্কার বাংলায়।

'এই একটু দেরি হয়ে গেল।' হাসলাম।

'হাসবেন না। এই জন্যে বাঙালির কিছু হয় না। এটা কি নিউইয়র্ক যাবে? এমন ভাবে প্রশ্ন করছেন যেন এটা বাস। ল্যান্সডাউন যাওয়ার মতো। উঠে পড়ুন।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতেই শ্বেতাঙ্গিনীকে দেখতে পেলাম। হাত জোড় করে বললেন, 'গুড মর্নিং।' তখনও আমার মাথার ওপর ময়ূরকণ্ঠী আকাশ হলদে তারাগুলো নিভব-নিভব করছে। দিল্লিতে ভোর একটু বাদেই হবে। মুখ ঘুরিয়ে আর একটু যে দেখব তার উপায় নেই। সুন্দরী বললেন, 'ভেতরে আসুন, প্লিজ।'

এত বিশাল প্লেন কি স্বপ্নে দেখেছি? যাদের তিনটে শ্রেণি যাদের তিনরকমের টিকিট কেনার সামর্থ্য আছে। আমি চলে এলাম একদম শেষ প্রান্তে। আমাদের শ্যামপার্কের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত হবে। আমার পাশের সিট ফাঁকা। বসতে না বসতেই সিট বেল্ট বাঁধার হুকুম। পৃথিবীর সমস্ত বিমান কোম্পানির গৃহীত নীতি অনুযায়ী সুন্দরীরা দেখাতে লাগলেন কীভাবে বেল্ট বাঁধতে হয়। অক্সিজেন মাস্ক কীভাবে বাঁধতে হয়। আমি তখন জানলা দিয়ে এয়ারপোর্ট দেখছি। দিল্লির গায়ে এখনও অন্ধকার।

এবার প্লেন নড়ে উঠল। লাল-সবুজ আলোর চোখগুলো ঘুরতে লাগল। আর তারপর আকাশ টানতে লাগল প্লেনটাকে। একঘণ্টা আমি আকাশ দেখলাম। কত রং সেখানে। মাঝ আকাশে কী করে রাত ভোর হয়। কীভাবে সূর্য রঙিন করে মেঘগুলোকে। তিরিশ হাজার ফুট উঁচুতে মানুষের হাত যেহেতু নোংরা ছড়ায় না তাই ওই ভোর-ভোর হওয়া সময়টা একটা রঙের বাগান হয়ে বসে থাকে।

এর মধ্যে সুন্দরী এসে দাঁড়িয়েছেন আমার পাশে, 'আপনি বেল্ট বেঁধে নিন। আমরা নামছি।'

'নামছি? এর মধ্যেই?' প্রশ্নটা শুনে মহিলা খিলখিলিয়ে হেসে উঠলেন। বললেন, 'নটি'। বলে চলে গেলেন। কথাটা কোন পরিপ্রেক্ষিতে বললেন বোধগম্য হল না। তবে সুন্দরী মেয়েদের হাসতে দেখলে আমার খুব ভালো লাগে। মনে পড়ল প্লেন ছাড়ার সময় এটাকে কোমরে বাঁধা হয়নি। সুন্দর বেল্টের গায়ে হাত রেখে মনে হল এই বস্তুটি আজ অবধি কত মোটা শুরু মাঝারি কোমর জড়িয়ে থেকেছে? মহেশ্বর দাস বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ভাষাতত্ত্ব পড়াতেন। বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে বিদেশি শব্দের অনুপ্রবেশ চ্যাপ্টারটা পড়াতে গিয়ে একদিন ক্লাসে প্রশ্ন করেছিলেন সে-ধরনের কোনও শব্দ আমাদের জানা আছে কি না। মহেশ্বরবাবুর ক্লাস আমার কখনই ভালো লাগত না। বৃষ্টি পড়ছিল বলে থেকে গিয়েছিলাম। হাত তুলতে উনি খুব অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'ও তুমিও জানো। বলো, বলে ফ্যালো।' আমি গম্ভীর গলায় উত্তরটা দিয়েছিলাম, 'সরু নরম গরম কোমর পছন্দ।' ক্লাসের সবাই এমন প্রাণখোলা হেসেছিল যে মহেশ্বরবাবু শুধু মুখ লাল করে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিরিশ সেকেন্ড। তারপর রাগত গলায় বলেছিলেন, 'ব্যাটাছেলের কোমর কখনও সরু হয় না। তোমার উত্তরে আদি রসের প্রাধান্য আছে। কিন্তু প্রতিটি শব্দ যেহেতু বিদেশি ভাষা থেকে এসেছে তাই শাস্তি কমিয়ে দিলাম। তুমি এই ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাও।'

তারপর থেকেই ধারণা হয়েছিল সরু কোমর মানেই বিদেশি মেয়ে। এদেশের মেয়েদের কোমর, যেটুকু বাইরে থেকে দেখা যায় তাকে সরু বলা যায় না। প্লেনের এই সিটবেল্টটাকে যে অবধি ছোট করা যায় সেই মাপের কোমর কোনও ভারতীয় মেয়ের হলে তাকে মন্বন্তরী বলতে হবে বেল্ট নিয়ে ভাবনাটা চলে গেল কারণ চোখের সামনে প্লেন থামতেই এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এর নামটা দেখতে পেলাম। আমি এখন তাহলে পাকিস্তানে দাঁড়িয়ে। পাকিস্তান সম্পর্কে আমার তেমন আগ্রহ নেই। প্লেনে যাঁরা উঠছেন তাঁদের সঙ্গে ভারতীয়দের চেহারার কোনও পার্থক্য নেই। সিট খোঁজার সময় ওঁরা নিজেদের মধ্যে কথাও বলছেন হিন্দিতে। একান্নবর্তী পরিবারের দুটি সদস্য আলাদা বাড়ি নিয়েছে, এই মাত্র। নড়ে চড়ে বসলাম। আমার পাশে যিনি বসলেন তাঁর মুখ দেখার কোনও সুযোগ নেই। বোরখার আড়াল সত্ত্বেও বুঝতে পারছি বপুটি বিরাটত্বে অসাধারণ। একাধিক হাত ব্যাগ ছাড়াও ছোট একটি সুটকেস নিয়ে এসেছেন তিনি। মাথার ওপরে সেগুলো চালান করে দিয়ে সিটে বসে বেল্টটা কোমরে বাঁধতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ওঁর আগে যিনি ব্যবহার করেছিলেন তাঁর কোমর ছিল মাঝারি। এঁকে অনেকটা চওড়া করতে হল। বাঁধাবাঁধি হয়ে গেলে স্থির হলেন তিনি। সন্ত্রস্ত হয়ে বসে আছি। প্লেন আবার জমি ছাড়ল। এবার একটানা অনেক ঘণ্টা। এ মহাদেশ পেরিয়ে ও মহাদেশ। প্লেন থামবে ফ্রাঙ্কফুর্টে।

ব্রেকফাস্ট এল। লাঞ্চ না হলেও মনে হচ্ছে চলবে। আড়চোখে দেখলাম খাবারগুলো বোরখাধারিণী কী সুকৌশলে ভেতরে চালান করে দিচ্ছেন অথচ ওঁর মুখ দেখা যাচ্ছে না। খাওয়া শেষ করে তিনি সুটকেস নিয়ে বাথরুমে চলে গেলেন। কালকের রাত খুব টেনশনে গিয়েছে কিন্তু এখন চোখে একদম ঘুম নেই। এয়ারহোস্টেস ইয়ারপ্লাগ দিয়ে গেলেন। হাতলের গর্তে লাগিয়ে চাবি ঘুরিয়ে গান-বাজনা শোনা যাবে। একবার টয়লেট থেকে তাজা হয়ে এলে ওই গান শুনে যদি ঘুম আসে। পেট যখন ভরেই গেছে! প্যান অ্যামের এই ফ্লাইটে আর কি বাঙালি নেই? চারপাশে তাকিয়ে দেখতে-দেখতে টয়লেটে চলে এলাম। খালি আলো জ্বলতে দেখে ভেতরে ঢুকেই সাবানগুলো দেখতে পেলাম। প্রায় চকোলেটের সাইজের রঙিন মোড়কে প্যান অ্যামের নাম ছাপা সাবান রয়েছে প্রচুর।

কল্যাণ বলেছিল স্যুভেনির আনতে। গোটাচারেক নিলে কেমন হয়? ঠিক করলাম এখন নয়, নামবার আগে নিয়ে নেব। টয়লেটের বাইরে এসে এক মিনিট চুপচাপ দাঁড়ালাম। কয়েকশো মানুষ যে যার সিটে বসে আছেন। সুন্দরীরা দেখাশোনা করছেন। একজন আমার কাছে এগিয়ে এসে আন্তরিক স্বরে শুধালেন, 'ডু ইউ হ্যাভ প্রবলেম?'

হেসে মাথা নাড়লাম। হে বালিকা, আমার কী সমস্যা তা কি আমিই জানি? মাছ কি জানে সে সারাক্ষণ ভিজে থাকে? যেন ফুলের বাগানে বেড়াচ্ছি, এমন ভঙ্গিতে নিজের সিটের কাছে এসে গুলিয়ে ফেললাম। আমার সিট কোনটা? সেই বোরখাধারিণীকে তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না! আশেপাশে সব মানুষের মুখই একরম দেখাচ্ছে। মাথায় ওপরে সাঁটা সিট নাম্বার মিলিয়ে থই পাচ্ছিলাম না। আমার সিটে বসে আছেন একজন সুন্দরী। তাঁর পরনে লাল জিনস, হলুদ গেঞ্জি। স্বাস্থ্যের প্রাবল্যে সেগুলো প্রায় বিদ্রোহ করার মুখে। মাথার চুলগুলো পালিশ করা যার প্রান্ত কাঁধ ছুঁয়েছে। মুখখানা একজিবিশনে প্রাইজ পাওয়া ডালিয়ার মতো। ইনি কোত্থেকে এলেন? কাছে এগিয়ে শুধালাম, 'এক্সকিউজ মি, আপনার সিট নাম্বার কত?'

তিনি মুখে কিছু না বলে হাতের ইশারায় পাশের আসনে বসতে বললেন। কারণ ইতিমধ্যেই তিনি ইয়ারপ্লাগ গুঁজে দিয়েছেন কানে। সম্ভবত সুরমূর্ছনায় মগ্ন। আমার জীবনে মেয়েদের কোনও শাসনের ভূমিকা নেই। পিতামহ এবং কিছু পরিমাণে পিতা ছাড়া আর কারও দ্বারা শাসিত হইনি। অতএব আপত্তির গলায় বললাম, 'এটা তো আমার সিট নয়।'

ইয়ারপ্লাগ খুলে মহিলা অত্যন্ত বিরক্তি নিয়ে তাকালেন, যেন এরকম বেরসিক পুরুষ এ জন্মে দ্যাখেননি। বললেন, 'আরে বাবা আমি একটু জানলার পাশে বসলে আপনার আপত্তি আছে? ওটা তো, আমার সিট। করাচিতে বোর্ডিং কার্ড দেওয়ার সময় বলল, "উইন্ডো সিট দিল্লি থেকে ভরে আসছে।"

এমন হতভম্ব আমি জীবনে হইনি। সেই বোরখাধারিণী টয়লেটে গিয়ে এই রূপ ধারণ করেছেন? বোরখাটাকে দেখতে পাচ্ছি না। পিসিমা বলতেন কোনও মেয়েকে দুঃখ দিস না, মায়ের জাত। তাছাড়া প্লেনের ভেতরে জানলার পাশে আর প্যাসেজের পাশে তো তফাৎই বা কী? এটা তো আর টু বি বাস নয়। অতএব অত্যন্ত সন্তর্পণে মহিলার পাশে বসলাম। তিনি ইতিমধ্যে ইয়ারপ্লাগ কানে গুঁজেছেন। চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর স্পর্শ এড়াতে পারছি না। সঙ্গে-সঙ্গে ঝুপ করে আলো নিভতে লাগল। যাদের পাশে জানলা খোলা ছিল তাদের সেগুলো বন্ধ করতে বলা হল। ভিসিআর—ছবি দেখানো হল, 'ডক্টর নো'। ইয়ারপ্লাগ কানে গুঁজে সংলাপ শুনতে-শুনতে সময় কাটিয়ে দিলাম ছবি দেখে। এর মধ্যে পার্শ্ববর্তিনী যে ছবি দেখার উত্তেজনায় কতটা হেলে পড়ছেন তা খেয়াল করেননি। আলো জ্বলতেই বলে উঠলেন 'সরি'। পুরুষদের স্পর্শ পেলে যেসব মহিলা চরিত্র নষ্ট হয়ে যায় বলে ভাবেন ইনি তাঁদের দলে কি না বলে যখন ভাবছি তখন প্রশ্ন এল, 'আপনার সিটে বসেছি বলে খুব রাগ করছেন, না? আসলে আমি না জানলার ধারে ছাড়া একদম বসতে পারি না। দিল্লিতে থাকেন?'

একদম বোম্বাই হিন্দিতে কথা বলছিলেন মহিলা। মাথা নাড়লাম, 'না কলকাতা।'

মহিলা বললেন, 'আমি না কখনও ইন্ডিয়ায় যাইনি।'

'আপনি করাচিতে থাকেন?'

'ও নো। আমি থাকি শিকাগোয়। এখানে আমার শ্বশুরবাড়ি।'

'আপনি বোরখা পরে উঠেছিলেন তো।'

'ও নো। পাকিস্তানে এলে আমি বোরখা ছাড়া এক পা হাঁটি না। কেউ বলতে পারবে না আমাকে বেশরম। কিন্তু প্লেনে উঠেই আমি ওটা খুলে ফেলি। একটু ঘুমিয়ে নিলে আপনার আপত্তি আছে? সারারাত ঘুমাইনি।' হাই তুলে তিনি পাশ ফিরলেন।

জানলাটা হাত বাড়িয়ে খুললাম। এখনও আধো আঁধার কেন? সকাল তো অনেক আগেই হয়ে গেছে। তখনই ঘোষণা হল ফ্রাঙ্কফুর্ট এসে যাবে আধ ঘণ্টার মধ্যে। এখন জার্মানিতে সকাল সাতটা। নিজের ঘড়ি দেখে চমকে উঠলাম। এখন কলকাতার মানুষ দুপুরের স্নানের কথা ভাবছে।

॥ ৩ ॥

ফ্রাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টকে আমি দুটো কারণে চিরকাল মনে রাখব। আমরা যখন নেমেছিলাম তখন ওখানে সবে ভোর হয়েছে। ছায়া-ছায়া আলস্য জড়ানো। টারমাক এত বিশাল, সেখানে এত প্লেন দাঁড়িয়ে আছে তা আমি একসঙ্গে কখনও দেখিনি। আমার ঘড়ি এখন স্থানীয় সময় থেকে কয়েক ঘণ্টা এগিয়ে গেছে। বাইরের ঠান্ডা শীতকালে দার্জিলিং-এ গেলে পাওয়া যায়। কিন্তু প্লেনের দরজা থেকে টানেলের মধ্যে সেন্ট্রালি এয়ার কন্ডিশন এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এ ঢুকে যাওয়ায় আমার একটুও শীত করল না।

আমরা ট্রানসিট প্যাসেঞ্জার। আমাদের থাকতে হবে একটি নির্দিষ্ট এলাকায়। আড়াই ঘণ্টা বাদে নিউইয়র্কের প্লেনে চাপতে হবে। এই এলাকাটিতে ডিউটি ফ্রি শপের সংখ্যা সম্ভবত নিউমার্কেটের সব দোকানকেও ছাড়িয়ে যাবে। গোটাআটেক হাওড়া স্টেশন এর কাছে নস্যি। অন্তত বাইশটা গেট দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের প্লেনের যাত্রীরা ক্রমাগত যাওয়া আসা করছে।

আমি এখন জার্মানিতে। অথচ ভিসা না থাকায় শহরে ঢুকতে পারছি না। ঘুরে বেড়াচ্ছি এমন একটা বাজারে যা পৃথিবীর সব বড় এয়ারপোর্টেই পাওয়া যাবে। ইউনিফর্ম পরা জার্মান এয়ারপোর্ট কর্মীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার পেছন পেছন সেই পাকসুন্দরীও নেমে এসেছেন প্লেন থেকে। তিনি নেমেই আমায় বলেছেন, 'এই নিয়ে আমি আটবার ফ্রাঙ্কফুর্টে এলাম, জানেন? এত বোরিং।' আমার তাঁর সঙ্গে একমত হওয়ার কোনও কারণ ছিল না। মালপত্র বিমান কোম্পানির হেফাজতে। আমি শুধু হালকা চামড়ার কাঁধব্যাগ নিয়ে হাঁটছি। প্রতিটি দোকানেই পৃথিবীর সেরা বিদেশি জিনিস। দেখেও সুখ। কয়েকজন দক্ষিণ ভারতীয়কে দেখলাম। আমায় আড়চোখ দেখে গেল। সুন্দরী আমার সঙ্গ ছাড়ছেন না। একটু বেশি কথা বললেও হাজার হোক আমরা তো অবিভক্ত-ভারতবর্ষের মানুষ। রাশিয়ান মেয়েরা যদি মোটা হয় তো এঁর দোষ কী! রামচন্দ্র সেন বলতেন। 'বুঝলে চাঁদু, মেয়েদের শরীরে মাংস না থাকলে মেয়ে কীসের? খড়ম আবার জুতো নাকি!' রামদা এই পাকসুন্দরীকে দেখলে কী বলতেন জানি না তবে আমার অন্তত মনে হচ্ছে আমি একা নই। হিন্দিতে কথা বলছেন মানে কলকাতার ভাষায় কথা বলছেন। আজকাল তো রকের ছেলেরা হিন্দি সিনেমার ভাষায় কথা বলে।

সুন্দরীর হাতের ব্যাগে সম্ভবত বোরখাটি রয়েছে এখন। সুটকেস আর এক হাতে। কিন্তু তাতে তিনি দমে যাওয়ার পাত্রী নন। জার্মান রুপোর হারের সন্ধান করছেন দোকানে ঢুকে-ঢুকে। আর প্রতিবারই আমাকে অনুরোধ করছেন একটু দাঁড়াতে। এই করতে-করতে এগিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আমাদের দরজা একেবারে শেষ প্রান্তে। অবশ্য তার হদিস পাচ্ছি না এখনও। হঠাৎ সুন্দরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'জার্মান বিয়ার খাবেন?'

হেসে ফেললাম। তাতে সুন্দরী আরও উৎসাহিত হলেন। বললেন, 'জার্মানিতে এলে জার্মান বিয়ার খেতে হয়। এগুলো দেখুন, আমি আসছি।' সুটকেস এবং ব্যাগ নামিয়ে রেখে পাশের দোকানে ঢুকে গেলেন তিনি তরতরিয়ে। কোনও মহিলা আজ পর্যন্ত আমাকে মদ খাওয়াননি। উনি কি নিজেও খাবেন? ওঁর ওই চেহারায় কি বিয়ার খাওয়া উচিত? এবং তখনই আমার রামচন্দ্র সেনের কথা

মনে পড়ল। ইনকাম ট্যাক্স প্র্যাকটিস করতেন রামদা। গাড়িতে দুটো ফ্লাস্ক থাকত। একটায় বিয়ার অন্যটায় হুইস্কি। এক দুপুরে গাড়িতে বসিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পেছনে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, 'খেয়ে দ্যাখো চাঁদু, খোদ জার্মান বিয়ার। বিয়ার খাবে জার্মানির, হুইস্কি স্কটল্যান্ডের, খাবার চিনের আর বউ জাপানের। অত সেবাযত্ন কেউ করবে না। চেহারাও গোলগাল।' তা বিয়ারে চুমুক দিয়ে গা গুলিয়ে উঠেছিল।

এই ইনি সেই জার্মান বিয়ার খাওয়াবেন। ভোরবেলায় মদ খাওয়া উচিত? বিনি পয়সায় যারা আয়োডিন খায় আমি সেই দলে নেই। খুব নামকরা কবি বা সাংবাদিক দেখেছি অন্যের দেওয়া পার্টিতে গিয়ে নির্লজ্জের মতো মাছ হয়ে মদে সাঁতার কাটেন। পরের পয়সায় মদ খেতে সম্ভবত কিছু মানুষের এক ধরনের স্যাডিস্ট সুখ হয়। এই সময় মহিলা বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে একটি ঢাউস ব্যাগ তাতে চার বোতল হুইস্কি। আর এক হাতে দুটো বিয়ারের ক্যান। বললেন, 'খেয়ে নিন।'

মাথা নাড়ালাম, 'সক্কালবেলায় মদ খাওয়া আমার শরীরে পারমিট করবে না।'

'দুর!' মহিলা ঠোঁট বাঁকালেন, 'বিয়ার আবার মদ নাকি! পাকিস্তানে তো মেয়েরা লুকিয়ে চুরিয়ে খায়। আসুন এখানে আমরা প্রকাশ্য খাই।' একটি টিন আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে অন্যটির মুখ খুলে যেই মুখগহ্বরে ঢালতে যাচ্ছেন তখনই কাণ্ডটা ঘটল।

এক ভদ্রলোক ঢাউস ব্যাগ ঝুলিয়ে উইনডো শপিং করতে-করতে হাঁটছিলেন। শো কেসের জিনিসে তিনি এমন মগ্ন ছিলেন যে মহিলার কথা খেয়াল ছিল না তাঁর। ফলে তাঁর ব্যাগ এসে ধাক্কা মারল মহিলার নিতম্বে। ক্যান থেকে তখন পানীয় বেরিয়ে আসছিল। হাত এবং শরীর নড়ে যাওয়ায় তা ছিটকে পড়ল মহিলার মাথায় এবং মেঝেতে। অপ্রস্তুত হয়ে ভদ্রলোক ভাঙা ইংরেজিতে বোঝাতে চাইলেন, তিনি সত্যিই দুঃখিত।

সেই সময় আমি পাঁচুর মাকে দেখতে পেলাম। শ্যামপুকুরের বারোয়ারি ঝি পাঁচুর মা, রণমূর্তি ধারণ করলে যে গলায় চেঁচান, অবিকল একই গলায় পাকসুন্দরী ইংরেজি ভুলে উর্দুতে (হিন্দিরই নামান্তর) বুলেট ছুড়তে লাগলেন।

'উঃ মাগো। চোখের মাথা খেয়েছে নাকি? মেয়েছেলের শরীরে ঠেলা দিয়ে দাঁত বের করে হাসা হচ্ছে? সামনে মেয়েছেলে আছে দেখতে পান না? বাড়িতে মা-বোন নেই?'

ভদ্রলোক আমাদের অবোধ্য ভাষায় কিছু বোঝাতে চাইছেন। বিয়ার ভেজা চুল দেখে আমার খুব খারাপ লাগছিল। কিন্তু শেষ কথাটা শুনে হাসি চাপতে পারলাম না। কলেজ স্ট্রিটের একটি প্রাইভেট বাসে ষাট বছরের এক বৃদ্ধার গায়ে ধাক্কা মেরেছিল বলে তিনি একটি যুবককে ধমকে ছিলেন, 'মেয়েছেলেকে ধাক্কা মারা হচ্ছে? বাড়িতে মা-বোন নেই?'

সুন্দরী আমার হাসি দেখে বললেন, 'আপনি হাসছেন? আপনার কষ্ট হচ্ছে না?'

'হচ্ছে।' তড়িঘড়ি গম্ভীর হলাম।

সুন্দরী যখন আবার সেই ভদ্রলোকের ওপর বাক্যবাণ বর্ষণ করছেন তখন একজন ইউনিফর্ম পরা জার্মান আমার পাশে এসে নীচু গলায় ইংরেজিতে বলল, 'আপনার স্ত্রী সম্ভবত খুব রেগে গেছেন। ওকে একটু ঠান্ডা করুন। উনি তো আর ইচ্ছে করে ধাক্কা দেননি। খামোকা চেঁচিয়ে কী লাভ?' কথাটা কানে যাওয়া মাত্র চোখদুটো বোধহয় রক্তবর্ণ ধারণ করেছিল। তবু আচমকা জিজ্ঞাসা করলাম, 'উনি যে আমার স্ত্রী, তা বুঝলেন কী করে?'

অফিসার হাসল, 'আপনি সঙ্গে আছেন বলেই তো উনি এত চেঁচাচ্ছেন। মেয়েরা স্বামীর কাছে সবসময় অনেস্ট প্রমাণ করতে চায়। নিজের স্ত্রীকে দেখে বুঝেছি মশাই।'

কলকাতা হলে এতক্ষণে চমৎকার ভিড় জমে যেত। কিন্তু এখানে যাতায়াতের সময় কেউ কেউ হাসিমুখে তাকাচ্ছে মাত্র। অফিসারকে বললাম, 'উনি আমার স্ত্রী নন। আপনার ধারণা ভুল।' 'আই সি।' চলে যাওয়ার আগে চিন্তিত ভদ্রলোক বললেন, 'আই অ্যাম সরি ফর ইউর লাক।'

পাঁচুর মায়ের জ্বালা কিছুতেই মিটত না। সকালে ঝগড়া হলে বিকালেও নিজের মনে বকবক করত। ইনি অবশ্য অতটা গেলেন না। রুমালে মুখ মুছে বিয়ারের খোলা ক্যানটা আমার হাতে ধরিয়ে পাশের দরজার দিকে ছুটে গেলেন। সেখানে মহিলার ছবি আঁকা আছে। সেই সুযোগে বিব্রত ভদ্রলোক উধাও। মাইকে ঘন-ঘন ঘোষণা চলছে। লন্ডন চলো, প্যারিস চলো। দিনের আলোকে হার মানানো আলোয় সাজানো আধ মাইল লম্বা লাউঞ্জে যেন বইমেলা বসে গেছে আর আমি পরিবার নিয়ে দেওঘর যাত্রী এক বাঙালি কেরানির মতো মালপত্র সামলাচ্ছি। হাতের খোলা বিয়ার ক্যানটার দিকে নজর পড়ল। অনেকটা পড়ে গেলেও তিনভাগ তো রয়েছেই। একা এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার চাইতে মুখে ঢালা ভালো। গলা দিয়ে নামানোর সময় মনে হল ভিক্টোরিয়ার পেছনে যা খেয়েছিলাম তার সঙ্গে কোনও মিল নেই। বরং রাতজাগা শরীরটায় ঈষৎ আরাম ছড়িয়ে পড়ছে। বাকিটাকে ফেলে রাখলাম না। ক্যানটাকে দেওয়ালে টাঙানো আবর্জনার বাক্সে ফেলে দিতেই মহিলা এলেন। ইতিমধ্যে তাঁর হৃতশ্রী অনেকটাই উদ্ধার করেছেন জামার ভিজে দাগগুলো অবশ্য রয়েই গেছে। এসে হাত বাড়াতেই আমি দ্বিতীয় ক্যানটা এগিয়ে দিলাম। তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'হাউ নটি ইউ আর! খাব না খাব না বলে ঠিকই খেয়ে নিয়েছেন।' আঙুলের চাপে ক্যানের মুখ খুলে গলায় ঢেলে তৃপ্ত হয়ে বললেন। 'এই পুরুষ জাতটা সত্যি উজবুক। না প্লিজ রাগ করবেন না। কানাকে কানা বলতে নেই কিন্তু উজবুককে উজবুক বলব না কেন বলুন? জানেন একবার ইতালিতে গিয়ে আমার কী অবস্থা? কেঁদে কূল পাই না। রাস্তায় যেই দ্যাখে সেই আমার পেছনে চিমটি কেটে যায়। চিৎকার করলে লোকে হাসে। তারপর জানলাম কোনও মেয়ের সৌন্দর্যের প্রশংসা নাকি ওভাবেই করা হয়। পুরুষের মাথা ছাড়া কার মাথা থেকে এমন বদ মতলব বের হবে বলুন?' বিয়ারের ক্যানটাকে শেষ করে বাক্সে ফেলে তিনি মালপত্র আধাআধি করে নিলেন। নিয়ে বললেন, 'লোকটা কোন দেশের ছিল বলুন তো?'

স্বীকার করলাম, 'আমি ওঁর ভাষা বুঝতে পারিনি।'

প্রায় শেষ প্রান্তে চলে এসে মাঝখানে পেতে রাখা চেয়ারগুলোর একটায় বসলেন পাকসুন্দরী। বসে বললেন, 'এখানে বসুন। ওই যে দেখছেন প্যান অ্যামের ডেস্ক। ওখান দিয়েই আমাদের যেতে হবে। বোর্ডিং কার্ডটা ফ্যালেননি তো। ওইটে অবশ্য কোনও কাজে লাগবে না। নতুন করে বোর্ডিং কার্ড নিতে হবে। আগে করাচি থেকেই দুটো কার্ড পেতাম এখন এক নতুন ঢং হয়েছে।'

হাতল ছাড়া চেয়ারে নিতম্ব আঁটছে না। একটি চেয়ার ছেড়ে বসলাম। এবং তখনই কানে এল পেছনের চেয়ার থেকে সংলাপ ভেসে আসছে এবং তা স্পষ্ট বাংলায়, 'সুভাষ বোস জার্মানিতে এসেছিলেন হিটলারের সাহায্য নিতে। ব্যাপারটা জানো?' দু-মুহূর্তের নীরবতা। তারপর গলার স্বর নীচে নামল, তোমার কী হয়েছে? তখন থেকে মুখ কুলুপ এঁটে বসে আছ? 'আমাকে একটু একা থাকতে দাও, কথা বলতে ভালো লাগছে না।' মহিলার স্বর।

বাঙালি ছাড়া পথে বেরিয়েও এইরকম শীতল আর কোনও জাত হতে পারে আমার জানা নেই। মুখ ফিরিয়ে শ্রীমুখ দুটো দর্শন করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই পাকসুন্দরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা আপনি বিয়ে করেছেন?'

অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, 'কেন বলুন তো?'

দেখে মনে হচ্ছে করেননি। বিবাহিত মানুষগুলো হাড়বজ্জাত হয়। আমার হাজব্যান্ডকে তো দেখেছি। এই যে আমি এতদিন করাচিতে ছিলাম তাতে ওর খুব মজা। নিত্যনতুন সাদা চামড়ার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে চেষ্টা করবে। আমি তো এবারে না জানিয়ে যাচ্ছি। একেবারে হাত নাতে ধরলে তিনমাস ঠান্ডা থাকবে। আপনার মতো চুপচাপ মানুষ তিনি নন। আপনি সিগারেট দিন তো একটা।'

দুটি আঙুল বাড়ালেন মহিলা। প্রসঙ্গটা এত দ্রুত পালটে গেল যে বুঝতে সময় লাগল।

আমি তখন প্যাকেট খুলছিলাম। একটা এগিয়ে দিতেই মহিলা বললেন, 'আগুনটা।'

এটা ঠিক সেই গলায় যে গলায় চৌরঙ্গিতে বেকার টাইপের লোকেরা সিগারেট ধরালেই সামনে এসে বলে। ধরিয়ে দিলাম। এক গাল ধোঁওয়া ছেড়ে মহিলা বললেন, 'করাচিতে সিগারেট খেতে দেখলে হইচই পড়ে যাবে। যেহেতু স্মোকিং ইনজুরিয়াস তাই কিছুদিন করাচিতে থেকে সিগারেট খাওয়ার অ্যাভারেজটা কমিয়ে আসি। ইন্ডিয়ান সিগারেট কিন্তু খারাপ নয়। আমি ইন্ডিয়া কিংস খেয়েছি। ওয়াণ্ডারফুল। আপনি ওটা খান না কেন?'

উত্তর দিলাম না। কী করে বলি বিদেশে যাচ্ছি অন্যের টাকায়। সেই সত্যজিৎবাবুর ছবি 'কাঞ্চনজঙ্ঘার' নায়কের মতো অবস্থা আমার। ইন্ডিয়া কিংস খাওয়ার সামর্থ্য আমার নেই। মহিলা বোধহয় উত্তরের জন্য প্রশ্ন করেননি। চোখ বন্ধ করে ধোঁয়া উপভোগ করছেন। উঠে দাঁড়ালাম আমি, 'আপনি বসুন। আমি একটু ঘুরে আসি।'

পাকসুন্দরী জানালেন যেহেতু সময় বেশি নেই তাই আমার দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসা উচিত। প্রায় ছিটকে সরে এলাম। মহিলা খারাপ নন। কিন্তু যাঁরা বেশি কথা বলতে ভালোবাসেন, তাঁরা অন্যের বিরক্তির পরিমাণটা বুঝতে পারেন না। পাকসুন্দরীর স্বামী দেবতাটির জন্যে আমার এখন কষ্ট হচ্ছে বেচারা। কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলাম। একটা টয়লেটে ঢুকে পরিষ্কার হয়ে নিলাম। নিজেকে খুব খারাপ দেখায় না বিশাল আয়নায়। এরকম একটা ঝকঝকে টয়লেটে কলকাতার মানুষ দু-দিনের নিজের করে নেবে। শুধু হেঁটে যাওয়া। কারোও সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা বলার সুযোগ নেই। ঘড়িতে নজর করে খেয়াল হল সময় আমার হাতে বাঁধা নেই। এই সময় আকাশবাণী হল, নিউইয়র্কগামী প্যান অ্যামের প্যাসেঞ্জারদের বাইশ নম্বর গেটের দিকে যেতে বলা হচ্ছে। দূরত্বটা পেরিয়ে আসতে মিনিটপাঁচেক লাগল। এসে দেখলাম পাকসুন্দরী নেই। এমনকী পেছনে বাঙালি দম্পতি বসেছিলেন যাদের মুখ আমার দেখা হয়নি তারাও উধাও। একটু এগিয়ে প্যান অ্যামের ডেস্কের সামনে পৌঁছে দেখি সেখানে বিশাল লাইন পড়েছে এবং পাকসুন্দরী তাঁর দুহাতে মালপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখতে পাওয়ামাত্র তিনি চিৎকার করে উঠলেন, এই যে দশ মিনিট হলো। তাড়াতাড়ি চলে আসুন।' সামান্য সরে নিজের পাশে আমার জায়গা করে দিলেন তিনি। লাইন এগোচ্ছিল দ্রুত। সুন্দরী তাঁর বোর্ডিং কার্ড নিয়ে এগিয়ে গেলেন সিকিউরিটির দিকে। প্যান অ্যামের কর্মচারীটি হাত বাড়ালেন, 'ইওর টিকিট প্লিজ।'

ডান হাত দিয়ে বাঁ-কাঁধে ঝোলানো চামড়ার ব্যাগটা ছুঁতে গেলাম। আঙুলে শুধুই শূন্যতা। চমকে মুখ নীচু করলাম, ব্যাগটা নেই। সঙ্গে-সঙ্গে মাথা ঘুরে গেল। এতক্ষণ তো ব্যাগটা আমার কাঁধে ছিল। আর ওই ব্যাগের ভেতর আমার টিকিট, পাশপোর্ট, ট্রাভেলার্স চেক এবং দিল্লি এয়ারপোর্ট থেকে কেনা ডলারের নোটগুলো রাখা ছিল। প্যান অ্যামের লোকটি তাড়া দিলেন, 'টিকিট দেখান।' পেছনের লোকজন উশখুশ করছে। আমি কী করব বুঝতে পারছি না। ব্যাগটাকে আমি কখন শেষবার দেখেছি মনে করতে পারছি না। পাকসুন্দরীর পাশে বসে থাকার সময় হালকা ব্যাগটা চেয়ারের পাশে পড়ে যায়নি তো। কিছু একটা বলে, কী বলেছিলাম জানি না, দৌড়ে এলাম চেয়ারগুলোর সামনে। কোনও ব্যাগ নজরে আসছে না। আমি যেখানে বসেছিলাম সেখানে এখন এক শ্বেতাঙ্গিনী বসে। তাঁকে বিরক্ত না করে নীচু হয়ে দেখতে চাইলাম নীচে পড়ে আছে কি না। তিনি 'হোয়াট ননসেন্স' বলে রেগেমেগে উঠে গেলেন। কিন্তু না নীচেও ব্যাগটির দর্শন পেলাম না।

ততক্ষণে আমি ঘেমে নেয়ে একশা। মনে হল পাকসুন্দরী কি দেখেছেন বস্তুটি? জিজ্ঞাসা করে আমি ছুটে গেলাম সিকিউরিটির সামনে। তিনি তখন ভেতরে পা বাড়াচ্ছেন, প্রশ্নটি শুনে চোখ ঘোরালেন, 'দ্যাখো কী কাণ্ড। এতক্ষণ ওই সামান্য ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে ঘুরছিলেন আর সেটা খেয়াল রাখলেন না। আমার হাজব্যান্ড ঠিক এই কাণ্ড করেন। যে পুরুষগুলো নিজের রুমাল সামলাতে জানে না তারা কী করে বিশ্বের সমস্যা সমাধান করতে চায় কে জানে? না বাবা, আমি

দেখিনি কিছু।'

তিনি চলে গেলেন ভেতরে। এবং আমার মনে হল টয়লেটে ফেলে আসিনি তো? দৌড়ে গেলাম। একই চিহ্ন দেওয়া গোটা তিনটে টয়লেট। এর কোনটায় আমি এসেছিলাম। তিনটেতেই খুঁজলাম। যে বেসিনে মুখ ধুয়েছিলাম, তার নীচেও নজর করলাম, আমার ব্যাগ কোথাও নেই।

বাইরে বেরিয়ে এসে মনে হল ট্রাঞ্জিট লাউঞ্জের সমস্ত আলো আমার কাছে হলদে হয়ে গেছে। এতো মানুষ সুমধুর শব্দ কিন্তু আমি যেন গভীর জলের তলায় শুয়ে আছি। গেঞ্জি ভিজে গেছে এবং নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। টিকিট এবং পাশপোর্ট ছাড়া জার্মানিতে আমি প্রমাণ করতে পারব না কোথায় যেতে চাইছি। এমনকি এই কারণে ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে। আমি তো আমার পরিচয় বোঝাতে চাইলেও কেউ বুঝবে না। খিদে পেলে খাবার কেনার পয়সা নেই। লস্ট আয়ডেনটিটি বলতে যা বোঝায় এখন আমার অবস্থা তাই। আর তখনই কলকাতার জন্যে, জলপাইগুড়ির জন্যে মন কেমন করতে লাগল। আমি এখন কী করব?

এই সময় আকাশবাণী হল, নিউইর্কগামী প্যান অ্যামের যাত্রীদের শেষবারের জন্যে ডাকা হচ্ছে। প্লেন খুব শিগগির ছেড়ে যাবে। অর্থাৎ আমার নৌকো আমাকে না নিয়েই বেরিয়ে যাচ্ছে। কবিত্ব নয় অসহায় মানুষের যন্ত্রণা কি কখনও কখনও কবিতার মতো হয়ে যায়? পরশপাথর হারানো ক্ষ্যাপার মতো আমি চারপাশে নজর রেখে হাঁটছিলাম। কোথাও ব্যাগটির চিহ্নমাত্র নেই। মন বলল পাওয়া যেতে পারে না। কারণ যে পাবে সে ডলারগুলো ছাড়বে না। যে পাবে সে ট্রাভেলার্স চেকেরও একটা গতি করে নিতে পারে। এই সময় আবার আকাশবাণী হল, মিস্টার এস মজুমদার, অ্যা প্যাসেঞ্জার ইন প্যান অ্যাম নিউইয়র্ক ফ্লাইট ইজ রিকোয়েস্টেড টু—আর দাঁড়ালাম না। জীবনের সেরা দৌড়টি দৌড়ে প্যান অ্যামের ডেস্কের সামনে পৌঁছে গেলাম।

ডেস্কে তখন দুজন প্যান অ্যামের পোশাক পরা কর্মচারী দাঁড়িয়ে। প্রথম জন সাহেব ব্যস্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়েস?' ইংরেজি শব্দগুলো দ্রুত তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। তবু বোঝাতে পারলাম আমিই সেই লোক যার নাম মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে।

ভদ্রলোক ধমকে উঠলেন, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? তাড়াতাড়ি টিকিট দিন। একটা পুরো প্লেন আপনার জন্যে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারে না।' ব্যস্ত হয়ে হাত বাড়ালেন তিনি।

গলা শুকিয়ে গেছে ততক্ষণে। বললাম, 'আমাকে কি আপনার মনে পড়ছে না? তখন টিকিট দেখাতে পারিনি, আসলে আমার সাইড ব্যাগটাই আমি হারিয়ে ফেলেছি।'

'মাই গড!' ভদ্রলোক কপালে চোখ তুললেন, 'ব্যাগে টিকিট ছিল?'

বার কয়েক মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম। তারপরে খেয়াল হতে বুক পকেট থেকে দিল্লি ফ্রাঙ্কফুর্টের বোর্ডিং কার্ডের অংশটি বের করে ডেস্কে রেখে বললাম। 'এই দেখুন আমি আপনাদের এয়ারলাইন্সে ফ্লাই করছি।'

'হোয়ার ইজ ইওর পাশপোর্ট?'

'সব ওর মধ্যে ছিল। পাশপোর্ট, টিকিট, ডলার, ট্র্যাভেলার্স চেক।'

ভদ্রলোক কাঁধ নাচালেন, আমার কিছু করার নেই। আপনি পুলিশকে রিপোর্ট করুন ইমিডিয়েটলি, নইলে উইদাউট পাশপোর্ট এখানে থাকলে বিপদে পড়বেন।' আমার সম্পর্কে দুশ্চিন্তা করা ছেড়ে দিয়ে তার সঙ্গীকে বললেন, 'ক্যাপ্টেনকে বলে দাও প্লেন ছেড়ে দিতে।'

দ্বিতীয় ভদ্রলোক ফরসা কিন্তু মনে হচ্ছি এশিয়ার মানুষ। এতক্ষণ সোজা চোখে আমাকে দেখে যাচ্ছিলেন। এবার জড়ানো ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি দিল্লির লোক?'

'না। আমি কলকাতায় থাকি। প্লেন ছেড়ে দিলে আমি কী করব?'

'ব্যাগটাতে এতসব জিনিস রেখে অসাবধান হয়েছিলেন কেন?' একটা কাগজ টেনে নিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'নাম কী?'

নাম বলতেই চোখ তুললেন, 'লেখেন?'

'দেশ' পত্রিকায় যখন আমার প্রথম গল্প ছাপা হয়েছিল তখনও এত আনন্দ হয়নি। মাথা নাড়তেই ভদ্রলোক তার সঙ্গীকে বললেন, 'ক্যাপ্টেনকে বলো আর দশ মিনিট অপেক্ষা করতে।'

সঙ্গীটি কাঁধ নাচালেন। ডেস্কে বেরিয়ে এলেন দ্বিতীয় ভদ্রলোক। তারপর পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে এসে ঠিক কোথায়-কোথায় গিয়েছিলেন বলুন তো?'

আমি তখন হতবাক। এই ভদ্রলোক বাঙালি? ফ্রাঙ্কফুর্টের প্যান অ্যামের ডেস্কে একজন বাঙালি বিদেশির ভঙ্গিতে কাজ করছেন? বিস্ময় কাটিয়ে বললাম, 'আপনি যে বাঙালি তা বুঝতেই পারিনি।'

তিনি বললেন, 'সেটা বুঝে আপনার কোনও উপকার হবে না। চটপট বলুন। ওই ব্যাগ না পেলে আপনার কী অবস্থা হবে অনুমান করতে পারছেন? এখানকার জেলে কিছুদিন কাটিয়ে দেশে ফিরতে হবে হাই কমিশনের দয়ায়। ব্যাগটা কীরকম ছিল?'

ভদ্রলোককে যতটা সম্ভব, ঠিকঠাক বর্ণনা দিলাম। তিনি প্রথমে টেলিফোনে এয়ারপোর্ট অথরিটিকে জার্মান ভাষায় কিছু জানালেন। তারপর আমাকে নিয়ে বেরুলেন ব্যাগ খুঁজতে। বাচ্চারা পথে কিছু হারিয়ে এলে মা-বাবা যেভাবে সেটা খুঁজতে বের হন ওর ভঙ্গি দেখে তাই মনে হচ্ছিল। ইতিমধ্যে জার্মান, ফরাসি এবং ইংরেজিতে ঘোষণা করা হচ্ছিল, যে-কোনও ধরনের চামড়ার সাইড ব্যাগ যার সরু স্ট্যাপ, যদি কেউ কোথাও পড়ে থাকতে দ্যাখেন, তাহলে বাইশ নম্বর গেটে প্যান অ্যামের ডেস্কে এখনই পৌঁছে দিন। চেয়ারগুলো থেকে শুরু করে ডিউটি শপগুলোর সামনে দিয়ে অনেকটা পাক খেয়ে এলাম ওঁর সঙ্গে। আমার মন বলছে পাওয়ার কোনও চান্স নেই। বাল্যকালে এক তান্ত্রিক পিতামহকে বলেছিলেন আমার নাকি জেলের ভাত খাওয়ার যোগ আছে। ফ্রাঙ্কফুর্টের জেলে কি ভাত দেয়? এই ভদ্রলোককে ঠিকানা দিয়ে গেলে কি তিনি কলকাতায় জানিয়ে দেবেন আমার কপালে কী ঘটেছে? বিয়ার খাওয়ার সময় মুখ তুলেছিলাম ওপরে। তখনই যদি পড়ে গিয়ে থাকে—। আবার ছুটে গেলাম জায়গাটায়। চকচকে মেঝেতে একটা কুটো পড়ে নেই। পাকসুন্দরীর ফেলে দেওয়া বিয়ার পর্যন্ত এর মধ্যে মুছে নিয়ে গিয়েছে জমাদার। ভদ্রলোক এবার টয়লেটগুলোয় ঢুকছেন। এক নম্বরে আমি যাইনি কিন্তু উনি গেলেন। দুনম্বরে উনি যাওয়ার আগে বললাম, 'আমি তিন নম্বরটায় গিয়েছিলাম।'

তিন নম্বর থেকে ফিরে এসে ভদ্রলোক জানালেন, 'নাঃ।' কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। কী করা যায় বলুন তো আপনাকে নিয়ে?'

বলতে-বলতে তিনি এবার দু'নম্বরটায় ঢুকলেন। একা হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। তিনটে টয়লেট একইরকম দেখতে। ওই বেসিনটায় কি আমি মুখ ধুয়েছিলাম? হঠাৎ ভদ্রলোক দেওয়ালে ঝোলানো ওভারকোট বা টুপি রাখার হ্যাঙার দেখিয়ে বললেন, ওটা কি আপনার?'

মেলায় হারিয়ে যাওয়া বউকে খুঁজে পেলে সম্ভবত এমন আনন্দ হয় না। এক দৌড়ে কাছে গিয়ে ব্যাগটা নামিয়ে নিলাম। এ ব্যাগ আমারই। আমার প্রাণভোমরা এর মধ্যেই ছিল। জিপার খুলতেই টিকিটের রং উঁকি মারল। পাগলের মতো হাতড়ে দেখলাম পাশপোর্ট, টিকিট, ট্রার্ভেলার্স চেক মায় সেই ডলারগুলো একই অবস্থায় পড়ে রয়েছে ওর গহ্বরে। ভদ্রলোক ততক্ষণে ছুটতে আরম্ভ করেছেন, চলে আসুন। আর এক মিনিটও সময় নেই। টিকিটের একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে বোর্ডিং কার্ড ধরাতে কতক্ষণ লেগেছিল জানি না। পৃথিবীতে কেউ এত জলদি বোর্ডিং কার্ড নিয়ে সিকিউরিটি গণ্ডি পেরিয়েছে কি না তাও জানা নেই। বাঙালি ভদ্রলোক সিকিউরিটিকে বলছিলেন তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে। ওরা এক্স-রে পর্যন্ত করতে পারল না। প্লেন তখন টানেল ছেড়ে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে। অতএব আমরা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে ছুটছি। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এলাকা ছাড়িয়ে টারম্যাকে নামতেই মনে হল জমে যাব। অনর্গল বেরুনো ঘামে ঠান্ডা লেগে আরও কনকনে হয়ে যাচ্ছে। পরনে একটিও

গরম জামা নেই। কিন্তু শীতের তোয়াক্কা না করে ছুটে এলাম প্লেনের কাছে। বাঙালি অফিসারের নির্দেশে একটি চাকাওয়ালা সিঁড়ি লেগে গেল প্লেনের দরজায়। দু-পা উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে যাচ্ছি তিনি চিৎকার করে বললেন, 'চটপট উঠে যান। ওসং বলতে হবে না।'

প্লেনের দরজাটা যখন আমার পেছনে বন্ধ হল, তখন মনে পড়ল এত তাড়াহুড়োয় মানুষটির নামটাও জেনে এলাম না। অথচ তিনি আমার কাছে ঈশ্বরের ভূমিকায়। বিশাল চেহারা আমেরিকান ক্যাপ্টেন যে আমার সামনে দাঁড়িয়ে তা বুঝতে পারিনি। যথাসম্ভব গলা নামিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহাশয়ের পরিচয়টা জানতে পারি কি যাঁর জন্যে আমাকে এতক্ষণ অপেক্ষা করতে হল।'

তারপরই উত্তরের জন্যে এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে তিনি হনহনিয়ে চলে গেলেন ককপিটের দিকে। একজন এয়ার হোস্টেস আমার বোর্ডিং কার্ডটিতে নজর বুলিয়ে ইশারা করলেন অনুসরণ করতে। বিশাল প্লেনটাকে প্রায় সাঁতরে এলাম দু'পাশে কৌতূহলী এবং বিরক্ত দৃষ্টি উপেক্ষা করে। যেন আমি না এলেই এরা খুশি হতেন।

একেবারে শেষ প্রান্তের জানালার ধারের একটি আসন দেখিয়ে এয়ার হোস্টেস বললেন, 'চটপট সিট বেল্ট বেঁধে নিন।' বলতে-বলতে ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। শরীর এলিয়ে দিয়ে মিনিটতিনেক চোখ বন্ধ করে বসে রইলাম। মাথা থেকে পা পর্যন্ত চিনচিনে অনুভূতি বয়ে যাচ্ছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্লেনের ভেতরে বসে আমার শরীর ক্রমশ শীতল থেকে শীতলতর হয়ে যাচ্ছে। মাথার ভেতর পৃথিবীর সব শূন্যতা যেন চেপে বেঁধে রয়েছে। নিজেকে ধাতস্থ করতে বেশ সময় লাগল। একটু আগে ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমার পরিচয় কী? ওই বাঙালি অফিসারটি না থাকলে আমার পরিচয় কিছু দেওয়ার ছিল না। হঠাৎ মনে হল যদি কোনও মানুষকে তার পরিবার পাড়া পরিচিত অল্প-পরিমণ্ডল থেকে বের করে এনে এস্কিমো বা ওই ধরনের প্রায় বিচ্ছিন্ন সমাজে ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে সে কোন পরিচয় নিয়ে গর্ব করবে? কোন পরিচয় দিয়ে সে স্বীকৃতি আদায় করবে?

খাবার এল। খেতে মোটেই ইচ্ছে করছিল না। ফিরিয়ে দিলাম। হঠাৎ এয়ার হোস্টেস কোমল গলায় বললেন, 'আমরা শুনেছি আপনি আপনার আইডেনটিটি এবং টিকিট হারিয়ে ফেলেছিলেন। আপনার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছি। আপনি কি একটু ব্র্যান্ডি নেবেন?'

আপত্তি করলাম না। প্লেন তখন মহাকাশে। জার্মানি রইল পেছনে পড়ে। মাঝে-মাঝে ক্যাপ্টেন জানিয়ে দিচ্ছেন ইউরোপের কোন কোন দেশের ওপর দিয়ে আমরা উড়ে যাচ্ছি। আলো নিভিয়ে ছবি দেখানো হল। কিন্তু কিছুই উপভোগ করতে পারছিলাম না। এই প্লেনে তিন স্তরের যাত্রীরা আছেন। সিট ছেড়ে তাঁদের দেখব বলে খানিকটা এগোতেই পাকসুন্দরীকে নজর পড়ল। তিনি জানলার ধারে একটা সিটে বসে পাশের এক ছোকরা সাহেবকে কী বোঝাচ্ছেন। সাহেব কিছু বলতেই তিনি হেসে গড়িয়ে পড়লেন। ততক্ষণে আমি তার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি। হাসতে-হাসতে সুন্দরী তখন বলছেন, 'যাই বলুন পুরুষরা বড় অল্পেতেই সন্তুষ্ট হয়। এত বোকা, না?'

ফিরে এলাম। কেন এলাম তাও জানি না। এই সাহেবকে ঈর্ষা করার অথবা পাকসুন্দরী সম্পর্কে অভিমান আমার মনে জন্মাবার কোনও কারণ নেই। উনি নিশ্চয়ই এয়ার হোস্টেসের সঙ্গে আমাকে দেখেছেন। অথচ—।

দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। আকাশে মেঘের গায়ে রঙের মতো রোদ। জানলা দিয়ে অলসভাবে তাকিয়েছিলাম। হঠাৎ কানে এল, আমরা মিনিটপাঁচেকের মধ্যেই কেনেডি এয়ারপোর্টে নামছি।

ক্রমশ চোখের সামনে সাজানো আলোর বাগান ভেসে উঠল। আকাশ থেকে নিউইয়র্কের কেনেডি এয়ারপোর্ট দেখার আনন্দে আমি পাকসুন্দরী ক্ষমা করলাম। ক্রমশ নীচু হয়ে আমাদের প্লেনটা সেই আলোর বৃত্তে প্রবেশ করল।

॥ ৪ ॥

হেমন্তের রাত্রে চা-বাগানের আকাশ মধ্যবয়সী নারীর আলস্য মেখে স্থির হয়ে থাকে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলেই সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার পবনমাসির মুখ মনে পড়ত। সারাদিন শুয়ে বসে বই পড়ে কাটিয়ে দিতেন তিনি। ভারী শরীরে যৌবন দেখার বয়স হয়নি তখন আমার। বিকেল চারটে হলে তিনি স্নান করতে যেতেন। রোজ পাটভাঙা নীলচে শাড়ি পরতেন গুছিয়ে চুল বেঁধে। মুখে সামান্য পাউডারের ছোঁয়া পড়লেই প্রায় চল্লিশে চেহারা অন্যরকম হয়ে যেত। সন্তানহীনা সেই মহিলার স্বামী পবনমেসো যিনি কাঠের ব্যাবসা করতেন, ফিরে আসতেন আলো জ্বললেই। সঙ্গে থাকত বন্ধুরা। রাত এগারোটা পর্যন্ত ওই বাড়িতে হুল্লোড় হত। তাঁরা যখন বিদায় নিতেন পবনমেসোকে দেখা যেত না। পবনমাসি দরজায় দাঁড়িয়ে হাতের উলটো পিঠে হাই ঢাকতেন। আমাদের নিষেধ ছিল ও-বাড়ির চৌহদ্দিতে যাওয়া। তবু আমরা পবনমাসিকে দেখতে চাইতাম। আর হেমন্তের রাত এলে আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হত কোথায় যেন বড় মিল, খুব মিল। আশ্চর্য, কেনেডি এয়ারপোর্টে নেমে আমার এতদিন পরে এসেই পবনমাসির মুখ মনে পড়ল।

শীত ছিল। তাও চা বাগানে ডিসেম্বর এলে যেমন থাকে। টানেল নয়। আমাদের নামানো হয়েছে এয়ারপোর্টের বিল্ডিং-এর দরজায়। শীতবস্ত্র রয়েছে বাক্সে। সেটার দখল পাব ভেতের যাওয়ার পরে। ছুটন্ত পথ আমাদের বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওপরে। সুড়ঙ্গের মতো এই রাস্তার কত মুখ। যার যেদিকে দরকার সে চলে যেতে পারে। আমি চোখ রেখেছি পাকসুন্দরীর দিকে। তিনি এখন একা। সেই সাহেব ভিড়ে মিশে গেছেন। পাকসুন্দরী যেদিক দিয়ে বেরুবেন আমিও সেই পথ ধরব। মনোজের আসার কথা আছে আমায় নিতে। আচ্ছা, ধরা যাক, মনোজ এল না। এয়ারপোর্ট নিশ্চয়ই শহরের বুকে হবে না। কী করে ঠিকানা খুঁজে বের করব। আর এক ধরনের নার্ভাসনেসের শিকার হলাম আমি। জানি না কেন, এমন হয়, বিদেশের অপরিচিত পরিবেশে আমি কিছুতেই স্বচ্ছন্দ হতে পারি না। আড্ডা মারার নেশা রক্তে এমন মিশে গেছে যে একা কাটানোর কথা ভাবলেই মনে হয় গিয়ে কাজ নেই। অথচ চাপড়ামারির জঙ্গলে কত রাত একা কাটিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। হয়তো সেই গাছগাছালিগুলোকেও বন্ধু বলে মনে হত তখন।

সামনেই বিশাল হলঘর। খানিকটা দূরত্ব রেখে পরপর গোটাপনেরো ডেস্কে সাদা এবং কালো সাহেবরা ওখানে বসে আমেরিকায় প্রবেশ করার অনুমতি দিচ্ছেন। তড়িঘড়ি কেরোসিনের লাইন নয়, আমাদের রাখা হল কিছুটা দূরত্বে। তারপর এক-একজনের কাজ ফুরোলে এগিয়ে যাওয়া। আমার ভাগ্যে পড়লেন একজন কালো অফিসার। চেহারাটি বিশাল। বললেন, 'শো মি ইওর আই ডি।'

আই ডি বস্তুটি বুঝতে পারলাম না। ঠোঁটের ফাঁকে একটা টুথপিক চেপে রেখে কাঁধ নাচাল, 'পাশপোর্ট।'

এগিয়ে দিলাম। পাতাগুলোয় শুধু আমেরিকার ভিসা নয়, ফরাসি দেশের ভিসাও নিয়েছিলাম। ফেরার পথে লন্ডনে নেমে যাওয়ার ইচ্ছে আছে তাই। খবর নিয়ে জেনেছি তখন লন্ডনে ভিসার চাহিদা নেই। উলটোপালটা পাতা ক'টা দেখে লোকটি বলল, 'শো মি ইওর টিকেট।' অর্থাৎ আমি ফিরে যাব কি না যাচাই করতে চাইছে। 'হোয়েন উইল ইউ গো ব্যাক?'

'উইদইন টু মান্থস।' চটপট জবাব দিলাম।

'হাউ মাচ ডলার ডু ইউ হ্যাভ?'

এ যে দেখছি আমাদের মতো ইংরেজি বলে! অঙ্কটা জানালাম। তারপর মনে পড়তেই ট্রাভেলার্স চেকের সঙ্গে রাখা ইউ এস আই এসের আমন্ত্রণ পত্রটা বের করে সামনে রাখলাম। সেটায়

নজর বুলিয়ে স্ট্যাম্প তুলে সশব্দে ছাপ মেরে দিল লোকটা পাশপোর্টের পাতায়। তারপর ইশারায় পাশ দিয়ে চলে যেতে বলল। ঘুরন্ত বেল্টে নিজের সুটকেস দেখার মতো আনন্দ আর কিছুতেই নেই। বেচারা দিল্লি থেকে এসেছে আমার সঙ্গে অথচ পথে ছিল ভাসুর-ভাদ্দর বউ-এর সম্পর্ক। বেল্ট থেকে সেটাকে তুলে এগোচ্ছি হঠাৎ পাকসুন্দরী ডাকলেন, 'শুনিয়ে।'

মুখ ফেরালাম। তিনি বিগলিত হয়ে বললেন, 'যাক শেষ পর্যন্ত ব্যাগ খুঁজে পেয়েছেন দেখে কী ভালো লাগল। নাউ, উইল ইউ বি কাইন্ড এনাফ টু ক্যারি দিজ টু বটলস্? আমি বাইরে গিয়েই নিয়ে নেব। ওরা এমন পাজি, দুটোর বেশি নিলেই ঝামেলা করে।' জীবনে প্রথমবার কোনও নারীকে বিমুখ করলাম। তিনি হিংস্র মুখে তাকাতেই আমি এগিয়ে গেলাম কাস্টমস এনক্লোজারের দিকে। খাদ্য দ্রব্য, গাঁজা, চরস জাতীয় মাদক আমেরিকায় নিয়ে আসা বেআইনি। জানি না আমেরিকায় সোনা পাচার হয় কি না। কাস্টমসের অফিসাররা আমায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ডু ইউ হ্যাভ এনিথিং টু ডিক্লেয়ার?'

মাথায় কিছু না আসতে বললাম, 'ইয়েস, আই হ্যাভ ব্রট মাইসেল্ফ?'

'ওয়েলকাম। ওয়েলকাম ইন ইউ এস এ।' হাত বাড়িয়ে প্রস্থান পথ দেখিয়ে দিলেন।

আপাতত আমার সুটকেসটা আসলে মুকুন্দর। চারটে চাকা লাগানো সুটকেসটা তিনি আমায় বিদেশ যাত্রার প্রয়োজনে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। কিন্তু কান ধরে টানলে এত আওয়াজ হয় যে চারপাশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে উপায় নেই। তার চেয়ে একটা লাগেজ ট্রলি নিয়ে কাজ হত। দরজা পার হতেই কিছু মানুষের ভিড় নজরে এল। আত্মীয় বন্ধুদের সংগ্রহ করতে এসেছেন এঁরা। বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করছিল। এবং তখনই মনোজ হাত তুলল। মাঝারি চেহারার সুন্দর ছাঁটা দাড়ি নজরে পড়তেই বুক জুড়িয়ে গেল। কাছে এসে মনোজ বলল, 'তাহলে আমি আপনাকে পেলাম।' হাতে হাত মিলিয়ে বলল, 'আলাপ করিয়ে দিই। আমার ভাই শ্যামল,' শ্যামলের পরনে জিনসের প্যান্ট এবং চামড়ার জ্যাকেট। মনোজ বলছিল 'ঠান্ডাটা এখন কম। কলকাতার শীতের চেয়ে একটু বেশি। কিন্তু বৃষ্টি পড়লে আর দেখতে হবে না।' আমি সোয়েটার চাপাতে-চাপাতে বললাম, 'চা-বাগানের ঠান্ডা এরচে' বেশি।' এই সময় পাকসুন্দরীর চেহারা নজরে পড়ল। তিনি গদগদ মুখে বের হচ্ছেন। তাঁর দৃষ্টি এক রাসভারী প্রৌঢ়ের দিকে। কাছে এগিয়ে যেতেই তিনি শুধু স্ত্রীর হাত থেকে হুইস্কির ব্যাগটা তুলে নিলেন। পাকসুন্দরী ক্রীতদাসীর মতো মালপত্র নিয়ে পেছন-পেছন চললেন ট্রলি ঠেলে। হঠাৎ বেচারার জন্যে খুব কষ্ট হল। ওঁর অবস্থা রত্নদার মতো। গল্প লিখতেন রত্নদা। দেশ পত্রিকা বা বড় কাগজে যেদিন মফস্‌সল থেকে জমা দিতে আসতেন সেদিন তাঁর স্ত্রী একটা খাতায় গল্পের নাম কাগজের নাম লিখে রাখতেন। টাকা বা চেক এলে তার পাশে অঙ্কটি বসিয়ে ব্যাঙ্কে জমা দিতেন তিনি। অ্যাকাউন্টটা যেহেতু দুজনের নামে তাই তিনিই টাকা তুলতেন। একবার দেশ পত্রিকা থেকে তাঁর গল্প ফেরত দেওয়া হয় কাকিমার সঙ্গে ভাইপোর শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে আপত্তি তুলে। তাই শুনে খেপে যান রত্নদার স্ত্রী। খাতা থেকে গল্পের নাম কাটতে পারবেন না তিনি। তাঁরই নির্দেশে রত্নদা কাকিমা কেটে বউদি করেন। ভদ্রমহিলার যুক্তি ছিল রবীন্দ্রনাথ যদি ওই কাজ গল্পে করতে পারেন তাহলে রত্নদাও পারবেন। ঘটনাটা শুনে আমাদের কষ্ট হয়েছিল রত্নদার জন্যে। পাকসুন্দরী আর রত্নদার মধ্যে ফারাক খুব বেশি নেই বাড়তি স্বাধীনতা এইটুকু যে ওঁকে এখানে বোরখা পরতে হয়নি।

শ্যামল ব্যাগ তুলে নিল। কাঁধের সরু স্ট্র্যাপের ব্যাগটা আর হাতছাড়া করতে রাজি নই আমি। আলো ঝলমল কেনেডি এয়ারপোর্টের বিভিন্ন করিডোর পেরিয়ে বাইরে আসতেই মনে হল মুখের চামড়ায় জ্বালা ধরল। এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এর ভেতর বুঝতে পারিনি ঠান্ডাটা কত জাঁকাল। মনোজের গাড়ির সামনের সিটে বসামাত্র ও বলল, 'বেল্টটা বেঁধে নিন নইলে ফাইন দিতে হবে।'

আজন্ম কোনও গাড়িতে ওঠার পর এমন নির্দেশ পাইনি। ড্রাইভারের জায়গায় বসে মনোজও

বেল্ট বাঁধল। বকলস লাগিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বুঝতে পারছি অ্যাকসিডেন্ট থেকে সামলাবার জন্যে এই ব্যবস্থা কিন্তু ফাইন করার লোক দেখবে কী করে?'

মনোজ হাসল, 'আইনের চোখ এখানে সর্বত্র।'

এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এর পাশ দিয়ে গাড়ি বাইরে বের করে আনতেই মনে হল যা ছিল এয়ারপোর্টের ভেতর ঘন সন্ধ্যার তা এখন শেষ বিকাল। রোদ নেই কিন্তু অন্ধকারও নেই। আমার ঘড়ি বলছে কলকাতার মানুষজন ঘুমের জন্যে তৈরি। ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে মসৃণ রাস্তা যত বাঁক নিচ্ছে তত গাড়ির ভিড় নজরে আসছে। মনোজ বলল, 'চারপাশে নজর বোলান, এখন শুধু আপনার দেখার পালা। আপনি আসবেন বলে আমি ছুটি নিয়ে বসে আছি। জমিয়ে একটা স্ক্রিপ্ট করুন তো, যাতে হইচই ফেলে দেওয়া ছবি করতে পারি।'

আমরা যাচ্ছিলাম হাইওয়ে দিয়ে। ষাট-সত্তর স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছে মনোজ। বিশাল রাস্তার একদিকে চারটে ট্র্যাকে বিভিন্ন স্পিডের গাড়ি যাচ্ছে। রাস্তার ওপরে নানারকম দিক্‌নির্দেশ টাঙানো। লেখাগুলোয় স্প্যানিশ প্রভাব বেশি। কিন্তু কোথাও কোনও ট্রাফিক পুলিশ চোখে পড়ল না। সে কথা জিজ্ঞাসা করতে মনোজ বলল, 'আছেন, তাঁরা সর্বত্র বিরাজ করেন।' আমার চোখ অবশ্য ওকে সমর্থন করল না।

হাইওয়ে থেকে বেরিয়ে সুন্দর, ছবির মতো একটা পাড়ায় চলে এলাম আমরা। এই জায়গাটার নাম কুইন্স। দু-পাশের দেবদারু গাছের সারি-সারি দিয়ে পড়ে থাকা নির্জন রাস্তার গায়ে সুন্দর বাংলাগুলোর একটার সামনে মনোজ গাড়ি থামাল। থামিয়ে বলল, 'এই আমার কুঁড়েঘর। ইয়ার্কি ভাববেন না, এখানে এই বাড়িগুলোকেই হাট বলে।'

ওপরে লাল টালি দেওয়া কাঠ ও সিমেন্ট মেশানো লন বাগানওয়ালা ছিমছাম বাড়িটির দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন এক সুন্দরী মহিলা। পরনের হলদে শাড়ি তাঁর গায়ের রঙের সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে গিয়েছে। মাঝারি চেহারার ওই মহিলার গায়ে একটা জ্যাকেট, হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, 'আসুন, পথে কোনও অসুবিধে হয়নি তো?'

শ্যামল ততক্ষণে সবাইকে পাশ কাটিয়ে মালপত্র বয়ে নিয়ে গিয়েছে ভেতরে। পথের অসুবিধের কথা মনে হতেই ফ্রাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্ট চোখের সামনে ভেসে উঠল। নিজের অসাবধানতার কথা গল্প করে লাভ কী।

মনোজের বসার ঘরে ঢুকতেই মনে হল নাটকের স্টেজে ঢুকে পড়েছি। কার্পেটে মোড়া মেঝের ওপর সোফা সেট, টিভি কিন্তু তার একপাশে উঁচু প্ল্যাটফর্ম। সেখানে চা করার ব্যবস্থা। ওপাশে রান্নাঘর। ওই প্ল্যাটফর্মের একাংশ চলে গেছে শোওয়ার ঘরের দিকে। দুটো প্রচণ্ড ছটফটে শিশু এই বাড়িটিকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে। একতলায় দুটি শোওয়ার ঘর। দোতলায় শ্যামল থাকে। একতলার একটিতে আমার ব্যবস্থা হওয়ার পর জামাপ্যান্ট পালটে চওড়া নরম বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে কয়েক মিনিট শুয়ে রইলাম। দেড়দিনের মতো পথে কাটিয়েও কিন্তু সেরকম ক্লান্তি লাগছে না আমার। জেটল্যাক বলে একটা কথা শুনেছিলাম। সেটা আমাকে এখনও তো আক্রমণ করেনি। মুখ ফিরিয়ে চারধারে বাচ্চাদের খেলনা, রামকৃষ্ণের ছবি দেখতে পেলাম। হঠাৎ মনে হল এই যে আমি এখন খোদ নিউইয়র্কে শুয়ে আছি অথচ এই ঘরটাকে পশ্চিমবাংলার যে-কোনও জায়গায় নিয়ে গেলে বলা যেত সেখানেই রয়েছি। মানুষ বোধহয় যে-কোনও শহরে বাস করতে গিয়ে সেই শহরটাকে নিজের মতো করে নেয়।

মনোজ টালিগঞ্জের ছেলে আর ওর স্ত্রী হাওড়ার। নিউইয়র্কে এক বছর থেকেও খাওয়া পরা জীবনে পুরো বাঙালি হয়ে আছে। স্বপ্নের মতো চাকরি করেও সে বাঙালিদের সাহেব হওয়া নিয়ে ঠাট্টা করে যায়। রাতের খাওয়া সেরে মনোজ আমাকে মাটির তলার ঘরে নিয়ে এল। আর ঘরটিকে দেখেই আমি প্রায় প্রেমে পড়লাম। এখানেই ওরা পত্রিকার কাজকর্ম করে। কল্যাণের কলকাতা থেকে

পাঠানো আর্টপুল নিউইয়র্কে ছাপিয়ে।এদেশের বাঙালিদের কাছে পৌঁছোনোর ব্যবস্থা করে মনোজ আর শ্যামল। বিশাল ঘরটায় টিভি, টয়লেট, বই এবং রেকর্ড প্লেয়ার রয়েছে। আছে একটা টেলিফোনও। আরাম করে বসে মনোজ জিজ্ঞাসা করল, 'খুব টায়ার্ড লাগছে? ঘুমাবেন।' 'মোটেই না। আমি ভাবছি আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তো এই ঘরে চলে আসব।'

'আমি ওকে বলেছিলাম। ও রেগে গেল।' বলল, 'অতিথিকে মাটির নীচের ঘরে রেখে অসুস্থ করতে চাও? অবশ্য এখানে ঠান্ডাটা বেশি।'

'কম্বল আছে, কোনও অসুবিধে হবে না।'

কথায়-কথায় মনোজের ছবির কথায় এলাম। ওর উপন্যাসের নাম 'এই দ্বীপ এই নির্বাসন'। আমার প্রস্তাবমতো নির্বাসন নামে আসতে দ্বিধা দেখাল মনোজ। গল্পটা আমি কীভাবে ভেবেছি বলতে শুরু করলে ও হেসে ফেলল, 'না মশাই, এখানে পান-সিগারেটের দোকান পাড়ায়-পাড়ায় নেই। চলুন এক পাক ঘুরে আসি। আপত্তি আছে?'

প্রাথমিক ক্লান্তি কেটে যাওয়ার পর ঘুমের বালাই ছিল না চোখে। মনোজের স্ত্রী আপত্তি করলেন, 'অতখানি পথ উড়ে এসেছেন উনি আর তুমি এত রাতে আবার ওকে নিয়ে বের হচ্ছ। এখানে থাকাটা কি আজই শেষ হয়ে যাচ্ছে।'

কিন্তু দুটি অবাধ্য পুরুষকে কোনও নারী কি স্তিমিত করতে পারে। বেরুবার আগে মনোজকে বললাম, 'এক ভদ্রলোককে ফোন করা দরকার। শুনেছিলাম তিনি রাত এগারোটার আগে বাড়িতে থাকেন না আপনার যদি আপত্তি না থাকে—।'

মনোজ বিরক্ত হল, 'ফোন করবেন তো কিন্তু-কিন্তু করছেন কেন। যখন ইচ্ছে করবেন। বাড়িতেও তো আপনার জানানো উচিত ঠিকঠাক এসেছেন।' ঘড়ি দেখে বলল, 'কিন্তু কলকাতায়। ওরা এখনও ঘুমোচ্ছে। ফিরে এসে কলকাতা ধরব।'

ছ'টা নম্বরের চাকতি ঘুরিয়ে টেলিফোনে কথা বলতে অভ্যস্ত আমরা। ডায়েরি খুলে দেখলাম নম্বর বিরাট লম্বা। বোতাম টিপে-টিপে সেটা শেষ করতেই ওপাশে ভারী গলা বেজে উঠল, 'হেলো!' জিজ্ঞাসা করলাম, মিস্টার কামাল ওয়াহিদা।'

'স্পিকিং। হু আর ইউ প্লিজ।'

'আমার নাম সমরেশ মজুমদার। একটু-আধটু লিখিটিকি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আপনার নম্বর দিয়ে যোগাযোগ করতে বলেছেন।'

'কবে এসেছেন আপনি।'

'আজই।'

'কোথায়।'

'নিউইয়র্কের কুইন্সে।'

'সুনীলের নাম না বললেও চলত। ঠিকানাটা বলুন।'

মনোজের ঠিকানা জানাতেই ভদ্রলোক বললেন, 'ঠিক আছে, আমি আসছি।'

মনোজ অপেক্ষা করছিল। রিসিভার রেখে বললাম, 'মনোজ, একটু মুশকিল হল। ভদ্রলোক বললেন তিনি আসছেন। এখন বেরিয়ে যাওয়া কি উচিত হবে।'

মনোজ কাঁধ নাচাল, 'ওকে বললেন না কেন আমরা বেরুচ্ছি। কোথায় থাকেন?' ঠিকানাটা পড়তেই মনোজ হো-হো করে হেসে উঠে এল, 'আপনি ভুল শুনেছেন। উনি আসছি বলতেই পারেন না। চলুন বেরিয়ে পড়ি।' আর কথা না বাড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে। নিজে একটা জ্যাকেট পরে নিল পাশের ওয়ার্ডরোব থেকে বের করে। আমার সোয়েটার পরা চেহারাটা দেখে জ্যাকেটটা উঁচিয়ে ধরল, 'এইটে চাপিয়ে দিন আপাতত।' কিন্তু আমি নিজের কান ভুল করতে পারি না। সেটা জানাতে মনোজ বুঝিয়ে দিল, 'আপনি যদি কলকাতা থেকে মালদার কাউকে টেলিফোন করে শোনেন

সে আসছি বলছে তাহলে কী বুঝবেন? এখান থেকে বোস্টনের দূরত্ব সেইরকম।' লক্ষ করলাম মনোজের স্ত্রী আর আমাদের বাধা দেননি বেরুতে, কিন্তু তিনি দরজা বন্ধ করার সময় নিজের আপত্তির চিহ্ন মুখে গোপন রাখতে পারেননি।

রাত এখন এগারোটা। পাড়াটা নিঝুম। ঠান্ডা ধারাল। মনোজের জ্যাকেটটা খুব উপকার দেবে বলে মনে হচ্ছে। অবশ্য গাড়ির ভেতরে ঢোকামাত্র মনোজ গরম হাওয়া চালিয়ে দিতেই আরাম লাগল। কুইন্স নিউইয়র্কের এক প্রান্তে। আসলে এইরকম কয়েকটা দ্বীপ নিয়েই নিউইয়র্কের প্রাণকেন্দ্র হল ম্যানহাটন। কয়েকটা ছোট রাস্তা পেরিয়ে আমরা মূল রাস্তায় চলে আসতেই গাড়ির ভিড় নজরে পড়ল। এই চওড়া রাস্তার আশেপাশে ঘরবাড়ি নেই। মাঝে-মাঝে রেস্টুরেন্ট, টয়লেট বা মোটেলের চিহ্ন। মনোজ বলল, 'একটা দিশি সিগারেট দিন তো।'

নিজের প্যাকেটের শেষ দুটো সিগারেট নিজেরা নিয়ে ছুটে যাওয়া গাড়ি থেকে প্যাকেটটা বাইরে ফেলে দিতেই মনোজ উচ্চারণ করল, 'সর্বনাশ।'

অবাক হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করতেই ও বলল, 'এয়ারপোর্ট থেকে আসার পথে পুলিশের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন না? কপাল খারাপ থাকলে এবার দেখা পেতে পারেন।'

ওর কথা ঠিক বুঝে ওঠার আগেই মনোজ বলল, 'এসে গেছেন।'

দেখলাম পেছনে একটা গাড়ি বারংবার আমাদের আলোর সংকেত দিচ্ছে। রাস্তার একপাশে মাঝে-মাঝে পার্ক করার ব্যবস্থা আছে। তার একটাতে গাড়ি থামাতেই লম্বাটে একটা গাড়ি আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। ওপাশের গাড়ির তরঙ্গে এ কারণে কোনও ব্যাঘাত সৃষ্টি হল না। সামনের গাড়ির দরজা খুলে এক বিশাল চেহারার পুলিশ অফিসার বাঘের মতো দ্রুততায় এগিয়ে এল, 'প্যাকেটটা কে ফেলেছে?'

মনোজ স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে কাঁধ নাচাতে লোকটা পকেট থেকে একটা ছোট খাতা বের করল। এই সময় আমি যেচে উত্তর দিলাম, 'আমি ফেলেছি।'

লোকটা কলম না খুলে হাত বাড়াল, 'শো মি ইওর আই ডি।'

আইডেন্টিফিকেশন কার্ডের আদুরে নামটি যে আমার ক্ষেত্রে পাশপোর্টের তা বুঝতে অসুবিধে হল না। গাড়ির আলোয় সেটাকে উলটেপালটে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কবে এসেছ এদেশে?'

উত্তরটা শুনে মনোজের দিকে হাত বাড়াতেই সে তার কার্ডটি এগিয়ে দিল। একপলক আলোয় সেটাকে দেখে নিয়ে লোকটা মনোজকে ধমকাল, 'তোমার ওকে বলে দেওয়া উচিত ছিল। সিগারেটের প্যাকেটের ফয়েলে চাকা পড়লে স্কিড করতে পারে গাড়ি। তা ছাড়া রাস্তাটা ডাস্টবিন নয়।' পাশপোর্ট আর কার্ড ফিরিয়ে দিয়ে লোকটা গাড়ি নিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ স্থির বসে থাকল মনোজ। তারপর হাসল, 'খুব জোর পঞ্চাশ ডলার বেঁচে গেল আপনি আজই এসেছেন বলে।'

সত্যি চমকে উঠেছিলাম। কলকাতায় কোনও বড় রাস্তায় কেউ সিগারেটের প্যাকেট ফেলছে আর পুলিশ এসে তাকে ধরে পাঁচশো টাকা জরিমানা করছে স্বপ্নেও তো ভাবা যায় না? হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানকার পুলিশ ঘুষ খায় না?'

'প্রচুর। কিন্তু হাত বাড়িয়ে লরিওয়ালার কাছ থেকে আট আনা নেয় না।'

এত রাতেও মাঝে মাঝেই গাড়ি দাঁড়াচ্ছিল ট্রাফিকের আলোর নিষেধে। আর তখনই পাশের ফুটপাতের থেকে কালো ছেলের দল সাবানের স্প্রে আর ডাস্টার নিয়ে এগিয়ে আসছিল গাড়ির দিকে। তারা গাড়ি পরিষ্কার করে পয়সা নেবে। মনোজ প্রতিবার নিষেধ করছে তাদের। লক্ষ করলাম দুটো গাড়ি আপত্তি করলেও তৃতীয়টিতে ওরা কাজ পাচ্ছিল। এই ভাবে এক-একটি ছেলে দিনে কুড়ি ডলার রোজগার করে। মনোজ বলল, শীতকালে এখানে ভালো বরফ পড়ে। নিয়ম হল প্রত্যেক বাড়ির মালিককে তার লনের জমে থাকা বরফ রাস্তার ধারে ফেলতে হবে সপ্তাহে দুদিন। পরিশ্রমটা বুঝুন। সেই সময় এই ছেলেরা এসে আমাদের সঙ্গে চুক্তি করে। এক রাস্তার দু-ধারে যত বাড়ি

আছে তার বরফ ওরা পরিষ্কার করে দেবে। ভালো রোজগার করে ওরা। শুধু বরফ কেন লনে-লনে ঘাস ছাঁটবার কন্ট্রাক্ট নেয় ওরা।'

কুইন্স থেকে ম্যানহাটন পৌঁছোতে সময় লাগে মিনিট পঁয়তাল্লিশ। কিন্তু মাঝখানে শহরে ঢোকার জন্যে আমাদের পয়সা দিতে হল। লম্বা লাইন পড়ল গাড়ির। আমেরিকান সাহেব মাঝখানের টিকিট ঘর থেকে হাত বাড়িয়ে পয়সা নিয়ে টিকিট দিচ্ছিলেন। হিমাচল প্রদেশের অনেক শহরে এই আইন চালু আছে। তখন ভাবতাম দার্জিলিং-এও চালু করা উচিত। এখন মনে হল যারা কলকাতায় রোজগার করতে আসেন, শহরে ঢোকার মূল্য তাঁদের দিতে আপত্তি থাকবে কেন?

এই সময় চোখের সামনে মুক্তো ঝলমল বললে কম হবে, হীরের ঠিকরানো আলোয় জ্বলে ওঠা স্বপ্নের মতো আকাশের একটি অংশ চোখের সামনে ভেসে উঠল। গাড়ি না থামিয়ে মনোজ বলল, 'সামনেই নদী। নদীর ওপরের ব্রিজটার নাম ব্রুকলিন। ব্রুকলিন ব্রিজ থেকে ওই দিকে তাকাবেন। ও এর মধ্যেই দেখতে পেয়েছেন? নিউইয়র্কের স্কাই লাইন। চমৎকার না?'

মাথা নাড়লাম। সত্যি চমৎকার। বলল, 'কী কী দেখবেন একটা লিস্ট করে ফেলুন।'

'কিছু না। শুধু মানুষ দেখব।'

হঠাৎ বেশ উত্তেজনা নিয়ে মনোজ বলে উঠল, 'দারুণ! আমার সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব জমবে মশাই। লোকে আসে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখতে, জাতি সঙেঘর বাড়ি, একগাদা স্থবির জিনিসপত্র ঘুরে-ঘুরে দেখতে। আরে মশাই, এসব দেখতে যাদের ভালো লাগে তারা জীবনের অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত। সাধারণ মানুষের মধ্যে অসাধারণ কিছু আবিষ্কার করে নেওয়ার আনন্দ সারা জীবন মনের ভেতর শেকড় গেড়ে থাকে।'

খানিকটা তরল গলায় বললাম, 'মনোজ, আপনি এবার সিরিয়াসলি গল্প লিখুন।'

'ফিল্ম করব না বলছেন?'

'করবেন। নিজের কাগজে শুধু না লিখে বড় কাগজগুলোয় লিখুন।'

সে কোনও উত্তর দিল না। ততক্ষণে আমরা আমেরিকার সবচেয়ে বিখ্যাত শহরের হৃদয়ে ঢুকে পড়েছি। দোকানপাট বন্ধ হয়েছে অনেকক্ষণ। রেস্টুরেন্ট বারগুলো অবশ্য খোলা। মনোজ প্রায় রিলে করে যাওয়ার মতো জায়গাটিকে চিনিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তায় ভিড় আছে। সত্যি বলতে কী এই প্রথম আমি ফুটপাতের লোকজন দেখলাম। রাস্তার ধারে গাড়ি পার্ক করে পার্কিং মিটারে পয়সা ফেলে মনোজ বলল, 'চলুন একটু চক্কর মেরে আসি।'

ঠান্ডা সত্ত্বেও হাঁটতে ভালো লাগল। এই রাস্তার ওপাশেই ব্রডওয়ে পাড়া। আরও কিছুটা গেলেই টাইমস্কোয়ার। নামগুলো আমার কাছে কোনও আলাদা মানে তৈরি করছিল না। দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমরা রাস্তায় হাঁটছিলাম। নম্বর দিয়ে রাস্তার পরিচিতি। একসময়ে মনে হল সব পথই একরকম। মনোজকে হারিয়ে ফেললে আমার পক্ষে বাড়ি ফেরা অসম্ভব হবে। ট্যাক্সিকে ঠিকানা দিলে গোটা পঁচিশেক ডলার পড়বে। এখানে পারতপক্ষে কেউ ট্যাক্সিতে চাপে না, বাড়িতে চাকর রাখার কথা ভাবতে পারে না। এবং ড্রাইভার রাখার চিন্তা করতেই সাহস পায় না। বাঁ-দিকে একটি বার দেখিয়ে মনোজ বলল, 'প্রতি শুক্র এবং শনিবার এটা ভরতি থাকে। নিউইয়র্কে অনেকগুলো সিঙ্গলস ক্লাব আছে।'

'কী হয় এখানে?' নিওন আলোয় সাজানো বারটির গায়ে কোথাও সিঙ্গল শব্দটি লেখা নাই। মনোজ বলল, 'যেসব নারী পুরুষ বিয়ে থা করেনি অথবা স্টেডি প্রেম করছে না সপ্তাহের শেষে ছুটিতে খুব একলা হয়ে যায় তারা। ওরাই এখানে আসে। পান করতে-করতে যদি কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় তো উইক এন্ডটার একটা হিল্লে হল। না হলে মুখ শুকিয়ে চলে যাও। বেশিরভাগ বন্ধুত্ব ওই দুটো দিনের জন্যই। তারপরের পাঁচদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির সময় কেউ কাউকে চেনেই না। খবরের কাগজ বলছে সিঙ্গলস ক্লাবে বন্ধুত্ব হওয়ার পর শতকরা মাত্র বিশ ভাগ নারী পুরুষ ক্রমশ আরও

ঘনিষ্ঠ হয়ে বিবাহিত জীবনযাপন করছে। মনোজের জ্যাকেট আমার অঙ্গে চাপানো না থাকলে ভেতরে ঢুকতে পারতাম না। দ্বারী এ বিষয়ে খুব সচেতন। ভেতরের পরিবেশ যে-কোনও বারের মতোই। তবে বসার জায়গা কম। সবাই পান করছে দাঁড়িয়ে গল্প করতে-করতে। সুবেশ পুরুষ এবং নারীরা এখানে প্রবেশের আগে পর্যন্ত খুব একটা পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু কথা বলার ভঙ্গিতে কোনও আড়ষ্টতা নেই। এইসব নারী-পুরুষেরা চাকরিজীবী। তবে কোনও বিবাহিত মানুষ খবরটা গোপন রেখে এসেছেন কি না বলা যাবে না। পুরুষের বয়স যেমন পঞ্চাশের ওপরেও রয়েছে নারীরাও তাই। তিরিশের নীচে কাউকে দেখলাম না। মনোজ মদ খাবে না কারণ এখানে গাড়ি চালাবার সময় পেটে অ্যালকোহল রাখা বেআইনি। দুটো অরেঞ্জ জুসের অর্ডার দিয়ে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে চারপাশে নজর বোলাচ্ছি। এই মুহূর্তে কোনও মহিলাকে একা দেখা যাচ্ছে না, একমাত্র আমাদের ডান পাশে দাঁড়ানো মহিলাটি ছাড়া। আমি চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, যদিও তার কোনও দরকার ছিল না, 'ইনি এখনও সঙ্গী পাননি না?'

মনোজ আড়চোখে দেখে নিয়ে বলল, 'মুখ দেখতে পাচ্ছি না। হয়তো পিসিমা টাইপের হবে।'

'মনোজ আপনি গল্প লিখুন।'

'দূর! আপনি পিসিমার সঙ্গে আলাপ করবেন?'

'ইন্টারেস্টেড নই। আচ্ছা মনোজ এদের মধ্যে কোনও মেয়ে প্রফেশনাল নয়?'

'মাথা খারাপ? ধরা পড়লে পুলিশের হাতে পড়তে হবে। ধরে নিন দুটি একলা নারী পুরুষ এখানে এসে সাময়িক বন্ধুত্বে আবদ্ধ হতে পারে। হয়তো এই পিসিমাকে কেউ অ্যাপ্রোচ করেনি অথবা পিসিমারই কাউকে পছন্দ হয়নি। চলুন, বেশি সময় নেই।'

'বাড়ি ফিরে যাবেন?'

'না-না। পার্কিং মিটারে যে পয়সা দিয়ে এসেছিলাম তার মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। এর পরে পুলিশ ফাইনের লকেট ঝুলিয়ে দেবে।'

মনোজের কথা শেষ হতেই আমার সিগারেটের প্যাকেটটার কথা মনে পড়ল। তড়িঘড়ি গেলাসটা রেখে ঘুরে দাঁড়াতেই আমার হাত লেগে কাউন্টারের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখা পিসিমার ব্যাগটা নীচে পড়ে গেল। অপ্রস্তুত হয়ে সেটাকে তুলতে-তুলতে ক্ষমা চাইলাম। 'মাপ করবেন। দেখতে পাইনি।'

গ্লাস নামিয়ে সেই বিদেশিনী মুখ ফিরিয়ে মৃদু হাসলেন। তারপর স্পষ্ট বাংলা বললেন, 'তাই বলে আপনাকে ভাইপো বলে ভাবতে পারছি না।'

॥ ৫ ॥

আমি জানি না ভগবানকে সামনে দেখে মানুষ কতটা চমকে উঠবে। মনোজের কথা বলতে পারব না, একজন আধাসুন্দরী মহিলা তাঁর পাতলা ঠোঁটে অসম্ভব বিদ্রূপের ছবি ফুটিয়ে যখন দ্বিতীয়বার বাংলায় বললেন, 'আচ্ছা বলুন তো সুন্দরী মিশুকে মেয়েরা কি পিসিমা হয় না?'

কোনওরকমে বলতে পারলাম, 'আমি দুঃখিত।'

'দুর মশাই। দুঃখ করার কী আছে? দুঃখ অত সস্তা? না না, আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন। পিসিমা-পিসিমা মুখ মানে খুব গম্ভীর, বেরসিক এবং আর কী, বলুন না? কিন্তু এটা কেন হবে? ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং। সুন্দরী মেয়েদের ভাইপো ভাইঝি থাকতে নেই?'

'বিশ্বাস করুন, না ভেবে কথাটা বলেছি। আসলে আপনাকে বাঙাল বলে ভাবতে পারিনি।'

আমার অবস্থা তখন পালাতে পারলে বাঁচি। আড় চোখে দেখেছি মনোজ তখন দাম মিটিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমার হয়ে গেলেই সে হাঁটতে শুরু করবে।

'আমার বুকের ভেতরটা একদম বাঙালি। যাকে বলে কাঠ বাঙালি আমি হলাম তাই। আজ রাত্রে একটা কবিতা অনুবাদ করতে-করতে খুব খারাপ লাগতে শুরু করল। আমার আবার ওই একটা রোগ। খারাপ লাগা শুরু হয়ে গেলে মাথায় পোকা কাটে। দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এই সিঙ্গল ক্লাবটায় ঢুকে পড়ে সময় কাটাচ্ছি। এই সময় আপনি পিসিমা বললেন। আমার কপালটা দেখুন। চেরাপুঞ্জি থেকে একখানা মেঘ গোবি সাহারার বুকে আসা দূরে থাক পদ্মার বুকে চর তুলে দিলেন। তা কী করা হয়?' মহিলা কথা বলছেন আর মাথার চুল সরাচ্ছেন। সেগুলো এত অবাধ্য যে বারংবার কপালে এসে পড়ছে। বাঙালি মেয়েদের তুলনায় যথেষ্ট লম্বা, প্যান্ট এবং ওভারকোট এঁকে মানিয়েছে চমৎকার। মুখ ফিরিয়ে কথা বলা শুরু করার পর আর একদম পিসিমা বলে মনে হচ্ছে না। বললাম, কলকাতায় থাকি। আজই নিউইয়র্কে এসেছি। ইনি মনোজ ভৌমিক। এঁর কাছে!'

'মনোজ ভৌমিক? নামটা, আরে মশাই, আপনি সেই লোক?'

'সেই লোক মানে?' মনোজ হতভম্ব।

'নিউইয়র্কে বসে বাংলা কাগজ বের করেন অথচ আমার কবিতা ছাপেন না? আপনার আন্তরিক পত্রিকা আমি দেখেছি। কবিতাগুলো খুব সাব স্ট্যান্ডার্ড। গল্প ভালো হয় না। প্রবন্ধ ভালো। আর ওই ধারাবাহিক উপন্যাসটা বিউটিফুল।'

'আপনার নাম?'

'ফরিদা। এখানকার একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়াই। খুব ভালো হল। কোথায় যাবেন এখন?'

'এই রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরব।'

'কাল ঘুরবেন। চলেন, আমার বাড়িতে বসে এক পাত্র রাম খেয়ে যান। খাঁটি জ্যামাইকান রাম আছে। আমার এক প্রেমিক এনে দিয়েছিল। বেশি দূর না, হাঁটতে-হাঁটতে চলে যাব।' ফরিদা আমাদের আর কথা বলার সুযোগ দিলেন না। মনোজ আমার দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল। মহিলাকে আমার ভালো লাগল। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করা কোনও মহিলা এইভাবে কথা বলবেন ভাবতে পারা যাচ্ছে না। বাইরে বেরিয়ে মনোজ বলল, 'ফরিদা, একটু দাঁড়াতে হবে। আমার গাড়িটাকে নিয়ে আসি। সময় ফুরিয়ে গেলে পুলিশ লকেট ধরিয়ে দেবে।'

ফরিদা বললেন, 'তাহলে চলেন, আপনাদের গাড়িতেই যাই। আমি ফকির মানুষ আমার গাড়ি নেই। থাকা খাওয়ার পয়সা দিতেই মাহিনা চলে যায়।'

রাত একটায় কোনও তৎক্ষণাৎ পরিচিতা মহিলার ফ্ল্যাটে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার এর আগে ছিল না। দুটো দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে ফরিদা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, 'বাইরের দরজায় দেখবেন প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটের নম্বর আছে। সেটা টিপলে এই দরজা খুলবে। এখানে ঢুকে ওই রিসিভার তুলে নিজের পরিচয় দেবেন। আমি বোতাম টিপে দরজা খুলে দেব, মনোজ এসব জানে। আপনি নতুন তাই বলছি।' লিফটে উঠে বললেন, 'আমাদের ঢাকার বাড়িতে কেউ এলে এমন কড়া নাড়ত যে পাড়ার লোকের ঘুম ভেঙে যেত।'

ফরিদার ফ্ল্যাট দু-ঘরের। বসার ঘরের সঙ্গেই পার্টিশান দিয়ে রান্নার ব্যবস্থা। সোফায় বসে যে জিনিস দেখে মুগ্ধ হলাম তা হল বই। ইংরেজিই বেশি। কিছু আরবিও আছে। জিজ্ঞাসা করতে বললেন, 'বাঙালি ঘরের কালো মেয়েকে যেমন রান্না সেলাই ঘরের কাজ থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখতে হয় বর পাওয়ার জন্যে তেমনি টাকা রোজগারের ধান্দায় আমাকে চার-চারটে ভাষা শিখতে হয়েছে মশাই। দাঁড়ান আপনাদের রাম এনে দিই।'

মহিলা অবশ্য ঘরে ঢোকার পর একদম বসেছিলেন না। সন্ধেয় খেয়ে যাওয়া পাত্র তুলে নিয়ে গেলেন। যেতে-যেতে বললেন, 'একা থাকলে কোনও কাজ ঠিক সময়ে করতে ইচ্ছে করে

না। অথচ নিজের চোখে ঠেকে না। আর যেই আপনারা এলেন তখনই ঘরটার চেহারা দেখে লজ্জা লাগছে।'

দু'জনে একা হাওয়ামাত্র মনোজ চাপা গলায় জিগ্যেস করল, 'কেসটা কী মনে হচ্ছে?'

'বুঝতে পারছি না। আর একটু দেখা যাক।'

'বেশিক্ষণ বসব না। মিনিট কুড়ির মধ্যে উঠে পড়বেন।' মনোজ উঠে বই-এর আলমারির কাছে গেল। আমারও মনে হচ্ছিল নতুন শহরে বেড়াতে এসে বসে সময় কাটানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তা ছাড়া ফরিদার বৃত্তান্ত কিছুই জানা নেই। ম্যানহাটন মানে কলকাতার চৌরঙ্গি। সেখানে এমন ফ্ল্যাট নিয়ে যে থাকে সে নিজেকে ফকির বলবে কেন? এই সময় মনোজ চাপা গলায় উত্তেজনা ফুটিয়ে আমায় ডাকল, 'এই সমরেশ, জলদি!'

সোফা ছেড়ে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আলমারির দুটো তাকে বাংলা বই। শামসুর রহমানের কবিতার বই বেশি। সুভাষ মুখার্জি এবং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও আছে। এই বিদেশে ওঁদের দেখে কেমন যেন আত্মীয় বলে মনে হচ্ছিল। সমরেশ বসুর বিবর, গঙ্গা, সুনীল গাঙ্গুলির আত্মপ্রকাশ, শীর্ষেন্দুর পারাপারের পাশে কী আশ্চর্য, আমার উত্তরাধিকার? বুকের মধ্যে ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। আমি কি সত্যি দেখছি। মনোজ আমার বইটাকে এখানে দেখে অমন উত্তেজিত হয়েছিল। হিসেবটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। নিজেকে সাহিত্যিক বলতে আমার আপত্তি খুব, লিখি এই পর্যন্ত। যার লেখক হওয়ার কোনও কথা ছিল না সে লিখে সংসার চালাচ্ছে, এটাও মেনে নিতে পারি কিন্তু তার বই এতো হাজার মাইল দূরে ম্যানহাটনের একটা ফ্ল্যাটে শোভা পাবে ভাবতেই গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে উঠল। উত্তরাধিকার দেশ পত্রিকায় যখন ধারাবাহিক বেরুচ্ছে তখন একদিন আশাপূর্ণা দেবী আমায় বলেছিলেন, 'অ্যাদ্দিনে তুমি সংসারী হলে।' 'কালবেলা' অ্যাকাডেমি পাওয়ার পর প্রিয়জনেরা আপশোস করেছিল, ওটা উত্তরাধিকারের পাওয়া উচিত ছিল। এসব মনে নিইনি তখন। হঠাৎ সেই মানুষটার জন্য বুক নিংড়ে বাতাস বেরিয়ে এল। যাঁকে নিয়ে উত্তরাধিকারের শুরু, অনিমেষের সারা জীবনের মূল্যবোধ যাঁর হাতে গড়া, কলকাতায় পড়তে আসার সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি স্টেশনে দাঁড়িয়ে যিনি বলেছিলেন 'মানুষ হও', তাঁর কাছে আর একবার কৃতজ্ঞ হলাম আমি।

'না না, ওখানে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম জীবনানন্দ নেই। তাঁরা আছেন আমার শোওয়ার ঘরে। এখানে তো বাংলা বই বেশি পাই না। চেয়ে চিন্তে নিই। আর শামসুর যখন আসে ওর বই দিয়ে যায়। আসেন, রাম খান। সঙ্গে এই বড়াগুলান। কীসের বড়া খেয়ে বলতে হবে।'

ট্রে নামিয়ে রাখলেন ফরিদা। আমরা ফিরে এলাম সোফায়। নতুন কিছু রান্না করে রহস্য উদ্ধারের দায়িত্ব পুরুষের কাঁধে চাপিয়ে মেয়েরা চিরকাল খুব মজা পায়। মনোজ বড়া রহস্যের সমাধান করায় ফরিদা খুব দুঃখিত হলেন, 'তাহলে খুব খারাপ হয়েছে। আমার মা যখন বানিয়েছিলেন আমি ধরতেই পারিনি।'

মনোজ বলল, 'ফরিদা, আপনার কথা বলুন।'

ফরিদা হাসলেন, 'আমার আবার কথা কী। ছাত্তর পড়াই, একা থাকি। মাঝে মাঝে প্রেমিক জুটলে প্রেম করি। সব্বর সঙ্গে শুতে ইচ্ছে করে না। জানেন, আজকাল পুরুষ মানুষের ভাবনার গভীরতা খুব কমে যাচ্ছে। মেয়েদের কথা ছাড়ান দেন। চিরকালই তো আপনারা আমাদের দাবায়ে রেখেছেন। তবু মেয়েরা আজকাল কিছু ভাবে-টাবে।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি বাংলাদেশের মেয়ে।'

'হ্যাঁ, তখন পাকিস্তান। আমার বাবা যেমন মর্ডান তেমনি কনজারভেটিভ। আপনি ইন্ডিয়ান সিগারেট খাচ্ছেন? আমার ভাল্লাগে না।' বলে ফরিদা একটা আমেরিকান সিগারেট ধরালেন, 'আমাদের বাড়ির উঠোনে একটা ডুমুর গাছ ছিল। ঢাকার বাড়িতে। ডুমুর গাছের ছায়ায় কখনও বসেছেন?

এক নাপিতের বউ আসত নখ কাটতে। সে আবার হাত দেখতে জানত। ডুমুর গাছের ছায়ায় বসে আমার হাত দেখে বলেছিল আমি গোরা বর পাব। তাই শুনে সবাই কী হেসেছিল। কথাটা কিন্তু সত্যি হয়েছিল।'

'আপনার স্বামী ব্রিটিশ?'

'না। আমেরিকান। সেকেন্ড হাজব্যান্ড। প্রথমজন বাবার পছন্দ করা। একজন পাঁড় মুসলমান। চার বছর ঘর করেছিলাম। পড়তে দেয় না, কলেজে যেতে দেয় না, শুধু বলে বাচ্চা চাই। তা আল্লা বললেন ফরিদাকে বাচ্চা দেব না। ব্যস, তালাক। ততদিনে আমার বোনের বিয়ে হয়েছে লন্ডনে। বিএ পাস করে চলে এলাম ওর কাছে। এমএ করলাম। করতে-করতে এক অমেরিকান ছোকরার প্রেমে পড়ে গেলাম। ওকে বিয়ে করে এখানে সিটিজেনশিপ পেয়ে গেলাম। যাই বলেন, ভেতরে-ভেতরে তো ভেতো বাঙালি। বর এর ওর সঙ্গে শোবে সহ্য হয়নি। অতএব ডিভোর্স। তদ্দিনে ইউনিভার্সিটির চাকরিটা জুটিয়ে নিলাম। লেটেস্ট খবর হচ্ছে এক ইংরেজ ডিউক খুব প্রেম করছে আমার সঙ্গে। বিয়ে করে ইংল্যান্ডে নিয়ে যেতে চায়। আমি বলেছি আর না, খুব হয়েছে। বিয়ে ফিয়ে আমার পোষাবে না। আবার ভাবি, বুড়ো বয়সে দেখবে কে? নাপতানির ভবিষ্যৎ বাণী সত্যি করে ফেলি।'

রামের গ্লাসে চুমুক দিলেন ফরিদা। অবাক হয়ে শুনছিলাম।

মনোজ বলল, 'আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভালোই হল।'

ফরিদা হাসলেন, 'তাহলে আমার কবিতা শুনতে হবে। ভালো লাগলে আপনার কাগজে ছাপবেন।' ফরিদা উঠলেন, সম্ভবত কবিতার খাতা আনতে। আর যাই হোক এত রাত্রে কবিতা শোনার কোনও বাসনা আমার ছিল না। মনোজ সেটা বুঝল। বলল, 'আজ থাক ফরিদা। সমরেশকে নিয়ে আরও কয়েকটা জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছে আছে।'

'সমরেশ?' ফরিদা আমার দিকে তাকালেন, 'আপনার নামটাই এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করিনি।'

হাসলাম। ফরিদা আমাদের এগিয়ে দিতে আসছিলেন, 'মনে হচ্ছে হঠাৎ করে আপনারা চলে যাচ্ছেন এখন আমি একা থাকব, একদম একা।'

শেষের দিকটায় গলার স্বর এমনভাবে কেঁপে গেল অবাক হয়ে তাকালাম। মনোজের টেলিফোন নম্বর জেনে নিলেন ফরিদা। আবার একদিন আসতে হবে বলে কথা আদায় করলেন। তারপর প্রায় লিফটের মুখে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সমরেশ, আপনার উপাধিটা কী?'

মনোজ জবাব দিল, 'উত্তরাধিকার বইটা আপনি কোত্থেকে পেলেন?'

যেন ভূত দেখার মতো তাকালেন ফরিদা, 'আরে। কী মূর্খ আমি? আপনি সমরেশে মজুমদার?' কথা বলার কিছু ছিল না। হাসলাম।

ফরিদা তখন আমার হাত জড়িয়ে ধরেছেন, 'আপনার আর কোনও লেখা পড়িনি। গতবার ঢাকা থেকে ওই বইটা নিয়েছিলাম। প্লেনে আসার সময় অনির মায়ের মৃত্যুর ঘটনায় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলাম। ওই একটা বই, আপনি আমার খুব প্রিয়জন।'

'ধন্যবাদ ফরিদা।'

'ধন্যবাদ না। আপনার আঙুলগুলো দেখি।' প্রায় জোর করে আঙুলগুলো সামনে ধরে ঠোঁট ছোঁয়ালেন ফরিদা, 'এই হাতে জীবন ফুটুক। আল্লা যা পারে না তাই এই আঙুল পারুক। মনোজ বলল, 'সমরেশ। আপনি ভাগ্যবান। আমি জানি না এত বড় কথা আর কোনও লেখক এর আগে শুনেছেন কি না।'

আপনি যা নন তার জন্যে যদি প্রশংসা শোনেন তাতে যা অস্বস্তি, আপনি যা কখনও হতে পারবেন না তা যদি কেউ আপনার কাছে আকাঙ্ক্ষা করে তার যন্ত্রণা অনেক বেশি। কিন্তু এর মধ্যেই ফরিদা এক কাণ্ড করলেন। মনোজকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় যাবেন আপনারা?'

'নিউইয়র্কের রাস্তায় ঘুরব। ওকে হুকার দেখাব।'

'হুকার? হুকার কেন?'

'সমরেশ একটা চিত্রনাট্য লিখছে। তাতে হুকারও আছে।'

'তাই? আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন ফরিদা। এক মিনিট দাঁড়াতে বলে নিজের ফ্ল্যাটে চলে গেলেন ছুটে। মনোজ বলল, 'সত্যি লেখক হওয়ার কী সুখ।'

ফরিদা এল তৈরি হয়ে, 'আমি আপনাদের সঙ্গে ঘুরব। যাওয়ার পথে নামিয়ে দেবেন।'

মনোজ বিব্রত হল, 'শুনলেন আমাদের বদ মতলব আছে।'

ফরিদা বললেন, 'আরে মশাই, আমি প্রবলেম ক্রিয়েট করব না।'

নিউইয়র্কে এখন প্রায় আড়াইটে। রাত হিসেবে মাঝ রাত পার হওয়ার সময়। অতটা পথ উড়ে এসেও আমার ঘুম পাচ্ছে না কেন? পার্কিং লট থেকে গাড়ি বের করে আমরা চললাম রাতের নির্জন পথ বেয়ে। মনোজের পাশে ফরিদা, আমি পেছনে। এক-একটা রাস্তার এক-একরকম চরিত্র। রাস্তার নাম নেই, সংখ্যায় পরিচয়। মনোজ বলল, হুকারদের পেতে আমাদের আরও একটু এগোতে হবে।' ফরিদা জানালেন, তিনি চৌত্রিশ নম্বর রাস্তায় হুকার দেখেছেন। এই নিয়ে তর্ক চলছিল। দেখলে কে বলবে আজ সন্ধেবেলাতেও আমরা পরিচিত ছিলাম না। হঠাৎ ফরিদা মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সমরেশ, হুকার মানে জানো?'

'মনোজের গল্পে পড়েছি।'

'একই ব্যাপার। পৃথিবীর সব দেশে আছে। আপনাদের কলকাতায় স্ট্রিট গার্ল নেই?

'আছে। তারা সন্ধের পর চৌরঙ্গি, পার্ক স্ট্রিটে ঘুরে বেড়ায়। খুব গরিব।'

'গরিব এরাও। তবে দাপট খুব। সেটাই পার্থক্য।'

এখন দোকানপাট বন্ধ। গাড়ি সংখ্যায় কম। বার রেস্টুরেন্টের আলো জ্বলছে। ফুটপাতে মাঝে-মাঝে নারী পুরুষ দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ মনোজ ঘোষণা করল, 'সমরেশ, এবার চোখ খোলা রাখুন।'

গাড়ির গতি কমিয়ে দিয়েছে মনোজ। একটা বাড়ির গায়ে ফুটপাতের ওপর গোটা পাঁচেক মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। ওদের কারও হাঁটু অবধি জুতো এবং স্কার্ট, কেউ লাল জিনস্ সাদা শার্ট পরে গল্প করছে, সিগারেট খাচ্ছে। আমাদের গাড়িটাকে দেখে কৌতূহলী হয়ে তাকাল সবাই। তারপর একটি সাদা মেয়ে ফুটপাতের ধারে এসে চিৎকার করে বলল, 'দয়া করে গাড়ির ইঞ্জিনটা বন্ধ করে মুখখানা দেখান।'

মনোজ গাড়িটা থামাতেই মেয়েটা ছুটে এল রাস্তায়। ফরিদাকে দেখে খুব বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করল, 'ও মাই গড। তোমার সঙ্গে তো পার্টনার আছে, আবার আমাকে ডাকছ কেন?'

'আমি তো ডাকিনি।' মনোজ উত্তর দিল।

'তাই নাকি। এত রাত্রে এই রাস্তায় স্লো স্পিডে গাড়ি চালায় কারা তা জানো না? ঠিক আছে তুমি তো একলা আছ, যাবে আমার সঙ্গে?'

শেষ প্রশ্নটি আমার দিকে। এই মাঝরাতের বিবর্ণ আলোয় মেয়েটিকে খুব নীরক্ত মনে হচ্ছিল। হঠাৎ ওপাশ থেকে কেউ সিটি দিয়ে উঠতেই মেয়েটি দুদ্দাড় করে দৌড়ে পাশের এক গলির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। দেখলাম ফুটপাতে যারা জটলা করছিল তারাও নেই। হঠাৎ চারপাশ কেমন থমথমে হয়ে গেল। মনোজ আর দেরি না করে গাড়ি চালাল। ব্যাপারটিতে নতুনত্ব তো কিছু নেই। রাত ন'টা দশটায় মিউজিয়ামের পাশে সদর স্ট্রিটের মোড়ে যে মেয়েদের দেখা যায় তারা খুব গরিব। পুলিশের গাড়ি দেখলে দৌড়ে পালায়। একই জীবিকার এই রমণীরা দুরকম নামে অভিহিত হবেন কেন? স্বৈরিণীর ইংরেজি তো হুকার নয়। যদি স্ট্রিট গার্লরাই হুকার হয় তাহলে এই ধারা আমাদের দেশে আমদানি হয়েছে ব্রিটিশরা আসার পর থেকেই। ফলে এর উপযুক্ত প্রতিশব্দ তৈরি হয়নি।

তবে আমাদের দেশে যারা রাস্তায় ঘুরে খদ্দের ধরে তারা কখনই আক্রমণাত্মক নয়। খদ্দের না চাইলে আগ বাড়িয়ে কথা বলে না। এই মেয়েটার দেখলাম সেসব জড়তা নেই। ফরিদাকে ওঁর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার সময় এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। যে দেশে যৌনতা নিয়ে কোনও কড়াকড়ি নেই সে দেশে বেশ্যাবৃত্তিকে কারা উৎসাহ দেয়?

ফরিদা বললেন, 'চোখ কান খোলা রেখে এদেশে ঘুরুন উত্তরটা পেয়ে যাবেন। এই যাদের আপনি দেখলেন তাদের দিনের বেলায় কোথাও খুঁজে পাবেন না। বেশ্যাবৃত্তির যে কয়েকটা স্তর এদেশে আছে এরা তার সবচেয়ে নীচুতলার। এভাবে গাড়ি দাঁড় করিয়ে এদের সঙ্গে কথা না বলাই ভালো। আমি সঙ্গে ছিলাম বলে আপনারা অল্পে ছাড়া পেলেন।'

মনোজ হাসল, 'সিটিটা শোনেননি? পুলিশের আসার আগাম খবর পেয়ে গিয়েছিল ওরা।'

ফরিদাকে ওর বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিলাম। বললেন, 'যে ক'দিন আছেন, মাঝে-মাঝে চলে আসবেন। মনোজ, আপনাকেও বলছি। আজ তো কবিতা শোনানোই হল না। কথা দিন আসবেন।'

আমরা কথা দিলাম। যতক্ষণ ভদ্রমহিলা চোখের আড়ালে চলে না গেলেন ততক্ষণ মনোজ ইঞ্জিন বন্ধ রেখেছিল। তারপর বলল, 'পুরো ব্যাপারটা বিশ্বাসের বাইরে না?'

আমি তখন ফরিদার জায়গায় এসে বসেছি বুকে বেল্ট এঁটে, 'আমার জানা শোনা কোনও মেয়ে এভাবে কথা বলতে পারত না। এভাবে মেশাটা অসম্ভব ছিল।' গাড়ি চালু করে মনোজ বলল, 'এখানে আপনার ওকে পছন্দ হচ্ছে, কিন্তু সমরেশ, কলকাতায় যদি ফরিদা আপনার সঙ্গে ঘোরে তাহলে আপনি প্রচণ্ড অস্বস্তিতে পড়বেন।'

মনোজের ছবিতে থাকবে নায়ক শৈবালকে একটি হুকার মেয়ে নাজেহাল করছে রাস্তায়। শৈবাল মানসিক বিপর্যস্ত হয়ে হুকারটির শিকার হয়ে পড়েছিল। চিত্রনাট্যে দৃশ্যটিকে রাখতে এখন আমার কোনও অসুবিধা হবে না। ব্যাপারটা বলতেই মনোজ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোনও বারবণিতার কাছে রাত কাটিয়েছেন?'

আচমকা এমন প্রশ্নে উত্তর দিলাম, 'তাহলে তো যে-কোনও লেখা লিখতে গেলে কল্পনাশক্তিকে বাতিল করতে হয়। বিভূতিভূষণ চাঁদের পাহাড় লিখতে পারতেন না।'

'বুঝলাম, কিন্তু ট্রেডের এমন কিছু শব্দ আছে যার ব্যবহারে সেটির পরিচয় প্রকাশ পায়। যেমন সোনাগাছিতে কেউ গেলে একজন বারবনিতা যদি জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি কি আজ রাত্রে আমার সঙ্গে থাকবেন', তাহলে মনে হবে কোনও ভুল নেই। প্রশ্নটি কিন্তু সোনাগাছির চরিত্র প্রকাশ করল না। মেয়েটির মুখের সংলাপ হওয়া উচিত, 'আমার ঘরে বসবেন?' 'বসবেন' শব্দটার মধ্যে ওরা সব কিছু বুঝিয়ে দেয়। না, না, যা ভাবছেন তা নয়। আমার কোনও হ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স নেই, বই পড়ে জানা। অতএব নিউইয়র্কের হুকারদের সঙ্গে চৌরঙ্গির মেয়েকে মেশাবেন না।' মনোজ সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা বাড়ছিল। গল্প উপন্যাস লিখতে গিয়ে অনেককেই দেখেছি চরিত্রগুলো জীবন এবং পরিবেশানুযায়ী লেখেন না। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী যে ভাষায় কথা বলে মাছওয়ালিও সেই ভাষা বলে। মনোজের সঙ্গে এইসব কথা বলতে-বলতে ফিরছিলাম। মাঝে-মাঝে সোঁসোঁ গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মনোজ বলল, 'চেয়ে দেখুন আর একদল হুকার।'

সামনের রাস্তার মোড়ে জনাসাত-আট কালো মেয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে, কেউ-কেউ গলা তুলে গান গাইছে। গাড়িটাকে দেখামাত্র ওরা একসঙ্গে ফিরে তাকাল। মনোজ গাড়ি দাঁড় করাতেই এবার খুব স্বাস্থ্যবতী সাদা এবং কালো দুটো মেয়ে এগিয়ে এসে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'স্কিন আলাদা কিন্তু শরীর এক, তবু পছন্দ তোমার ওপর।'

মনোজ জিজ্ঞাসা করল, 'দক্ষিণা কত দিতে হবে?'

'নট মাচ। রাত শেষ করে দেখা হচ্ছে তাই সুবিধে করে দিচ্ছি। আমাকে পঞ্চাশ দিও আর

ঘরের জন্যে একশো। ছটার আগেই বেরিয়ে যেতে হবে কিন্তু।

'দেড়শো ডলার? আরেব্বাস। অত আমার পকেটে নেই।'

'ঠিক আছে, মেক ইট ওয়ান ফরটি।' মনোজের দিকে দাঁড়িয়ে কালো মেয়েটি কথা বলছিল। মনোজ বলল, 'ঠিক আছে শুধু ফর্টি। যে একশো ডলার ঘরের জন্যে দেবে সেটা দিতে হবে না। আমার একটি খালি ফ্ল্যাট আছে।'

'সরি হিরো। আমরা নিজেদের জায়গা ছাড়া যাই না।'

'তাহলে পারলাম না।'

হঠাৎ মেয়েটি উগ্রমূর্তি ধরল, 'ইয়ার্কি পেয়েছ? এতক্ষণ কথা বলিয়ে পারব না বলছ? ঠিক আছে, বিশটা ডলার ছাড়ো তারপর এখান থেকে তুমি যেতে পারবে।'

এতক্ষণ আমার পাশে দাঁড়ানো সাদা মেয়েটা কথা বলেনি। এবার বলল, 'হাই টুনা, লিভ দেম টু মি। আই উইল হুক দেম।' কালো মেয়েটা কাঁধ নাচাল, একটা অশ্লীল গালাগালি দিল তারপর শরীর দুলিয়ে ফুটপাতে উঠে গেল। সাদা মেয়েটি এবার আমার জানলার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল, 'ওর কথায় কিছু মনে কোরো না। বড্ড মাথা গরম। গত সপ্তাহে একটা খদ্দের ওকে ডিচ্ করেছে। তারপর থেকেই—. যাক, তোমরা দুজনেই ঘুমাবে?'

উচ্চারণ এত জড়ানো যে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল। মনোজ ওপাশ থেকে জবাব দিল, 'দ্যাখো বাবা, আমরা কেউ ঘুমাতে আসিনি। আমার এই বন্ধু আজই প্রথম এদেশে এল। ও একটা স্ক্রিপ্ট লিখবে। সেই ব্যাপারে কথা বলতে চায়?'

'আচ্ছা! মেয়েটি এক মুহূর্তে ভেবে নিল, 'কত খরচ করবে?'

'বিশ ডলার।'

'তাহলে সময়টা তোমরা ভুল পছন্দ করেছ। এখানে কারও সঙ্গ নিলেই আমাদের কমিশন দিতে হয়। আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে তো কথা বলা যাবে না। ইন ফ্যাক্ট এতক্ষণ কথা বলেছি বলে আমাকে জবাবদিহি দিতে হবে। দশ ডলার ছাড়ো।'

'তোমরা, তুমি কোথায় থাকো?'

'কোথাও না। দশ ডলার ছাড়ো?' মেয়েটি গাড়ির জানলায় সেঁটে কথা বলছিল।

এমন সময় দুটো লোক যেন অন্ধকার ফুঁড়ে নেমে এল রাস্তায়, 'হাই জিনা ইজ দেয়ার এনি প্রব্লেম?' যেন ম্যানড্রেকের কমিকস—এ লোথারকে যে সমস্ত চেন হাতে গুন্ডার সঙ্গে লড়তে হয় এ দুটোকে দেখতে ঠিক তাদের মতো। আমি চাপা গলায় মনোজকে বললাম, 'গাড়ি চালান।'

মনোজ কথাটায় কান দিল না। জিনা বলল, 'ইয়েস, দে ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট অ্যা স্ক্রিপ্ট।'

ততক্ষণে লোক দুটো চলে এসেছে কাছে। একজন মনোজের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পা তুলে চিউইংগাম চিবোচ্ছে। অন্যজন মনোজের জানলার পাশে 'হোয়াটস দ্যাট?'

মনোজ বলল, 'নাইট লাইফ নিউইয়র্ক—এর ওপর একটা ছবি হচ্ছে। আমরা চাই তোমাদের সাহায্য। অফ কোর্স ইউ উইল পে ফর দ্যাট।'

লোকটা মনোজকে দেখল, 'সাউথ আফ্রিকান?'

'না। ভারতীয়।' মনোজ হাসল।

লোকটা মাথা নাড়ল, 'কী ধরনের সাহায্য চাইছ?'

মনোজ চটপট উত্তর দিল, 'এখানে সুটিং করব। তোমরা ম্যানেজ করবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে ভালো অভিনেতা-অভিনেত্রী থাকে তাহলে তাদের আমরা চান্স দেব।'

'কেন?'

'যাতে ব্যাপারটা খুব অথেন্টিক হয়।'

এবার গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, 'বস, আমি অ্যাক্টিং করতে চাই।'

'কত টাকা দেবে?'

'আমরা কথা বলে ঠিক করতে পারি।'

এই সময় জিনা কিছু বলতে গেল। কিন্তু তাকে ধমকে থামিয়ে দিল লোকটা, 'আমাকে এই ব্যাপারটা বুঝতে দাও। যাও, ফুটপাতে গিয়ে দাঁড়াও, লুক ফর অ্যা গুড বিজনেস।'

মেয়েটি রাগত ভঙ্গিতে চলে যেতে লোকটা বলল, 'এসব কথা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলা যায় না। পুলিশ খুব ঝামেলা করছে। তোমরা এক কাজ করো। বাঁ-দিকের মোড়ে রবিন্সের পাব এখনও খোলা আছে। ওখানে গিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করো। মিনিটদশেকের মধ্যে আসছি। লোকটা ইশারা করতেই ওর সঙ্গী গাড়ির সামনে থেকে সরে দাঁড়াল।

মনোজ গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে খানিকটা এগিয়ে যেতেই সেই কালো মেয়েটা চিৎকার করতে-করতে রাস্তায় নেমে এল, 'জন, দে আর লায়ার। ডোন্ট বিলিভ দেম।'

আমরা ততক্ষণে মোড় পেরিয়ে গেছি। রবিন্সের পাব দেখতে পেলাম। মনোজ আবার বাঁ-দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে রাস্তা পালটালো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওরা যদি নম্বর লিখে রাখে।'

'লোকাল মাস্তান। পাড়ার বাইরে যাবে না। শুধু এই এলাকাটা কিছুদিন এড়িয়ে যেতে হবে। কিন্তু সমরেশ, আমরা তখন ধোঁয়া দেখে গিয়েছিলাম, এবার আগুনটাকেও দেখলাম, তাই না? মিউজিয়ামের সামনে দাঁড়ানো বাঙালি স্ট্রিট গার্লের সঙ্গে এদের পার্থক্য হল এরা স্বাধীন নয়। এরা খদ্দেরকে হুক করবে এবং মালদার লোক হলে এদের নিয়োগকর্তারা তাদের ধ্বংস করবে। খদ্দের হুক করে নিয়ে যায় নিয়োগকর্তাদের ডেরায়। সো দে আর হুকার।'

'পুলিশ জানে না?'

'পৃথিবীর সব দেশেই পুলিশের চরিত্র এক।' মনোজ হাসল, 'এরা ঘুষ নেয় না ট্রাক ড্রাইভারের হাতে হাত মিলিয়ে। কিন্তু আরও বড় কিছু করে। তবে বলতে পারেন এদের কর্তব্য সম্পর্কে এরা যতটা সজাগ তা আমাদের পুলিশের রপ্ত করা সম্ভব হবে কি না জানি না।' আমরা ম্যানহাটন পেরিয়ে এসেছি ততক্ষণে। নদীর তলায় সুড়ঙ্গ দিয়ে সোঁসোঁ করে গাড়ি ছুটছে। ঘড়িতে এখন ভোর সাড়ে চারটে।

এই সময় রাস্তা ফাঁকা। চুপচাপ পেরিয়ে এলাম পথটা। মনোজের বাড়ির সামনে পৌঁছে ও স্টার্ট বন্ধ করে দিল গাড়ির। গাড়ি থেকে নেমে মনোজ বলল, 'একটু *ঠেলবেন?*'

গাড়ির কোনও গণ্ডগোল নেই অথচ *ঠেলতে* হবে কেন? দরজা খুলতেই প্রচণ্ড ঠান্ডা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুহূর্তেই নাক বরফ। মনোজ বলল, 'এই ভোরে আর মহিলাটির ঘুম ভাঙাতে চাই না। *ঠেলে* গ্যারেজে ঢুকিয়ে দিই আসুন।'

দুজনে গাড়ি *ঠেলে* গ্যারেজে ঢুকিয়ে লনে পা দিতেই শিশির পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। নিউইয়র্কে ভোর হচ্ছে। এবার বিছানার জন্যে শরীর টিমটিম করছে। নিঃশব্দে দরজা খুলে মনোজ বলল, 'চুপচাপ আপনার ঘরে চলে যান। ঘুমিয়ে পড়ুন।'

'ঘুম পাবে কিনা জানি না তবে এখন শুতে হবে।'

'ও জানলে চেঁচামেচি করবে এখন ফিরেছি বলে, নইলে আপনাকে আজ কফি খাওয়াতাম।'

এই সময় একটা গাড়ি এসে থামল বাইরে। তারপরেই বেলের শব্দ। সমস্ত বাড়ি জানিয়ে দেওয়ার পক্ষের যথেষ্ট। মনোজ খুলল। আপাদমস্তক মোড়া একটা লোক জিজ্ঞাসা করল, সরি, আমি একটু অসময়ে এসে পড়লাম।

'সমরেশ মজুমদার এখানেই আছেন, তাই না?'

মনোজ বলল, 'আপনি?'

লোকটি টুপি খুলল, 'আমার নাম কামাল।'

॥ ৬ ॥

মনোজ চেয়েছিল আমাদের এই রাত কাবার করে ফেরাটা ওর স্ত্রীর অগোচরে থাক। কিন্তু ভোরবেলায় যে শব্দে বেল বাজল তাতে যে কোনও মুহূর্তে ওদের শোওয়ার ঘরের দরজা খুলে যেতে পারে। এবং এখনও আমাদের পরনে যেহেতু বাইরে বেরুবার পোশাক তাই ভদ্রমহিলার কাছে কিছুই গোপন থাকবে না। কলকাতায় আমার এক পরিচিতকে দেখতাম স্ত্রী মনঃক্ষুণ্ণ হবেন ভেবে কোনও কাজই সাহস করে করতেন না। অথচ তাঁর খুব ইচ্ছে হতো একটু সাহসী হওয়ার। কোনও-কোনও মহিলা স্বামীর সঙ্গে খোলামেলা কথা বললে সব কিছু সহজভাবে মেনে নেন। কিন্তু অনেকেই পারেন না। আর এসব ক্ষেত্রেই স্বামীদের কমপ্লেক্স তৈরি হয়, ওরা আরও লুকোছাপায় পড়ে যান। মনোজের অবস্থাটা বোঝার মতো সময় এখনও আসেনি। হয়তো ও চায়নি ওর স্ত্রীর ঘুম অসময়ে ভাঙাতে। কিন্তু ভাঙল। আমি কিছু বলার আগেই পাশের দরজা খুলল।

ততক্ষণে সোফায় বসে পড়েছে মনোজ। বসে বলছে, 'আপনি কি এখন বস্টন থেকে এলেন?'

'ইয়েস। একটা ট্রাক চালিয়ে চলে এলাম। কিছু মালপত্র কেনার ছিল, কিনে চলে যাব।'

হাত বাড়াল কামাল। করমর্দন করে আমি ওকে নিয়ে সোফায় বসলাম। এখন আমি বা মনোজ পেছনের দিকে তাকাচ্ছি না। মনোজ যেন খুব সিরিয়াস, এমন ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল, 'একটু বুঝিয়ে বলুন। আপনার সঙ্গে সমরেশের কথা হল ঘণ্টাসাতেক আগে। আপনি বললেন, 'আসছি। বস্টন থেকে নিউইয়র্কের দূরত্ব যা তাতে আমরা ভাবিনি আপনি আসবেন। আগেই কি এখানে আসার প্ল্যান ছিল?' কামাল মাথা নাড়ল, 'এটা আবার একটা কথা নাকি? সমরেশের ফোন পেয়ে মনে হল চলে যাই। ব্যাবসাও হবে ওর সঙ্গে আলাপটাও। সমরেশ, ক'দিনের প্রোগ্রাম?'

প্রশ্নটা এমন ভঙ্গিতে যেন বহুদিন পরে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে। সুনীল গাঙ্গুলি আমাকে বলেছিলেন কামালের সঙ্গে আলাপ হলে নতুন অভিজ্ঞতা হবে। শুরুতেই কথাটাকে সত্যি বলে মনে হচ্ছে। মোটামুটি আমার কথা বলতেই কামাল উঠে দাঁড়াল, 'যাক, হাতে কিছুদিন সময় পাওয়া গেল। তোমারটা নিয়ে তাহলে পরে ভাবব। আগে চা খাব। এই যে নমস্কার, আপনি মিসেস ভৌমিক? সাত সকালে ঘুম ভাঙালাম আপনার। কিচেনটা কোথায়?' মনোজের স্ত্রী যতই বিরক্ত হয়ে থাকুক এবার অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'মানে?'

'ভৌমিক? ভৌমিক ব্রাহ্মণ নাকি? আমি মুসলমান। কামাল। আপনার রান্না ঘরে ঢুকে চা বানালে আপত্তি আছে? জাত যাবে?' কামাল এগিয়ে গেল।

মনোজের স্ত্রী বলল, 'আপনি চা বানাতে যাবেন কেন?'

মনোজ বলল, 'আপনি বসুন, আমি বানাচ্ছি।'

কামাল ধমকে উঠল, 'আরে, আমার ইচ্ছে হয়েছে আর তোমরা ভদ্রতা করছ।' আমি যেমন বাইরে থেকে এলাম তোমরাও মনে হচ্ছে বাইরে থেকে এলে। জামাকাপড় ছাড়ো, আমি চা বানাচ্ছি। এই তুমি চা খাবে?'

শেষ প্রশ্নটা মনোজের স্ত্রীর উদ্দেশ্যে। বেচারা আর উষ্ণতা ধরে রাখতে পারল না। সম্মতি আদায় করে কামাল রান্নাঘরে ঢুকল। মনোজ কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সে জানিয়ে দিল আমেরিকান বাঙালিদের কিচেনে কোন জিনিসটা কোথায় থাকে তা তার ভালো জানা আছে। মনোজ স্ত্রীর দিকে তাকাতেই মাথা নেড়ে শোওয়ার ঘরে ফিরে গেল। মনোজ আমাকে বলল, 'এক রাতে দুবার শক সহ্য হচ্ছে না। একে ফরিদা তার ওপর কামাল।'

আমি তখন অবাক হয়ে কামালকে দেখছি। মনোজের কিচেন যে-কোনও বঙ্গললনার আকাঙ্ক্ষার বস্তু হবে। কার্পেটের ওপর দাঁড়িয়ে তিন পাশের দেওয়ালে র‍্যাকে সবরকম আধুনিক

রান্নার ব্যবস্থার সুযোগ পাওয়ায় খাটুনি থাকে না বলা যায়। প্রায় আমার বয়সি লোকটা সেখানে তৎপর। অথচ মিনিটপাঁচেক আগেও ওকে চিনতাম না। এ বাড়ির মানুষগুলোকেও আগে দ্যাখেনি ও। কিন্তু এরই মধ্যে শুধু তুমি বলাই নয় চা বানাতে আরম্ভ করা, এটা হজম করতে অসুবিধা হচ্ছে। এই সময় শ্যামল নামল। ও সাতসকালেই কাজে বের হয়। রান্নাঘরে এক অপরিচিত লোক দেখে সে তাজ্জব। কামাল ওকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এই চা চলবে? আর এক কাপ জল দেব?'

শ্যামল মাথা নেড়ে আমাদের দিকে তাকাল। বললাম, 'কামাল ওয়াহিদ, বস্টনে থাকেন। আমার ফোন পেয়ে চলে এসেছেন ট্রাক চালিয়ে।' শ্যামল, যে খুব কম কথা বলে সে না বলে পারল না, 'স্ট্রেঞ্জ!' চা নিয়ে এসে হাতে-হাতে ধরিয়ে দিলে কামাল। তারপর মনোজকে জিজ্ঞাসা করল, 'এই, ওর নাম কী? ওকে ডাকো।'

মনোজের স্ত্রী, বেরিয়ে এল পোশাক পালটে। ওদের বসার ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আমরা চায়ের কাপে ঠোঁট ছোঁয়াচ্ছি। গাড়ি থেকে নামবার আগে শরীর শুতে চাইছিল, এখন সেই ভাবটা কেটে গেছে। মনোজ জানলার পরদা সরিয়ে দেখল নিউইয়র্কে ভোর হচ্ছে। কামাল কথা বলে যাচ্ছিল। মিনিটপনেরোর মধ্যে আমরা জানতে পারলাম সে বস্টনে থাকে। আমেরিকার নাগরিক। একা। বিয়ে করেছিল কিন্তু সেটা টেকেনি। এইখানে মনোজের বউ প্রশ্ন করেছিল, 'আপনি বোধহয় বাড়িতে ঝামেলা করতেন?'

'তা বোধহয়। তবে ও যখন অন্য লোকের প্রেমে পড়ল তখন ওকে মুক্তি দিয়ে দিলাম। সেই সময় ও আমাকে যা বলেছিল সব টেপ করে রেখে দিয়েছি। মাঝে-মাঝে এখনও বাজিয়ে শুনি। বিয়ে ভেঙে নতুন বিয়ে করে ওরা এদেশেই আছে।

ওর আদি বাড়ি ঢাকায়। মিস্টার ওয়াহিদ প্রচুর সম্পত্তি রেখে মারা গেছেন। মাদাম ওয়াহিদকে সে মা বলতে রাজি নয়। বস্তুত, সে পৃথিবীতে কীভাবে জন্মেছে তা তার জানা নেই। কোনও মানুষেরই তা থাকে না। বড় হওয়ার সময় তাকে যা জানিয়ে দেওয়া হয় তাই সে লালন করে। কিন্তু কামাল তাতে রাজি নয়। বোঝা যাচ্ছিল আত্মীয়দের সঙ্গে তিক্ততা থেকে সে এমন ভাবনায় পৌঁছেছে। ধর্ম-টর্ম বিশ্বাস করে না সে। মৌলবীদের ওপর ভীষণ খাপ্পা। মৌলবীরা যে জোব্বা পরেন তা দিয়ে চারটে গরিব শিশুর শীতের পোশাক হয়ে যায়। হিন্দু ব্রাহ্মণদের গোঁড়ামি ওর দু'চক্ষের বিষ। এইসব কথা বলে-টলে কামাল উঠে দাঁড়াল, 'সমরেশ, তুমি ঘুমিয়ে নাও। আমি দুপুরে আসছি। তখন ভাত খাব। চলি।' যেমন এসেছিল তেমন বেরিয়ে গেল সে, প্রায় আচমকা। আমরা কেউ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারিনি। মনোজের বউ শুধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল খানিক পরে, 'ভদ্রলোককে বিশ্বাস করা যায় তো?' উত্তর দিতে তখনই পারিনি।

এ ধরনের জীবনযাত্রায় আমি কখনই অভ্যস্ত ছিলাম না। রাতে খাওয়া সেরে দশটা নাগাদ ঘণ্টাদুয়েকের জন্যে দুজনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে একসময় আবিষ্কার করতাম অন্ধকারের পুঁজি আর হাতে নেই। শিশির পড়ার শব্দ শুনতে-শুনতে যখন বাড়ি ফিরতাম তখন ফরসা হয়ে গেছে আকাশ, শীত যেন হায়েনা। তারপর মনোজের বানানো চা খেয়ে লম্বা ঘুম মাঝদুপুর পর্যন্ত। দুটো নাগাদ ব্রেকফাস্ট খেয়ে আলস্য। আড্ডা। সন্ধের পর স্নান সেরে 'লা-নার' খাওয়া। মনোজের স্ত্রী বলত, 'লাঞ্চ খেতে অনেককেই দেখেছি কিন্তু এ আবার কী। লাঞ্চ এবং ডিনার কেউ একসঙ্গে খায়?' আমার পিসিমা খেতেন। যে মহিলাটি দশে বিবাহিতা হয়ে সাড়ে দশে বিধবা সাইনবোর্ড নিয়ে আশি বছর পর্যন্ত আমার পিতা এবং আমাদের ঝক্কি সয়ে গেলেন তিনি ভাত খেতে বসতেন বিকেল চারটেয়। এর আগে তাঁর কাজ নাকি ফুরোতেই চাইত না। অত অবেলায় খাওয়ার পর রাতের খাওয়া সম্ভব? প্রায়ই বলতেন, 'আলো চাল পেটে গেলে বড্ড ফোলে, বুঝলি। সেই সাড়ে দশ বছর থেকে খাচ্ছি তো।'

আমাদের এই নৈশজীবনে মনোজের স্ত্রীর সম্মতি ছিল না। যে কোনও মহিলাই এতে আপত্তি করবেন। আমরা অবশ্য সেটাকেও উপভোগ করতাম। দুটো নাগাদ কামাল এসে আমার ঘুম ভাঙাল। প্লেন যাত্রার ক্লান্তি এবার সমস্ত শরীরে জেঁকে বসেছে। কামাল একেবারে আমার শোওয়ার ঘরে স্বচ্ছন্দ হয়ে বসে, 'এর বেশি কিছু অ্যাড করে না। ওঠো।'

বাড়িটা এখন খুব নির্জন। মনোজ ও তার সন্তানদের সাড়া পাচ্ছি না। কামাল বলল, 'কাল ফরিদার ওখানে তোমরা আড্ডা মেরেছ?'

চমকে উঠলাম। ফরিদার কথা কামাল জানল কী করে?

কামাল বলল, 'খুব সিম্পল ব্যাপার। সকালে এখান থেকে ম্যানহাটনে গিয়ে মনে হল ফরিদার সঙ্গে দেখা করে যাই। ও তখন ইউনিভারিসিটিতে যাচ্ছে। ওর কাছেই শুনলাম। ও আমার সম্পর্কে শাশুড়ি।'

দুজন বাংলাদেশি মানুষের মধ্যে আত্মীয়তা থাকতেই পারে। কিন্তু এই যোগাযোগ গল্প-উপন্যাসে লিখলে সাজানো বলে মনে হয়। ফরিদা কামালকে বলেছে আমাকে জানাতে যে তার খুব ভালো লেগেছে। আমি যেন তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করি।

বিকেল পর্যন্ত আমরা গল্পগুজব করলাম। আমার প্রোগ্রাম জেনে নিল কামাল। মার্কিন সরকার আমার ইচ্ছেমতো সারা দেশে ঘুরতে দেবেন জেনে বলল, 'কোথায় কোথায় যাচ্ছ প্ল্যান করে আমায় জানিয়ে দিও। আমি সেখানকার বাঙালিদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেব। অ্যাই সমরেশ, আমেরিকায় এসে নিগ্রো মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে না?'

'আপত্তি নেই। বরং বলা যায় ছেলেবেলা থেকে আমাকে কালো মেয়েরা বেশি আকর্ষণ করে।'

'ঠিক আছে, জুলিকে তোমার কথা বলব।'

'কে জুলি?'

'আমার এক বান্ধবী। একসময় বিয়ে করতে চেয়েছিল। এখন এক চার্চম্যানকে বিয়ে করেছে। দারুণ গান গায়। লস এঞ্জেলস-এ থাকে।'

'লস এঞ্জেলস? সে তো অনেক দূর।' অবশ্য টেলিফোনের দৌলতে সব কিছু হাতের মধ্যে।

ইতিমধ্যে আমরা জেনে গেছি কামাল খুব রেস্টলেস। কোনও কারণে মায়ের ওপর রাগ আছে। মেয়েদের বন্ধুত্ব ও পছন্দ করে। সুনীল গাঙ্গুলি নাকি ওকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখছেন। মনোজের ছবির কথা শুনে খুব উৎসাহিত সে। বলল, 'আমি একটা লোককে পাঠিয়ে দেব বস্টন থেকে। ওর নাম ফুয়াদ চৌধুরি। ফিল্ম নিয়ে পড়াশোনা করেছে। ও ইন্টারেস্টেড হবে।' সেই বিকেলেই ট্রাক নিয়ে বস্টনে ফিরে গেল কামাল।

মনোজ গেল সাংসারিক কাজ করতে। কেনাকাটা দরকার। ও ফিরে এলে আমরা বেরুব। একা ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগছিল না। টিভিতে এতগুলো চ্যানেল এবং এত রকমের ছবি দিনরাত দেখায় যে সময় কাটাতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু শরীর জুড়ে আলস্য বেশি বলেই ঘরে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। চাবিটা সঙ্গে নিয়ে বাইরে লনে দাঁড়ালাম। সামনের সারিবদ্ধ গাছের ছায়ামাখা চওড়া রাস্তাটা বড় নির্জন। তিন-চারটে সাদা বাচ্চা সাইকেল চড়া শিখছে। দু-ধারে ছবির মতো কটেজ টাইপের বাড়ি। মনোজের লনে বোধহয় নিয়মিত হাত পড়ে না। কিন্তু পাশের কটেজটার বাগান চমৎকার। এক বৃদ্ধ সেখানে দাঁড়িয়ে পাতা ছাঁটছিলেন। আশির নীচে বয়স নয়। একটু কুঁজো দেখাচ্ছে, একটু বাদে ভেতর থেকে এক বৃদ্ধার গলা ভেসে এল। বৃদ্ধ গাছ কাটতে কাটতেই জবাব দিলেন। জড়ানো কথা। দেখলাম বৃদ্ধা বেরিয়ে এলেন। কাছাকাছি বয়স। ওঁর হাতে কিছু ছিল। বৃদ্ধ সেটি নিয়ে দুহাতে বৃদ্ধাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলেন। অন্তত মিনিটখানেক ওঁরা একত্রিত থাকলেন। এর আগে আমি কখনও ওই বয়সে পৌঁছে যাওয়া মানব-মানবীকে চুম্বনরত অবস্থায় দেখিনি। মনে

হল স্বর্গীয় দৃশ্য দেখছি। নরনারীর যৌবনের সঙ্গে চুম্বনের স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকে কিন্তু ওই যৌনচেতনাহীন চুম্বনের সৌন্দর্য এতকাল অনাবিষ্কৃত ছিল আমার কাছে। বৃদ্ধ মুখ সরিয়ে নিয়ে হাসলেন। বৃদ্ধা তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিতেই বুঝলাম পাইপ খাওয়ার আনন্দে বৃদ্ধ আদরটি করলেন। পাইপ ধরিয়ে ওরা এপাশে আসতেই আমাকে দেখতে পেলেন।

বৃদ্ধ বললেন, 'হেলো জেন্টলম্যান, ইউ আর মিস্টার—?'

'মজুমদার। আমি মনোজের বন্ধু।'

'ও হ্যাঁ', বৃদ্ধা বললেন, 'তুমি কলকাতা থেকে এসেছ। তাই না?'

'আজ্ঞে তাই।'

'কদিন থাকবে এখানে?'

'আপাতত দিনপনেরো। তারপর জানি না।'

'কী করো তুমি?'

'লিখি। গল্প উপন্যাস।'

'আচ্ছা। সেটা খুব ভালো। একজন লেখকের সঙ্গে আলাপ করে ভালো লাগছে।'

'আমার খুব ভালো লাগছে আপনাদের বাগানটা।'

'ধন্যবাদ। তবে আরও ভালো করা যেত। সামনের বছর যদি বেঁচে থাকি—'

'ও জর্জ। স্টপ ইট।' বৃদ্ধর কথা থামিয়ে দিলেন বৃদ্ধা।

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, 'সত্যিকে সত্যি বলে নেবে। তাহলে দুঃখ পাবে না।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার স্ত্রী চান আমি অনেকদিন বেঁচে থাকি। যদি জিজ্ঞাসা করি কতদিন তাহলে কিন্তু সঠিক বলতে পারবেন না। আমি এখন আশিতে পৌঁছেছি। ও চাইতে পারবে না আরও পঁচিশটা বছর। আবার সামনের বছর আমি থাকব না এটাও মানতে নারাজ। আমি বলি কী মনকে তৈরি রাখার বয়সে আমরা পৌঁছে গিয়েছি, তাই না?'

প্রশ্নটা আমাকে করলেন কিন্তু কী উত্তর দেব আমি! জিজ্ঞাসা করলাম, প্রসঙ্গ ঘোরাতেই, 'এখানে আর কে থাকেন?'

বৃদ্ধ চটপট মুখ ঘোরালেন, 'আর কে থাকবে? আমরা দুজন।'

বৃদ্ধা হাসলেন, 'তোমার মনে আছে ডোরা, মিসেস বাউমিক একবার ওই প্রশ্ন করেছিলেন। আমার ছেলেমেয়েরা সব নিজেদের কাজকর্ম নিয়ে থাকে। তাদের সংসারও বড়।'

'আসেন না ওরা?'

এবার বৃদ্ধা বললেন, 'কী করে আসবে? উইলি থাকে শিকাগোয়। ও সময় পায় না। বব থাকে সানফ্রান্সিস্কোতে। ব্যাবসা করে। টেভ মারা গেছে ভিয়েতনাম ওয়ারে। ডলি অবশ্য নিউইয়র্কে থাকে। কিন্তু ওর স্বামীটা এত পাজি যে ওকে আসতে বারণ করে দিয়েছি আমি।'

বৃদ্ধ বললেন, 'তবে মাদার্স ডে-তে ওরা টেলিগ্রাম গিফ্ট পাঠায়। ইন ফ্যাক্ট উই ডোন্ট ওয়ান্ট দেম টু ডিস্টার্ব টু-ডে।'

এতক্ষণ একরকম লাগছিল হঠাৎ স্রোতটা যেন ঘুরে গেল। প্রশ্নটা করতেই বৃদ্ধ বললেন, 'যদ্দিন শুধু ওরা আমাদের ছেলেমেয়ে ছিল তদ্দিন অসুবিধা ছিল না। যেই ওরা কারও স্বামী বা স্ত্রী, বাবা বা মা হয়ে গেল অমনি ওদের নিজস্ব একটা জগৎ তৈরি হল। বেশি আসা যাওয়া করলে আমাদের জগতের সঙ্গে ওদের সংঘাত লাগবেই। তা ছাড়া এককালে ওদের জন্যে অনেক করেছি এখন দুজনে একটু একা থাকতে চাই। তুমি বরং একদিন এসো চা খেতে-খেতে তখন গল্প করব। এখনই টিভি-তে একটা দারুণ সিরিয়াল দেখাবে। বাই।' বৃদ্ধাকে জড়িয়ে ধরে বৃদ্ধ পাইপ টানতে-টানতে ভেতরে চলে গেলেন। এতকাল শুনতাম ইংল্যান্ড বা আমেরিকায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা তাঁদের সন্তান দ্বারা উপেক্ষিত। ভারতীয় বাবা-মায়ের সঙ্গে তাঁদের বয়স্ক সন্তানদের সম্পর্ক নিয়ে বেশ গৌরব করতাম

আমরা। সাহেবরা বৃদ্ধ হওয়ার পর অসহায় অবস্থায় দিন কাটায় ওল্ড এজ্জ হোমে আর তাদের ছেলেমেয়েরা ভুলেও তাকায় না বলে আধুনিক সভ্যতাকে দায়ী করতাম। কিন্তু আজ ওই বৃদ্ধর দিকে তাকিয়ে আমার বার সেই ভদ্রলোকদের কথা মনে পড়ল। চা বাগানে চাকরির জমানো টাকায় তিনি জলপাইগুড়িতে বাড়ি তৈরি করেছিলেন। বেশ বড়সড় বাড়ি। ইচ্ছে ছিল চার ছেলে এবং নাতিনাতনি নিয়ে জমিয়ে থাকবেন। রিটায়ারমেন্টের পঁচিশ বছর পরে ওই বাড়িতে যখন তিনি এবং তাঁর বিধবা মেয়ে ছাড়া তৃতীয় প্রাণী নেই তখন আমায় লিখেছিলেন, 'আমার ছেলেমেয়ে নাতিদের মধ্যে একমাত্র তুমি আমাকে বুঝতে পারো বলে মনে হয়। এই যে এখন আমরা একলা আছি, এর চেয়ে সুখের আর কিছু নেই। এতকাল সবাই আমার আদেশ শুনত। এখন সবাই আমাকে হুকুম করতে চায়। এটা সহ্য করা বড় কঠিন। একা থাকায় নিজের মতো ভালো থাকা যায়। হয়তো অর্থের অনটনে পড়তে হয়, মাঝে-মাঝে তবু সেটা ছেলের বউ বা নাতনিদের ভিন্ন ভাবনার সঙ্গে মানিয়ে চলার থেকে ঢের ভালো। সাহেবরা শুনেছি আঠারো পার হলেই ছেলেমেয়েকে চরে খেতে বলে। নব্বই বছরের এই বৃদ্ধ চাইছে এদেশেও ওটা চালু হোক। স্নেহের খাল কেটে অপমানের কুমির ডাকার কি কোনও মানে হয়? তোমার কী অভিমত?

সেই বৃদ্ধের স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন পঞ্চাশ বছর আগে। বিধবা মেয়েকে নিয়ে তিনি একা থাকতে চেয়েছিলেন শেষ সময়ে। এই স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর মানসিকতার ফারাক কী?

নিউইয়র্কে সন্ধে হয় কিন্তু রাত যেন নামতেই চায় না। মনোজের সঙ্গে আমি আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরুলাম। ওর স্ত্রী বলেছেন, অন্তত দুটোর মধ্যে ফিরতে। বাইরে কোথাও খেয়ে নেওয়া যাবে। আজও পেট্রল পাম্প থেকে সিগারেট কেনা হল। বেশি তেল কিনলে এরা দেখছি পকেট ক্যামেরা উপহার দেয়। টাইম স্কোয়ারে যখন পৌঁছলাম তখনও আকাশে আলো। পার্কিং লটে গাড়ি রেখে পা বাড়াতে দুই সাহেবের একজন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ডাকল, 'হেই মিস্টার, কাম হিয়ার।'

সঙ্গে-সঙ্গে মনোজ চাপা গলায় জানাল, 'যাবেন না ভিখিরি।' অবাক হয়ে ভিখিরি দর্শন করলাম। একজন পাইপ খাচ্ছে অন্যজন কিছু চিবোচ্ছে। বয়স ষাটের ওপাশে। পরনের স্যুট ঈষৎ বিবর্ণ। কিন্তু একজনের টাই আছে। যে ডেকেছিল সে বলল, 'এই আমার বন্ধু, ওর কিছু টাকা দরকার। দুটো ডলার দিয়ে যাও তো। খুব গম্ভীর গলায় এই হুকুমটা হল। মনোজ বলল, 'থামবেন না। তাকাবেন না।'

অতএব এগিয়ে যাচ্ছিলাম। এবার গালাগালি ভেসে এল। অশ্রাব্য ভাষায় আমাদের কৃপণ বলা হচ্ছে। মনোজকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ কীরকম ভিখিরি?'

মনোজ হাসল, 'ওই পর্যন্ত। আর এগোতে সাহস পাবে না। পুলিশ দেখলেই চুপ করে যায়। আর একদল আছে যারা চুপচাপ বসে ভিক্ষে চায়।'

আমেরিকার মতো বড়লোকদের দেশে ভিক্ষুক আছে ভাবতে খুব ভালো লাগছিল। মনোজ আমাকে জুতো পালিশওয়ালা দেখাল। সিংহাসনের মতো একটা চেয়ারে বসিয়ে জুতো পালিশ করছে। টাইম স্কোয়ার অনেকটা আমাদের চৌরঙ্গির মতো। ফুটপাতে হাঁটা দায়। আর একটু এগোলেই নিওন সাইন চোখে পড়ল। 'লাইফ সেক্স', 'শেফ উইথ্ সেক্স', 'সেক্স গেম', 'শি অ্যান্ড ইউ।' দুই ফুটপাতে সিনেমা হলের মতো পরপর সাজানো উইন্ডো। আর সেখানে দাঁড়িয়ে নিগ্রো যুবকেরা হাঁকাহাঁকি করে খদ্দের ডাকছে।

ব্যাপারটা অনেকটা কলকাতার ফুটপাতে শোনা, 'কী চাই দাদা, একবার আসুন' বলে যে হাঁকাহাঁকি করে নির্দোষ বিক্রিবাটা চলে, তার কথা মনে করিয়ে দেয়। মনোজ বলল, 'আগে এদেশে এইসব সেক্সশপগুলো বে-আইনি ছিল। তখন সুইডেন থেকে স্মাগল হয়ে আসত। লোকে চোরাগোপ্তা দেখত। শেষ পর্যন্ত সরকার বিধি-নিষেধ তুলে দিল। প্রথম-প্রথম বিশ ডলার লাগত ঢুকতে। বেশির ভাগটাই ব্লু-ফিল্ম দেখাত। কিন্তু ঢোকার জন্যে লাইন পড়ত বিরাট। এখন বছরবারো পরে টিকিটের

দাম পাঁচ ডলার। সকাল দশটায় যখন খোলে তখন ঢুকে পরদিন ভোরে বেরিয়ে এলেও কেউ তাড়িয়ে দেবে না। কিন্তু সারাদিনে বড় জোর পঞ্চাশ জন দর্শক হয়।'

'কেন?' অবাক হয়ে বললাম, 'দাম কমলে দর্শক আসছে না কেন?'

'দর্শক আসছে না বলেই দাম কমছে। যৌনতার একই দৃশ্য এখন আমেরিকানদের শুধু বিরক্তি উৎপাদন করে। লাইফ শো-তে ভিড় হয় না কিন্তু ভালো নাটকের টিকিট তিনমাস আগে ফুল হয়ে যায়। যখন আগ্রহ ছিল, তখন উন্মাদনা ছিল, আগ্রহ ফুরিয়ে গেলেই কেউ ফিরেও তাকায় না এক ট্যুরিস্ট আর বুড়ো মানুষ ছাড়া। সত্যি বলতে কী এই পর্নো এলাকা বেঁচে আছে ট্যুরিস্টদের দৌলতে। মনোজের কথা শেষ হতেই আমার একটা ছোট্ট উদাহরণ মনে পড়ল। শ্যামবাজারে থিয়েটারে প্রথম যখন ক্যাবারে নাচ চালু হল তখন ভিড় দেখে সুধীজনেরা বলেছেন, দেশটা, দেশের সংস্কৃতি রসাতলে গেল। সবাই ভিড় করেছে সেখানে। তখন পেশাদারি থিয়েটার মানেই ক্যাবারে নাচ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সময়টা এল যখন ক্যাবারে নাচের ভিড় সত্ত্বেও টিকিট বিক্রি হয় না। তিন মাসে নাটক উঠে যায়। অথচ মোটামুটি সামাজিক নাটকগুলোয় হাউস ফুল হয়। কলকাতায় যদি ব্লু-ফিল্ম দেখানোর সরকারি অনুমতি মিলত তাহলে বছর পাঁচেকের মধ্যে ব্লু-ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি উঠে যেত।

পাঁচ ডলার মানে ষাট টাকা। দুকিলো ভালো মুরগির মাংসের দাম। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে একটা কাঁচের দরজা পেলাম। সেটা ঠেলতেই প্যান্টি পরা এক টপলেস সুন্দরী আমাদের অভিবাদন জানিয়ে বললেন, 'ভেতরে বসার সুবন্দোবস্ত আছে।' চা-বাগানে মদেশিয়া রমণীদের আওরাভাসা নদীতে স্নানরতা অবস্থায় দেখে আমার বালককালে কোনও অস্বস্তি হয়নি। কিন্তু এখন শরীর ঘিন-ঘিনিয়ে উঠল।

অ্যাকাডেমির মতো একটা প্রেক্ষাগৃহ। কিন্তু আধা অন্ধকারে বুঝলাম দর্শকের সংখ্যা এই সুসময়েও জনাসাতেক। মঞ্চের পেছনে টাঙানো পরদায় একটি ব্লু-ফিল্ম চলছে। দেখলাম প্যান্টি পরা টপলেস মেয়েরা ট্রের দড়ি গলায় ঝুলিয়ে ড্রিংকস বিক্রি করার চেষ্টা করছে। এই সময় ছবি শেষ হল। একটি মেয়ে উইংসের পাশ দিয়ে ঢুকল স্টেজে। যেন টায়ার্ড হয়ে নিজের ঘরে ঢুকেছে। স্টেজে একটা খাট পাতা রয়েছে। মেয়েটি সব জামাকাপড় বেমালুম খুলে দর্শকদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখাল। তারপর একটি পুরুষ দ্বিতীয় উইংস দিয়ে প্রবেশ করে তার সঙ্গে শৃঙ্গার করতে লাগল। পৃথিবীর কুৎসিততম সেইসব দৃশ্য দর্শকরা দেখছে তন্ময় হয়ে। সব চুকে যাওয়ার পর আলো জ্বলতেই দেখলাম সাত জনের মধ্যে জনাপাঁচেক বৃদ্ধ আর দুজন আরব দর্শক বসে। মনোজ বলল, 'ওরা কিন্তু অভিনয় করল। আট ঘণ্টার চাকরিতে অন্তত আটবার দর্শকদের সামনে এই অভিনয় করতে হয়।'

মানুষ যখন যন্ত্র হয়ে যায় তখন শরীরের এই নির্মম সুখের খেলা অভিনয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারে। ওদের লক্ষ রাখতে হয় দর্শক যেন তাদের ভাঁওতা ধরতে না পারে।

কেউ যদি সত্যিকারের জীবনের নিয়মের কাছে আত্মসমর্পণ করে ফেলে তাহলে তার চাকরি যাবে। খুব ইচ্ছে ছিল ছেলেটির সঙ্গে কথা বলি। সে কত মাইনে পায়, এই দক্ষতা কোন অধ্যাবসায়ে অর্জন করল। মনোজ জানাল, তাতে নাকি প্রাণসংশয় হতে পারে। ছেলেটি এবং মেয়েটি একটি র‍্যাকেটের পুতুল। সেই র‍্যাকেট ওদের কথা বলতে দেয় না। বেরুবার আগে দেখলাম আরব যুবকেরা পসারিণীদের সঙ্গে পাশের ঘরে চলে গেল। খোলা বাতাসে নেমেও মনের ঘিনঘিনে ভাবটা কিছুতেই কমছিল না। হৃদয় ছাড়া যৌনতা আমার কাছে গ্রহণীয় নয়। নিগ্রো টাউটদের চিৎকারে ভ্রূক্ষেপ না করে আমরা কিছুটা এগোতেই থিয়েটার পাড়ায় চলে এলাম। ডেথ অফ এ সেলসম্যান হচ্ছে একটায়। অভিনয় করছেন ডাস্টিন হফম্যান। ক্র্যামার ভার্সেস ক্র্যামার দেখেছি গ্লোবে। আমেরিকান ছবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় অভিনেতাকে স্টেজে অভিনয় করতে দেখার লোভ হল। কিন্তু জানলাম তিন মাসের মধ্যে টিকিট পাওয়া যাবে না। আর একটি স্টেজে অ্যান্টনি কুইন করছেন, 'জোবরা দ্য গ্রিক।' মনে পড়ল হাঞ্চ ব্যাক অফ নটরডোম আর গানস অফ নভোরন ছবি দুটোর কথা।

পাশেই অফ ব্রডওয়ে পাড়া। আমাদের গ্রুপ থিয়েটারের মতো পরীক্ষামূলক নাটক করে থাকেন এরা। কিন্তু করেন অত্যন্ত প্রফেশনাল ভঙ্গিতে। মনোজ এইরকম একটা নাটকে কিছুদিন অভিনয় করছে ভারতীয় চরিত্রে। সেই গ্রুপ থিয়েটার পাড়ায় এসে জানলাম, রোজ হাউস ফুল হয়ে যায়। ভালো লাগল দেখে মিনিটদশেক দূরে পর্নো থিয়েটার যখন মাছি তাড়াচ্ছে, তখন এখানে দর্শক আসছেন বিপুলভাবে।

হাঁটতে-হাঁটতে কতটা চলে এসেছিলাম খেয়াল নেই, হঠাৎ মনোজ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল একটি দোকানের দিকে। কোনও মহিলা সম্ভবত তাঁর স্বামীর সঙ্গে কিছু কিনছিলেন। কিন্তু মহিলা সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি আসতেই তিনি সোজা এগিয়ে এলেন সামনে। ফরসা, সুন্দরী। জিনস পরা মহিলাটি ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা তো ভারতীয়। খুব ভুল যদি না করে থাকি তাহলে বাঙালি। আপনি কি কখনও জলপাইগুড়িতে ছিলেন?'

রোমাঞ্চিত হলাম। নিউইয়র্কেও জলপাইগুড়ির নাম। স্বীকার করতেই জিজ্ঞাসা করলেন, এবার অবশ্য বাংলায়, 'যদ্দুর মনে হচ্ছে আপনার নাম সমরেশ মজুমদার?'

এবার পুলক মনেও। শুধু আমার বই নয়, এখানে আমার নামও জানে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনাকে চিনতে পারলাম না তো?'

'সে কথাই বলছি। না চিনে কেন লিখতে যান।'

'মানে?'

'আপনি নাকি কী একটা বইতে আমাকে, আমাদের নিয়ে স্ক্যান্ডাল করেছেন? আমি পড়িনি। আপনার চেহারাটা অনুমান করেছিলাম। দেশ থেকে একটা চিঠিতে ব্যাপারটা জেনেছিলাম। ট্রাশ! সেই স্ক্যান্ডাল লিখেই কি আমেরিকায় এসেছেন? শিট।' বলেই হনহন করে ফিরে গেলেন স্বামীর কাছে। গিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরলেন। আমি হতবাক। কে এ? স্মৃতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে। রম্ভা, উর্বশী না সীতা! কিন্তু যেই হোক মেয়েরা ফেলে আসা দিনের স্মৃতির আরশিতে দেখতে ভালোবাসে না? কারণ। জ্ঞানত আমি কখনও মিথ্যে কথা লিখিনি।

॥ ৭ ॥

বিদেশে কিছুদিন থাকলেই বোঝা যায় পৃথিবীটা কত ছোট। বঙ্গসন্তানদের ভুলিয়ে রাখা খুব সহজ কাজ। একটু তোষামোদ করলেই তেনারা মিথ্যে কথাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করেন। বাঙালির ইতিহাস নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই বলবেন না আমাদের কী ছিল, কী হল। আমাদের যে কিছুই ছিল না এইটেই এখন বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। ভারতবর্ষ চিরকাল বিদেশির দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে। মোগলরা পর্যন্ত আমাদের এক করতে পারেনি। ব্রিটিশরা দুশো বছর পর ধামাচাপা দিয়ে একত্রিত রেখেছিলেন। সেটা যে মন থেকে নয় তার প্রমাণ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরের মধ্যে অসম পাঞ্জাব থেকে শুরু করে পশ্চিমবাংলায় বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। অথচ আমাদের কবি যখন লিখলেন 'ভারত আবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে' তখন কেউ প্রশ্ন করেনি 'আবার' মানে? কবে শ্রেষ্ঠ ছিল? ব্যাপারটা ভাবলেই ভালো লাগত। তখন শিমুলতলায় গেলে বলা হত পশ্চিম গিয়েছেন। বিলেতফেরত মানুষ দ্রষ্টব্য ছিলেন। আজও যদি কেউ আমেরিকা, ইউরোপ যায় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চাশভাগ মানুষ বিস্ময়ে তাকায়। কিন্তু লন্ডনের যাতায়াত ভাড়া যে তিনবার বম্বে যাতায়াতের চেয়ে কম সেটা জানা থাকে না তাঁদের। বলা যায় সত্তরের আগে থেকে কিছু শিক্ষিত মানুষের আনাগোনা বাড়ল বিদেশে। এখন তো জলভাত। কলকাতার ফ্ল্যাটে বাঙালি যে

গলায় ঝগড়া করে তা নিউইয়র্কেও করে। মনোজ বলেছিল, 'আপনি এখানে এসেছেন তা অনেকে জেনে গেছে।'

'কী করে জানল?'

'আপনার কামালের কৃপায়। সবাই বলেছে ব্যাপার কী, কবে বসবে?'

মনোজকে আমি বারংবার নিষেধ করেছিলাম এ ব্যাপারে। কিন্তু নিউইয়র্কের বাঙালিদের কয়েকটা আড্ডা আছে, ওকে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেই হয়। বোঝা যাচ্ছে ইচ্ছে থাকলেও সামনের শনিবার ব্যাপারটা এড়ানো যাবে না। এ ব্যাপারে যা শুনলাম তা চমকপ্রদ। এঁদের যখন ছুটি হয় তখন আকাশে সূর্যদেব বহাল থাকেন। কিন্তু সোম থেকে বৃহস্পতি কাউকে নেমন্তন্ন করলেও তিনি আসবেন না। উইক-এন্ড ছাড়া বেরুবার কথা ভাবতে পারে না এরা। অথচ কাজের দিন বিকেল থেকে ঘণ্টাপাঁচেক বাড়িতে বসে থাকলেও বেরুবার সময় পরের দিনের অফিসের দোহাই দেবেন। জানি না এই কারণেই হয়তো এখানে দুর্গাপুজো দুই সপ্তাহ ধরে শনি-রবিবার হয়। যেহেতু শনি-রবি ছুটি তাই শুক্র এবং শনিবার এঁরা সামাজিকতা করতে বের হন। দেখা যাবে ডায়েরির পাতায় এক-একজন প্রায় তিন চার সপ্তাহের ওই ছুটির দিনে আগাম বুকড হয়ে আছেন। মনোজ আমাকে আশ্বস্ত করল, যাঁরা আসছেন তাঁরা মোটামুটি গল্প উপন্যাস পড়েন, দেশের হালফিল খবর রাখেন এবং কেউ-কেউ পত্র-পত্রিকায় লেখেনও।

পৃথিবীটা ছোট হয়ে গেলেও বাঙালি বাঙালিতেই আছে, তা নিউইয়র্কে গেলে চমৎকার বোঝা যাবে। যে ছিল পাড়ার পটলদা, রকে বসে আড্ডা মারত, কোনও মামাকে ধরে একটা চাকরির স্বপ্ন দেখত, সে-ই আমেরিকায় পৌঁছে রীতিমত সাহেব হয়ে আমেরিকানদের চেয়েও বেশি আমেরিকান হয়ে যেত। মনোজের উপন্যাস অনুযায়ী যে চিত্রনাট্য শুরু করেছি তাতে এইরকম এক প্রৌঢ় চরিত্র বাড়িতে লুঙ্গি পরে থাকেন কিন্তু কলিং বেল বাজতেই ঝটপট স্যুট পরে হ্যালো বলে দরজা খোলেন। মেয়েকে নির্দেশ দেন, 'দ্যাখো, যদি বিয়ে করতেই হয়তো কোনও বাঙালিকে করবে, যে দেশে ফিরবে না। সেরকম না পেলে আমেরিকান যেয়ার স্কিন। বাট কোনও কালুয়াকে নেভার।' কালুয়া মানে নিগ্রো যারা এখন আমেরিকার অর্ধেক জনতা। সাদা আমেরিকানরা তাদের কালো সতীর্থদের যতটা এড়িয়ে না চলে বাঙালিরা তার বহুগুণ সেই মানসিকতা দেখায়।

চিত্রনাট্যের কাজ চলছে দুপুরে। মাটির তলায় ঘরে শুয়ে বসে আমি আর মনোজ লিখছি। সামনে একটা টিভি খোলা। এতরকমের ছবি একসঙ্গে দেখার অভিজ্ঞতাও অসাধারণ। কামাল প্রায়ই ফোন করে বস্টন থেকে। জুলি নামের নিগ্রো মেয়েটি যে লস এঞ্জেলসে থাকে তার টেলিফোন নম্বর দিয়েছে আমাকে। চিত্রনাট্যের এক জায়গায় আমি আবার আটকালাম। নিউইয়র্কে কোনও বাঙালি মেয়ে একা কীভাবে থাকে তা জানা নেই. এখানকার বাড়িওয়ালারা কি একা মেয়েকে ফ্ল্যাট দেয়? মনোজ উঠে পড়ল, 'চলুন।'

এখন দুপুরে আড়াইটে। আমাদের ব্রেকফাস্ট সবে হয়েছে। আকাশে অবশ্য সূর্যদেব বিন্দুমাত্র কঠোর নন। গাড়িতে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় যাচ্ছি বলুন তো?'

মনোজ বলল, 'একজন ভদ্রমহিলার কাছে যিনি এ মাস পর্যন্ত একা আছেন।'

'এ মাস পর্যন্ত মানে?'

'আগামী মাসে ওর বিয়ে। বিয়ে মানে নিজেই বিয়ে করছেন। ভদ্রমহিলা ডিভোর্সি।' আগাম কৌতূহল আজকাল আর প্রকাশ করি না। ঈশ্বর সর্বত্র এত রহস্য মজুত রেখেছেন যে আগে থেকে ভেবে লাভ কী। বেরুবার আগে মনোজ টেলিফোন করেছিল, ওপাশ থেকে সাড়া পায়নি। কিন্তু ওর ধারণা মিনিটচল্লিশেক যেতে লাগবে এবং এর মধ্যে মহিলা ফিরে আসবেন। শ্যামবাজার থেকে গড়িয়াহাট যেতে যে সময় লাগে ওখানে তার বারোগুণ রাস্তা একই সময়ে যাওয়া যায়। লিখতে-লিখতে ফার্স্ট হ্যান্ড অভিজ্ঞতার সন্ধানে উঠে যাওয়ার কথা আগে কখনও ভাবতে পারতাম না।

মনোজের সিগারেট খাওয়া বারণ। কিন্তু আমি আসার পর সেটা কমের দিকে নেই। মনোজ বলল, 'একসময় নিউইয়র্কের বাঙালি সমাজ এই মহিলাকে কনডেম করেছিল। ডিভোর্সের পর সবাই চেয়েছিল ও দেশে ফিরে যাক। এমনকী ওর বাবা-মা কলকাতা থেকে ওকে সেই কথাই লিখেছিলেন, কিন্তু ও ফেরেনি। তখন বঙ্গললনারা তাঁদের স্বামীদের ওপর নজর রাখত যাতে ওর সঙ্গে না মেশে। একা লড়ে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। আমার চরিত্রটা ওকে ঘিরেই।'

প্রায় মিনিটপনেরো যাওয়ার পর ডান দিকে তাকাতে অন্তত হাজারপাঁচেক গাড়ি দেখতে পেলাম। সংখ্যাটা বেশিও হতে পারে। এত গাড়ি এখানে কেন? অফিস পাড়া তো এটা নয়। মনোজকে জিজ্ঞাসা করতেই বলল,'ওটা রেসকোর্সে যারা গিয়েছে তাদের গাড়ি।'

'রেসকোর্সটা কোথায়?'

'ওই যে স্টেডিয়ামের মতো দেখছেন ওটা।'

অন্তত সিকি মাইল দূরে স্টেডিয়াম গোছের একটা কিছু। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'হাতে সময় আছে, যাবেন? আপনার প্রথম উপন্যাস তো দৌড়। কলকাতার মাঠের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিউইয়র্কের রেসকোর্সের কতটা মিল দেখুন না।' ও গাড়ি ঘোরাল।

সেটা ছিল তিয়াত্তর সাল। সাহিত্যিক হিসেবে বরেন গঙ্গোপাধ্যায় তখন বেশ খ্যাতিমান। ওঁকে ঘিরে আমরা কয়েকজন তরুণ লেখক রাণিগঞ্জ কোল হাউসে শিল্পী নিতাই দে-র অফিসে রোজ বিকেলে আড্ডা মারতাম। নিতাইদা মাঝে-মাঝে রেসে যেতেন। এক শনিবার বরেনদার আগ্রহে আমরা ওঁর সঙ্গ নিলাম। সেকেন্ড এনক্লোজারে গিয়েছিলাম। তিরিশ টাকা হেরেছিলাম। খুব সংকোচ এবং ভয় ছিল, যদি কেউ দেখে ফেলে। সেদিনই প্রথম রেসের বই দেখেছিলাম। যে জিনিসটি আমাকে আকর্ষণ করেছিল তা হলে ঘোড়ার নামগুলো। রয়েল চ্যালেঞ্জ কোনও ঘোড়ার নাম হতেই পারে, কিন্তু ল্যাপিস ল্যাজুলি? আমরা ঢুকেছিলাম সেকেন্ড ক্লাসে। গিয়ে জেনেছিলাম ঘোড়াদেরও ক্লাস আছে। বি ক্লাস থেকে ফার্স্ট ক্লাস যত ওপরের ক্লাসে ঘোড়া উঠবে তত তার দাম বাড়বে। জিতে-জিতে প্রমোশন পেয়ে ঘোড়ারা ওপরের ক্লাশে ওঠে। কিন্তু এসবের বাইরে যেটা আমার চোখে পড়েছিল তা হল রেসকোর্সের দর্শক। বাঙালির ছেলেরা ঘোড়ারোগ ধরলে শুনেছি সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। প্রথম দিনই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল যিনি পঞ্চাশ বছর ধরে রেসে আসছেন। মাসে একশো টাকার বেশি খেলেন না। হারলে ওই অঙ্কই। বলেছিলেন, 'এটাই আমার রিক্রিয়েশন হে। যে জিততে আসবে সে পানি পাবে না, যে এই অঙ্কভিত্তিক খেলাটাকে আনন্দ পাওয়ার জন্য নেবে তার মতো খুশি কেউ নেই।'

নিতাইদার সঙ্গে কিছুদিন মাঠে গিয়ে একটা টাকাও না খেলে মানুষ দেখেছি। রেসের মাঠে যা হয় তার বাইরে সম্ভবত দশগুণ কাণ্ডকারখানা চলে। কত পরিকল্পনা এবং হ্যাঁ ষড়যন্ত্রও। যতক্ষণ না শেষ রেসের ঘোড়াগুলো খাঁচা থেকে বের হয় ততক্ষণ রেসের মাঠে একটা ক্লাসলেস জনতা তৈরি হয়ে থাকে। এই জনতা কোনও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা ভাবে না, সামাজিক স্ট্যাটাস নিয়ে মাথা ঘামায় না। কেরানি এবং কোটিপতির মধ্যে ওই ক'ঘণ্টায় চমৎকার আঁতাত তৈরি হয়ে যায়, ড্রাইভারের কাছে টিপস নেয় অধ্যাপক। এই মানুষগুলোকে নিয়ে গল্প লিখলাম দেশে, রাজার খেলা। হঠাৎই মনে হল রেসকোর্সের জকির জীবন আমাদের আধুনিক মানুষের জীবনযাত্রার প্রতীক। যা হোক, বঙ্গসন্তান রেসে যায় তা মুখ ফুটে বলে না, আজও, যদিও রেস একটি সরকারস্বীকৃত জুয়া। দেখলাম বিখ্যাত গায়ক, সাহিত্যিকও মাঠে আসছেন। এবং তাঁর সঙ্গে রেস নিয়ে আলোচনা করেছেন যাঁরা তাঁদের শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। পরে বোম্বে, দিল্লি, মাদ্রাজে যখন গিয়েছি তখন সেখানকার রেসকোর্সগুলোতে ঢুঁ মেরেছি। দেখেছি জনতার চরিত্র এক।

মনোজ গাড়ি পার্ক করে কয়েক পা এগোতেই একটা বাস এসে দাঁড়াল সামনে। এটি যাবে একেবারে রেসকোর্সের দরজায়। রেসকোর্সের নিজস্ব বাস। টিকিট লাগে না। পার্কিং লট থেকে মেইন গেট পর্যন্ত যাওয়া আসা করে। জানলাম রেস শুরু হয়েছে ঘণ্টা দুয়েকআগে।

দশ ডলারে দুটো টিকিট কেটে গেট পার হলাম। ভারতবর্ষের রেসকোর্সগুলোর সামনে হকাররা রেসবুক বিক্রি করে। এখানে কেউ নেই। হঠাৎই দেখলাম এক বুড়ো নিগ্রো বেজার মুখে উলটো দিক থেকে আসছেন। আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে তিনিই জিজ্ঞাসা করছেন, 'এর আগে এখানে এসেছ?' মনোজ মাথা নেড়ে না বলতেই, 'আশা করি আমার মতো ভাগ্য তোমাদের হবে না' বলে রেসবুকটা ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। মানুষটি যে খুব হেরে গেছে বোঝা যাচ্ছিল। সামনেই লিফট। সেটায় উঠে রেসের বই খুলে দেখলাম কিছুই বুঝছি না। কলকাতার মতো লেখা নয়। তবে রেস হয়ে গেছে চারটে। আরও তিনটে বাকি। নিগ্রো ভদ্রলোক প্রথম চারটে রেসে যে যে ঘোড়া জিতেছে তাদের নামের পাশে টিক দিয়ে রেখেছেন। একটা নাম দেখে ভালো লাগল, কিং অশোক। নিউইয়র্কের মাঠে কিং অশোক জিতেছে যার মালিক আরবের কোন শেখ!

লিফট আমাদের নিয়ে এল একটা বড় কাফের দরজায়। সেখানে টুলে বসে লোকজন পানীয় পান করছে আর রেসের বই দেখছে। সেটা ছাড়িয়ে একটু এগোতেই হাওড়া স্টেশনের মতো বিশাল প্ল্যাটফর্ম দেখতে পেলাম। ওপরে ইলেকট্রিক বোর্ডে পরের রেসের ঘোড়াগুলোর দর জ্বলছে নিভছে। ওপাশের কাউন্টারে লোকে টিকিট কিনছে লাইন দিয়ে। একজনকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম মাঠটা কোথায় যেখানে ঘোড়ারা দৌড়োয়, তখন সে এমনভাবে তাকাল যেন উজবুক দেখছে। কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙে একটা বিশাল চাতালের ওপর উঠে আসামাত্র চোখ জুড়িয়ে গেল। কলকাতার রেসকোর্স ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মাঠ। কিন্তু এও বা কম কী! সবুজে ছেয়ে আছে। এখন ঘোড়াদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে। মনোজ বলল, 'এলাম যখন তখন একটা ঘোড়া খেলা যাক।' আমার মাথায় কোনও ঘোড়া সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। মনোজ পাশে দাঁড়ানো এক সাদা বুড়িকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন ঘোড়া জিতবে?'

বুড়ি খিঁচিয়ে উঠল, 'সেটা যদি আমি জানতে পারতাম তাহলে ফ্রান্সে সামার ভিলা করতাম।' মোক্ষম যুক্তি। মনোজ বলল, 'তাহলে এক নম্বরটা খেলি। দশ ডলার। আপনাতে আমাতে।' মনোজ চলে গেল টিকিট কাটতে। কলকাতা শহরেই একশো টাকা কখনও খেলিনি বিদেশে এসে ওই টাকা খোয়াব? অবশ্য ভাগে পঞ্চাশ পড়বে। কিন্তু এখানে তো ডলার গোনাগুন্তি। জনতার দিকে তাকালাম সংখ্যা বলতে পারব না। সাদা কালোয় মেশামেশি নেই। কলকাতার মতো ক্লাসলেস ক্রাউড বলা যাচ্ছে না টিকিট নিয়ে এল মনোজ। কম্পুটার পাঞ্চ করে দিয়েছে। রেস শুরু হল। আমাদের এক নম্বর এল অনেক পেছনে। দ্বিতীয় রেসেও দশ ডলার হারলাম আমরা এক নম্বর খেলে। মনোজ বলল, 'অনেক হয়েছে। এবার চলুন। আর বাড়িতে ফিরে এই ঘটনাটা গল্প করবেন না।'

বেরিয়ে আসছি। হঠাৎ বইটার দিকে নজর পড়তেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। নিতাইদা বলত প্রথম রেসে যে ঘোড়া জেতে তার ট্রেনার মালিক এবং জকি যদি শেষ রেসে কোনও ঘোড়ায় একত্রিত হয় তাহলে তার জেতার সম্ভবনা নব্বুই ভাগ। প্রথম রেসে কিং অশোক জিতেছে। শেষ রেসে যে দশটা ঘোড়া ছুটছে তাদের একজনের নাম মোনালিসা। মালিক সেই আরবের শেখটি, ট্রেনার এবং জকিও কিং অশোকের। নিতাইদার কথা কি সত্যি হবে? ওরা কি ডাবল করবে। সংকোচে মনোজকে বললাম কথাটা, মনোজ বলল, 'দূর! কলকাতার নিয়ম কি এখানে খাটে? আর পয়সা নষ্ট করব না।'

কিন্তু আমি আরও দশ ডলারের ঝুঁকি নিলাম। লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কেটে নিয়ে এলাম। স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে যখন ঘোড়াগুলো যাচ্ছে তখন মোনালিসাকে দেখতে পেলাম। সাত নম্বর। ধবধবে সাদা।

হঠাৎ মনোজ পাঁচ ডলারের নোট এগিয়ে দিল। 'রাখুন। এক যাত্রায় আর পৃথক ফল হয় কেন। পনেরো-পনেরো করে হারলাম। তিরিশ ডলারে দুটো জিনসের প্যান্ট অথবা দু-বোতল শিভাস রিগ্যাল কেনা যেত।' রেস শুরু হল। আগের দুটোতেও দেখেছি, যে ঘোড়া প্রথমে এগিয়ে যায়

সে অবশ্যম্ভাবী হারে। তিন চারশো গজ যাওয়ার পরেই পেছনেরগুলো তাকে টপকে যায়। অর্থাৎ জিততে হলে প্রথমদিকে তিন-চার নম্বরে থাকতে হবে। মনোজ বলল, 'বেরিয়ে চলুন সাদা ঘোড়া প্রথমে ছুটছে।'

মন খারাপ হয়ে গেল। মোনালিসা নাম্নী ঘোড়াটি সবার আগে ছুটছে। চারশো গজ যাওয়ার পরেই পেছন থেকে একটা ধূসররঙা ঘোড়া ওকে ধরে ফেলল। এখন পাশাপাশি ছুটছে ওরা। দর্শকরা চেঁচাচ্ছে। অবিকল কলকাতার মতো। কিন্তু মোনালিসা হাল ছাড়ছে না। সমানে লড়ে যাচ্ছে। বাঁক ঘুরে ওরা জোড়া তির হয়ে ছুটে গেল উইনিং পোস্টের দিকে। পেছনের ঘোড়াগুলো নাগাল পেল না। শেষ মুহূর্তে বুঝতে পারলাম মোনালিসা জিতেছে। মনোজ উজ্জ্বলমুখে বলল, 'সমরেশ, আমরা জিতেছি।' বলতে না বলতেই ইলেকট্রিক বোর্ডে মোনালিসার নাম জ্বলজ্বল করে উঠল। আমাদের উত্তেজনা দেখেই সম্ভবত সেই বৃদ্ধা ছুটে এলেন, 'তোমরা কি মোনালিসা খেলেছ?'

মনোজ খুশিতে মাথা নাড়তেই বৃদ্ধা চিৎকার করে উঠলেন, 'পঁচিশের দরের ঘোড়া খেলে তখন আমার সঙ্গে রসিকতা করছিলে? কোন ঘোড়া জিতবে? কেন আমাকে বলতে কী হয়েছিল?' মনোজ বলল, 'ম্যাডাম বিশ্বাস করুন আমরা আন্দাজে খেলেছি।' অসন্তুষ্ট বৃদ্ধা বকরবকর করতে-করতে চলে গেলেন। পঁচিশের দর? আমরা হাতে পেলাম দুশো তিরিশ ডলার। তিন রেসে প্রত্যেকের পনেরো করে খরচ হয়েছিল। সেটা ফিরিয়ে নেওয়ার পর দুশো ডলার রইল লাভের খাতে। দু-হাজার টাকার বেশি। মনোজ বলল, 'এই টাকাটা দিয়ে সবাই মিলে আনন্দ করা যাক সমরেশ। আপনার আপত্তি আছে?'

বললাম, 'বিন্দুমাত্র নয়।' পার্কিং লটের দিকে আসবার সময় বারংবার নিতাইদার কথা মনে পড়ছিল। চোখের দৃষ্টি প্রায় হারিয়ে নিতাইদা ছবি আঁকার কাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন। টালিগঞ্জে এমন একটা জায়গায় যেখানে আমাদের পরিচিত কেউ যায়নি। শুনেছি খুব আর্থিক সংকটে আছেন এখন। কিন্তু আমাদের পকেটে যে দুশো ডলার এল লস্ কভার করা পর সেটা নিতাইদার দান। রেস এমন একটা অঙ্ক যা পৃথিবীর সর্বত্র প্রযোজ্য।

ম্যাকডোনাল্ডের মিল্কসেক আমার খুব প্রিয়। জানি ওই জমাট ঠান্ডা চকোলেট মেশানো ক্ষীর-ক্ষীর দুধ খাওয়া মানে ওজন বাড়ানো তবু লোভ সামলাতে পারতাম না। রেসকোর্স থেকে বেরিয়ে গাড়ি নিয়ে মণিকা সেনের বাড়িতে যাওয়ার পথে ম্যাকডোনাল্ডে নেমে ওটা খেয়ে নিলাম। মনোজের মুখে শুনেছি আমেরিকার বাঙালিদের বাড়িতে অসময়ে কেউ গেলে কিছু খাওয়ানো হয় না। এটা অসময় কি না জানি না তাই রিস্ক নিলাম না। ম্যাকডোনাল্ড হল সেই সুন্দর খাবারের দোকান যেখানে আমাদের মতো অভাগারা সস্তায় খেতে পারে। প্রতি ছ'ঘণ্টা অন্তর এদের সেলসম্যান এবং টেবিল বয় পালটায়। আর এরা বেশিরভাগই এশিয়ার দেশগুলো থেকে আসা ছাত্র।

ভদ্রমহিলার নাম মণিকা সেন। বিয়ের পর মিত্র হয়েছিলেন এখন আবার সেন। লিফটে সাততলার ফ্ল্যাটে ওঠার আগেই মনোজ এই খবরটুকু দিয়েছিল। বোতামে চাপ দেওয়ার কয়েক সেকেন্ড বাদে দরজা খুলল। দেখলাম মধ্য তিরিশের এক স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী মহিলা দাঁড়িয়ে, 'আরে মনোজ, কী খবর? এসো, আসুন।' ভদ্রমহিলার পরনে একটা জিনসের প্যান্টের ওপর জ্যাকেট। এটা এদেশের মেয়েদের অভ্যস্ত পোশাক, মাঝে-মাঝে জরুরিও।

মনোজ বলল, 'তোমায় ফোন করেছিলাম। বেজে গেল। তাই গেট ক্র্যাস করতে হল।'

'আমি এইমাত্র ফিরেছি। গেট ক্র্যাস আবার কী! বসো।'

'আমার বন্ধু সমরেশ মজুমদার। তুমি কলকাতা ছাড়ার পর লেখা শুরু করেছে। আমার ছবির স্ক্রিপটা ও লিখে দিচ্ছে। তুমি ওর লেখা পড়োনি!'

'সত্যি কথা। খুব অশিক্ষিত হয়ে গেছি। আমার চরিত্রটা কেমন লাগছে!'

'আপনার চরিত্র?'

'বাঃ। ওটা তো আমি।'

মনোজের নায়িকা লড়াই করেছে এখানকার প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে। নিউইয়র্কের বাঙালি সমাজ ওকেও এক ঘরে করেছিল একমাত্র শৈবাল ছাড়া। লিফটে ওঠার আগে আমি বুঝতে পেরেছিলাম মনোজ চরিত্রটি বানায়নি। টিয়ার কাছেই যাচ্ছি আমি। তবু ভেবেছিলাম কোনও ভদ্রমহিলাকে একটু ব্যবধানে রেখে কথা বলা উচিত। তাই বিস্ময় দেখিয়ে ছিলাম।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'মনোজের সাহস আছে তাই লিখেছে। ও আপনাকে কিছু বলেছে?'

'বিশেষ কিছু নয়।'

'তাহলে আপনি আসলেন কেন?'

'আপনাকে দেখতে।'

'বলুন কী দেখতে চান?'

'এই ফ্ল্যাটে একা থাকেন আপনি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপত্তি আছে?'

'আরে না না। এভাবে বলছেন কেন?'

'একা থাকার পর উড়ো ফোন আসত। কেউ কেউ জ্ঞান দিত। অবশ্যই সবাই বাঙালি।'

'আমি দুঃখিত। কিন্তু আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন।'

মণিকা সেন কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকালেন, 'সরি, আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

'মনোজ এবার হাসল, 'ব্যস। উত্তেজনা শেষ করো এবার। তোমার খবর ভালো?'

'তুমি জানো না।'

'জানি।'

'খুশি?'

'আশ্চর্য! বিয়ে করেছ তুমি? খুশি হওয়ার কথা তোমার।'

মণিকা সেন এবার আমার দিকে তাকালেন, 'আচ্ছা সমরেশবাবু, আপনি তো লেখেন, প্রেমের সংজ্ঞা ঠিকঠাক বলতে পারেন?'

'অসম্ভব। স্বয়ং ঈশ্বরও বলতে পারেন না।'

'ঠিক কথা হল না। মানুষ অনেকরকমের প্রেম করে। এই ধরুন যদি বলি, আমি মনোজকে খুব চাইতাম। ওকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতাম। ওর জীবনযাত্রার কথা আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করত। কিন্তু যখন জানলাম নিজের সংসার ছেড়ে মনোজের বেরিয়ে আসা সম্ভব নয় তখন ওর পারিবারিক শান্তির জন্য নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। তখন আমার প্রেম কি মরে গেল? না, না মনোজের নাম আমি উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করলাম, ওর দিকে তাকাবেন না। কিন্তু বলুন, প্রেম মরে গেল? আমি বাকি জীবন ওকে নিজের মতো করে ভালোবেসে যেতে পারি। কিন্তু তাই বলে যদি এরপরে অন্য পুরুষ আমার জীবনে আসে এবং তার ব্যবহার, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি খারাপ না লাগে তাহলে তার সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি হতে পারে যা বিয়েতে গিয়ে পরিণতি পেতে পারে। এবং সেই মুহূর্তেও কিন্তু আমি মনোজকে আমার মতো করে ভালোবেসে যেতে পারি। অবশ্যই আমি এমন কাজ করব না যাতে আমার স্বামী আঘাত পান। আপনি এটা মানেন?'

'মানি।'

'মন রাখার জন্যে বলছেন?'

'না।'

'তাহলে আপনার সঙ্গে আমার জমবে।'

'ফ্ল্যাটটা পেতে আপনার কোনও অসুবিধে হয়নি?'

'এটা কলকাতা নয় মশাই। এজেন্সি পয়সা নিয়ে বাড়ি দিয়েছে।'

'কোনও অসুবিধে হয়নি?'

'এখন পর্যন্ত নয়। আপনি কি জানেন আমি বিয়ে করছি।'

'জানি।'

'বিয়ের পর এই ফ্ল্যাট আমি ছেড়ে দেব। একজনের পক্ষে ঠিক ছিল।'

'টিয়াকে কিন্তু কিছু নিগ্রোরা রেপ করেছিল।'

'মনোজ তাই লিখেছে টিয়া যদি বিবাহিত হত তাও রেপড হতে পারত। আবার যারা রেপ করে তারা একটি সুন্দর নারীদেহ ভোগ করতে চায়। একা মেয়েকে পাওয়া সহজ তাই মনোজ ও কথাটা লিখেছে। টিয়া বিবাহিতা হলে এবং ওর স্বামী বাইরে গেলেও একই ব্যাপার হতে পারত।'

'একলা মেয়ের জন্যে লোকের আগ্রহ বেশি থাকে, না?'

'থাকে। তবে আমেরিকায় কম।'

'আপনি কি অসুবিধায় পড়েছেন?'

'টিয়া যা পড়েছিল। মনোজ তো আমাকে নিয়েই লিখেছে। স্বামী অন্য মেয়ের সঙ্গে শুচ্ছে। বান্ধবীদের পাওয়ার জন্যে তাদের স্বামীদের সঙ্গে শুতে বলছে। অতএব ক্ল্যাশ লাগল। কলকাতার গন্ধ তো যায়নি শরীর থেকে। ঝামেলা বাড়তে-বাড়তে শেষ পর্যন্ত ডিভোর্স। আলাদা হলাম। চাকরি করি না। থাকার জায়গা নেই। যারা এতদিন ঘনিষ্ঠ ছিল তারাও আমাকে রাখতে বিব্রত হল। কলকাতা থেকে বাবা-মা লিখলেন ফিরে যেতে। একদিন সবাই ঈর্ষা করেছিল আমাকে। আমেরিকায় প্রবাসী পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে বলে। এখন তারাই বলবে বামন হয়ে চাঁদ ধরতে গেলে এই দশা হবেই। বাঙালি কারও ভালো দেখতে পারে না, দুর্দশা দেখলে খুশি হয়। মাথা নীচু করে ফিরে যেতে চাইলাম না। প্রথম দিকে কী না করেছি। রেস্টুরেন্টে চাকরি, সেলসেও। পড়েছি সেই সঙ্গে। তারপর একটা ভালো গোছের কাজ জুটে গেল। প্রথমদিকে যে হোটেলে ছিলাম সেখানে মান্টা নামের একটা মেয়ে ছিল। সে বলত, 'জানো মণিকা, প্রতিটি মেয়েই একটা রাত্রে বেশ্যার জীবনযাপন করে। যে রাত্রে তার স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু বাধ্য হয়, সেই রাত্রে সে তো বেশ্যা।' মেরি বলে একটা মেয়ে আমার রুমমেট ছিল। সে বলত, 'একটা পুরুষ আমার শরীরে তার শরীর প্রবেশ করানো মাত্র আমি কেন অসতী হব? সেও তো সমান অসৎ। আমার শরীর চাইছে সে প্রয়োজন মেটাচ্ছে। কিন্তু আমার প্রিয়জন চাইলে আমার মন তার ডাকে সাড়া দেবে। কথাগুলো মাথার মধ্যে নানা ছবি আঁকত। কিন্তু বিশ্বাস করুন কোন ছবিটা সত্য সেটাই ধরতে পারতাম না।'

মণিকা সেনের সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালো লাগেছিল। বুঝতে পারছিলাম ভদ্রমহিলা কিছুটা কমপ্লেক্সে ভুগছেন। কিন্তু ওর চোখে জীবনটা এখন যেভাবে স্বচ্ছ হয়ে এসেছে তা অনেক মেয়ে কল্পনা করতে পারবে না। মণিকা এখন যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে তিনি ওঁর প্রয়োজন মেটাবেন এবং নিরাপত্তা দেবেন। কিন্তু এর বিনিময়ে তিনি মণিকার কাছে আনুগত্য চাইতে পারেন। সে ব্যাপারে মণিকা ওঁকে কখনও ঠকাবেন না। কিন্তু স্বামীর কাছে অপমানিত হওয়ার পর একলা হয়ে যে বিবাহিত পুরুষকে মণিকা ভালোবেসেছিল, তাকে তিনি চিরকাল মনের কোঠায় জীবন্ত রাখবেন। মণিকা জিজ্ঞাসা করলেন, 'মনোজ, মাত্র জনাদশেক মানুষকে নিমন্ত্রণ করব আমার বিয়ের পার্টিতে। তোমাকে ইচ্ছে করে বাদ দিয়েছি।'

'ধন্যবাদ।' মনোজ বলল।

মণিকা বললেন, 'কতদিন আছেন আমেরিকায়?'

'জানি না।'

'একটা অনুরোধ করব?'

'বলুন।'

'আপনার চিত্রনাট্যে শৈবালের সঙ্গে টিয়ার বিয়ে দিয়ে দেবেন।'

'সে কী। কেন?'

'টিয়া বেঁচে যাবে?' মণিকা হাসলেন, 'বাঙালি মেয়ে লাথি ঝাঁটা খেলেও ভালোবাসার মানুষের বুকে মাথা রাখলে যে সুখ পায় তা কোথাও পাবে না। আমার কথা রাখবেন আপনি?'

'ভাবব। এইটুকু বলতে পারি।'

মণিকা একটু বাদে বেরুবেন। ভাবী স্বামী, যিনি আমেরিকান, তাঁর সঙ্গে ডিনার করতে যাবেন। আমরা চুপচাপ নীচে নেমে এলাম। বিদায় নেওয়ার সময়েও মণিকা মনোজের সঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলেননি। বরং ওর স্ত্রী এবং বাচ্চাদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

নীচে নেমে আমি মনোজকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই ও বলল, 'এবার আপনি টিয়াকে বুঝতে পেয়েছেন নিশ্চয়ই। লিখতে অসুবিধে হবে?'

বললাম, 'না। কিন্তু মনোজ, সেই ভাগ্যবানটা কে?'

'আমি জানি না।' মনোজ জবাব দিল।

গাড়িতে ওঠার পর মনোজ আজ তেমন কথা বলছিল না। এর মধ্যে রাত বেড়েছে, নিউইয়র্কে অন্ধকার নেমেছে। মনোজ বলল, 'চলুন ম্যানহাটনে যাই।'

'বাড়িতে চিন্তা করবে না।'

'আমি ফোন করে দেব।'

সেই রাত্রে আমরা অকারণ শুধু রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরেছিলাম। কেন ঘুরছিলাম তা আজও আমার কাছে ব্যাখ্যাহীন। রাত দুটো নাগাদ মনোজ বলল, 'খুব তেষ্টা পেয়েছে। চলুন একটা ফ্যামিলি পাবে যাই।'

'ফ্যামিলি পাব?' শব্দ দুটো আমার কাছে নতুন।

'চার পাঁচটা ব্লকের মানুষ যে পাবে আড্ডা দেয় তার নাম ফ্যামিলি পাব। সবাই সবাইকে চেনে। আজ শুক্রবার। সবাই আড্ডা দিচ্ছে।'

মনোজ আমাকে যেখানে নিয়ে এল সেটা একটা লম্বাটে রেস্টুরেন্ট। লম্বা-লম্বা টুলে বসে আছে খদ্দেররা। টিভি চলছে। খুব শান্ত পরিবেশ। কাউন্টারের সামনে লম্বা টুলে আমরা বসলাম। বারম্যান এসে বলল, 'দিস ইজ চার্লি। তোমাদের কীভাবে সাহায্য করতে পারি?'

মনোজ বলল, 'আমাকে একটা কোক দাও আর আমার বন্ধুকে হুইস্কি।'

আমেরিকায় যারা গাড়ি চালায় তাদের মদ খাওয়া নিষেধ। ধরা পড়লে প্রচুর ফাইন। আমি বাঁ-দিকে তাকালাম। ঠিক আমার পাশের টুলে এক স্বর্ণকেশী কাউন্টারে মাথা রেখে ঝুম মেরে পড়ে রয়েছেন।

॥ ৮ ॥

মাতাল মহিলা বড় একটা দেখা যায় না চা-বাগানে মাইনের দিনে কিছু বৃদ্ধা মদেশিয়াকে অবশ্য দেখেছি হাঁড়িয়া খেয়ে টং হয়ে মদের ভাঁটি থেকে লাইনে ফিরে যেতে টলতে-টলতে। সেটা ছেলেবেলায় খুব স্বাভাবিক মনে হত। কলকাতায় যেসব বাঙালি মহিলা মদ্যপান করেন তাঁরা কখনওই মাতাল হন না। বড় জোর সামান্য টিপসি। আর হলেও হাতে গোনা যায়। আমার সৌভাগ্য হয়নি তাঁদের দর্শন পাওয়ার। রামচন্দ্র সেন বলতেন, 'বাপু হে, মেয়েদের পেটে ঈশ্বর শুধু লিভার রাখেননি। তার সঙ্গে রেখেছেন একটি ব্লটিং পেপার। সেটা যেমন সমস্ত দুঃখ কষ্ট শুষে নেয়, তেমনি অ্যালকোহলও। লংকা ছাড়া কোনও কিছুতেই সেই বস্তু ঘায়েল হয় না। মদ খেয়ে যে মেয়ে মাতালনী হবে সে

মেয়ে পদবাচ্যই নয়।' এ ব্যাপারে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁরা ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন কিন্তু কলকাতায় যেসব মহিলাদের আমি মদ খেতে দেখেছি তাঁরা মুখভঙ্গিতে লেবুর জল খাওয়ার চেহারাটা ধরে রাখতে পারেন।

কিন্তু এখন আমি হলফ করে বলতে পারি আমার পাশের টুলে যে স্বর্ণকেশী বসে থাকার চেষ্টা করছেন কাউন্টারে মাথা রেখে তিনি আর নিজের মধ্যে নেই। ওঁর মুখ আমি দেখতে পাচ্ছি না বিপরীত দিকে ফিরিয়ে রাখায়। কিন্তু শরীর নড়ছে না, পরনের স্কার্টে যে রঙের বাহার তাও যেন স্থির হয়ে রয়েছে। মাতালনীদের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা অনুচিত ভেবে আমি মনোজের সঙ্গে কথা বলছিলাম। আমরা যখনই কথা বলি তখন ঘুরে ফিরে চিত্রনাট্যের প্রসঙ্গ আসে।

আমি ওর উপন্যাসের ডালপালা ছেঁটে ছিমছাম নাটকে নিয়ে এসেছি গল্পটাকে। অনেক লেখক শুনেছি এ কারণে পরিচালকের ওপর খুব অসন্তুষ্ট হন কিন্তু চিত্রনাট্য যে ফিল্মের প্রয়োজনে লেখা হয়, সাহিত্যের কার্বনকপি নয়, এটা তাঁরা খেয়াল রাখেন না। মনোজ কিন্তু একটুও প্রতিবাদ করেননি। আমাদের বিতর্ক হচ্ছিল ছবির শেষ নিয়ে। আমরা একমত হচ্ছিলাম না।

হঠাৎ আমার বাঁ-দিকের কাধে মৃদু টোকা দিল কেউ। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম স্বর্ণকেশী সোজা হয়ে বসতে চেষ্টা করছেন। তাঁর কোমর থেকে উর্ধ্বাঙ্গ ফণাতোলা কেউটের মতো দুলছে। কিন্তু চোখ আধবোজা, এটুকুই ফারাক। কোনও সাহায্য দরকার ভেবে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইয়েস?'

উনি জড়ানো ইংরেজিতে শুধালেন, 'আপনি কি পাকিস্তানি?'

গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে মনোজের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললাম, 'সেরেছে।'

পরক্ষণেই দ্বিতীয়বার টোকা, 'দেন ইউ আর বাংলাদেশি!'

আমি একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, 'না ম্যাডাম, আমি ভারতীয়।'

'ইন্ডিয়া? ইন্ডিয়ান?' চোখ ছোট হয়ে এল মহিলার, 'হুইচ পার্ট অফ ইন্ডিয়া?' ভালো লাগল। এ তাহলে ভারতবর্ষের ম্যাপটা দেখেছে। খোঁজ খবর রাখে। বললাম 'ক্যালকাটা। ওয়েস্ট বেঙ্গল। নট বাংলাদেশ।'

এবার এক দৃষ্টিতে, যদিও সেই দৃষ্টি পূর্ণ নয়, দেখতে-দেখতে সামান্য দুলে তিনি প্রায় ফিসফিসিয়ে বললেন, 'আই হেট ইউ।'

আমার কানে যেন গরম জল ঢুকল। আমি কি ঠিক শুনেছি? মনোজের দিকে তাকালাম। সে পাবের দেওয়ালে টাঙানো টিভি দেখছে। অত আস্তে উচ্চারণ ওর পক্ষে শোনা সম্ভবও নয়। আমি স্বর্ণকেশীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'পার্ডন?'

হঠাৎ যেন সেই পাবের ভেতর এক ডজন গ্লাস ভাঙল। স্বর্ণকেশী তাঁর গলার শিরা ফুলিয়ে পরিষ্কার চিৎকার করলেন টেনে-টেনে, 'আই হেট ইউ।' মুহূর্তেই পাব-এর ভেতর ঠান্ডা নৈঃশব্দ নেমে এল। সূচ পড়লেও যেন শোনা যাবে। ততক্ষণে মনোজের হাত আমার কাঁধে চলে এসেছে, জিজ্ঞাসা করছে, কী হয়েছে? সমস্ত খদ্দেরদের নজর এখন আমাদের দিকে। আমি এখন যাকে বলে দিশেহারা। কী বলব বুঝতে পারছি না। একটা হিম আতঙ্ক এখন আক্রমণ করেছে আমাকে। আর যিনি ওই আর্ত চিৎকারটি করলেন তিনি এখন শঙ্খচূড়ের মতো দুলছেন চোখ বন্ধ করে। কপালে তখন আমার ঘাম জমেছে।

ইতিমধ্যে বারম্যান ছুটে এসেছে। ব্যাকুল গলায় সে জিজ্ঞাসা করছে, 'হোয়াট হ্যাপেন্ড? হেই ডোরা, হোয়াট হ্যাপেন্ড?' স্বর্ণকেশী কোনও জবাব দিলেন না। সেই একইভাবে দুলতে লাগলেন। এবার বারম্যান আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে? কী করেছ তুমি?'

আমি কোনওরকমে বোঝাতে চাইলাম, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এই মহিলাকে জীবনে দেখিনি। আমি কেন, ওর ঘৃণা পেতে যাব তাও জানি না।,'

বারম্যান এবার কথাটাকে অবিশ্বাস করেই, জিজ্ঞাসা করল, 'হেই ডোরা!' এবার স্বর্ণকেশী

ঠোঁট খুললেন, 'আই হেট হিম।' গলার স্বর তার মাঝারি পর্দায়।

'বাট হোয়াই? কী করেছে তোমার?' বারম্যান আরও ঝুঁকল কাউন্টারের ওপাশ থেকে।

'বিকজ হি ইজ ইন্ডিয়ান। বেঙ্গলি। ফ্রম ক্যালকাটা।'

'মাই গড। ডু ইউ নো হিম?'

'নো। বাট দ্যাট ডাজ নট ম্যাটার।'

এবার মনোজ মুখ খুলল, 'লুক। আমি জানতাম এটা খুব রেসপেক্টবল ফ্যামিলি পাব। এখানে একজন মহিলা সম্পূর্ণ বিনা কারণে এভাবে অপমান করবেন ভাবতে পারিনি। আমি কি তোমাদের কাছে এর ব্যাখ্যা চাইতে পারি?'

সঙ্গে-সঙ্গে বারম্যান ছুটে এল মনোজের সামনে, 'আই অ্যাম সরি। বাট শি ইজ ড্রাংক। কিন্তু ওর এই কাজটা আমি সমর্থন করছি না।' বলে আবার মহিলার সামনে ফিরে গিয়ে কড়া গলায় বলল, 'আমার খদ্দেরকে অপমান করার কোনও অধিকার তোমার নেই। এখনই এই পাব থেকে চলে যাও। কুইক।'

স্বর্ণকেশী চোখ খুলল না। কিন্তু বলল, 'না, আমি যাব না। আমি মদ খাব।'

'তুমি যদি না যাও তাহলে আমি ডোরম্যানকে ডাকব। ডোরা—'

মহিলা তবু উঠছেন না। বারম্যান তালি বাজাতেই স্বাস্থ্যবান দারোয়ান এগিয়ে এল আমাদের দিকে। হঠাৎ মেয়েটির মুখ দেখতে পেলাম আমি। মদ খেলে কেউ কেউ কাঁদে। কিন্তু মেয়েটির ঠোঁটে এত ঘৃণা কেন? মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিলাম। বললাম, 'উনি যদি এই ব্যবহার আর না করেন তাহলে ওকে চলে যেতে বাধ্য না করলেই খুশি হব।'

কথাটা শুনে বারম্যান যেন একটু স্বস্তি পেল। ইশারায় দারোয়ানকে চলে যেতে বলে আমার দিকে সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল, 'দিস ইজ চার্লি। ডোরাকে আমি বছরদুয়েক চিনি। পাশের ব্লকেই থাকে। খুব ঠান্ডা মেয়ে। আসে, ড্রিংক করে, চলে যায়, কোনওদিন ঝামেলা করেনি। আমি বুঝতে পারছি না আজ কী হল। লুক ডোরা, এঁরা খুবই ভদ্রলোক। তোমার সঙ্গে পালটা খারাপ ব্যবহার করল না। হ্যাভ এ নাইস টাইম।' বারম্যান চলে যেতেই পরে আবার স্বাভাবিক আবহাওয়া ফিরে এল। এবার আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম স্বর্ণকেশী ডোরা বিড়বিড় করে বলছে, 'কিন্তু আমি তবু ঘৃণা করি।' সঙ্গে-সঙ্গে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু কেন?'

'বিকজ ইউ আর বেঙ্গলি, ফ্রম ক্যালকাটা।' চোখ না খুলে জবাবটা দিলে ডোরা। এবার আমি গল্পের গন্ধ পেলাম। কলকাতার বাঙালি বলে মেয়েটা আমাকে ঘেন্না করছে। অর্থাৎ উপলক্ষ্য। হাত নেড়ে চার্লিকে ডাকলাম। চার্লি ছুটে এল। আর একটা ভোদকা উইদ টনিক নিজের জন্যে আর কোক বললাম মনোজের জন্যে। তারপর চার্লিকে বললাম, 'ডোরাকে বলো সে কিছু খাবে কি না, আমার খরচে অবশ্যই।'

চার্লি মানুষটি দেখলাম মজার। এক চোখ টিপে হেসে চাপা গলায় বলল, 'ওর যা অবস্থা তাতে আর খাওয়ালে তোমাকে ক্যারি করতে হবে।'

ডোরা সম্ভবত কথাগুলো শুনতে পেল না কারণ সে সমানে দুলে যাচ্ছে। পান করতে-করতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মনে হচ্ছে তুমি কোনও বাঙালিকে চেনো?'

'ইয়েস। অবশ্যই চিনি। চিনি বলেই তো ঘেন্না করি।' ডোরা তখন চোখ খুলছিল না।

'কী নাম তার?' কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছিল।

'নাম? সেন। পি সেন।'

সেই মুহূর্তে পি সেন নামক এক বঙ্গসন্তানের জন্য খুব দুঃখিত হলাম। তিনি কী এমন কাণ্ড করেছেন যে তামাম বাঙালি জাতির উদ্দেশ্যে ডোরা ঘেন্না বর্ষণ করছে। পি থেকে তো অনেক কিছু হতে পারে। পি সেন নামে একজন মানুষকেও তো ইদানীং আমি চিনি না। আমি আরও খবরের

আশায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'মিঃ পি সেন কী করেন?'

'কী আবার করবে। আমার সঙ্গে চাকরি করত। ইউ-এন-এ।'

মনোজ এতক্ষণ আমাদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করছিল। এবার বলল, 'সমরেশ আপনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একজন কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলছেন।'

মাথা নেড়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'করত মানে? এখন করে না?'

'নাঃ। সেন দেশে ফিরে গেছে। আশ্চর্য। আমি কলকাতায় গিয়েও একদিনেও ওকে বের করতে পারলাম না। আই হেট হিম,' ডোরা চোখ খুলল, 'এই যে মশাই। এসব কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন? আমি কোনও বাঙালির সঙ্গে কথা বলি না।'

'মদ পেটে পড়লে পৃথিবীর সবদেশের মানুষ এক হয়ে যায়, জানেন না?'

'হয়? সত্যি?' খুব সন্দেহের চোখে তাকাল ডোরা।

মনোজ মাথা নাড়ল। তারপর মার্কিন ইংরেজিতে বলল, 'এটা পুরোনো প্রবাদ।'

'অ। তাহলে ঠিক আছে। আমরা কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি। তোমরা অবশ্য মুডটাই নষ্ট করে দিয়েছ।'

'আপনি কলকাতায় গিয়েছিলেন?'

'বললাম তো। বারো ঘণ্টা ছিলাম।'

'মিস্টার সেনকে খুঁজতে?'

মাথা নাড়ল ডোরা। জানি না কতক্ষণ সময় লেগেছিল তবে ফ্যামিলি পাব বন্ধ হয় ভোর চারটে নাগাদ। সেই বন্ধ হওয়ার সময় এলে চার্লি যখন বলেছিল, বড্ড ঘুম পাচ্ছে হে, তোমরা এবার বাড়ি যাও তখন কথা থামাতে হয়েছিল। শেষের দিকে ডোরার নেশা ফিকে হয়ে এসেছিল। সব কথা এক সঙ্গে শুনতে পাইনি। বারংবার জিজ্ঞাসা করে যেটুকু জেনেছি তা হল এইরকম।

ডোরা চাকরি করে ইউনাইটেড নেশনসে। বয় ফ্রেন্ড ছিল কিন্তু তারা কেউ স্বামী হওয়ার যোগ্য নয়। এই সময় একটি ভারতীয় ছেলে যার নাম পি সেন এল ওদের অফিসে। হ্যান্ডসাম, অন্তত ছ'ফুট লম্বা। ব্যবহার খুব ভালো। হেসে কথা বলে। প্রথমদিন আলাপেই ওকে খুব ভালো লেগে গেল ডোরার। মাঝে-মাঝে ক্যান্টিনে একসঙ্গে লাঞ্চ করত। তারপর মাসতিনেকের মাথায় পরপর দু-দিন স্বপ্ন দেখলে সে। সেন তার সঙ্গে স্বামী হিসেবে বাস করছে। ওর মনে হল বিয়ে যদি করতেই হয় তো এমন মানুষকেই করা উচিত। কিন্তু তখনও প্রেমের কথা বলেনি ওরা। ডোরা লাঞ্চের সময়, অফিস থেকে বেরুবার সময় ওকে ঠারেঠুরে ইঙ্গিত করতে লাগল। সে শুনেছিল ভারতবর্ষের মানুষেরা এখনও বউকে দরজা বন্ধ করে চুমু খায়। তাই সেন সেই সব ইঙ্গিতে সাড়া না দেওয়ায় খুব অবাক হয়নি। তবে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে আপত্তি করেনি।

এক উইক-এন্ডে সেনকে নেমন্তন্ন করল তার ফ্ল্যাটে। ডিনার খাওয়াবে। খুব পরিশ্রম ও যত্ন করে রান্নাবান্না করে চমৎকার সেজেগুজে নিল। সেন এল ঠিক সময়ে। ডোরা ভেবেছিল সেন ফুল নিয়ে আসবে, আসেনি। বসার ঘরে বসে কথা বলতে-বলতে ডোরা ঠিক করল ডিনারের পর সে সেনের কাছে প্রস্তাব দেবে বিয়ের, কিন্তু ডিনারের দেরি ছিল। অতএব ডোরা সেনকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী খাবে বলো?'

সেন খুব বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিল, 'যা তোমার ইচ্ছে!'

ডোরা বলল, 'না, তুমি কী খাবে?'

সেন আবার জবাব দিল, 'যা দেবে।'

ডোরা একটু বিরক্ত হল, বলল, 'আমার কিচেনে কফি চা আছে। এনি সফট ড্রিংকস দিতে পারি। আর হুইস্কি এবং ভোদকা পাবে; রাম অল্প একটু। কী খাবে?'

সেন আরও নির্লিপ্ত গলায় বলেছিল, 'যা তোমার ইচ্ছে তাই দাও।'

ডোরা উঠে এসেছিল। মনে-মনে বিরক্ত হয়েছিল। একটা পুরুষ মানুষের কোনও পছন্দ নেই? অন্তত খাওয়ার ব্যাপারে? বলতে পারত না কফি দাও অথবা হুইস্কি! সে ইচ্ছে করেই ট্রেতে তার বাড়িতে যা ছিল তা সাজিয়ে সেনের সামনে নিয়ে এসে বলেছিল, 'আমার ইচ্ছে এসব তুমি খাবে।'

সেন অবাক হয়ে বলছিল, 'এইসব আমাকে খেতে হবে?'

জেদে মাথা নেড়েছিল, 'হ্যাঁ, সব।'

তারপর অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটল। সেন এক-এক করে সবক'টা কাপ আর গ্লাস খালি করল। প্রতিবাদ করতে গিয়েও করেনি ডোরা। তারপর সেন বলেছিল। আমার একটু অস্বস্তি হচ্ছে, কোথাও শুতে পারি। নিজের বেডরুমটা দেখিয়ে দিয়েছিল ডোরা। সেখানে জুতো খুলে শুয়ে পড়েছিল সেন। ডোরা বাইরের ঘরে ফিরে এসেছিল। ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল হয়তো কিন্তু তার স্বামীর নিজস্ব পছন্দ থাকবে। সে তা-ই চেয়েছিল সেনের কাছে। একটু বাদে ডিনার দেওয়ার সময় ওই কথা বুঝিয়ে বলা যাবে। জেগেছিল যতক্ষণ ততক্ষণ ডোরা ঘরে গিয়ে দেখে এসেছে অকাতরে ঘুমাচ্ছে সেন। মায়া হয়েছিল বলে ডাকেনি। শেষ পর্যন্ত নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছিল বাইরের ঘরের সোফায়। ঘুম ভাঙল যখন তখন ঘড়িতে সাতটা। ধড়মড় করে উঠে বসে ডোরা দেখল সামনে একটা চিরকুট অ্যাসট্রে চাপা দেওয়া রয়েছে, সেন নেই। চিরকুটে লেখা ছিল, 'তোমার আতিথেয়তার জন্যে ধন্যবাদ।' রাগে অপমানে কেঁদে ফেলেছিল ডোরা।

পরপর দুদিন অফিসে আসেনি সেন। এল যখন এমন ভঙ্গি করত যেন ডোরাকে চেনে না। একদিন করিডোরে ধরেছিল সে ওকে, জিজ্ঞাসা করেছিল, 'সেদিন না বলে চলে এলে কেন?' সেন জবাব দিয়েছিল, 'তুমি ঘুমোচ্ছিলে তাই বিরক্ত করিনি।'

'তোমার কোনও নিজস্ব পছন্দ নেই?'

সেন হেসেছিল, 'না। নেই।'

সেদিন থেকে আর কথা বলেনি ডোরা। যে মানুষের পছন্দবোধ নেই সে আর যাই হোক সভ্য মানুষ নয়। সেন সম্পর্কে সে এমন বীতস্পৃহ হয়েছিল যে ওর খবরই রাখত না। সেন যে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ইন্ডিয়ায় ফিরে গিয়েছে তা অবশ্য জেনেছিল। যে কোনও ভারতীয় কারও বাড়িতে গিয়ে মুখ ফুটে পছন্দ জানায় না। কারণ সে যে জিনিসটা চাইবে তা নাও থাকতে পারে গৃহকর্তার। তাই তিনি তাঁর সাধ্যমতো যা দেবেন তাই গ্রহণ করে অতিথি। কিন্তু সেনকে সে জানিয়ে দিয়েছিল তার কাছে কী কী মজুত ছিল। তা থেকে একটা পছন্দ করে নিতে পারত সেন। তবু বুকের মধ্যে একটা কাঁটা বিঁধত ডোরার। এর বেশ কিছুদিন পরে অফিসের কাজে সিঙ্গাপুর যেতে হয়েছিল ওদের একটা দলকে। ফেরার সময় ডোরা ইচ্ছে করে কলকাতায় একদিনের স্টপ ওভার নিয়েছিল। থেমে-থেমে ডোরা যে ভাষায় ওর অভিজ্ঞতা বলেছিল তা হল অনেকটা এইরকম।

এয়ারপোর্ট থেকে খোঁজখবর নিয়ে ক্যালকাটার একদম হার্টের হোটেলে গিয়ে উঠেছিলাম। খুব বড় নয়, মিউজিয়াম ছিল পাশেই কিন্তু নট ব্যাড। আমি হোটেলের রিসেপশনে সেনের ঠিকানাটা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ওকে কী করে পাব? রিসেপশন বলল এলাকাটা এত দূরে যে আমার একার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। ওরা আমাকে বলল, হোটেলেই অপেক্ষা করতে, টেলিফোনে যোগাযোগ করবে। সেই বিকেলের ফ্লাইটেই আমার কলকাতা ছাড়ার কথা। পনেরো মিনিট অন্তর ঘর থেকে রিসেপশনকে ইন্টারকমে জিজ্ঞাসা করছি, 'সেনের লাইন কী হল?' প্রতিবার ওরা বলছে, লাইন পাওয়া যাচ্ছে না, হয় এনগেজড নয় অন্যকিছু। শেষ পর্যন্ত আমি রেগে বললাম, আপনারা টেলিফোন কোম্পানিকে কমপ্লেন করে বলুন লাইনটা পাওয়া জরুরি। রিসেপশন বলল তাতে কোনও লাভ হবে না ম্যাডাম। ক্যালকাটা টেলিফোনস এইরকমই। দুপুরে হঠাৎ গরম শুরু হল। ঘরে থাকতে পারলাম না। কারণ জানতে চাইলে রিসেপশন বলল, লোডশেডিং শুরু হয়েছে ম্যাডাম। পাওয়ার কাট। এখন এদিকে কোনও আলো জ্বলবে না, পাখাও ঘুরবে না। আঁতকে উঠলাম, 'সে কী! তোমরা

এসব মেনে নিয়েছ? কেস করা উচিত।' রিসেপশন এমনভাবে হাসল যেন আমি পাগল। বলল, 'এখানে এইরকমই হয়ে থাকে ম্যাডাম। বরং এখানে আমাদের জেনারেটার চলছে, আরাম করে বসুন। আর হ্যাঁ, আপনার ওই টেলিফোনের লাইন পাওয়া যাচ্ছে না। অন্তত একশো বার ডায়াল ঘুরিয়েছি।'

সুতরাং আমি ঠিক করালাম, আর নয়, এয়ারপোর্টে ফিরে যাব। আমার সঙ্গীরা নিউ দিল্লিতে অপেক্ষ করছে। হোটেল থেকেই ট্যাক্সি ঠিক করল। কিন্তু একটু এগিয়েই ওই গরমে দাঁড়িয়ে গেল। ড্রাইভার বলল, সামনে মিছিল যাচ্ছে। দেখলাম হাজার-হাজার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায় চুপচাপ। যেন কারও কোনও কাজ নেই। আর পিঁপড়ের মতো মানুষেরা রাস্তা আটকে যাচ্ছে চিৎকার করতে-করতে। প্রায় একঘণ্টা ওইভাবে রইলাম। ট্যাক্সির মিটার উঠছে। ভয় হচ্ছিল সাত তাড়াতাড়ি বেরিয়েও শেষ পর্যন্ত ফ্লাইট না মিস করি। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলাম। 'এসব কী ব্যাপার, তোমরা কেন প্রতিবাদ করছ না? কত মানুষ এখন বিপদে পড়ে যাবে!'

ড্রাইভার হেসে বলেছিল, 'এখানে এইরকমই হয়ে থাকে ম্যাডাম।' প্রায় শেষ মুহূর্তে এয়ারপোর্টে পৌঁছোতে পেরেছিল ডোরা। গল্প শেষ করে সে বলেছিল, 'তোমরা বাঙালি ইন্ডিয়ান, তোমাদের কোনও পছন্দ করার শক্তি নেই, তোমাদের প্রতিবাদ করার মেরুদণ্ড পর্যন্ত নেই। তোমরা সবসময় আত্মসমর্পণ করো। অতএব তোমাদের ঘৃণা করে আমি কিছু অন্যায় করেছি বলে মনে হয় না।'

ডোরা আমাদের সঙ্গে বেরুল না। চার্লি আর এক ভদ্রলোককে অনুরোধ করল ওকে পৌঁছে দিতে। চার্লি বলল, জেন্টলমেন, তোমাদের আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এই উইকটা আমার রাত্রে ডিউটি। ইচ্ছে হলে চলে এসো।'

নিউইয়র্কের ভোর হতে তখনও দেরি। রাস্তার আলোগুলো ইতিমধ্যে হলদে হয়ে গিয়েছে। মনোজের পাশে বসে নিউইয়র্কের আর একপ্রান্তে ফেরার সময় আমার মনে তেমন কোনও অপমানবোধ কাজ করছিল না। বাঙালি হিসেবে ঘৃণিত হয়েও নয়। কারণ, ইতিমধ্যে আমরা জেনে গেছি সভ্য মানুষের জন্যে নিম্নতম যে স্বাচ্ছন্দ্য আমাদের পাওনা তা পাওয়ার যোগ্যতা আমরা অর্জন করিনি। পাশ্চাত্যের মানুষরা নিজেদের হিসেবমতো আমাদের সঙ্গে চললে হোঁচট খাবেনই।

ওয়াশিংটনে যাওয়ার দিন ঘনিয়ে আসছিল। সরকারি কর্তারা মনোজের ঠিকানায় টেলিফোন করে জানিয়েছেন নির্দিষ্ট দিনে আমি যেন ওখানে হাজির হই। নিউইয়র্ককে চার রাতে যত দেখেছি দিনে তার এক দশমাংশ দেখিনি। চিত্রনাট্যের কাজ প্রায় শেষ। এই সময় বোস্টন থেকে ফুয়াদ এলো। সঙ্গে একজন সাদা চামড়ার লোক। রোগা উজ্জ্বল চেহারার বাংলাদেশি তরুণ ফুয়াদ চৌধুরী কথা বলে ধীরে। বলল, কামাল ভাই আপনাদের কথা আমাকে বলেছেন। আমি বোস্টনের কলেজে ফিল্ম পড়াই। কিন্তু আমারও অনেকদিনের বাসনা এখানে একটা বাংলা ছবি করি। আপনাদের কাহিনিটা কী?'

মোটামুটি বুঝিয়ে বলা হল। দেখলাম বেশ উত্তেজিত ফুয়াদ। বলল, 'রাজি। তবে একটা কথা। আপনারা বাংলাদেশের কয়েকজন শিল্পীকে ডাকুন। ইন্ডিয়া বাংলাদেশ মিলে শিল্পী হলে দুটো সুবিধা। বাংলাদেশি সরকারের যে আইন তাতে আটকাবে না ছবি ওখানে দেখানোর। আর ইন্ডিয়াতে মানুষেরা পরিচিত শিল্পীদের দেখতে পাবে।' এই কথা বলে ফুয়াদ সঙ্গীর সঙ্গে ভালো আলাপ করিয়ে দিল। বছর তিরিশের যুবকটির নাম 'সাইমন স্কট।' বাড়ি কানাডার টরেন্টোয়। সেখানে অ্যাসিস্টেন্ট ক্যামেরাম্যান হিসেবে কাজ করে। বলল, 'কানাডায় পুরো দায়িত্ব পাওয়া অসম্ভব। সেখানে পুরোনোরা যদ্দিন না অবসর নিচ্ছে তদ্দিন কেউ বিশ্বাস করে কাজ দেবে না। ফুয়াদের কাছে আমি তোমাদের পরিকল্পনার কিছুটা শুনেছি। আমি সাজেস্ট করছি ছবিটা তোমরা কানাডায় করো।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এতে কী লাভ হবে আমাদের?'

সাইমন বলল, 'কানাডায় কোনও নাগরিক যদি ছবির প্রযোজনায় টাকা লগ্নি করে তাহলে সেই টাকার ওপরে শতকরা দুশো ভাগ ট্যাক্স মকুব।'

'দুশো ভাগ মানে?'

'পরপর দু-বছর, একশো ভাগ করে।'

মনোজ বলল, 'কানাডিয়ান প্রয়োজক পাব কী করে। এখানে আমরা বন্ধুবান্ধবদের কাছে টাকা তুলছি। কানাডায় তো সেরকম কেউ নেই।'

সাইমন হাসল, 'ব্যাপারটা কঠিন নয়। আমার পরিচিত অনেক কানাডিয়ান আছেন যাদের স্টেটসে বিজনেস আছে। তোমরা তাকে টাকা দিয়ে দেবে। সে ওখানে তার হোয়াইট টাকা ছবিতে ঢেলে ট্যাক্স মুকুব করে নেবে।'

'কিন্তু এর ফলে তো ভদ্রলোকই প্রোডিউসার হয়ে যাবেন।'

'নট দ্যাট। তোমরা যে টাকা ওকে এখানে দেবে তার বদলে উনি ছবির ইন্টারন্যাশনাল রাইট তোমাদের লিখে দেবেন। ভদ্রলোকের লাভ ট্যাক্স বেঁচে যাওয়া।' মনোজের আপত্তি ছিল প্রস্তাব মানতে। কারণ নিউইয়র্ক আর টরেন্টোর চেহারা এবং মানুষজন এক নয়। গল্প নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সাইমন যদি তার নিজস্ব ক্যামেরার কাজ আমাদের দেখায় তাহলে ওকে একটা সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। ফুয়াদ ছবিটির টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসার হিসেবে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। সময় বেশি নেই। আগামী বছর ছবিটির কাজ শুরু করা হবে। সাইমন জানাল নিউইয়র্কের ফিল্ম টেকনিশিয়ান গিল্ড খুব শক্তিশালী। ওদের লোক নিয়ে কাজ না করলে স্যুটিং বন্ধ করে দিতে পারে। মনোজ বলল, 'ব্যাপারটা জানি। কিন্তু গিল্ডের একজন প্রোডাকসন বয়ের আট ঘণ্টার মজুরি ছয়শো ভারতীয় টাকা। এতে হলিউডে ছবি হয়। কিন্তু দশ লাখ টাকার ছবি হয় না। আমার ছবির বাজেট জানিয়ে ওদের সেক্রেটারিকে চিঠি দিয়েছিলাম। মনে হয় আলোচনা করে এ ব্যাপারে একটা কিছু সুরাহা হবে।'

সেই দুপুরটা আমরা এমন মশগুল ছিলাম যে মনে হচ্ছিল ছবি শুরু হয়ে গেল বলে। ফুয়াদ আর সাইমন যাওয়ার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল এখন থেকে প্রতিমাসে একবার করে মিটিং-এ বসবে। আমার কাজ দেশে ফিরে গিয়ে ওখানকার ব্যবস্থা করা। স্যুটিং-এর আগে টিম নিয়ে আবার নিউইয়র্কে আসতে হবে আমাকে।

সেদিন বিকেলে মনোজ একটা ফোন পেল। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর সে টেলিফোন ছেড়ে বলল, 'সমরেশ চলুন, মনে হচ্ছে টাকা পয়সার প্রব্লেম সলভ হয়ে যাবে।'

'কী রকম?' আমি হেসে বলেছিলাম, 'আপনার তো কোনও প্রব্লেম ছিল বলে জানি না।'

'না-না। আসলে ডকুমেন্টারি করে কিছু তো ঢুকিয়েছি। তাই নিউইয়র্কের পরিচিতদের কাছে আবেদন করেছিলাম যদি তাঁদের কেউ প্রোডিউস করেন। এখানে টাকা আছে একমাত্র ডাক্তারদের। বাঙালি ডাক্তার কম নেই। চলুন। মনোজ চটপট তৈরি হয়ে নিল, 'কেউ না করলে আমি নিজেই করব। আমি কখনও হার স্বীকার করি না।'

মনোজ আমাকে বলেনি কার কাছে নিয়ে যাচ্ছে। শহরের অন্য প্রান্তের যে পাড়ায় আমাদের গাড়ি ঢুকল তার চেহারা দেখেই মালুম হল জব্বর বড়লোকরাই এ তল্লাটে বাস করেন। বাড়িগুলো যেমন তার চারপাশের লন এবং বাগানও দ্রষ্টব্য। নির্জন এক গেটের সামনে দাঁড়াতেই জেমস বন্ডের ছবির মতো গেটের ভেতর লুকিয়ে রাখা একটি যন্ত্র জানতে চাইল, আমরা কারা? মনোজ গলা তুলে নিজের পরিচয় দিতেই গেটটা খুলে গেল। বিশাল লন ধাপে-ধাপে ওপরে উঠে গেছে। কোনও মানুষের চিহ্ন নেই। আমরা ঢোকামাত্র গেট বন্ধ হয়ে গেল। পাহাড়ি পথ বেয়ে বাড়িটার সামনে উপস্থিত হলাম। দরজাটা খুলে গেল দুপাশে সরে গিয়ে। ভেতরে পা দিতেই মেঝেটা আমাদের নিয়ে ওপরে উঠতে লাগল লিফটের মতো। অবাক হয়ে মনোজকে জিজ্ঞাসা করলাম। ব্যাপারটা কী?' মনোজ হাসল, 'ধনীদের নিরাপত্তা দরকার। তা ছাড়া লোকাভাবও এভাবে সমাধান করা যায়। ওপরে উঠে দেখলাম এক দক্ষিণী ভদ্রলোক তাঁর পোশাকে অপেক্ষা করছেন। আমাদের দেখে সবিনয়ে ভেতরে

নিয়ে গিয়ে বসালেন। সোফা বা চেয়ার নয়, মাটিতে গদি ও তাকিয়ার ব্যবস্থা। ভদ্রলোক ইংরেজিতে জানিয়ে গেলেন, ম্যাডাম এখনই আসবেন। আমি দেখলাম এই ঘরে বৈভবের বাড়াবাড়ি নেই। মনোজ জানাল, 'এই মহিলার স্বামী বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন। ডলারে কোটিপতি বললে কম বলা হবে। ষাট বছর বয়সে হঠাৎই হৃদয়যন্ত্র বন্ধ হয়ে মারা যান। একটিমাত্র ছেলে ওদের।'

এই সময়ে মহিলা এলেন। ফরসা, স্থূলকায়া প্রৌঢ়া শাড়ি পরেছেন কালো রঙের এবং তা বয়স হলেও চামড়াকে উজ্জ্বল করেছে। মাথার চুলে কিঞ্চিৎ সাদা ছোঁওয়া। হেসে বললেন, 'মনোজ আমি ভেবেছিলাম তুমিই ফোন করবে। কী খবর, কতদূর এগোল?' কথা হচ্ছিল ইংরেজিতে। মনোজ বলল, 'চিত্রনাট্যের কাজ শেষ। ইনি সমরেশ, কলকাতার লেখক, ইনিই লিখেছেন।'

'ভালো, কিন্তু এক লক্ষ ডলারে ছবি করবে কী করে? তোমাকে পরে বাজেট বাড়াতেই হবে।'

'আমি তো আপনাকে সম্ভাব্য খরচের একটা লিস্ট দিয়েছি।'

'দেখেছি। আমার মনে হয়েছে অন্তত দেড় থেকে পৌনে দু-লক্ষ ডলার দরকার হবে। তুমি বাজেটটা একবার রিভাইজ করো।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার বন্ধু ছবি করবে কাউকে টাকা না দিয়ে। আর বোম্বে থেকে ডাইরেক্টররা এসে আমাকে বাজেট দেয় দশ লক্ষ ডলারের। সিমি গারোয়াল যে ছবিটা করেছে তার বাজেট অনেক বেশি। যা হোক, আমি ছবিটা প্রোডিউস করতে পারি। কিন্তু মনোজ, তুমি স্ক্রিপ্টের একটা ইংরেজি ট্রানস্লেসান আমাকে দেবে। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস সোমই তো ছবির মূল চরিত্র?'

শেষ প্রশ্নটা আমার দিকে তাকিয়ে। বললেন, 'সেই সঙ্গে ওদের ছোট মেয়ে।'

'ও হ্যাঁ, তাইতো।' দেখুন বোম্বের অনেকেই আমাকে ছবি প্রোডিউস করতে বহুবার অনুরোধ করেছে। কিন্তু যে জগৎ ছেড়ে আমি এসেছি সেখানে ফিরে যাওয়ার কোনও ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু এই ছবির গল্প আমাকে আকর্ষণ করছে। মনোজ, আমি মিসেস সোম করতে চাই।'

'কিন্তু আপনি তো বাংলা বলতে পারবেন না।'

'আমি কিছু জানি। আমাকে তিন মাস সময় দাও, আমি পারব।'

মনোজ হাসল, 'দেখা যাক।' কিন্তু বুঝতে পারলাম সে আপস করতে রাজি নয়। ম্যাডাম বললেন, 'প্রবাল সোমের বয়স যা অশোককুমারকে মানায় না?'

'উনি করলে তো চমৎকার হত। তবে ওঁর বয়স হয়ে গেছে।'

'তুমি ওকে জানো না। মেকআপ নিলে অশোককুমার এখনও পঞ্চাশে নেমে আসবেন।' ম্যাডাম কথা শেষ করতে একটি যুবক ঘরে ঢুকল। ছিপছিপে লম্বা, চশমা চোখের ছেলেটিকে দেখে ভালো লাগল। সে মনোজকে দেখে বলল। 'হ্যালো, সেই ফিল্ম? আচ্ছা, তোমাদের ছবিটার গল্প বলো তো?'

ম্যাডাম বিরক্ত হলেন, 'তোমার কী দরকার? ডাক্তারি পড়ছ তাই পড়ো।'

ছেলেটি বলল, 'ও মাম, তুমি যা ছবি করেছ তা দেখে—। ইনফ্যাক্ট এত গাছের ডাল ধরে গান গাওয়া, পাহাড়ে দৌড়ানো, বৃষ্টিতে-বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে নাচ—হরিবল। এসব আছে তোমার ছবিতে?'

ছেলেটি বিদ্রূপের গলায় প্রশ্ন করল। তারপরে ঘটনা একটু অন্যরকম। মনোজ ওকে ছবির বিষয় বোঝাতে আরম্ভ করল। ভারতবর্ষের বাপেরা মেয়ের ওপর রেগে গেলে শুধু প্রহার করতেই জানেন জেনে ছেলেটি অবাক হল। সে স্বীকার করল মাত্র দুবার দেশে গিয়েছে। গল্পটি শুনতে-শুনতে সে ক্রমশ উত্তেজিত হচ্ছিল। ইতিমধ্যে ম্যাডাম উঠে গিয়েছেন। মনোজ থামলে ছেলেটি বলল, 'এই ছবিটা করা দরকার। আমেরিকান ইন্ডিয়ান সেকেন্ড জেনারেশকে ঠিক ধরেছ তুমি। আমরা না আমেরিকান না ইন্ডিয়ান। কিন্তু মাকে ও চরিত্রে নিও না। মা কোনওদিন নিম্নবিত্ত বউ-এর মন বুঝতে পারবে না। তা ছাড়া বাংলা বলবে খুব খারাপ। মা যদি টাকা না দেয় আমি দেব।'

মনোজ হাসল, 'দাঁড়াও, ভাবি একটু।'

ছেলেটি বলল, 'ভাবার কিছু নেই। মা চিরকাল গাছের ডাল ধরে গান গেয়েছে। আমি তোমার এই ছবির সঙ্গে যুক্ত হতে চাই।' বিদায় নেওয়ার সময় ম্যাডাম এলেন। মনোজ তাঁকে ইংরেজি অনুবাদ পাঠিয়ে দেবে বলে কথা দিল।

ফেরার পথে মনোজ জিজ্ঞাসা করল, 'ভদ্রমহিলাকে চিনতে পারলেন?'

বললাম, 'খুব চেনা লাগছিল, কিন্তু ঠিক প্লেস করতে পারছি না।'

মনোজ হাসল, 'দেহপট সনে নটি সকলি হারায়।' ইনি সেই বিখ্যাত দক্ষিণী নাচিয়ে ভগ্নীদের একজন। ফিল্মেও নাম করেছিলেন। রাজকাপুরের সঙ্গে। 'জিস দেশ মে গঙ্গা বহতি হ্যায়।' লাস্ট ছবি সম্ভবত 'মেরা নাম জোকার।'

ততক্ষণে আমি চেঁচিয়ে উঠেছি, 'পদ্মিনী? এত পালটে গিয়েছেন?'

॥ ৯ ॥

নিউইয়র্কে থাকার সময়টা হুহু করে ফুরিয়ে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে প্রচুর মানুষ দেখলাম এবং বাঙালিও। শনিবার রাত্রে তাঁরা এলেন। পরপর কয়েকটা গাড়ি এসে থামল মনোজের বাড়ির সামনে। প্রথমে ভবানী মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী আলোলিকা। ভবানীবাবু মিশুকে মানুষ। বড় চাকরি করেন। আলোলিকা কবিতা লেখেন। পরিবর্তন পত্রিকায় নিউইয়র্কের খবর পাঠান। মোটাসোটা, মিষ্টি ব্যবহারে চমৎকার। কলকাতার সাংস্কৃতিক জগতের হালফিল খবর ওঁর জানা। এলেন সুজয় আর শমিতা দাশগুপ্তা। সুজয় কথা বলেন টিপে-টিপে, অত্যন্ত মার্জিত ভঙ্গিতে। কয়েক মিনিটেই বোঝা যায় ভদ্রলোকের পড়াশোনা আছে ব্যাপক। শমিতা মিষ্টি চেহারায় ছিপছিপে সুন্দরী। হাসেন ভালো এবং সেটা বুঝেসুঝে। শমিতা কবিতা লেখেন। সুজয় অঙ্ক নিয়ে গদ্য লেখালেখি করেন। এল ধ্রুব কুণ্ডু। ওর নাম আমি শুনেছি কলকাতায়। বুধসন্ধ্যার নাটকে অভিনয় করেছে ধ্রুব। এবং ওই সংস্থার পরিচিত মানুষদের ঘনিষ্ঠ। বেশ ডানপিটে ধরনের, বেপরোয়া, রাত গভীর হলে এবং সঙ্গে মহিলা না থাকলে দুঃসাহসী হয়ে ওঠেন এই পরিচয় পরে আমরা পেয়েছিলাম। ধ্রুব কথা বলেন বেশি। প্রথম প্রথম একটু কায়দা করার চেষ্টা থাকে ওঁরা কথাবার্তায়, পরে নিছক আড্ডাবাজ হয়ে যান। ওর স্ত্রী দারুণ সেজেগুজে একটি গম্ভীর পুতুলের মতো বসেছিলেন একপাশে। ঘণ্টাতিনেকের আড্ডায় কথা বলেছেন তিনটের বেশি নয়। কিন্তু ওঁর দেখে আমার একবারেও মনে হয়নি চুপ করে থাকাটাই ওঁর স্বভাব। মানুষের মন তো নানান কারণে খারাপ থাকে। এবং সবশেষে এল ফরিদা।

ফরিদাকে যে নিমন্ত্রণ করেছে মনোজ তা আমাকে বলেনি। কলিং বেলের আওয়াজ পেয়ে মনোজের স্ত্রী দরজা খুলেছিল। আমি ফরিদার গলা পেলাম, 'উঃ টিউব থেকে নেমে হাঁটছি তো হাঁটছি। আপনি মিসেস ভৌমিক? আমি ফরিদা। এখন থেকে তুমি বলব, কেমন?'

ঘরে ঢুকে আমাদের দিকে তাকিয়ে ষোড়শীর মতো সলজ্জ হাসলেন ফরিদা। মনোজ সবার সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিল। এবার ফরিদার নজর পড়ল আমার ওপর, 'এ কী অবিচার সমরেশ। আমি তোমার জন্যে যাকে বলে চাতকের মতো পথ চেয়ে থাকি রোজ আর তুমি আমাকে ভুলেই গেছ?'

বুঝতে পারলাম সব কয়টি মুখ আমার দিকে ফিরল। হালকা করার জন্যে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কবিতা কেমন চলছে?'

'আমি লিখে যাব। মৃত্যু পর্যন্ত। তোমাদের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় না ছাপলে না ছাপুক।' ফরিদা হাসল। আলোলিকা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কবিতা লেখেন?'

ফরিদা বলল, 'একশোবার লিখি। এই এক গ্লাস পানি দাও তো।' শেষটা মনোজের স্ত্রীর উদ্দেশ্যে। আমি হেসে বললাম, 'পানিটা জিভে আটকে আছে না?'

ফরিদা মাথা নাড়ল, 'থাকবেই তো। মুসলমানের মেয়ে।'

বেশ বুঝতে পারলাম ফরিদা আসার পর আমাদের আড্ডার সুর কেটেছে। সবাই কেমন অস্বচ্ছন্দ। ভবানী একমাত্র কথা চালাচ্ছিলেন। মদ্যপান এবং খাওয়াদাওয়া চলছিল নীরবে। এর মধ্যে ফরিদা অনুমতি নিয়ে সিগারেট ধরিয়েছেন। ভবানী বললেন, 'ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি পুরুষ না নারী এই বিতর্কের শেষ হবে না।'

সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েরা বলে উঠলেন, 'শ্রেষ্ঠ হয়ে লাভ কী, ঈশ্বর যা কিছু সুবিধা তা দিয়েছেন ছেলেদের। পরজন্মে যেন ছেলে হয়ে জন্মাই।

ভবানী বললেন, 'সব মেয়ে যদি ছেলে হয়ে জন্মায়, তাহলে পৃথিবীর অবস্থা কী হবে।'

ফরিদা এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। এবার সিগারেট নিভিয়ে বললেন, 'কিন্তু কোনও কোনও পুরুষ নারী হয়ে জন্মাতেই চেয়েছেন।'

ভবানী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কীরকম?'

লজ্জা-লজ্জা মুখ করে ফরিদা বললেন, 'একটু শ্ল্যাং হয়ে যাবে। অবশ্য এ আপনাদের পৌরাণিক গল্প। আমি বানিয়ে বলছি না। রাজার নাম ভুলে গিয়েছি। ভদ্রলোকের ছেলেপুলে ছিল না। বরুণের পুজো করে তিনি একশো পুত্রের পিতা হলেন। তাই দেখে ইন্দ্র গেলেন ক্ষেপে। তিনি রাজাকে জব্দ করতে চাইলেন। একদিন মৃগয়া করতে-করতে ক্লান্ত রাজা এক সরোবর দেখে সেখানে স্নান করতে গেলেন। ইন্দ্রের বদমায়েশিতে রাজা স্নান করে উঠে দেখলেন তিনি নারী হয়ে গেছেন। নারী রাজা মনের দুঃখ বনে গেলেন। সেখানে এক সন্ন্যাসীর কাছে থেকে গেলেন স্বামী-স্ত্রী হয়ে। তাতে তার একশো সন্তান হল। নারী রাজা সেই একশো ছেলেকে নিয়ে ফিরে গেলেন রাজধানীতে। প্রথম পক্ষের সঙ্গে দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেদের আলাপ করিয়ে দুশো জনের ওপর রাজ্যভার দিয়ে বনে ফিরে গেলেন তিনি। ইন্দ্র দেখলেন তার ষড়যন্ত্রের কোনও কাজ হচ্ছে না। তিনি দুশো ভাইবোনের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিলেন এমন যে তারা মারামারি করে মারা গেল। এবার ইন্দ্র দেখা দিলেন নারী রাজাকে। নারী রাজা তাঁর উপাসনা করলেন। সন্তুষ্ট ইন্দ্র বললেন, 'দুটো বর দেব। তার একটা হিসেবে তুমি যে-কোনও একশো ছেলের জীবন চাইতে পার।'

নারী রাজা বললেন, 'তাহলে আমার গর্ভে সন্ন্যাসীর ঔরসে যে একশো সন্তান তাদের ফিরিয়ে দিন।'

অবাক ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি তোমার ঔরসে জাত সন্তানদের চাও না?'

'প্রথমেই চাই না। কারণ মা হওয়ার আনন্দ আমি বুঝেছি।'

ইন্দ্র দ্বিতীয় বর চাইতে বললে নারী রাজা বললেন, 'পরজন্মে যেন নারী হিসেবে জন্মাই।'

'সে কী? কেন?' ইন্দ্র আরও অবাক।

নারী রাজা বললেন, 'পুরুষ হিসেবে যৌনসুখের স্বরূপ জেনেছি। কিন্তু নারী হিসেবে যা পেয়েছি তার তুলনা নেই।' গল্পটা বলে ফরিদা আমায় জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি পড়োনি?'

মাথা নেড়ে জানালাম পড়েছি। কিন্তু এই গল্প আড্ডাটা ভেঙে দিতে সাহায্য করল। মহিলারা যাওয়ার আগে বারংবার বলে গেলেন, 'আমেরিকা ঘুরে দেখে ফেরার আগে আমি যেন অবশ্যই তাদের বাড়িতে যাই।' মধ্যরাতে গাড়িগুলো যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন ফরিদা জনে-জনে জিজ্ঞাসা করছিল তারা কেউ ম্যানহাটনে যাবে কি না। ওদের রাস্তা উলটো জেনে বেচারা খুব নিরাশ হল। শেষ পর্যন্ত মনোজকে বলল সে, 'ফকির মানুষের অসুবিধে এই। রাত বেশি হয়ে গেলে বাড়ি ফিরতে পারে না। টিউব বন্ধ। আজ এখানেই থেকে যাই। তোমরা তো রাত জাগতে পারো। এসো গল্প করে রাত কাবার করি।'

মনোজের স্ত্রী বলল, 'এ কী কথা। রাত জাগবেন কেন? আপনাকে আমি আমার শাড়ি দিচ্ছি। চেঞ্জ করে নিয়ে শুয়ে পড়ুন। আমি এই ঘরে বিছানা করে দিচ্ছি।'

ফরিদা বলল, 'কিছু মনে কোরো না লক্ষ্মীবোন, আমি অন্যের শাড়ি পরতে পারি না। আমার বিছানা হল আজ রাতের জন্যে নীচের বাঞ্ছিত ঘরে। ফরিদা চলে গেল শুতে। মনোজের স্ত্রীও। আমরা দুজনে কথা বলছিলাম। মনোজ জিজ্ঞাসা করল, 'যাবেন নাকি চরতে?'

আমি বললাম, 'না। আজ ঘুমোব।'

এই সময় ফরিদা বেরিয়ে এল। পরনে শাড়ি নেই। আমার শালটা জড়িয়েছে ওপরে, পরনে পেটিকোট। এসে বলল, 'পুরুষ মানুষের গায়ের গন্ধে বিছানায় ঘুম আসল না।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'একী পোশাক?'

ফরিদা বিরক্ত হল, 'কেন? অন্যায় কী? আপনারা গেঞ্জি পাজামা লুঙ্গি পরে মেয়েদের সামনে বসতে পারেন আর আমরা পেটিকোট পরে থাকলেই দোষ? আমার পা পর্যন্ত ঢাকা না।'

একটু বাদেই আমরা সাহিত্য সঙ্গীত নিয়ে মশগুল হয়ে গেলাম। ফরিদা আমাদের কিছু গান শোনালেন। আইরিশ লোকগীতির সুরে বাংলা গান। গলাটি মিষ্টি তবে অনুশীলন নেই! এর ফাঁকে ছোট্ট একটা দৃশ্য দেখলাম। যেহেতু ফরিদার পেছনে ঘটেছিল তাই ওর জানা হল না—মনোজের স্ত্রী বেরিয়ে এসেছিল শোওয়ার ঘর থেকে। ফরিদার পোশাক দেখে বিরক্তিতে ওর মুখ বেঁকে গিয়েছিল। একটুও কথা না বলে সে ফিরে গিয়েছিল ঘরে। আমি বাজি রাখতে পারি অনেকক্ষণ সে ঘুমোয়নি। আমরা যখন শুতে গেলাম তখন রাত প্রায় শেষ।

অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোনো হল না। মনোজ এসে জানিয়ে দিল আমার টেলিফোন এসেছে। মাটির তলার ঘরে শুয়ে রিসিভার তুলে জানলাম ওয়াহিও থেকে কবি তনুশ্রী ভট্টাচার্য ফোন করছেন। ব্যাপারটা বেশ চমকপ্রদ। আমেরিকায় যেসব বঙ্গললনা আছেন তাঁদের দুই-তৃতীয়াংশ কবিতা লেখেন। তবে তনুশ্রী এঁদের সবার থেকে এগিয়ে। ওঁর কবিতা দেশে ছাপা হয়। তনুশ্রী বললেন, 'এসে অবধি নিউইয়র্কে বসে আছেন। কবে আসছেন ওয়াহিওতে। এসে দেখুন ভালো লাগবে। প্রচুর টিউলিপ ফুটেছে চারধারে।' তনুশ্রীর কবিতায় দেখেছি টিউলিপদের কথা থাকে খুব। ওকে জানালাম, সুযোগ পেলেই চলে যাব। ও আমাকে বলল, 'যেখানেই থাকুন মাঝে-মাঝে ফোন করবেন। পয়সা না থাকলে ক্ষতি নেই, বলবেন আমি দিয়ে দেব।' পরে জেনেছি এইভাবে ওদেশে টেলিফোন করা সম্ভব। রিসিভার তুলে নম্বর ঘুরিয়ে বলতে হয় যে আমার টেলিফোনের দামটা ওই নম্বর দেবে। অপারেটর সেই নম্বরে ডায়াল করে সম্মতি নিয়ে কানেকশন করে দেয়। পকেট খালি থাকলে ব্যবস্থাটা খুব উপকারে আসে।

সকালে মনোজের এদিন ঝামেলা ছিল। ফরিদা বলল, 'কী গুডি বয়ের মতো গাড়িতে চেপে শহর দেখে যাচ্ছেন। আমার সঙ্গে চলুন। হাঁটুন, টিউব নিন।'

মনোজের সঙ্গে কথা বলে ফরিদাকে নিয়ে বেরুলাম। বুঝলাম ওর স্ত্রীর ভালো লাগল না এটা। মনোজ বলেছিল বাড়ির পেছনের রাস্তায় গেলেই বাস পাওয়া যাবে পাবলিক ফোন থেকে আমায় ফোন করবেন। মিনিটতিনেকের মধ্যেই বাস পেলাম। কলকাতার প্রাইভেট কোম্পানির লাক্সারি বাসগুলো একে দেখে আর গর্বিত হবে না। ড্রাইভারের সামনে দিয়ে উঠে ফরিদা ব্যাগ খুলছিল। কোনও মহিলাকে ভাড়া দিতে দেওয়াটা আমার অভ্যেস নেই। অতএব কয়েন কুড়িয়ে বাড়িয়ে এক ডলার আশি সেন্ট গর্তে ফেললাম। এই ভাড়ায় বাসের শেষ স্টপ পর্যন্ত যাওয়া যাবে। কিন্তু কুড়ি টাকায় দুজনের বাসের টিকিট হচ্ছে। ভাবতেই মন খারাপ হয়ে গেল। পাশাপাশি বসে ফরিদাকে বলতেই ও খিলখিলিয়ে হেসে উঠল, 'টাকার হিসেব করছেন কেন? ধরে নিন এক টাকা আশি পয়সায় দুজনে শ্যামবাজার থেকে গড়িয়াহাট যাচ্ছি।'

'আপনি কলকাতায় শেষ কবে গিয়েছেন?'

'ঢাকা যাওয়ার পথেই যাই। দু-বছর আগে গিয়েছিলাম। তা ছাড়া কলকাতার বাসে মাঝ পথে উঠে এমন পাশাপাশি প্রেমিক-প্রেমিকার মতো বসতে পারতেন?'

আবার হাসল ফরিদা।

'আপনি চটপট বেশ কথা বলতে পারেন তো।'

'যদি বুঝতাম আপনি প্রেম করার জন্যে তৈরি তাহলে কি বলতে পারতাম?'

টিউব স্টেশনে ঢুকতেও মাথা পিছু নব্বুই সেন্ট। যথা ইচ্ছা তথা যাও। বলতে দ্বিধা নেই। নিউইয়র্কে তো বটেই পরে লন্ডন কিংবা প্যারিস টিউবে চেপে মনে হয়েছে আমাদের এই কলকাতার টিউব অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন, স্টেশনগুলো ঢের বেশি সুন্দর। মাটির তলায় দুবার ট্রেন পালটে আমরা ফরিদার কথামতো যেখানে উঠে এলাম সেটা নিউইয়র্কের এক প্রান্ত। ফরিদা জিজ্ঞাসা করল, 'বাড়ি ফিরতে পারবেন তো?'

আমার নিজেরই সংশয় ছিল। যে ব্যস্ততায় ট্রেন পালটানো হয়েছে তাতে স্টেশন না গুলিয়ে ফেলি। এখন কাজের সময়। নিউ ইয়র্কের অফিস যাত্রীরা আজ ছুটিতে। দিনের বেলায় বেশির ভাগ মানুষ শহরের প্রান্তে গাড়ি রেখে টিউবে চেপে শহরে আসেন। পার্কিং ফি বড্ড বেশি। ফুটপাতে লোকজন আছে। আছে হকারও। তবে তাদের মধ্যে নিগ্রোরাই বেশি। অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন দেখলে কতখানি খুশি হতেন জানি না। কারণ আজও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে কোনও নিগ্রো নির্বাচিত হয়নি। কিন্তু নিগ্রোদের প্রতাপ কম নয়। তারা যখন কাউকে বকে তখন মোটেই আঙ্কল টমের কথা মনে পড়ে না। ফরিদার বাড়িতে পৌঁছে মনে হল এখন ওর ওপর তলার ফ্ল্যাটে সময় না কাটিয়ে একটু ঘুরে ফিরে দেখা যাক। ফরিদার ক্লাস নেই আজ। কোনওমতে আবার আসব বলে বিদায় নিলাম ফুটপাতে দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ এলোমেলো হাঁটার পর চারপাশের সাহেব-মেমের ভিড় দেখে ক্রমশ বিরক্তি এল। এভাবে একা-একা কি হাঁটা যায়?

চওড়া ফুটপাতের শেষে একটা বাড়ির চাতালে বসে সিগারেট খাচ্ছিলাম। আমার সামনেই দুটি নারী পুরুষ পথ হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পরে পরস্পরকে চুম্বন করে যাচ্ছিল। পরস্পরকে আকাঙ্ক্ষা করার সবরকম নির্দশন ওরা রাখছিল। অথচ কেউ ওদের ঘুরেও দেখছে না এবং তখনই কাণ্ডটা ঘটল। একজন বৃদ্ধা দুই হাতে ভারী ব্যাগ নিয়ে আসছিলেন। এবং শুকনো ফুটপাতে তিনি বিদিকিচ্ছিরি আছাড় খেলেন। দিদিমার চোখ যুবক-যুবতীর ওপর ছিল কি না বলতে পারব না। কিন্তু মহিলা উঠতে পারছেন না। যন্ত্রণায় ছটফট করছেন ফুটপাথে শুয়ে। অথচ কেউ ওঁর দিকে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে যাচ্ছে না। ব্যস্ত মানুষেরা যাওয়ার সময় একবার চেয়ে দেখছে শুধু। প্রেমিক প্রেমিকারা এগিয়ে গিয়ে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করে চলে গেল।

কলকাতার অত্যন্ত ঘৃণ্য সমাজ-বিরোধীও এইরকম দৃশ্য দেখলে সাহায্য করতে ছুটে যায়। আমরা ভদ্রলোকরা গা বাঁচিয়ে তা দেখি। কিন্তু বৃদ্ধার বয়স আমাকে তৎপর করল। ওঁর কাছে গিয়ে নীচু হতেই ওপাশ থেকে এক নিগ্রো আমায় ডাকল। কাছে যেতেই বলল, 'তোমার আবেগ চেপে রাখো। ফোন করে দেওয়া হয়েছে। যাদের কাজ তারা করতে আসছে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু ওঁর কষ্ট হচ্ছে।'

'তুমি কি ডাক্তারি শাস্ত্রটা পড়েছ?'

'না।'

'তাহলে কোন অধিকারে ওর গায়ে হাত দিতে যাচ্ছ। ধরো, ওর একটা হাড় জখম হয়েছে, তুমি এমনভাবে তুললে যে সেটা সারাজীবনের জন্যে ভেঙে গেল। এ দেশে নতুন?'

উত্তর দেওয়ার আগেই অ্যাম্বুলেন্স এসে গেল। বৃদ্ধা বড়জোর মিনিটপাঁচেক ফুটপাথে শুয়েছিলেন। অ্যাম্বুলেন্সের লোকেরা ওঁকে সযত্নে তুলে নিয়ে গেল। নিগ্রো প্রৌঢ়টি বলল, 'কারও দুর্ঘটনা ঘটলে হাত লাগিয়ে সাহায্য করতে গিয়ে অপকারই করে ফেলা হয় অনেক সময়। কোত্থেকে আসছ তুমি?'

'ভারতবর্ষ। ওখানে এত তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্স আসত না।'

লোকটির সঙ্গে আমার জমে গেল। বিশাল চেহারার নিগ্রোটি কেরানির চাকরি করে। আজ ছুটি, সময় কাটাতে বেরিয়েছে। ওকে আমি ভারতীয় সিগারেট খাওয়ালাম। দুজনে গল্প করতে-করতে পথ হাঁটছি। ও আমার চেয়ে ঢের লম্বা। গল্পের বিষয়বস্তু মজার। ও জানতে চাইছিল ভারতবর্ষের মানুষরা কেন ইংরেজি বলে? কৌতূহল মিটিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় থাক? লোকটার নাম সিডনি। সিডনি বলল, 'হার্লেম।'

হার্লেমের কথা আমি জেনেছি অনেককাল। নিউইয়র্ক শহরের এক প্রান্তে নিগ্রোদের নিজস্ব এলাকার নাম ওটা। খুন-জখম অহরহ ঘটে। একদিন মনোজের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। মনোজ বলেছিল, কোনও বঙ্গসন্তান ভুলেও ওই চত্বরে যায় না। হার্লেমের পুলিশও কালো। সাদারা যায় বাধ্য হলে। পৃথিবীর যাবতীয় নেশা, অপকর্মের ঘাঁটি ওটা।

সিডনি হার্লেমে থাকে শুনে আর একবার মুখটা দেখলাম। সিগারেট টানতে-টানতে হাঁটছে। কেরানির চাকরি করে। এই লোকটা কী হার্লেমে রোজ মারপিট করে? হঠাৎ সিডনি দাঁড়িয়ে পড়ে দেওয়ালের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। পার্কিং প্লেসের গায়ে লম্বা দেওয়াল উঠে গিয়েছে। সেই দেওয়ালে বিশাল ছবি এঁকেছেন শিল্পী। বিমূর্ত শিল্পের চমৎকার প্রকাশ। ক্ষুধার্ত একটি শিশু সমস্ত বিশ্বের সামনে নতজানু হয়ে রয়েছে। সিডনি বলল, 'এইটে আমার এক বন্ধুর কাজ।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওকে কি কোনও কোম্পানি আঁকতে বলেছিল?'

'না-না। এখানকার তরুণ শিল্পীরা পয়সার অভাবে হল ভাড়া নিয়ে একজিবিশন করতে পারে না। ওঁরা তাই খালি দেওয়াল বেছে নেয়। প্রায় মাসদুয়েক ধরে বিনা পারিশ্রমিকে ওই ছবিটা এঁকেছে সে। যদি কোনও সহৃদয় সমঝদার এই ছবি দেখে ওর খবর নিয়ে অন্য ছবি কিনতে যায় এই আশায়।'

কলকাতা শহরে বছর দুয়েক আঁকতেই পয়সা দিয়ে আকাডেমি ভাড়া নিয়ে প্রদর্শনী করতে দেখেছি অনেককে। মনে হল এই সব শিল্পীদের কলকাতায় নিয়ে গেলে আমাদেরই উপকারে লাগত। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার বন্ধু কি কালো?'

'হ্যাঁ। আমরা পাশাপাশি বাড়িতে থাকি। ছবি আঁকা ছাড়া ও একটা রেস্টুরেন্টে ডিস ধোওয়ার কাজ করে। খুব মজার লোক।'

তার মানে হার্লেমে শিল্পীরাও থাকে। একটু গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। তাই শেষতক আমি জিজ্ঞাসা করেই ফেললাম, 'কিছু মনে করো না হার্লেম সম্পর্কে অন্য গল্প শুনেছি।'

'ঠিকই শুনেছ।' সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিল সিডনি।

'তুমি বুঝতে পারছ আমি কি বলতে চাইছি?'

'আরে হ্যাঁ। খুন, মারামারি, নেশা, ড্রাগস। এসব তো হয়েই থাকে। তাই বলে লোকে ছবি আঁকবে না কেন? কবিতা লিখবে না কেন?'

'তোমার জানাশোনা কবি আছে ওখানে?'

'আমি কবিতা লিখি।' প্রায় বুক টান করেই বলল সিডনি। আজকাল কবিতা লেখার জন্যে লবঙ্গলতিকা হওয়ার প্রয়োজন হয় না মানি, কিন্তু তাই বলে এই মানুষটি কবিতা লেখে তা দেখলে কে বুঝবে? জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার কবিতার বই আছে?'

'পয়সা কোথায় যে বই ছাপাব? পাবলিশার্সরা তো পাত্তাই দেবে না। অবশ্য আমার কিছু কবিতা নিয়ে সাইক্লোস্টাইল করে ফোল্ডার বানিয়ে নিয়েছি।'

'আহা দেখলে ভালো হত?'

'তোমার কবিতা ভালো লাগে? বেশ তো, আমার বাড়িতে চলো। আমার বউ-এর আজ ডিউটি চলছে। কফিটা আমিই তোমাকে খাওয়াব।'

হার্লেমে গিয়ে কোনও বিপদে পড়লে কি মনোজের সাহায্য পাওয়া যাবে? সিডনিকে দেখে

তো ভয়ংকর কিছু মনে হচ্ছে না। তা ছাড়া, কবিরা কি ছিনতাইবাজ হয়। আর সম্পত্তি বলতে পাশপোর্ট, কিছু ডলার আর প্রাণটুকু ছাড়া সঙ্গে কিছু নেই। নেবে কী? সামনের একটা দোকান থেকে কিছু কেক কিনে সিডনির সঙ্গে বাসে উঠলাম।

হার্লেমে নেমে ভয়ে-ভয়ে চারপাশে তাকালাম। খুব শান্ত, যে-কোনও ভদ্র জায়গার মতো মনে হচ্ছে। সিডনি বলল, 'তোমাকে বাড়িতে এনেছি শুনলে আমার বউ খুব চটে যাবে।'

'সে কী কেন? তাহলে গিয়ে দরকার নেই।' আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম।

'না-না। ওর দোষ নেই। হাজার হোক তুমি উটকো মানুষ। কিছুই জানি না তাই। ও বলে আমার নাকি কাণ্ডজ্ঞান নেই। তা হঠাৎ যদি এসে পড়ে বোলো অনেকদিনের আলাপ।'

বলতে চাইলাম অনেকদিনের আলাপ থাকলে তোমার বউ তো আমার নাম শুনবে। ততক্ষণে আমি সিডনিকে অনুসরণ করেছি। বড় রাস্তা থেকে গলিতে ঢুকে মনে হল কলকাতার রাজাবাজারের ভেতরে কিংবা মার্কুইস স্ট্রিটে এসে পড়েছি। কালো শিশুরা কিলবিল করছে। অর্থনৈতিক দুরবস্থার ছাপ সর্বত্র। বিশাল চেহারার নিগ্রো পুরুষরা অলস ভঙ্গিতে আড্ডা মারছে। মাতলামো করছে কেউ কেউ। একটিও সাদা আমেরিকানকে দেখতে পেলাম না। দুশো বছরের শাসনে সাদাদের সঙ্গ পেলে যে স্বস্তি পাই, কালোদের সঙ্গে তা পাই না। ক্রমশ আমার ভয়-ভয় করতে শুরু করল। যেভাবে গলিতে ঢুকছি তাতে একা বেরুতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। অথচ এখান থেকে ফিরেও যাওয়া যায় না। জনাকীর্ণ এক দোতলা বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠে সিডনি তালা খুলল, ইলিয়ট রোডে এইরকম ঘর আমি প্রচুর দেখেছি। ড্রইং-কাম ডাইনিং-কাম-বেডরুম। পাশেই কিচেন এবং টয়লেট। একটা আঁশটে গন্ধ ঘরে। চেয়ার টেনে বসতে বলে জানলা খুলল সিডনি। তারপর আমার সামনে এসে বলল, 'তোমার নামটাই জানা হয়নি।'

প্রায় চারবারের চেষ্টায় নামটার কাছাকাছি উচ্চারণ করতে পারল। আমি কেকগুলো দিয়ে বললাম, 'তোমার ছেলেমেয়েদের দেখছি না, ওদের জন্যে।'

সিডনি অবাক হল, 'কী কাণ্ড! তুমি যখন কিনলে তখন ভাবলাম নিজের জন্যে কিনছ। আমাদের জন্যে গিফট এনেছ? ধন্যবাদ। কিন্তু ছেলেমেয়েদের দিতে পারছি না সাম, কারণ ওরা নেই, মানে হয়নি। তোমাকে "সাম" বলে ডাকছি।'

প্যাকেটটা টেবিলে রেখে ও দুটো গ্লাস আর-একটা বোতল বের করল। আমার চেনাজানা কোনও মদের নাম ওই বোতলে লেখা ছিল না। অনেকটা ঢেলে একটা গ্লাস আমাকে দিয়ে বলল, 'তাহলে আমার কবিতা তুমি শুনবেই?'

পৃথিবীর সব দেশের কবি এবং গায়ক সম্ভবত শুরুর দিকে এক ধরনের ভণিতা করে থাকেন। এই সময় তাদের মুখ বেশ লজ্জিত-লজ্জিত দেখায়। সিডনিকেও দেখাল।

'কবিতা শুনব বলেই তো এতদূরে এলাম।'

'আমি খুব ভালো পড়তে পারি না যদিও।' সিডনি গ্লাসে এক চুমুক দিয়ে ওর কবিতার সাইক্লোস্টাইল ফোল্ডারের পাতা খুলল। মুখের কাছে সেটাকে নিয়ে গিয়ে সে পড়া শুরু করল,

'আমার শিরায় যে রক্ত ঘোরে ফেরে
তা নাকি পুরুষানুক্রমে পাওয়া।
আমার চামড়ার রং দিয়েছেন পিতা পিতামহেরা।
আমার ঘাম কিন্তু আমারই
কেউ দেয়নি, দিতেও পারে না।'

মুখ তুলল সিডনি, 'কেমন লাগল?'

মাথা নাড়লাম, 'চমৎকার।'

'মদটা খাও হে, মদ না খেলে কবিতা জমে?' জিভে নিয়েই বুঝলাম এ দ্রব্য বঙ্গসন্তানদের

জন্যে নয়। কিন্তু ওই আঁশটে ঘর অদ্ভুত আসবাব, বাইরে কালো বাচ্চাদের চিৎকার এবং দুপুর পার হতে যাওয়া সময় একটা জাদু তৈরি করেছিল। আমি দুটো গ্লাস শেষ করলাম কবিতা শুনতে-শুনতে। আফ্রিকার কোনও গ্রামের মাদলের সুর, দুশো বছর আগে জাহাজে ঠাসাঠাসি ক্রীতদাসরা, নোনতা ঘামে বাধ্য যৌনতা, যা কি না সাদা চামড়ার প্রয়োজনে প্রজননের জন্যেই।

এইরকম অনেক কবিতার পাশাপাশি একটি—'মাঝে-মাঝে ইচ্ছে করে পৃথিবীর অন্য মানুষদের বাড়িতে যাই। তারা কেমন মদ খায়, কেমন গান গায়, কেমন কবিতা লেখে? তাদের সদ্যজাত শিশুর, গালে ঠোঁট চেপে বলি, বাছা বেঁচে থাকো, ভালো থেকো।'

আমার কি নেশা হচ্ছে। আমার কেন এই কবিতা এতো ভালো লাগছে। কেন সিডনিকে প্রায় দেবদূতের মতো মনে হচ্ছে। আমি যখন দু-গ্লাসে তখন সিডনি পাঁচ পেরিয়ে গেছে। এখন বোতল শূন্য। সে হঠাৎ পড়া থামিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'দাঁড়াও, আর একটা কিনে আনি।' আমার আপত্তি শুনল না সিডনি। আমায় একা বসিয়ে রেখে সে বেরিয়ে গেল। এই প্রথম মনে হল লোকটা সত্যি কাণ্ডজ্ঞানহীন। একা অজানা মানুষের কাছে ঘর রেখে দিয়ে কেউ এভাবে বেরিয়ে যায়? এই সময় আমি টেলিফোনটা দেখতে পেলাম। ঘরের দেওয়ালে ওটা ঝুলছে। মনোজকে ফোন করব? সিডনি কিছু মনে করবে না তো। দরজায় একটা শব্দ হতে মুখ ফিরিয়ে যাকে দেখলাম সে প্রচণ্ড বিস্মিত। মধ্য তিরিশেই বয়স। লম্বা, স্বাস্থ্যবতী, কাঁথার মতো সেলাই করা চুল, হাতে ব্যাগ, স্কার্ট পরা কালো যুবতী আমাকে জিগ্যেস করল, 'সিডনি কোথায়?'

'একটু আগেই বেরিয়েছে। এখনই আসবে।'

'আপনি কে?'

'আমি একজন ভারতীয়। সিডনির কবিতা শুনছিলাম।'

'ভারতীয়। ওর সঙ্গে কবে আলাপ?'

উত্তরটা আমাকে দিতে হল না। সিডনির গলা পাওয়া গেল পেছনেই, 'তোমাকে বলতেই ভুলে গিয়েছিলাম সামের কথা। খুব ভালো কবিতা বোঝে। সাম, আমার বউ ডেইজি।'

ডেইজি ব্যাগ রাখল, 'যাক আমি ভাবলাম তোমাদের আজই পরিচয় হয়েছে।'

কেক দেখে ডেইজি খুব খুশি। আমরা জমে গেলাম। সিডনির কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। ডেইজি তাকে আর নিতে নিষেধ করছিল। কিন্তু মাতালদের সবসময় একটা জেদ চেপে থাকে। সিডনি বলল, 'আমার বউ দারুণ গাইতে পারে। ওর গান শোনো।'

ডেইজি বলল, 'তুমি যদি এটাকেই শেষ গ্লাস করো তাহলে গাইব।'

সিডনি মাথা নাড়ল। ডেইজি উঠে গিয়ে একটা ছোট যন্ত্র বের করল। তার বোতাম টিপে সুর তুলতেই তুলকালাম কাণ্ড শুরু হল। উত্তর কলকাতার বস্তির সামনে যাঁরা থাকেন তাঁরা এই শব্দাবলীর সঙ্গে পরিচিত হবেন। সিডনি হাত নেড়ে বলল, 'ঘাবড়িও না। দু-একটা ফালতু লোক মরতে পারে এই মাত্র। শোনা একটা কবিতা, 'পৃথিবীর ওজন বাড়ছে। ওজন বাড়া মানেই চর্বি জমা। যা ক্রমশ রোগ আনবে। পৃথিবীর জগিং করা দরকার। ফালতু চর্বি ঝরাতে কেউ কেউ ছুরি কিংবা বুলেটে শান দিক।' এখন বেচারার কথা আর স্পষ্ট নেই। ডেইজি আমাকে ইশারা করল কথা না বলতে। এবং সে গান ধরল। আমি অবাক হলাম। এই কৃষ্ণা মেয়েটির গলা ভারী সুরেলা। আমাদের সন্ধ্যা মুখার্জির মতো। কৈশোরে স্বপ্ন দেখতাম সুচিত্রা সেনের মতো কোনও নারী সন্ধ্যা মুখার্জির গলায় আমার মাথার পাশে বসে জ্যোৎস্না রাতে গান গাইছে। ডেইজি গাইছিল—

'আমার শিরার রক্ত নাকি
পুরুষানুক্রমে পাওয়া
আমার গায়ের চামড়ার রং
পিতামহদের দেওয়া

আমার বুকের কান্না কিন্তু
নিজের করে নেওয়া।'

সিডনির কবিতার লাইন একটু অদলবদল করে নিয়েছে ডেইজি। বললাম 'ভারী সুন্দর।' ডেইজি—লজ্জা পেল। আমি বললাম,

'এবার উঠব। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের।'

ডেইজি বলল, 'ঠিক আছে। আপনার সঙ্গে পরে সিডনির মাধ্যমে যোগাযোগ করব। ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার খুব আগ্রহ। সিডনি তো ঘুমিয়ে পড়েছে। আপনি একা যেতে পারবেন বাসস্টপে? দাঁড়ান, বাইরে ঝামেলা হল, আমি আপনাকে এগিয়ে দিচ্ছি।

রাস্তায় নেমে দেখলাম থমথম করছে। ডেইজি বলল, 'কোনও দিকে না তাকিয়ে সোজা আমাকে অনুসরণ করুন।'

কোথাও পুলিশ দেখতে পেলাম না। বাস স্টপে এসে ডেইজি বলল, 'আবার দেখা হবে। সেদিন আমরা অনেক গল্প করব। মদ না খেলে সিডনির মতো মানুষ হয় না।'

বাসের সিটে বসে আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। এই পথ চিনে সিডনির বাড়িতে যাওয়া অসম্ভব। সিডনিও কোনওদিন আমাকে খুঁজে বের করতে পারবে না। মাঝে-মাঝে ইচ্ছে করলেও আমি সিডনির বাড়িতে যেতে পারব না।

কিন্তু তারপরেই মনে হল এখন কী হবে? এই বাস থেকে নেমে আমি কুইন্সে যাব কী করে? সব পথই যে একরকম লাগছে।

॥ ১০ ॥

টাইমস স্কোয়ারের পেছনের দিকে বাস থেমেছিল। সেখানে নেমে ধর্মতলা স্ট্রিটের মতো জনতার ফুটপাথ ধরে কিছুক্ষণ হাঁটলুম। এ রাস্তায় নিগ্রোদের ভিড় রয়েছে। কিন্তু তারা এখানে প্রায় অবহেলিত। বিকেল হয়ে এসেছে। মদ্যপান করলেও মানুষের খিদে পায়। একটা ম্যাকডোনাল্ডে ঢুকে কিছু পেটে পুরলাম। ম্যাকডোনাল্ডের দেওয়ালে টেলিফোন ঝোলানো। মনোজ বলেছিল অসুবিধা হলেই যেন ওকে ফোন করি। ও সঙ্গে-সঙ্গে চলে আসবে। ইচ্ছেটা দমন করলাম। দেখাই যাক না। ম্যাকডোনাল্ডের টেবিল অনেকটা কফিহাউসের মতো। চট করে কেউ উঠিয়ে দেয় না। তার একটায় বসে রাস্তা দেখছি। ছুটির দিনেও ভিড় কম নেই। শুধু এই অঞ্চলেই গাড়িতে যেতে আসতে দেখেছি নিউইয়র্কের অনেক পাড়ার ফুটপাতে সারাদিনে গোনাগুনতি মানুষ চলে।

সন্ধের মুখটায় ফুটপাত ধরে হাঁটছি। হঠাৎ একটা বড় দোকান চোখে পড়ল। প্রথমে মনে হয়েছিল দাবার বোর্ডের দোকান। পরে বুঝলাম এখানে দাবা খেলা হয়। ভেতরে গোটাবিশেক টেবিল পাতা। বোর্ড সাজানো। প্রতিটি টেবিলে একজন করে খেলোয়াড় অপেক্ষা করছে। এক ডলার থেকে কুড়ি ডলার টেবিল বিশেষে পাওয়া যাবে সেই টেবিলের খেলোয়াড়কে হারাতে পারলে। অনেকেই খেলছে। জিতছে কেউ-কেউ। একটা টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে খেলা দেখে মনে হল আহামরি কিছু নয়। বাল্যকালে জলপাইগুড়িতে যখন বৃষ্টি নামত, মাঠ-ঘাট কয়েকদিনের জন্যে একাকার হয়ে যেত, তখন বাইরে বেরুবার উপায় থাকত না। পিতামহ মনে করতেন শুধু পড়াশোনা নয় একজন ছাত্রের খেলাধূলা করার প্রয়োজন আছে। তা সেসময় যখন ঘরবন্দি তখন তিনি দাবার বোর্ড নিয়ে বসতেন। শৈশবে দেখেছি চা বাগানের বাড়ির বারান্দায় হ্যাজাক জ্বেলে বন্ধুর সঙ্গে দাবা খেলতে তাঁকে। বন্ধু মারা যাওয়ার পর একাই বোর্ড সাজিয়ে তার হয়ে চাল দিতেন। কয়েকটা বর্ষাকালের সুবিধা পেয়ে

খেলাটা একটু-একটু করে শিখে ফেললাম। এবং একদিন হারিয়েও ফেললাম তাঁকে। তখন তিনি প্রবল উৎসাহে লুকোনো চাল শেখাতে লাগলেন। কোনও বল না মেরে কী করে গজ মন্ত্রীর আক্রমণে প্রতিপক্ষের রাজাকে বশ করা যায়, কী করে প্রতিপক্ষকে ধোঁকা দেওয়া যায়, নিজের বল খাইয়ে কী করে বড় আঘাত করা সম্ভব বুঝতে আরম্ভ করেছিলাম। তা সেই সময় বর্ষার দিনগুলো যেহেতু অস্থায়ী হত তাই পোক্ত হতে পারিনি। এক ডলারের টেবিলে বসে পড়লাম। প্রতিপক্ষ বৃদ্ধ। ডলারটি নিয়ে গেল এক কর্মচারী। জিতলে প্রতিপক্ষ যে টোকেন দেবে তা দেখালে কাউন্টার থেকে দুটো ডলার পাওয়া যাবে। ওদের খেলোয়াড় নাকি সবসময় সাদা ঘুঁটি নেবে, এটাই নিয়ম। গজমন্ত্রীর যুগ্ম আক্রমণ কাজে লাগল না। বৃদ্ধ এসব জানেন। অনভ্যাস আমাকে পরাস্ত হতে সাহায্য করল। বৃদ্ধ বলল, 'তুমি আর একবার চেষ্টা করো। আমার আর মোটেই বাসনা ছিল না। বৃদ্ধ খুব অনুরোধ করছিল। শেষতক বলেই ফেলল, 'আট ঘণ্টা শেষ হবে তিরিশ মিনিট পরে। মাত্র পাঁচজন খদ্দের পেয়েছি। ফরটি পার্সেন্ট পাই আমি। দু-ডলারে এই বাজারে চলে?'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু আপনি যদি হেরে যান?'

মালিক পঞ্চাশ সেন্ট কেটে নেবে। তবে হারি না। ব্যাপারটি জানো আমার চেয়ে ভালো খেলোয়াড় এক ডলারের জন্যে খেলবে কেন? কিন্তু বৃদ্ধের অনুরোধ রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। রাস্তায় এখন ঝকমকে আলো জ্বলছে। পর্নো হাউসগুলো ছাড়িয়ে কিঞ্চিৎ এগোতে বেশ ঘাবড়ে গেলাম। সারা মুখ চুলে বিচিত্র রং মেখে ফুটপাত জুড়ে শুয়ে বসে আছে গোটা পনেরো তরুণ-তরুণী। ছেলেদের পরনে জিনসের প্যান্ট আর মাথার চুল অর্ধেক কামানো। কানে বিশাল মাকড়ি। মেয়েদের বেশিরভাগ সাজ আরও উৎকট। ওদেরও কারও মাথায় চুল সিকি ভাগ কামানো এবং বেঁচে যাওয়া অংশে হলদে রং করা। পরনে চামড়ার স্কার্ট। যেভাবে ওরা চিৎকার করে এ ফুটপাতে ও ফুটপাতে বাক্যবিনিময় করছে তা দেখে ভয় পেতে হয়ই। বুঝলাম ভদ্রলোকেরা এই তল্লাটে আসছে না। আমাকে যেতে হলে ওদের টপকে-টপকে যেতে হবে। কেউ কেউ যাচ্ছেও। ওরা ভ্রূক্ষেপ করছে না। পা সরিয়েও নিচ্ছে না। সেইভাবে যাচ্ছিলাম হঠাৎ একটি মেয়ে হাত উঁচিয়ে আমাকে থামাল, 'হেই মিস্টার, যদি আমার গায়ে তোমার পা লাগে তাহলে এখনই আমাকে বিয়ে করতে বাধ্য করব।' কথাটা শুনে তার সঙ্গীরা খুব হইহই করে উঠল, 'বিয়ের পর হনিমুনে যাবি কোথায়?' মেয়েটি ওদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে জবাব দিল, 'ওর ব্যাংকে।'

কী মাথায় এসেছিল জানি না, হেসে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'তুমি বিয়ে করতে চাও?'

মেয়েটি চোখ পাকিয়ে তাকাল। পা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'যাও, চরে খাও।'

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। হঠাৎ ডাক শুনলাম কয়েক পা এগোতেই, 'হেই মিস্টার।' মুখ ঘুরিয়ে লোকটিকে চিনতে পারলাম, 'যদি কিছু মনে না করো তুমি আর তোমার বন্ধু আমার পাবে গিয়েছিলে না? আমি চার্লি।'

আমরা করমর্দন করলাম। চার্লি বলল, 'যাক, শেষ পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে মেয়েটির ভাব হয়ে গিয়েছিল বলে আমি খুশি।' 'আই হেট ইউ' শুনলে আমিও চটে যেতাম। কিন্তু তুমি এই পাঙ্কটাকে চমৎকার ম্যানেজ করলে তো? তোমাদের দেশে পাঙ্ক আছে?

হেসে জবাব দিলাম, 'এখনও আমেরিকা ওদের ওখানে রপ্তানি করেনি। এদের পুলিশ কিছু বলে না।'

বলে না আবার। পুলিশের গাড়ি দেখলেই সটকে পড়ে। তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'কোথায়ও না। আমি হাঁটছিলাম।'

'চলো, হাঁটতে-হাঁটতে কথা বলি। আজ আমার ডে অফ।'

'এই পাঙ্কদের বাড়িঘর কোথায়?'

'সাধারণ মানুষদের মতনই। হিপিরা ছিল নিরীহ। এরা শয়তান। কাজকর্ম করবে না। মাঝে-

মাঝে বাড়িতে গিয়ে টাকার জন্যে মা বাবার সঙ্গে ঝামেলা করবে। না পেলে জিনিসপত্র চুরি করে এনে বিক্রি করে দেবে। এটাই নাকি ওদের প্রতিবাদের রাস্তা। বদমায়েশি করলে পুলিশ ওদের মারে কিন্তু তাতে খুব একটা কাজ হচ্ছে না। প্রত্যেকটার যৌনরোগ আছে। আবার এদের মধ্যে প্রতিভাবাপন্ন গায়ক আছে কয়েকজন। পাঙ্ক মিউজিক রেকর্ড করেছে তারা। বিক্রিও হয়। তোমার ডাকনামটা কী যেন?'

হেসে বললাম, 'সাম।'

'ইয়া। সাম! আচ্ছা তোমার হাতে যদি সময় থাকে তাহলে আমার সঙ্গে এসো।'

চার্লি যেদিকটা দেখাল সেদিকে নাইট ক্লাবের সাইনবোর্ড। এখন সবে সন্ধে। নাইট ক্লাব কখন খোলে? আমি তো পোশাকে তৈরি নই। কিন্তু চার্লি সেসব শুনল না। ভেতরে ঢুকে খুব হতাশ হলাম। আমাদের ছোট ব্রিস্টলের মতো একটা মদ্যশালা কিন্তু একপাশে চেয়ার সাজানো রয়েছে ছোট ডায়াস ঘিরে। তার ওপর মাইক ড্রাম রাখা। কিছু মহিলা পুরুষ ইতিমধ্যে সেখানে বসে মদ্যপান করছেন। আমরা বসলাম। চার্লি দুটো বিয়ার নিল। নাইট ক্লাব সম্পর্কে আমার যা ধারণা ছিল তা পালটে দিয়ে এক আধা সুন্দরী পূর্ণ পোশাকে প্রকাশিত হয়ে গোটাপাঁচেক গান গাইলেন। তাঁর পর এক পুরুষ দায়িত্ব নিলে তিনি চটজলদি চলে এলেন আমাদের পাশে। এসে চার্লির হাত জড়িয়ে বললেন, 'তুমি একবারও হাততালি দাওনি।'

চার্লি হাসল, 'মনে-মনে দিয়েছি ডার্লিং।'

মহিলা বললেন, 'দুষ্টু।' ইতিমধ্যে মহিলার মধ্যপ্রদেশ দেখে আমার বুঝতে অসুবিধে হয়নি ওঁর জীবনে পরিবর্তন এসেছে। চার্লি আলাপ করিয়ে দিল, 'আমার বান্ধবী। আর এ হল সাম, ইন্ডিয়ান ফ্রম ইন্ডিয়া। সাম, নেক্সট উইকে আমরা যাচ্ছি জ্যামাইকা, হনিমুন করতে।' 'হনিমুন। এতদিন সময় পাওনি বোধহয়?' জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না।

সঙ্গে-সঙ্গে মহিলা হেসে গড়িয়ে পড়লেন। চার্লি বলল, 'সময় পাব না কেন?' কিন্তু বিয়েটা করছি আগামী সপ্তাহেই। বিয়ের পরের দিনই চলে যাব।'

কোনও মহিলার মধ্যপ্রদেশের দিকে সজাগ হয়ে তাকানো উচিত নয়। কিন্তু এতটা ভুল হবে বলে মনে হচ্ছে না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'জ্যামাইকা কেন?'

'ওখানে এক সপ্তাহ থাকলে চামড়া বেশ পুড়ে যাবে। ও চাইছে ওর বাচ্চার গায়ের রং যেন ফ্যাকফেকে সাদা না হয়। জ্যামাইকার সূর্য হয়তো ওর বাচ্চাটাকেও হেল্প করবে। শি ইজ এক্সপেক্টিং উইদইন থ্রি মান্থস। চার্লি খবরটা দিল।

বললাম, 'ওর বাচ্চা বলছ কেন, তোমারও তো।' চার্লি মাথা নাড়ল 'না না। ওর আগের স্বামীর বাচ্চা ও ক্যারি করছে। ডিভোর্স পেয়েছে দিনসাতেক হল।' কথাগুলো বলে চার্লি মহিলাকে চুম্বন করল সভালোবাসায়।

চার্লি আর ওর ভাবী বউ আমাকে টিউব স্টেশনে পৌঁছে দিল দশটার পরে। পইপই করে ওরা আমাকে বুঝিয়ে দিল আমাকে কী করতে হবে। এই টিউব সরাসরি কুইন্স যাবে না। মাঝখানে দু-দুবার পালটাতে হবে টিউব। স্টেশনগুলোর নামও ওরা বলে দিল। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে টিউবে ওঠার পর মনে হল ওদের ভাবী মিলিত জীবনের জন্যে একটা ছোট্ট অভিনন্দনও জানানো হল না আসার সময়। প্রথম স্টেশনে ট্রেন পালটাতে অসুবিধে হয়নি। লোকজন ছিল অনেক। জিজ্ঞাসা করে হদিশ জেনে নিতে পেরেছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয় স্টেশনে এসে হকচকিয়ে গেলাম। শুনসান চারধার। কোন প্ল্যাটফর্মে যেতে হবে কুইন্সের টিউব ধরতে তাই জানতে পারার লোক নেই। মাঝে-মাঝেই এপাশ-ওপাশ থেকে ট্রেন আসছে বেরিয়ে যাচ্ছে। এর কোনও একটা নিশ্চয়ই কুইন্সে যাবে। এই সময় আমি একজনকে আসতে দেখলাম। গায়ের রং সাদা আমেরিকানদের মতনই, বছরপঞ্চাশেক বয়স। হাঁটার ভঙ্গিতে বোঝা যায় খুবই ক্লান্ত। রোগা, গালভাঙা, জীর্ণ একটি স্যুট শরীরে। ওকে

দেখে এই রাত্রেও আমার বিজন ভট্টাচার্যের কথা মনে পড়ল। অনেক কাল আগে আমরা এক সকালে মুক্তাঙ্গনে নাটকের পোস্টার লাগাচ্ছি এই সময় বিজনদা এলেন একজনকে সঙ্গে নিয়ে। নবান্নের নাট্যকার এবং অভিনেতা হিসেবে এই প্রবাদ পুরুষটিকে আমি প্রথমেই চিনতে পারিনি। পাজামা এবং মলিন পাঞ্জাবিতে মনে হয়েছিল একদা কম্যুনিস্ট পার্টি করা সৎ কোনও কমরেড যিনি নিজের জন্যে কিছু জমিয়ে রাখার কথা ভাবতে পারতেন না। উনি হাঁটছিলেন খুব ক্লান্ত ভঙ্গিতে। এসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কী নাটক অ্যাঁ?' নাম জেনে বলেছিলেন, 'আমরা করছি গর্ভবতী জননী।' বলে একই ভঙ্গিতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তখন মনে হয়েছিল রসিকতা করেছেন পরে ভুল ভেঙেছিল। এই মানুষটির চেহারা ঠিক বিজনদার মতো। হাতে একটা ব্যাগ যা হরিপদ কেরানিরাই বহন করে থাকে। ব্যাগটা আধভরতি। ইনি এমন একজন আমেরিকান যাঁর সঙ্গে কথা বলতে আমার কোনও সংকোচ হল না, 'আচ্ছা, কুইন্সে যাওয়ার টিউব কোথায় পাব?'

ভদ্রলোক চশমার ফাঁকে এমন ক্লান্ত ভঙ্গিতে তাকালেন যেন এমন প্রশ্ন জীবনে শোনেননি। শেষে মাথা নেড়ে বললেন, 'আমিও ওদিকে যাচ্ছি। পাকিস্তানি?'

'না। ভারতীয়। আমি নতুন এসেছি।'

'চাকরি পেয়েছেন।'

'আজ্ঞে না, আমি চাকরি করতে আসিনি।

'দেশে কী করো?'

'লেখালিখি করি।'

'ওতে চলে যায়?'

'মোটামুটি।'

'ধরো, এক কিলো আলুর দাম তোমাদের দেশে কত?'

'তিরিশ সেন্টের মতো।'

'মাই গড!' তারপর শুরু হল নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম জানা। বাড়িভাড়া কত লাগে? শেষমেশ বললেন, মাসে তিনশো ডলার রোজগার করলে তোমার দেশে ঝি-চাকর রাখা যায় বলছ? আমি যদি যাই তাহলে এই বয়সে চাকরি পাব? আমি বাহান্নতে পড়েছি?'

বিরাট ধাক্কা খেলাম। কখনও কল্পনা করিনি কোনও আমেরিকান ভারতবর্ষে চাকরি করতে আসতে চাইবে শুধু ভালোভাবে খেয়ে পরে বেঁচে থাকবার জন্যে। মুখের দিকে তাকাতে মনে হল বড় কষ্টে আছেন। এই সময় একটা ট্রেন আসতেই আমাকে ইঙ্গিত করে উঠে পড়লেন ভদ্রলোক। প্রায় ফাঁকা কামরা। হুহু করে ট্রেন ছুটছে। জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাগে কী নিয়ে যাচ্ছেন? বললেন, 'পাঁউরুটি, মাখন, সংসারের টুকিটাকি জিনিসপত্র। যে চাকরিটা করি তাতে সংসার চলে না। আমার স্ত্রী কাজকর্ম করে না। বসে-বসে খায়। তাই বিকেলে আর একটা কাজ আনঅফিসিয়ালি করি। খুব কম দেয়, কিন্তু দেয় তো।'

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন। চিবুক প্রায় বুকে ঠেকেছে। চোখ বন্ধ। চট করে মনে পড়ল ব্যারাকপুর কিংবা বনগাঁ লোকালে রাত ন'টা দশটায় এইরকম অনেক মানুষকে শিয়ালদা থেকে সস্তার বাজার করে ফিরতে দেখেছি। মানুষটির জন্যে বড় মায়া হল। হঠাৎ তিনি মাথা তুলে সিটের গায়ে আঁটা স্টেশন ইন্ডিকেটার দেখলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'অনেকদিন পরে একজন ইয়ংম্যানের সঙ্গে পার্সোনাল প্রব্লেম নিয়ে কথা বললাম। ধন্যবাদ। তোমার স্টেশন এসে গিয়েছে। তৈরি হও।'

ওঁর চিবুক আবার বুকে ঠেকল। স্টেশনের বাইরে এসে মনে হল একটা মৃত শহরে পা রেখেছি। হুহু হাওয়া বইছে। ঠান্ডায় দাঁতে দাঁত বাজনা তুলছে। দু-পকেটে হাত ঢুকিয়েও নিস্তার নেই। সামনের চওড়া রাস্তায় শুধু উজ্জ্বল আলো কিন্তু একটিও মানুষ নেই। মাঝে-মাঝে তীব্র গতিতে

গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে। ফরিদার সঙ্গে একা এই স্টেশনে এসেছিলাম বাসে। এখন বাসও চোখে পড়ছে না। হেঁটে গেলে কতটা এবং কোন পথে গেলে মনোজের বাড়িতে পৌঁছব তাও বুঝতে পারছি না। শুধু মনে আছে আমরা যখন বাস থেকে নেমেছিলাম তখন স্টেশনটা বাঁ-দিকে ছিল। তাহলে এখন ডান দিকে হাঁটলে কেমন হয়?

নির্জন চওড়া রাস্তায় একা হাঁটছি। এদিকের যে-কোনও বাড়ি ঘরই এক চেহারার। মনোজের বাড়ির সামনের রাস্তাটার নাম মনে আছে, নম্বরটা এত বড় যে খেয়াল করতে পারছি না। রাস্তাটায় পৌঁছে গেলে কি আর বাড়িটা চিনতে পারব না?

সেই রাতেই বাড়ি ফিরেছিলাম ঠিকই কিন্তু একা নয়। আমেরিকান পুলিশের সাহায্য নিয়ে। মনোজই এসে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। ও বাড়ির দশ মিনিটের মধ্যে পাক খাচ্ছিলাম। গাড়িতে ওঠার পর মনোজ বলেছিল, 'করেছেন কী? সারাদিন একদম উধাও? চিন্তায় মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। তার ওপর ফরিদাটা সব গোলমাল করে দিল।'

'ফরিদা? সে আবার কী করল?' গাড়ির উত্তাপ আমার ভালো লাগছিল।

মনোজ বলল, 'আপনি ওর ওখানে দুপুরে ঘুমাচ্ছিলেন?'

'না তো। ফরিদা বলেছে?'

'হ্যাঁ। বলল ডেকে দিতে পারব না। তা কথাটা আমি সরলভাবে মিসেসকে বলে নিরুদ্বিগ্ন করতে চাইলাম। উলটে ভীষণ চটে গেল। ফরিদাকে ও পছন্দ করছে না। আপনি কেন ওর ফ্ল্যাটে গিয়ে ঘুমাবেন? কিছুক্ষণ পরে ফরিদাকে ফোন করে বলল আপনাকে ডেকে দিতে। তখন ফরিদা জানাল, আপনি ওর ফ্ল্যাটেই যাননি। তখন রসিকতা করছিল। উলটে আপনার খবর পাওয়া যাচ্ছে না বলে উদ্বিগ্ন হল। কিন্তু মুশকিল হল ফরিদার এই দ্বিতীয় স্টেটমেন্টটাও মিসেস বিশ্বাস করছে না।' মনোজ খুব সিরিয়াসলি বলছিল। একটু ঘাবড়ে গেলাম, 'তাহলে কী হবে এখন?'

'কী আর হবে। আপনি যদি গিয়ে থাকেনও তাহলে ওর রাগ করার কী আছে? আমার সঙ্গে এই নিয়ে একচোট হয়ে গেল।'

মনোজ ওর বাড়িতে পৌঁছে গেল।

দরজা খুললেন মনোজের স্ত্রী। দেখলাম শ্যামলও বসে আছে। বললাম, 'অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু সত্যি-সত্যি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম।'

মনোজের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায়?'

'আপনাদের বাড়ির কাছেই। সারাদিন হার্লেমে এক নিগ্রোর সঙ্গে ছিলাম। লোকটা কবি? শ্যামল বলল, 'বাঃ। তাহলে তো দিনটা চমৎকার কেটেছে। কবিতা শুনেছেন?'

'হ্যাঁ। দাঁড়াও বলছি। মাঝে-মাঝে মনে হয় পৃথিবীর অন্য মানুষদের বাড়িতে যাই। তারা কেমন মদ খায়, কেমন গান গায়। তাদের সদ্যজাত শিশুর গালে ঠোঁট চেপে বলি বাছা, বেঁচে থাকো, ভালো থেকো।'

মনোজ হাততালি দিল। শ্যামল মাথা নেড়ে ওপরে উঠে গেল। আর মিসেস ভৌমিক কী করবেন বুঝতে না পেরে ভেতরে চলে গেলেন। তখনই ফোন বেজে উঠল। মনোজ রিসিভার তুলে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমায় ডাকল, 'আপনার ফোন।'

রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই ফরিদা চেঁচিয়ে উঠল, 'কোনও মেয়ের পাল্লায় পড়েছিলেন? উঃ কী চিন্তাই না হয়েছিল। দ্যাখো বাবা, দেশের ছেলে দেশে ফিরে যাও। গিয়েছিলে কোথায়?'

'হার্লেমে।'

'তাহলে ঠিক আছে।'

'মানে!'

'ওখানে যদি কোনও মেয়ের প্রেমে পড়ো তাহলে দারুণ সেবা পাবে'। বলে ফোন রেখে দিল।

সেই রাত্রে বিছানায় শুয়ে নিজের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। অনেককাল আগে আমি একবার অবালকোচিত অপরাধ করেছিলাম। পিতৃদেব খুব ক্ষিপ্ত হয়ে আমায় প্রহার করেছিলেন। পিতামহ বাড়ি ফিরে সে কথা শুনে জিজ্ঞাসা করেছিলেন পিতৃদেবকে, 'তুমি ওর কাছে সঠিক ঘটনাটা জানতে চেয়েছিলে প্রহর করার আগে? কেন ও কাজটা করেছিল?' পিতৃদেব জবাব দিতে পারেননি। পিতামহ আমার প্রতি তারপর অনাবশ্যক স্নেহ দেখাননি। কিন্তু কথাটা মনে লেগে গিয়েছিল। আজ নতুন করে মনে পড়ল। মিসেস ভৌমিক আমাকে একবারও সঠিক কারণ জিজ্ঞাসা করেননি। হয়তো তাঁর বিশ্বাস আছে আমি সত্যি গোপন করতাম। কলকাতায় সুধীজনেরা দেখেছি বানানো গল্প সত্যি বলে ভাবতে ভালোবাসেন এবং সেই গল্প অন্য কারও কাছে করার সময় আরও একটু বানিয়ে ফেলেন নিজের অগোচরেই। ফরিদার মানসিকতা অর্জন করা ক'জন মেয়ের পক্ষে সম্ভব হবে জানি না কিন্তু বিপরীত ভাবনা ভাবতে পারার মতো মেয়ের অভাব আমাদের দেশে নেই। মাঝরাতে কিংবা শেষরাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজনে। দরজা খুলে অন্যমনস্ক হয়ে টয়লেটের কাছে পৌঁছে বসবার ঘরের সোফার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। মনোজ সেখানে উপুড় হয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। অথচ ও আমার সামনেই বেডরুমে ঢুকেছিল। ওর বেডরুমের আরাম কি ড্রইং রুমের সোফার চেয়ে কম? কোনওদিন জিজ্ঞাসা করতে পারিনি।

নিউইয়র্কে এসে এই প্রথম মধ্যাহ্নভোজন করলাম বেলা এগারোটায়। স্যুটকেস গাড়িতে তুলে যখন লনে দাঁড়ালাম তখন বাড়ির সবাই পেছনে। হঠাৎ মনে হল আমি যেন নিজের বাড়ি থেকেই বেরুচ্ছি। এবং মন খুব খারাপ হয়ে গেল। আদৌ যেতে ইচ্ছে করছিল না। এমনকী পাশের বাড়ির বুড়িও আমার দিকে জুলজুল করে চোখে তাকিয়ে।

মিসেস ভৌমিক বললেন, 'রোজ একবার ফোন করবেন নইলে চিন্তায় থাকব। আর দেশে ফেরবার আগে কিছুদিন এখানে থাকা চাই।'

মনোজ গাড়ি চালাতে-চালাতে বলল, 'একেই বলে স্ত্রী চরিত্র। গতরাত্রে আপনার ওপর ক্ষেপে গিয়েছিল আর আজ দেখুন। যাক কাজের কথা বলি, আমেরিকায় যেখানেই থাকুন অসুবিধে হলেই আমার অ্যাকাউন্টে ফোন করে জানাবেন।'

স্টেশনে পৌঁছে মনোজই টিকিট কেটে দিল, জোর করে। আমার স্যুটকেস বয়ে নিয়ে গেল যে পর্যন্ত বিনা টিকিটে যাওয়া যায়। তারপর বলল, 'এনজয় ইওরসেল্ফ। ইতিমধ্যে আমি আপনার স্ক্রিপ্ট্ ধরে শট ডিভিসন করতে শুরু করি। নেমে যান।'

ভারী স্যুটকেস হাতে নিয়ে চলন্ত সিঁড়িতে পা রাখতেই সেটা আমাকে নিয়ে তরতর করে নীচে নামতে লাগল। মুহূর্তে মনোজ চোখের আড়ালে। আর আমি আমার চিরকালীন নিঃসঙ্গতা রোগে আক্রান্ত হলাম। বুকের মধ্যে একটা অস্বাচ্ছন্দ্যের ভার চেপে বসেছিল। এখন থেকে আমি একা। স্যুটকেস টেনে-টেনে চলছি প্ল্যাটফর্ম ধরে। পাশেই একটা লম্বা ট্রেন দাঁড়িয়ে যার সবকটা দরজা বন্ধ। এবং টিউবট্রেনের মতো দেখতে নয়। একদল রেলের অফিসার দাঁড়িয়েছিলেন প্ল্যাটফর্মে, টিকিট দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন ট্রেন ওয়াশিংটন যাবে? ভদ্রলোক যেন আঁতকে উঠলেন, 'আরে তুমি করছ কী, এই ট্রেন এখনই ছেড়ে যাবে আর তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ।'

'ট্রেনের দরজা যে বন্ধ।'

ভদ্রলোক বিনা বাক্যব্যয়ে দরজার পাশের সুইচে চাপ দিতেই ওটা খুলে গেল। ওপরে উঠে মনে হল রাজধানী এক্সপ্রেসের চেয়ারকার এর কাছে তৃতীয় শ্রেণির। কম্পার্টমেন্ট-এ লোক আছে। অন্তত জানলার সিট খালি নেই। অতএব একটায় বসে সিগারেট ধরাতে যেতে একজন যাত্রী খুব ভদ্রভাবে বললেন, 'এটা ননস্মোকিং কম্পার্টমেন্ট।'

চটপট সিগারেট প্যাকেটে ঢোকালাম। ননস্মোকিং থাকলে স্মোকিং নিশ্চয়ই থাকবে! এই সময় ট্রেনটা ছাড়ল। স্যুটকেস টেনে-টেনে করিডোর দিয়ে একটার পর একটা কম্পার্টমেন্ট পার হচ্ছি। সবকটাতেই সিগারেটের ওপর লাল ক্রশ। এয়ারকন্ডিশন্ড গাড়িতে যখন ঘেমে উঠেছি তখন স্মোকিং কম্পার্টমেন্ট খুঁজে পেলাম।

কম্পার্টমেন্টটা একদম ফাঁকা। জানলার পাশে বসার পর নিজেরই অস্বস্তি হচ্ছিল। মনোজ বলেছে বটে আমেরিকানরা সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু তাই বলে এই অবস্থা হবে ভাবতে পারিনি। মনের সুখে সিগারেট ধরালাম। এইভাবে একা-একা সিগারেট খেতাম ক্লাস টেনে। তিস্তার চরে কাশবনের আড়ালে বসে সবাইকে লুকিয়ে।

নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটনে ট্রেনে যাওয়ার বুদ্ধিটা মনোজের। 'ভাড়া প্লেনের থেকে সামান্য বেশি হলেও দেশটা দেখতে পাবেন।'

ওয়াশিংটনের ওয়াশিংটন হাউস হোটেলে আজ আমাকে রিপোর্ট করতে হবে যদি আমেরিকান সরকারের আতিথ্য নিতে চাই। আগামীকাল সকালে ওঁরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। দুপুরে ওঁদের দপ্তরে বসে ঠিক হবে কোথায় কোথায় আমি যেতে পারি। কলকাতা ছাড়ার আগে সুপ্রিয়দা বলেছিলেন, 'যাই করো বাবা দয়া করে ঠিক সময়ে হোটেলে পৌঁছে যেও।' সুপ্রিয়দার কাছে কিছু টিপস চেয়েছিলাম। মনেপ্রাণে বাঙালি অথচ আমেরিকান সংস্থার প্রাণপুরুষ মানুষটি এক গ্লাস লস্যি খাইয়ে বলেছিলেন, 'সবসময় মনে রাখবে তোমার নাম সমরেশ মজুমদার এবং এটাই হল সবচেয়ে বড় টিপস।' তারপর হেসে বলেছিলেন, 'সাহেবরা যে ইংরেজি শিখিয়ে গেছেন তা যথেষ্ট। যখন মার্কিনের বাক্য বুঝতে পারবে না কিছু না বলে চুপ করে থাকবে। সে শেষ করলে বিনীতভাবে বলবে, "পার্ডন?" সুপ্রিয়দার কাছে গেলেই ভালোবাসার স্পর্শ পাই কিন্তু এখন সেটার অভাব বোধ করছিলাম।

হঠাৎ একজোড়া তরুণ-তরুণীকে দেখলাম কম্পার্টমেন্টে ঢুকতে। পকেট থেকে সিগারেট বের করে তারা সম্ভবত দেশলাই খুজছিল। তরুণীর নজরে পড়ল আমি সিগারেট খাচ্ছি। সটান উঠে এসে জড়ানো গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'লাইটার পেতে পারি?'

বুঝেও না বোঝার ভান করলাম, 'পার্ডন?' সুপ্রিয়দার কথা মনে রেখে। তরুণী ইশারায় বুঝিয়ে দিলো সে কী চায়। কলকাতার দেশলাই ওর হাতে দিতেই সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তারপর বন্ধুকে ডেকে দেখাল। বন্ধু জিজ্ঞাসা করল, 'কী সিগারেট খাচ্ছ তুমি?' আমার প্যাকেটটা দেখাতে লোকটা বলল, 'আমি একটা পেতে পারি?' ওরা আমার সিগারেট খেলো। কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালিয়ে বুঝলাম ছেলেটি এবং মেয়েটির পরিচয় হয়েছে ট্রেনে ওঠার পর। ওরা যখন চলে গেল তখন দু জনের হাত দুজনের কোমরে। এই কম্পার্মমেন্টে কেউ স্থায়ী বসতে চাইছে না। সিগারেট খেয়ে নিয়েই চলে যাচ্ছে যে যার কম্পার্টমেন্টে।

ওয়াশিংটনে যখন ট্রেনটা পৌঁছোল তখন কড়া রোদ। স্টেশনে নেমে ভিড়ের সঙ্গে চলেছি স্যুটকেস টানতে-টানতে। কাঁধের কাছে ব্যথা শুরু হচ্ছে। দু-তিনটে পোর্টার এগিয়ে এসেছিল কিন্তু ডলার খরচের ভয়ে রাজি হয়নি। প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে বড় ঘড়ির তলায় এসে হকচকিয়ে গেলাম। কোন পথে যাব? অনেকগুলো একজিট পয়েন্ট। এখান থেকে কীভাবে যাব? সামনেই রিসেপশন। একজন শেতাঙ্গ এবং একজন কৃষ্ণাঙ্গী প্রৌঢ়া কাউন্টারে বসে। বয়স্করা কোমল মনের অধিকারিণী হন। কাছে গিয়ে বললাম, 'আমি ওয়াশিংটন হাউস হোটেলে যাব। কীভাবে যেতে পারি?'

মহিলা, যাকে দেখতে মানুর মায়ের মতো, তাঁর সামনে দাঁড়ালাম। মহিলা বললেন, 'বাদিকে এগিয়ে যান, টিউব পাবেন।'

'আমি টিউবে অভ্যস্ত নই।'

'আপনার পকেটে ডলার আছে? থাকলে ডান দিকের গেট দিয়ে বেরিয়ে যান, পুরো ট্যাক্সি পাবেন। সোজা গেলে শেয়ারে ট্যাক্সি পাবেন। সোজা যাওয়াই ভালো, কারণ পয়সা তো রক্ত জল করে লোকে রোজগার করে, তাই না?' বৃদ্ধা সস্নেহে বললেন।

॥ ১১ ॥

আমার সুটকেস যা কিনা মুকুন্দর কাছ থেকে ধার করে আনা মোটেই অনুগত ছিল না। ওর কান ধরে টেনে আনার চেষ্টা করলেই চাকাগুলো এমন ঘড়ঘড় আওয়াজ করত যে নিজের কানেই খারাপ শোনাত। ওয়াশিংটন স্টেশনের বাইরে আসার জন্যে টানেলের মধ্যে দিয়ে হাঁটার সময় শব্দটা যেন তিনগুণ বেড়ে গেল। পাশ দিয়ে হেঁটে-চলা প্রৌঢ় হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে উপদেশ দিলেন, 'শোনো ভাই, তোমার উচিত সুটকেসের চাকায় সাইলেন্সার ব্যবহার করা। একাই চারধার কাঁপিয়ে দিচ্ছে।'

কথা বলার লোক পেয়ে মাথা নাড়লাম, 'যা বলেছেন। আপনার সঙ্গে আমি একমত। তবে কিনা বস্তুটি ওয়াশিংটনে এসে এমন আওয়াজ ছাড়ছে।'

অবাক হয়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেকী?' এরকম কথা তো জীবনে শুনিনি। আমাদের এই শহরটার দোষ কী!'

যেন সুটকেসের চাকায় সাইলেন্সার লাগানোর কথা এর আগে আমিও শুনেছি। বললাম, 'এখানে নতুন তো। ঘড়িতে বলছে, সন্ধেও হয়ে গেছে, কীভাবে কম পয়সায় হোটেলে পৌঁছোব, তাও জানি না। জানলে হাতেই বয়ে নিতাম ওকে। বেচারা শব্দ করত না।' হঠাৎ ভদ্রলোক হোহো করে হেসে উঠলেন। শুনেছি মার্কিনরা ব্রিটিশদের মতো গোমড়ামুখো হয় না। কিন্তু এখন পর্যন্ত এদেশে গায়ে পড়ে আলাপ করা রসিককে দেখতে পাইনি। হাসিটি দেখে তাই আরাম লাগল। লোকটার চেহারার সঙ্গে আমার প্রিয় অভিনেতা জহর রায়ের বেশ মিল আছে। এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। ঈশ্বরের মানুষের মুখ তৈরির ছাঁচেরও একটা লিমিট আছে। সেই এক নাক চোখ ঠোঁট চিবুক আর গালের হনুর সামান্য তারতম্য দিয়ে এক একটা মুখের আলাদা পরিচয় দিতে হয় তাঁকে। কিন্তু এভাবে কত আর তিনি দিতে পারেন। জহর রায়ের মুখের সঙ্গে এই মানুষটির যেমন মিল তেমনি একই মুখের অধিকারী পৃথিবীর দুই প্রান্তের হয়তো দুজন মানুষ আছেন। দূরত্বটা এমন বাড়িয়ে রেখেছেন ঈশ্বর যে দুজনে জানতেই পারে না দুজনের অস্তিত্ব। এই প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা মনে পড়ছে। আমেরিকা থেকে ফেরার অনেক পরে আমি আমন্ত্রিত হয়ে নরওয়ের বার্গেন শহরের সাহিত্য সম্মেলনে গিয়েছিলাম। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কবিরা এসেছিলেন সেখানে কবিতা পড়তে। একমাত্র আমি ছিলাম অকবি। ওদের কবিতার ভাষা বুঝতে পারতাম না। মাঝে-মাঝেই সম্মেলন কক্ষ ছেড়ে চলে যেতাম রাস্তায়, সমুদ্রের ধারে যেখানে বাজার বসে আর মাছের স্টিমারগুলো এসে লাগে। এক দুপুরে এইরকম কেটে পড়ে ওই সমুদ্রের তীরে গিয়ে সিগারেট ধরিয়েছি সবে, অমনি একটি মানুষের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। বার্গেনে এসে অবধি আমি কোনও বাঙালির দর্শন পাইনি। দেখলাম জলের পাশে বেঞ্চিতে শরীর এলিয়ে বর্তমানের সম্পাদক বরুণবাবু বসে আছেন। বরুণবাবুকে কয়েকবার আমি দেখেছি চোখ বুজে বসে থাকতে। ওখানে সেইমতো দেখে পুলকিত হয়ে চিৎকার করলাম। ভদ্রলোক মুখ ফেরালেন। ওইরকম বয়স, কোকঁড়া চুল স্বাস্থ্যও এক। শুধু গায়ের রঙটাই একটু আলাদা। ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমাটমা চেয়ে বললাম, 'ঠিক আপনার মতো দেখতে এক ভদ্রলোক কলকাতায় আছেন। অবিকল। উনি একটি সংবাদপত্রের সম্পাদক।'

সামান্য ই জানা সেই মানুষটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'চমৎকার, আমরা একই

প্রফেশনে আছি। আমার কাউন্টার পার্টটিকে অভিনন্দন জানাবেন। বাট হি মাস্ট নট মিট মাই ওয়াইফ।'

টানেলে দাঁড়িয়ে হাসি থামার পর প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন, 'তোমার ধারণা ভুল। এখন বাইরে কড়কড়ে রোদ। আজ ছুটি হয়ে গেছে, রাস্তায় ভিড় নেই। ওই বস্তুটিকে যদি হাতে তুলে আমার সঙ্গে হাঁটো, তাহলে তোমাকে সাহায্য করতে পারি।'

একটি বিশাল সুটকেসে আমার সব সম্পত্তি ঠাসা। মাটি থেকে তুলে দশ পা হাঁটলেই মনে হয় হাত ছিঁড়ে গেল। তাই সুযোগ পেলেই চামড়ার স্ট্র্যাপ ধরে টানি আর ও গড়িয়ে চলে। স্যুটকেসের চাকায় কী তেল দিতে হয় মুকুন্দ বলে দেয়নি। হাতবদল করতে-করতে সুটকেস নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল। ঘড়ি অনুযায়ী ইতিমধ্যে তো সন্ধে হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু সমস্ত চরাচর এখন চমৎকার রোদে ভাসছে। ভদ্রলোক বললেন, 'দেখলে তো। তা দেশ থেকে এই এতদূর যখন আসতে পেরেছ তখন হোটেলেও পৌঁছোতে পারবে। ওখানে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে চলে যাও।' কথা শেষ করেই তিনি উলটো দিকে হাঁটতে লাগলেন। অদ্ভুত লোক তো? আর এই মুহূর্তে ওকে আমার কিছুতেই জহর রায় বলে ভাবতেও ইচ্ছে করল না। মানুষের মুখ এক হলেই যে চরিত্র এক হবে তার যদিও কোনও নিয়ম নেই।

ট্যাক্সির জন্যে লাইন পড়েছে। পুলিশ বাঁশি বাজিয়ে ট্যাক্সিওয়ালাদের ডাকছে। গাড়িগুলোর চেহারা দেখে মনে হল ভারতবর্ষের টাটা-বিড়লারাই অমন গাড়িত চড়তে পারেন। অনেকগুলো লাইন। এর কোনটায় দাঁড়ালে আমার হোটেলের ট্যাক্সি পাব? স্যুটকেস রেখে কয়েক পা এগিয়ে পুলিশটাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওয়াশিংটন হাউস' হোটেলে যাব। কোন লাইন?'

'কী হোটেল?' প্রচণ্ড ধমকে জিজ্ঞাসা করল পুলিশটা। নামটা আবার জানালাম। এবার সে আমাকে ইশারা করল সামনে থেকে সরে যেতে। বাধ্য হয়ে সুটকেসের কাছে ফিরে এলাম। আর তখনই পুলিশটি চিৎকার করে আমাকে কিছু বলে একটা ট্যাক্সি দেখিয়ে দিল। কী কাণ্ড, ওই বিশাল গাড়িটায় আরও চারজন বসে আছেন। আমি এগিয়ে যেতেই ড্রাইভার আমার হাত থেকে স্যুটকেস নিয়ে পেছনের ডিকিতে রেখে দিল। আমি ইতস্তত করছিলাম, লোকটা দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'কুইক।'

অতএব উঠে বসলাম। বসেই বুঝলাম এটি শেয়ারের ট্যাক্সি। কলকাতায় যা আমাদের ভরসা তা খোদ আমেরিকার রাজধানীতেও চালু আছে আবিষ্কার করে পুলকিত হলাম।

গাড়ি ছেড়ে ড্রাইভার একটা প্যাড টেনে বাঁ-হাতে কলম নিয়ে ডানহাতে স্টিয়ারিং ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'ডেস্টিনেশন প্লিজ।' প্রত্যেকে যে যার জায়গা বলে যেতে লাগল। লোকটা সেসব লিখে নিয়ে এক দুই তিন চার পাঁচ নম্বর পাশে বসাল। দেখলাম, আমার জায়গাটার আগে পাঁচ নম্বর বসল। বুঝতে পারলাম আমাকে নামতে হবে সবার শেষে। এই ট্যাক্সিতে জায়গা অঢেল। এয়ার কন্ডিশনড। সিগারেট খাওয়া নিষেধ। পা ছড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকালাম। নিউইয়র্কের চেয়ে অনেক চওড়া রাস্তা এবং লোকজন খুব কম। বাড়ি-ঘরদোর দেখতে-দেখতে শুনতে পেলাম ওয়ারলেসে খবর আসার মতো কিছু একটা বেজে যাচ্ছে সমানে ড্রাইভারের সামনে। লোকটা মাঝে-মাঝে প্যাডে তাই শুনে নোট নিচ্ছে আর গাড়ি চালাচ্ছে। ব্যাপারটা কী বোঝবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু রেডিও ওয়ারলেসে ভেসে আসা গলা এত অস্পষ্ট যে মাথায় কিছু ঢুকল না। ইতিমধ্যে আমার এক সহযাত্রী নেমে গেছেন তাঁর জায়গায়। নামবার আগে কোনও বাক্য বিনিময় না করে দুটো এক ডলারের নোট দিয়ে গেলেন। আমি বুঝতে পারছি না আমাকে কত দিতে হবে। ভারত সরকার দেশ থেকে আসার সময় মোট সাড়ে ছয়শো ডলার মঞ্জুর করেছেন। অবশ্য তার অনেকটাই পকেটে রয়ে গেছে। নিউইয়র্কে রেসে যা জিতেছিলাম তা দিয়ে একটা পার্টি করার কথা ছিল আসবাব আগে পার্টি না হওয়ায় মনোজ আমার অংশ দিতে চেয়েছিল, আমি নিইনি। ফিরে গিয়ে সেটা করা যাবে বলে রাখতে বলেছিলাম। এখন কত দক্ষিণা ড্রাইভারটি চাইবেন ঈশ্বর জানেন। ইতিমধ্যে আমার সহযাত্রীরা নেমে

গেছেন। চার নম্বর নামবার আগে পাঁচ ডলার দিয়ে গেলেন। কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালা পঞ্চাশ টাকা শেয়ার নিলে কী কাণ্ড হত? এখন আমি আর ড্রাইভার গাড়িতে। দুপাশে বেশ বাড়ি ঘরদোর। আমরা সম্ভবত কোনও রেসিডেন্সিয়াল এলাকা দিয়ে যাচ্ছি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওয়াশিংটন হাউস হোটেল আর কত দূরে?' চিউংগম মুখে রেখে ড্রাইভার জবাব দিল, 'দেরি আছে। নতুন নাকি শহরে?'

কলকাতার অভিজ্ঞতা বলছে 'হ্যাঁ' বললে ঠকতে হবে। কিন্তু অস্বীকার করলে তো ধরা পড়ার সম্ভবনা। অতএব সত্যি কথাই বললাম। ড্রাইভার মাথা নাড়ল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'রেডিওতে কী বলছে?'

ড্রাইভার বলল, 'কোন রাস্তায় জ্যাম আছে, কোথায় নো-এন্ট্রি করা হল, কোন এলাকায় কে কোথায় দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি এইসব। কেন? কোন দেশ থেকে আসছ তুমি?'

'ভারতবর্ষ।'

'তোমার দেশে কেউ ট্যাক্সি চাইলে ওয়ারলেসে ট্যাক্সি ড্রাইভারদের জানিয়ে দেওয়া হয় না অ্যাটেন্ড করতে? এটা নতুন কথা নাকি?'

উত্তর দিলাম না। হাত দেখিয়ে ট্যাক্সি থামিয়ে অনুনয় বিনয় করলেও যেদেশে ড্রাইভারদের মন ভেজে না সেদেশে ওয়ারলেসের মাধ্যমে খবর পাঠানোর কথা কেউ ভাবতে পারে? আপনার ট্যাক্সি দরকার। আপনি আপনার লোক্যাল ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে ফোন করে সেটা বলবেন। স্ট্যান্ডে কোনও ট্যাক্সি নেই। অতএব ওরা ওয়ারলেসে জানিয়ে দিল আপনার বাড়ির এক কিলোমিটারের মধ্যে যেসব খালি ট্যাক্সি আছে তাদের কেউ যেন যোগাযোগ করে। কোনও ট্যাক্সিওয়ালা সেই ডাকে সাড়া দিয়ে বলল, 'আমি যাচ্ছি।' সঙ্গে-সঙ্গে স্ট্যান্ড থেকে ওয়ারলেসে প্রচার করা হল। এত নম্বর ট্যাক্সি ওঁমুক ঠিকানায় যাচ্ছে। এতএব আর কারও সেখান যাওয়ার দরকার নেই। এ ছাড়া ট্যাক্সি ড্রাইভারদের একঘেয়েমি কাটানোর জন্যে গান বাজানো হয়, রেসের ফুটবল খেলার খবর দেওয়া হয়।

ভাগ্যিস লোকটা আর ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রশ্ন করেনি। বিশেষ একটি জায়গায় এসে ড্রাইভার ম্যাপ বের করলেন। লোকটা কি হোটেলটার নাম এর আগে শোনেনি? জিজ্ঞাসা করতে বলল, 'আমি আজকাল রেগুলার ট্যাক্সি চালাই না।'

বুঝলাম গুল মারল। হোটেলের নাম জানবে না এমন কখনও হয়? বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর আমরা হোটেলটার উলটোদিকে পৌঁছোলাম। ড্রাইভার বলল, 'সাত ডলার দিন।'

সাত ডলার! সত্তর টাকা! লোকটা যদি আমার কাছে সত্তর চাইত তাও দিতে হত। কিন্তু চার নম্বর লোকটা নেমেছে অন্তত মাইলপাঁচেক আগে। জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা স্টেশন থেকে যদি আমি পুরো ট্যাক্সি নিয়ে আসতাম কত ভাড়া লাগত?'

ড্রাইভার বলল, 'মিটারটা দেখুন।'

দেখলাম সেখানে উনিশ ডলার উঠেছে। পরে যোগ করে দেখেছি আমার এবং অন্য চারজন যাত্রীর কাছ থেকে ড্রাইভার যা পেয়েছে তা কোনওমতেই বিশ ডলার ছাড়িয়ে যায়নি। অর্থাৎ মিটার অনুযায়ী এখানে শেয়ার ট্যাক্সির ভাড়া নির্দিষ্ট হয়। এমন তাজ্জব কথা কলকাতায় কেউ শুনেছে? ট্যাক্সিটা থামতেই ওয়াশিংটন হাউসের হোটেল থেকে একজন দারোয়ান এগিয়ে এসেছিল। ডিকি থেকে সুটকেস নিয়ে সে বলল, 'ওয়েলকাম স্যার।'

ভাড়া মিটিয়ে ফুটপাথ পেরিয়ে হোটেলের কাচের দরজা ঠেলে ঢুকলাম। বিশাল রিসেপশন। দারুণ সাজানো। এগিয়ে গিয়ে রিসেপশনিস্টকে বললাম, 'আমার জন্যে একটি ঘর এখানে বুক করা আছে।'

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, 'খুব অসুবিধে না হলে যদি আপনি আপনার নামটি জানান, তাহলে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

এ যেন বিনয়ের ফুলঝুরি। নিজের পরিচয়, আমন্ত্রণের চিঠি দেখানোর পর একটা চাবি পাওয়া

গেল। খাতায় সইপত্র করতে হল। রিসেপশনিস্ট বললেন, 'সোজা পাঁচতলায় উঠে যান। চাবিতে ঘরের নম্বর দেওয়া আছে।'

কিন্তু আমার সুটকেস? রিসেপশনিস্ট আশ্বস্ত করল, আমার ঘরে ওটা ঠিকই পৌঁছে যাবে। চাবিটা নিয়ে চারপাশে তাকালাম। সুন্দর সাজানো লাউঞ্জে বেশ মিষ্টি গন্ধ ভাসছে। ওপাশে সম্ভবত রেস্টুরেন্টের প্রবেশ পথ। আমেরিকান হোটেল শ্রেণিবিন্যাসে এটি তিন না চার তারায় পড়বে তা আমার জানা নেই। খানিক এগিয়ে পরপর চারটি লিফটের দরজা পেলাম। লিফট নামছে। আমি নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে। হতভম্ব হয়ে দেখলাম লিফট নীচে নেমে গেল। আমি দাঁড়িয়ে আছি একতলায়। একতলার নীচে, মাটির তলাতেও দুটো ফ্লোর আছে নাকি?

পাঁচতলায় উঠে মনে হল শূন্য রাজপ্রাসাদে ঢুকে পড়েছি। নিজের চাবির নম্বর অনুযায়ী ঘরের দরজা খুলে হতভম্ভ হয়ে গেলাম। এত রীতিমতো হলঘর। একটা দেওয়াল পর্দামোড়া। বিশাল খাট। আধুনিকতম সব আরাম ছড়ানো। সঙ্গে-সঙ্গে দরজায় মৃদু শব্দ এবং আমার সুটকেস ঘরে এল। এমন টয়লেট বাথরুম আমি কখনও ব্যবহার করিনি। ঘরে ঢোকামাত্র একটা অস্বস্তি শুরু হয়েছিল। সেটা কাটাতেই ভাবলাম শুয়ে পড়া যাক। বিছানার ঠিক মাঝখানে শরীর ফেলে দিতেই মনে হল এর নামই আরাম!

কিন্তু ঘুম এল না, অস্বস্তি এল। এমন বিলাসকক্ষে কখনও থাকিনি বলে নয়, বিশাল ঘরটা যেন আমার বুকে চেপে বসেছিল। মাঠের মতো খাটে কয়েকবার গড়ালাম। এরকম একটা দারুণ ঘরে যদি আমার বন্ধুবান্ধবরা থাকত, খুব আফসোস হচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে মনে হল আমার তো খিদে পাওয়া উচিত। মনোজ বলে দিয়েছিল তারামার্কা হোটেলের রেস্টুরেন্টে কখনও ভুলেও খেতে ঢুকবেন না। আপনার পকেট তখন আপনার থাকবে না। তাহলে দোকানের খাবার কোথায় পাই? এ তল্লাটের ম্যাকডোনাল্ড খুঁজে বের করতে হবে। সেজেগুজে নীচে নেমে আসতেই দেখলাম রোদ মরেনি তখনও। রিসেপশনিস্টকে চাবিটা দেওয়ার সময় ভাবলাম ম্যাকডোনাল্ডের কথা জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু পাশেই কেতাদুরস্ত হোটেলের নিজস্ব রেস্টুরেন্ট থাকা সত্ত্বেও ওই প্রশ্ন করলে লোকটা আমাকে নিশ্চয়ই ফেকলু ভাববে। ফুটপাতে নেমে চারপাশে তাকিয়ে তেমন লোকজন দেখতে পেলাম না। বাঁ-দিক ধরে হাঁটতে লাগলাম। দোকানপাট সব বন্ধ। যেন রবিবারের সকালে ডালহৌসির ফুটপাতে হাঁটছি। ভুল হল, সেখানেও এর চেয়ে বেশি লোক থাকে। ব্যাপারটা কী? আমেরিকার রাজধানীর ফুটপাত জনশূন্য? গাড়ি যাচ্ছে মাঝে-মাঝে। বেশ খানিকটা হাঁটার পর মনে হল বাঁ কিংবা ডানদিক গেলে দোকান-টোকান পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যদি রাস্তা হারিয়ে ফেলি? কাউকে যে শুধাব তারও তো উপায় নেই। হঠাৎ একটা রেস্টুরেন্টের সাইনবোর্ড দেখতে পেলাম। দরজার বাইরে কাঁটা চামচ আর প্লেটের ছবি আঁকা দেখে মনে হল আমাদের বসন্ত কেবিন টাইপের হবে। কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে দেখলাম লম্বা-লম্বা টেবিল খদ্দেরশূন্য হয়ে রয়েছে। একপাশে একটা কাউন্টার সেখানে বসে আছে থুরথুরে এক বুড়ি। কাছে এগিয়ে যেতে কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়েস?'

বিনীত ভঙ্গিতে জানতে চাইলাম, 'দোকান কি বন্ধ?'

বুড়ি হাত ওলটালেন, 'তাহলে এখানে কি আমি পুতুল হয়ে বসে আছি? কী খেতে চাও বলো, বাজে কথা বলার সময় আমার নেই?' রোগা শিরাশিরায় ছাওয়া বুড়ি তো চুপচাপ বসেই আছেন, সময় না থাকার হুমকি দিলেন কেন? মেনুকার্ড নিয়ে চেনা খাবার খুঁজতে গিয়ে হতাশ হলাম। একমাত্র রু জ্যাম ছাড়া কিছুই চিনতে পারছি না। সামনে পুরো রাত পড়ে রয়েছে। রুটি আর জ্যাম খেয়ে কাটাতে হবে? মনে হয় চোখে মুখে অসহায় ভাব ফুটে উঠেছে। হঠাৎ বৃদ্ধার গলা একটু পালটাল, 'পেট ভরে খেতে চাও নাকি একটু আধটু!'

'পেট ভরেই, কিন্তু—।'

'পকেটে তিন ডলার আছে?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, কিন্তু আপনাদের খাবার—?' আমাকে শেষ করতে দিলেন না উনি, 'দেশ কোথায়? পাকিস্তান?'

'আজ্ঞে না, ভারতবর্ষ।' রেগে গেলেও প্রকাশ করলাম না।

বুড়ি চোখ বন্ধ করে কিছু ভেবে আমাকে ইশারা করলেন টেবিলে যেতে। মিনিটপনেরো পরে তিনি উদিত হলেন পাশের আর একটি দরজা দিয়ে। বয়স হলেও শক্ত আছেন নইলে ট্রেটা ওভাবে ধরতে পারতেন না। টেবিলে খাবার পরিবেশিত হলে দেখলাম একটি বিশাল তন্দুরি রুটি টাইপের বস্তু, আলু সেদ্ধ, কয়েকরকমের শাক সেদ্ধ, পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা এবং একটি বিশাল ওমলেটের সঙ্গে অল্প আইসক্রিম। ইচ্ছে হচ্ছিল বুড়িকে প্রণাম করি। জিজ্ঞাসা করলাম কী করে বুঝলেন 'এইটে আমার ভালো লাগবে?'

বুড়ি কোনও উত্তর না দিয়ে ফিরে গেলেন। হঠাৎ যেন বাঙলাদেশের ঠাকুমা দিদিমার স্পর্শ পেলাম। তাঁদের প্রশংসা করলে তো এইভাবে এড়িয়ে যান। ঠিক করলাম খিদে পেলেই এখানে চলে আসব। আমেরিকায় এসে এই অবধি যখন গোরু শুয়োরের আশ্রয় নিতে হয়নি মনোজের কৃপায় তখন এই বুড়িকেই খুঁটি করা যাক।

সাড়ে ন'টার সময় হোটেলে ফিরলাম। চাবি নিতে গিয়ে দেখলাম রিসেপশনিস্ট বদল হয়েছে। যিনি এসেছেন তিনি বললেন, 'দুজন আপনাকে দুবার টেলিফোন করেছেন।' দুটো কাগজ এগিয়ে দিলেন আমার সামনে। বেশ অবাক হয়ে ও দুটোতে নাম এবং টেলিফোন নাম্বার লেখা দেখলাম। রবার্ট নামের লোকটি কে? আর জুলি নাম্নী লস এঞ্জেলেস্ শহরের মহিলাটি আমার হদিস পেলেন কী করে? তিন হাজার কিলোমিটার দূর থেকে তিনি পয়সা খরচ করে আমায় ফোন করতে যাবেন কেন? ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আর সঙ্গে-সঙ্গেই টেলিফোনের গায়ের যন্ত্রটা বিপ বিপ করে উঠল। ওটাকে কীভাবে থামাতে হয় জানা নেই। এখানে কি টেলিফোন এলে রিং হয় না? মনোজের বাড়িতে তো টেলিফোন কলকাতার মতনই বাজে। রিসিভার তুললেই বিপ বিপানি বন্ধ হল। ওপাশ থেকে গলা পেলাম, 'গুড ইভনিং মিস্টার মজুমদার, দিস ইজ বব।'

মনোজ বলেছিল, সাহেবদের নামের পুঁজি বড় অল্প। ডাক নামের।

যিনি এডওয়ার্ড তিনি এড হবেনই। চার্লস চার্লি, রবার্ট বব, উইলিয়াম উইলি। অর্থাৎ এখন যিনি টেলিফোনে আছেন, তিনি একটু আগে রবার্ট নামে আমার খবর নিয়েছিলেন। বব হলেন সরকারি দপ্তরের সেই কর্তা যাঁর ওপর আমার আমেরিকার ভ্রমণের দায়িত্ব পড়েছে। বব তাঁর অফিসের ঠিকানা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করে বললেন, আমি যেন আগামীকাল সকাল সাড়ে দশটায় সেখানে পৌঁছে যাই। রিসিভার নামিয়ে রেখে দেখলাম সব গুলিয়ে যাচ্ছে। ববের ঠিকানাটা মনে রাখা অসম্ভব। হঠাৎ মনে পড়ল কলকাতায় সুপ্রিয়দা একটা কাগজে কিছু লিখে দিয়েছিলেন। সম্ভবত এই ঠিকানাটাই। পরে খুঁজে দেখব সেটাকে পাই কি না।

কিছুই করার নেই এখন। বাইরে সবে অন্ধকার নামছে। তারা মার্কা হোটেলের এমন শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে অবশ্য সেটা বোঝার উপায় নেই। ওয়াশিংটনে তো বাঙালিরাও থাকেন। তাঁরা কোথায়? হাত বাড়িয়ে টেলিফোন ডাইরেক্টরিটা টেনে নিয়ে বাঙালির উপাধি খুঁজতে লাগলাম। প্রায় আধঘণ্টা দেখে-দেখে চোখের মাথা যখন খাওয়ার মুখে তখন পি অ্যালফাবেটে পৌঁছোলাম। এবং তখন দুটো শব্দে চোখ থামল। আর পাইন। পাইন বাঙালি উপাধি। অন্যদেশেও কি পাইন আছে? নাকি আমি উচ্চারণ ভুল করছি? একটা ফোন করলে কেমন হয়? স্রেফ বাংলায় প্রশ্ন করব। বাঙালি না হলে উলটোপালটা বলবে এবং তখন লাইন কেটে দেব। বেশ ভয়ে ভয়েই আমি ডায়াল করলাম। সঙ্গে-সঙ্গে ওপাশে বাজনা বাজল। এবং তার একটু বাদেই চোস্ত মার্কিন ইংরেজিতে একটি ভারী গলা জিজ্ঞাসা করল আমার পরিচয়। চট করে বলে ফেললাম, 'আপনি কি বাঙালি?'

এক মুহূর্ত চুপচাপ। রিসিভার নামিয়ে রাখব ভাবছি অমনি ভেসে এল, 'হ্যাঁ, অবশ্যই আমি

বঙ্গসন্তান। মহাশয়ের পরিচয় জানতে পারি কি?'

ততক্ষণে জুৎ করে উঠে বসেছি। বললাম, 'ক্ষমা করবেন। হোটেলের ঘরে একা হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে আপনার উপাধি দেখতে পেলাম।'

মৃদু হাসির শব্দ ভেসে এল, 'কবে এসেছেন ওয়াশিংটনে?'

'আজ দুপুরে।'

'কাজে কর্মে—?'

'ঠিক তা নয়। দেশটাকে দেখতে।'

'ও। আমার নাম রমেন পাইন। ভয়েস অফ আমেরিকার বাংলা বিভাগে কাজ করি।'

'আরে! আপনাকে তো আমি দেখেছি। কলকাতা দূরদর্শনে একসময়ে খবর পড়তেন না।'

'হ্যাঁ। মনে রেখেছেন বলে ধন্যবাদ। কোন হোটেলে আছেন?'

'ওয়াশিংটন হাউস হোটেল।'

'তাহলে তো প্রচুর ডলার সঙ্গে আছে।'

'না-না। মার্কিন সরকার অনুগ্রহ করছেন।'

'ওঁরা তো যাকে-তাকে ওটা করে না। আপনার নামটা শুনতে পারি?'

আমেরিকার বাঙালিরা বাংলা সাহিত্য পড়ার সময় পান না। নব্বুই ভাগের ইচ্ছাও হয় না। তাঁরা বাঙালি লেখক বলতে রবীন্দ্রনাথের পর তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণের নাম শুনেছেন। ষাটের দশকে চলে আসা এইসব ভাগ্যান্বেষীরা সমরেশ বসুর নামের সঙ্গে পরিচিত হলেও হতে পারেন। সেক্ষেত্রে —নাম বললাম।

'আরে মশাই! আপনি কী, অ্যাঁ? খুব বোকা বানালেন যা হোক। আমি টিভিতে শব্দ উচ্চারণ করতাম সেটা আপনার সঙ্গে কোনও তুলনায় আসে? দাঁড়ান আসছি।' লাইন কেটে গেল। আমি আবার ধন্দে পড়লাম। টেলিফোনে কামালও বোস্টন থেকে আসছি বলে পরের ভোরে নিউইয়র্কে উপস্থিত হয়েছিল। রমেন পাইন কত দূরে থাকেন কে জানে। তিনি কি কামালের মতো একই গ্রহ নক্ষত্রের মানুষ? ঘরে না বসে লাউঞ্জে বসলে কেমন হয়? হোটেলে যখন-তখন রকমারি লোক দেখা যেতেই পারে। দরজা বন্ধ করে আবার নীচে নেমে এলাম।

রমেন পাইনকে চিনতে আমার মোটেই অসুবিধে হয়নি। স্মার্ট সুদর্শন বঙ্গসন্তান যতই শীতের কারণে জ্যাকেটে মুড়ে থাকুন না মুখের হাসিটি লুকোবেন কোথায়? মুখোমুখি হয়ে বললেন, 'খুব দেরি করিনি নিশ্চয়ই সমরেশবাবু। চলুন।'

'কোথায়?' মনে হচ্ছিল ওয়াশিংটন শহরটা আর অজানা জায়গা নয়।

'আমার বাড়িতে। জুলি বসে আছে আলাপ করবে বলে।'

'জুলি? রমেনবাবু কি আমেরিকান মহিলার স্বামী?'

'আমার স্ত্রী। মেয়েরাও আছে। চলুন, আর কথা নয়।'

রাত তখন এগারোটা। রাস্তাও প্রায় গাড়িহীন। রমেনবাবুর পাশে বসে মসৃণ রাজপথ বেয়ে গাড়ি কোন গতিতে ছুটে চলেছে খেয়াল করিনি। রমেন বললেন, 'কাল হোটেল ছেড়ে আমার ওখানে চলে আসুন। সুনীল ওয়াশিংটনে এলেই আমাদের কাছে চলে আসেন।' বুঝলাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে এদেরও সখ্যতা রয়েছে। জানি না কী কারণে মনোজের সঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচয় হয়নি কিন্তু আমেরিকার তরুণ বাঙালিরা সবাই ওঁকে চেনে। এটা যতটা না ওঁর লেখা পড়ে, তার চেয়ে বহুগুণ ওঁর সান্নিধ্য পেয়ে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কলকাতায় চাকরি ছেড়ে কীরকম লাগছে এখানে?'

'আমি এখন টাকা রোজগারের মেশিন! টাকার জন্যে এসেছি, লাগালাগির ব্যাপারটা মাথা থেকে উড়িয়ে দিয়েছি। ওসব ভাবি না।'

'তবু?'

হঠাৎ গলা তুললেন রমেন, 'কদিন থাকুন বুঝতে পারবেন। যন্ত্র হয়ে গেছি মশাই। বন্ধুবান্ধব নেই, আড্ডা নেই, পরচর্চা নেই, কবিতা আবৃত্তি নেই, ইচ্ছে করলে বই পাওয়া যায় না, এখন আমি একটি রোবট। দেশে যদি হাজার টাকার চাকরি পেতাম আর ফিরতাম না! এখানে আমার গাড়ি, মেয়ের গাড়ি। চারজনেই একটা না একটা চাকরি করি। ডলারের স্বাদ বড় খারাপ নেশা তৈরি করে। আমরা অ্যাডিক্টেড হয়ে গেছি। এখন আমি চাইলেও আমার স্ত্রী মেয়েরা দেশে ফিরবে না। মাসখানেকের জন্যে বেড়াতে যাওয়া—ওই অবধি ওদের দেশপ্রেম। বেঁচে থাকার যতরকম সুবিধে যারা একবার ভোগ করতে আরম্ভ করে তাদের ইমোশনাল ব্যাপারটা ভোঁতা হয়ে যায়। অথচ আমি, বিশ্বাস করুন কাল দেশে ফোন করেছিলাম জীবনানন্দের বোধ কবিতার দুটো লাইন জানতে। বইটা আমার কাছে নেই এবং লাইন দুটো মনে পড়ছিল না কিছুতেই। আমার স্ত্রী বলবেন এটা আমার ব্যক্তিগত সমস্যা, অ্যাবসলিউটলি আমার। মানছি।'

কোনও মানুষ যখন নির্জন মুহূর্তে সরবে মনের গোপন ব্যথা জানাতে শুরু করে তখন তার প্রিটেনশন থাকে না। রমেনের মুখের থমথমে চেহারাটা গাড়ির ড্যাশবোর্ডের আলোতেও আমার চোখে ধরা পড়ল। অনেকটা চলে এসেছি আমরা। হঠাৎ একটা মোড় ঘুরে ছবির মতো বাড়িগুলো দেখিয়ে রমেন বললেন, ওই যে আমার বাড়ি। কেমন বুঝলেন?'

॥ ১২ ॥

একটা ছবির মতো দোতলা বাড়ি, সামনে বড় ঘাসের লন, পেছনে চমৎকার ফুলের এবং ফলের বাগান, প্রতিটি ঘরের মেঝে কার্পেটে মোড়া, রঙিন ভিসিআর-এর লেটেস্ট মডেল, রান্নাঘরে চূড়ান্ত আধুনিক সরঞ্জাম, ফ্রিজে লোভনীয় খাবারের স্তূপ, নতুন কায়দায় কর্ডলেস টেলিফোন—একটি বাঙালি পরিবারের স্বপ্ন এর চেয়ে বেশি কী হতে পারে। আর হ্যাঁ, সেইসঙ্গে বাড়ির একপাশের রঙিন গ্যারেজে দুটো এয়ারকন্ডিশন গাড়ি সবসময় প্রস্তুত। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির উঁচু তলায় চাকরি করলে এই ধরনের সুবিধে কেউ-কেউ এদেশে পেয়ে থাকেন। সরকারি আমলারা যে মাইনে পান তাতে এই স্বাচ্ছন্দ্য স্বপ্নাতীত। কেউ-কেউ যখন তা আয়ত্তে রাখে তখন বুঝতেই হয় তাঁর দু-তিন নম্বরী টাকার স্রোত বেশ টগবগে। কিন্তু আমেরিকায় একজন অধ্যাপক, একজন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার অথবা দশ বছর চাকরি করা অফিসার এই সম্পত্তির মালিক হবেন যদি তাঁর স্ত্রী কাজ করতে বের হন। ধরুন আপনার মাস মাইনে হাজার ডলার। না, টাকায় অঙ্কটা নিয়ে যাবেন না। ডলারটাকে টাকাই ভাবুন। নব্বুই সেন্ট বাস ভাড়াটাকে নব্বুই পয়সা ভাবাই ভালো। আপনি বাড়িভাড়া করতে গেলে তিনশো ডলারের নীচে দেড়খানা ঘর শহরের বাইরে পাবেন না। এবার আপনি ধার নিলেন ষাট হাজার। ওই ডলারে একটা ছোটখাটো বাড়ি কুইন্সে হয়ে যায়। প্রতি মাসে পাঁচশো মাইনে থেকে কেটে নেওয়া হবে সুদ সমেত। কুড়ি বছর পর বাড়িটার মালিক হয়ে যাবেন আপনি। ছ'হাজারে সুন্দর একটা হাতফেরতা গাড়ি পেয়ে যাবেন। গাড়ির জন্য মাসে দেড়শো করে কাটবে। অর্থাৎ এবার আপনি হাতে পাচ্ছেন তিনশো। গাড়ির এবং বাড়ির মালিক হওয়ার পর আপনি রোজ এক কেজি মুরগির মাংস, রুটি, দুধ, ফল এবং সবজি আড়াই ডলারে পেয়ে যাবেন। অর্থাৎ মাসে পঁচাত্তর। রইল দুশো পঁচাত্তর। পঞ্চাশ ডলার দেবেন ফার্নিচার্স হায়ার পারচেজ কিনে রাখার জন্যে। পঞ্চাশ ডলার জামা কাপড়ের জন্যে। এবার একশো পঁচাত্তরের মধ্যে একশো রাখুন গাড়ির তেল ইলেকট্রিক বিলের জন্যে। পঁচিশ গ্যাস এবং অন্যান্য খরচ। পঞ্চাশ হাত খরচ। হ্যাঁ, এই অঙ্কে মদ্যপান, রেস্টুরেন্টে খাওয়া

সম্ভব নয়। এবার আপনার স্ত্রী যদি কাজে বের হন এবং তিনি যদি মাসে পাঁচশো ডলার হাতে পান তো ও'গুলো করে শ'দুই ডলার নির্ঘাত জমাতে পারেন প্রতি মাসে। দেশে আসার সময় অঙ্কটা অবশ্য দু-হাজারের বেশি দেখাবেই, তো দেখাক না। ভালো লাগাটা তখনই আসুক। মনে রাখবেন এখানে যাই হোক, ওদেশে এক ডলারের মান এক টাকার সমান। এই হিসেবের কিছুটা মনোজের মুখে শোনা কিছুটা রমেনবাবু বললেন। আমরা বসেছিলাম ওদের একতলার বসার ঘরে। রমনের স্ত্রী জুলি অত্যন্ত মিশুকে মহিলা। এদেশে চাকরি করেন। চেহারা এবং পোশাকে এদেশের সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে নিয়েছেন। রমেন বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, সমরেশবাবু, যা কিছু পাওয়ার তা আমরা পেয়েছি। কিন্তু বড় একা হয়ে গেছি এই পাওয়ার দাম নিতে।'

জুলি বললেন, 'এটাই হয়েছে মুশকিল। সবসময় এই ভাবনাটা ওর মাথায় এমন পাক খায় যে কোনও কিছুতেই আর সুখ পায় না। যে দেশে আজ আছ সেই দেশের মতো হও না। এমন ক্রাইসিসের জীবন পাওয়ার জন্যেই তো এক সময় ছটফট করেছ।'

আমি দুজনকে দেখছিলাম। মনোজ বলেছিল, 'আমেরিকায় এসে দেশের জন্যে হা-হুতাশ করার রোগে কিছু বাঙালি ভোগে। কিন্তু দেশে বেড়াতে গিয়েই আইঢাই করতে থাকে ফিরে আসার জন্যে। আবার এদেশে কোনও বাঙালি বেড়াতে এলেই এমন ভাব দেখায় যে তার বুক দেশে ফিরে যাওয়ার জন্যে ফেটে যাচ্ছে। সবসময় ইচ্ছাকৃত নয়, অভ্যেস থেকেও এটা হয়।'

মনোজের কথাটা রমেনবাবুর ওপর কতটা প্রযোজ্য তা বুঝতে পারছিলাম না। জুলি কিন্তু আমার কাছে স্পষ্ট। ওঁকে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। আমি জানি না রমেনবাবুর কষ্টটা হয়তো ঠিক। সন্দেহ করাই আমার অভ্যেস হয়ে গেছে হয়তো।

জুলি বললেন, 'আপনাকে আজ খেয়ে যেতে হবে সমরেশ।'

মাথা নাড়লাম, 'আজ নয়। বিন্দুমাত্র খিদে নেই।' এইসময় ওঁদের ছোট মেয়ে নেমে এল। মিষ্টি চেহারার কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ে। স্বচ্ছন্দে বলল, 'আপনাকে আংকল বলতে একটুও ইচ্ছে করছে না।'

জুলি উঠে গেলেন কফি আনতে। মেয়েটিকে আমার খুব পছন্দ হল। ও এদেশে এসেছে পাঁচ-সাত বছর বয়সে। দেশের আবহাওয়াতে ওইটুকুনি বয়স কাটিয়ে ও মানুষ হয়েছে আমেরিকার পরিমণ্ডলে। ওর কথাবার্তা আচার-আচরণে যে বিদেশি ছাপ পড়ছে তা আমাদের দেশের ইংরেজি মিডিয়ামে পড়া মেয়েদের ওপরও পড়ে না। মনোজের 'এই দ্বীপ এই নির্বাসন' ছবিটির জন্যে শিল্পী নির্বাচন করতে গিয়ে আমরা ওই চরিত্রটি নিয়ে কিছু ভাবতে পারিনি। দেশের কোনও অভিনেত্রীর দ্বারা ওই চরিত্রটিকে ফোটানো অসম্ভব। কথাবার্তায় মার্কিন ম্যানানিজম, হাঁটা চলা চাহনিতেও সেটা স্পষ্ট অথচ মেয়েটি বাংলা বলবে—এ যেন সোনার পাথরবাটি। মনোজ বলেছিল, 'কলকাতা নয়, মেয়েটিকে খুঁজে বের করতে হবে আমেরিকা থেকেই।'

এখন এত রাতে এই মেয়েটির মুখোমুখি বসে আমার মনে হল চিত্রনাট্যে যার কথা লিখেছি এ সেই। ও এখানে কলেজ করছে, অন্য সময় ছোটখাটো কাজও করে। পরনে স্কার্ট। চুলগুলো কাঁধ ছোঁওয়া। বাবার সঙ্গে যখন ইংরেজি বলছে তখন মনে হয় না বাঙালি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার কালো বন্ধু নেই।'

'চারজন। হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞাসা করলেন কেন?'

এবার রমেনবাবুর সামনেই ওকে প্রস্তাবটা দিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে ও লাফিয়ে উঠল। চিৎকার করে বলল, 'আই উইল লাভ টু ডু দ্যাট! কী করতে হবে বলো, প্লিজ।'

মুহূর্তে আমি তুমি হয়ে গেলাম। এবং তারপরের পনেরো মিনিট আমরা যেভাবে কথা বললাম তাতে মনে হচ্ছিল আমরা অনেকদিনের পরিচিত। এবার রমেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মেয়ে যদি ছবিতে অভিনয় করে তাহলে তাঁর আপত্তি আছে কি না?'

রমেন বললেন, 'বিন্দুমাত্র নয়। ও বড় হয়েছে ভালোমন্দ ও বুঝবে। এ ব্যাপারে নাক গলানো আমি মোটেই পছন্দ করি না। তা ছাড়া আপনাদের ছবির বিষয় আমার খুব পছন্দ হয়েছে।'

জুলিও রমেনের সঙ্গে একমত।

কফি খাওয়া হয়ে গেলে দেখলাম মধ্যরাত পার হয়ে গিয়েছে। ওঠার সময় হল। ওঁরা অনুরোধ করলেন রাতটা থেকে যেতে। আমি রাজি হলাম না। রমেনের সঙ্গে ওঁর গাড়িতে উঠে অবশ্য খারাপ লাগল। আমাকে ওয়াশিংটনে পৌঁছে দিয়ে ওঁকে আবার এতরাতে ফিরে যেতে হবে। রমেন আমি নানারকম গল্প করতে-করতে ফিরে এলাম। নামিয়ে দেওয়ার সময় রমেন বলে গেলেন, 'কাল পাঁচটায় হোটেলে থাকবেন। আমি আর জুলি এসে আপনাকে তুলে নেব। কোথাও যাবেন না।'

হোটেলের নিগ্রো দারোয়ান নক করল। ঘুমন্ত রাজপ্রাসাদ। রিসেপশনে কাউকে দেখছি না। অবশ্য পাঁচতলার নিজের ঘরে পৌঁছোতে অসুবিধা হল না। জামাপ্যান্ট ছেড়ে বিশাল বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়েছি যেই অমনি টেলিফোন বেজে উঠল। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলতেই মনোজের গলা কানে এলে, 'আচ্ছা লোক তো, রাত আড়াইটে অবধি কোন সুন্দরীর সঙ্গে নতুন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দশটা থেকে টেলিফোন করছি আর শুনছি আপনি নেই!'

মনোজকে রমেন পাইনের কথা বললাম। ও বলল, 'ভাগ্যবান লোক মশাই। যেখানে যাচ্ছেন সেখানেই জমিয়ে নিচ্ছেন।'

তখন বললাম, 'না জমালে পিংকিকে পেতাম না।'

'পিংকিকে পেয়েছেন?' মনোজ উত্তেজিত।

'ইয়েস স্যার। রমেনবাবুর ছোট মেয়ে। ঠিকঠাক পিংকি।'

'ওঃ সাবাস। আমার এখনই দেখতে ইচ্ছে করছে। আপনি বলে দিন পিংকি যদি একবার নিউইয়র্কে চলে আসে খুব ভালো হয়। কাল রাতে আবার কথা বলব।'

ঘুম আসছিল না। একা, ভীষণ একা লাগছিল। হঠাৎ মনে হল একটা গল্প লিখলে কেমন হয়? কাগজপত্র নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসলাম। মিনিটপাঁচেকের মধ্যে আমি একটা গল্প শুরু করলাম উত্তরবঙ্গের স্বর্গছেঁড়া চা বাগানের পাশ দিয়ে তিরতিরিয়ে বয়ে যাওয়া আঙরাভাসা নদী আমার গল্পের পটভূমি।

ঠিক সকাল আটটায় ঘুম ভাঙল টেলিফোনের আওয়াজে। ঘুম-ঘুম আলিস্যি নিয়ে রিসিভার তুলতেই মিষ্টি গলা ভেসে এল, 'কী করছ? ঘুমাচ্ছ?'

বুঝতে পারলাম গলাটা। বললাম, 'ঠিক তাই।'

'ওমা, এখনও?'

'কাল সাড়ে চারটে পর্যন্ত গল্প লিখছিলাম।'

'লাভলি। এইজন্যে তোমরা আলাদা। আজ সন্ধেবেলায় কী করছ?'

'কেন?'

'আমার সঙ্গে চলো। একটা ডিসকো ক্লাবে যাব। ফ্যান্টাস্টিক।'

'রমেনবাবু বলেছেন পাঁচটার সময় তোমার মাকে নিয়ে এখানে আসবেন।'

'কাটিয়ে দাও। বাবা সবসময় নিজের সঙ্গে কথা বলে আর মা—তুমি খুব বোর হবে। আমার সঙ্গে গেলে লেখার সাবজেক্ট পাবে।'

'শোনো, আমি তো লেখার সাবজেক্টের পেছনে ছুটি না, সাবজেক্ট আমার কাছে চলে আসে। আজ নয়, আর একদিন হবে খুকি। তবে তোমাকে একদিন যেতে হবে নিউইয়র্কে। ছবির পরিচালক তোমায় দেখতে চায়।

'তুমি কবে ফিরবে নিউইয়র্কে?'

'দিন পনেরো কুড়ি পরে।'

'ফিরে ফোন করলে চলে যাব। বাই, হ্যাভ এ বোরিং টাইম।'

হোটেল থেকে বেশ সেজেগুজে বের হলাম। কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়ে ট্যাক্সি নিলাম। গোটাআটেক ডলার পকেট থেকে বেরিয়ে গেল। লিফটে নির্দিষ্ট ফ্লোরে উঠে অফিসের দরজাটা দেখলাম। ছোট ঘর। দু-তিনজন মানুষ কাজ করছেন। পরিচয় দিতেই ওঁরা ভেতরে খবর পাঠালেন। একটু বাদেই এক সুন্দরী শ্বেতাঙ্গিনী এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিস্টার মজুমদার?'

মাথা নেড়ে উপস্থিতি জানালাম। মহিলা অনুরোধ করলেন ভেতরে আসতে। করিডোর পেরিয়ে মোটামুটি একটা বড় ঘরে ঢুকে মহিলা বললেন, 'বব, হেয়ার হিজ মিস্টার মজুমদার।' বেশ স্মার্ট মধ্যবয়স্ক এক ভদ্রলোক চেয়ার থেকে উঠে হাত মেলালেন। ইনিই বব, ওরফে রবার্ট। ভদ্রলোক আমাকে বসতে বললেন। জিজ্ঞাসা করলেন আমেরিকা কেমন লাগছে? মিনিটতিনেকের মধ্যে আমরা বেশ খোলামেলা কথা বলতে লাগলাম। যদিও আমার মাথার মধ্যে কাজ করছিল এদের সঙ্গে সি.আই.এ-র সম্পর্ক রয়েছে তবু বলতে বাধছিল না। আমাকে মার্কিন সরকার পনেরো দিনের আতিথ্য দেবে। এই পনেরো দিন এই বিরাট দেশের যে-কোনও জায়গায় যেতে পারি। আমার প্লেন খরচ, ট্রান্সপোর্ট, হোটেল কনসেশন এঁরাই দেবেন। এবং এ ছাড়া প্রতিদিন আমি একশো ডলার করে একটা বিশেষ ভাতা পাব। আর এই পনেরো দিন আমাকে দেখভাল করার জন্য একজন এসকর্ট দেওয়া হবে। এবার আমি কোথায়-কোথায় যেতে চাই, তা ঠিক করতে হবে। বব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি আমেরিকার কোন-কোন শহরে যেতে চাই? এমনই উদো আমি যে আগে থেকে ভেবেটেবে যাইনি। অতএব মনে যা এল বলে গেলাম, লস এঞ্জেলস্, সানফ্রান্সিস্কো, শিকাগো, ওয়াহিও, কলম্বাস। বব হাত তুললেন। পনেরো দিনে এই চারটি জায়গা কোনওমতে দেখতে পারি। এর বেশি পারা ওই সময়ের মধ্যে সম্ভব নয়। উনি রুট ঠিক করলেন। ওয়াশিংটন থেকে পিটার্সবার্গ এয়ারপোর্ট হয়ে যেতে হবে ওয়াহিও, কলম্বিয়া, সেখান থেকে শিকাগো, শিকাগো থেকে লস এঞ্জেলস্ হয়ে সানফ্রান্সিসকো। তারপরে নিউইয়র্কে ফেরত আসা। সময় মেপে দেখা গেল এতেই আমার পনেরো দিন চলে গেল। তখন আমি বুঝতে পারিনি, পরে ভেবেছি আমি হনলুলুটা বলতে পারতাম, বলতে পারতাম মায়ামি বিচের কথা। মাথায় আসেনি তখন। ওয়াহিও কলম্বিয়াতে আমি থাকব প্রভাত দত্ত এবং তনুশ্রীর বাড়িতে, শিকাগোতে হোটেলে। সেখানে দেখা করব প্রফেসর ডিমকের সঙ্গে। লস এঞ্জেলসে উঠব মনোজের বন্ধু বনজ বসুর বাড়িতে। আর সানফ্রান্সিসকোতে হোটেলে। যাদের সঙ্গে দেখা করব তাদের নামের একটা লিস্ট ধরিয়ে দিলাম। বব বললেন, 'আমি খুব দুঃখিত, হ্যারল্ড রবিন্স এখন ফান্সে। জেমস হ্যাডলি চেজ নামে কোনও লেখক জীবিত নেই। গ্রেগরি পেক, সিডনি পোয়েটার, অ্যান্টনি কুইন এবং ডাস্টিন হফম্যানের সঙ্গে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে আমি লস এঞ্জেলসের অফিসকে অনুরোধ করেছি।

বব ওঁর সেক্রেটারি, সেই সুন্দরী মহিলাকে আমার ভ্রমণসূচি দিয়ে বললেন, 'এয়ার টিকিট বুক করে পার্সন কনসার্নকে জানিয়ে দাও।'

ববের সঙ্গে কথা বলতে বেশ ভালো লাগছিল। খুব সহজেই আমরা জমে গেলাম। বব জানাল, আমাকে পনেরো দিনের জন্যে পনেরোশো ডলার আজই দেওয়া হবে। এবং সেই সঙ্গে যেসব জায়গায় যাব তার প্লেনের টিকিট। প্রতিটি এয়ারপোর্টে আমার জন্যে একটি গাড়ি অপেক্ষা করবে এবং সেই শহর থেকে চলে যাওয়ার সময় পর্যন্ত সেটি ব্যবহার করতে পারব। আমি যেখানে বন্ধুবান্ধবের কাছে থাকব সেখানে প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু হোটেলে থাকতে গেলে সরকারি অতিথি হিসেবে শতকরা চল্লিশভাগ চার্জ কমিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইবার বব তাঁর আলমারি থেকে

একটি ফাইল বের করে তা থেকে একটা কার্ড তুলে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন, 'এইটে যত্নে রাখবেন। এই পনেরো দিন যদি কোথাও কোনও বিপদে পড়েন তাহলে কার্ডটাকে দেখাবেন।'

সুন্দর ভিজিটিং কার্ডের মতো দেখতে সাদা বোর্ডে লেখা রয়েছে, 'মিস্টার সমরেশ মজুমদার আমাদের অতিথি। ওঁকে কোনওরকম সাহায্য করা মানে তা আমেরিকান সরকারকেই সাহায্য করা হবে। রোনাল্ড রেগন, প্রেসিডেন্ট।' সরকারি মোনোগ্রাম ছাপা রয়েছে কার্ডে। রোমাঞ্চিত হলাম। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা যা পড়েছি এখানে এসে তার তেমন প্রমাণ পাইনি। কিন্তু বুঝতে পারছি তাঁর অদৃশ্য হাত সর্বত্র। সেক্ষেত্রে এমন কার্ড সঙ্গে থাকা অরণ্যদেবের আশীর্বাদ পুষ্ট লকেট বুকে ঝোলানো। সযত্নে বুক পকেটে রেখে দিলাম ওটাকে।

ববের সেক্রেটারির নাম যদ্দুর মনে পড়ছে লিজা। লিজা এলেন কাগজপত্র নিয়ে। আমার টিকিট আগামীকাল পাওয়া যাবে। পনেরোশো ডলারের ট্রাভেলার্স চেক এগিয়ে দিয়ে সইসাবুদ করিয়ে নিলেন তিনি। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাঙাতে অসুবিধে হবে না তো? যে কোনও সিটি ব্যাংকে চলে যাবেন।'

'কাছাকাছি ব্রাঞ্চ আছে?'

বব বললেন, 'লিজা তুমি বরং মিস্টার মজুমদারকে দেখিয়ে দাও ব্যাংকটা। আর হ্যাঁ, মিস্টার মজুমদার আমরা আপনার জন্যে এসকর্টের ব্যবস্থা করেছি।'

'এসকর্ট?' অবাক হলাম।

'হ্যাঁ। এদেশে আপনি নতুন। এখন কোনও জায়গায় যেতে হলে ঠাওর করতে পারবেন না। তা ছাড়া আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। এখানে গাড়ি চালাবার জন্যে ড্রাইভার পাওয়া যায় না। এই এসকর্টই গাড়ি চালাবে আপনার। আপনার প্রোগ্রামের সব দায়িত্ব তার।'

সঙ্গে-সঙ্গে এই বঙ্গসন্তান সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। আমার এই পনেরো দিনের সফরে বব পেছনে টিকটিকি লাগাতে চাইছে। সি.আই.এর চর নাকি। ছাত্রজীবনে ছাত্র ফেডারেশন করেছি, এই খবরটা পেয়ে গেছে নাকি? হেসে বললাম, 'সরি। এতদূর যখন একা আসতে পেরেছি তখন আপনাদের দেশটা ঘুরে দেখতে এসকর্টের দরকার হবে না।'

কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে মাথা নাড়ল বব, ভুল করছেন। আপনি একটি শহরে গিয়ে কারও সাহায্য ছাড়া কিছুই না দেখে চলে আসবেন। একজনের অভিজ্ঞতা আপনাকে অভিজ্ঞ করবে। তা ছাড়া গাড়ির ব্যাপারটা তো রয়েছেই। লিজা, এসকর্টের কী হল?'

লিজা বললেন, 'আই অ্যাম এক্সপেক্টিং হার টুমরো মর্নিং।'

হার? বলছে কী। আমাকে এসকর্ট করবে একজন মহিলা?

পনেরো দিন ধরে! কী কাণ্ড! লিজা আমার মুখ দেখে বোধহয় বুঝতে পারলেন, 'শি ইজ ভেরি অ্যাকমপ্লিশড। সুন্দরী। সাতাশ বছর তিনমাস বয়স। বানানো নয়।'

লিজা আমাকে নিয়ে বের হলেন। আগামীকাল টিকিটের জন্যে আমাকে এখানে আসতে হবে। নীচে নেমে ফুটপাতে পা দিয়ে লিজা বললেন, 'আপনাকে একটা টিপস দিচ্ছি মিস্টার মজুমদার। আপনার এসকর্টটিকে আমরা দৈনিক রাহাখরচ দিচ্ছি। টাকাটা খুব ভালো। প্লাস কাজটার জন্যে টাকা পাবে। ওকে নিয়ে যখন রেস্টুরেন্টে ঢুকবেন, ঢুকতেই হবে খেতে, তখন ওর খাবারের দাম আপনি দেবেন না। ও আমাদের কাছে ওই জন্যে টাকা পাচ্ছে।'

ব্যাংক থেকে তিনশো ডলার ভাঙিয়ে লিজা ডলার এবং ট্রাভেলার্স চেকগুলো আমাকে দিয়ে বিদায় নিয়ে গেলেন। পকেটে ওই মহামূল্য বস্তুগুলো রেখে ফুটপাতে এলাম। অফিস থেকে বের হওয়ার আগে বব আমাকে আর একটি কার্ড দিয়েছিলেন। এটা দেখালে আগামীকাল সকালে আমি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রেগন সাহেবের বাসভবন হোয়াইট হাউসে ঢোকার অনুমতি পাব। কিন্তু এখন আমি কী করতে পারি। রাস্তায় লোকজন খুব কম। রাজধানী যেন কলকাতার সল্টলেক। শুধু

গাড়ির স্রোত বয়ে চলেছে। রাস্তায় বাস রয়েছে কিন্তু তারা কোথায় যাচ্ছে জানি না। বব আমাকে ওয়াশিংটনে দ্রষ্টব্য কেন্দ্রগুলোর একটা লিস্ট দিয়েছিল। নিউইয়র্কে আমি কিছুই দেখতে চাইনি। ওয়াশিংটনে ওসব দেখব? তবু সময় কাটানোর জন্যেই স্পেস রিসার্চ সেন্টারে চলে গেলাম একটা ট্যাক্সি নিয়ে। সত্যি এবং কল্পনার মধ্যে মেলামেলি অভিজ্ঞতা এখানে না এলে হত না। মহাকাশ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার একটা প্রাথমিক স্তরে চলে আসা যায় স্বচ্ছন্দে।

বিকেলে হোটেলে পাইন দম্পতি এলেন। ওদের গাড়িতে আমি শহরটা বেশ কয়েকবার পাক দিলাম। জুলি জিজ্ঞাসা করলেন, পাঙ্কদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে কি না। বললাম, দেখেছি, কিন্তু পরিচয় হয়নি। ওয়াশিংটনের রাস্তায় কালো মানুষের সংখ্যাই বেশি। মার্টিন লুথার কিং-এর খুনের পর এরাই ক্রোধে উন্মাদ হয়ে যে তাণ্ডব করেছিল, তার চিহ্ন এখনও ওয়াশিংটনের রাস্তায় রয়েছে। গাড়িতে ঘুরলে একটা ছিমছাম শহরের যে চেহারা তার বেশি কিছু আমি দেখলাম না। পাইন দম্পতি অতিরিক্ত মাত্রায় ভদ্রমানুষ। ওঁরা প্রথমে নিয়ে এলেন আমাকে একটা লেকের ধারে। সেখানে ফ্লোটিং দোকানে বিভিন্নরকমের মাছ বিক্রি হচ্ছে। বাঙালি মাত্রেই লোভী হবেন ওখানে গেলে। বিশাল গলদা চিংড়ির কেজি পঁচিশ টাকা, ডলার নয়। জুলি একটা দশ কেজি রুই এবং পাঁচ কেজি পরিমাণ চিংড়ি কিনে গাড়ির ডিকিতে বরফ দিয়ে রেখে দিলেন। মাছের বাজার কিন্তু মেছোবাজার নয়। দিল্লির বইমেলায় যেমন হাতেগুনতি লোক আসে এও তেমন। রীতিমতো ডাকাডাকি শুরু হয়ে যায় খদ্দের দেখলে।

আমরা একটা খুব সুন্দর রেস্তোরাঁয় বসলাম। খুব সিরিয়াস বিষয় নিয়ে কথা বললাম। মদ খেলাম যেটুকু না খেলে নয়। তারপর রাত হলে হোটেলে ফিরলাম। পাইন দম্পত্তি আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। এবং তার আধ ঘণ্টা বাদেই আমি পিংকির ফোন পেলাম, 'কেমন ঘুরলেন?'

'এই আর কী!' হাসলাম

'কেমন বোর হলেন?'

'এই আর কী!' এবার হাসি নয়।

'কী বলেছিলাম?'

'তুমি এখন কোথায়?'

'বান্ধবীর বাড়িতে। আসবেন?'

'না হে। এবার ঘুমাব।'

রিসিভার রেখে বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। আমার কি বয়স হচ্ছে? বুড়ো হয়ে গেছি? চোখের নীচের চামড়ায় কি হাঁসের পায়ের ছাপ পড়ছে? চট করে পাগলাদার মুখ মনে ভেসে এল। আমরা যখন ক্লাস থ্রিতে পড়তাম তখন পাগলাদা ম্যাট্রিক দিচ্ছেন। আমি যখন ক্লাস টেনে তখনও উনি চেষ্টা থেকে বিরত হননি। সেই পাগলাদার এক কাকা ছিলেন যাঁর বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। জুলপিতে পাক ধরেছে এবং সেই সময় সার্ট ধুতি পরার অভ্যেস থাকায় আমাদের মতো হত উনি যাকে বলে প্রৌঢ়। পাগলাদা পাশ করতে পারছেন না দেখে বকাবকি করায় তাঁর সম্পর্কে পাগলাদা বলেছিলেন, 'বুড়োটা যে কবে মারা যাবে!'

চল্লিশে পা দিলে আজ কাউকে বুড়ো বলা যায় না। অপর্ণা সেন আমার চেয়ে মাত্র তিন ক্লাস নীচে পড়তেন। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় ওঁকে দেখেছি। এখন ওঁকে দেখলে চিত্ত চঞ্চল না হলে ধরে নিতে হবে পেশমেকার বসানো আছে। তাহলে আমি বুড়ো হব কী করে। অঙ্কই তো উলটো কথা বলছে। কিন্তু পিংকির ডাকে সাড়া দিতে পারলাম না, কেন? নিজেকেই সবসময় বুঝি না।

বিছানায় শুয়ে আর একটা সুখ ভাবনায় আক্রান্ত হলাম। পনেরো দিন ধরে আমার গাড়ি চালাবেন, আমার সঙ্গিনী হবেন, যে হোটেলে আমি থাকব সেখানে একজন সাতাশ বছরের

শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা, ভাবা যায়? চোখের সামনে আভা গার্ডনার, ব্রিজিট বার্ডোর্ট, সোফিয়া লোরেন, লিজ টেলারের মুখ ভেসে এল। লিজা বলেছেন ইনি সুন্দরী। পনেরো দিন কম কথা? উত্তেজনায় ঘুমই আসছিল না। আচ্ছা, একসঙ্গে খেতে বসে একজন মহিলাকে দাম দিতে বলা যায়? আর একটু ভালো জামা প্যান্ট আনলে হত। পনেরোশো ডলার যা আজ পাওয়া গেল তার কত খরচ হবে জানি না, জানলে কালই কিছু কিনে নিতাম। বিছানায় চিৎপাত হয়ে সিগারেট ধরালাম।

আচমকা মাথায় অন্য একটা ভাবনা এল। আমেরিকায় এলাম কোনও কালো মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল না। কিছুদিন আগে একটা ছবিতে কালো মেয়েকে দেখেছিলাম। পাঁচ আট লম্বা হবেই, বিদ্যুতের মতো শরীর। অতএব সাদার বদলে কোনও কালো মেয়ে তো আমার এসকর্ট হতে পারত। শ্বেতাঙ্গিনী এসকর্ট হওয়ার জন্যে যা যা গুণ রপ্ত করেছে তা কি কোনও কৃষ্ণাঙ্গী অর্জন করতে পারেনি? চিন্তাটা মাথার মধ্যে এমন পাক খেতে লাগল যে তা থেকে মুক্তি পাচ্ছিলাম না। আমেরিকা মূলত কৃষ্ণাঙ্গের দেশ। শ্বেতাঙ্গরা এটাকে কলোনি করে পরে জাঁকিয়ে বসেছে। অতএব আমার গাইড হওয়া উচিত একজন কৃষ্ণাঙ্গীর। রিসিভার তুলে নিয়ে ববকে ডায়াল করলাম। কিছুক্ষণ বাদে ববের ঘুমজড়ানো গলা পেলাম। নিজের পরিচয় দিতেই তিনি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ইয়েস মজুমদার, কোনও বিপদআপদ?'

'না-না। আপনাকে অনুরোধ করব।'

'বেশ তো।'

'আমার এসকর্টটি যদি শ্বেতাঙ্গিনীর বদলে কৃষ্ণাঙ্গী হয়, তাহলে আপনার আপত্তি আছে?'

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ, 'বেশ তো, কোনও চিন্তা করবেন না। তবে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কাল সকালে গিয়ে গাইডদের লিস্ট দেখে বদলাতে চেষ্টা করব। গুড নাইট।'

ঘড়ি দেখে লজ্জিত হলাম। মধ্যরাতে পেরিয়ে গেছে। এটা কি ফোন করার সময়? পরদিন সকালেই ববের ফোন এল, 'সরি মজুমদার, আমাদের লিস্টে দুজন ব্ল্যাক লেডি এসকর্ট আছে। কিন্তু তারা এই মুহূর্তে এনগেজড্।'

'ও।' আমি হতাশ হলাম।

'আমার মনে হল শ্বেতাঙ্গিনীর ওপরে আপনার কোনও কারণে বীতরাগ আছে। না না, আমি ঘটনাটা জানতে চাই না। আমি আপনার সেন্টিমেন্টকে অনার করছি, কৃষ্ণাঙ্গী না পেয়ে আমি একটি সাদা ছেলেকে ডেকে পাঠিয়েছি। ও লেখে-টেখে, নাটক, ছবি সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড। এগারোটার মধ্যে আপনার হোটেলে পৌঁছে যাবে।'

রিসিভারটা পড়ে গেল হাত থেকে ঠিক যেভাবে বাংলা ছবির বাবাদের খারাপ খবর পেয়ে হাত থেকে পড়ে যায় এবং হার্ট অ্যাটাক হয়। অবশেষে নিজের জিভ কামড়াতে ইচ্ছে করছিল। চিরটাকাল এই করেই আমি মাঝ নদীতে রয়ে গেলাম। ঠিক এগারোটায় দরজায় শব্দ হল। একটি লম্বা ফরসা দাড়িওয়ালা তরুণ হাত বাড়িয়ে বলল, 'আমি কেন্ট মুরহেড। আপনার এসকর্ট।'

॥ ১৩ ॥

বোধহয় এইজন্যে বুদ্ধিমানেরা বলে থাকেন, অল্পে সন্তুষ্ট হও, বেশি চাওয়াচাওয়ি করতে যেও না, নইলে যখন পস্তাবে, তখন আঙুলে নখও থাকবে না কামড়াবার জন্যে। বব আমাকে গাইড করার জন্যে একটি সুন্দরী শ্বেতাঙ্গিনীর ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু আংকল টম্‌স্ কেবিন না কীসে দেখা ইংরেজি ছবিব সুন্দরী কৃষ্ণাঙ্গীকে দেখা আমার মন চাইল একটি কালো কেউটের মতো সুন্দরী আমার সঙ্গে

ঘোরাফেরা করুক। এর কোনও মানে হয়? ইনিও গেলেন উনিও, মাঝখানে আমার কপালে এক কবি-কবি স্বভাবের নীল চোখে চশমা সাঁটা, লালচে দাড়ির যুবক যাকে কিছু বললেই খুব গম্ভীর ভঙ্গিতে ভেবে নেয় কিছুক্ষণ তারপর জবাব দেয় গুছিয়ে। জানি না কেউ ওকে বলেছে কি না ভারতীয়দের কথাবার্তার অনেকরকম মানে হয় নইলে অত ভাববার কী আছে।

এ আপশোশের পালা আমার ইহজীবনে শেষ হবে না। কিন্তু কেন্টকে তো ফেরত পাঠানোর উপায় নেই। আমার অবস্থা প্রায় অতীনের মতো। ও ইংরেজি কাগজের মারফৎ দুজন পেন ফ্রেন্ড জোগাড় করেছিল। দুজনই বাঙালি। একজন থাকে নিউ আলিপুর অন্যজন বালিগঞ্জে। অতীন দুজনের সঙ্গেই হবি, পড়াশোনা নিয়ে চিঠিপত্র শুরু করে প্রায় ইওর্স অনলিতে যখন পৌঁছে গেছে তখন দুজনই ওকে দেখতে চাইল। অতীন এল আমার কাছে। তখন আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। সে সময় আমাদের কাছে সততার দাম ছিল খুব। অতীন বলল, 'দুজনকে দুটো ডেট দিতে পারব না। খুব খারাপ কাজ হবে সেটা। তার চেয়ে একজনকে লিখে দিই তোমার সঙ্গে আমার দেখা করা অসম্ভব। কারণ আমি আর একজনকে দেখতে চাইছি।'

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কাকে লিখবি সেটা?'

অতীন বলেছিল, 'সেটাই সমস্যা। আমি দুজনের স্ট্যাটিস্টিকস্ দিচ্ছি, তুই হেল্প কর তো। একজন পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, ব্রেবোর্নে পড়ে, ফরসা, গান জানে, ছবি আঁকে। আর একজন পাঁচ ফুট লম্বা, নিউআলিপুরে পড়ে, ডাক টিকিট জমায় আর রাঁধতে ভালোবাসে। অতীন আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। ঠাট্টা করে বলেছিলাম, 'যে খাওয়াতে ভালোবাসে তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখাই ঠিক।'

অতীন রেগে গিয়েছিল, 'তোর সমস্ত বুদ্ধি পেটে গিয়ে শেষ হয়। ব্রেবোর্নে পড়া গান গাওয়ার পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি, বাঙালি মেয়েদের মধ্যে ওয়ান পার্সেন্ট ওইরকম লম্বা হয়, ওকেই লিখছি আসতে।'

বোঝাতে চেয়েছিলাম, আর চেয়ে একদিন দুটো কলেজে গিয়ে দেখে আয় না কে কীরকম?

ও বলেছিল, 'অনুমতি ছাড়া দেখেছি জানতে পারলে পেন ফ্রেন্ডশিপের শর্ত ভাঙা হবে।'

সেই পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চির সঙ্গে অতীন সাতদিনও থাকতে পারেনি। পার্ক স্ট্রিটের বড় রেস্টুরেন্টের চায়ের বিল মেটাতে জেরবার হয়ে গিয়েছিল বেচারা। মেয়েটি নাকি বলেছিল, 'বসে কথা বলতে হলে নাথিং বিলো পার্কস্ট্রিট।'

তবু অতীন তো দুজনের একজনকে পেয়ে অভিজ্ঞ হয়েছে। আমি তো তাও পেলাম না।

এই অবধি পড়ে যদি কারও মনে হয় আমি হ্যাংলামো করেছি তাহলে তাঁর কাছে আমার বিনীত নিবেদন আছে। স্কটিশচার্চ বা ইউনিভার্সিটিতে কোনও মেয়ে আমাদের ধারে কাছে ঘেঁষত না। আমার গায়ে নাকি মফস্সলি গন্ধ ছিল, সেটাও একটা কারণ। খুব ছেলেবেলা থেকেই আমাদের মনে এমন একটা ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল যার ফলে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতেই অস্বস্তি হত। বাঙালি মেয়ে প্রেমে পড়ে যাদের, তাদের জন্যে জীবন দেয়। বাঙালি মেয়ে চোখের জলে ভাসে ও ভাসায়। কিন্তু কতদিন? একমাত্র মনীষা ছাড়া আমি এমন একটি বাঙালি মেয়েকে দেখিনি যে বন্ধুর মতো রাত এগারোটায় আড্ডা মারতে পারে। শিবরাম চক্রবর্তী এক সকালে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'বিকেলে কী করছ?'

বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারব শুনে বলেছিলেন, 'ও সব করে কিছু হবে না। রোজ বিকেলে মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দেবে। তাতে কুচুটেপনা এমন শিখবে যে আর ঠকতে হবে না। কিন্তু আড্ডা দেওয়ার মতো মেয়ে কোথায় পাব তা বলেননি। কলকাতায় কোনও মহিলার সঙ্গে কলেজ স্ট্রিটে পাঁচ পা হাঁটলে গড়িয়াহাটায় খবর রটে যায়। তাই পনেরো দিন একটি বিদেশিনীর সঙ্গে আড্ডা মারতে পারব সবার ঈর্ষাকাতর চোখ এড়িয়ে এমন সুখ থেকে যখন বঞ্চিত হলাম তখন হা হুতাশ না করে উপায় কী? আর আপনি যদি ছেলে হন তাহলে আমার কষ্ট বুঝতে পারলেও মুখে অন্য

কথা বলবেন। যদি মেয়ে হন, খুব খারাপ লাগবে, কিন্তু কী করা!

কেন্ট যাবে বব-এর অফিসে। এই হোটেলেই উঠেছে সে। আমাকে তৈরি হতে বলল। আমি বললাম, কেন্ট তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা বলে নেওয়া দরকার। এ কাজের জন্যে তুমি টাকা পাবে?

'হ্যাঁ। আমেরিকায় যারা বেড়াতে আসে তাদের গাইড করার জন্যে, একটা প্যানেল আছে হাতে যখন কাজকর্ম কম থাকে তখন অফার পেলে রাজি হয়ে যাই।'

'ভালো। তোমার সঙ্গে যখন পনেরো দিন থাকব তখন দুটো ব্যাপার মাথায় রেখো। একমাত্র প্লেন ধরা বা কারও সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখা ছাড়া আমাকে মোটেই তাড়া দেবে না। আর কোনও নতুন জায়গায় গিয়ে স্ট্যাচু, বিল্ডিং, মিউজিয়াম দেখতে বলবে না। আমি সেই জায়গার মানুষের সঙ্গে আড্ডা মারতে চাইব। তুমি থাকলে আপত্তি নেই, না থাকতে চাইলে যা ইচ্ছে তাই কোরো।'

আমার কথাগুলো কেন্ট চোখ বড়-বড় করে শুনল। মাথা নাড়ল। ট্যাক্সি নিয়ে আমরা বব-এর অফিসে গেলাম। বব কেন্টের সামনেই বারংবার দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল কৃষ্ণাঙ্গিনী কাউকে পায়নি বলে। তারপর বলল, 'কিন্তু দেখো, কেন্টকে তোমার খুব পছন্দ হবে। ভালো ছেলে।'

কেন্ট গেল লিজার সঙ্গে আমার টিকিটের ব্যবস্থা করতে। বব বলল, 'এখনও হলিউড থেকে কোনও ফিল্মস্টারের কনফার্মেশন পাইনি। মনে হয় তুমি সেখানে পৌঁছোবার আগেই ওটা হয়ে যাবে। এক কাজ করো, সময় আছে এখনও, তুমি হোয়াইট হাউসটা দেখে এসো।'

'কী দেখব ওখানে?'

'কী দেখবে মানে? প্রেসিডেন্ট থাকেন ওখানে?'

'তা তো জানি। এখন গেলে ওঁর দেখা পাব?'

'না-না। তোমাদের ঢুকতে দেওয়া হবে ওর অফিসের একটা অংশে। আগের প্রেসিডেন্টরা যেখানে থাকতেন সেখানেও যেতে দেওয়া হবে।'

'তার মানে টেবিল চেয়ার, কিছু আসবাব, দেওয়ালে টাঙানো ছবি, মানে অনেক স্মৃতি যা তোমাদের কাছে মূল্যবান। তাই তো?'

'ব্যাপারটা অনেকখানি ওইরকম।'

'আচ্ছা বব, আমি যদি হোয়াইট হাউসে না যাই তুমি কিছু মনে করবে?'

'আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে হোহো করে হেসে উঠল বব, 'তাই বলো। তাহলে তুমি ওয়াশিংটনে কী দেখতে চাও বলো তো?'

'দেখি কী দেখা যায়। এ ব্যাপারে কোনও বাধ্যবাধকতা নেই তো।'

'না-না। অ্যাজ ইউ লাইক। বাই দ্য ওয়ে, আমেরিকান মোশন পিকচার্স-এর একটা বিরাট কালেকশন এখানে আছে। ওখানে পৃথিবীর সব দেশের প্রতিনিধিত্বমূলক ছবি আছে। যেতে চাও?' বব উৎসাহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

আমি জানি না, রাশিয়ায় কখনও যাইনি, একজন রাশিয়ান আর একজন আমেরিকানদের মধ্যে কে বেশি গোঁড়া। মস্কোয় গিয়ে যদি ক্রেমলিন দেখতে না চাইতাম, তাহলে ওঁদের কী প্রতিক্রিয়া হত। কিন্তু ববকে দেখে মনেই হয়নি হোয়াইট হাউসে না যাওয়ার ইচ্ছা জেনে ও বিন্দুমাত্র বিরক্ত হয়েছে। হয়তো পাকা অভিনেতা, আমার নামের পাশে ঢ্যাড়া পড়ল, এমনও হতে পারে।

লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস বিল্ডিং-এ কেন্ট আমার সঙ্গে আসেনি। বব-এর নির্দেশ নিয়ে নিজেই চলে এলাম। লিফটে ওপরে উঠে জিজ্ঞাসা করে-করে সিনেমার ফ্লোরে পৌঁছে গেলাম। ঢোকার আগেই চোখ পড়ল বাঁ-দিকে বিশাল ক্যান্টিন। খিদে পেয়েছিল। রকমারি খাবারের সামনে পৌঁছে সেলসম্যানকে হুকুম দিতেই যে খাবার ট্রেতে তিনি সাজিয়ে দিলেন তার মূল্য বাজার দরের অর্ধেক। একটা খালি টেবিল দেখে আরাম করে বসে খাওয়া শুরু করলাম। হলঘরের মতো খাওয়ার ঘরে সব টেবিলেই

নারী পুরুষ খেয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ কান খাড়া হল। বঙ্গললনার কণ্ঠে প্রশ্ন বাজল, 'পুদিনা পাতা পেলে কোথায়?'

'বাজারে। হঠাৎ দেখতে পেলাম। গন্ধটা দেশের মতো অতটা নয়।'

'লাউ পেয়েছিলাম গত রবিবার। কুঁচো চিংড়ি তো নেই, গলদা দিয়ে করতে হল।'

'আমি বাবা অত রান্না পারি না। তিনি তো দিনরাত বলে যাচ্ছেন মাকে লিখে রান্নার বই আনিয়ে নিতে। আনালেই মুশকিল। রোজ একটা না একটা বায়না হবে।'

আমি আর পারলাম না। মুখ ঘুরিয়ে পেছনে তাকালাম। দুজনেই প্যান্ট এবং জ্যাকেট পরা। একজনের যার বয়স হয়েছে, যিনি লাউ চিংড়ি রেঁধেছেন, তাঁর চুল প্রায় ছেলেদের মতো ছাঁটা। দ্বিতীয়ার কাঁধ পর্যন্ত, এখনও যুবতী। ওঁরা দুজনেই আমাকে দেখলেন। হেসে বললাম, 'আপনাদের খাওয়াদাওয়ার গল্প আমার কানে এল বলে তাকালাম, কিছু মনে করবেন না।'

মহিলারা একটু হাসলেন। প্রৌঢ়া জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানেই চাকরি করছেন?'

'আজ্ঞে না। বেড়াতে এসেছি।'

'আমেরিকায় বেড়াতে এসে লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের ক্যান্টিনে খাচ্ছেন?'

'চোখে পড়ে গেল। এসেছিলাম মোশন পিকচার্সে।'

'সিনেমার লোক নাকি?'

'আজ্ঞে না।'

যুবতী মহিলার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি কোনও কথা বলেননি। বাঙালি মহিলাদের বয়স না হলে সম্ভবত আড় ভাঙে না। প্রৌঢ়া যে স্বচ্ছন্দ নিয়ে কথা বলতে পারছেন যুবতী তা পারেননি। এক্ষেত্রে পরিচয় অপরিচয়ের প্রশ্ন তুলে লাভ নেই, প্রৌঢ়ার ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য। তবে সবার প্রকৃতি একরকম নয়, এটা মানতে রাজি আছি। প্রৌঢ়া বললেন, 'এখানে বসতে পারেন আপনি, ইচ্ছে হলে।' ট্রে তুলে ওঁদের টেবিলে এসে বসলাম। নমস্কার করে বললাম, 'আমি সমরেশ মজুমদার। আপনারা কি এখানেই চাকরি করেন?'

প্রৌঢ়া বললেন, 'হ্যাঁ। বেড়াতে এসেছেন বললেন, কারও কাছে উঠেছেন? না হোটেলে?'

দুজনে দুজনকে দেখলেন। প্রৌঢ়া বললেন, 'বাঙালিরা এখানে বেড়াতে এসে ওঠার জায়গা ঠিক করে আসে। ডলার তো দেশ থেকে আসার সময় বেশি পাওয়া যায় না।'

বললাম, 'আমার ঘোরার ব্যবস্থাটা এদেশের সরকার করেছেন।'

'কেন? আপনি কী করেন?'

'লেখালেখি'

প্রৌঢ়া বললেন, 'আমি তো তিরিশ বছর দেশে যাইনি। তুমি নাম শুনেছ?'

যুবতী মাথা নাড়লেন, 'সমরেশ বসু বলে একজন লেখেন, শুনেছি।'

চটপট জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কবে এসেছেন এদেশে?'

'সিক্সটি নাইনে।'

অনুমান করলাম এদেশে আসার সময় ওঁর বয়স আঠারোর বেশি হবে না। কিন্তু তখনও কি উনি সমরেশ বসু পড়েননি? মনে পড়ল লা মার্টিনার্সে পড়া একটি কিশোরী আমাকে বলেছিল, 'আমি রবীন্দ্রনাথের কিছু লেখার ইংরেজি ট্যান্সলেশন পড়েছি।' ইনি যদি সেই গোত্রের হন কিছু বলার নেই। অনেক বাড়িতেই দেখেছি পড়াশোনার চাপ সামলে ছেলেমেয়েদের বাংলা গল্পের বই পড়তে উৎসাহ দেওয়া হয় না। আমাদের কালে যেমন লাইব্রেরিতে পড়ে থাকার রেওয়াজ ছিল গার্জেনের চোখ এড়িয়ে। এখন সেটা নেই।

প্রৌঢ়া বললেন, 'তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ-প্রেমেন্দ্র মিত্রের পর লেখালেখি হচ্ছে!' বললাম, 'খুব খারাপ। কয়েকজন মাত্র লিখতে পারছেন।'

প্রৌঢ়া বললেন, 'শুনেছিলাম বিভূতিভূষণ নাকি না খেয়ে মারা গিয়েছেন। টিভিতে যখন সত্যজিতের পথের পাঁচালি দেখানো হল এত কষ্ট হচ্ছিল।'

বললাম, 'আপনি ভুল শুনেছেন। জীবদ্দশায় বিভূতিভূষণ বেশি অর্থ পাননি বটে কিন্তু না খেয়ে মারা যাননি। তবে হ্যাঁ, তিনি তো অল্পেই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের নাম আপনি শুনেছেন?'

'বা শুনব না! এখানকার টিভিতে একজন আমেরিকান সত্যজিৎবাবুর একটা ইন্টারভিউ নিয়েছিল। আপনাকে বলব কী, সত্যজিৎবাবুর ইংরেজির পাশে ও দাঁড়াতে পারেনি। এত গর্ব হচ্ছিল তখন।' প্রৌঢ়া হাসলেন।

'আপনার হ্যাজবেন্ড কী করেন?'

'উনি মারা গেছেন। ছেলেপিলে নেই। একাই আছি।'

এবার যুবতী বললেন, 'দেশে ফিরতে একদম সময় পাই না। এত নেমন্তন্ন রাখতে হয়, এত জায়গায় যেতে হয়, আপনার নাম শুনিনি বলে কিছু মনে করবেন না। দূরত্বটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।'

'না-না। মনে করার কী আছে। পশ্চিমবঙ্গের শতকরা নিরানব্বুই জন আমার নাম জানেন না। সে ক্ষেত্রে আপনি ঠিকই আছেন।'

যুবতী এবার উঠলেন, 'আমি উঠছি। ভালো লাগল আলাপ করে।'

মহিলার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে উনি চলে গেলেন। অপ্রস্তুত বোধ করলাম, 'আমি কি আপনাদের আড্ডা ভেঙে দিলাম?'

'না-না। ও রোজ আগেই উঠে যায়।' প্রৌঢ়া ধীরেসুস্থে খাচ্ছিলেন, 'দেশের খবর কেউ এলে পাই। সাহিত্য-সংস্কৃতির ব্যাপারটা জানিই না। অবশ্য গানের কেউ এলে গান শুনতে যাই। এই সেদিন সন্ধ্যা মুখার্জি এসেছিলেন, হেমন্ত মুখার্জি, দ্বিজেন মুখার্জি এরা এলে খুব ভিড় হয়। ওদের পরে যারা গাইছে তাদের নাম জানি না।'

'এ ব্যাপারে আপনি কিছু মিস করেননি। সত্তর কিংবা আশির দশকে পশ্চিমবাংলায় কোনও আধুনিক গায়ক নাম করেননি।'

'এখানে দুটো বাংলা নাটকের দল এসেছিল। উত্তমকুমারের ভাই তরুণকুমার—' বাধা দিয়ে বললাম, 'শুনেছি সে গল্প।' এবার ওর কথা জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল, 'আপনারা কি গ্রিন কার্ড হোল্ডার?'

মহিলা মাথা নাড়লেন, 'সিটিজেনশিপ পেয়ে গেছি। উনি মারা যাওয়ার পর একাই আছি। খুব খারাপ লাগে মাঝে-মাঝে। কিন্তু দেশে গিয়ে তো থাকতে পারব না। বাড়ি বাগান আর অফিস নিয়ে আছি। এখানে আর কোনও বাঙালির সঙ্গে আলাপ হয়নি?'

আমি রমেন পাইনদের কথা বললাম। দেখলাম উনি ওদের চেনেন। খুব ইচ্ছে করছিল ওঁর বাড়িতে যেতে। আমেরিকায় একজন বাঙালি প্রৌঢ়া একদম একা হয়ে কীভাবে রয়েছেন জানার আগ্রহ ছিল। কিন্তু ইনি এ ব্যাপারে কোনও আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। খাওয়া শেষ করে প্রৌঢ়া আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মোশান পিকচার্সে কার কাছে যাবেন?'

পকেট থেকে কাগজ বের করে পড়লাম, 'মোশান পিকচার্স-ব্রডকাস্টিং অ্যান্ড রেকর্ডেড সাউন্ড ডিভিসনের অ্যাসিস্টেন্ট চিফ মিস্টার পল সি স্পের-এর কাছে।'

'ও পল। চলুন আমার সঙ্গে।'

'আপনি চেনেন ওঁকে?'

'আমরা একই ডিপার্টমেন্টে কাজ করি। ও আমার মেজ বস।'

প্রৌঢ়ার সঙ্গে ডিপার্টমেন্টে ঢুকলাম। প্রথমেই উনি বললেন, 'আপনি যদি আগ্রহী হন, আমি যেখানে কাজ করি সেখানে আসতে পারেন। কম্পুটারে পৃথিবীর মেজর ছবিগুলোর সম্পূর্ণ বায়োডাটা

প্রিজার্ভ করি।'

বললাম, 'আমার ইচ্ছে ওই পলের সঙ্গে দেখা করার।'

মহিলা আর কথা না বাড়িয়ে তিন-চারটে দরজা পেরিয়ে স্বচ্ছন্দে একটা বড় ঘরে ঢুকলেন। সেখানে টেবিলের কোণায় বসে দাড়িওয়ালা মধ্যবয়সি এক ভদ্রলোক ফোন করছিলেন। ইশারায় আমাদের বসতে বললেন তিনি। মহিলা দাঁড়িয়ে রইলেন। টেলিফোন নামিয়ে রেখে ভদ্রলোক বললেন, 'হাই।'

প্রৌঢ়া জানালেন, 'পল, হি ওয়ান্টস টু মিট ইউ।' বলে আর দাঁড়ালেন না। এখানে বলে রাখা ভালো প্রৌঢ়া এবং পলের চাকরিগত স্তরের পার্থক্য মহাকরণের একজন ডেপুটি সেক্রেটারি আর লোয়ার ডিভিসন ক্লার্কের মতো। অথচ উনি যে স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে পলের ঘরে এলেন এবং পল যেভাবে কথা বললেন, তা মহাকরণের কেউ আশা করতে পারে না। পরিচয় দিতেই পল হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'গ্লাড টু মিট এ বেঙ্গলি রাইটার।'

বুঝলাম বব ইতিমধ্যে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে। পল বললেন, 'সত্যজিৎ রায়ের খবর কী? উনি ভালো আছেন?'

যা জানি বললাম। পল খুব দুঃখিত গলায় বলল, 'বুকের অসুখটা এমন যে আমাদের অনেক ভালো জিনিস পাওয়া থেকে বঞ্চিত করে।'

এরপরের আধঘণ্টা আমরা ভারতীয় ছবির আলোচনায় ডুবে গেলাম। হোঁচট খেলাম যখন দেখলাম পল তামিল অথবা ওড়িয়া ছবির খবর রাখে, যা আমি ভাসাভাসা জানি। পল বলল, 'আমার এখানে সমস্ত রিপ্রেজেন্টেটিভ ইন্ডিয়ান ফিল্মের ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াইজ ভিডিও ক্যাসেট রয়েছে। আপনি দেখবেন? সত্যজিৎ রায়ের যে কোনও ছবি দেখতে পারেন শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘা ছাড়া। অনেক করেও ওটা পাচ্ছি না। শুনেছি লন্ডনে একটা প্রিন্ট আর নিউইয়র্কে আর একটা প্রিন্ট আছে। নিউইয়র্কে রে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের জন্যে এনে সম্ভবত ফেরত দেয়নি। ছবিটার প্রিন্ট আমরা বেশি দামেও কিনতে রাজি আছি।'

পলের সঙ্গে ওদের ভিডিও লাইব্রেরিতে গেলাম। প্রমথেশ বড়ুয়া থেকে আরম্ভ করে প্রায় সব বিখ্যাত ছবি রয়েছে। মনে হচ্ছিল পরিচিত জায়গায় এসেছি। পল একটা-একটা ক্যাসেট টেনে নিয়ে ভিসিআরে পুরলেন। সেই ঘরে অনেকেই পছন্দমতো ছবি দেখছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তৈরি ছবিগুলো কোনও শব্দ করছে না। দর্শকের কানে যে হেড ফোন তাতে তিনিই শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। আমার কানে হেডফোন দিলেন পল। নাম্বার দেখে আগুপিছু করে যে দৃশ্যটি তিনি পর্দায় আনলেন সেখানে কাশীর হরিহর মৃত্যু-শয্যায়। সেই বিখ্যাত দৃশ্যটি যা তুলতে পারলে একজন চিত্র পরিচালক সারা জীবন আনন্দে বুঁদ হয়ে থাকতে পারেন, আমি আবার দেখলাম। সেই শব্দ করে পায়রা উড়ে যাওয়া, সমস্ত বিশ্বচরাচর এক শব্দহীন নৈঃশব্দ্যে আচ্ছন্ন হয়ে গেল মুহূর্তেই। ছবি বন্ধ করে পল জিজ্ঞাসা করলেন, 'নিশ্চয়ই অপরাজিত আপনার দেখা ছবি?'

'অনেকবার। কিন্তু এই দৃশ্যটা আমাকে দেখালেন কেন?'

'এইটে আমার খুব প্রিয় দৃশ্য। দেখলেই মন ভালো লাগে।'

'মন ভালো লাগে? মৃত্যুদৃশ্য দেখলে মনে ভালো লাগে?'

'হ্যাঁ। তখন মনে হয় আমিও ওই পায়রাদের সঙ্গে এই শরীরটা ছেড়ে মহাকাশে মিলিয়ে যাব। অতএব খামোকা বেঁচে থাকার সময়টায় কেউ ঝামেলা করলে উত্তেজিত হয়ে কী লাভ? সঙ্গে-সঙ্গে স্বাভাবিক হয়ে যাই। ভালো লাগে।'

এ ব্যাখ্যার সঙ্গে কেউ একমত হবেন কি না জানি না কিন্তু ওই সময়, পলকে আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। অফিসে ফিরে গিয়ে পল আমার দিকে একটা লিস্ট এগিয়ে দিয়েছিল, 'আমরা কিছু সাম্প্রতিক বাংলা ছবির লিস্ট করেছি। এগুলোর ভিডিও কিনব। আপনি চোখ বোলান তো। দেশ

পত্রিকার ফিল্ম ক্রিটিক হিসেবে আপনার মতামতের দাম আছে আমার কাছে।'

'এ খবরটা পেলেন কোথায়?'

জবাব না দিয়ে পল হাসল। লিস্টে চোখ বোলাতে-বোলাতে চমকে উঠলাম। মৃণাল সেন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর নামের পাশে সুখেন দাসের নাম। যে ছবিটি এরা কিনবেন ভেবেছেন, দেশ পত্রিকার প্রয়োজনে সেটা আমাকে দেখতে হয়েছিল। পলকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই নামটা আপনি কোথায় পেলেন?'

'উনি শুনেছি আপনার দেশের খুব পপুলার ডিরেক্টর। কমার্শিয়ালি ওঁর ছবি রায়ের থেকে অনেকগুণ বেশি সাকসেসফুল। অর্থাৎ লার্জার অডিয়েন্স ওঁর ভক্ত। তাই আমার এখানে ওর কপি রাখতে চাই। যাতে দর্শকদের টেস্ট বোঝা যায়।'

কিছু বলার নেই। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা আপনারা কেন ইন্ডিয়ান ফিল্মের ভিডিও ক্যাসেট লাইব্রেরি করেছেন? এতে আপনাদের কী লাভ?'

পল চেয়ারে হেলান দিলেন, 'মজুমদার। আমরা জানতে চাই পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশের মানুষেরা কে কেমন ছবি নিয়ে ভাবছেন? ব্যস এইটুকুই।'

সেই দুপুরে লাইব্রেরি আর কংগ্রেস বিল্ডিং-এর বাইরে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম যদি আমি কলকাতায় বসে হঠাৎ গুজরাতি ছবি দেখতে চাই লোকে পাগল বলবে। পাকিস্তানের উপন্যাস পড়তে চাই। কিন্তু খুঁজে পাব না। এমনকী বাংলাদেশের হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাস পড়তে চাই, যা একটাও খুঁজে পাব না। অথচ এরা সব জমিয়ে রাখছে। হয়তো এমন একদিন আসবে যেদিন নিজেদের দেশে পুরোনো ছবি না পেয়ে ওয়াশিংটনে তার কপির জন্য খোঁজ করতে হবে।

ওয়াশিংটন এয়ারপোর্টের চেহারা খুব বড় নয়। কেন্ট যাবতীয় কাজকর্ম করছিল। বব ওর হাতে প্লেনের টিকিট এবং আমার ট্যুর প্রোগ্রাম দিয়ে দিয়েছিল। তাতে কোন শহরে আমি কতদিন থাকব, কোথায় থাকব, কার সঙ্গে দেখা করব তা বিস্তারিত ছাপা। জানতাম না এই ট্যুর প্রোগ্রামের একটা করে কপি চলে গেছে সেইসব জায়গায় যেখানে এবং যাদের কাছে আমি যাব।

আমার টিকিট আমেরিকান এয়ারলাইন্সে। এদের অবস্থা অনেকটা ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের মতো। সব আছে অথচ কিছু নেই। এয়ার হোস্টেস আছেন, কিন্তু সুন্দরী নন। আমাদের ধারণাটাকে আঘাত করতে এঁরা যথেষ্ট। দমদম বাগডোগরা ফ্লাইটেও একই অভিজ্ঞতা আমার। কেন্ট বসেছেন আমার কাছে। ওর মাধ্যমে হুকুম চালাচ্ছিলাম। জল খাব, এক প্যাকেট তাস চাও তো, কফি দেবে এরা? কেন্ট শান্ত মুখে সেগুলো বোঝাচ্ছিল হোস্টেসকে। যখন আর কিছু চাওয়ার রইল না তখন কেন্ট আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'মজুমদার, একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, আমেরিকায় এসে এত জায়গা থাকতে তুমি ওয়াহিওতে কেন যাচ্ছ? আমি এর আগে অনেককে এসকর্ট করেছি। কেউ কিন্তু ওয়াহিওতে যেতে চায়নি।'

'তুমি নিজে ওখানে গিয়েছ?'

মাথা নেড়েছিল কেন্ট, 'না।'

'তাহলে নতুন জায়গা দেখতে পাবে।'

'কেউ আছে তোমার ওখানে? হু ইজ দিস ভট্টা-ভট্টা।' কেন্ট পুরো উপাধিটি উচ্চারণ করতে পারছিল না। হেসে বললাম, 'তনুশ্রী ভট্টাচার্য, কবি। আমার পরিচিতা। খুব সুন্দরী মহিলা। ভালো আড্ডা মারতে পারেন।'

'তোমার বান্ধবী।'

'বান্ধবী বলতে কী বোঝাচ্ছ?' মাথা নাড়লাম। 'বন্ধুর স্ত্রীলিঙ্গ বান্ধবী হলে তাই।'

কেন্ট চুপচাপ বসে রইল। প্লেন উড়ে যাচ্ছে পিটার্সবার্গ এয়ারপোর্টের দিকে। সেখানে পালটাতে

হবে এয়ার ক্রাফট্। আজ সকালে তনুশ্রীকে ফোন করেছি যাচ্ছি বলে। ও খুব খুশি হয়েছে। হঠাৎ বললাম, 'কেন্ট, এই এয়ার হোস্টেসকে দেখে তোমার কি মনে হয় কোনও ছেলে ওকে প্রেম নিবেদন করেছে' কেন্ট মাথা নাড়ল, 'কী জানি, হবে হয়তো। আচ্ছা তুমি শ্যামল গং, গং আই অ্যাম সরি, পুরো নাম বলতে পারছি না, কিন্তু হি ইজ এ রাইটার, চেনো?'

'হ্যাঁ। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। শ্যামলদা। তুমি নাম জানলে কী করে?'

'উনি যখন এসেছিলেন তখন আমার এক বন্ধু ওঁকে এসকর্ট করেছিল। বাঙালি লেখকেরা কি সবসময় উলটোপালটা কথা বলে?'

॥ ১৪ ॥

পিটার্সবার্গ খুব ছোট্ট এয়ারপোর্ট। খিদে পেয়েছিল। কেন্টকে জিজ্ঞাসা করতে সে মাথা নাড়ল। খাবে না। সে নাকি দিনে দুবার খায়। ব্রেকফাস্ট এবং লানার। কথা বাড়ালাম না। এয়ারপোর্ট রেস্টুরেন্টের দিকে এগোতেই টেলিফোন বুথ নজরে এল। তনুশ্রীকে জানিয়েছিলাম আজ ওঁর ওখানে যাব। কিন্তু কোন ফ্লাইটে যাচ্ছি জানিয়ে দিলে কেমন হয়? টেলিফোন বুথে ঢুকে প্রথমে অপারেটারকে চাইলাম। বললাম, এই নম্বরে কথা বলব, পয়সাটা যার সঙ্গে বলব সে-ই দেবে। যাচাই করে নিয়ে লাইন করতে তনুশ্রীর গলা পেলাম, 'আসছেন তো? নাকি বাঙালি লেখকের মুডের একটা উদাহরণ রাখবেন?'

বললাম, 'যাচ্ছি। খুব বিরক্ত হবেন যাওয়ার পরে কিন্তু আর উপায় নেই। ফোন করছি পিটার্সবার্গ? এয়ারপোর্ট থেকে, এয়ারপোর্টে আসবেন?'

'অবশ্যই। আপনার ফ্লাইট টাইম দেখে নিচ্ছি।'

রিসিভার নামিয়ে খেতে ঢুকলাম রেস্টুরেন্টে। ট্রলিতে প্লেট কাঁটা চামচ নিয়ে ঘেরা সেল্ফগুলোর সামনে দিয়ে দুবার পাক খেলাম। প্রতিটি সেল্ফে সুদৃশ্য খাবার, বেশিরভাগই নানান মাংসের সুরুয়া রাখা আছে। মাংসগুলোর চেহারাতে মালুম হচ্ছে হয় গোরু নয়, শুয়োর। বাধ্য না হলে ওগুলো খাওয়ার কোনও কারণ নেই। মুরগি পেলাম না। আমেরিকায় যাদের পয়সা কম থাকে তারাই মুরগি খায়। অতএব চোখ বন্ধ করে একপিস করে রুটি আর খানিকটা লালচে মাংস বাটিতে তুলে পে-কাউন্টারের সামনে দাঁড়ালাম। মহিলা এক নজর দেখেই মেশিনে আঙুল টিপে বিল রেডি করে এগিয়ে দিলেন। সাড়ে চার ডলার। বাপস্। ম্যাকডোনাল্ড হলে এর অর্ধেক দামে হয়ে যেত।

সন্দেহ আছে মনের মধ্যে, স্বাদও ভালো নয়। কিন্তু নিজেকেই বললাম, 'জলের মতন হও হে। যেখানে যেমন।' ছেলেবেলায় পিসিমা বলতেন, 'খবরদার, এটা খাব না করবে না। যা পাবে লক্ষ্মীছেলের মতো খেয়ে নেবে।' পিসিমার সেই যা পাওয়ার লিস্টে নিশ্চয়ই গোরু বা শুয়োরের মাংস ছিল না। কিন্তু উপদেশটি এই মুহূর্তে আমাকে স্বস্তি দিল। আসলে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। হ্যাম বা বিফ পাউরুটির মধ্যে পুরে স্যান্ডউইচ বানিয়ে খেয়েছি অনেকবার। মোটেই খারাপ লাগেনি। কিন্তু ওই বস্তুর বড়-বড় টুকরো ঝোলে ভাসছে দেখলেই কেমন একটা অস্বস্তি এসে যায়। পাশের টেবিলে নজর পড়তেই অবাক হলাম। ভদ্রলোক নির্বিকার মুখে ভাত আর সবজি খাচ্ছেন। এটা পেলেন কোথায়? আমার ততক্ষণে খাওয়া শেষ। উঠে যাওয়ার মুখে ওঁর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মাপ করবেন, এসব খাবার এখানে পাওয়া যায়?'

'নইলে আমি খাচ্ছি কী করে? ভেজিটিরিয়ানদের জন্যে আজকাল ব্যবস্থা রাখেই।'

'আপনি আমিষ খান না?'

'না। অ্যানিমেল প্রোটিন মানুষের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।' ভদ্রলোক আবার খাওয়া শুরু করলেন। এই জন্যেই সাধুরা বলেছেন, চোখ মেলে দ্যাখো, ঠিক খুঁজে পাবে। পেট পুরে খাওয়ার পর আর খোঁজার কোনও মানে হয় না। কিন্তু আমেরিকান সাহেব নিরামিষাশী ভাবতে বেশ অবাক লাগছিল। আমাদের ছেলেবেলায় বিধবা মহিলাদেরই শুধু আমিষ ত্যাগ করতে দেখেছি। পঞ্চাশের দশকের পর পশ্চিমবাংলায় গুরুদেবদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় অনেক মানুষ দীক্ষা নিতে শুরু করলেন। তার আগে শাক্ত বা বৈষ্ণব ছাড়া কোনও শ্রেণি বিভেদ ছিল না। তবে শাক্তরাও বাড়িতে মুরগি ঢোকাতেন না। বৈষ্ণবরা খুব কট্টর না হলে মাছ খেতেন। তবে এমনিতে বৈষ্ণবদের সংখ্যা এত অল্প ছিল যে আমার পরিচিত মানুষের মধ্যে কাউকে পাইনি। দীক্ষা নিত সবাই রামকৃষ্ণ মিশনে, পঞ্চাশ পেরিয়ে গেলে। আনন্দময়ী মা কিংবা নিগমানন্দের শিষ্যরা ছিলেন। তবে তাঁরা আমিষ বর্জন করেছেন বলে শুনিনি। পরবর্তীকালে দীক্ষার রেওয়াজ পৌঁছোল পনেরো-ষোলো বছরেও। এবং তাঁদের অনেকেই সম্পূর্ণ নিরামিষে জীবনযাপন করছেন। আমেরিকার সাহেবটি নিশ্চয়ই দীক্ষিত নন। এঁরা আমিষের বিপক্ষে নাকি একটা আন্দোলন শুরু করেছে বলে মনোজ বলেছিল। ব্যাপারটা কলকাতায় ব্যাপকভাবে চালু হলে মাছের বাজারে বাঙালির ভিড়টা একটু কমে।

পিটার্সবার্গ থেকে কলম্বাস ওয়াহিও এয়ারপোর্টে পৌঁছোতে মিনিটপঁয়তাল্লিশ লাগে। প্লেন থেকে নেমে কেন্ট জিজ্ঞাসা করল, 'মিসেস দাত্ কি তোমার বান্ধবী?'

বান্ধবী? তনুশ্রীকে বান্ধবী বলাটা কি ঠিক? আসলে ও মনোজ কিংবা কল্যাণের বান্ধবী। আমাদের দেশে বান্ধবী শব্দটির মধ্যে একধরনের ঘনিষ্ঠতা থাকে। পরিচিতা বলাটাই সঙ্গত। কিন্তু কেন্টকে ব্যাপক বোঝাতে চাইলাম না। বললাম, 'হ্যাঁ। ও আমাদের রিসিভ করতে এয়ারপোর্টে আসবে।'

একটু স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করে কেন্ট জিজ্ঞাসা করল, 'কীরকম দেখতে উনি?'

'সুন্দরী। স্মার্ট।' ছোট্ট করে হাসলাম। কেন্ট মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'কোথায় তিনি? এখানে তো কোনও সুন্দরী ভারতীয়কে দেখতে পাচ্ছি না।'

সত্যি, যাঁরা পরিচিতদের রিসিভ করতে এসেছেন তাদের মধ্যে তনুশ্রীকে দেখতে পাচ্ছি না। কেন্ট বলল, 'ওপাশে একজন ইন্ডিয়ান মহিলা যাচ্ছেন। ওকে নিশ্চয়ই সুন্দরী বলবে না।'

প্যান্ট জ্যাকেট পরা দক্ষিণী একটি মেয়েকে দেখাল কেন্ট। তারপর বলল, 'তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি কার-রেস্ট কাউন্টার থেকে একটা গাড়ির চাবি নিয়ে আসি।'

পরে জেনেছি আমেরিকার এয়ারপোর্ট, রেলওয়ে স্টেশন, বাস টার্মিনাসে গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। দু-তিনটে কোম্পানি এই ব্যাবসাটা চালায়। কেউ যদি এক শহরে গাড়ি ভাড়া নিয়ে অন্য শহরে গিয়ে সেটা জমা দেয় তাহলে কোম্পানির আপত্তি নেই। এদের ব্রাঞ্চ সর্বত্র। কেন্টের নাম এবং নম্বর এদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। কার্ড দেখিয়ে সে বিনা পয়সায় গাড়ি পাবে আমার জন্যে। পরে সরকারের কাছে কোম্পানি বিল করে দাম নেবে। চাবি নিয়ে এসে কেন্ট বলল, 'তোমার সুন্দরী বান্ধবীটি নিশ্চয়ই খুব ভুলো। চলো, গাড়িটা নিই।'

এইসময় একটি কালো মাঝারি উচ্চতার স্যুটপরা ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, 'যদি কিছু মনে না করেন আপনি কি মিস্টার মজুমদার?'

প্রশ্ন হল ইংরেজিতে। মাথা নাড়লাম, 'আপনি?'

সঙ্গে-সঙ্গে দুটো হাত জোড় করে বললেন, 'আমি প্রভাত দত্ত।'

'আচ্ছা। নমস্কার।'

'তনুশ্রী আসতে পারল না। ওর খুব শরীর খারাপ। চলুন।'

পরিচয় করিয়ে দিলাম কেন্টের সঙ্গে। 'ইনি মিস্টার ডাট্। ওঁর স্ত্রী আসতে পারেননি শরীর খারাপ হওয়ায়।' এই প্রথম মনে হল কেন্ট বুদ্ধিমান ছেলে কারণ কোনও কথা বলল না সে। বাইরে

বেরিয়ে কেন্ট জিজ্ঞাসা করল, 'মিস্টার ডাট, এখানে ভালো হোটেল কোথায় পাব?'

প্রভাত বললেন, 'পথেই পাব। চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি।'

কোম্পানির পার্কিংপ্লেস থেকে একটা গাড়ি নিয়ে এল কেন্ট। আমি উঠলাম প্রভাতের পাশে। কেন্ট আমাদের অনুসরণ করছিল। প্রভাত জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছোকরা আপনার এসকর্ট বুঝি? ঠিক আমেরিকান ছেলেদের মতো চালু নয়।'

'আপনি এখানে কতদিন আছেন প্রভাতবাবু?'

'বছরচারেক। আগে নিউইয়র্কে ছিলাম। আপনার লেখা আমি দেশ-এ পড়েছি।'

'এখানে দেশ পান আপনারা?'

'নিয়মিত নয়। কলকাতায় গেলে টাকা দিয়ে আসি, ওরা পাঠায়।'

'তনুশ্রীর কী হয়েছে?'

'ঠিক জানি না। একটু আগে অফিসে ফোন করে বলল শরীর খুব খারাপ, আমি যেন আপনাকে রিসিভ করতে যাই।'

খুব ফাঁকা এবং নির্জন রাস্তা, চারপাশে বাড়িঘর নেই। এইভাবে কিছুটা যাওয়ার পর আমরা শহরে এলাম। ওয়াহিও শহর খুব নিরিবিলি। জনসংখ্যা অল্প। দোকানপাট ও বাড়ির চেহারায় আলস্য রয়েছে। কেন্টকে একটা হোটেলে জমা করে দিলাম আমরা। ওর কাছে প্রভাতবাবুর বাড়িব টেলিফোন নম্বর আছে। শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। একটু পাহাড়ি পথ। প্রভাত দত্তকে দেখছিলাম আমি। চুল প্রায় পেকে এসেছে। বয়স আন্দাজ করা মুশকিল। মনোজদের কাছে শুনেছি ছাত্র হিসেবে প্রভাত খুব মেধাবী ছিলেন। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। নিউইয়র্কে থাকতে প্রভাতের উদ্যোগে মনোজদের সহায়তায় প্রথম আমেরিকা থেকে একটি বাংলা পত্রিকা বের হয়, যার নাম 'অতলান্তিক' পত্রিকার কিছু কপি আমি দেখেছি। এদেশে থেকে ওরা বাংলা পত্রিকার চেহারা সুন্দর করতে পারেননি। মতবিরোধ হতে মনোজ 'আন্তরিক' বের করছিল। তার চেহারা ছাপা এবং লেখা কিন্তু অতলান্তিকের চেয়ে ঢের ভালো। অতলান্তিক এখনও বেরুচ্ছে। নিউইয়র্ক থেকে সরে এসে প্রভাত ওয়াহিও থেকে সেটা প্রকাশ করে সারা আমেরিকার গ্রাহকদের কাছে পাঠাচ্ছেন। স্থানীয়দের কিছু লেখা ছাড়াও জেরক্স-এর ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল ওঁকে। লাভ তো হয়ই না বরং সুখ ও অর্থ নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু সম্পাদক প্রভাত দত্তের নেশা এত প্রবল যে 'অতলান্তিক' ওঁর কাছে পুত্রতুল্য। স্ত্রী তনুশ্রী ভট্টাচার্য কবিতা লেখার সময় ব্রাকেটে দত্ত লেখেন না। পত্রিকার কাজে তিনি নিশ্চয়ই সাহায্য করেন স্বামীকে।

ডানদিকে ছবির মতো লনওয়ালা বাড়িগুলোর একটা প্যাসেজে গাড়ি ঢুকল। সশব্দে দরজা বন্ধ করলাম গাড়ি থেকে নেমে। কিন্তু বাড়ির ফ্রন্ট খুলল না। যতই অসুস্থ হোক বাড়িতে নিজের অতিথি এলে দরজা খুলে অ্যাপায়ন করা যাবে না, এটা ভাবতে পারছিলাম না। বিশেষ করে যাঁর সঙ্গে খানিক আগে টেলিফোনে আমার কথা হয়েছে।

সুন্দর লনে হরেকরকমের ফুল। প্রভাত ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে যেতেই আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। সুন্দর সাজানো ড্রইং রুম। ওপাশে ডাইনিং টেবিল কার্টেনের আড়ালে রাখা। সোফায় বসতে না বসতেই তনুশ্রী ঘরে এলেন। অসুস্থতার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। এসেই বললেন, শেষপর্যন্ত আসতে পারলেন। কেমন লাগছে ওয়াহিও? চা না কফি?'

মেয়েরা রহস্যময়ী, এই তথ্যের অর্ধেকটা আমি মানি। বেশিরভাগ মেয়ে জানেন না তাঁরা কী বলছেন। নিজের কথা কন্ট্রাডিক্ট করতে তাঁদের জুড়ি নেই। আবার কেউ-কেউ আছেন জেনেশুনেই এটা করেন। তাঁরা বুদ্ধিমতী, কিন্তু রহস্যময়ী নন। তনুশ্রীকে ঠিক এই ভাষায় কথা বলতে শুনিনি কখনও। আমি আসছি উনি জানতেন অতএব শেষপর্যন্ত আসার কী হল? এরই মধ্যে ওয়াহিও সম্পর্কে আমার ধারণা তৈরি হতে পারে! এবং দুটোর সঙ্গে এয়ারপোর্টে না যাওয়ার কারণ দেখানোর প্রয়োজন বোধ না করে চা, কফির প্রস্তাব কী করে দেওয়া যায়? কৈশোরে এক সুন্দরীর সঙ্গে আমার সখ্যতা

ছিল। সে ছিল নেহাতই তেরো চৌদ্দ বছরের। এক বিজয়া দশমীর সকালে বলেছিল আমি যেন অবশ্যই বিকেলে ঠাকুর মণ্ডপে যাই। গিয়েছিলাম। তার মা এলেন, মহিলারা সিঁদুর পরালেন ঠাকুরকে, কিন্তু সে এল না। দুদিন বাদে যখন দেখা হল তখন উদাস গলায় জবাব দিয়েছিল, 'না রে, আমার মন খুব খারাপ হয়ে যায় এই সময় গেলে।'

'তাহলে আমাকে যেতে বললি কেন?'

'তোর মন খারাপ করে দিতে খুব ইচ্ছে করছিল তাই।'

আমি আর তার সঙ্গে কথা বলিনি এ জীবনে। পরে ভেবেছি সে তার কাজ ঠিকই করেছিল। মেয়েদের জন্যে মন খারাপ না হলে ওরা খুশি হয় না। এবং সেটা শুরু করার সময় ভেবেচিন্তে করে না ওরা।

দত্তবাড়িতে আমার জায়গা হল যে ঘরটিতে সেই ঘরে এসে তনুশ্রী বললেন, 'দেখুন, আমার বাগানে কত টিউলিপ ফুটেছে।'

অভিমান ছিল, জিজ্ঞাসা করলাম, 'এয়ারপোর্টে যাননি কেন?'

হেসে বললেন, 'এমনি।'

হয়তো। কারণ এসেই দেখেছি সরকারি দপ্তর থেকে এই বাড়িতে আমার ট্যুর প্রোগ্রাম জানিয়ে চিঠি এসেছে হলুদ প্যাডে। আমি কোথায় যাচ্ছি, সঙ্গে কে আছে বিস্তারিত সব। তনুশ্রীর ছোট মেয়ে মালিনী আধো-আধো কথা বলে, ভারী মিষ্টি দেখতে। বড় ছেলে গম্ভীর। দেখতেও বাবার মতন। সন্ধেবেলায় আমরা জমিয়ে আড্ডা মারছিলাম। কেন্ট এসেছিল আমায় দেখতে। সম্ভবত, আমি কীরকম পরিবেশে আছি, তা দেখা ওর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কিন্তু কেন্ট যে চমৎকার গিটার বাজায়, তা আবিষ্কার করলাম এখানে।

লোকটাকে তবু মেনে নিতে পারছি না এখনও। বারংবার ওর দিকে তাকালেই মনে হচ্ছে, আমার হঠকারিতার জন্যে কেন্ট সঙ্গে রয়েছে। কিন্তু প্রভাত দত্তের বড় ছেলে এর মধ্যেই কেন্টের সঙ্গে জমে গেছে। এখানেই মানুষ, উচ্চারণে জড়তা নেই তার ওপরে সাদা চামড়ার ওপর মনে হচ্ছে দুর্বলতা একটু বেশি। খানিক বাদে ওয়ালি এলেন। বাংলাদেশের এই যুবক অ্যান্টিয়ক বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন। কিছুক্ষণ বাদে মনে হল আমরা কলকাতায় আড্ডা মারছি। খাবার টেবিলে গল্পে-গল্পে রাত বাড়ল। ওয়ালি সম্পর্কে তনুশ্রী যেন খুব স্বচ্ছন্দ নন। পরদিন দত্ত পরিবার আমাকে নিয়ে গ্রামে গেলেন। আমেরিকান চাষিদের তখন বোধহয় একটু ফুরসত মিলেছে। ফসল কাটা হয়ে গিয়েছে। জানলাম এক ফসল সেখান দুবার বোনা হয় না। দিগন্তবিস্তৃত মাঠে চাষি জিপ চালিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই সময় গোয়াল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে গোরুর পাল। তাদের চেহারার বিশালতা দেখে দুঃখিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। কারণ তাদের মালিকদের শরীর, পয়সা এবং মানসিকতার কাছে ভারতবর্ষের চাষিদের তুলনা করাও যায় না। ওয়াহিও কলম্বাসকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু বাঙালির বাস; তাঁরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও সাপ্তাহিক যোগাযোগ রয়েছে। অনেকের সঙ্গে দেখা হল। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের কোনও খবর রাখেন না। এঁদের সমস্ত ধারণা সাহিত্যিক এবং প্রাইমারি স্কুল মাস্টাররা প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় থাকেন। হাবভাব দেখে বুঝতে পারলাম আমার সাহিত্যিক পরিচয়ে ওঁদের বেশ সন্দেহ রয়েছে। তনুশ্রীর কাছে আমেরিকার গ্রাম দেখতে চেয়েছিলাম। ভালো দেখা হল না। কিন্তু তনুশ্রীকে কিছুটা জানলাম। এই দেশ থেকে ভদ্রমহিলা আর ফিরবেন না। যদিও চেষ্টা করবেন প্রতি বছর বইমেলার সময় কলকাতায় যেতে। সারা বছর যে কবিতাগুলো লেখেন তাই জড়ো করে সেইসময় বই বের করবেন। সম্ভবত এই কারণেই তনুশ্রী একটা চাকরি করছেন যাতে দেশে যাওয়ার ভাড়া চাইতে না হয় প্রভাতের কাছে। কলকাতার জন্যে খুব মন কেমন করলেও সেখানে পাকাপাকি থাকতে চান না কলকাতার পরিচিত মানুষদের একদম বুঝতে পারেন না তিনি। আর সেই কারণেই কলকাতা থেকে মা বাবা দুই ভাইকে তিনি ওয়াহিওতে নিয়ে আসতে চান পাকাপাকিভাবে। পরে জেনেছি,

তনুশ্রী নিজের অভিলাষ পূর্ণ করেছেন। দত্তদের বাড়ি থেকে এয়ারপোর্টে আসার সময় একটা কাণ্ড ঘটল। কেন্ট গাড়ি নিয়ে এসেছিল আমায় নিয়ে যেতে। প্রভাত এবং ওয়ালি আমাকে পৌঁছোতে তৈরি, তনুশ্রী বললেন তিনিও যাবেন। আমি মালপত্র রেখেছি কেন্টের গাড়িতে। বেচারা একা যাবে বলে ওর গাড়িতে উঠেছি। তনুশ্রী আমাদের গাড়িতে দরজা খুললেন। প্রভাত নিজের গাড়ি থেকে চিৎকার করলেন, 'তুমি কি এই গাড়িতে যাবে না?'

তনুশ্রী জবাব দিলেন না। জানি না স্বামী-স্ত্রীতে কোনও মনকষাকষি সেই সকালে হয়েছিল কীনা। কারণ প্রভাতকে খুব বিরক্ত দেখাল। বোকামি করলেন ওয়ালি। বাংলাদেশি ভালোমানুষি মুখ করে এগিয়ে এসে বললেন, 'তনুশ্রী, প্রভাত চাইছেন আপনি ওর গাড়িতে এয়ারপোর্ট যান।'

তনুশ্রী অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বললেন, 'ওয়ালি, আপনাকে তৃতীয়বার মনে করিয়ে দিচ্ছি আমাকে বিরক্ত না করবার জন্যে।'

চাপা হাসি ঠোঁটে নিয়ে ওয়ালি ফিরে গেলেন প্রভাতের গাড়িতে।

দুটো গাড়ি আগুপিছু চলছিল। কেন্টের পাশে আমি, পেছনের সিটে তনুশ্রী চুপচাপ জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। মনে আছে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত লম্বা রাস্তায় তিনি কোনও কথা বলেননি। ওঁর মুখের যা অবস্থা তাতে আমিও কথা চালাতে চাইনি। কেন্ট নিশ্চয়ই কৌতূহলে টইটম্বুর। কথা না বুঝলেও নীরবতার ভাষা বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। আয়নায় দেখছি প্রভাতের গাড়িটা একই স্পিডে পেছন-পেছন আসছে। শেষ পর্যন্ত আর না পেরে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী হয়েছে বলুন তো?'

মেয়েরা খুব দ্রুত নিজেদের বদলে ফেলতে চায়, পারে না। কিন্তু তনুশ্রী বললেন, 'কী ব্যাপারে?'

'আপনি গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া।'

'ঝগড়া করার মতো মন নেই আমার।'

এইরকম শীতল কথা মেয়েরাই বলতে পারেন যার পরে কথা খুঁজে পাওয়া ভার হয়ে ওঠে।

'দেখুন, আমি এলাম আপনার নেমন্তন্নে বেড়াতে। যাওয়ার সময় এতো ভারী আবহাওয়া।'

'আবহাওয়া যদি ভারী হয় তবে তার জন্যে দায়ী প্রভাত। আমি নিষেধ করেছিলাম ওয়ালিকে যেন না আসতে বলে। তবু ওয়ালি এল।'

'কিন্তু উনি তো আপনাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড?'

তনুশ্রী উত্তর দিলেন না। একটু স্বস্তি এল। ওয়ালিকে কেন্দ্র করেই স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ্ব। এয়ারপোর্টে পৌঁছে প্রভাত বারংবার অনুরোধ করলেন আবার আসার জন্যে। একটু আগে থেকে জানিয়ে এলে তিনি বাই রোড আমেরিকার ওপ্রান্তে গ্র্যান্ডে ক্যানিয়নে বেড়াতে যেতে পারতেন আমাকে নিয়ে। ওয়ালি বললেন, 'তখন অবশ্য আমায় পাবেন না। আমি খুব শিগগির অন্য শহরে চলে যাচ্ছি।'

গাড়ি জমা দিয়ে এল কেন্ট। যেন খানিকটা বেপরোয়া ভাব দেখিয়েই তনুশ্রী অনেকটা আমাদের সঙ্গে এলেন। আমেরিকান এয়ারলাইন্সের ডেস্ক থেকে বোর্ডিং কার্ড নেওয়ার পর কেন্ট যখন মালপত্র বেল্টে তুলে দিচ্ছে তখন তনুশ্রী বললেন, 'আজকাল খুব দ্রুত মাথা গরম হয়ে ওঠে। আপনি কিছু মনে করবেন না।'

কৌতূহল চেপে রাখতে পারলাম না, 'আসার সময় পিটার্সবার্গ এয়ারপোর্ট থেকে যখন ফোন করেছি তখন বললেন এয়ারপোর্টে আসছেন অথচ এক ঘণ্টার মধ্যে অসুস্থতার দোহাইটা দিলেন কেন?'

'আপনার জন্যে।'

'বুঝলাম না।'

'আপনার ফোন নামিয়ে রাখার পরই সরকারি দপ্তর থেকে ট্যুর প্রোগ্রাম এল।'

সেটা দেখছি এমন সময় একটা ফোন। লসএঞ্জেলস থেকে জুলি নামের একটা মেয়ে জিজ্ঞাসা করল আপনি এসেছেন কি না, আমি আপনাকে চিনি কি না, কেমন দেখতে এইসব। এত রাগ হয়ে গেল যে প্রভাতকে ফোন করে বললাম আপনাকে এয়ারপোর্টে অ্যাটেন্ড করতে। প্রভাত খুব ভালো। রেগে না গেলে আমাকে প্রশ্ন করে না। অজুহাত না পেয়ে অসুস্থতার কথাটা ও বানিয়ে বলেছে।'

'জুলি কে?'

'সেটা আপনি আমার চেয়ে ভালো জানেন। আমেরিকায় এসে কী যে করে বেড়াচ্ছেন তা আপনিই জানেন। নিউইয়র্কে দোসরটি ভালোই পেয়েছিলেন।'

'মনোজ ভালো ছেলে।'

'মায়ের কাছে মাসির গল্পটা কি না বললেই চলছে না।'

কিন্তু আমি অবাক হয়ে তনুশ্রীকে দেখছি তখন। সপ্রতিভ, শিক্ষিত, আমেরিকান জীবনে অভ্যস্ত রুচিসম্পন্না মহিলা একটু আগে যে ভাষায় কথা বললেন সেই ভাষায় আমি জলপাইগুড়িতে মৃণালিনীদিকে কথা বলতে শুনেছি। মৃণালিনীদি থাকতেন জলপাইগুড়িতে আমাদের পাড়ায়। ছোটবেলা থেকে ওঁকে একই চেহারায় দেখেছি। পড়াশোনা হয়নি, ভাইদের সংসারে খাটেন। বিয়ে কেন হয়নি জানি না। কলকাতায় পড়তে আসার দু-বছর পর একদিন মৃণালিনীদির সঙ্গে দেখা। পিসিমার সঙ্গে গল্প করতে এসেছিলেন বিকেলে। গরমের ছুটিতে গিয়েছি আমি। দেখেই বললেন, 'কীরে বাড়িতে ঠিকমতো চিঠি দিস না কেন? কলকাতায় গিয়ে কী যে করে বেড়াচ্ছিস তা তু-ই জানিস।'

কলম্বাস ওয়াহিও এয়ারপোর্ট থেকে প্লেন যখন উঠল আকাশে তখনও আমার মাথায় জুলি নামটা পাক খাচ্ছে। ওয়াশিংটনের হোটেলেও ও আমাকে ফোন করেছিল অতদূর থেকে। কিন্তু ফোন করছে যখন আমি থাকছি না কিংবা পৌঁছোচ্ছি না এমন সময়ে। ভদ্রমহিলার সম্পর্কে কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ কেন্ট বলল, 'ওই ওয়ালি লোকটা গোলমেলে, না?'

চমকে উঠলাম। আমরা গাড়িতে বসে বাংলায় কথা বলেছিলাম। কেন্টের তা বোঝার উপায় নেই। কিন্তু ব্যাপারটা ও ধরল কী করে? জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি বুঝলে কী করে?

লজ্জা পেল কেন্ট, 'সিক্সথ সেন্স।'

'বাংলা বোঝো?'

'কেন?'

'আমার বন্ধু, যে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে এসকর্ট করেছিল সে কয়েকটা বাংলা শব্দ পিক আপ করেছে। রিয়েলি সুইট।

'তুমি শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখেছে?'

'হ্যাঁ। চমৎকর ভদ্রলোক।' কেন্ট চোখ মুখ বন্ধ করল।

শিকাগো এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে কেন্ট বলল, 'এখানে আমি গাড়ি নেব না। একটা রাত তো থাকব মোটে। তোমার আপত্তি আছে?'

শিকাগোতে আমি এসেছি এদের বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখতে যেখানে প্রফেসর এডওয়ার্ড ডিমক কাজ করেন। শিকাগোতে আসার আর একটা কারণ সেই বাল্যকাল থেকে শুনে আসা গল্প, স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে প্রথম বাঙালি বাগ্মি হিসেবে বক্তৃতা দেন। বাগ্মি শব্দটিতে অনেকের আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু ওঁর আগে আমি কোনও বাঙালির নাম শুনিনি যিনি নিজস্ব বক্তব্য অমন সুচারু ভাষা ও ভঙ্গিতে বিদেশে রেখেছেন।

এয়ারপোর্টের বাইরে আসামাত্রই মনে হল হাওয়া নয়, যেন ঝড় বইছে। শিকাগো একসময় ছিল নিগ্রোদের শহর। কিন্তু এয়ারপোর্টে যেসব ট্যাক্সিওয়ালা দেখছি তাদের চেহারা এশিয়ানদের মতো। তারই একটায় উঠলাম আমরা। সরকার হোটেল ঠিক করে রেখেছেন।

লোকটা মাঝবয়সী, চটপটে। ইঞ্জিন চালু করেই জিজ্ঞাসা করল, 'আর ইউ বাংলাদেশি।' কেন্ট জবাব দিল, 'নো, হি হিজ ইন্ডিয়ান।'

'আই সি। সাব, আপ কৌন প্রভিন্সকা আদমি?'

'ওয়েস্ট বেঙ্গল।'

'কলকাতা।'

উত্তরটা শুনে খুব সন্তুষ্ট। বলল, আমি দুবার গিয়েছি ওখানে। আমার দাদা ফিল্ম প্রোডিউসার, বম্বেতে থাকে। আমি আমেরিকায় এসেছিলাম ভাগ্য খুঁজতে।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'পেয়েছ?'

'অল্পস্বল্প। টুরিস্ট হয়ে এসেছিলাম। ভিসার টাইম শেষ হয়ে গেলে সরকার আমাকে অ্যারেস্ট করল। কেস চলল একবছর। আমেরিকার এক একটা স্টেটে এক-একরকম আইন। শিকাগোর আইন হল কেস চলার সময় এখানেই থাকতে হবে। একমাস জেল হল। তারপর সাতদিনের নোটিশ দিল চলে যাওয়ার জন্যে।'

লোকটা গাড়ি চালাতে-চালাতে শিস দিল।

একপাশে সমুদ্র রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি শহরের দিকে। হাওয়া বইছে খুব। জিজ্ঞাসা করলাম 'তারপর কী হল?' ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল, 'গেলাম না। ওঁরা আবার ধরল। আবার কেস। জামিনে ছাড়া পেলাম কিন্তু নিজের নামে কোনও কাজ করতে পারতাম না। এবার তিনমাস জেল আর তিনদিনের নোটিশ।'

লোকটা আবার শিস দিতে লাগল। আচ্ছা মানুষ! কেবলই কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়ে চুপ করে যাচ্ছে। আমি প্রশ্ন করতেই বলল, 'এবার তিনদিনের মধ্যে একটা সাদা মেয়েকে বিয়ে করে ফেললাম। পেপার ম্যারেজ। সে আমার সঙ্গে থাকবে না। শুধু প্রতিমাসে আমাকে দুশো ডলার করে দিয়ে যেতে হবে। পুলিশ ধরলে বললাম, 'আমি বিবাহিত। আমার বউ এদেশের নাগরিক। তাকে ছেড়ে যাব কী করে?' কোর্ট আমার পেপার-বউকে প্রশ্ন করে ছেড়ে দিল আমাকে। তারপর থেকে রয়ে গেছি শিকাগোতে। ট্যাক্সি চালাই, ছোট্ট একটা দোকান আছে।'

'তোমার বউ?'

'সে প্রতিমাসে এসে দুশো ডলার নিয়ে যায়। এর মধ্যে দুজনের সঙ্গে স্টে-টুগেদার করে দুটো বাচ্চার মা হয়েছে। আমাকে ডিভোর্স না করলে তো ওদের বিয়ে করতে পারবে না।'

'তোমরা একসঙ্গে থাকছ না কেন?'

'পাগল। একসঙ্গে থাকলে দুশোর বদলে আটশো ডলার জলে যাবে প্রতিমাসে। হাজার হোক আমি বোম্বাইকা বাবু, আমাকে টুপি পরাবে কে?'

॥ ১৫ ॥

শিকাগো শহরকে কেউ কেউ ঝড়ের শহর বলেন। দিনরাত সমুদ্র থেকে ঝোড়ো বাতাস উঠে এসে শহরটাকে কাঁপিয়ে দেয়। লম্বা-লম্বা বাড়িগুলোয় ধাক্কা খেয়ে চাপা আওয়াজ তুলেই যাচ্ছে সমানে। সরকারনির্দিষ্ট হোটেলটিতে যখন আমরা পৌঁছোলাম তখন শিকাগোয় রাত নেমেছে। হোটেলের সামনের রাস্তা পার হলেই ঢেউভাঙা সমুদ্রের জলরাশি। সার্চ লাইটের আলো সমানে হাতড়ে বেড়াচ্ছে ঢেউগুলো। সামুদ্রিক হওয়ার গন্ধ নাকে টেনে দশতলা হোটেলে ঢুকলাম। ট্যাক্সিওয়ালা যাওয়ার আগে বলল, 'আপনাকে আমার খুব ভালো লাগল। কাল সকালে একবার আসব।'

লোকটাকে বেশ মজার মনে হচ্ছিল। পাশপোর্ট ভিসা ছাড়া বছরের পর বছর শিকাগোতে থেকে যাচ্ছে। লোকটা গল্প শেষ করছিল এই বলে, 'বুঝলেন, শিকাগো এমন একটা স্টেট যেখান থেকে কাউকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় না।'

হোটেলের রিসেপশনে পৌঁছোতেই ইউনিফর্ম পরা মহিলাটি পরিচয় পেয়ে চাবি আর দুটো স্লিপ এগিয়ে দিলেন। একটি স্লিপে প্রফেসর ডিমকের নাম লেখা, দ্বিতীয়টিতে, কী আশ্চর্য, সেই লস অ্যাঞ্জেলসের জুলি। এখানেও ফোন করেছিল। সময় বিকেল তিনটেতে। রিসেপশনিস্ট বললেন, 'দুজনকেই বলে দেওয়া হয়েছে যে আপনি এখনও আসেননি।'

কেন্ট চলে গেল ওর ঘরে। লিফটে ওপরে উঠে এলাম। এই ধরনের হোটেলের ঘরগুলো একইরকমের হয়। জিনিসপত্র রেখে বাথরুমে যেতে না যেতেই ফোন বাজল। তোয়ালে জড়িয়ে বেরিয়ে এসে রিসিভার তুলতেই বাংলা শুনতে পেলাম, 'মিস্টার মজুমদার বলছেন?'

'হ্যাঁ। আপনি?'

'আমি ডিমক, এডওয়ার্ড ডিমক।'

'ওহো, নমস্কার। আপনি ফোন করেছিলেন হোটেলে এসেই শুনলাম।'

'হ্যাঁ। আপনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত এখন। আমরা কি আগামীকাল সকালে সাক্ষাৎ করতে পারি? আপত্তি না থাকলে আপনি আমার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করতে পারেন।'

'না-না। আমি খুশি হব।'

'বেশ। তাহলে এখন রাখছি।'

কিছুক্ষণ বাদে খেয়াল হল ভদ্রলোক আমেরিকান। অথচ, কথা বললেন স্পষ্ট বাংলায়। এই মানুষটিকে দেখবার ইচ্ছে ছিল অনেকদিন। শুনেছি আমেরিকায় বসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে চর্চা এবং প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন উনি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে এই বৃদ্ধের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যভাষা ও সাহিত্য নিয়ে উনি ব্যস্ত।

একটু বাদেই কেন্ট টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করল, 'ন'টা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। ডিনার করবেন?'

সেই মুহূর্তে খেতে ইচ্ছে করছিল না। কেন্টকে সেটা জানাতেই ও বলল কাল সকালে দেখা হবে। ভারী পরদা সরিয়ে দিতেই সমুদ্র দেখতে পেলাম। বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা হবেই। হোটেলে ঢোকার সময় সেটা টের পেয়েছিলাম। সমুদ্রের ওপর অন্ধকার ঝুলছে, সার্চ লাইটের আলো সেটা চিরে-চিরে যাচ্ছে। আমার পায়ের তলায় পুরু কার্পেট। অত্যাধুনিক স্টাইলের আসবাব এই ঘরে। আমি, স্বর্গছেঁড়া চা বাগানের সেই আমি কখনও ভাবতে পেরেছি এইখানে এসে দাঁড়াব? লম্বা ঘরের শেষ প্রান্তে টিভি সেটটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম ওপরেই প্রোগ্রাম চার্ট রয়েছে। তুলে নিয়ে চোখ বোলাতেই নজরে এল আর মিনিটপাঁচেক বাদে ডাস্টিন হফম্যানের 'টুথসি' দেখানো হবে। ছবিটা সম্পর্কে অনেক শুনেছি কলকাতায়। কিছুদিন আগে বম্বে-ফিল্ম উৎসবে গিয়েছিলাম। শ্রদ্ধেয় পরিচালক তপন সিংহ আর আমি একটা বিরক্তিকর ছবি না দেখতে পেরে হল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। তপনদা সময় কাটানো এবং আড্ডা মারার জন্যে আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন তনুজার বাড়িতে। মহিলা তখনও সুন্দরী। বাংলা বলেন অল্পস্বল্প। কিন্তু খোঁজ খবর রাখেন বেশ। তনুজার মুখে 'টুথসি'র গল্প শুনেছিলাম। ভারতবর্ষে তখনও রিলিজ করেনি ছবিটা। ডাস্টিন হফম্যান ওই ছবিতে এক মহিলার ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন। তনুজা সেটা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন 'ফ্যান্টাস্টিক।'

টিভির নব টিপতে গিয়ে থমকে গেলাম। দিল্লির স্মৃতি মনে পড়ল। সেখানে টিভি না খুলতেই বেরুবার সময় পয়সা চেয়েছিল। হোটেলের ঘরে যে টিভি থাকে তা চালালে নিশ্চয়ই পয়সা দিতে হয়। ডলারে তার পরিমাণ কত হবে? বঙ্গসন্তান অস্বস্তিতে আক্রান্ত হলে পিছিয়ে যায়। আমি ব্যতিক্রম

হলাম না। বদলে গায়ে ভারী জামাকাপড় চাপিয়ে দরজায় চাবি লাগিয়ে বেরিয়ে এলাম। লিফটে নীচে নামতেই দেখি ওপাশের রেস্টুরেন্টে খুব জোর খাওয়াদাওয়া চলছে। দারোয়ানের সেলাম কুড়িয়ে বাইরে পা বাড়াতেই মনে হল শরীরে বরফ ঢুকে গেল। রাস্তা ফাঁকা। মাঝে-মাঝে হুসহাস গাড়ি ছুটছে। হাওয়ার তেজ আরও বেড়েছে। দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে মাফলারটা নাকের ওপর দিয়ে পেঁচিয়ে একা হাঁটতে লাগলাম। দোকানপাট বন্ধ। রাস্তাটা পেরিয়ে এপাশের ফুটপাতে আসতেই সমুদ্রটাকে দেখতে পেলাম। অন্ধকারে সমুদ্রকেও বড় নির্জীব মনে হয়। আর এই সমুদ্রে যেহেতু ঢেউয়ের শাসানি নেই তাই বেশ পোষা মনে হচ্ছিল। হাঁটলে শরীর গরম হয়। নাকের সে-বালাই নেই। ওটা আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। কতটা দূর চলে এসেছি খেয়াল নেই। হঠাৎ একটা ছোট্ট রেস্টুরেন্ট চোখে পড়ল। অনেকটা আমাদের সুতৃপ্তির মতো। এবং তখনই মনে হল খেয়ে নিলে মন্দ হয় না। দোকানে ঢুকতেই একটা হেঁড়ে গলায় চিৎকার শুনতে পেলাম। বিশাল চেহারার এক নিগ্রো মাতাল হয়ে চিৎকার করছে। আরও গোটা আটেক নিগ্রো নারী-পুরুষ অলসভঙ্গিতে বসে রয়েছে। বিশাল চেহারার নিগ্রো বলে যাচ্ছিল, ওরা শুনছে। উচ্চারণ এমন জড়ানো যে আমি বক্তব্যের বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারছিলাম না। আমি যে ঢুকেছি তা কেউ লক্ষই করছে না। ঘরে ঢোকার পর আরাম লাগছিল। আশেপাশে তাকিয়ে আমি একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। সামনেই টেবিল। তাতে এঁটো ডিস, মদের গ্লাস ছড়ানো। ওপাশে দুই বৃদ্ধা নিগ্রো বসেছিল। আমার পাশে এক বৃদ্ধ নিগ্রো বসেছিল। সে খুব মাথা নাড়ছিল চিৎকার শুনতে-শুনতে। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে আমাকে জড়ানো ইংরেজিতে বলল, 'সাম আজ নির্ঘাৎ খুন হয়ে যাবে। কেউ বাঁচাতে পারবে না।'

'সাম কে?' চটপট জিজ্ঞাসা করলাম।

'আ! সামকে চেনো না? কোথায় থাকো তুমি?' বলে আবার ওপাশে মন দিল।

আমার ঠিক সামনের বৃদ্ধার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তিনি হাসলেন, 'সাম ইজ অ্যা নটরিয়াস চ্যাপ। ট্যাক্সি চালায়। বব ওর কাছে টাকা পায়, খেতে দাম দেয়নি।'

'বব কে?'

'ওই যে চেঁচাচ্ছে। এই রেস্টুরেন্টটা ওর।'

'টাকা দেয়নি বলে খুন করে ফেলবে?'

'না-না। সাম বব-এর বউকে নিয়ে কাউকে না বলে মিয়ামিতে বেড়াতে গিয়েছে। কোনও পুরুষ সহ্য করবে ব্যাপারটা। বব এমনিতে রাগে না।' বলে তিনি বব-এর দিকে তাকালেন। বব তখন একটা রিভলভারে গুলি ভরছে। রেস্টুরেন্টে চমৎকার নীরবতা। শুধু বাইরের দরজায় হাওয়ায় শব্দ করে যাচ্ছে। ওপাশ থেকে কেউ সম্ভবত ববকে অনুরোধ করল শান্ত হতে। সঙ্গে-সঙ্গে মোটা শরীর মুচড়ে তার দিকে ফিরে রিভলভার উঁচিয়ে ধরল বব। যা বলল তার অর্থ এমন করে নেওয়া যায়, 'আর একবার উচ্চারণ করলে তোমার খুলি উড়িয়ে দেব।'

সামনের বৃদ্ধাকে তার সঙ্গিনী বলল, 'এমন স্বামী থাকলে সব বউ পালিয়ে যাবে।'

বব-এর দুঃখ বুঝতে পারছিলাম। খাবার খেয়ে দাম না দেওয়া বেচারা সহ্য করেছিল। কিন্তু বউ নিয়ে পালানো সহ্য করা অসম্ভব। সাম লোকটাকে সমর্থন করা যায় না। এপাশের বৃদ্ধা বললেন, 'না বলে যাওয়াটা সত্যি অন্যায় হয়েছে।'

আমার পাশের বৃদ্ধ মুখ ঘোরাল, 'বাঃ, বলে গেলে সাত খুন মাপ। না?'

'ঠিকই তো। আমি যদি কখনও যেতাম আর তুমি যদি অমন ষাঁড়ের মতো চেঁচাতে তাহলে তোমার পা খোঁড়া করে দিতাম। খুব ববকে সমর্থন করা হচ্ছে, না?'

'আমি কিছু বলেছি?'

'মনে-মনে বলছ। ব্যাটাছেলেদের আর চিনতে বাকি নেই। সবকটা সন্দেহবাগীশ, নিজে ফুর্তি করবে কিন্তু বউকে ছাড়বে না।' বৃদ্ধা বলতে-বলতে উঠে দাঁড়ালেন। 'চলো, আর নাটক দেখতে

হবে না। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

বৃদ্ধ নিতান্ত অনিচ্ছায় টেবিল ছাড়লেন। বৃদ্ধার সঙ্গিনীও ববকে দেখতে-দেখতে ওঁদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। আমি এখন টেবিলে একা। এইসময় ববের নজর পড়ল আমার ওপর। ওর হাতে তখন রিভলবার, আমার দিকে তাক করা। চোখ না সরিয়ে পা ফেলে-ফেলে বব আমার সামনে এসে দাঁড়াল। 'হু আর ইউ?'

'ইন্ডিয়ান।'

'ইন্ডিয়ান?' বব সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'শো মি ইওর আইডি।' লোমশ একটা কালো হাত আমার মুখের সামনে এগিয়ে এল। প্রতিবাদ করে লাভ নেই, পাশপোর্টটা পকেট থেকে বের করে ওকে দিলাম। কয়েকটা পাতা উলটে আবার আমার ছবির সঙ্গে আমাকে মেলাল বব। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'আমি তোমাকে কখনও দেখিনি। এই রেস্টুরেন্টে কোনও ফরেনার খেতে আসেনি। আমার মনে হচ্ছে তুমি সাম-এর এজেন্ট।'

বাধ্য হয়ে পকেট থেকে কার্ডটা বের করে দিলাম যেটা ওয়াশিংটনে আমাকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে লেখা রয়েছে আমাকে সাহায্য করলে প্রেসিডেন্ট রেগন খুশি হবেন। সঙ্গে-সঙ্গে মুখের চেহারা পালটে গেল বব-এর। রিভালবার টেবিলে রেখে আমার পাশপোর্ট আর কার্ডটা ফেরত দিয়ে উলটোদিকের চেয়ারে বসে বলল, 'সরি বস। আসলে আমার মাথা ঠিক নেই। কী খাবে বলো? আচ্ছা, আমি ব্যবস্থা করছি।'

মনে হল ভূতগ্রস্ত কোনও মানুষকে ওঝা ঝাঁড়ফুঁক করে সুস্থ করলে যে আচরণ মানুষটি করে, বব এখন তাই করছে। আমার জন্যে তিন কোর্সের মেনু এল। বব এসে বসল সামনে, 'সাম-এর মতো বিশ্বাসঘাতক লোক আমি জীবনে দেখিনি। তুমি কিছু মনে কোরো না, আমি যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি তখন ওকে মেরে ফেলবই। আমি ওর কাছে পাই সত্তর ডলার। কিন্তু আমার বউকে নিয়ে বাইরে চলে গেল না বলে।'

'দোষটা তো তোমার বউ-এরও।'

'ঠিক। তবে কী জানো, মেয়েদের মাথায় সবসময় বুদ্ধি খোলে না। একবছর ধরে ও আমাকে বলেছিল মিয়ামিতে বেড়াতে নিয়ে যেতে। আমার বাবা শিকাগোর বাইরে যেতে একদম ভালো লাগে না। সাম নিশ্চয়ই মিয়ামির গল্প বলে ওকে খুব তাতিয়েছিল। ব্যস!' কাঁধ ঝাঁকাল বব। লোকটার চেহারা এবং মুখের গড়ন গরিলার মতো। বোঝাই যাচ্ছে রাগে ফুঁসছে সে। অন্যান্য খদ্দেররা ববকে নক করে-করে বেরিয়ে গেল একসময়। খাওয়া শেষ করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'দোকান কতক্ষণ খোলা থাকবে?'

বব বলল, 'বারোটা। লাস্ট ফ্লাইটের সময়টা দেখি।'

বলতে না বলতেই দরজা খুলে গেল। একজন লম্বা সুন্দর শরীরের অধিকারিণী কালো মেয়ে একটা সুটকেস হাতে নিয়ে দোকানে ঢুকেই চিৎকার করে উঠল, 'হা-ই বব।' সে দুটো হাত এমনভাবে ওপরে ছুঁড়ল যে সুটকেসটা পড়ে গেল নীচে সশব্দে। এক দৌড়ে আমাদের টেবিলের কাছে পৌঁছে মেয়েটি গলা জড়িয়ে ধরল বব-এর। অবাক হয়ে দেখলাম চুম্বনের বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। সেই সঙ্গে 'উমম্ উমম্' শব্দ। ইনিই তাহলে মিসেস বব, যিনি মিয়ামি ঘুরে এলেন। অর্থাৎ এখনই ওই রিভলবার থেকে গুলি বেরুবে এবং আমি একটি মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখব। আতঙ্কিত হয়ে পকেট থেকে ডলার বের করে নীচু গলায় জিগ্যেস করলাম, 'খাবারের দাম কত হবে?'

বব আমার দিকে তাকালই না। যে অবস্থায় বসেছিল তার পরিবর্তন হল না। তখনও তাকে দু-হাতে জড়িয়ে মাথায় মুখ ঘষছে মেয়েটি, 'ইউ আর সুইট, উমম্, রাগ করো না, লক্ষ্মীটি, আমি তোমাকে চটিয়ে দিতে সাম-এর সঙ্গে বোস্টনে গিয়েছিলাম মাকে দেখতে। আমি মায়ের কাছে ছিলাম, সাম হোটেলে ছিল। তোমার কাছে সাম তো নস্যি।' খুব খিলখিলিয়ে হেসে নিয়ে বলল, 'আমি

ওকে বলেছি বব-এর ডলার শোধ না করা পর্যন্ত রেস্টুরেন্টে ঢুকবে না।' মেয়েটি দুই হাত ছেড়ে দেওয়া মাত্র বব ঢলে পড়ল টেবিলের ওপর। চোখ বন্ধ। মুখটা যেভাবে পড়ল তাতে আমি চিৎকার করে উঠলাম। মেয়েটি তখন খোলা মুখে হাত দিয়ে থরথরিয়ে কাঁপছে। বব মারা গিয়েছে।

একটা লোক মারা গেল আচমকা? হার্ট ফেল? মেয়েটাকে ঢুকতে দেখেই কি রাগে বব হার্ট ফেল করল? প্রশ্নগুলো মাথায় আসামাত্র দেখলাম মেয়েটি দৌড়ে দরজার কাছে চলে গেল। তারপর স্যুটকেসটা তুলে নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল বাইরে। আর সঙ্গে-সঙ্গে আর এক ধরনের ঠান্ডা আমাকে গ্রাস করল। মেয়েটা পালাল কেন? ও যে এখানে এসেছিল তার কোনও প্রমাণ বলতে একমাত্র আমি। আমাকে যেহেতু চেনে না তাই সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারে যে সে এখানে আসেনি। কিন্তু আমি কী করব? বব-এর মৃতদেহ সামনে নিয়ে বসে থাকাটা কি ঠিক? আমার কি উচিত নয় চিৎকার করে সবাইকে ডাকা? কিন্তু তাদের বলতে হবে স্ত্রীকে দেখে হার্ট ফেল করেছে বব। যদি ওর স্ত্রী অস্বীকার করে তাহলে আমি কীভাবে বিশ্বাস করাব? এই মৃত্যু স্বাভাবিক কি না তদন্ত করতে নিশ্চয়ই পুলিশ আসবে। পকেটে যতই প্রেসিডেন্টের নাম লেখা কার্ড থাকুক তদন্ত হলে আমি জড়িয়ে পড়বই। এইসব ভাবতে কয়েক সেকেন্ড সময় লেগেছিল। চটপট চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। জানি, যে মানুষটা আমাকে যত্ন করে খাইয়েছিল, স্ত্রীর জন্যে যার বুকে কষ্ট ছিল, তার মৃতদেহ এভাবে ফেলে রেখে যাওয়াটা অন্যায়। কিন্তু এদেশের আইনকানুন না জেনে জড়িয়ে পড়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়, এই বোধ তখনও আমার সক্রিয়। রিভলভার পড়ে আছে সামনে, মৃতদেহ নিয়ে আমি একা রেস্টুরেন্টে, যে কেউ দেখলেই তার চোখে আমি খুনি হয়ে যেতে পারি। ভাবনাটা মাথায় আসামাত্র আর দাঁড়ালাম না। চটপটে পায়ে দরজা ঠেলে বাইরে বেরুতেই তীব্র শীতল হাওয়ার ঝটকা পেলাম। মাথা নীচু করে হোটেলের দিকে পা বাড়াতেই দেখলাম একটি লোক শিস দিতে-দিতে এগিয়ে এসেছে রেস্টুরেন্টের দিকে। দ্রুত তাকে পেরিয়ে উলটো ফুটপাতে চলে এলাম। এখান থেকে আর রেস্টুরেন্টটাকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সেইসময় ঠকঠক শব্দ কানে বাজল। শব্দটা যেন আমাকে অনুসরণ করছে। মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই মনে হল আমি জমে গেলাম। বব-এর বউ আমার দিকে এগিয়ে আসছে সুটকেস নিয়ে।

কী করব বুঝতে না পেরে বাঁ-দিকের গলিতে ঢুকে পড়লাম। কোথায় যাচ্ছি জানি না, কিন্তু মনে হল মহিলাকে এড়িয়ে যাওয়া উচিত। রাস্তা নির্জন। শিকাগোতে সম্ভবত নেড়ি কুকুরও নেই। মহিলা আমাকে ধরে ফেললেন, 'এক্সিউজ মি!'

না দাঁড়িয়ে উপায় নেই তবু আমি চলতে চলতেই বললাম, 'ইয়েস।'

মহিলা ততক্ষণে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। 'ডু ইউ নো মি?'

'নো। কী করে জানব?'

'আপনি কি আজই প্রথম ওই রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

মহিলা যেন সশব্দে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন, 'বব মারা গিয়েছে, তাই না?'

'হ্যাঁ। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু আপনি ছাড়া কেউ জানে না আমি রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলাম।'

'সেটা ঠিক কথা।'

'বব কি আমি যাওয়ার আগেই মারা গিয়েছিল?'

চমকে উঠলাম। কী বলতে চায় মেয়েটি। মাথা নাড়লাম, 'না।'

'ও। সুটকেস নিয়ে আমি গিয়েছিলাম এটা কি আপনি কাউকে বলবেন?'

'পুলিশ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা না করে।' হাঁটতে-হাঁটতে কথা বলতে-বলতে আবিষ্কার করলাম যে হোটেলের রাস্তা আমি হারিয়ে ফেলেছি। ওপাশে একটা জিপ আসছে হেডলাইট জেলে। মেয়েটি

অস্ফুটে বলে উঠল, 'পোলিস।'

জিপটাকে পুলিশের বলে মনে হচ্ছিল না। শুধু মাথার ওপর আলোর দপদপানি বলে দিচ্ছে এটির পরিচয়। এত রাত্রে আমাকে একজন নিগ্রো মহিলার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জেরা আরম্ভ করবে না তো! ওরা যদি থানায় নিয়ে যায় এবং ইতিমধ্যে বব-এর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়ে থাকে তাহলে আর দেখতে হবে না। কিন্তু জিপ থামল না। বাঁক ঘুরে ওটা অন্যদিকে চলে গেল।

মহিলা চাপা গলায় বললেন, 'কোথায় থাকেন বলতে অসুবিধে আছে।'

হৃৎপিণ্ড নড়ে উঠল। আমার ঠিকানা জানতে চাইছে কেন? মতলবটা কী?'

বললাম, 'আমি এই শহরে আজ এসেছি কাল চলে যাব। আমাকে নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না।'

'ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।' বিড়বিড় করলেন মহিলা।

আমি হাঁটতে লাগলাম। মহিলা তখনও ফুটপাতে সুটকেস হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। খুব খারাপ লাগল। স্বামীকে তিনি ভালোবাসেন কি না জানি না কিন্তু এই মুহূর্তে তো তিনি নবীনা বিধবা। হঠাৎ আর একটা কথা মনে এল। ওয়াশিংটনে আমি কালো মেয়েকে এসকর্ট হিসাবে চেয়ে পাইনি আর ভাগ্যের এমন লীলা যে একজন কালো মেয়েকে মাঝরাত্রে ছেড়ে পালাতে হচ্ছে আমাকে।

প্রায় দেড়ঘণ্টা তীব্র হাওয়ায় কাটিয়ে যখন হোটেল খুঁজে পেয়ে নিজের বিছানায় চলে এলাম তখন আমার নাকে কোনও সাড় নেই। ঠান্ডায় জমে গেলেও সমস্ত মনে তীব্র অস্বস্তি কাজ করছিল। ঘুমের কোনও বালাই নেই। বাথরুমে গিয়ে গরম জলে মুখ ধুলাম। কম্বলের তলায় শুয়ে অন্ধকার ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। বব-এর মুখটা সমস্ত ঘরে যেন সাঁটা। লোকটা কেন মারা গেল? স্ত্রীকে দেখে কি ওর আনন্দ হয়েছিল? মারা না গেলে কি বব স্ত্রীকে খুন করত? কিন্তু স্ত্রীর বাহুবন্ধনে থেকে মুখখানা কেমন হয়ে গিয়েছিল ববের। টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভাঙল। ঘুম ভাঙবার সময় টেলিফোনগুলো যতই আধুনিক হোক কানে কর্কশ ঠেকে। হাত বাড়িয়ে রিসিভার টেনে নিয়ে জানান দিতেই ওপাশের নারীকণ্ঠ মার্কিনি ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল আমি সমরেশ মজুমদার কি না। উত্তরটা জানার পর বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে যা বললেন তা হল আমি আসছি এ কথা প্রফেসর ডিমকের মুখে ইনি শুনেছেন। ইন ফ্যাক্ট, আমার সঙ্গে দেখা করার খুব ইচ্ছে তাঁর। নাম সুচরিতা। তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা নিয়েই রয়েছেন। এতকাল প্রফেসর ডিমকের সঙ্গে, এখন একাই থাকেন। সুচরিতা জানালেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

সাড়ে আটটা নাগাদ তাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে গরম জলে স্নান করে পোশাক পালটে চুলে চিরুনি দিতে-দিতে গতরাতের কথা ভাবছিলাম। বব-এর মৃত্যুর তদন্ত কি পুলিশ শুরু করেছে? আমার উপস্থিতি কি ওরা জানতে পারবে? রাত্রে যারা রেস্টুরেন্টে ছিল তারা বেরিয়ে যাওয়ার আগে দেখেছে আমি আর বব কথা বলছি। আর আমি যে ভারতীয় তা বব-এর উঁচু গলায় জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় জেনে গেছে। একেবারে হাড়ের ভেতর কাঁপুনি ছড়িয়ে পড়ল। এবং তখনই দরজায় শব্দ হল। কেন্ট? না পুলিশ? আড়ষ্ট পায়ে দরজা খুলতেই দেখলাম শীর্ণ চেহারার স্যুট পরা এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। বৃদ্ধের মুখে লাল-সাদায় মেশানো দাড়ি, মাথায় চুল কম কিন্তু হাসিটি বড় স্নিগ্ধ। হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিস্টার মজুমদার?'

ওঁর বাড়ানো হাতে হাত রেখে বললাম, 'আপনি যে হোটেলে আসবেন ভাবতে পারিনি প্রফেসর।'

'কারণ? আমেরিকার এতো আকর্ষণীয় জিনিস ছেড়ে দিয়ে যে মানুষ একজন বৃদ্ধ লোকের সঙ্গে দেখা করতে শিকাগোতে আসেন তাঁর কাছে আমি তো হাজারবার যাব।'

প্রফেসর ডিমক খুব ধীরে-ধীরে এসে বললেন, 'আপনি তৈরি হয়ে নিন।'

আমার তখন শুধু জুতো পরা বাকি। সেটা পরতে-পরতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'শরীর ভালো

আছে আপনার?'

'আমি এমন একটা বয়সে পৌঁছেছি যখন লড়াই করা ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে থাকা যায় না। আমি আপনার ট্রিলজি পড়েছি। কালবেলার চেয়ে উত্তরাধিকার আমাকে ভীষণ টানে।' প্রফেসর বললেন।

আমি পাথর হয়ে গেলাম যেন। শিকাগো শহরে একজন আমেরিকান আমার মনের কথা বলছেন আমারই লেখা নিয়ে? উনি এত হাজার মাইল দূরে বসে একজন সামান্য বাঙালি লেখকের লেখালেখির খোঁজ রাখেন? প্রফেসর বলছিলেন, 'অনির যখন মা মারা গেলেন আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। কিন্তু সব মিলিয়ে বাংলা গল্প-উপন্যাস যেন আর আগের মতো ধারালো নেই। নতুন লেখকও বেশি পাচ্ছি না। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় হাসির লেখা লেখেন, বেশ ভালো, কিন্তু বেশিক্ষণ মনে থাকে না। আমার বিশ্বাস বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সময় উনিশশো কুড়ি থেকে ষাট। অফকোর্স রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে

সেদিন হোটেল থেকে বেরিয়ে রেস্টুরেন্টে খেতে-খেতে, সমুদ্রের ধারে প্রফেসরের গাড়িতে পাক খেতে-খেতে এবং সব শেষে ওঁর ঘরে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বসে শুধু বাংলা ভাষা সাহিত্য নিয়ে কথা বলে গেলাম। ডিমক সাহেব একসময় বেশ কিছুদিন কলকাতায় ছিলেন। সেই সুবাদে কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের অনেককেই চেনেন তাঁর ইচ্ছে একেবারে সাম্প্রতিক বাংলা গল্প-উপন্যাস পর্যন্ত ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে যাবেন মারা যাওয়ার আগে। এর মধ্যে সুচরিতার কথা উঠল। প্রফেসরের এক বিখ্যাত বাঙালি কবি-অধ্যাপক বন্ধুর মেয়ে সুচরিতা। শিকাগোতে তাঁর কাছেই সুচরিতা ছিলেন এতকাল। এখন একা হয়েছেন। প্রফেসর তাঁর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে জেনে নিলেন যে তিনি আমার জন্যে লাঞ্চের সময় ক্যান্টিনে অপেক্ষা করবেন। আমেরিকায় যেসব ছেলেমেয়েরা লেখালেখি করে তারা খুব সহজেই প্রচারিত হতে পারে না। বড় পাবলিশার অথবা পত্রিকায় সুযোগ পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। তা ছাড়া এখন তো সবাইকে এজেন্সির মাধ্যমে আসতে হচ্ছে। লিটল ম্যাগাজিন আছে। নিজেদের লেখা ছাপাবার জন্যেই সেই পত্রিকা বের করে তরুণরা। কিন্তু সেগুলো পাঠায় বড় পত্রিকা-সম্পাদক বা প্রকাশকের কাছে। কলকাতায় কোনও নবীন লেখক যদি মোটামুটি একটা ভালো গল্প লিখে দেশ পত্রিকায় পাঠিয়ে দেন তাহলে সেটা ছাপা হবেই। লক্ষাধিক পাঠকের সামনে পৌঁছোবে। এইরকম গোটাতিনেক ভালো গল্প লিখলেই বড় কাগজের পুজো সংখ্যায় উপন্যাস লেখার সুযোগ পাওয়া যায় এখন। কারণ এদেশে গত কুড়ি বছরে কোনও শক্তিমান লেখক আসেননি। সম্পাদকরা কারও মধ্যে সামান্য ক্ষমতার ইঙ্গিত পেলেই সুযোগ দিচ্ছেন। সন্তোষকুমার ঘোষের কাছে শুনেছি যে তাঁর সময়ে খুব ভালো গল্প লিখেও পুজো সংখ্যা আনন্দবাজারে সুযোগ পাওয়া কীরকম অসম্ভব ব্যাপার ছিল, কারণ সমস্ত মহারথীরা সেসময়ে লিখছেন। একবার সম্পাদক ঠিক করলেন একজন নতুন লেখকের গল্প ছাপবেন। অনেক ঝাড়াই বাছাই করে তিনজন নতুন লেখককে গল্প

বলা হল। যার গল্প সবচেয়ে ভালো হবে তাঁরটাই ছাপা হবে। সন্তোষকুমার ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র নামে তিনজন নবীন লেখকের তিনটি গল্প পড়ে সম্পাদক এমন বিপাকে পড়েছিলেন যে সে বছর পুজো সংখ্যায় একটির বদলে তিনটি গল্প ছাপতে হয়েছিল। ওদের পরের যুগে এক ঝাঁক ক্ষমতাবান লেখক লেখার লড়াই চালিয়ে জায়গা দখল করেছিলেন। তারপরের মাঠ শূন্য। যাঁরা বড় কাগজে লেখার সুযোগ পান না বলে চিৎকার করেন তাঁদের নিরানব্বই জনই লিখতে জানেন না। নিজেদের প্রয়োজনেই বড় কাগজগুলো লেখক খুঁজছে সেখানে যাঁরা সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না বলে নাকে কাঁদেন তাদের অপদার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। কিন্তু আমেরিকায় এই চেহারাটি ভাবা যায় না। নতুন লেখকের কোনও উপন্যাস প্রকাশকরা প্রাথমিক মনোনয়নের পর সম্পাদকীয় বোর্ডের কাছে পাঠান। বোর্ড অনুমোদন দিলে তা মাত্র দুহাজার কপি ছাপা হয় স্যাম্পেল সার্ভে করতে, বুক স্ট্যান্ডে প্রদর্শনের জন্যে। সেই বই, লেখক সম্পর্কে পাঠকদের রিপোর্ট

পাওয়ার পর লেখকের ভাগ্যে ব্যাপক প্রচার পাওয়া নির্ভর করে। মোদ্দা কথা, লড়াই ওখানে অনেক বেশি। তৈরি করা অহংকার নিয়ে ওখানে কেউ বাস করে না। অধ্যাপক আমাকে লাইব্রেরিতে নিয়ে গেলেন। বাংলা ভাষায় লেখা সব বই ওখানে আছে। কম্পিউটার সেসব তথ্য মজুত রেখেছে। বাঙালি লেখকদের নামের তালিকায় আমারটিও আবিষ্কার করলাম। আমার নামের পাশের নম্বর আর বাংলা ভাষার প্রতীক নম্বর কম্পিউটারে টিপতেই পর্দায় ভেসে উঠল সমস্ত তথ্য। আমার নাম, জন্ম তারিখ, ঠিকানা বাবার নাম, কী-কী বই এঁদের কাছে আছে তার বিশদ তালিকা। ম্যাজিকের মতো ব্যাপারটা আমাকে মোহিত করল।

ক্যান্টিনের সামনে আমাকে ছেড়ে দিয়ে প্রফেসর ক্লাসে গেলেন। কথা হল সুচরিতার সঙ্গে দেখা করে আমি তাঁর অফিসে গিয়ে অপেক্ষা করব। ক্যান্টিনটি পরিচ্ছন্ন। টেবিলে-টেবিলে ছেলেমেয়েরা জমিয়ে গল্প করছে। একটা খালি টেবিলে বসলাম। খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। এই সময় সুচরিতা এল। খাটো চেহারার প্যান্ট সার্ট পরা মেয়েটি খুব স্মার্ট গলায় আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। ওর ইংরেজি উচ্চারণ মার্কিনিদের মতনই। উলটোদিকের চেয়ারে বসে সে বলল, 'এতো ব্যস্ত যে আপনাকে সময় দিতে পারছি না।'

হেসে বললাম, 'আমি তো সময় চাইনি।'

'আপনি কবে দেশে ফিরছেন?' প্রশ্নের উত্তরে আনুমানিক সময়টা জানলাম। সে সিগারেট ধরাল। তারপর একটা বড় মুখবন্ধ খাম এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ওপরে ঠিকানা লেখা আছে। দয়া করে এটা যদি দেশে পৌঁছে দেন খুব খুশি হব।'

আপত্তি করার কিছু নেই। কথাবার্তা প্রফেসর ডিমকের ওপর ঘুরে এল। এবং আমি জানলাম ডিমক ক্যানসারে আক্রান্ত। অনেকদিন থেকেই রোগটির সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছেন। হতভম্ব হয়ে গেলাম। সুচরিতা চলে যাওয়ার আগে বলল, 'একটা কথা, আমি যে সিগারেট খাচ্ছি দেশে গিয়ে বলবেন না।'

খুব খারাপ লাগল। যে মেয়ে একা আমেরিকায় শিক্ষিত হচ্ছে সে তো সিগারেট খেতেই পারে। কিন্তু তার মানসিকতা হিতমপুরে গাঁয়ের মেয়ের মতো মনে হবে কেন? নাকি আমাকেই খুব গেঁয়ো ঠাওরাল। আমার প্লেন ধরার সময় হয়ে গেছে। হোটেলে ফিরে কেন্টকে নিয়ে বেরুতে হবে। অধ্যাপক ডিমক আমাকে নিয়ে বারান্দা দিয়ে হাঁটছিলেন। হঠাৎ একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এখানে একজন লেখক আছেন। আলাপ করবেন?'

মাথা নাড়লাম, 'না। কারণ উনি আমার লেখা কখনই পড়বেন না। আলাপটা হবে কোন স্তরে?'

ডিমক হাসলেন। বিদায় নেওয়ার আগে আমি আচমকা ওঁকে প্রণাম করে ফেললাম। বাংলা ভাষার নীরব সেবককে প্রণাম না করে আমার উপায় ছিল না। তিনি জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন, 'জীবনে প্রথমবার কেউ আমাকে প্রণাম করল সমরেশ।' তারপর শান্ত হয়ে বললেন, প্রণাম করেছ সেই অধিকারে বলছি, কখনও কারও সঙ্গে কমপ্লেক্স নিয়ে মিশবে না। একজন লেখককে উদার হতে হবে। তুমি সলবেলোর সঙ্গে দেখা করতে পারতে। হি ইজ নট দ্যাট টাইপ। ওই লেখকটির নাম সলবেলো।'

॥ ১৬ ॥

সারাদিন অধ্যাপক ডিমকের সঙ্গে কাটানোয় কেন্টের খবর নেওয়া হয়নি। হোটেলে ফিরে দেখলাম সে রিসেপশনে আমার জন্যে নোট রেখেছে, এলেই যেন ফোন করি। ডেস্ক থেকেই ফোন করলাম।

লোকটা সম্ভবত সারাদিনই আমার জন্যে ঘরে বসে ছিল। সাড়া দিয়ে বলল, সে এখনই নেমে আসছে। গতরাতেও দেখেছি, এই দুপুরেও, হোটেলের রিসেপশন, তার সামনের লবিতে মোটেই ভিড় নেই। বাঁ দিকের স্ট্যান্ডে খবরের কাগজ রয়েছে। তার দুটো টেনে নিয়ে চোখ বোলাতে লাগলাম। না, বব-এর মৃতদেহ আবিষ্কারের খবর কোথাও নজরে পড়ল না। আজ সারাদিন আমি যাই করি না কেন মনের ভেতরে কাল রাতের ঘটনাটা কাঁটার মতন বিঁধে রয়েছে। পুলিশ সম্ভবত এখনও আমার অস্তিত্ব টের পায়নি, যা পাওয়া খুব স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু একজন ভদ্রলোক হিসেবে আমারই উচিত ছিল ঘটনাটা পুলিশকে জানানো। এইসময় কেন্ট মুরহেড সামনে এসে দাঁড়াল, 'প্রফেসর ডিমকের সঙ্গে কেমন কাটল?'

'চমৎকার। কিন্তু আমার প্লেন কখন?'

'সময়টা একটু পিছিয়ে গিয়েছে। আমাদের হাতে এখনও সময় আছে।'

কথাটা শোনার পর ডিমক সাহেবের মুখ আর একবার মনে পড়ল। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটে গেলে উনি কি আমাকে সলবেলোর ঘরে নিয়ে যাবেন? না। তখন যা স্বাভাবিক ছিল এখন তা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। কেন্ট বলল, 'তুমি তো শহরটা ভালো করে দেখলে না। দেখবে?'

কিছুই যখন করার নেই তখন রাজি হলাম। ট্যাক্সি নিয়ে আমি ইচ্ছে করেই সেই দিক দিয়ে যেতে বললাম যেদিক দিয়ে গতরাতে আমি হেঁটেছিলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য, বব-এর রেস্টুরেন্টটা আমার চোখে পড়ছে না। সত্যি শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলাম না। কেন্ট আমাকে বারংবার জিজ্ঞাসা করছিল আমি ঠিক কী খুঁজে পেতে চাইছি, কিন্তু আমি এড়িয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে হল গতরাতে যা ঘটেছিল তার সবটাই কি বিভ্রম, আমার কল্পনায় তৈরি? নইল দিনদুপুরে একটা রেস্টুরেন্ট উধাও হয়ে যায় কী করে!

শিকাগো উইন্ডি সিটি, শিকাগো খুন জখমের শহর, শিকাগো কাউকে তাড়িয়ে দেয় না। পরে জেনেছি ওই শহরে প্রতিদিন এত খুনজখম হয়ে থাকে যে সেগুলো নাকি খবরের কাগজগুলো ছাপে না যদি না তাতে কোনও ভিআইপি জড়িত থাকে। হয়তো সেই কারণেই বব-এর কপালে ছাপার অক্ষরে নিজের নাম ছাপানো সম্ভব হল না।

আর একটি ব্যাপারে আমার কিঞ্চিৎ মোহভঙ্গ হল। কলকাতা শহরের তিনশো বছরের ইতিহাস আমাদের অনেকের মুখস্থ। কে কবে কী করেছিলেন তাও বলে দিতে পারবেন অনেকে। বিদেশিদের ক্রিয়াকাণ্ডগুলো তো আরও বেশি মনে রাখি। এর দুটো কারণ আছে। আমাদের ইতিহাস বইগুলো লেখা হয়েছে বিদেশিদের পরিচালনায়। তাঁদের মতন করে তাঁরা আমাদের ইতিহাস পড়িয়েছেন। ইতিহাস লেখকদের যে-কোনও প্রকারে কিনে নেওয়ার চেষ্টা তো পৃথিবীর সব দেশে সব যুগেই হয়ে থাকে। আজ এদেশের ইতিহাস যদি সি পি এম সরকার লেখাতে চান তো একরকম হবে আবার কংগ্রেস যদি ক্ষমতায় কখনও ফিরে আসেন এবং ইতিহাস লেখান তো অন্যরকম হবে। তা আমাদের যা শেখানো হয়েছিল তা মুখস্থ করে সব কিছু মনে রেখে দিয়েছি। দ্বিতীয়ত, বাঙালির রোমন্থন করার অভ্যেস ড্রাগের নেশার থেকেও তীব্র। এই স্মৃতি হাতড়ানো কিন্তু শেখানো পথেই, বাস্তব অবাস্তব, সত্য অসত্য যাচাই না করে। এবং আমরা বাঙালিরা এইসব ব্যাপার অন্যের মধ্যেও সমানভাবে আশা করি। মনোজ একদিন আমায় বলেছিল, 'ভাবতে পারেন শ্বশুরবাড়ি থেকে টাকা আনেনি বলে মার্কিন বউকে তার স্বামী পুড়িয়ে মেরেছে? বাঙালি ছেলেদের মেরুদণ্ডহীন করে রাখা হয়েছিল বলেই তাদের কিছু-কিছু উজ্জ্বল প্রতিনিধি এখনও শ্বশুরবাড়িকে শোষণের কাজে মা-বাবার সঙ্গে হাত মেলান। যদি তোর বউকে পছন্দ না হয় তাহলে ডিভোর্স কর। পুড়ে মরার চেয়ে বাঙালি মেয়েরা আলাদা হতে চাইবে না, এ আমি বিশ্বাস করি না সমরেশ।'

এত কথা উঠল কারণ সেদিন ওই এক ঘণ্টায় আমি রাস্তায় যত কালো এবং সাদা মানুষকে প্রশ্ন করেছি তাদের একজনও শিকাগোর ইতিহাসটা ঠিকঠাক বলতে পারেননি। এটাও মেনে নিয়েছি।

কলকাতার ফুটপাতে কাউকে ইতিহাস জিজ্ঞাসা করলে হয়তো তোতলাবে। রাসবিহারী এভিন্যুতে দাঁড়িয়ে কেউ হয়তো বলবেন যাঁর নামে রাস্তা তাঁর নাম শোনেননি। কিন্তু অক্ষমতা স্বীকার করবেন না। শিকাগোর মানুষরা কিন্তু এ ব্যাপারে অকপট ছিলেন। কালোরা বলেছেন, 'আমরা লিঙ্কনের কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের তেমন কোনও ইতিহাস নেই। ইংরেজরা এখানে এসে জুড়ে বসল, স্প্যানিশরাও তাদের অনুসরণ করল আর আমরা অনেক বছর পর তাদের সঙ্গে মিশে গেলাম। না, আমাদের কোনও ইতিহাস নেই, থাকার মধ্যে রয়েছে বর্তমান।'

এবং যে ব্যাপারটা আমাকে আর একবার দুঃখিত করেছিল তা হল এঁরা কেউ বিবেকানন্দের নাম শোনেননি। ১৮৯৩ সালের এগারো থেকে সাতাশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শিকাগো শহরে যে বিশ্বধর্ম সম্মেলন হয়—বাঙালি হিসেবে আমরা গর্বিত হই কারণ, 'আশ্চর্যপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিতে উঠে সকলের মন হরণ করে নিলেন, সারা শহর মুখরিত হল তাঁর নামে।' সেই প্রথম ভারতবর্ষের বাইরে কোনও বাঙালি নিজেকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারলেন। ১৮৯৪ সালে আমেরিকায় বসে যে মানুষ বলতে পেরেছিলেন, 'দাসব্যাবসা রহিত হওয়ার আগে দাসদের যে অবস্থা ছিল, এখন তাদের অবস্থা শতগুণে মন্দ। দাস-প্রথা রহিতের আগে হতভাগ্য নিগ্রোরা ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি ছিল, আর যেহেতু সম্পত্তি তাই তাদের রক্ষণাবেক্ষণ মালিকদের করতে হত, পাছে ক্ষতি হয়। এখন তারা কারও সম্পত্তি নয়—তাদের জীবনের কোনও মূল্যই নেই—সামান্য ছুতোয় তাদের পুড়িয়ে মারা হয়। গুলি করে মারা হয় তাদের—কিন্তু খুনিদের বিরুদ্ধে কোনও আইন নেই, থাকবে কী করে তারা তো মানুষ নয়, জন্তু পর্যন্ত নয়—তারা নিগার।'

মনে রাখতে হবে, বিবেকানন্দ যখন এইসব বাক্য উচ্চারণ করছিলেন তার পঞ্চাশ বছর আগে হলে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হত অথবা পাথর ছুড়ে বা জ্যান্তই পুড়িয়ে মারা হত। আর যাদের সম্পর্কে এত বড় সত্য উচ্চারণ করলেন তিনি তারা যদি একশো বছর পার হওয়ার আগে কাঁধ ঝাঁকিয়ে পালটা প্রশ্ন করে, 'হু ওয়াজ হি?' তাহলে আমাদের দুঃখ লাগতে পারে কিন্তু বাস্তব তো বাস্তবই। আমি জানি না, হয়তো শিকাগো ধর্মসম্মেলন নিয়ে আমাদের দেশে যে প্রচার হয়েছে খোদ শিকাগো শহরে তা হয়নি। আমেরিকান প্রেস বিবেকানন্দকে জায়গা দিয়েছিলেন কিন্তু সেটাও হয়তো সেখানকার মানুষকে উদ্বেলিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। যেহেতু আমাদের স্মৃতিতে আবেগ রয়েছে তাই আমরা বেশি মাত্রায় আপ্লুত হই। কিংবা মনোজই হয়তো ঠিক বলেছিল, 'বড়লোকদের ড্রইংরুমে দাঁড়িয়ে পাঁচটা সত্য কিন্তু কঠোর কথা বলে এসেছি, এই গর্বে গরিব সারাজীবন টগবগ করতে পারে, কিন্তু বড়লোক পরের সকালেই সেটা ভুলে যায়।'

শিকাগো এয়ারপোর্ট থেকে প্লেন আকাশে উঠতে পা ছড়িয়ে বসলাম। একটা জিনিস লক্ষ করছি, এখানকার এয়ারহোস্টেসদের সঙ্গে যাত্রীদের বেশ ভাবসাব আছে। কেউ-কেউ তো চেয়ারের হাতলে বসে গল্প করছে। যেন অনেকদিন বাদে বন্ধুর সঙ্গে দেখা। অথচ কথাবার্তায় মালুম হল এদের প্রথম সাক্ষাৎ এখনই। কেন্টের মাধ্যমে মিনিটপনেরো এদের বিরক্ত করে চললাম। কলকাতায় বসে কল্যাণ বলেছিল প্লেনের টয়লেটে ঢুকে সাবান হাতিয়ে নিতে সুভেনির হিসেবে, তাও করেছি। তাসের প্যাকেট পেয়েছি বালিকাদের অনুরোধ করে। শিকাগো থেকে লসএঞ্জেলস টানা সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার যাত্রা। কোথাও থামবে না। অতএব পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে নেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু ঘুম আসছিল না। এও এক জ্বালা।

লস এঞ্জেলস্ এয়ারপোর্টে নেমে ঘড়ির কাঁটা ঘোরাতে হল। সময় এই দেশেও সব জায়গায় এক নিয়মে চলে না। যখন বেশ রাত নামবার কথা তখন বিকেল হচ্ছে লস এঞ্জেলসে। এয়ারপোর্টের কাছে বাড়ি-ঘরদোর থাকে না। এখানেও নেই। কোম্পানির বাসে চলে এলাম পার্কিং লটে। কেন্ট এখান থেকে কার্ড দেখিয়ে গাড়ি নেবে কয়েকদিনের জন্যে। অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে দেখলাম বাঁধানো চাতালে কয়েকশো গাড়ি দাঁড়িয়ে। তাদের চেহারাতেই মূল্য মালুম হচ্ছে। মিনিটদশেক বাদে কেন্ট

গাড়ি পেল। লম্বা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। মালপত্র তার ডিকিতে তুলে দিয়ে ভেতরে বসতেই মনে হল ফাইভ স্টার হোটেলের সোফায় বসেছি। গাড়িতে রেডিও এবং টিভি রয়েছে। কেন্ট অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে গাড়ির জঙ্গল পেরিয়ে হাইওয়ের দিকে এগোতে-এগোতে আচমকা গালাগালি দিয়ে উঠল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আমি যদি গাড়িটা ঘুরিয়ে নিই, তাহলে তুমি অখুশি হবে?'

'কেন? আবার ঘোরার কী দরকার?'

একটু লজ্জিত ভঙ্গি করল কেন্ট, 'আমার একটা ভুল হয়েছে। ব্রিফকেসটা ফেলে এসেছি ওখানে।' অতএব ফিরতে হবেই। কিন্তু খুশি হলাম। আমার এসকর্টটির স্বভাব তাহলে আমার মতনই। স্বচ্ছন্দে এখন ওয়াশিংটনকে বলা যায় যে নিজের জিনিসের দায়িত্ব নিতে পারে না সে আমার দায়িত্ব নেবে কী করে? কিন্তু এমন অভিযোগ করার মতো মূর্খ আমি নই। কেন্ট না থাকলে আমি যে হাজারটা ঝামেলায় পড়তাম তা এর মধ্যে হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি।

লস এঞ্জেলস শহরের রাস্তাঘাট এবং পাড়াগুলোর নাম যতটা ইংরেজিতে তার বহুগুণ বেশি স্প্যানিশে। চট করে স্পেন দেশে এসেছি বলে ভুল করা বিচিত্র নয়। আমরা যাব লস এঞ্জেলসের এক প্রান্তে, স্যান ডিনাসে। রাস্তাটার নাম অ্যাভিনিডা এস্টারাডা। মনোজের বন্ধু বনজ বসু থাকেন সেখানে। মনোজই চিঠিপত্র এবং টেলিফোনে ওঁকে আমার খবরাখবর জানানোর পর উনি উৎসাহিত হয়েছেন আমাকে আশ্রয় দিতে। এয়ারপোর্টেও আসতে চেয়েছিলেন কিন্তু মনোজ নিষেধ করেছিল। বলেছিল, 'পথ চিনতে দাও সমরেশকে। নিজে-নিজে যা চিনে নিলে চেনা যায় না।'

তখন অবশ্য ও জানত না আমার সঙ্গে সরকারি গাইড থাকবে।

লস লঞ্জেলস্ শহরের মতো রাস্তায় এত গাড়ি আমি কোথাও দেখিনি। না কলকাতায় না নিউ ইয়র্কে। পিঁপড়ের মতো থিকথিক করছে যেন। মাঝে-মাঝেই দাঁড়িয়ে পড়তে হলেও বড়বাজারে জ্যাম কোথাও পাইনি। সন্ধে নামছে শহরে। কিন্তু ফুটপাতে কোনও লোক নেই। এখানে বোধহয় কেউ হাঁটাহাঁটি করে না। স্যান ডিনাসে পৌঁছোতে আমাদের প্রায় মিনিট পঁয়তাল্লিশ লেগে গেল। যে জিনিসটা এখানে এসেই টের পাচ্ছি তা হল আবহাওয়ার আকাশ পাতাল ফারাক। অঙ্গের ধরাচূড়া ক্রমশ অসহ্য মনে হচ্ছে। গরমকালে দার্জিলিং থেকে নেমে আসার সময় শুখনা পেরোলে যে রকম লাগে আমার অবস্থা এখন সেইরকম। যদিও গাড়ির এয়ারকন্ডিশন মেশিন চালু করেছে কেন্ট, তবু একটার পর একটা শীতবস্ত্র খুলতেই লাগলাম।

স্যান ডিনাস অনেকটা টিলার মতো জায়গা। পাক দিয়ে-দিয়ে উঠতে হয়। সারা শহরে এখন হীরের দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ছে। অন্ধকার নেমেছে কিন্তু সেটা তিন নম্বর গয়লার চার নম্বর দুধের মতো পাতলা। বাড়ি খুঁজে পেতে বেশ ঘুরতে হল। রাস্তায় কেউ নেই যে ডেকে জিজ্ঞাসা করব, 'দাদা, ষোলোশো এগারো নম্বর বাড়ি কোন দিকে?' পাড়ার ভেতরেও বিরাট চওড়া রাস্তা ছবির মতো ছিমছাম। দুপাশে অনেকখানি জায়গা নিয়ে বাগান আর বাড়ি। শেষপর্যন্ত ষোলোশো এগারো নম্বরের সামনে গাড়ি থামাতেই কাচের দরজা খুলে গেল। খাটো চেহারার শক্ত গড়নের এক ভদ্রলোক পাজামা পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে এসে দুটো হাত যুক্ত করলেন, 'নমস্কার। আজ নিশ্চয়ই রাস্তায় হেভি ট্রাফিক পেয়েছিলেন?'

মজা লাগল। যেন রোজই এইপথে আসছি এমন ভঙ্গিতে আজকের খবর জিজ্ঞাসা করছেন ভদ্রলোক। যে মানুষ প্রথম দর্শনেই এক অপরিচিতের সঙ্গে এই ভাষায় কথা বলতে পারেন, তার সঙ্গে জমে যেতে সময় লাগে না। মালপত্র নামিয়ে কেন্ট বলল, সে কাছাকাছি কোনও হোটেলে উঠবে। নিশ্চয়ই আজকের রাত্রে আমি বের হব না। কাল সকালে ব্রেকফাস্টের পর গাড়ি নিয়ে আসবে।

কেন্ট চলে যাওয়ামাত্র আর একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়ির ড্রাইভারই রিমোট কন্ট্রোলে গ্যারাজের শাটার খুললেন। ততক্ষণ গাড়ির নাম্বার প্লেটে আমার নজর যাওয়ায় আমি প্রায় হতবাক।

পরিষ্কার লেখা অঞ্জনা। বনজ বললেন, আপনি আসবেন বলে ও একটু বাজারে বেরিয়েছিল। কত দেরি করে ফিরল দেখুন।'

ওই গাড়ির ড্রাইভার কাছে এসে নমস্কার করে বললেন, 'আমি অঞ্জনা, আপনি সমরেশবাবু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' আমি ফিরে আবার শাটার না টানা গ্যারেজে সদ্য পার্ক করে রাখা গাড়ির নাম্বার প্লেট দেখলাম। সেটা লক্ষ করে বনজ বললেন, 'ওটা এঁর গাড়ি। একটু বেশি টাকা দিলে ডিজিটের বদলে লেটারে নাম্বার প্লেট পাওয়া যায়। তাই যার গাড়ি তার নামেই নাম্বার প্লেট করিয়ে দিয়েছি।'

অঞ্জনা মাথা হেলালেন, 'হল? সমরেশবাবু এর মধ্যে ব্যাপারটাকে আদিখ্যেতা বলে ভাবতে শুরু করেছেন।' ভেতরে ঢুকতে-ঢুকতে বনজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, বউকে ভালোবাসি এটা সবাইকে জানালে আদিখ্যেতা হবে কেন বলুন তো?'

মাথা নেড়ে বললাম, 'আমি কিন্তু কিছুই বলিনি। মেয়েরাই আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে আক্রমণ করেন।'

অঞ্জনা কিছু বলতে গিয়েও হেসে ফেললেন, 'না, বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই আপনার সঙ্গে ঝগড়া করব না। কিন্তু দাদা, আপনার লেখা পড়ে তো মনেই হয় না যে আপনি নারীবিদ্বেষী!'

এবার চমকাবার পালা আমার। প্রথম কথা, অঞ্জনা লস এঞ্জেলসে বসে আমার লেখা পড়ছে, এবং মেয়েদের সম্পর্কে আমি বিদ্বেষ পোষণ করি? পিসিমা বেঁচে থাকলে দ্বিতীয় মন্তব্যটি করার জন্যে কখনও অঞ্জনার সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন না। অবশ্য এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। প্রথমটির ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করতে অঞ্জনা আমাকে ওদের স্টাডি রুমের দরজায় নিয়ে গেলেন। চেয়ে দেখুন।'

দেখলাম একটি টেবিলে 'দেশ' পত্রিকার প্রায় পাহাড়। লস এঞ্জেলসেও তাহলে 'দেশ' আসে। বনজ প্রসঙ্গটা আপাতত চালাতে দিলেন না। ওঁদের এই বাড়ি দোতলা। চমৎকার সাজানো গোছানো। বনজদের দুই কন্যা এসে আলাপ করে গেল। চা খেতে-খেতে জানলাম অঞ্জনার বাপের বাড়ি কলেজ স্ট্রিট এলাকায়। আমেরিকায় তার একটুও ভালো লাগছে না। কিন্তু মেয়েদের পড়াশোনা আর বনজের চাকরির জন্যে কেবল মন খারাপ করেই থাকতে হচ্ছে। দুবছর অন্তর দেশে যান এঁরা। লস এঞ্জেলসের ভারতীয় ক্লাবগুলোর সঙ্গে জড়িত। প্রায় শিল্পী আনিয়ে অনুষ্ঠান করেন। অঞ্জনা জানালেন, অভিনেতা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক ভাই এই শহরেই থাকেন।

আমার ঘর একতলাতেই। সুন্দর ছিমছাম। টয়লেটে গিয়ে আবার বিব্রত হতে হল। ফ্ল্যাশের নব খুঁজে পাচ্ছি না। প্রায় মিনিটপাঁচেক খোঁজাখুঁজির পর পায়ের তলায় সেটিকে আবিষ্কার করলাম। আমেরিকায় এসে এই প্রথম আমি পাজামা পাঞ্জাবি পরলাম। বেশ আরাম লাগল। পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে আসতেই বনজ বললেন, 'একটু আগে আপনার ফোন এসেছিল। আপনি টয়লেটে আছেন বলে ডাকিনি।'

'মনোজ?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'না-না। একটি মেয়ে। নাম বলল জুলি।'

মাথা নাড়লাম। অদ্ভুত মেয়ে তো। যেখানেই যাচ্ছি সেখানেই গিয়ে শুনছি জুলি ফোন করেছিল। অথচ কখনই তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি না। কিন্তু এই ফোন নাম্বারগুলো সে পাচ্ছে কোত্থেকে?

যত্ন করে খাওয়াল অঞ্জনা। বনজ বললেন, 'আজ অনেক খাটুনি হয়েছে আপনার। শুয়ে পড়ুন। একদিন আপনাকে নিয়ে আমরা বের হব।'

বসু দম্পতি সম্ভবত বড্ড বেশি নিয়ম মেনে চলেন। এই ইঙ্গিত মনোজ আমাকে দিয়েছিল। খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে ফিরে এলাম নিজের ঘরে। অথচ এখন আমার ইচ্ছে করছে বাইরে বের

হতে। রাত্রে লস এঞ্জেলসের চেহারাটা দেখতে বড় ইচ্ছে করছিল। ঘড়ি দেখলাম। প্রায় সাড়ে এগারোটা। মনোজকে খুব মনে হচ্ছিল এই সময়। তারপরেই নিজেকে শাসন করলাম বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে। কলকাতায় কি এই সময় কেউ আড্ডা মারতে বের হয়? আমি কখনও যেতাম না।

গরমদেশে সকাল হয় সাত তাড়াতাড়িতে। রোদ উঠলে আমি বিছানায় পড়ে থাকতে পারি না। কিন্তু যে ঘরে আমি শুয়েছিলাম তার ভারী পরদাগুলো আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। ন'টার সময় যখন পরিষ্কার হয়ে ঘরের বাইরে এলাম তখন কেন্ট বলল, 'হেলো, গুড মর্নিং

'মর্নিং। কখন এসেছ?'

ততক্ষণে দেওয়ালে ঝোলানো ইলেকট্রিক ঘড়ির দিকে আর একবার নজর গিয়েছে আমার কেন্ট একা বসে রয়েছে ড্রয়িংরুমে। বনজ কিংবা অঞ্জনাকে দেখতে পাচ্ছি না।

'ঘণ্টাখানেক। মিসেস বোস বললেন তুমি ঘুমোচ্ছ।'

'হ্যাঁ। একটু আরাম করছিলাম।' হঠাৎ মনে হল সেটা করতেই পারি। কারও সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে সেটা রাখতে যাওয়া ছাড়া বাকি সময়ে আমি যা ইচ্ছে করতে পারি

'মজুমদার আর ঠিক দেড় ঘণ্টার মধ্যে আমাদের অফিসে পৌঁছোতে হবে

'পৌঁছে যাব। কেন্ট তুমি বিবাহিত?'

'হ্যাঁ, আমার একটি মেয়ে আছে। কেন বলো তো?'

'আমার এক ব্যাচেলার বন্ধু আছে। সে ঠিক তোমার মতো বিকেলে ট্রেন থাকলে সকালে তাড়া দেয়। কিন্তু এখন কিছু খাবার দরকার। তোমাকে এখানে ঢুকতে দিল কে?'

'মিসেস বোস। উনি মেয়েদের নিয়ে খানিক আগে বেরিয়েছেন। বলে গেছেন তোমার যদি খিদে পেয়ে যায় তাহলে কিচেনে সব ব্যবস্থা করা আছে।'

কেন্ট কথা শেষ করতেই আমি কিচেনের উদ্দেশে হাঁটতে লাগলাম। এবং তখনই টেলিফোন বেজে উঠল। কেন্টের সামনেই টেলিফোন। সে রিসিভার তুলে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমাকে জানাল, 'তোমার ফোন।' কিচেনের দরজায় দেখলাম একটি কর্ডলেস রিসিভার ঝোলানো। সেটি তুলে নিয়ে প্রশ্ন করলাম বাংলায়, 'আপনি কে বলছেন?'

ওপাশে সামান্য ইতস্তত, তারপর মিষ্টি গলায় মেয়েলি স্বর কানে এল, 'মে আই স্পিক টু মিস্টার মজুমদার?'

এবার ইংরেজিতে জানালাম তিনি জায়গায় পৌঁছেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে একটা চিৎকার ছিটকে উঠল যেন ওপাশে। সেইসঙ্গে হাসির মিশেল। কথা যখন স্পষ্ট হল তখন শুনলাম, 'ও মজুমদার, আমি তোমাকে রোজ শুধু খুঁজে যাচ্ছি। আমার ভাগ্য এত খারাপ যে তোমাকে পাচ্ছিলাম না কিছুতেই। শেষ পর্যন্ত তুমি আমাদের শহরে এসে গেছ, উঃ, কী আনন্দ হচ্ছে। ওহো, আমি হলাম জুলি, কামাল আমাকে তোমার কথা বলেছে। ও বলেছে তুমি খুব ভালো লেখো। আমেরিকার একটি কালো মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাও। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই মিথ্যে নয়, তাই না?'

'কামাল তোমাকে সত্যি কথা বলেছে।'

'আই অ্যাম ডায়িং টু মিউ ইউ। কখন দেখা হচ্ছে বলো?'

'আমি আজ সকালে সরকারি অফিসে যাব। তোমার ফোন নাম্বারটা দাও, একটু ফাঁকা পেলেই তোমায় ফোন করব।'

'কিন্তু সেটা আজই। আমি বাড়িতেই থাকব বিকেলে পর্যন্ত।'

জুলির টেলিফোন নম্বর লেখার পরও সে কথা বলতে চাইছিল। কিন্তু যেই শুনল আমি ঘুম থেকে ওঠার পর কিছু খাইনি অমনি হাঁ-হাঁ করে উঠল, সে কী! এতবেলা অবধি কিছু খাওনি? বলবে তো! না, আমি ফোন নামিয়ে রাখছি। ও হ্যাঁ, নতুন জায়গায় এসেছ, আজ সকালে অনেকটা

অরেঞ্জ জুস খেয়ে বেরুবে।'

টেলিফোন নামিয়ে হেসে ফেললাম। দূরে বসা কেন্ট সেটা লক্ষ করে জিজ্ঞাসা করল, 'হাসছ কেন?'

মাথা নেড়ে কিছু না বলে কিচেনে ঢুকলাম। জুলি কালো চামড়ার নিগ্রো মেয়ে। অথচ ওর এই শেষ কথাগুলোর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের নায়িকার কোনও পার্থক্য নেই। আমেরিকায় আসার পর থেকেই মনে হয়েছিল সাতানব্বুই বছর আগে বিবেকানন্দ এদেশে এসে যা দেখেছিলেন, তা আজ এলে শুধরে নিতেন অনেক ব্যাপারে। বিশেষ করে মেয়েদের সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যটি আজ তিনি বলতে পারতেন বলে ধারণা জন্মেছিল। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'হে আমেরিকার নারী, শত সহস্রবার জন্মেও আমি আপনাদের কাছে আমার গভীর কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করতে পারব না। আমার কৃতজ্ঞতার প্রকাশের ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না' বলেছিলেন, 'আমেরিকার নারীরা নিজেদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত না হয়েও সেখানে যা কিছু মঙ্গলময়, শুভময় তারই প্রতি অগাধ সহানুভূতিশীল।' জুলির সঙ্গে কথা বলার পর বিবেকানন্দকে মনে পড়েছিল। সময়ের উইপোকা কাগজ কাঠ ইত্যাদি ভঙ্গুর জিনিসের গায়ে দাঁত বসাতে সক্ষম কিন্তু সোনা ইস্পাত প্রভৃতি ধাতব পদার্থকে স্পর্শ করার কোনও ক্ষমতা রাখে না। জুলির সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমার ভেতরে একটা আগ্রহ জন্মাল।

এই সময়ের মধ্যে আমি আমার ব্রেকফাস্ট বানিয়েছি। পাঁউরুটি সেঁকে মাখন বুলিয়েছি, ফ্রিজ খুলে খানিকটা পুডিং নিয়েছি আর চায়ের জল গরম করে একটা পাতলা লিকার তৈরি করেছি। প্রচুর খাদ্যদ্রব্য রয়েছে ফ্রিজে। কিন্তু রান্নাঘরে অনভিজ্ঞতার দরুন এগোতে সাহস করিনি। খাওয়ার ব্যাপারে আমার অবশ্য কিছুতেই উন্নাসিকতা নেই। কিন্তু এই যে খাবার বানালাম, যা পারলাম খেয়ে ডিস কাপ ধুয়ে সাজিয়ে রাখলাম যথাস্থানে, কলকাতায় কি কখনও করতাম? এখন মনে হচ্ছে করলে মন্দ [illegible]

[illegible] যখন বাইরে বের হওয়ার জন্যে তৈরি তখনও অঞ্জনা ফেরেননি। অতএব বাইরে থেকে [illegible] বন্ধ করে গাড়িতে উঠলাম। আমাদের দেশে বাড়িতে কেউ এলে তার জন্যে [illegible] বাড়ির কর্তাও সময় দিয়ে থাকেন। প্রথম সকালেই আগন্তুক নিজে খাবার তৈরি করে [illegible] ভাবা যায় না। অনেকে তো রীতিমতো অপমানিত বোধ করবেন। কিন্তু ওদেশে প্রত্যেকের জীবন [illegible] নিয়মে বাঁধা এবং কাজকে অবহেলা করার প্রবৃত্তি এত কম যে সময়ের সঙ্গে [illegible] চললে না তাকে নিজের খাবার করে নিতে হবে। আমি যদি সাতটার সময় উঠতাম [illegible] নিশ্চয়ই কিচেনে ঢুকতে দিতেন না। অনাবশ্যক কিছু চক্ষুলজ্জার জন্যে এদেশে আমরা [illegible] ক্ষতিগ্রস্ত হই। সেই সকালে অঞ্জনা ঠিক কাজই করেছিলেন।

[illegible] গাড়িতে চেপে কেন্টের পাশে বসে আমি শহরের দিকে চলেছি। এখানেও রাস্তায় কোনও [illegible] কিন্তু গাড়িতে-গাড়িতে পথ ছয়লাপ। এত গাড়ি এবং তাদের রকমারি বাহার দেখে [illegible] লাগছিল। থামতে হচ্ছে কিন্তু সেটা বেশিক্ষণের জন্যে নয়। রাস্তাগুলো এত চওড়া যে [illegible] বেডরোড পাশাপাশি স্বচ্ছন্দে ঢুকে যাবে। এমনকী শহরের মধ্যেও। মাঝে মাথার ওপর সংকেত ফুটে উঠেছে। অমুক রাস্তায় জ্যাম হয়েছে, আপনারা দয়া করে রাস্তা পরিবর্তন করুন। [illegible] তো মাঝে-মাঝেই চোখে পড়ছে।

সরকারি অফিসটিতে আমাদের যেতে হল সেটি একেবারে শহরের মাঝখানে। এর মধ্যে কেন্টকে জিজ্ঞাসা করেছি হলিউড কোন দিকে? সে যা বুঝিয়েছে তা ভালো করে মাথায় ঢোকেনি। একবার একটা রাস্তা দেখিয়ে বলল, 'এই দিক দিয়ে ডিজনিল্যান্ড যাওয়া যায়।'

সরকারি অফিসার একজন প্রৌঢ়া মহিলা। পরিচয় পেয়ে বসতে বললেন। তাঁর নজর আমার পোশাকের ওপর। পাজামা পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে খুব আরাম লাগছিল এতক্ষণ, ওঁর দৃষ্টিতে সামান্য অস্বস্তি এল। উনি অবশ্য প্রসঙ্গ তুললেন না, 'মিস্টার মজুমদার, আমি খুব দুঃখিত। অনেক চেষ্টা

করেও হ্যারল্ড রবিন্সের সঙ্গে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দিতে পারলাম না।'

বললাম, 'ওয়াশিংটনে বব আমাকে সেটা বলেছে।'

মহিলা বললেন, 'ডাস্টিন হফম্যান এবং অ্যান্টনি কুইন এখন নিউইয়র্কে। ব্রডওয়েতে নাটক করছেন। কিছু করার নেই। গ্রেগরি পেককে আমরা কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করছি। সিডনি পয়েটারকে আগামীকাল বিকেলে পেতে পারি। আমি আপনাকে অনুরোধ করব যখন দিনতিনেক এই শহরে থাকছেনই তখন ডিজনিল্যান্ড আর হলিউডটা ঘুরে দেখুন। এর মধ্যে আমরা এদিকটায় কিছু করার চেষ্টা করছি।'

আমার কিছু বলার নেই। মনে পড়ল আনন্দবাজারের সম্পাদক অভীক সরকারের কথা। উনি বলেছিলেন, 'সরকারি আমলাদের অনুরোধ ফিল্ম স্টাররা শুনবেই না। ওদের ধরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবেন না। পাত্তাই দেবে না সরকারি আমলাদের।'

মনে হল কথাগুলো ঠিকই। ভদ্রমহিলার পাশে দাঁড়িয়ে এক প্রৌঢ় আমাদের কথা শুনছিলেন। এবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর কারও সঙ্গে দেখা করতে চান। ধরুন, পুরোনো দিনের অভিনেতা অভিনেত্রী?'

মাথা নেড়ে না বললাম। ওঁরা অনেকটা দুঃখ প্রকাশ করে বললেন যে হাল ছাড়বেন না। অতএব এখন আমরা হলিউডে যাব। ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'একটা ফোন করতে পারি?'

তিনি বললেন, 'স্বচ্ছন্দে।' জুলিকে ফোন করলাম। সে সম্ভবত টেলিফোনের পাশেই ছিল। ওঁকে জিজ্ঞাসা করে বাড়ির ঠিকানা আর কীভাবে যাব, লিখে নিলাম।

গাড়িতে উঠে কেন্টকে ঠিকানাটা দিলাম। কেন্ট জিজ্ঞাসা করল, 'হু ইজি শি? তোমার বান্ধবী?'

কী উত্তর দেব? হেসে বললাম, 'না। এখনও নয়।'

কিন্তু নির্দেশ ধরে আধঘণ্টাটাক চলার পর বাঁক ঘুরতে-ঘুরতে কেন্ট জিজ্ঞাসা করল, 'জুলির সঙ্গে তোমার কীভাবে আলাপ হল বলো তো?'

'কেন?' অবাক হলাম। কেন্ট মাথা নাড়ল, 'এদিকটায় কালোরা থাকে, তাই জিজ্ঞাসা করলাম। ততক্ষণে আমরা যে রাস্তায় ঢুকেছি তার দুপাশে লনওয়ালা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। নির্দিষ্ট নম্বরের প্যাসেজে গাড়ি ঢুকল। দরজা খুলে নামতেই দেখলাম একটি কালো তরুণী দৌড়ে বারান্দায় এল। এসে চিৎকার করল, 'মজুমদার? মাথা নাড়তেই সে লাফিয়ে নামল লনে। তারপর তীব্রগতিতে ছুটে আসতে লাগল আমার দিকে।

॥ ১৭ ॥

দীর্ঘাঙ্গিনী কালো মেয়েটি প্রায় দুহাতেই আমাকে জড়িয়ে ধরল প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস নিয়ে। যেন দীর্ঘদিন পরে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, হয়তো কোনওদিন যে-কোনও ধরনের নিবিড় সম্পর্ক ছিল তার সঙ্গে, জুলির সমস্ত শরীর এবং নিশ্বাসে সেইরকম অভিব্যক্তি ছিল। আমার হাতে হাত রেখে সে চিৎকার করে বলল, 'অ্যাট লাস্ট ইউ আর হিয়ার। অ্যাঁ?'

এই বঙ্গসন্তান ততক্ষণে দমবন্ধ করে দাঁড়িয়ে। মধ্যবয়সী এক যুবতী দীর্ঘাঙ্গিনী যার মুখ চোখে তেলতেলে ভাব, গায়ের রং জলপাই-এর গায়ে নামা পাতার ছায়ায় মতো সে আমাকে এমনভাবে আপ্যায়ন করবে কখনও ভেবেছিলাম! আমার বাক্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সম্ভবত। শুধু দেখলাম কেন্ট প্রচণ্ড বিস্ময় নিয়ে আমাদের দেখছে। জুলি তখনও বলে যাচ্ছে কোথায়-কোথায় আমাকে টেলিফোন করেছে। কামাল তাকে জানিয়েছে আমি নাকি গল্প উপন্যাস লিখি। আজ পর্যন্ত কোনও লেখককে

সে দেখেনি। কামাল আরও বলেছে সাদা মেয়েদের চেয়ে আমি কালো মেয়েদের বেশি পছন্দ করি। কারণ আমি যে দেশ থেকে এসেছি সেখানকার মেয়েদের রং কালো। এসব শুনেই সে নাকি আমার দেখা পাওয়ার জন্য উত্তেজিত হয়ে অপেক্ষা করছে। এই সময় ওপরের টেরেসে একজন প্রৌঢ়ের আবির্ভাব ঘটল। ভদ্রলোকের জুলপি সাদা। পরনে যাজকদের সাদা পোশাক। মুখে স্মিত হাসি। জুলি চিৎকার করল, 'চার্লি, দ্যাখো কে এসেছে! তুমি বাজিতে হেরে গেলে।'

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'হারাটা এক্ষেত্রে খুবই আনন্দের। কিন্তু ওঁকে বাইরে দাঁড় করিয়ে কষ্ট দিচ্ছ ডার্লিং। ওয়েলকাম মজুমদার। এই মুহূর্তে আমার পরিচয় জুলির স্বামী, চার্লস।'

কালো চামড়ার সুগঠিত মানুষটির গলার স্বর চমৎকার। হতভম্ব হয়ে জুলিকে জিগ্যেস করলাম, 'বাজির ব্যাপারটা কী?'

'আমি তোমাকে ফোন করছি আর তুমি রেসপন্স করছ না দেখে চার্লি বলেছিল যে তুমি কখনওই আমার কাছে আসবে না। তাই বাজি হয়েছিল।'

'বাজিতে কী জিতলে?'

'তুমি আসামাত্রই ও আমাকে একটা গান লিখে দেবে।'

'উনি গান লেখেন নাকি?'

'লিখতে কি চায়? জোর করে লেখাতে হয়।'

'আর উনি জিতলে?'

'আমাকে একদিন কথা বন্ধ করে থাকতে হবে।'

'কেন? তুমি বেশি কথা বলো নাকি?'

'মোটেই না। পাদরিদের তো চেনো না। নিজেরাই শুধু কথা বলতে চায়।'

'চার্লি কি পাদরি?'

'হ্যাঁ। রেভারেন্ড।'

এইসব কথা বলতে-বলতে আমরা লন পেরিয়ে যাচ্ছিলাম। জুলি আমার একটা হাত জড়িয়ে রেখেছিল। হঠাৎ মনে পড়তেই ঘুরে দাঁড়ালাম, 'কেন্ট, এসো।'

গাড়িতে হেলান দিয়ে বুকের ওপর দুটো হাত ভাঁজ করে কেন্ট বলল, 'থ্যাংকস। আমি এখানেই খুব আরামে আছি। তোমার কি খুব দেরি হবে?'

'ঘণ্টাখানেক। কিন্তু তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন?'

'আমি এক বন্ধুর কাছে যাচ্ছি। ঠিক এক ঘণ্টার মাথায় ফিরে আসব।'

কেন্ট ফিরে গেল ড্রাইভিং সিটে। সেদিকে তাকিয়ে চাপা স্বরে জুলি জিগ্যেস করল, 'হু ইজ হি?'

'আমার এসকর্ট। সরকার থেকে দিয়েছে।'

'কোন স্টেটের লোক ও?'

'কেন?'

'মাস্ট বি ব্ল্যাক্ হেটার।'

'যা। আজকাল কেউ ওসব করে নাকি? আমিও তো কালো।'

'ওপরে চলো বলছি।'

চার্লি দাঁড়িয়ে ছিলেন সিঁড়ির মুখে। দুটো হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরে বললেন, 'ওয়েলকাম, ওয়েলকাম। খুব ভালো লাগছে আপনাকে দেখে।'

হেসে বললাম, 'আপনাকে কিন্তু এখনই গান লিখতে হবে।'

চার্লি স্ত্রীর দিকে তাকালেন, 'আই উইল লাভ টু ডু দ্যাট।'

আমাকে ওরা বসার ঘরে নিয়ে গেল। যে-কোনও মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের বসবার ঘরের

সঙ্গে কোনও ফারাক নেই। উপরন্তু একটা পিয়ানো, কিছু বাদ্যযন্ত্র ঘর জুড়ে রয়েছে। আমাকে সোফায় বসিয়ে জুলি জিগ্যেস করল, 'কী খাবে বলো?'

'ঠান্ডা কফি।'

'গুড। লাঞ্চ করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি আসছি।' জুলি দ্রুতপায়ে ভেতরে চলে গেল। আমি তখন অন্য জিনিস ভাবছি। জুলি আমার সঙ্গে যেরকম আচরণ করছে তা চার্লির মন্দ লাগছে না কেন? আমাদের দেশে কোনও মহিলার যদি আমার লেখা পড়ে ভালো লাগে এবং তিনি যদি স্বামীর সামনে এমন ব্যবহার করেন তাহলে সম্পর্ক কি টিকবে? মনে হয় না!

চার্লি বসেছেন উলটো দিকে। বললেন, জুলি তোমার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছে যে কী বলব। আগামীকাল তোমার অনারে ও এখানে একটা গানের অনুষ্ঠান করছে।'

'চার্চে?'

'হ্যাঁ। এখানে চার্চের হল অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া পাওয়া যায়।'

'আপনি গানবাজনা করেন?'

'না-না। একটু আধটু লিখি। আমেরিকা কেমন লাগছে?'

'ভালো।'

'আপনাদের দেশ সম্পর্কে আমার তেমন কোনও ধারণা নেই। এককালে তো সবাই ইন্ডিয়ান আর রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে গুলিয়ে ফেলত। অবশ্য মিসেস গান্ধিকে আমরা জানি।'

জুলি এল ট্রে নিয়ে। তাতে তিনটি কফির কাপ। আমার হাতে একটা ধরিয়ে দিয়ে সে স্বামীকে দিল। নিজেরটা নিয়ে বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই খুব নামি লোক, নইলে সরকার এত খোয়াতে পারে না। তার ওপর বিনি পয়সার ড্রাইভার।'

'কেন্ট কিন্তু আমার ড্রাইভার নয়।'

'ওই হল। আমি তোমাকে বলতে পারি ওর কোনও বন্ধু এখানে নেই। স্রেফ আমার বাড়িতে আসবে না বলেই মিথ্যে কথা বলে গেল।' জুলি বলল।

চার্লি তাকে ধমকালেন, 'ডার্লিং, না জেনে কিছু বলা ঠিক নয়।'

জুলি এমন একটা মুখের ভঙ্গি করল, যার মানে, ঠিক আছে। কথা বলল না।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে তো সাদা কালো একসঙ্গে চাকরি করে, অভিনয় করে, কালো গায়ক আর খেলোয়াড়দের তো প্রচণ্ড ডিম্যান্ড। তাহলে?'

জুলি জবাব দিল, 'অফিসের জীবন অফিসেই শেষ হয়। গায়ক খেলোয়াড়দের নিয়ে মাতামাতি করে টিন এজার্সরা। এরা বড় হলে হাওয়া পালটাবে নিশ্চয়ই। খেলোয়াড়দের কথা বলছ, একটা কালো টেনিস খেলোয়াড় খুঁজে পাবে যে কোনর্স, বর্গের মতো বিখ্যাত। পাবে না। কারণ টেনিস বড়লোকদের খেলা। সাদাদের একচেটিয়া।'

'কালো বড়লোক নেই?'

'আছে। তারা হালে পানি পাচ্ছে সম্প্রতি।'

'কিন্তু সাদা মেয়েরা কালোদের তো পছন্দ করে। পথেঘাটে দেখেছি।'

'দে আর স্টেয়িং টুগেদার ফর সেক্স। হৃদয়ের জন্যে নয়।'

এইসময় চার্লি বাধা দিলেন, 'ইউ ডোন্ট নো ডার্লিং।'

'ঠিক আছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট একজন কালো লোক এমন ঘটনা ঘটলে আমায় বলবে। ছেড়ে দাও এসব কথা। তোমার বই কি ইংরেজিতে লেখা?'

'না। আমার মাতৃভাষায়। বাংলা।'

ট্রান্সলেটেড হয়নি?'

'হয়েছে।'

'আমাকে একটা দিও। আই ওয়ান্ট টু রিড ইউ।'

আমেরিকান ইংরেজি খুব গোলমেলে। জুলি যদি বলতে চায় তোমাকে পড়তে চাই তার জন্যেও তো ওই একই বাক্য ব্যবহার করতে পারে। কামালের প্রসঙ্গ উঠল। জুলি বলল, 'ও একটা অদ্ভুত লোক। বস্টনে আমার সঙ্গে আলাপ। বউ ডিভোর্স করার পর খুব মন খারাপ করে থাকত। কিন্তু কারও কিছু হলে আগ বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত। আমাকে বাংলা শেখাতে চাইত। বলত, জুলি তুমি আমার খুব ভালো বন্ধু। ও আমার সামনে সহজে এমন সব সত্যি কথা বলত যা শুনে আমার কান গরম হয়ে যেত কিন্তু ওর অকপটতায় মুগ্ধ হতাম। তারপর একদিন ওকে বিয়ে করতে চাইলাম। তখন তো আমার সঙ্গে চার্লির আলাপ হয়নি। কামাল ক্ষেপে গেল খুব। তুমি আমার বন্ধু। বন্ধুকে আমি বউ করি না। তা ছাড়া আমি আর বিয়েই করব না। পরে কত চেষ্টা করেছি ওর বিয়ে দেওয়ার। একটা সুন্দরী মেয়ে অভিযোগ করেছিল সারারাত একসঙ্গে থেকেও কামাল তাকে স্পর্শ করেনি। এমন লোককে বিয়ে করার জন্যে মেয়ে পাওয়া যাবে?'

জুলির কথাগুলো শুনতে-শুনতে আমি চার্লির দিকে তাকাচ্ছিলাম। স্ত্রীর প্রাক্‌বিবাহিত জীবনের গল্প শুনে প্রশ্রয়ের হাসি হাসছেন। বললাম, 'জুলি গান শুনব।'

আঙুল তুলল জুলি, 'কাল বিকেল ঠিক ছ'টায়। চার্চের ঠিকানা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, তোমার জন্য গাইব আমি।'

চার্লি বলল, 'দাঁড়াও, একটা গান মাথায় এসেছে। লিখে ফেলি।' চার্লি উঠে গেলেন ভেতরে। জিগ্যেস করলাম, 'তোমার স্বামী কেমন মানুষ?'

'ঠিক আমার বাবার মতন। আসলে জানো, কামাল ঠিক বলেছে। বন্ধুকে বিয়ে করা যায় না। স্বামীর মধ্যে বাবার গুণ থাকা দরকার। শুধু প্রেম নয়, অনেকটা স্নেহ যদি না থাকে, তাহলে মেয়েদের খুব ফাঁকা লাগে। তুমি প্রেম করেছ কখনও?'

'কী মনে হয়?'

'করেছ। তোমার প্রেমিকাকে কীরকম দেখতে?'

'কালো।'

'ধ্যুৎ ঠিকঠাক বলছ না। জানো তোমাকে দেখামাত্র আমার মনে হল তুমি খুব কাছের লোক। তোমার গায়ের রং যদি আরও একটু ময়লা হত, নাকটা যদি আরও একটু বসা হত তাহলে তোমাকে আমার দাদা বলে চালানো যেত।'

'এখন?'

'ওয়েল, আমি জানি না, তুমি আমার দাদা হতে চাইবে কি না?'

'নিশ্চয়ই। দাদারাও তো স্নেহ করে।'

খিলখিল করে হেসে উঠল জুলি, 'তুমি খুব দুষ্টু। তবে দাদা কখনও বাবা হয় না।' হাসি থামিয়ে জিগ্যেস করল, 'এখন কোথায় যাবে?'

'ডিজনিল্যান্ড।'

'ও কী মজা! অনেকদিন যাইনি। আমাদের নিয়ে যাবে?'

আমাদের শব্দটি বড় মধুর শোনাল। বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু তোমার এসকর্ট যদি রাজি না হয়?'

'এ ব্যাপারে কিছু বলার এক্তিয়ার নেই ওর।'

এইসময় চার্লি ফিরে এলেন। তাঁর হাতে একটা কাগজ। স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দিলেন সেটা। খুব আগ্রহ নিয়ে কাগজটায় দৃষ্টি বোলাল জুলি। তারপর বলল, 'চমৎকার। ও চার্লি।'

উঠে দাঁড়িয়ে স্বামীকে একটা চুমু খেল সে, 'তুমি প্রতিভাবান।'

লজ্জা পেলেন চার্লি। সেটা ঢাকতে যেন বললেন, 'ওঁকে দেখাও।'

জুলি বলল, 'আমি পড়ে শোনাচ্ছি। না, শোনাব না। কাল এই গানটাই প্রথমে গাইব আমি। চার্লি, তৈরি হয়ে নাও। মজুমদার আমাদের নিয়ে ডিজনিল্যান্ড বেড়াতে যাবে। কুইক্।

চার্লি হতভম্ব, 'সত্যি? কিন্তু আমাকে তো পাঁচটায় চার্চে যেতে হবে।'

কিন্তু নারীর আবদারের কাছে পুরুষের ওজর আপত্তি কতক্ষণ টিকতে পারে।

জুলিকে লক্ষ করছিলাম। ওর হাবভাবে কোনও মার্কিনি ব্যাপার নেই। প্রিয় আত্মীয় বাড়িতে এলে আমাদের মেয়েরাও এইরকম আচরণ করে। দারুণ সেজে এল সে। চার্লি সাধারণ পোশাক পরলেন। জুলি আমার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন দেখাচ্ছে আমাকে?'

'ভালো।'

'তোমাদের দেশে গেলে সেখানকার মেয়েরা ভালো বলবে?'

'পৃথিবীর কোনও দেশের মেয়েরাই মেয়েদের সাজগোজকে মনে-মনে প্রশংসা করে না।'

চার্লি হেসে উঠলেন হো হো করে, 'ওয়েল সেইড।'

ঠোঁট মুচকে জুলি বলল, 'তোমাকে দেখে তো নারীবিরোধী মনে হয় না।'

'মোটেই নয়। একটি মেয়ে যদি আরেকটি মেয়েকে মেনে নেয় তাহলে সে মনে-মনে হেরে যাবে। আর আমিও চাই সব মেয়ে জিতে যাক।' এইসময় কেন্ট ফিরে এল। হর্ন এখানে বাজানো হয় না। দরজায় তালা দিয়ে আমরা নীচে নেমে এলাম। কেন্ট নির্লিপ্ত। আড়চোখে আমাদের দেখল। দরজা খুলে দিয়ে ওর পাশে উঠে বসলাম। জুলির পেছনে বসে বললাম, 'কেন্ট এরা হল জুলি আর চার্লি। কেন্টের কথা তোমাদের বলেছি।'

ওরা তিনজন পরস্পরকে 'হেলো-হেলো' বলে আলাপ সারল। তারপর কেন্ট জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা এখন কোথায় যাব?'

'ডিজনিল্যান্ডে।'

কেন্ট একবার পাঁচ আঙুলে স্টিয়ারিং ঘোরাল। তারপর গাড়ি পিছিয়ে নিয়ে স্পিড বাড়াল। চার্লি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এর আগে আমেরিকায় এসেছেন?'

মাথা নাড়লাম, না। চার্লি প্রশ্ন করলেন, 'আপনাদের দেশের লোক আমাদের কী ভাবে?'

'আপনারা খুব বড়লোক, আপনারা বুর্জোয়া, আপনাদের সরকার সাম্রাজ্যবাদী, কিন্তু এই দেশে এলে খুব আরাম পাওয়া যায়।'

'সরকারের ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে চাই না কিন্তু আমরা অনেকেই মোটেই বড়লোক নই, বুর্জোয়া তো নই-ই, আর টাকা না থাকলে এখানে মোটেই আরাম পাওয়া যায় না। একজন বলেছিল স্বর্গে স্বর্গসুখ পাওয়া যায়। তা একজন ভিখারি স্বর্গে গিয়ে ভাবল সে খুব সুখ করবে। কিন্তু সারাদিন ঘোরাঘুরির পর সে এক দেবতাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা নন্দনকাননে আমাকে ঢুকতে নিষেধ করল কেন?' দেবতা বললেন, 'ওখানে আমাকেও ঢুকতে দেওয়া হয় না।'

'সে কী? আপনিও তো দেবতা।'

'হ্যাঁ, কিন্তু নীচুতলার দেবতা। নন্দনকাননে উঁচুশ্রেণির দেবতারাই ঢুকতে পায়।'

'কেন? আমি যে ফুল দেখতে চাই।'

'এত লোক প্রতিদিন স্বর্গে আসছে। সবাইকে ঢুকতে দিলে নন্দনকাননে একটা ফুলও কি থাকবে? ফুল দেখতে হলে বাবা পৃথিবীতে চলে যাও।'

আমরা হাসলাম। জুলি বলল, 'তুমি কিন্তু দেশে ফিরে গিয়ে সত্যিকথাটা বলবে।'

মাথা নাড়লাম। কিন্তু মিথ্যাচারণ করলাম কে আর নিজের কবর খোঁড়ে? আমেরিকার লোকেদের বেশি প্রশংসা করলে লোকে বলবে, 'ছিল প্রতিষ্ঠানের লেখক, এখন আমেরিকার দালাল।

বিবেকানন্দ যদি এখন আমেরিকার নারীদের প্রশংসা করতেন তবে তাঁকেও সিআইএ-চর বলা হত বলে আমাদের বিশ্বাস। কেন্ট কোনও কথা বলছিল না। শেষপর্যন্ত আমরা পৌঁছে গেলাম ডিজনিল্যান্ড। আমার পাঠকবৃন্দ নিশ্চয়ই এই রূপকথার রাজ্যটির বিবরণ অনেক পড়েছেন। সেই বিশদে আমি যেতে চাই না। ডিজনিল্যান্ডে প্রবেশাধিকার সরকারি দপ্তর দিয়েছিল। কিন্তু চার্লি আর জুলির টিকিটটা আমি কাটলাম। পিলপিল করে লোকজন ভেতরে ঢুকছে। আমাদের ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের মতো একটা জায়গা জুড়ে ডিজনি সাহেব ওই কল্পলোক তৈরি করেছেন। মজার-মজার যত ইলেকট্রনিক খেলার ঘর চারপাশে ছড়ানো। জুলি খুব খুশি হয়ে চার্লির সঙ্গে গল্প করছিল। ডিজনিল্যান্ডের খেলাঘরগুলোর প্রত্যেকটা দেখতে গেলে অন্তত দুটো দিন সময় লাগবে। মিনি মেলা বসে গেছে প্যাসেজে-প্যাসেজে। ডিজনি সাহেবের তৈরি কার্টুনচিত্রগুলো চারপাশে হেঁটে বেড়িয়ে বাচ্চাদের মজা দিচ্ছে। আমি দুটো খেলাঘরে ঢুকেছিলাম। একটিতে ট্রলিতে বসতে হয়। সামনে পেছনে চারজন। ট্রলি ধীরগতি নিয়ে অন্ধকারে ঢুকে যায়। তারপর সামনে যেন মহাকাশ চলে আসে। নক্ষত্ররা জ্বলজ্বল করে আর ট্রলির স্পিড বাড়ে। সেটা বাড়তে-বাড়তে প্রায় ঘণ্টায় তিনশো কিলোমিটার পৌঁছে যায়। এবং একসময় ট্রলি লাইন ছেড়ে শূন্যে ছিটকে উঠে আবার আর একটা লাইনে ঝাঁপিয়ে ঠিকঠাক পড়ে ছুটতে থাকে। এইসময় যাত্রীরা প্রতিবাদ করে থাকেই। যখন ট্রলিটা আবার আলোয় ফিরে এসে থেমে যায় তখন মনে হয় হৃৎপিণ্ড আর বুকে নেই। তার আওয়াজ নিজের কানেই যেন শোনা যায়। বেরিয়ে এসে মনে হয়, আর নয়, এ জীবনে আর ওখানে ঢোকা নয়। দরজায় লেখা রয়েছে, দুর্বল হৃদয় মানুষের জন্যে নয়। কিন্তু দেখলাম কিশোর মার্কিনরা একবার ঘুরে এসে আবার টিকিট কাটছে ভেতরে যাওয়ার জন্যে।

দ্বিতীয়টি মজার। আমরা একটা নৌকোয় উঠে বসলাম যেটি যন্ত্রচালিত। নৌকা আমাদের অন্ধকারে নিয়ে এল। চারপাশে ঢেউ-এর শব্দ। নৌকা থেকে আলো পড়তেই বালির চর দেখতে পেলাম। ঢেউ সেই সৈকতে নামছে উঠছে। কোথাও অন্য শব্দ নেই। সেই বালিতে একটি করোটি পড়ে রয়েছে। আর আমরা কাছাকাছি যাওয়া মাত্র সেই করোটির চোখের গর্ত থেকে একটা কাঁকড়া বেরিয়ে এল। সেটা নেমে গেল সুড়সুড় করে জলে। পরের অংশেই একটি মাড়কসার জালে ঘেরা ঘর যার ভেতরে প্রচুর অলংকার পড়ে রয়েছে। যেন বহুকাল সেখানে হাত পড়েনি। জুলি চিৎকার করে উঠল ভয়ে। দুটো সাপ ধীরে-ধীরে বেরিয়ে আসছে অলংকারগুলোর স্তূপ থেকে। কিন্তু তাদের পেরিয়ে গেল নৌকা। মাথার ওপর দুজন নাবিক একটা কাঠের ওপর পা ঝুলিয়ে মদ খাচ্ছে। নাবিক না বলে জলদস্যু বলা যেতে পারে। হঠাৎ একটা গুলি এসে তাদের একজনের বোতল ভেঙে চুরমার করে দিতেই আলো অদৃশ্য হল। এবং আমরা দূরে একটি জলদস্যুদের জাহাজ দেখতে পেলাম। ডানদিকে কোনও দুর্গ। জলদস্যুরা দুর্গাধিপতিকে শাসাচ্ছে আত্মসমর্পণের জন্যে। এবং শেষ পর্যন্ত গোলা বর্ষণ শুরু হল। জাহাজ থেকে গোলা ছুটে যাচ্ছে আর আমরা মাঝখানে নৌকার ওপরে। আগুন ও শব্দে প্রাণ আঁতকে উঠছে। নৌকো সরিয়ে আনল আমাদের বোটম্যান। জাহাজ ভিড়ল দুর্গে। জলসদ্যুরা জাহাজ দখল করেছে। নারীদের ওপর অত্যাচার করছে। তাদের আর্ত চিৎকার আর দস্যুদের অট্টহাস্যে কানে তালা লাগল। বোটম্যান দ্রুত নৌকা বের করে আনল আলোয়। এসবই মায়া। সবই পুতুল, তবে ইলেকট্রনিকের কেরামতি। কিন্তু চাক্ষুস করার সময় মোটেই সেই বোধ মনে জাগে না। কেন্টকে লক্ষ করছিলাম। সে যে জুলিদের সঙ্গে একদম কথা বলছে না তা নয়। কিন্তু দূরত্ব রেখে। যা না বললে নয়। আমি একটু পিছিয়ে পড়েছি এবার। দেখলাম মিকি মাউস একটা নির্জন জায়গা দেখে জিরিয়ে নিচ্ছে। ওর পাশে গিয়ে বসতেই বলল, 'হেলো।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি এখানকার স্টাফ?'

'নিশ্চয়ই।'

'কতক্ষণ তোমাকে এই ধড়াচূড়ো পরে থাকতে হয়?'

'আটঘণ্টা।'

'তোমার ভালো লাগে?'

'খুব। বাচ্চারা এতো আনন্দ পায় যে কী বলব? এখন মাঝে-মাঝে নিজেকেই মিকি মনে হয়। কার্টুনটা আমি এতবার দেখেছি যে তাকে নকল করে ওপেন এয়ারে অভিনয় করতে অসুবিধে হয় না। কোন দেশ থেকে এসেছ?'

'ভারতবর্ষ।'

'ইন্দিরা গান্ধি?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাদের দেশের বাচ্চারা এখানে বেশি আসে না কেন বলো তো?'

উত্তর দিতে পারিনি। যে দেশের বাচ্চাদের মুখের খাবার আর পড়াশোনার ব্যবস্থা করতে বাবা-মায়েরা হিমশিম খেয়ে যায় সে দেশের বাচ্চাদের জন্যে আমেরিকান ডিজনিল্যান্ড নয়। অথচ সত্যি আমাদের দেশের বাচ্চারা কতভাবে না বঞ্চিত হচ্ছে। ডিজনিল্যান্ডটাকে যদি তুলে এনে এদেশের শহরে-শহরে ঘোরানো যেত তাহলে ওদের খুশি আকাশ স্পর্শ করত। দেখতে-দেখতে কেমন একটা অপরাধবোধে আক্রান্ত হলাম।

জুলিদের ওদের বাড়িতেই নামিয়ে দিলাম। ওরা সেই চার্চের ঠিকানা লিখে কেন্টকে বুঝিয়ে দিল কীভাবে পৌঁছোতে হবে। ধরাবাঁধা সময়ের জন্যে হল ভাড়া করেছে ওরা। আমি কথা দিলাম অবশ্যই যাব। জুলি জিজ্ঞাসা করল আমাকে নিয়ে আসতে হবে কি না? ওকে আশ্বস্ত করলাম। ফেরার পথে টের পেলাম খিদে পেয়েছে। কেন্টকে সেকথা বলতে সে আমাকে নিয়ে এল একটা নিরিবিলি রাস্তায়। ম্যাকডোনাল্ড নয়, বড় পাব বলা যেতে পারে। বেশ চওড়া হলঘর। আমরা টেবিলে না বসে কাউন্টারেই বসলাম লম্বা টুল টেনে। আসলে মদই বিক্রি হয়, খাবার চাইলে তাও। দুজনের খাবার পছন্দ করে হুকুম দিয়ে বিয়ার নিলাম। গাড়ি চালালে ড্রিংকস নিতে নেই এদেশের আইন অনুযায়ী বলে মনোজ আমায় জানিয়েছিল। কিন্তু কেন্ট বিয়ার খাচ্ছে। জানি না, সাহেবরা বিয়ারকে অ্যালকোহলের সম্মান দেয় না হয়তো।

কেন্ট জিজ্ঞাসা করল, 'জুলিকে তুমি আগে চিনতে?'

'না।'

'স্ট্রেঞ্জ।'

আমি ওকে প্রশ্ন করতে পারতাম কিন্তু ইচ্ছে করেই চুপ করে গেলাম।

ছেলেটা আমার সঙ্গে কখনই খারাপ ব্যবহার করেনি। ওর ব্যক্তিগত অপছন্দ নিয়ে প্রশ্ন তুলব কেন? এইসময় আমাদের পাশের টুলগুলোতে ঝড় উঠল। দুটি মেয়ে পাশাপাশি বসে রয়েছে। দুজনে সাদা চামড়ার। একজন মোটাসোটা, স্বাস্থ্যবতী, দ্বিতীয়া একটু ক্ষীণা। দ্বিতীয়া প্রথমাকে কিছু বোঝাচ্ছে, আর সে কাঁদছে। কেন্টকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কী?'

কেন্ট বলল 'দাঁড়াও, দেখছি।'

সে ঝুঁকে পড়ে কিছু বলল, যা আমি শুনতে পেলাম না। স্বাস্থ্যবতী চোখ মুছল। তারপর বেমালুম কেন্টের সঙ্গে গল্প করতে লাগল। আমি উঠে টয়লেটে গেলাম। এবং আবিষ্কার করলাম আমেরিকায় পাবের টয়লেটেও অশ্লীল শব্দ লেখার লোকের অভাব নেই।

ফিরে এসে দেখলাম খাবার এসেছে এবং কেন্ট প্রথমার সঙ্গে শেয়ার করছে সেটা। দ্বিতীয়া চুপচাপ বসে। আমাকে দেখে তিনি হাসলেন। অর্থাৎ, আমি কি ধরে নিতে পারি তিনি আমারটা শেয়ার করতে ইচ্ছুক? প্রায় বাধ্য হয়েই তাঁকে অফার করলাম। তিনি মাথা নাড়লেন, তাঁর খিদে নেই। কিন্তু তিনি আমার পাশে এসে বসলেন। আমি নীরবে খিদে মেটাচ্ছি আর দ্বিতীয়ার কথা শুনছি।

'তুমি কি বাংলাদেশি?'

'না।'

'পাকিস্তানি?'

'না। ভারতীয়।'

'ও। খুব খিদে পেয়েছে তোমার মনে হচ্ছে। আমি এখন খাই না।'

'তোমার বন্ধুর কী হয়েছে?'

'আর বলো না। ও হল যুগোশ্লেভিয়ান। একজন আমেরিকানের সঙ্গে ছিল। এক জায়গায় কাজ করি আমরা। আমেরিকান ছেলেটি ওকে বিয়ে করতে চাইছে না। কিন্তু কালরাত্রের মধ্যে যদি ও কোনও আমেরিকানকে বিয়ে করতে না পারে তবে চাকরি যাবে কারণ ওকে দেশে ফিরে যেতে হবে।'

'সে কী? এই অল্প সময়ের মধ্যে ও পাত্র পাবে?'

'চেষ্টা করছে। শি ওয়ান্টস টু স্টে হিয়ার। তোমার বন্ধুকে রিকোয়েস্ট করছে পেপার ম্যারেজের জন্যে। বেচারা।'

'সে কী? কেন্ট তো বিবাহিত। বলেনি?'

'বলেছে। কিন্তু ডরোথি বিশ্বাস করছে না।'

এইসময় কেন্ট খাওয়া শেষ করে বলল, 'আমার দুটো বাচ্চা আছে, বুঝলে?'

॥ ১৮ ॥

মেয়েটির জন্যে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। একেই বোধহয় 'বেচারা' বলা চলে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ওকে একটি স্বামীর ব্যবস্থা করতে হবে। এতদিন যার সঙ্গে স্টে-টুগেদার করত সে দায়িত্ব নেবে না এবং চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলে মার্কিন সরকার ওকে ঘাড় ধরে বের করে দেবে। শিকাগো রাজ্যের নিয়ম বোধহয় লস এঞ্জেলসে চলে না। এই মুহূর্তে চাকরি খুইয়ে মেয়েটি স্বদেশে ফিরতেও চায় না। সেখানে নাকি ওর জন্যে কেউ প্রতীক্ষায় নেই। কেন্ট বিবাহিত এবং বাচ্চা আছে জানার পর সে খুব গম্ভীর হয়ে গেল। কেন্টের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিল। ওর বান্ধবী ওকে বলল, 'এতো আপসেট হয়ো না। জিম তোমাকে একবার অ্যাপ্রোচ করেছিল না?'

মেয়েটি মাথা নাড়ল, 'তখন তো আমি জনের সঙ্গে স্টেডি ছিলাম। তাই জিমকে পাত্তাই দিইনি। এখন গায়ে পড়ে ভাব করতে গেলে সন্দেহ করবে। আচ্ছা, একটা কথা আমি অনেকক্ষণ থেকে ভাবছি। কালকের সকালের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে কেমন হয় যে দুপুরের মধ্যে বিয়ে করতে চাই কোনও আমেরিকানকে? বয়স কোনও সমস্যা নয়। শুধু একটু ভদ্র হতে হবে।'

বান্ধবী লাফিয়ে উঠল, 'দারুণ আইডিয়া। লেটস গো। যেন পরশপাথর পেয়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে ওরা দুজন পাব থেকে বেরিয়ে গেল।

রাত্রে বাড়িতে ফিরে এসে বনজ-অঞ্জনাকে গল্পটা বললাম। দেখলাম ওরা মোটেই অবাক হল না। বনজ বলল, 'মেয়েটা সত্যি বোকা। নইলে এমন সমস্যায় পড়তে পারে জেনেও চাপ দিয়ে আমেরিকান বন্ধুটিকে আগেভাগে বিয়ে করে ফেলেনি। কিন্তু বিয়ে ব্যাপারটা কোন পর্যায়ে চলে গেছে এমন ভাবলে বড্ড ভুল হবে। মেয়েটির অস্তিত্বের প্রবল প্রয়োজনেই সে এখন উন্মাদিনীর মতো আচরণ করছে। কিন্তু কেন্ট আমায় বলেছিল বিয়ের ব্যাপারে আজকের মার্কিন মেয়েরা অনেক বেশি সজাগ, পছন্দসই না হলে মোটেই নয়। এখন ওরা বিয়ে করতে চায় এমন ছেলেকে যে

কখনও আলাদা হওয়ার কথা ভাববে না। নিজের বউ-এর কথা বলেছিল কেন্ট। ওদেশে তো মেয়ে বড় হলে বাপ মা পাত্র খুঁজতে যায় না। আঠারো পার হওয়ার আগেই ডেটিং হচ্ছে। আর এই ডেটিং চোখের দৃষ্টিবদল বা হাত ধরাধরিতে সীমাবদ্ধ থাকে না আজকাল। মেয়েটি দেখল ছেলেটি সুপুরুষ কিন্তু মদ খায় খুব। বাতিল করল। সুপুরুষ নয় কিন্তু বড় আড্ডাবাজ, পছন্দ হল না। সুপুরুষ, আড্ডাবাজ নয়, মদ খায় না কিন্তু দারুণ অলস, তাও চলবে না। এখন সুপাত্র মানে, তোমার চেহারা মানানসই হলে ভালো, ভদ্র, মোটামুটি মাইনে, বেড়াতে ভালোবাসে খুব, মদ খাও কিন্তু নেশা হওয়ার আগেই থামতে জানো। নিজের মত অন্যের ওপর চাপিয়ে দাও না, শেয়ার করতে জানো অর্থাৎ স্বার্থপর নও। তা এরকম পাত্র না পাওয়া গেলে মোটেই বিয়ে নয়। স্টে-টুগেদার করো। দু-একটা বাচ্চা হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই। তোমার সঙ্গে যখন বনবে না তখন আলাদা হয়ে যাব। বিয়ে করে সেটা ভাঙা চলবে না। মনোজ গল্প বলেছিল, একটি শান্তশিষ্ট আমেরিকান মেয়ের কোনও বয়ফ্রেন্ড ছিল না, সে ছেলেদের সঙ্গে মিশত না, একুশ বছরের পর প্রেমে পড়ল। ছেলেটি তাকে বিয়ে করবেই। বিয়ের আগে ছেলেটি ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে আবিষ্কার করল মেয়েটি কুমারী। সঙ্গে-সঙ্গে সে সাত হাত দূরে ছিটকে গেল। যে মেয়ে একুশ বছরে কুমারী থাকে সে নিশ্চয়ই বরফের চাঁই। একে বিয়ে করে জীবনটা বরবাদ করা যায়? কোনও ছেলে যার কাছে ঘেঁষেনি তার নিশ্চয়ই খারাপ ইতিহাস আছে।

ধান ভানতে হয়তো শিবের গীত গাওয়া হল। কিন্তু এই অবস্থাতেও পাব-এ দেখা মেয়েটি যেন আমাদের রূপকথার গল্পের রাজকুমারীর মতো সকালে ঘুম ভাঙলে যাকে দেখবে তার গলাতেই মালা দেবে অবস্থায় পৌঁছে গেছে শুধুই একটা পুরুষকে বিশ্বাস করার ফলে।

সকালে জুলি টেলিফোন করল। মনে করিয়ে দিল আজ সন্ধ্যার অনুষ্ঠানের কথা। বলল, 'আজ অনুষ্ঠানের পর আমার মায়ের বাড়িতে তোমাকে ডিনার খেতে হবে।'

বললাম, 'এখনই কথা দিতে পারছি না। আমার জন্যে সরকারি দপ্তর কী প্রোগ্রাম করে রেখেছে জানি না। যাই থাকুক, সন্ধে ছ'টায় তোমার গান শুনতে হাজির হবই।'

কেন্ট এল ঠিক সাড়ে ন'টায়। ওর সঙ্গে সরকারি অফিসে এসে জানতে পারলাম কোনও চিত্রাভিনেতার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা যায়নি। একমাত্র সিডনি পয়েটার জানিয়েছেন সন্ধে সাতটা নাগাদ তিনি দেখা করতে পারেন। ওই সময় একটা টেলিফোন করে নিতে। অফিস থেকেই সিডনির টেলিফোন নম্বর জেনে নিলাম। সিডনি পয়েটার সম্ভবত একমাত্র কালো অভিনেতা যিনি এক সময় হলিউডের ছবিতে দাপটে অভিনয় করেছেন এবং পুরস্কৃত হয়েছেন। ছাত্রাবস্থায় মেট্রো সিনেমায় ওঁর ছবি দেখতে আমরা লাইন দিতাম।

আজ দুপুরে হলিউড পার্কিং লটে গাড়ি রেখে ফুটপাত ধরে হাঁটতে-হাঁটতে চমক খেলাম ফুটপাতে এক-একটা পাথরের ওপর এক-একজনের নাম খোদাই করা রয়েছে। বব হোপ, ক্যাথরিন হেপবার্ন, গ্রেটা গার্বো, গ্রেগরি পেক, আভা গার্ডনার, চার্লি চ্যাপলিন, অ্যালফ্রেড হিচকক থেকে আরম্ভ করে কার নাম নেই। কেন্ট জানাল, এই ফুটপাতে নাম না উঠলে হলিউডের অভিনেতা অভিনেত্রী পরিচালকরা জাতে উঠবেন না। তাঁদের প্রতিভার স্বীকৃতি হিসেবেই নাকি এখানে নাম লেখা হয়। শিবরাম চক্রবর্তী একদা আমাকে বলেছিলেন, 'যেদিন দেখবে তোমার লেখা বড় কাগজে ছাপা হচ্ছে সেদিনও তুমি লেখক হওনি। ছাপা হওয়ার পর যখন তোমার বই প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিং-এ সেকেন্ড হ্যান্ড বিক্রির জন্যে ঝুলবে তখনই তুমি ষোল আনা লেখক।' কী জানি, এও হয়তো তেমনি।

একটু আগে বাঁ-দিকে একটি স্ট্যাচুকে দেখেছিলাম একটা দোকানের সামনে। স্ট্যাচুর পরনে কোট প্যান্ট, বাড়ানো হাতে টুপি ধরা। হঠাৎ দেখলাম ওই একই স্ট্যাচু ফুটপাতে দাঁড়িয়ে। কেন্টকে জিজ্ঞাসা করলাম ওটা কোনও বিখ্যাত লোকের স্ট্যাচু কি না কারণ একাধিক দেখা যাচ্ছে। কেন্ট

হেসে বলল, 'সামনে গিয়ে দ্যাখো তো চিনতে পারো কি না।' স্ট্যাচুর সামনে দাঁড়িয়েই অস্বস্তি হল। একটা চোখ বন্ধ করেই খুলল স্ট্যাচু। হাসি পেল। লোকটা শুধু গায়ের রংই স্ট্যাচুকালার করেনি, ওই একই ভঙ্গিতে অনড় দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকে ওর টুপিতে পয়সা ফেলে যাচ্ছে। ভিক্ষে চাইবার আগে সে নিজের যোগ্যতা দেখাচ্ছে মূকাভিনয় করে। চমৎকার।

হলিউডে ঢোকার আগে আমরা লাঞ্চ সেরে নিলাম। এদিকটা একদম ফাঁকা। দুপাশে সাজানো গাছের সারি। চওড়া সিঁড়ি নেমে এসেছে বিশাল বাড়িগুলো থেকে। হঠাৎ লক্ষ করলাম দুটি পাঙ্ক এক বাড়ির সিঁড়িতে বসে সিগারেট টানছে। নিউইয়র্কে দেখা পাঙ্ক মেয়েদের সঙ্গে এদের সাজগোজে কোনও ফারাক নেই। সেই বিকট করে চুল ছাঁটা, চুলে কিম্ভূতকিমাকার রঙের প্রলেপ, চামড়ার স্কার্ট। চোখেমুখে উদাস দৃষ্টি। কোনও পাঙ্ক ছেলে কাছেপিঠে নেই। একটু সাহস হল। কেন্টকে বললাম, 'ওদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

কেন্ট মাথা নাড়ল, 'অসম্ভব। ও চেষ্টা করো না।'

বললাম, 'কিন্তু করতে যে ইচ্ছে করছে আমার।'

'পাগল! ওরা মানুষের মতো ব্যবহার করতে জানে না।'

'আরে হাজার হোক ওরা মেয়ে! তুমি বোধহয় একটু বেশি ভয় করছ।'

কেন্ট বলল, 'ওরা কথাই বলবে না।'

'গিয়ে দ্যাখো না। বলো, আমরা কথা বলতে চাই ভদ্রভাবে।'

আমার কথা শুনে কেন্ট খুব অসহায়ের মতো তাকাল। যেন তাকে আমি এরোপ্লেন থেকে লাফাতে বলছি। তারপর গুটিগুটি এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। মেয়ে দুটো ওকে আমলই দিচ্ছে না।'

কেন্ট বলল, 'হেলো!' দুটো মেয়ে নিরুত্তর রইল। সিগারেটটি খুব সাধারণ নয় মনে হল। কেন্ট আবার বলল, 'লুক, আমার বন্ধু ভারতবর্ষ থেকে এসেছে। তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান। উনি লেখেন। নভেলিস্ট।'

এইবার একটি মেয়ে মুখ ফেরাল, 'আমিও লিখি।'

সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে বেশ উৎসাহিত বোধ করলাম। মেয়েটি আঙুল তুলল। আঙুলটি মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঘুরে এল, 'আই রাইট মাই ওন নভেল।'

কেন্ট খুবই বিমর্ষ চোখে আমার দিকে তাকাল। ভাবখানা এমন, সাবধান করেছি তাও তুমি শোনোনি। সে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আসলে উনি তোমাদের কাছে কিছু শুনতে চান।'

'ওকে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে বলো।'

কেন্ট ফিরে এল হাসিমুখ নিয়ে। বলল, 'এরা মনে হচ্ছে বেশিদিন পাঙ্ক হয়নি। এখনও অসভ্য হয়নি তেমন। তুমি বেশি প্রশ্ন না করলেই ভালো হয়।'

ঠিক মিনিটতিনেক পরে সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ওরা উঠে দাঁড়াল। তরতর করে আমাদের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় গেল বলে, 'ফলো আস।'

এ আবার কী? কোথাও নিয়ে গিয়ে ঝামেলা করতে চায় নাকি? তবু একটু দূরত্ব রেখেই অনুসরণ করছিলাম। বাঁ-দিকে একটা সুদৃশ্য টয়লেট। মেয়ে দুটো সেখানে ঢোকার আগে চিৎকার করল, 'নাউ ইউ ক্যান হিয়ার, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু...।'

সমস্ত শরীরের রক্ত যেন মুখে চলে এল। আমি কি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারি? কেন্ট আমার হাত ধরল, দেখলে তো, আমি তোমাকে কতবার বলেছিলাম এরা মানুষ নয়, জানোয়ার। তাড়াতাড়ি চলো এখান থেকে, ওদের মুখ দেখাও অন্যায়।'

আমার কিন্তু অতটা রাগ হল না। অপমানিত বোধ করেছিলাম। মেজাজ খারাপও হয়েছিল। কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি অবাক হয়েছিলাম। ওই অল্প বয়সি মেয়ে দুটো কী স্মার্ট ভঙ্গিতে আমাদের সভ্য মানুষের সরল ইচ্ছেকে ব্যঙ্গ করে গেল। নিশ্চয়ই এটা অসভ্যতার চূড়ান্ত নিদর্শন। কোনও

নারী এই অশ্লীল ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলবে না। কিন্তু অবহেলা দেখাবার জন্যে তো একটা সাহসের প্রয়োজন হয়। সেটা এরা অর্জন করল কোত্থেকে? শুধুই প্রচলিত সংস্কার নিয়ম ভাঙার প্রবণতা? পাঙ্ক হয়ে সমাজকে ব্যঙ্গ করা? বিকল্প কিছু যারা দেখতে পারছে না তাদের এই উৎসাহ বেশিদিন থাকতে পারে না সত্যি। কিন্তু আমরা যে ওদের অপছন্দ করছি সেটা বুঝেই কি ওদের ঘৃণার ব্যাপারটা এমন সহজ ভঙ্গিতে ওরা প্রকাশ করতে পারে।

হলিউডে ঢুকলাম। এর আগে স্কিম স্যুটিং দেখেছি টালিগঞ্জে এবং বোম্বেতে। এ দুটোরই তুলনা হয় না। টালিগঞ্জে ঢুকলে মনে হয় এত পুরোনো যন্ত্রপাতি, এত বিশৃঙ্খল আবহাওয়া, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্টুডিওকে উন্নত করার বিন্দুমাত্র প্রয়াস যেখানে নেই, সেখানেই সত্যজিৎ রায় ছবি বানান কী করে, মৃণালবাবু, তপন সিংহ কী করে বছরের পর বছর ছবি করেন? টালিগঞ্জে চলচ্চিত্র কর্মচারীরা নির্ভর করেন প্রয়োজকদের ওপর। একটা সময় ছিল যখন ওখানে সারা মাসে দু-একটা ছবি হত, ক্যান্টিনেও খাবার থাকত না। অথচ পান থেকে চুন খসলেই প্রযোজকদের ওপর খাঁড়া নেমে আসে। আন্দোলনের হুমকি যারা দেন তারা শ্রমিক কর্মচারীদের কাজের সময় আন্তরিক হতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন না। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে তাই এখনও এখানে ছবি হচ্ছে। কিন্তু ধীরে-ধীরে অনেক প্রযোজক চলে যাচ্ছেন ভুবনেশ্বরে। বাংলা ছবির উৎপাদন কেন্দ্র যদি ভুবনেশ্বর হয় এরপর তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। যন্ত্রপাতি, স্টুডিওর আবহাওয়া আর কর্মচারীদের সহযোগিতার জন্যে ভুবনেশ্বর এখনই অনেককে টানছে। পরিচালক নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় একটা ছোট ঘটনা বলেছিলেন, টালিগঞ্জে কোনও প্রোডাকশন বয়ের কাছে জল চাইলে সে গ্লাসটা যেখানে চুমুক দেব সেখানেই নোংরা হাত রেখেছিল। নিজের কাজটা না শিখেই সে টালিগঞ্জে এসেছে। একজন সহকারী পরিচালককে কাজ দিতে বাধ্য করা হচ্ছিল আমাকে। আপত্তি ছিল না। কিন্তু জানলাম সে পৃথিবীর পাঁচটি সেরা ছবির নাম জানে না পাঁচজন পরিচালকের নাম বলতে পারছে না। এই ইনসিনসিয়ারদের নিয়েই এখানে কাজ করতে বাধ্য হতে হয়।

ধান ভাঙতে শিবের গীত হল বোধহয়। কিন্তু পরের কোনও ভালো জিনিস দেখলেই নিজের খারাপ ব্যাপারটা বড় বেশি করে বাজে। হলিউডে আট ঘণ্টার একটা শিফট মানে আট ঘণ্টারই। তার বেশি করালে পারিশ্রমিক বাড়ে। কিন্তু আটঘণ্টার কাজ তাঁরা করেন যন্ত্রের মতো। দু-ঘণ্টার কাজ আট ঘণ্টাতে নয়। প্রতিটি সেকেন্ডে প্রযোজকের যে খরচ হচ্ছে তার সঠিক মূল্য দিচ্ছেন তাঁরা শ্রমের মাধ্যমে। যন্ত্রপাতির কথা ছেড়ে দিলাম, পরিচালক এবং প্রোডাকশন বয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক ঈর্ষণীয়। ইউনিয়ন আছে, আন্দোলন আছে। কিন্তু ফাঁকিবাজ এবং অসৎ কোনও কর্মচারীর স্বপক্ষে ইউনিয়ন কোনও অন্দোলন করে না। ফলে প্রযোজক ইউনিয়নকে ভয় পান। ইউনিয়নও নিজের মর্যাদা বোঝে। ছবির সুট্যিং হচ্ছিল হলিউডের ভেতরেই তৈরি সিমেন্ট বাঁধানো চওড়া রাস্তায়। রাস্তার দুপাশে দোকানপাট যার পেছনের দেওয়াল নেই। ইচ্ছে করলে সাইনবোর্ড পালটে শহর পরিবর্তন করা যায়। দোকানগুলোর যে পেছনের দেওয়াল নেই, কোনওটার পাশেরও তা রাস্তা থেকে বোঝার উপায় নেই। গড়ন একটু পালটে নিয়ে মধ্যযুগে চলে যাওয়া যায়। পরিচিত কোনও অভিনেতা-অভিনেত্রীকে ফ্লোরে দেখলাম না। মাথার ওপরে খোলা আকাশ রেখে পরিচালক একটা ছোট স্কুটার রিক্সায় বসে তদারকি করছেন।

স্যুটিং বেশিক্ষণ দেখতে গেলেই বিরক্তি আসে। অতএব আমরা চললাম প্রাচীন হলিউড দেখতে। টিকিট কাটতে হল। আমরা একটা দেওয়াল খোলা বাসে বসলাম। ড্রাইভারের পাশেই গাইড রয়েছেন, তিনি বলে যাচ্ছেন কোন বিখ্যাত ছবির সুটিং কোথায় হয়েছিল। হঠাৎ তিনি তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন। 'সাবধান ঝড় উঠেছে, বৃষ্টি নামল বন্যাও হতে পারে।'

শোঁশোঁ শব্দে হাওয়া বইছে। দু-পাশের গাছপালা মাথা নোয়াচ্ছে আবার তুলছে। বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেল সেই সঙ্গে। আমাদের বাস সন্তর্পণে চলছিল। হঠাৎ গাইড চিৎকার করল, 'যে যার সিটের হাতল ধরে বসে থাকুন। বন্যা আসছে।'

দেখলাম বাঁ-দিকের উঁচু পাহাড়ের ঢাল বেয়ে প্রচণ্ড গতিতে জল নেমে আসছে। মুহূর্তেই সেটা রাস্তা ভাসিয়ে দিল। এমনকী আমাদের বাস টলিয়ে দিল। আর আঘাত করল সামনের একটা বিশাল গাছকে। গাছটা মড়মড় করে ভেঙে পড়ল জলে। আমাদের যখন হতবাক অবস্থা তখনই শোঁশোঁ করে জল সরে গেল রাস্তা থেকে। নেমে গেল ওপাশে। গাইড বলল, 'লাইন ক্লিয়ার। লেটস মুভ।'

বাস চলতে আরম্ভ করল। বিস্ময় আরও বাকি ছিল। পড়ে যাওয়া গাছটা আমরা ডিঙিয়ে যাওয়া মাত্র আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। পেছনে তাকিয়ে দেখলাম জলের চিহ্ন বিন্দুমাত্র নেই। অর্থাৎ কোনও পরিচালক যদি এইরকম একটা দৃশ্যের ছবি তুলতে চান, তার কাহিনিতে যদি এমন দৃশ্য থাকে তাহলে তাঁকে চুল ছিঁড়তে হবে না। স্রেফ এখানেই সেটা করে নিতে পারবেন। আর একটু এগোতে বাঁ-দিকে বিশাল পুকুর দেখতে পেলাম, আয়তনে প্রায় দীঘিকে ছুঁচ্ছে। তার এক ধারে এক ভদ্রলোক মাথায় টুপি পরে সরু নৌকায় বসে এক মনে ছিপ ফেলে ফাতনার দিকে তাকিয়ে আছেন। গাইড বলল, 'হি ইজ মিস্টার মে। খুব ভালো মাছ ধরেন।'

পরিচয় দিয়েই তিনি চিৎকার করলেন, 'হেই মিস্টার মে! উইশ ইউ গুড লাক।'

সে তাঁর নৌকায় বসেই আমাদের দিকে ফিরে হাত নাড়লেন। এইসময় বাসের একজন চিৎকার করে উঠল, 'শার্ক! শার্ক! সত্যি দেখলাম একটা শার্কের বিশাল ডানা জল কেটে এগিয়ে যাচ্ছে নৌকোর উদ্দেশ্যে। গাইড চিৎকার করে মে'কে সতর্ক করে দেওয়ার মুহূর্তে কাণ্ডটা ঘটে গেল। মে'র নৌকা শার্কের লেজের ধাক্কায় শূন্যে উঠে জলে পড়ে গেল। মুহূর্তেই জল লাল, আর টুপিটা ভাসছে। আমরা কেউ কথা বলতে পারছিলাম না। বাসের কোনও মহিলা কেঁদে ফেললেন। জলজ্যান্ত একটা মানুষ মরে গেল চোখের সামনে। এবং তখনই জল তোলপাড় করে প্রায় বাসের গায়ে একটা দানবাকৃতি শার্ক উঠে এল মুখ হাঁ করে। আর্ত চিৎকার উঠল প্রত্যেকের একই সঙ্গে। হাঙরের মুখের ভেতর, দাঁত পর্যন্ত দেখা গেল। মুখ বন্ধ করে সে নেমে গেল সেই জলে। আর গাইড বললেন, 'যাকে আপনারা এই মাত্র দেখলেন সে কী চমৎকার অভিনয় করেছে জ' সিরিজের এক নম্বর ছবিতে। এই ইলেকট্রনিক্সের তৈরি শার্কটাকে তৈরি করতে প্রচুর খরচ হয়েছিল।' বাস চলতে আরম্ভ করতেই দেখলাম মে জল থেকে উঠে এল নৌকায়। এমনকী তার মাথার টুপিটাও যথাস্থানে। সে মাছ ধরছে নিবিষ্ট মনে। মে তাহলে রোবট। এমনকী হাঙরটাও।

একটু বাদেই আমরা যেন একটা টেক্সাস ছবির ফ্লোরে ঢুকে পড়লাম। গুলি চলছে। ঘোড়া ছুটে যাচ্ছে। পাহাড়ের ওপরে পাথরে ঠেস দিয়ে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছেন ডিন মার্টিন। সেইসব চোখা চোখা সংলাপ।

শেষমেষ আমাদের নিয়ে আসা হল ক্যামেরার কারসাজি বিভাগে। সেই নির্বাক যুগে চলন্ত ছবিকে প্রজেকশনে ধরতে কীরকম সমস্যা হত। ঘরে ঢুকে ছবির একটি চরিত্র যেন হাঁটতে-হাঁটতে দেওয়ালে উঠে গেল। আবার তাকে নামিয়ে আনা হল স্বস্থানে। পাশের ঘরটি আরও মজার। পেছনে একটি বড় পরদা রয়েছে। সেখানে আল্পসের ছবি। পাহাড়ি পথ পাক খেয়ে একটা পিচের রাস্তা উঠে গেছে। দর্শকদের একজনকে ডাকা হল ডেমনেস্ট্রেশনের সময়। সামনেই একটা ফি'ড সাইকেল রয়েছে। প্যাডেল এবং চাকা থাকলেও নীচে ফ্রেমের সঙ্গে আটকানো বলে মুভ করে না। যে গিয়েছিল তাকে সাইকেলে বসিয়ে প্যাডেল ঘোরাতে বলা হল। ক্যামেরা চালু হলে দেখলাম ভদ্রলোক সাইকেল নিয়ে আল্পসের ওপরে। শেষে রাস্তার ওপরে ওকে আনা গেল। ফিগার কমিয়ে মানানসই করা হল। দেখা গেল, পরদায়, পাহাড়ি পথ বেয়ে ভদ্রলোক মহানন্দে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছেন। অর্থাৎ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে সুটিং স্পটে না গিয়ে শুধু প্রকৃতির দৃশ্য তুলে স্টুডিওতে এইভাবে

কাজ সারা যায়। বোম্বাইতে এই কাজ কিছুদিন হল শুরু হয়েছে। ধর্মেন্দ্র পহেলগাঁওতে না গিয়েও ওই ছবিতে এইভাবে অভিনয় করে গান গাইতে পারেন।

বিকেলের আগেই বাড়ি ফিরে এলাম। বনজ এখনও অফিসে। অঞ্জনাকে বললাম মনোজকে একটা টেলিফোন করতে চাই। অঞ্জনা চটে গেলেন। 'আপনি কীরকম লোক বলুন তো! আমাকে জিজ্ঞাসা করার কী আছে, যাকে ইচ্ছে যেখানে খুশি ফোন করুন। ভাত খাবেন?'

'ভাত?'

'হ্যাঁ মাছের কাঁটা দিয়ে পুঁইশাক আর চিংড়ি দিয়ে পোস্ত।'

'খানা লাগান। এটা কি লস এঞ্জেলস্?'

'ইচ্ছে করলেও সব জায়গায় সব পাওয়া যায় না শুধু আমেরিকা ছাড়া।'

অঞ্জনা ভাত বাড়তে গেলেন। আমি মনোজকে ধরলাম। ও ঘুমোচ্ছিল। জড়ানো গলায় বলল, 'আপনি ডেঞ্জারাস লোক মশাই। কোনও খবর নেই?'

বললাম, 'আজ হলিউড দেখলাম। মাথা খারাপ হয়ে গেল।'

'না-না। ওটা ঠিক রাখুন। হলিউড বড়লোকদের সিনেমা করার জায়গা। আমরা গরিবরা যারা আদার সিনেমা করি তাদের জন্য হলিউড নয়। আমরা ক্যামেরা একদিনের জন্যে ভাড়া করে তিনদিন চালাই, টেকনিসিয়ানদের টাকা অর্ধেক দিই। কলকাতায় তো প্রগতিবাদী তরুণ পরিচালকরা এমন করেন শুনেছি।' মনোজ বলল।

'দুর মশাই। এসব গল্প কোথায় শোনেন? কলকাতায় যারা ক্যামেরা ভাড়া দেন তারা সঙ্গে কেয়ারটেকার পাঠান। শিফট মেপে পয়সা নেয় তারা' জানালাম।

'আপনার জুলির সঙ্গে দেখা হল?'

'হয়েছে।'

'কেমন?'

'ভালো।'

'কপাল করে এসেছিলেন মাইরি। তিনবার ফোন করেছিল এখানে আপনি লস এঞ্জেলসে পৌঁছানোর আগে। ফরিদা আপনার খোঁজ করছিল। ফোন নম্বর দেব?'

'কেন?'

'এমনি। নারী তো রহস্যময়ী।'

'বড্ড বাজে বকছেন। আজ রাখছি।'

অঞ্জনা এসে বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল? মনোজের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে আরম্ভ করলে ওঁর হুঁস থাকে না।'

কেন্টকেও খেতে বলল অঞ্জনা। না না করেও শেষপর্যন্ত রাজি হল সে। টেবিলে বসে পুঁইশাকের কাঁটা বাছতে-বাছতে গলদঘর্ম হল সে। আর আমার পিসিমার কথা মনে পড়ল। এই বাল্যবিধবা মহিলাটি আমাদের সংসার ছেড়ে মাত্র সাতদিনের জন্য শ্বশুর বাড়িতে গিয়েছিলেন এগারো বছর বয়সে। আমার পিতামহের সেবা করছেন সাতষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত, আমার বাবাকে মানুষ করেছেন তাঁর মাতৃবিয়োগের পর এবং আমাকে আদর দিয়ে অমানুষ করেছেন। এইটেই তাঁর একমাত্র ত্রুটি। জলপাইগুড়ি শহরে আমি একা দাদু ও পিসিমার সঙ্গে থাকতাম। পিসিমা চা বানাতেন সরবতের মতো। মাছের ঝোল বা ডিমের তরকারি বানানো ছেড়ে দিয়েছিলেন আমার চৌদ্দ বছর বয়সেই, কারণ গন্ধ সহ্য করতে পারতেন না। বাড়িতে শাক সবজির গাছ ছিল। চমৎকার নিরামিষ তরকারি রাঁধতে পারতেন। ফুলকপির একটা তরকারি এমন হত যে তাই দিয়ে পুরো ভাত খাওয়া যেত। আজ অবধি তাঁর তুল্য তরকারি রাঁধতে দেখলাম না। হঠাৎ এক দুপুরে আমার পাতে ওই মাছের কাঁটা দেওয়া পুঁইশাক পড়ল। অবাক হয়ে তাকাতে তিনি বললেন, 'তোর নিরামিষ খেতে রোজ

কষ্ট হয়। মাছ রাঁধতে পারি না তাই কাঁটা দিয়ে করলাম।'

অমৃতের স্বাদ মানুষ পায়নি। সেদিন আমার মনে হয়েছিল আমার অমৃত চাই না। অঞ্জনা যখন জানতে চাইল কেমন হয়েছে তখন বললাম, 'ফার্স্টক্লাস'।

ও খুশি হল। সেই বাল্যবিধবা পিসিমা একদিন আমায় বলেছিলেন, কখনও কোনও মেয়েকে দুঃখ দিবি না। মেয়েরা হল মায়ের জাত। দুঃখ দিলে সেটা মহাপাপ হবে।'

সেটা মাথায় ছিল কি না জানি না তবে যে মেয়ে খুঁজে পেতে এমন বাঙালি মেনু তৈরি করে লস এঞ্জেলসে বসে তাকে খারাপ বলা যায়?

দুপুরটা চট করে বিকেল হয়ে গেল, কেন্ট বসে টিভি দেখছিল। ওকে আমি তাড়া দিলাম। ঠিক সময়ে সেই চার্চে পৌঁছোতে হবে আমাকে। জুলি আমার সম্মানে আজ গান গাইবে। এ জীবনে কোনও মেয়ে এরকম কাণ্ড করেনি। কেন্ট বলল, 'সিডনি পয়েটারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া গিয়েছে। মাত্র দশ মিনিট তিনি কথা বলতে পারেন। কিন্তু তোমাকে ঠিক করে নিতে হবে কোথায় যাবে। সিডনি সাতটার সময় দেখা করবেন। দুটো সময় রাখা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

আমি প্রতিবাদ করলাম 'কেন নয়? জুলির গান ছ'টায়। ওখান থেকে সাড়ে ছ'টায় বেরিয়ে আমরা সিডনির ওখানে পৌঁছোতে পারব না?'

'ডিফিকাল্ট।' জানাল কেন্ট। কিন্তু আমি দু-জায়গাতেই যেতে চাই। সিডনির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। চোখের সামনে সেই কৃষ্ণাঙ্গ চিত্রতারকার ছবি ভেসে উঠল। আমাকে ওঁর কাছে যেতেই হবে। কিন্তু তাই বলে জুলির গান শুনতে যাব না তা কি কখনও হয়? সেজেগুজে সময় হাতে নিয়েই আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

জলপাইগুড়ি শহরে যখন রাস্তায় গোটাদশেকের বেশি গাড়ি চলত না, তখনও আমার পিতামহ সন্ধ্যায় ট্রেন থাকলে দুপুর থেকেই তাগাদা দিতেন। কলকাতায় বিকেল সাড়ে পাঁচটায় হাওড়ায় পৌঁছোতে গেলে গড়িয়াহাট থেকে অন্তত সাড়ে তিনটেতে বের হতে হয়। স্ট্যান্ড রোড, ডালহৌসি, হ্যারিসন রোড অথবা পোস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় ধৈর্যের শেষ বিন্দুতে অবস্থান করতে হয়। একবার হাওড়ায় যাচ্ছি ক'জনে। পোস্তায় গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে চল্লিশ মিনিট। আর আধঘণ্টা বাদেই ট্রেন ছাড়বে। ট্যাক্সিওয়ালা উপদেশ দিল, 'মালপত্র সঙ্গে না থাকলে হেঁটে যেতে বলতাম। ট্রেন ধরতে চান তো মিনিটতিনেক দূরের গঙ্গার ধারে গিয়ে একটা নৌকো ভাড়া করে চলে যান।' উপদেশ মান্য করায় সেবার ট্রেন ধরতে পেরেছিলাম। কলকাতা জেদি রাগি যাত্রীদের জন্যে নয়। মাঝে-মাঝে মনে হয় কেউ যদি এমন খেলা আবিষ্কার করতে পারত যা বাসে বসে দাঁড়িয়ে খেলা যায় তাহলে মানুষের কষ্ট কম হত। কিন্তু আমরা আছি খোদ লস এঞ্জেলসে। দেড়ঘণ্টা আগে বাড়ি থেকে বেরিয়েও ঘড়িতে যখন ছ'টা পনেরো তখনও পাক খাচ্ছি রাস্তায়। এতক্ষণ ছিলাম জ্যামে আটকে। কেন্ট যে দিকেই যাচ্ছে সেদিকেই জ্যাম। তারপর রাস্তা গোলাল। শেষমেষ যখন পৌঁছোলাম তখন ছ'টা পঁচিশ। চার্চের অনুষ্ঠানগৃহে যখন পৌঁছোলাম তখন মঞ্চে কেউ নেই, দর্শকাসন শূন্য। শুধু চার্লি দাঁড়িয়ে বুকে হাত ভাঁজ করে। কেন্ট গাড়িতেই ছিল। আমি ওঁর দিকে তাকাতেই জিজ্ঞাসা করলেন 'কী হয়েছিল?'

সমস্যাটা বলতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোনদিক দিয়ে এসেছেন? পথে কী কী পড়েছিল?'

সেটা জানাতেই তিনি ঠোঁট কামড়ালেন। যেটুকু বুঝলাম তাতে এমন দাঁড়ায় কেউ যদি গড়িয়াহাট থেকে শিয়ালদা, বড়বাজার, ডালহৌসি ঘুরে কালীঘাটে আসতে চায় তবে তার যা অবস্থা হবে আমাদের তা হয়েছে। রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল। কেন্টকে এর জন্যে জবাবদিহি করতেই হবে। চার্লি বললেন, 'বেচারা জুলি একদম ভেঙে পড়েছে। পনেরো মিনিট অপেক্ষার পর প্রোগ্রাম ক্যানসেল করেছে। কারও কথা শুনছে না। শুধু কেঁদেই চলেছে। আসুন ড্রেসিংরুমে।'

॥ ১৯ ॥

চার্লির পেছনে মিনিটখানেক হেঁটে পৌঁছে গেলাম ড্রেসিংরুমে। গিয়ে লজ্জায় পড়লাম। একটা বিরাট আয়নার সামনের চেয়ারে বসে দু-হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে জুলি। তার পাশে দাঁড়িয়ে আর একটি কালো মেয়ে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। চার্লি নীচু গলায় বললেন, 'জুলি। মিস্টার মজুমদারের দোষ নেই। অযথা ঘুরে দেরি করে ফেলেছেন। কথা বলো।'

জুলি মুখ তুলল। আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছে। লজ্জা থেকে অপরাধবোধের শিকার হয়েছি তখন। কোনওমতে বলতে গেলাম, 'আই অ্যাম সরি জুলি।'

সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকার করে উঠল সে 'নো! ইউ মাস্ট নট। আমার প্রাপ্য আমি পেয়েছি। কেন এসেছ এখানে। হোয়াই হোয়াই হোয়াই।'

চুপচাপ কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইলাম। পেছন থেকে চার্লি বললেন, 'জুলি, একটু ধৈর্য ধরে ওঁর কথা শোনো। প্লিজ, ডার্লিং, একটু শান্ত হও।'

'আমি কারও কোনও কথা শুনতে চাই না। লেট মি স্টে অ্যালোন।'

অভিজ্ঞতায় বলে মেয়েদের দুটো শ্রেণি আছে। নিরানব্বুই ভাগ মেয়ে শিক্ষা-সংস্কৃতির তারতম্য সত্ত্বেও অভিমান নামক মারাত্মক অসুখে ভোগে। এক ভাগের অভিমান থাকলেও মস্তিষ্ক পরিষ্কার থাকে। অন্তত সেই মুহূর্তে বোঝালে বোঝে। কিন্তু অপর সংখ্যাধিক্য শ্রেণি সেই সময় কোনও যুক্তি মানতে চায় না। এ ব্যাপারে জলপাইগুড়ির গ্রামের মেয়ে ননীবালার সঙ্গে লস এঞ্জেলসের জুলিরানীর কোনও ফারাক নেই। পণ্ডিতরা বলেছেন মেয়েদের অভিমানের সময় খবরদার বোঝাতে যেও না। শতকরা একভাগ তোমার ভাগ্যে জুটবে এমন কথা বলা যায় না। বরং সেই সময় তাদের চোখে-চোখে রেখ। যেভাবে টাইফয়েড রোগীর জ্বর মাপতে হয় সজাগ হয়ে সেইভাবে। ওই নিরানব্বুই জনের মধ্যে আটানব্বুইজনের অভিমান কাটতে সময় লাগে বিশুদ্ধ বারো ঘণ্টা, কারণ তার মধ্যেই তাকে স্নান করতে হয়, অথবা খাবার পরিবেশন করতে হয়। এক একজনের চলে দীর্ঘকাল। তারাই হয় মারাত্মক। রামদা তার স্ত্রীর অভিমানের কথা বলেছিলেন—নেমন্তন্নে যাওয়ার ছিল সন্ধেবেলায়। বন্ধুদের সঙ্গ না এড়িয়ে দু-পাত্র বাঁচিয়ে ন'টা নাগাদ বাড়িতে পৌঁছে দ্যাখেন বউদি সাজ খুলছেন। রামদাকে দেখামাত্র ছুড়ে-ছুড়ে ফেলতে আরম্ভ করলেন হার, দুল, চুড়ি। অনেক অনুনয় বৃথা গেল। রামদা বলেছিলেন, 'জানো ভায়া, ওই সময় ঈশ্বর মেয়েদের একটা জিনিস জীবন্ত করে দেন। কবে কোনদিন দেরিতে বাড়ি ফিরেছি, কবে কথা দিয়ে রাখিনি এসব সন তারিখ মাস পর্যন্ত কোট করতে লাগল তোমার বউদি। আমার কিন্তু কোনও খেয়াল নেই। শেষে হাতে-পায়ে ধরে বললাম, "যাই বলো, তোমাকে আমি ভালোবাসি।" বউদি বললেন, "ছাই!" ' রামদা আরও গাঢ় গলায় বলেছিলেন, 'দিব্যি দিয়ে বলছি।' বউদি ঠোঁট বেঁকিয়েছিলেন, 'আর কোনও মেয়ে তোমার দিকে তাকাবে না তাই আমায় ভালোবাসছ।'

রামদা বলেছিলেন, বোকার মতো বলেছিলাম, 'প্রমাণ চাও?'

সঙ্গে-সঙ্গে বউদি ডুকরে উঠেছিলেন, 'জানি তো। তার জন্যে তুমি হেদিয়ে মরছ।'

গল্প শেষ করে রামদা বলেছিলেন, 'মেয়েদের অভিমান হল এই জিনিস। হ্যাঁ বললে দোষ, না বললে অন্যায়। শাঁখের করাত।'

জুলির ক্ষেত্রে এসব কতটা প্রযোজ্য বুঝতে পারছি না। বললাম, 'জুলি তুমি আমার বোন, তোমার কাছে আমি মিথ্যে বলতে যাব কেন?'

জুলি চুপ করল। যেন এবার আমার কথা শোনার জন্যে একটা পরিবেশ তৈরি করল। আমি চার্লির দিকে তাকালাম। তিনি ইশারা করলেন, কথা চালিয়ে যাও।

বললাম, 'আজকের প্রোগ্রামে ঠিক সময়ে উপস্থিত থাকব বলেই অনেক আগে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু পথে এত জ্যাম যে রাস্তা পালটে বেশ ঘুরে আসতে হয়েছিল।'

চার্লি এবার কথা বললেন, 'ওঁর এসকর্ট হয়তো রাস্তা চেনেন না জুলি।'

'ঠিক চেনে। লস এঞ্জেলসের রাস্তায় একজন অন্ধও ঠিক চলে আসতে পারে। আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল। ওই সাদা চামড়ার লোকটা ইচ্ছে করে ওকে এমন ঘুরিয়েছে যাতে ঠিক সময়ে আসতে না পারে। আর তোমাকেও বলি। ব্যাটাছেলে তো! সবসময় এসকর্টের ওপরে নির্ভর করে না থেকে নিজেই চলে আসতে তো পারতে।' জুলির মুখের মেঘ এখন হালকা।

'আমার তো ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই।'

'এত প্ল্যান করেছিলাম সব মাটি হয়ে গেল। আমার যে কী কষ্ট হচ্ছে।'

'আমি বুঝতে পারছি।'

'ছাই!'

অভিমান যখন মিইয়ে আসে তখন নীরব থাকতে উপদেশ দিয়েছেন পণ্ডিতেরা। থার্মোমিটারে জ্বর নেমে এসেছে দেখে পুলকিত হয়ে গায়ে ঠান্ডা হাওয়া লাগিয়েছ কি টাইফয়েড। চড়চড় করে আবার পারা উঠবে। অতএব আমি চুপ করে রইলাম। আমার পেছনে চার্লি। হাত বাড়িয়ে রুমাল টেনে নিয়ে চোখ মুছল জুলি। তারপর বলল, 'যা হওয়ার তো হয়ে গেছে। চার্লি দ্যাখো তো কাল হল পাওয়া যাবে কি না।'

চার্লি মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেল। এখন এই সাজঘরে আমি আর জুলি। জুলি বলল, 'তুমি, তোমাকে কখনও কেউ কষ্ট দিয়েছে?' নীরবে মাথা নাড়লাম হ্যাঁ। এক পলক তাকিয়ে থাকল সে, 'কীরকম?'

'অকারণ ভুল বুঝে। আমি যা করিনি তাই আমার ওপর চাপিয়ে দিয়ে।'

চোখ ছোট হল জুলির, 'তুমি আমার কথা বলছ?'

'মোটেই না। ধরো আমি কাউকে প্রচণ্ড ভালোবাসি। সে-ও একথা জানে। কিন্তু তার ধারণা আমি নাকি বদলে যাচ্ছি। আর যেই তার মাথায় এই ধারণা ঢুকল অমনি সে আমার সমস্ত আচরণ থেকে দ্বিতীয় একটা মানে তৈরি করে নিতে লাগল। আমি কিন্তু এসব টের পেলাম না। শেষে একদিন সে বলে দিল আমার পরিবর্তনের জন্যে অপমানবোধ করছে। আমি তখন হতভম্ব। যতই চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় আমি আগে এরকম করতাম না। এটা যে কী কষ্টকর ব্যাপার তা আমিই জানি। অকপটে বললাম।

'খামোকা সে তোমার মধ্যে পরিবর্তন দেখবে কেন যদি সত্যি সেটা না হয়?' মাথা নাড়লাম, 'আমি জানি না। তবে আমার এক পণ্ডিত দাদা এ ব্যাপারে মতামত দিয়েছেন।'

'কী সেটা? শুনি!' জুলির ঠোঁটে এই প্রথম হাসি ফুটল।

'মেয়েদের ভালোবাসার কোনও উচ্চতা নেই। বিস্তার আছে। চারপাশে গড়িয়ে-গড়িয়ে যায়।'

'হাউ ফানি! তারপর?'

'ওই কারণেই কোনও স্থির মূর্তি তারা তৈরি করতে পারে না। বন্যার মতো সব গ্রাস করে নিতে চায়। কোথাও খাদ থাকলে সেটাকে ভরতি করে পরের জমিতে যেতে সময় লাগে। সেই সময়টাই নাকি মারাত্মক। বাচ্চারা যেমন অন্ধকারে নানারকম মূর্তি কল্পনা করে নেয় মেয়েরাও তখন ভালোবাসার মানুষকে নিয়ে সেইরকম মূর্তি বানায় মনে-মনে। যেহেতু তাদের প্রেম ঊর্ধ্বমুখী নয় তাই কল্পনাটা বাস্তবে ঠোকর খায়। ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে অপমানবোধ আক্রমণ করে বসে তাদের।'

এই ব্যাখ্যাটা পরম শ্রদ্ধেয় সন্তোষকুমার ঘোষের। চৌষট্টি বছর বয়সেও যে মানুষটা নিত্য প্রেম নিয়ে ভাবতেন তাঁর সামনে বসলেই মতে হত আমি সমুদ্র দেখছি। অফিসের চেম্বার, মিনার্ভা হোটেল, রাতদিনের কোণার টেবিল অথবা ডায়মন্ড হারবারের রাস্তায় কত শুনেছি তাঁর বিশ্লেষণ।

মানুষটি আজ নেই। মাঝে-মাঝে খুব নিঃসঙ্গ মনে হয় তাই।

যা হোক, জুলি কিন্তু সন্তোষদার সঙ্গে একমত হল না। তার বক্তব্য, হিমালয়ের উচ্চতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই কিন্তু তার বিস্তার নেই একথা মূর্খও বলবে না। কোনও কোনও মেয়ের প্রেম নাকি সেরকম। আমার পণ্ডিত দাদার দুর্ভাগ্য যে ভারতবর্ষে তিনি সেইরকম মেয়ের সান্নিধ্যে আসেননি। এই সময় চার্লি ফিরে এল। এসে জানাল আগামীকাল হল পাওয়া যাবে না। আগে থেকেই সব বুকড্ হয়ে গেছে।

মাথা নাড়ল জুলি। আমি তখন ঘড়ি দেখছি। সিডনি পয়েটারের সঙ্গে দেখা করার কথা আমার। ওইটেও নষ্ট হোক তা আমি চাই না। জুলি বলল, 'এক কাজ করো। আমার মায়ের বাড়িতে চলো। ওখানে আমাদের ডিনার করার কথা। তুমি আমার গেস্ট। মায়ের বাড়িতে পিয়ানো আছে। ওখানেই তোমায় গান শোনাব।'

খুব খারাপ লাগছিল। কিন্তু বলতে বাধ্য হলাম, 'জুলি। তুমি খুব মুশকিলে ফেললে। একটু বাদেই সিডনি পয়েটারের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে যে।'

'সিডনি? ও মাই গড। তুমি সিডনির কাছে যাবে?' উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ল জুলি। 'উনি আমাকে সময় দিয়েছেন।'

'আমি যদি যাই তাহলে তোমার আপত্তি আছে।'

জুলির প্রশ্নের উত্তর দিলেন চার্লি, 'না জুলি। আমি শুনেছি সিডনি খুব কড়া ধাতের মানুষ। যাঁর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট, শুধু তাঁর সঙ্গেই দেখা করেন। তুমি সঙ্গে গেলে সাম অস্বস্তিতে পড়বেন।'

জুলি সেটা বুঝল 'ওকে। তাহলে তোমাকে আটকাব না। সিডনির সঙ্গে তোমার দেখা হওয়া দরকার। কালোদের মধ্যে সে-ই প্রথম ফিল্মে বিখ্যাত হয়েছে।'

আশ্চর্য! মেয়েটা যেন মুহূর্তেই পালটে গেল। আর আবদার অভিমান নেই। এমনকী সেই দুঃখটাও এখন নীচে ঢাকা পড়েছে। আমাকে স্বামীর সঙ্গে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিল, 'তুমি পরশু যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।' হঠাৎ নিজের স্বরে বাষ্প আবিষ্কার করলাম।

'কাল কী করছ?'

'আমার হোস্ট বলেছেন সি ওয়ার্ল্ডে বেড়াতে নিয়ে যাবেন।'

'ও। তাহলে তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।'

উত্তর দিতে পারলাম না। এই বঙ্গসন্তান ঘন-ঘন লস এঞ্জেলসে আসবে এমন উপায় নেই। জুলি হাসল, 'এই ভালো। আই উইল রিমেম্বার ইউ থ্রু আউট মাই লাইফ। ইউ মে আস্ক মি হোয়াই? আই ডোন্ট নো, রিয়েলি আই ডোন্ট নো। কিন্তু তোমার কাছে একটা জিনিস চাইব। তোমার দেশের বাড়ির ঠিকানা। না, আই উইল নেভার রাইট ইট। চিঠি লেখা আমার ধাতে আসে না। কিন্তু কখনও যদি কলকাতায় যাই তবে তোমাকে চমক দেব।' ঠিকানাটা লিখে দিলাম। চোখের সামনে ভেসে উঠল উত্তর কলকাতার অপরিষ্কার ভিড়ের রাস্তা। ধরা যাক জুলি সেখানকার মুদির দোকানে আমার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করছে। সঙ্গে-সঙ্গে জনাপঞ্চাশেক বাচ্চা পেছনে ছুটে যাবে। বয়স্করা রকে বসে রায় দেবেন, 'নিগ্রো মেয়েছেলে সমরেশবাবুর কাছে কোন ধান্দায় এসেছে রে।'

দোতলা থেকে বঙ্গললনারা উঁকি মেরে দেখে চোখ বড় করবেন, 'উঃ মা গো! কী কালো। কয়লাও হার মানে।'

তবু লিখলাম। জুলি জোরে-জোরে উচ্চারণ করল যা বাংলা শব্দগুলো অদ্ভুত শোনাল। কেন্ট দাঁড়িয়েছিল গাড়ির সামনে, 'মজুমদার, আর দেরি করা ঠিক হবে না।'

চার্লির সঙ্গে হাত মেলালাম। জুলি দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ ঠিক যেভাবে কোনও বাঙালি মেয়ে বিদায় দেওয়ার সময় দাঁড়িয়ে থাকে। অথচ এই মেয়েটি প্রথম দেখার দিন পুরো ছুটে এসে আমায়

জড়িয়ে ধরেছিল। গাড়িতে উঠে সিট বেল্ট বাঁধতে-বাঁধতে মাথা দোলালাম। চার্লি স্ত্রীর কোমর জড়িয়ে নিজের দিকে টানল। চলন্ত গাড়িতে বসে ভাবছিলাম, কেন এমন হয়। জুলি আমাকে কখনও চিনত না। অথচ এমন পরমাত্মীয়ার মতো ব্যবহার করতে পারল কী করে! ঈশ্বর পৃথিবীতে মানুষকে পাঠাবার সময় তাদের পূর্বস্মৃতি লোপ করে দেন, সম্পর্কের ওয়েভলেংথ ছিন্ন করে বলে দেন নতুন সম্পর্ক তৈরি করো। কিন্তু তারও মাঝে-মাঝে ভুল হয়ে যায়। আচমকা কাউকে, তেমন কাউকে দেখলে সেই বোধ তেজি হয়ে ওঠে, পৃথিবীর চোখে যার ব্যাখ্যা পাওয়া খুব মুশকিল।

কেন্ট গাড়ি চালাচ্ছিল গম্ভীর মুখে। ওর সঙ্গে ঝগড়া করে কোনও লাভ নেই। আমি এখনও জানি না কেন্ট ইচ্ছে করেই জুলির কাছে আসতে দেরি করেছে কি না। হয়তো কিংবা নয়। আমি শুধু সন্দেহ করতে পারি কিন্তু প্রমাণ করা অসম্ভব। কেন্ট আমার সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করেনি। যা ফিরে আসবে না তার দায় ওর ওপর চাপিয়ে খামোকা সম্পর্ক নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। কেন্ট হঠাৎ বলল, 'অ্যাই অ্যাম সরি মজুমদার।'

হেসে বললাম, 'আরে ঠিক আছে। ভাগ্যে ছিল না তাই হল না।' বলতে অবশ্য ভালো লাগল না।

সিডনি পয়েটারের কাছে পৌঁছোতে আমরা দশ মিনিট দেরি করে ফেললাম। কোনও কোনওদিন এমন হয়। একবার ঘোর লাগলে কিছুতেই কাটতে চায় না। সুদৃশ্য পাড়ায় সুন্দর বাড়ির মালিক সিডনি তখন অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সময় রাখার ব্যাপারে কড়া মনোভাব শুনেছি ইংরেজদের আছে। লাখে এক আধজন বাঙালি পুরুষ মহিলা সেইটে রপ্ত করেছেন। তাদের নিয়েই আমার নাজেহাল অবস্থা। কয়েক লাখের গণ্ডা যেন আমার ভাগ্যেই জুটে গেছেন। এখানে এসে দেখলাম সিডনিও ওই দলে। অনেক অনুরোধেও ওঁর সেক্রেটারি আর সাক্ষাতের সময় বের করতে পারলেন না। শেষে দুধের বদলে ঘোল দিলেন, আমি টেলিফোনে কথা বলতে পারি।

তাই সই। সিডনি এখন স্নান করতে চলে গেছেন। সেখান থেকে বেরিয়ে সেজেগুজে যাবেন পার্টিতে। এখন বাথটবে শুয়ে শুয়েই কথা বলবেন।

রিসিভারে কান লাগিয়ে বললাম, 'হেলো, আমি একজন ভারতীয়। দশ মিনিট দেরি করে ফেলেছি বলে দুঃখ প্রকাশ করছি।'

জড়ানো গলায় ইংরেজি উচ্চারিত হল। যার বেশ কিছু শব্দের অর্থ বোধগম্য হয়নি আমার। সিডনি বললেন, সম্ভবত বললেন, 'কিছু জিজ্ঞাসার থাকলে করতে পারেন।'

'আপনি কলকাতায় খুব পরিচিত। কিন্তু এখনকার ছবিতে বেশি দেখি না কেন?'

'কারণ আমাকে সুযোগ দেওয়া হয় না।'

'তার কারণ কী?'

'আমার বয়সের আমার চেহারার চরিত্র থাকে না তাই।'

'অভিনেতা হিসেবে কাজ করতে না পারার বেদনা হয় না আপনার?'

'সেটা আমার সমস্যা, প্রোডিউসারদের নয়।'

'আপনি এখন কী করছেন। এই মুহূর্তে নয়, এখন।'

'একটা ছবি তৈরি করছি।'

'একটা কথা। আমেরিকায় বেশির ভাগ মানুষ কালো। অথচ আমেরিকান ছবিতে সাদাদের ভিড় দেখি। কালোরা থাকলে হয় গুণ্ডা নয় তেমন কিছু। কেন?'

'দ্যাটস দ্য প্রব্লেম। ইন্ডাস্ট্রিটা ওদের হাতে। সাদা কালোর দ্বন্দ্ব বুঝি না। বুঝতে চাই না। কিন্তু অনেক কালো ছেলে প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও সুযোগ পাচ্ছে না চরিত্রের অভাবে। একজন কালো গায়ক যে সুবিধে পায়, কালো অভিনেতা তা পায় না। শেকসপিয়র ওথেলোয় এইটাই লিখেছেন। আমি যে ছবি তৈরি করতে যাচ্ছি তা কালোদের জীবন নিয়ে। সাদা বন্ধুদের হতাশ করতে হচ্ছে

তাদের চরিত্র নেই বলে।' একটু থামল সিডনির গলা, 'ধন্যবাদ। এবার আমার স্নান শেষ করা উচিত। বাই।' লাইনটা কেটে গেল! কিন্তু ভদ্রলোককে আমি অভদ্র বলতে পারলাম না। টেলিফোনে এর চেয়ে বেশি আর কী বলা যেত। তবে আপশোশ থেকে গেল সামনাসামনি না দেখা হওয়ার জন্য। তারপরে মনে হল, সিডনির ছবি দেখেছি ষাটের দশকে। তখন তিনি যুবক, তরতাজা। এখন নিশ্চয়ই বেশ বয়স্ক। চুলে পাক ধরেছে। দেখলে সিনেমার স্মৃতির সঙ্গে মেলাতে না পারারই কথা।

বোস দম্পতি আমার জন্যে অন্যান্য কাজ থেকে ছুটি নিয়েছেন। ওঁদের বিশাল বাড়িতে আমরা দুপুরের খাওয়া সেরে বেরিয়েছি। কেন্টকে আজ ছুটি দেওয়া হয়েছে। বেরুবার সময় একটা টেলিফোন এল। প্রতিবেশী এক ভদ্রলোক জানতে চাইছেন বিকেলে আমরা বাড়িতে থাকব কি না। উনি খবর পেয়েছেন বোস পরিবারে একজন লেখক বেড়াতে এসেছেন। বনজ তাঁকে বলে দিল, থাকছি না। নিউইয়র্কে মনোজও বলেছিল ব্যাপারটা। এদেশে কেউ কারও বাড়িতে টেলিফোন না করে যায় না। আমি যাঁর বাড়িতে যাচ্ছি তিনি কী পরিস্থিতিতে আছেন না জেনে যাওয়া একটা অপরাধ বলে মনে করে এরা। স্বদেশের বাঙালিরা মনে করে কারও কোনও ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে কিছু নেই। যখন তখন চট করে পরিচিতর বাড়িতে গিয়ে কড়া নাড়লেই যেন তিনি কৃতার্থ করবেন। ধরুন সকালবেলায় আপনার কোনও কাজ করার সময়, যা একাই করতে চান, এই সময় না জানিয়ে আমি হাজির হলাম এবং আপনি যে কাজটা করতে পারলেন না তার জন্য সামান্য দুঃখিতও হলাম না আপনি যদি পাঁচ মিনিট বাদে বলেন যে আর কথা বলতে পারছেন না কাজের জন্য তাহলে সারা শহরে আমি আপনার অভদ্রতার বিবরণ বিলিয়ে বেড়াব। আর কাজটা যদি খুব গুরুতর হয় এবং আপনি বলে পাঠান যে দেখা করতে পারছেন না তাহলে সর্বনাশ ডেকে আনলেন। আমি এবং আমার মতো লোকগুলো বুঝতেই চাই না যে খেজুরে আলাপের জন্যে আপনার বাড়িতে গিয়ে আপনাকে বিব্রত করছি। আপনার সুবিধে মতো সময়ের জন্য অপেক্ষা করা বাঙালির ধাতে নেই। বিদেশে গিয়ে তাদের ভালো গুণগুলো দেখে যদি প্রশংসা করা হয় তাহলে সে দালাল হয়ে যায়। কিন্তু নিজের দেশের বদব্যাপারটা ঢেকে ঢুকে রাখতেই শান্তি। বিবেকানন্দের বরাত ভালো যে তিনি আঠারশো নিরানব্বুইতে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। নইলে, 'হে আমেরিকার নারী, তোমাকে প্রণাম,' বলার জন্যে সিআইএ-র দালাল হয়ে যেতেন।

লস এঞ্জেলস্ থেকে মেক্সিকোর বর্ডার খুব বেশি দূরে নয়। বর্ডার পেরিয়ে মরুভূমিকে ভদ্রস্থ করে নেওয়া রাস্তা ডিঙিয়ে গাড়ি নিয়তই ছোটাছুটি করে। আমেরিকার নাগরিকদের সেখানে যেতে ভিসার প্রয়োজন হয় না। মেক্সিকোতে ঢোকার আগেই জায়গাগুলোর নাম আর ইংরেজি থাকেনি। যে সময় ব্রিটিশরা আমেরিকাকে কলোনি বানাতে চেয়েছিল সেই সময় স্প্যানিশরাও চুপ করে বসে থাকেনি। তারাও পূর্বতট বেয়ে এখানে জেঁকে বলেছিল। ফলে যেদিকে তাকাই স্প্যানিশ নামের ছড়াছড়ি।

বোস পরিবার আমাকে নিয়ে এলেন স্যান দিয়াগোতে 'সি-ওয়ার্ল্ড' দেখাতে। সমুদ্রের তলায় যাদের বাস তাদের এখানে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। সি-ওয়ার্ল্ডের গেটের সামনে বিশাল মাঠে গাড়ি থিকথিক করছে। পার্কিংপ্লেস পাওয়াই মুশকিল। আজ হালকা রোদ উঠেছে। শরৎকালের বিকেলের মতো। গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে খুব ভালো লাগছিল। বনজের ছোট মেয়ের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছে। ও আমার আঙুল ধরে হাঁটছিল। কলকাতার কথা বললে মাথা নাড়ে, 'টু মাচ ক্রাউড, টু মাচ হট, অনলি গ্র্যান্ড মা ইজ ফাইন।' আমেরিকার দ্বিতীয় জেনারেশনের বাঙালিকে নিয়ে মনোজ অনবদ্য লেখা লিখেছে, 'এই দ্বীপ এই নির্বাসন।' এই মেয়েটিও ক্রমশ তার চরিত্র হয়ে যাবে একদিন।

সি-ওয়ার্ল্ডের টিকিট যখন বনজ কাটতে গিয়েছেন তখন আমি একটি নোটিশ বোর্ডের দিকে সকৌতুকে তাকালাম। সেখানে পরিষ্কার লেখা রয়েছে হরেকৃষ্ণ দলের কোনও সদস্যের প্রবেশাধিকার

নেই। আমেরিকার বেশ কিছু মানুষ তাহলে হরেকৃষ্ণ সম্প্রদায়কে অপছন্দ করেন। নিশ্চয়ই আইনসম্মতভাবে তাদের ভেতরে ঢোকা বন্ধ করা হয়েছে নইলে ওই নোটিশটি টাঙানো হত না।

অনেকটা চিড়িয়াখানা দেখার কায়দায় আমরা ঘুরলাম। বিশাল কাঁচের বাক্সে জল ভরতি করে তাতে বীভৎস চেহারার হাঙর রাখা হয়েছে। ওই কাচ ভাঙার সামর্থ্য নেই কিন্তু বিকট জন্তুগুলো যখন মুখ হাঁ করে তেড়ে আসে, তখন কাচের দেওয়ালের বাইরে দাঁড়িয়েও আঁতকে উঠতে হয়। 'জ' ছবির চরিত্রটি যেন চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ঢোকার মুখে কয়েকটা ছোট চৌবাচ্ছায় বাচ্চা হাঙরদের রাখা হয়েছে। ওদের ভাবভঙ্গি এখনও নিরীহ। বেরিয়ে এলাম। খানিকটা হাঁটতেই একটা ওপেন এয়ার গ্যালারি দেখতে পেলাম। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। মাঝখানে টলটলে নীল জল। অনেকটা সুইমিং পুলের মতো। একদম সার্কাসের মতো অ্যানাউন্সমেন্ট করা হল, এখনই খেলা শুরু হবে। সুন্দরী সুদেহের অধিকারিণী এক মহিলা সাঁতারের পোশাকে সামনে, সে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতেই জল তোলপাড় হল। শরীর থেকে জল ঝরিয়ে দুটো ডলফিন প্রায় হাতজোড় করার ভঙ্গিতে জলের মধ্যেই মহিলার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর চলল ওদের খেলা। দুটো ডলফিনকে দিয়ে ওরা কতরকমের খেলা খেলল যার যে কোনও একটাই বিস্ময় উদ্রেক করে। সিংহকে শিক্ষিত করে ট্রেনার যেমন সার্কাসে খেলা দেখায়, এরা ডলফিনকে দিয়ে তার পাঁচগুণ ভালো খেলা দেখাল। ডলফিনের পরের ব্লকে সিল থিয়েটার। এক বোকাসোকা মোটা ভদ্রলোক যেন সিল পরিবারে বেড়াতে এসেছেন। বৃদ্ধ সিলমাছ তাঁকে আপ্যায়ন করছেন। তাঁর জন্যে খাবার প্লেটে রাখল। কিন্তু পরিবারের কনিষ্ঠ সিলমাছটি ঢাকা তুলে সেটা চুরি করে খেয়ে গেল। ভদ্রলোক খেতে গিয়ে পাত্র শূন্য দেখলে বৃদ্ধ সিল মাছের কী আপশোশ। রেগে মেগে সে নাতিকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে পেছনে ছুটছে আর নাতি নানান মজা করছে তখন দর্শকরা হেসে কুটোকুটি। একটা বাড়ির ভেতরের ঘরের সেট আর সামনে খানিকটা জল রেখে চমৎকার নাটক করে গেলেন পরিচালক সিল মাছদের নিয়ে। শুধু ওই দলটিকে যদি কলকাতায় আনা যেত...। বনজ মনে করিয়ে দিলেন কলকাতার উত্তাপে সিলদের বেঁচে থাকা মুশকিল হবে। এরপরে মিউজিয়াম। সমুদ্রের তলায় যারা বাস করে প্রায় অধিকাংশের অস্থি সেখানে রাখা আছে। এমনকী জলজ গাছেরা পর্যন্ত।

সকালে উঠেই সাজগোজ। অঞ্জনার মন খারাপ। বললেন, 'আপনারা হঠাৎ আসেন, আমাদের ভালো লাগে, আবার হঠাৎ চলে যান। কী বিচ্ছিরি হয়ে যায় সময়টা তারপর।' বাচ্চারা স্কুলে চলে গেল। ছোটটা যাওয়ার আগে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করল, 'আংকল, হোয়েন আই উইল সি ইউ এগেইন?'

'আমি জানি না মা। তুমি যখন কলকাতায় যাবে তখন হয়তো।'

'তুমি আর আসবে না এখানে?'

'আমি জানি না।'

'আংকল। একটা প্রশ্নের জবাব দেবে?'

'বলো।'

'তোমরা, বড়রা, এত জেনেও কেন প্রায়ই বলো জানি না? তোমরা কি মিথ্যে কথা বলো?'

'না মা। আমরা সত্যিই জানি না।'

কেন্টের পাশে বসে হাইওয়ে দিয়ে এয়ারপোর্টের দিকে যেতে-যেতে মেয়েটার কথাগুলো বারংবার মনে পড়ছিল। সত্যি কি আমরা জেনেও না জানার ভান করি? এরপরে যদি কখনও লস এঞ্জেলসে আসি তখন ওই ছোট্ট মেয়েটি অনেক বড় হয়ে যাবে। আর বড় হওয়ার একটাই সুবিধে, খুব সত্যিকথাগুলো সরল গলায় জিজ্ঞাসা করতে ভুলে যাবে।

এয়ারপোর্টে গাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে আমরা যখন বোর্ডিং কার্ড নেওয়ার জন্যে যাচ্ছি তখনই

চার্লিকে দেখতে পেলাম। আমি অবাক। চার্লির আসার তো কোনও কথা ছিল না। কেন্টকে আমার টিকিট দিয়ে কার্ড নিতে বলে আমি চার্লির মুখোমুখি হলাম। চার্লি হাসলেন, 'অসুবিধে করলাম না তো?'

'মোটেই না। খুব ভালো লাগছে আপনাকে দেখে। জুলি কোথায়?'

'আসেনি। আমাকে পাঠাল। আসলে ও খুব সেন্টিমেন্টাল।'

মাথা নীচু করলাম। হঠাৎ চার্লি বললেন, 'আমি তো ঠিক কবি নই। গান লিখি। জুলি সেই গান গেয়ে আরাম পায়। আমি জুলিকে বলেছিলাম সঙ্গে আসতে। তা ও বলল, আর কান্নাকাটি করতে চায় না।' আমাকেই পাঠাল। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে আমায় দিলেন চার্লি, 'এই গানটা সেদিন আমি লিখেছিলাম। জুলি অনুষ্ঠানের প্রথমেই এই গান গাইবে বলে ঠিক করেছিল। আচ্ছা, চলি। আবার নিশ্চয়ই আমাদের দেখা হবে। পৃথিবীটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে, আবার দেখা হবে।' একটু নাটকীয়ভাবে চার্লি চলে গেলেন। কাগজের ভাঁজ খুললাম।

'বিন্দু বিন্দু জলবিন্দু জমছে আমার মুখে
আমার দেহ আমার এ প্রাণ কাঁপছে পরম সুখে
রোদ্দুর নয় জলবিন্দু জমুক আমার বুকে

এই গানে কোথায় আমি আছি? চার্লি এবং জুলি মিলিতভাবে কী বলতে চেয়েছিল? উত্তরটা কি আমি জানি? নাকি সেই ছোট্ট মেয়েটির কথাই সত্যি। জেনেও বলছি জানি না।

॥ ২০ ॥

আমেরিকার পূর্বতটে এই অঞ্চলটিকে বলে ক্যালিফোর্নিয়া। লস এঞ্জেলস্, সানফ্রান্সিসকো, লা ভেগাস আর গ্র্যান্ড ক্যানিয়ান বিরাট সংখ্যায় পর্যটক টানে। মনোজের কাছে শুনেছি লা ভেগাস শহর নাকি দিনের বেলায় ঘুমায়। রাস্তায় বেরুলে একটিও মানুষ চোখে পড়বে না। দোকানপাটও প্রায় বন্ধ। সূর্যাস্তের পর শহর জেগে ওঠে। লা ভেগাস বিখ্যাত তার জুয়োখেলার জন্যে। দু-পা অন্তর ক্যাসিনো। লক্ষ-লক্ষ ডলার প্রতি রাত্রে হাতবদল হয় সেখানে। কিন্তু সেখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা হয় কঠিন হাতে। সরকারি অফিসাররা থাকলেও শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্বে নিয়েছে ক্যাসিনোর মালিকরা। তারা কিছুতেই বদনাম অর্জন করতে রাজি নয়। তবু রোজ কেউ না কেউ মরছে মারামারি করে এবং এটাকে ঘটনা বলে মনে করা হয় না। কিন্তু লা ভেগাস না সানফ্রান্সিসকো এই দুটোর মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হলে আমি দ্বিতীয় শহরটিকেই বাছব। কলেজে পড়ার সময় একটি আমেরিকান ছবি দেখে ছিলাম যেটি তৈরি হয়ে ছিল সানফ্রান্সিসকো শহরকে ঘিরে। দারুণ রোমান্টিক ছবি। দেখতে-দেখতে মনে হয়েছিল শহরটাকে আমি চিনে নিয়েছি। সম্ভবত সেই নস্টালজিক ভাবনা সতেজ ছিল বলেই জুয়োর শহর ছেড়ে স্মৃতির শহরে এলাম।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে টিপসি বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে হেঁটে গাড়ি ভাড়া দেওয়ার কোম্পানির দরজায় এলাম। কেন্ট সইসাবুদ করে সুন্দর একটা গাড়িতে উঠে বসল। আমি তার পাশে। দারোয়ানটি হেসে বলল, 'হ্যাভ অ্যা নাইস ডে!' খুব অল্প কয়েকটা শব্দ। সঙ্গে সামান্য হাসি। কিন্তু মন ভালো করে দিল। বিদেশিদের অনেক কথাই সাজানো কিন্তু কোনও-কোনও কথা যদি আমরা বলতে পারতাম তাহলে—। ভেবে লাভ কী? কেন যে ভাবি!

ভিআইপি রোডের বদলে যদি দমদম এয়ারপোর্ট থেকে ইস্টার্ন বাইপাস রাস্তাটি শহরে আসত মোটামুটি এয়ারপোর্ট থেকে সানফ্রান্সিসকো শহরে ঢোকার ছবিটা পাওয়া যেত। কেন্ট শিস দিচ্ছে

আর গাড়ি চালাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন্ট, তুমি কি এমনি মাঝে-মাঝেই বিদেশি ট্যুরিস্ট এলে তার সঙ্গে দেশটাকে ঘুরে দেখতে বেরিয়ে পড়ো?'

'না। যদি ছুটি ম্যানেজ করতে পারি তবেই। আমিও তো এক জায়গায় চাকরি করি।'

'তুমি ফিল্ম তৈরির কাজে আছ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু সেটাই আমার জীবিকা নয়। পড়াশোনা করেছি, কাজ শিখেছি কিন্তু এদেশে চট করে কাজ করার সুযোগ পাওয়া যায় না। কেউ সহজে জায়গা ছাড়ে না। তোমরা যে ছবিটা করতে যাচ্ছ তাতে যদি আমায় সুযোগ দাও, তাহলে আমি সাহায্য করতে পারি।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু আমরা হলিউডের ধরনে ছবি করার স্বপ্ন দেখি না। খুবই গরিব প্রোডাকসন্স আমাদের। নিউইয়র্কে ফিরে তোমার সঙ্গে মনোজের আলাপ করিয়ে দেব।' আন্তরিকভাবেই কথাগুলো বলে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার স্ত্রী ফিল্মে কাজ করা পছন্দ করবেন?'

'ও আমার কোনও ব্যাপারেই আপত্তি করে না। এই যে আমি চলে এসেছি আর ও রয়ে গেছে দুটো বাচ্চাকে নিয়ে, কোনও প্রব্লেম নেই। ও চাকরি করে। আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে মা-বাবার কাছে যাই। লাঞ্চ করি। ওরাও আমাদের বাড়িতে আসেন।' কেন্ট হাসল।

'তোমার বাবার বাড়িতে কি জায়গা কম?'

'কেন?'

'এই বাচ্চাদের নিয়ে যে আলাদা থাকো তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

'না-না। এক সঙ্গে থাকলে আমার স্ত্রীর সঙ্গে বাবা-মায়ের গোলমাল হবেই। কারণ দুটো সংসারের দুটো ধারা। বাবা-মা চাইবেন আমার বউ তাঁদের মতো চলুক আবার আমার বউ উলটো চাইবে। এটাকে সহজেই এড়িয়ে যাই আলাদা থেকে সপ্তাহে একদিন এক সঙ্গে কাটিয়ে।'

কেন্ট হাসল, 'আমি তোমাদের দেশের ব্যাপারটা শুনেছি। এখানে কেউ যদি সাফার করে তাহলে ছেলেদের কথাই বলতে হয়। তারা নিজের ধারা ত্যাগ করে বউ-এর ধারায় চলতে বাধ্য হয়। কিন্তু মজাটা কী জানো, প্রথম দু-তিন বছর ভালোবাসায় এমন কেটে যায় যে ওসব ধারার কথা মনে থাকে না। তারপর যখন সন্তান আসে তখন মনে হয় স্বামী-স্ত্রী মিলে নতুন একটা ধারা তৈরি করলাম। নদীর মতো।'

কেন্টের এই ব্যাখ্যা আমার ভালো লাগল। পশ্চিমবাংলায় যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে বলে আমরা কতই না হা-হুতাশ করি। অর্থনৈতিক সমস্যাকে দায়ী করি। কিন্তু সত্যি যদি বিয়ের পর ছেলে বউকে নিয়ে আলাদা থাকত, কোনও-কোনও দুর্বলচিত্ত পিতামাতা সত্যিকারের কষ্ট পেলেও, সংসারে শান্তি আসত। অন্তত আর যাই হোক, পঞ্চাশ শতাংশ বউ যন্ত্রণা পেত না, পাঁচ শতাংশ পুড়ে মরত না।

সানফ্রান্সিসকো শহরে ঢুকলাম আমরা। ছিমছাম সুন্দর শহর। ঠাটবাট জমকালো নয়। লম্বা-চওড়া বাড়ি কিন্তু নিউইয়র্কের মতো আকাশছোঁয়া নয়। সানফ্রান্সিসকো এসে মনে হচ্ছিল আমি খুব পরিচিত শহরে ঢুকে পড়েছি। হয়তো সেই কবেকার দেখা সিনেমাটি সক্রিয় হয়েছিল। পার্কিংলটে গাড়ি রেখে হোটেলে ঢুকলাম আমরা। রিসেপশনিস্ট জানাল আমাদের নামে ঘর বুক করাই আছে। খাতাপত্তরে সইসাবুদ করতে-করতে জানলাম আমার যা কিছু দামি সম্পত্তি হোটেলের লকারেই রেখে দিতে পারি। কোথাও করিনি ব্যাপারটা কিন্তু এখানে করলাম। আমরা যখন কথা বলছি তখন ওপাশের লিফট থেকে এক প্রবীণ বঙ্গসন্তান নামলেন সঙ্গিনী নিয়ে। সঙ্গিনীটিও বাঙালি। বিদেশে বাঙালি বাঙালিকে দেখলে খুশি হয়। ইনি হলেন না। আমার চোখে চোখাচোখি হওয়ামাত্র মুখ ফিরিয়ে সঙ্গিনীকে কিছু বলতেই তিনি মুখ নামালেন। তারপর যত দ্রুত সম্ভব বেরিয়ে গেলেন সামনে থেকে। বেশ মজা লাগল। দুজনের বয়সের ব্যবধান অন্তত বছরপঁচিশেক। আর মেয়েটিকে খুব চেনা মনে

হল অথচ বুঝতে পারলাম না। কৌতূহলী হয়ে রিসেপশনিস্টকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই হোটেলে কোনও ভারতীয় আছেন নাকি?'

'হ্যাঁ।' রিসেপশনিস্ট ওদের বেরিয়ে যাওয়ার সময় পেছন ফিরে কাজ করছিল। আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে রেজিস্টার খুলে বলল, 'ইন্ডিয়া থেকে এক দম্পতি এসেছেন গতকাল। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস এস রায়। রুম নাম্বার পাঁচশ সাত। ওহো, দে আর ফ্রম ইওর সিটি, ক্যালকাটা।'

কেন্টের ঘর আমার ফ্লোরে নয়। ও আমার ঘরের টেলিফোন নম্বর নিয়ে চলে গেল অন্য লিফট দিয়ে। আমি সুটকেস হাতে লিফটে উঠলাম। পাঁচশো পনেরো নম্বর ঘর আমার। অর্থাৎ পাঁচতলার পনেরো নম্বরটি আমার জন্যে বরাদ্দ। লিফট থেকে নেমে কার্পেটমোড়া প্যাসেজ ডিঙিয়ে ঘর খুঁজতে-খুঁজতে পেতলের চাকতিতে পনেরো নম্বর পেয়ে গেলাম। চাবি ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই চক্ষু মজে গেল। আকাশী নীল আমার বড় প্রিয় রং। আর সেই রঙে ব্যাডমিন্টন কোর্টের সাইজের ঘরটি সাজান। সুটকেস ফেলে দিয়ে বিশাল লোভনীয় খাটে লাফিয়ে পড়লাম। আঃ, কী আরাম। দুবার পাক দিয়ে স্থির হতেই হঠাৎ মন খারাপ হয়ে গেল। অনেকদিন কলকাতাকে দেখিনি। কলকাতা এখন কেমন আছে? এখন এই মুহূর্তে যদি আমার প্রিয়জনদের কলকাতা থেকে তুলে নিয়ে এই বিশাল ঘরে বসে আড্ডা মারতে পারতাম তাহলে কী চমৎকারই হত।

মন খারাপ লাগলে আমার শুয়ে থাকতে মোটেই ভালো লাগে না। চটপট উঠে পড়ে ভারী পরদা টেনে সরিয়ে দিয়ে শেষ বিকেলের রোদ ঘরে ঢুকতে দিলাম। বাড়িগুলোর মাথা পেরিয়ে, কারও বা ফাঁক গলে আচমকা নীল সমুদ্র দেখতে পেলাম। খুব বেশি দূরে নয় কিন্তু এক চিলতে। আর তখনই দরজার শব্দ হল। কেন্ট এল বোধহয়। কার্পেট মাড়িয়ে, দরজা খুলতেই মধ্যবয়সি পুরুষকে দেখতে পেলাম যার হাতে বেশ কিছু ম্যাগাজিন। জিজ্ঞাসা করলাম 'ইয়েস' 'ইওর ম্যাগাজিন স্যার।' বলে সে একটি ম্যাগাজিন এগিয়ে দিল।

'আই ডোন্ট নিড এনি ম্যাগাজিন।' মাথা নাড়ালাম।

'ইটস ফ্রি অফ কস্ট স্যার বিকজ ইউ আর গেস্ট অফ দি সিটি।' প্রায় জোর করেই ম্যাগাজিনটা ধরিয়ে দিয়ে সমীহ দেখিয়ে চলে গেল লোকটা। গেস্ট অফ দি সিটি! বেশ সম্মানিত মনে হল নিজেকে সরকার থেকে কি এদের সবাইকে আমার পরিচয় জানিয়ে দিয়েছে? দরজা বন্ধ করে একটু আলতো জোরে ম্যাগাজিনটা ছুড়ে দিলাম খাটের ওপর। পরে চোখ বোলানো যাবে। জামাকাপড় পালটে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে খাটের দিকে তাকিয়ে আমি হতভম্ব। ম্যাগাজিন ছুড়ে ফেলার সময় আর ফিরে তাকাইনি। হয়তো তখনই পাতা খুলে গিয়েছিল।' ইলাস্ট্রেটেড উইকলির সাইজের ম্যাগাজিনের পাতায় একটি সুন্দরী লম্বা টুলের ওপর বসে মদির চোখে জন্মদিনের পোশাকে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। প্লে-বয় পত্রিকাটি দেখেছি। যৌন রসের মিশেল দেওয়া সেই পত্রিকাটির মতো কি? এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে পাতাটাকে চোখের সামনে ধরতেই পড়লাম, 'আমি লিসা, আমার ফিগার হল ছত্রিশ তেইশ সাঁইত্রিশ। উচ্চতা পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি। নীচে যে টেলিফোন নম্বরটি রয়েছে সেটি ব্যবহার করে আমার সঙ্গে কথা বলে চলে আসতে পারেন।'

পরের পাতায় একটি সুন্দর খাটে জনৈকা শুয়ে আছেন পায়ের ওপর পা চাপিয়ে। নীচে লেখা, 'আমি কিসি, ছত্রিশ তেইশ সাঁইত্রিশ। আপনি এলে আমার সময়টা ভালো কাটে। নীচের টেলিফোন নম্বরটা দয়া করে ব্যবহার করুন।' পাতায় পাতায় অপ্সরাদের নগ্ন শরীরের ছড়াছড়ি। ম্যাগাজিন না বলে ক্যাটালগ বলা চলে। কিছুক্ষণ দেখলেই মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করে। পেছনের দিকে লেটেস্ট অ্যাড ছাপা হয়েছে। তার ভাষাও অদ্ভুত। 'একটি ফ্ল্যাট সমুদ্রের ধারে ভাড়া নিয়েছি। মাসিক ভাড়া ছয়শো ডলার। স্বাস্থ্যবান পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে শেয়ার করতে চাই। টেলিফোন নম্বর।' 'বিয়ে নয়। শুধু স্টে-টুগেদার করতে চাই। আপনাকে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে হতে হবে এবং যেটা দরকার সেটা হল ভদ্রতা।' এই শহরে নতুন এসেছেন? একা? খারাপ লাগছে? যদি দিনসাতেক

থাকেন তাহলে আর হোটেলে কেন? সমুদ্রের ধারেই আমার কটেজ। বেডটি, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ আফটার নুন টি, আর ডিনারের জন্যে তিরিশ ডলার, বিশ ডলার বিছানার জন্যে দিতে হবে। মদ নিজের পয়সায়। সার্ভিস চার্জ যেরকম সার্ভিস চান সেইরকম। টেলিফোন করবেন বিকেল পাঁচটার পরে কারণ দুপুরে অফিসে থাকি।'

এই বিজ্ঞাপনটি পড়ে মনে হল একটু বুদ্ধিমত্তার ছাপ আছে। অবশ্য যিনি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তিনি পুরুষ না মহিলা জানা যাচ্ছে না। কিন্তু পঞ্চাশ ডলারে থাকা খাওয়া তো বেশ সস্তা। আমার অনেক দিনের শখ ছিল সমুদ্রের ধারের একটা কটেজে থাকব। জানালা দিয়ে ঢেউ দেখতে-দেখতে লিখব। যখন লিখতে ইচ্ছে করবে না তখন প্যান্ট গুটিয়ে সমুদ্র সৈকতে হেঁটে বেড়াব। অবশ্যই সেই সৈকতটাকে নির্জন হতে হবে। লাল কাঁকড়াদের দল আমার পায়ের আওয়াজে গর্তে ঢোকার জন্যে ছোটাছুটি করবে তখন দৌড়ে দু-একটাকে ধরব। ছড়ানো পায়ে ঢেউ এসে পড়বে আর আমি পৃথিবীবিস্মৃরিত হয়ে বিয়ার খাব। ঝাউগাছে হাওয়ারা শব্দ তুলবে আর আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইব। না। এ আশা পূর্ণ হয়নি। পূর্ণ করার জন্যে যে উদ্যোগ নেওয়া দরকার তা নিইনি কোনওদিন। আজ এই বিজ্ঞাপনটি পড়ে খুব লোভ হচ্ছিল। থাকি বা না থাকি দেখে এলে ক্ষতি কী। এইসময় সেজেগুজে কেন্ট এল।

ম্যাগাজিনটা দেখালাম ওকে। কেন্ট গম্ভীর মুখে বলল, 'সানফ্রান্সিসকোয় প্রসটিটিউশন খুব চালু। পৃথিবীর সব দেশের মানুষ আসে এখানে। জাহাজঘাটা রয়েছে। জাহাজিদের খুব ভিড়। তোমার সঙ্গে ক'দিন থেকে আমার মনে হচ্ছে তুমি এসবে ইন্টারেস্টেড নও।'

'নই। কিন্তু এর জন্যে পুলিশ কিছু বলে না?'

'যতক্ষণ কেউ তোমাকে বিরক্ত না করছে ততক্ষণ না। এসব মেয়েদের এজেন্সি চালায়। লক্ষ করে দ্যাখো চার-পাঁচটা মেয়ের টেলিফোন নম্বর একই। ওটা এজেন্সির নম্বর।'

'এদের আয় কেমন? এজেন্সি কত নেয়?'

'মিনিমাম টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট। টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করো না।'

'কী জিজ্ঞাসা করব?'

'তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হবে না। তুমি শুধু বলো এই হোটেল থেকে বলছ। রুম নম্বর বলার দরকার নেই। এক্সপেরিয়েন্স হোক।' হাত কাঁপছিল। তবু প্রথম ছবির টেলিফোন নম্বরটা টিপলাম। রিং হল। একটি নারীকণ্ঠ বলল, 'হেলো।'

'আমি লিসার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'কোত্থেকে বলছেন?'

হোটেলের নাম বলতেই মহিলা বলল, 'সোজা চলে আসুন। আপনার হোটেল থেকে বেরিয়ে ডান দিকে মিনিটদশেক গেলে একটা ম্যাকডোনাল্ড দেখতে পাবেন। সেটাকে বাঁ-দিকে রেখে খানিকটা এগিয়ে গেলে মার্চেন্টস নামে একটা হোডিং দেখবেন। তার উলটো দিকের বাড়িতে ঢুকে তিনতলায়। এক ঘণ্টার জন্যে দুশো ডলার। রাত্রে থাকলে পাঁচশো। টাকাটা এখানে না দিতে চাইলে হোটেল বিলের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করা যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে হোটেল থেকে ক্রেডিট কার্ড নিয়ে আসবেন।' লাইন কেটে গেল।

বিমূঢ় শব্দটির অর্থ সংসদের অভিধানে রয়েছে 'কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞানহীন' বিহ্বল এবং সেই সঙ্গে আর একটি মানে করা হয়েছে, সম্পূর্ণ মুগ্ধ। আমি একই সঙ্গে তিনটে অর্থাৎ সত্যিকারের বিমূঢ়। একী বাক্যাবলী শুনলাম? ক্রেডিট কার্ড নিয়ে রেড লাইট এরিয়ায় যাওয়া! গুজব শুনেছি একদা কলকাতার নামি কবির একজন বারবিলাসিনীর কাছে যাতায়াত ছিল। দু-তিনজন তরুণ কবি এবং লেখকের পরবর্তীকালে যাঁরা বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হয়েছিলেন বড় সাধ হয়েছিল রমণীতে রঞ্জিত হওয়ার। সেই নামি কবির নাম করে তাঁর বিলাসিনীর কাছে তাঁরা গমন করেছিলেন। সেখানে

তবু পরিচিত সূত্র ছিল কিন্তু এখানে তো পুরো আইনসম্মত ধাঁচের ব্যবস্থা।

তারপর যে চিন্তাটা মাথায় এল সেটা সম্ভবত বঙ্গসন্তান হওয়ার কারণেই। পাঁচশো ডলার মানে ছয় হাজার টাকা। দুশো চব্বিশশো। এক ঘণ্টার জন্যে চব্বিশশো খরচ করতে চান কোন মূর্খ! শিবরাম চক্রবর্তীর গল্প মনে পড়ল। ডাক্তার তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন ঘণ্টায়-ঘণ্টায় কিছু খেয়ে যেতে। তাহলে দিনে চব্বিশবার খেতে হয়। অথচ শিবরামদা ঘুমাতে ভালোবাসতেন এবং তা বারো ঘণ্টার কম নয়। রইল বাকি বারো। এর মধ্যে তাঁর স্নান প্রাকৃতিক কর্ম করার জন্যে এক ঘণ্টা এবং অন্যান্য কাজের জন্য একঘণ্টা ব্যয় হত। রইল দশ ঘণ্টা। শিবরামদা বলেছিলেন, দশ ঘণ্টায় চব্বিশ বার খেতে হবে ডাক্তারের বিধান মানলে। বিধান মানে জানো? চৌদ্দ ঘণ্টা যদি ফালতু চলে যায় তো ঘণ্টায়-ঘণ্টায় খাওয়ার লোভ দেখানো কেন বাপু! অতএব ডাক্তারকে বললাম, পাকা কাজ নয়, ঠিকা কাজ করব। দশ ঘণ্টায় কবার খাব বলুন। মানুষের তো ক্ষমতা অসীম নয়। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া, কারণ তিঁনি মহামানুষ।

তাই বলে চব্বিশশো টাকা কম কথা। কেন্টকে ম্যাগাজিনটা দিতে চাইলাম, 'তুমি এটার গতি করো।' কেন্ট হাসল, 'ওইসব বিজ্ঞাপন হল, আরবদের জন্যে। তৃতীয় বিশ্বের কিছু-কিছু লোক লোভে পড়ে ওখানে চলে যায়। কিন্তু তুমি এত বিচলিত কেন?'

বললাম, দ্যাখো আমাদের দেশে এককালে অর্থবানরা রাত কাটাতেন বাইজির বাড়িতে অথবা বাগানবাড়িতে। তাতে তাদের সম্মান হানি হত না। তখন টাকার দাম বেশি ছিল। এখন কেউ প্রকাশ্যে ওসব করতে সাহস পায় না। টাকার দামও কমেছে। কিন্তু অতিবড় সুন্দরীও এই অঙ্ক স্বপ্নে ভাবতে পারবে না। আমাদের দেশে যাঁরা জীবিকায় আছেন এবং থাকবেন তাঁরা যদি কোনওরকমে পাশপোর্ট ভিসা করে এদেশে চলে আসেন তাহলে ফুলে ফেঁপে কী যে হয়ে যাবেন।'

কেন্ট হোহো করে হাসল। তারপর বলল, 'তোমাকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।' আমার পাঠকরাও কি পারছেন। নিশ্চয়ই অনেকের নাক ইতিমধ্যে কুঁচকে উঠেছে। বেশ অশ্লীল-অশ্লীল গন্ধ পাচ্ছেন। ছেলেবেলায় একবার পথ হারিয়ে আমি জলপাইগুড়ির স্বৈরিণী পাড়ায় ঢুকে পড়লাম ভরবিকেলে। তারা আমাকে খুব আদর করেছিল। দশ বছর বয়সে ওদের দেখে একবারও অশ্লীল বলে মনে হয়নি। আসলে শব্দটাকে জানতাম না বলেই কোনও বোধের উদ্রেক হয়নি। অতএব সানফ্রান্সিসকোতে যেটা স্বাভাবিক তা বঙ্গসন্তানদের কাছে অশ্লীল বলে মনে হতেই পারে। দু-চারজন ছাড়া, যাদের কাছে অশ্লীল শব্দটির প্রকৃত ব্যাখ্যা অস্পষ্ট।

ম্যাগাজিনটা থেকে সেই সমুদ্রসৈকতে পঞ্চাশ ডলারে থাকা-খাওয়ার টেলিফোন নম্বর টুকে নিলাম কাগজে। বিজ্ঞাপনটি পড়ে কেন্টও ঠাহর করতে পারল না এটি একই ব্যবসায়ের কিনা।

হোটেল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে বসে প্রথমে চলে এলাম সমুদ্রের ধারে, বন্দরে। এইটুকুনি আসতে মনে হল, চৌরঙ্গি পাড়া দিয়ে চলেছি। রাস্তাগুলো খুব বেশি চওড়া নয়। আর ফুটপাত ভরতি লোক। একমাত্র নিউইয়র্ক ম্যানহাটন টাইমস্কোয়ার ছাড়া অন্য কোথাও যা দেখিনি। আর সেই জনতায় শুধু আমেরিকান নয়, চিনে, আরব থেকে জাপানি, পাঞ্জাবি পর্যন্ত চোখে পড়ল।

বন্দরে বেশ কয়েকটা জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। বেশ বাতাস বইছে। লস এঞ্জেলসের মতো গরম নেই এখানে। কেন্ট দশ মিনিটের জন্যে ওর এক পরিচিতের সঙ্গে দেখা করতে গেল। আর আমি জাহাজটার সামনে বিশাল চাতালে নাটক দেখছিলাম। শম্ভু মিত্র অনেককাল আগে বিভাব করেছিলেন। খালি স্টেজে কল্পিত আসবাব নিয়ে নাটক। চমৎকার হয়েছিল। পরবর্তীকালে বাদল সরকার যে আর এক ধরনের নাট্য আন্দোলন করছেন তাতেও শুধু কুশীলব হলেই চলে যায়। কালো ছেলে মেয়ের এই দলটি নাটক করছে শরীর এবং অভিনয় শক্তি ব্যবহার করে চাতালের ওপর স্টেজ এবং আসবাব ছাড়াই। শুধু পেশির সঞ্চালনে অভিনেতা অনেক কিছু বোঝাতে'

পারেন। অভিনেতা অভিনেত্রীদের দেখে মনে হচ্ছিল, এঁরা জিমন্যাস্টিকের পরীক্ষায় পাশ করে এসেছেন। পথনাটিকা বলে এদেশে যে মোটা দাগের ব্যাপার নির্বাচনের আগে করা হয় তা এর ধারে কাছে আসতে পারে না। অভিনয়ের শেষে টুপি পেতে-পেতে দর্শকদের ভালোবাসার দান নিল কুশীলবেরা।

সমুদ্রের ধারে বেঞ্চিতে এসে বসলাম এবং তখনই গেরুয়া বসনা, মাথায় ঘোমটা, রসকলি আঁকা, গেরুয়া উলের চাদর জড়ানো এক মহিলা পাশে বসলেন। হরেকৃষ্ণ।

চমকে উঠলাম। 'আপনি হরেকৃষ্ণ পার্টি করেন?'

'পার্টি বলছেন কেন? আমি কৃষ্ণের সেবিকা। আপনি তো বাঙালি। আমি নবদ্বীপে ছিলাম কিছুদিন। বাংলা বলতে পারি।' তিনি হাসলেন।

ভাঙা বাংলা শুনে কোনও সন্দেহ রইল না জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে আপনাদের আশ্রম আছে?'

তিনি মাথা নাড়লেন, 'আছে। তবে প্রচার করতে দেয় না। লুকিয়ে চুরিয়ে করতে হয়। এই যে লিফলেট।' চাদরের তলায় কাগজ দেখালেন, 'কলসির কানা মারুক তাই বলে' কথা শেষ করতে পারলেন না মহিলা। আচমকা বেঞ্চি থেকে উঠে দুদ্দাড় দৌড়লেন বাঁ-দিকে। দেখলাম ডান দিক থেকে একজন পুলিশ অফিসার আসছেন। মহিলা এমনভাবে মিলিয়ে গেলেন যেন তিনি বাতিল বলে ঘোষিত কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মী। কৌতূহল হল। চটপট উঠে বাঁ-দিকে হাটতে লাগলাম। পুলিশ অফিসার সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে আমাকেও দেখছেন। অপরাধ তো কিছু করিনি। সমুদ্রের ধার ছেড়ে একটা গলির মধ্যে ঢুকলাম। এখান দিয়েই কৃষ্ণপ্রেমিকা গিয়েছেন। দুপাশে দোকান। অনেকটা দার্জিলিঙের ধাঁচের। এবং আর কয়েক পা হাঁটতেই মহিলাকে দেখতে পেলাম। অত্যন্ত সিরিয়াস ভঙ্গিতে এক বৃদ্ধকে তিনি কিছু বোঝাচ্ছেন বন্ধ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। কাছাকাছি হতেই শুনলাম মহিলা বলছেন, 'নো, নট দ্যাট, হি ইজ আওয়ার ফ্রেন্ড, আওয়ার লর্ড, হি ইজ কৃষ্ণ, ইউ ক্যান গেট পিস, লাভ, অ্যান্ড ইভরিথিং। তোমাকে কিছুই করতে হবে না, শুধু দু-বেলা বলবে হরেকৃষ্ণ হরেরাম। বলো আমার সঙ্গে হরেকৃষ্ণ।

চুপচাপ ফিরে এলাম। কেমন একটা বোধ মনের মধ্যে তৈরি হল যা ব্যাখ্যা করা মুশকিল। আমি কোনওদিন কৃষ্ণভক্ত তো দূরের কথা, ধর্মীয় সংগঠনগুলো কর্তৃক আকর্ষিত বোধ করিনি। বৈষ্ণব পদাবলি অথবা চৈতন্য চরিতামৃত পড়েছি সাহিত্য হিসেবে। তার কাব্যধর্মিতায় মজেছি। কিন্তু ওই পর্যন্ত। হৃদয়ের তাৎক্ষণিক ভালোলাগা জীবনের সঙ্গে জড়াতে চাইনি। আমার শাক্তপদাবলিও ভালো লাগে। কথামৃত তো প্রায় বেদের মতো অমৃতসমান। জড়াতে গেলে তো সবার সঙ্গে জড়িত হতে হয়। কিন্তু এই মহিলা আমাকে অস্বস্তিতে ফেললেন অন্য কারণে। একজন মিশনারি যখন পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে প্রচার করেন তখন আমাদের খারাপ লাগে। কিন্তু দরিদ্র বঙ্গবাসী কিছু সুবিধের আশায় ধর্মান্তরিত হয়ে যিশুকেই শেষ পর্যন্ত আশ্রয় করে থাকেন। বুদ্ধদেব ধর্ম প্রচার করতে বিদেশে দূত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম প্রচারের চেষ্টা শংকরাচার্যের পরই থেমে গিয়েছিল। সানফ্রান্সিসকোতে যদি আমি হরেকৃষ্ণ শব্দ দুটি পুলিশের তাড়া খেয়ে পালানো বিদেশিনী মহিলার কণ্ঠে শুনি তাহলে ব্যক্তিগত প্রতিরোধ থাকা সত্ত্বেও তিনি আমার আত্মীয়া হয়ে যান। তিনি কোন সংগঠনে আছেন, তাদের উদ্দেশ্য কী, এসব চিন্তা মাথায় আসে না।

ফিরে এসে দেখলাম কেন্ট হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে। দেখামাত্র জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় গিয়েছিলেন?'

হেসে বললাম, 'দরকার ছিল।'

আমেরিকান এসকর্টের একটা গুণ, কখনও দ্বিতীয়বার কৌতূহল দেখায় না। ঘড়িতে এখন ছ'টা। অথচ সন্ধে হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। দুজনে সানফ্রান্সিসকোর বন্দরে এলোমেলো হেঁটে

বেড়ালাম। বিচিত্র মানুজন। কিছু গ্রিককে দেখলাম গলা খুলে গান গাইছে। পাশেই চিনে পাড়া। এখানকার চিনে পাড়া খুব বিখ্যাত। আর চিনে পাড়ায় চিনে রেস্টুরেন্ট থাকবে না এটা অসম্ভব ব্যাপার। ভাবতে অবাক লাগে এশিয়ার একটা রাষ্ট্রের মানুষ কীভাবে পৃথিবীর সমস্ত বড় শহরে শুধু জেঁকে বসেনি নিজেদের পাড়াও তৈরি করে নিয়েছে। এখন যে-কোনও গ্রাম্যচিনে পৃথিবীর অন্যতম শহরগুলোতে গেলে নিজেদের ঘর খুঁজে পাবে। কিন্তু এদের থাকতে হয় অনেক প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে লড়াই করে, চিনে পাড়া মানে বিভিন্ন নেশার আড্ডা এমন ধারণার প্রচারই প্রতিবন্ধকতাগুলো তৈরি করতে সাহায্য করছে। তবে কলকাতার ট্যাংরায় চিনেরা যেমন প্রায় দুর্গ বানিয়ে বাস করেন, শহরের মধ্যে থেকেও আর একটি শহর তৈরি করে নিয়েছেন, শুনেছি তাঁরা পৌরকরও দিতে চান না। এতটা স্বাধীনতা এখানকার চিনেরা পায়নি। চিনা ভাষাও অনেক, ধর্মও বিভিন্ন। এবং বেশিরভাগ চিনে অত্যন্ত রক্ষণশীল। বাইরের সম্প্রদায়ের মানুষকে নিজেদের সঙ্গে জড়াতে দেন না।

খিদে পেয়েছিল। একটা ছোট্ট রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। আমাদের অতৃপ্তি মার্কা রেস্টুরেন্ট। কেন্টের চিনে খাবারে আগ্রহ খুব। দুটো লোমেন বললাম। চাওমেন বললে ঠকতে হবে। সেই সঙ্গে মাংসের বড়া। অনেকটা চিলিচিকেন টাইপের। একটা বিশ্রী গন্ধ আছে। কেন্টকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, এই খাবারগুলোর এটাই বৈশিষ্ট্য। টেস্ট ভালো, কিন্তু গন্ধটাও সহ্য করতে হবে।

কলকাতার চিনেরা বুদ্ধিমান। হয় তারা দীর্ঘদিন ভারতবর্ষে থেকে স্বদেশের রান্না ভুলে গিয়েছেন নয় ভারতবাসীর স্বাদ অনুযায়ী নিজেদের রান্নাটা পালটে নিয়েছেন। যদিও সানফ্রান্সিসকোর চিনে রেস্টুরেন্টের খাবার আমেরিকান ছোঁয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

দাম খুব বেশি নয় ম্যাকডোনাল্ডে এইরকমই পড়ে। এতে পেট ভরে না। একজন চিনে পরিচালক মাত্র চার লক্ষ টাকায় সাদা কালো ছবি তৈরি করেছেন সম্প্রতি। এত কম টাকায় আমেরিকায় বসে আজ অবধি কেউ ছবি তৈরি করতে পারেনি। চিনে ভাষায় তৈরি সেই ছবির পাত্রপাত্রী বিভিন্ন শহরের চিনে পাড়া থেকে সংগৃহীত। কাগজে দেখেছিলাম ছবিটি নিয়ে খুব হইচই হচ্ছে। এমনকী তার সাবটাইটেল বানিয়ে আমেরিকানদের দেখানোও হয়েছে। চার লক্ষ দিয়ে ছবি করা যায় কোনও পরিচালক স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না ওখানে। আমাদের দেশে নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়রাও কষ্টেসৃষ্টে ছবি করলে চার সাড়ে চার লাখে গিয়ে দাঁড়ায়। এই চিনে পরিচালকটির সঙ্গে নব্যেন্দুদের যোগাযোগ হওয়া উচিত। শুনেছি ছবির বিষয় আর বলার ধরনেও নাকি ভদ্রলোক চমক সৃষ্ট করতে পেরেছেন। কিন্তু যে জিনিসটা নব্যেন্দুরা পাননি তা হল একটা ছবি থেকেই কয়েক লক্ষ ডলার রোজগার করতে।

দাম মিটিয়ে বেরিয়ে আসার মুখে পাবলিক টেলিফোন নজরে পড়ল। পকেট থেকে কাগজ বের করে বোতাম টিপলাম। সাড়া পেতেই পয়সা ফেললাম। ছিমছাম একটি মহিলা কণ্ঠ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী চাই বলুন?'

বললাম, 'আমি একজন ইন্ডিয়ান, একটা বিজ্ঞাপন দেখে ফোন করছি।'

'হ্যাঁ। বিজ্ঞাপন আমিই দিয়েছি বলুন।'

'ওটা কি এখনও খালি আছে?'

'এখনও। অন্তত জনাদশেক ভালো মানুষের ছেলে এসে দেখে গিয়েছে। একজন বলেছে আগামী সপ্তাহ থেকে এসে থাকবে। আপনি ক'দিন থাকবেন?'

'কয়েকটা দিন।'

'আপনি ইন্ডিরা গান্ডির দেশের লোক?'

'হ্যাঁ।'

'চলে আসুন। এসে দেখে যান। পছন্দ উভয়পক্ষেরই হলে থাকতে পারেন। ঠিকানাটা বলছি লিখে নিন। আমি কেন্টকে রিসিভার দিলাম, ও আমরা চেয়ে ভালো বুঝতে পারবে।

॥ ২১ ॥

একটা জিনিস লক্ষ করেছি, আমার তরল আচরণ কেন্টের ভালো লাগল না। অবশ্য এই ভালো না লাগাটা ও কখনই সক্রিয়ভাবে বোঝাত না। ওকে আমার প্রায়ই দার্শনিক মনে হত। যে-কোনও কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবে এবং মনে-মনে তার বিশ্লেষণ করে। রসিকতা করে খুব সৌজন্য রেখে। শিল্প-সাহিত্যের কোনও তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পেলে খুশি হয়। তখন ওকে দেখে খুব সিরিয়াস বলে মনে হয়। অতএব হোটেল থেকে টেলিফোনে জিজ্ঞাসাবাদ করাটাকে কোনওক্রমে সহ্য করলেও আমি যে ওই মহিলার বাংলোয় যেতে চাইব, তা বিশ্বাস করতে পারেনি সে। সত্যি কথা বলতে কী কেন্ট-এর সঙ্গে আলাপ হলে আমেরিকান জাত সম্পর্কেই অন্যরকম ধারণা তৈরি হয়ে যাবে। আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীনেরা কেন্টের মতো একজন বংশধর পেলে বুক ভরে নিশ্বাস নিতে পারেন।

কেন্ট বলল, 'মজুমদার, আমরা তো একটা ভালো হোটেলেই আছি, ওখানে যাওয়ার কী খুব প্রয়োজন আছে? দূরত্বটা অবশ্য কিছু নয়, তবুও।'

বললাম, 'কেন্ট, আমি একটু ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসি। একটা সময় ছিল যখন আমার থাকার জায়গা ছিল না কলকাতা শহরে। তখন আমি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে-ঘুরে থাকতাম।'

বাক্যব্যয় না করে সে আমাকে নিয়ে গাড়িতে উঠল। সমুদ্রের ধারে যাওয়ার জন্যেই সম্ভবত সমুদ্র ছেড়ে ভেতরে ঢুকলাম। কেন্ট জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ঘুরে-ঘুরে থাকতে বললে। তোমাদের দেশে যাযাবর আছে বলে মনে হয় না।'

বললাম, 'যাযাবর আছে। তবে তারা জাতে বাঙালি নয়। ঘুরে-ঘুরে থাকতাম মানে একসময় কলকাতা শহরের হেন জায়গা কম ছিল যেখানে আমি থাকিনি। পাক্কা ছ'মাস তিরিশ টাকায় মাস চালিয়েছি। একটাকা দিনের জন্য বরাদ্দ। তাতেই খাওয়া ঘোরা। অথচ সেই সময় একটুও কষ্ট হত না।'

কেন্ট আমার দিকে তাকাল, 'ইন্টারেস্টিং। তারপর?'

আমি ছোট চোখে তাকালাম। আমেরিকানরা ইন্টারেস্টিং বললে, নাকি বোঝায় তোমার গল্প আর আমার ভালো লাগছে না, বলছ তাই শুনছি। কিন্তু কেন্টের মুখ দেখে আমার তা মনে হল না। কিন্তু সানফ্রান্সিসকোর সমুদ্র আবার দেখা যাচ্ছে। এইসময় মাঝরাত্রে কুকুরের চিৎকার সামলে সুনীলদার অনুমতিতে পাওয়া তাঁর অফিসের টেবিলে শুতে যাওয়ার গল্প বলতে একদম ভালো লাগল না। একটা সময় ছিল যখন অভাব চারপাশ থেকে ঘিরে ধরত অথচ অভাবটাকে আমল দিতাম না বলেই কষ্ট পেতাম না। এখন আরামের প্রায় চূড়োয় উঠে সেই দিনগুলোকে মনে পড়লেই ঘটনাটা শোনাই পাঁচজনকে। দেখাই, আহা কী লড়াই করতে হয়েছে আমাকে। একেই যন্ত্রণাবিলাপ বলে কি না জানি না। কিন্তু চোখ বন্ধ করলে তখনকার আমার মুখকে অত কষ্টেও যখন দুঃখী-দুঃখী বলে মনে হয় না তখন তার গল্প বলে বুক ফুলিয়ে কী লাভ। দ্যাখো কী কষ্টে ছিলাম বলার সময় কি আড়ালে থাকে না এই কথাটা, এটাও দ্যাখো আমি কোন স্তরে উঠে এসেছি?

অতএব কেন্টকে বললাম, 'ওসব পুরোনো গল্প আর আমার ভালো লাগে না। এখন নতুন অভিজ্ঞতার জন্যে বেঁচে আছি। আশা করি, আজ সেরকম একটা কিছু হবে।'

কেন্ট অবাক হল, কিন্তু কিছু বলল না। ছেলেটির গুণ এইটেই। বুঝে নিতে পারে কখন থামতে হয়। একবার মাথা নেড়ে সে নিবিড় মনে গাড়ি চালাতে লাগল।

সমুদ্রের ধার রাস্তা ঘেঁষে চলে গিয়েছে। মাঝে-মাঝে সাইনবোর্ডে দিকনির্দেশ করা রয়েছে। কেন্ট বারংবার সেটা যাচাই করছিল। এদিকটায় বসতি বেশি নেই। বালি আছে, কিন্তু তার ওপব

ঘাসও রয়েছে। আকাশে দিব্যি আলো ফুটে রয়েছে। ঢেউ খুব মারাত্মক নয় কিন্তু মৃদু আওয়াজ তুলছে। রাস্তাটা যেখানে বাঁ-দিকে বাঁক নিয়েছে সেখানেই শুরু হয়েছে আর একটা কাঁচা রাস্তা যেটা সমুদ্রের দিকে নেমে গিয়েছে। কটেজটা তার গায়ে। পাশাপাশি পরপর তিনটে কটেজ। প্রথমটির নীচতলায় অফিস। গাড়ির আওয়াজ পেয়ে এক দীর্ঘাঙ্গিনী সিগারেট হাতে বেরিয়ে এসে দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। মুখ দেখে মনে হচ্ছে পঞ্চাশে পা দিয়েছেন কিন্তু শরীর দেখে বোঝা যাচ্ছে না। আমেরিকার যে-কোনও শহরের চেয়ে লস এঞ্জেলস্ এবং সানফ্রান্সিসকোতে বেশি গরম পেয়েছি, তবু সানফ্রান্সিসকো লস এঞ্জেলস্-এর চেয়ে অনেক বেশি আরামদায়ক। কিন্তু এখানকার সমুদ্রের ধারে মহিলাদের পোশাক স্বল্প হয়ে যেতে লক্ষ করেছি। ইনি পরেছেন একটা খাটো প্যান্ট আর হাতকাটা গেঞ্জি। আমরা গাড়ি থেকে নামতেই সিগারেট না ধরা হাত আকাশের দিকে তুলে বললেন, 'হা-ই।' ওয়েলকাম। ওয়েলকাম ইন মাই প্যারাডাইস।'

সুন্দরী ছিলেন অবশ্যই। এবং ছিলেন বলাটা যুক্তিসঙ্গত কি না তা নিয়েও একটু ভাবতে হবে। শুধু মুখ কিংবা শরীর নয়, মেয়েদের সৌন্দর্য যে তাদের বলার ধরনে, দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে হাঁটাচলাতেও এই ধারণা নিরানব্বুইভাগ বঙ্গললনা খেয়ালেই আনেন না। ওইসব কুশলী একাংশকে সাধারণ মানের হলেও অসাধারণ দেখায়। ইনি সেই কায়দাটি জানেন। কেন্ট আর আমি পাশাপাশি এগিয়ে যেতেই তিনি সিগারেট না ধরা হাতটি বাড়িয়ে করমর্দন করলেন। সেটি ডান হাত নয়। এবং স্কাউটেই শুনেছি বাঁ-হাতে করমর্দন করার চল ছিল। ভুল হলেও হতে পারে। কেন্ট আমার পরিচয় দিল; তিনি তাঁর অফিসঘরে আমন্ত্রণ জানালেন। হোটেলের অফিসঘর যেমন হয় এটিও তেমনি। তফাত শুধু আমাদের চেয়ারে বসতে বলে তিনি দু-হাতের পাঞ্জায় ভর করে শরীরটাকে টেনে টেবিলের ওপর রাখলেন, 'আপনি সমুদ্র ভালোবাসেন? ওহো। তাহলে তো আপনার সঙ্গে আমার খুব মনের মিল। আসলে আমার ষষ্ঠ স্বামীর সঙ্গে এখানে বেড়াতে এসে মনে হল যদি কটেজ করা যায় তাহলে আমার মতো অনেক সমুদ্রপ্রেমিকা চমৎকার থাকতে পারবে। ব্যস, যেই ভাবা সেই কাজ।'

কেন্ট জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি আর আপনার স্বামী মিলেই এটা চালান?'

'না। আমি একাই একশো। ওর সঙ্গে গতবছর ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে।'

মহিলার কথা শোনামাত্র কেন্টের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। এ ছোকরার নিশ্চয়ই পশ্চিমবাংলায় জন্মানো উচিত ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার কটেজ খালি আছে?'

'দুজনেই থাকবেন?'

কেন্ট আমার দিকে অসহায় চোখে তাকাল। আমি হেসে বললাম, 'না। আমি একাই থাকব। কিন্তু আমি সমুদ্র দেখতে পাব এমন জানলা চাই।'

'সরি জেন্টলম্যান। সুমদ্র দেখতে হলে দু-পা হেঁটে আপনাকে সমুদ্রের কাছে যেতে হবে। আমি ইচ্ছে করেই জানলাগুলো এমনভাবে করিয়েছি যাতে সমুদ্র না দেখা যায়। হি ইজ সো বিগ, আমরা একে এটুকু অনার দেব না কেন?' বলেই মহিলা চোখ বন্ধ করে কাঁধ ঝাঁকালেন।

'আপনি কিন্তু বলেননি ঘর খালি আছে কি না?'

'নেই। একার জন্যে নেই। কিন্তু আপনি আর একজনের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন। ইনফ্যাক্ট আমার কটেজের প্রতিটি রুমই ডবলবেডেড। দামি জিনিস সঙ্গে থাকলে লকারে রেখে যান। সকাল থেকে রাত যা-যা প্রয়োজন সব পেয়ে যাবেন। আপনার কি মনে হয় না দামটা খুব সস্তা?'

'খুব। তবে অজানা লোকের সঙ্গে থাকাটা কন্সিডার করলে।'

'দ্যাটস নাথিং। আপনাকে একদিনের টাকা অ্যাডভ্যান্স দিতে হবে।'

'আমি একবার একটু ঘুরে দেখতে চাই।'

'ও সিওর। চলুন আমি দেখাচ্ছি।'

মহিলার সঙ্গে বাইরে এলাম। বালির ওপর সমুদ্রের জল গড়িয়ে-গড়িয়ে আসছে। আকাশ রং পালটাচ্ছে। হাওয়া দিচ্ছে চমৎকার কিন্তু দিন নেভেনি।

মহিলা বললেন, 'আগে একটু সমুদ্রের গা ঘেঁষে হাঁটুন। মন ভালো হবে।'

হাঁটলাম। এই নির্জন বালুবেলায় জোড়ায়-জোড়ায় সাদা নারীপুরুষ শুয়ে আছে, এবং একমাত্র কটি বস্ত্র ছাড়া তাদের অঙ্গে কোনও বাহুল্য নেই। বেশিরভাগই উপুড় হয়ে এবং সমুদ্রের জল তাদের শরীর বেয়ে ঘাড় অবধি উঠে আবার নেমে যাচ্ছে। মহিলা বললেন, 'দিস ইজ হেভেন, তাই না?'

এবং তখনই আমি আর কেন্ট একসঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমাদের চোখের সামনে এক জোড়া নারী পুরুষ চিৎ হয়ে শুয়ে। নারীটির শরীরে কিঞ্চিৎ বস্ত্র রয়েছে। ওদের চোখ বন্ধ। এবং নারীটি আমাদের দুজনেরই চেনা।

কেন্ট প্রথম কথা বলল, 'মাইগড! শি ইজ হিয়ার!'

মহিলা ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার কথা বলছ! ওহো! ওরা। সো সুইট। ওরা কাল বিকেলেই পৌঁছেছে। হনিমুন ট্রিপ। ওদের চেনো তোমরা?'

কেন্ট বলল, 'মহিলার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল।' বলতে না বলতে পুরুষটি চোখ খুলে পাশ ফিরে নারীটিকে চুম্বন করল। নারী চোখ বন্ধ করেই হাসল। আমরা দ্রুত জায়গটাকে এড়িয়ে এলাম। কেন্টকে বললাম, 'দ্যাখো, সেই বিকেলে বেচারা হন্যে হয়ে স্বামী খুঁজছিল যাতে আমেরিকায় থাকতে পারে বিয়ে দেখিয়ে। ভাগ্যবতী বলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে স্বামী পেয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, সেই স্বামী হনিমুনে নিয়ে এসে আদর করছে। আমাদের তো খুশি হওয়াই উচিত কী বলো?' কেন্ট মাথা নাড়ল, কোনও উত্তর দিল না।

বেশিরভাগ কটেজের দরজায় তালা। মহিলা বললেন, 'আগে আমার এখানে তালা দেওয়ার রেওয়াজ ছিল না। মাঝখানে চুরি হতে আরম্ভ করল, তাই বোর্ডারদের তালা চাবি দিয়েছি।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠে লম্বা বারান্দা। দুপাশে দুটো ঘর। বারান্দায় চেয়ার রয়েছে। একটা ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে। অন্যটা আধখোলা। মহিলা দরজায় শব্দ করলেন, 'আমরা ভেতরে আসতে পারি?' ভেতর থেকে নারীকণ্ঠের আওয়াজ বেরুল, 'তিরিশ সেকেন্ড।'

কেন্ট ওঠেনি। সে বালির চরে দাঁড়িয়ে সূর্য দেখছে। সমুদ্রের ওপর নেমে এসেছে অনেকটা। লালে লাল আকাশ-সমুদ্র। এবার ভেতর থেকে আহ্বান এল। মহিলা আমার দিকে ইঙ্গিত করে ভেতরে ঢুকলেন। ওপাশের জানলা খোলা। তাই দিয়ে কিছু আলো ঢুকছিল। এ পাশের খাটের গায়ে পড়ার বাতি জ্বলছে। যিনি শুয়ে আছেন তাঁর হাতে বই ধরা। সেই অবস্থায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার কাছে এসেছেন।'

মহিলা বললেন, 'না-না, আপনি পড়ুন।' তারপর আমার দিকে ঘুরে বললেন,

'এইটে আপনার খাট। পাশে একটা ছোট টেবিলও আছে। ওপাশে টয়লেট যা ওঁর সঙ্গে শেয়ার করতে হবে। চমৎকার ব্যবস্থা। কি পছন্দ হয়েছে তো?'

আমি আর একবার পার্শ্ববর্তিনীকে দেখলাম। অমন বিশাল চেহারা এ জীবনে আমি দেখিনি। শুয়ে আছে, তবু মনে হল পাঁচ ফিট এগারো কি ছ'ফিট লম্বা। ছেলেবেলায় একজন মহিলাকে আমি মুভিং ক্যাসেল বলতাম আড়ালে। তিনি এঁর কাছে শিশু। যেন বিছানায় একটি বিশাল তিমি শুয়ে আছে, যার ঊর্ধ্বাঙ্গে আল্পস, মাঝখানে কুলু ভ্যালি এবং নিম্নাঙ্গে বিন্ধ্যাচল পর্বত দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। মহিলা না ফরসা না কালো। মাথার চুলে কোঁকড়ানো ভাব আছে। আমার দৃষ্টি লক্ষ করে মালকিন বললেন, 'আপনার রুমমেট খুব পড়ুয়া। দিনরাত পড়ে বলে সমুদ্র দেখার সময় পায় না।'

তৎক্ষণাৎ ওই বিশাল শরীর থেকে মিহি গলায় শব্দ বেরিয়ে এল, 'ভুল হল। সমুদ্র দেখতে চাই না কিন্তু শব্দ শুনতে চাই।'

বললাম, 'সূর্যাস্ত হচ্ছে, বাইরে গিয়ে দাঁড়ালে হয় না।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার মুখে দেখলাম মহিলার বালিশের পাশে স্তূপ করে রাখা আছে পর্নো পত্রিকা। এবং তাতেই তিনি ধ্যানমগ্না। হাতের বইটি সেই শ্রেণির হওয়াটাই মনে হল স্বাভাবিক। বালিতে নেমে সরাসরি করলাম, 'এই মহিলার সঙ্গে আমাকে একঘরে থাকতে হবে?'

'ওহো! ও মোটেই খারাপ নয়। গতবছরও এসেছিল। কেউ ওর বিরুদ্ধে কোনও কমপ্লেন করেনি। একটু মোটাসোটা বটে, কিন্তু তোমার কী? তুমি এসেছ সমুদ্রের কাছে। দ্যাখো, সারাদিন রাত এখানেই পড়ে থাকবে।' হাত নেড়ে সমুদ্রতট দেখিয়ে দিলেন তিনি। এই প্রথম কেন্ট আমার কোনও ব্যাপারে নাক গলাল। বোধহয় বেচারা আর চুপ করে থাকতে পারছিল না, বিনীতভাবে বলল, 'আপনি জানেন না, ইনি তো ভারতীয়, আর ভারতীয়রা কখনই অপরিচিত মহিলার সঙ্গে এক ঘরে রাত কাটায় না।'

আচমকা একরাশ বিরক্তি যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ভদ্রমহিলার মুখে, 'তোমরা এখানে পৌঁছোলে কীভাবে? ওই কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে, তাই না? ওই কাগজ যখন কোনও ভারতীয় পড়ে তখন সে একজন পাঠক হিসেবেই পড়ে নিশ্চয়ই। আর ভারতীয় বলছ? এই তো গত সপ্তাহেই একজন এসেছিল। কী নাম যেন হ্যাঁ, হ্যারি মিটার। আমাকে ভারতীয় দেখাতে এসো না তোমরা। সোজা কথা বলো, থাকবে কি থাকবে না? আমার যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়ে গিয়েছে।'

কেন্ট সম্ভবত চূড়ান্ত কথাটাই বলতে যাচ্ছিল, ওকে বাধা দিয়ে বললাম, 'আপনি খুব রেগে গিয়েছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন অত মোটা মানুষ এক ঘরে থাকলে আমার ঘুম হবে না। তা ছাড়া আমার খুব নাক ডাকা অভ্যাস। ওঁরও অসুবিধে হবে। আপনি যদি আমাকে পুরো ঘর দেন, তাহলে ভালো হয়।'

ঠোঁট কামড়ালেন মহিলা, 'নাক ডাকে তা এতক্ষণ বলোনি কেন? আচ্ছা, আধঘণ্টা এখানে ঘোরাফেরা করো, আমি দেখছি।' বলে তিনি বড়-বড় পা ফেলে চলে গেলেন তাঁর অফিসঘরের দিকে।

কেন্ট এবার শব্দ করে হেসে ফেলল, 'ও সত্যি, তোমার মাথায় চমৎকার বুদ্ধি খেলে। নাক ডাকার ব্যাপারটা আমার বুদ্ধিতে কখনই আসত না। আমরা কি এবার শহরে ফিরে যেতে পারি?'

হেসে বললাম, 'উনি যে অপেক্ষা করতে বললেন।'

জানতাম এতে কেন্ট খুব বিরক্ত হবে। বলল, 'সত্যি কি তুমি এইখানে থাকতে চাও। আমি তোমাকে বুঝতে পারছি না।'

'এখানে থাকতে অসুবিধা কী আছে! নিজের মতো একটা ঘর পাওয়া গেলে, আর যাই হোক এটা তো কোনও ব্রথেল নয়।'

'না, তা নয়। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সিঙ্গল মানুষরা এখানে ক'দিন এসে অন্যের সান্নিধ্য নিয়ে যায়। মালকিনকে দেখে মনে হল যে রেট তিনি বিজ্ঞাপনে বলেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি অন্য খাতে নিয়ে নেবেন।'

কেন্টের কথাগুলো এর আগেই আমার মাথায় এসেছে। একেবারে স্বাস্থ্যনিবাস এটা নয়। কিন্তু এতক্ষণ থেকেও আমরা কোনও গর্হিত ব্যাপার দেখতে পাইনি। আমেরিকান উপন্যাসে যেসব সমুদ্রতীরের কটেজের বর্ণনা পড়েছি তার সঙ্গে খুব অমিল নেই বলেই আমার ভালো লাগছিল এখানে এসে। কিন্তু বুঝতে পারছি না প্রতি ঘরে একজন করে মহিলা এখানে অপেক্ষা করেন কি না।

একটু অলসভাবেই আমরা গাড়ির দিকে এগোচ্ছিলাম। সূর্য এখন ডুবুডুবু। সমুদ্র থেকে দুজোড়া নারী পুরুষ কটেজে ফিরছে। হঠাৎ তাদের একজন দাঁড়িয়ে পড়ল। সদ্য বিবাহিত ডরোথি হাত নেড়ে চিৎকার করল কেন্টের দিকে তাকিয়ে, 'হাই!'

'আমি তোমাকে চিনি, কোথায় দেখেছি বলো তো!'

কেন্ট একটু অপ্রস্তুত গলায় বলল, 'হ্যাঁ, আমিও তোমাকে দেখেছি।'

তিন-চারটে জায়গার নাম বলে গেল ডরোথি। কোমর জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডরোথির স্বামী। স্ত্রীর এমন উচ্ছ্বাসে একটু যেন বিরক্ত। মিলছে না দেখে ডরোথি আমার দিকে তাকাল। চোখ ছোট হল, তারপর চেঁচিয়ে বলল, 'লস এঞ্জেলস্। এই তো কয়েকদিন আগে। জানো না? আর ভুল হবে না। তোমরা শুনলে নিশ্চয়ই খুশি হবে যে সেই সমস্যাটা সমাধান হয়ে গেছে। পরের দিনই জনের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। মিট জন, হি ইজ এ নাইস বয়।'

আমরা দুজন বাধ্য হয়েই নিজের নাম বলে জনের সঙ্গে করমর্দন করলাম। জন বলল, 'ডার্লিং, তোমার ঠান্ডা লাগবে।'

ওর গালে হাত বুলিয়ে ডরোথি বলল, 'ও জন, কী ভালো তুমি। ঘর থেকে যা হোক একটা কিছু এনে দাও আমায়, কতদিন পরে দেখা হল আমাদের, একটু কথা বলি। জাস্ট পাঁচ মিনিট, প্লিজ।'

কাঁধ সামান্য নাচিয়ে জন চলে গেল কটেজের দিকে। আমার মনে হল এসব কথার আড়ালে ডরোথি জনকে বলল তুমি কেটে পড়ো আমি পাঁচ মিনিট বাদে আসছি। এবার কেন্ট বলল, 'যাক, তোমাকে নিশ্চিন্ত দেখে ভালো লাগছে। একদিনেই বর পেয়ে গিয়েছ, ইউ আর লাকি।'

'না-না, আমি জানতাম পাব। তবে না পেলে দেশে ফিরে যেতে হত বলে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। একসঙ্গে থাকব বলে সবাই লাফিয়ে আসে কিন্তু বিয়ে করতে বললে, কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না এই দেশে।' বিপদ পার হয়ে এসে পিছু তাকিয়ে যেভাবে মানুষ কথা বলে সেইভাবে বলল ডরোথি।

'জনকে কীভাবে খুঁজে পেলে?' জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না।

'ওয়েল ওটা একটা গল্পই বলতে পারো। আমার এক বান্ধবীর কথায় সেই রাত্রে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এসেছিলাম আগামীকালই বিয়ে করতে চাই। বেলা বারোটা পর্যন্ত কেউ এল না। নট এ সিঙ্গল কল। আমার মনের অবস্থা বুঝতেই পারছ। সেই রাতটা কেটে গেলে পুলিশ আমাকে অ্যারেস্ট করতে পারে বেআইনিভাবে আমেরিকায় আছি বলে। হঠাৎ জনের কথা মনে পড়ল। ওঁর সঙ্গে দুবছর আগে দেখা হয়েছিল। তখন জন বিবাহিত। শুনেছিলাম ওর স্ত্রী ডিভোর্স নিয়েছে। কোর্ট ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে জন ইম্পোটেন্ট। বেচারা খুব মনমরা হয়েছিল। কোনও মেয়ে কাছে ঘেঁষত না। সোজা ওর কাছে চলে গেলাম। আমাকে দেখে জন খুব অবাক হল। আমি একে বিয়ের প্রস্তাবও দিলাম। ও ওর অসুবিধার কথা বলল। আমি বললাম মাইনাস সেক্স পুরুষ মানুষের আলাদা যে অস্তিত্ব আছে আমি তাকে অনার করব। ও যেন প্রাণ ফিরে পেল, আমরা সেদিনই বিয়ে করলুম।'

এইরকম গল্প কি মহাভারতে আছে? ব্যাসদেবের ওপর শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। কিন্তু জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না, 'সবই ঠিক, তবে তুমি তো এখনও যুবতী, নিজের কথা ভেবেছ? মা হতে চাইবে না তুমি?'

ডরোথি রহস্যময় হাসি হাসল, 'দেখা যাক। একবার অভিজ্ঞতা হয়েছে জনের, এবার মনে হয় খুব একটা কনজারভেটিভ হবে না। আচ্ছা, চলি। আমাদের জন্যে তোমরা একটু শুভেচ্ছা রেখ।' হাত নেড়ে কটেজের দিকে চলে গেল ডরোথি।

কেন্ট চাপা গলায় বলল, 'অদ্ভুত!'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'বিয়ের পর ডরোথি আমেরিকান সিটিজেনশিপ পেতে পারে নিশ্চয়ই, কিন্তু তারপর যদি ডিভোর্স হয়ে যায় তাহলে কি ও সেটা হারাবে? তোমার কি মনে হয় কেন্ট?'

কেন্ট হেসে ফেলল, 'মনে হয় না। কিন্তু এভাবে চললে তো একসময় আমেরিকা ডিভোর্সি

মেয়েতে ভরতি হয়ে যাবে।'

আমরা গাড়ির কাছে পৌঁছোতেই একটা পুলিশের জিপ যেন ঝড় তুলে ছুটে এল। আমাদের সামনে ব্রেক কষে দাঁড়াতেই দুজন অফিসার লাফিয়ে নামল। একজন আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনারা এখানে থাকেন?'

কেন্ট বলল, 'না। বিজ্ঞাপন পড়ে দেখতে এসেছিলাম।'

গাড়ির আওয়াজ পেয়ে সেই সুন্দরী দরজায় এসে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'গুড ইভনিং অফিসার্স। গাড়ি অত জোরে চালানো ঠিক নয়। এখানে স্পিড লিমিট চল্লিশ।'

একজন অফিসার শক্ত গলায় বললেন, 'নাই ইউ আর ইন ট্রাবল সারা।'

'ও ফাইন। ট্রাবল ছাড়া আমার চলে না।'

'তোমার এখানে যারা আছে তাদের আমি দেখতে চাই।'

'নো। ইউ কান্ট। তাতে আমার বিজ্ঞাপনের গুডউইল নষ্ট হবে।'

'হু কেয়ার্স।'

'কী ব্যাপার বলো তো? তুমি আজকে অন্যরকম গলায় কথা বলছ। ভেতরে এসো, একটা ড্রিংক নাও। কাম অন।'

'সরি আই অ্যাম অন ডিউটি' তারপর এগিয়ে গিয়ে পকেট থেকে একটা ছবি বের করে দেখাল, 'এই মহিলা তোমার এখানে আছে?'

সুন্দরী ধীরে-ধীরে মাথা নাড়লেন। অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায়?'

'চার নম্বর কটেজে।'

অফিসার ইঙ্গিত করতেই তার সহকারী চলে গেলেন চার নম্বর কটেজের দিকে। সুন্দরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও কী করেছে?'

'ইউ নো বেটার দ্যান মি।'

'আই ডোন্ট নো এনিথিং।'

'দ্যাটস ইওর প্রিভিলেজ। যখনই কিছু জিজ্ঞাসা করি তখনই শুনি তুমি কিছু জানো না। এই মেয়েটি একজন প্রস্টিটিউট। তাতে আমাদের মাথা ঘামানোর কিছু নেই। তুমি তো এদেরই শেল্টার দাও। বাট ওর ব্যাবসা পড়ে যাওয়ার পর ইদানীং ড্রাগ র‍্যাকেটে জড়িয়ে পড়েছে। খুব ভালো ক্যারিয়ার ওর। টেনশন বেড়ে গেছে বলে এখানে রেস্ট নিতে এসেছে। কিছু বলবে?'

সুন্দরী কথা না বলে ঘাড় নেড়ে জানালেন, তার কিছু বলার নেই। আমরা গাড়িতে উঠলাম। পুলিশের জিপকে কাটিয়ে কেন্ট যখন গাড়িতে স্পিড দিচ্ছে তখন দেখলাম দ্বিতীয় অফিসার রিভলবার দেখিয়ে সেই বিশাল শরীরটাকে হাঁটিয়ে আনছে। কেন্ট চাপা গলায় বলল, 'ভগবান তোমাকে আবার ধন্যবাদ।'

॥ ২২ ॥

সানফ্রান্সিসকো শহরে আড্ডাবাজরা বেশ প্রশ্রয় পায়। প্যারিসের রেস্টুরেন্টে একটি অলিখিত নিয়ম আছে। কেউ যদি সেখানে টেবিল দখল করে বসে খাবারের অর্ডার দেয় তাহলে সে নিজে যতক্ষণ দাম চুকিয়ে বেরিয়ে না যাচ্ছে ততক্ষণ তাকে বিল সার্ভ করা হয় না। অর্থাৎ কোনও বেয়ারা এসে বলবে না অনেকক্ষণ বসে আছেন। এবার দামটা দিয়ে কেটে পড়ুন। পরে নিজেরও এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে। প্যারিসের অসীম রায়কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলাম। তাঁর নিজেরও একটি রেস্টুরেন্ট

রয়েছে। অসীমবাবু বলেছিলেন, 'খদ্দের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলেও আমরা কাউকে উঠে যেতে বলি না। একবার বললে চারধারে দুর্নাম ছড়িয়ে যাবে ওর রেস্টুরেন্টে খেয়ে বসতে দেয় না। ব্যস। ভিড় হালকা হয়ে যাবে।' এতে দোকানের মালিকের ক্ষতি হয় না। কারণ রেস্টুরেন্টের খাবারের দাম বেশ বেশি। মনে আছে মধ্যরাতে ক্ষুধার্ত হয়ে প্যারিসের একটি রেস্টুরেন্টে আলো জ্বলতে দেখে ঢুকতে চেয়েছিলাম কিন্তু দারোয়ান বাধা দিয়েছিল। অথচ কাচের দেওয়ালের ওপাশে টেবিলে-টেবিলে নারী পুরুষকে আড্ডা মারতে দেখেছিলাম। দারোয়ান জানিয়েছিল রাত সাড়ে এটারোটায় শেষ খাবার সার্ভ করা হয়ে গেছে। এখন রেস্টুরেন্ট বন্ধ। খদ্দেররা যাঁরা ঢুকেছেন, তাঁদের ইচ্ছে মতন বেরিয়ে যাবেন। মনে হয় তিনটের পরে থাকবেন না। আমাদের দেশে এগারোটা বেজে গেলেই চেয়ারগুলো টেবিলে উঠে যায়। ওদেশে সেটা করে কেউ যদি আড্ডাবাজকে সরাতে চায় তাহলে ঢিঢি পড়ে যাবে।

সানফ্রান্সিসকো অবশ্যই প্যারিস নয়। কিন্তু রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা মারার প্রবণতা আছে। মাঝে-মাঝে কয়েকটা মোড়কে আমার গড়িয়াহাটের মোড় বলেই মনে হয়েছে তবে অত ভিড় নেই। কিন্তু চারপাশে হোমোসেক্সুয়াল আর লেসবিয়ানে ভরতি একটা পাড়া দেখলে যে হৃদয়ে আতঙ্ক ঢোকে তা আগে জানতাম না। একই রাস্তায় হোমো আর লেসবিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুরুষরা পুরুষদের পছন্দ করছে এবং রেস্টুরেন্টে ঢুকে যাচ্ছে। তাদের সাজগোজ ভাবভঙ্গিতে অবশ্যই একটা মেয়েলি ছাপ আছে। আমেরিকান উপন্যাসে তো এদের কথা ছড়িয়ে আছে। অনেক চিত্রতারকা অথবা গায়ক এই রোগে আক্রান্ত। অথচ এরা কিন্তু রোগ বলে মনে করে না। সাধারণ আমেরিকান কিন্তু এদের পছন্দ করেন না। যদিও এ ব্যাপারে কাউকে পাত্তা দেওয়া প্রয়োজন মনে করে না লেসবিয়ানরা। দুটি পুরুষ বা দুটি নারী পরস্পরের কাঁধ জড়িয়ে ধরে হাঁটছে দেখলেই সাধারণ আমেরিকান তাদের হোমো কিংবা লেসবি বলে মনে করেন। কথাটা শুনে আঁতকে উঠলাম। আমাদের দেশে এলে কী বলতেন? মনে আছে কলেজে আমাদের সঙ্গে রবীন নামের একটি ছেলে পড়ত, তার হাবভাব চালচলনে মেয়েলিপনা বড্ড বেশি ছিল। এমনকী মেয়েরা পর্যন্ত তাকে নিজেদের লোক বলেই মনে করত। এই রবীনকে নিয়ে অনেক ছেলের মধ্যে একটা স্নায়ুযুদ্ধ হত মাঝে মাঝেই। যেন সে একটি রমণী এমনভাবেই ব্যাপারটা উপভোগ করত রবীন। ও মেয়েদের গলায় চমৎকার গান গাইত। পরে ভেবে দেখেছি যেসব ছেলে মেয়েদের কাছে একদম পাত্তা পেত না তারাই রবীনের আপাত সান্নিধ্য চাইত। শুনেছি রবীন এখন কোনও স্কুলে পড়ায়, বিয়ে থা করে ছেলের বাবাও হয়েছে। কিন্তু সানফ্রান্সিসকোতে এসে রবীনের কথা খুব মনে পড়েছিল। তবে রবীনের পোশাক ছিল সাধারণ ছেলেদের মতো।

কেন্টের পছন্দ হচ্ছিল না ফুটপাতে দাঁড়াতে। হঠাৎ ঠান্ডা হাওয়া নেমেছে। আমাদের পাশে একটি মেয়ে সর্বাঙ্গ চামড়ার পোশাকে মুড়ে দাঁড়িয়ে আছে হাতে সিগারেট নিয়ে। চট করে রাত ন'টায় পার্ক স্ট্রিটের কথা মনে আসে। কিন্তু মেয়েটি আমাদের দিকে মোটেই তাকাচ্ছে না। আমাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর কোনও আগ্রহ নেই। বছরতিরিশের মধ্যে বয়স এবং সত্যিই সুশ্রী। চুল ছেলেদের মতো ছাঁটা। কেন্ট গম্ভীর গলায় বলল, 'শি ইজ লেসবি।' কোনওরকম বিদ্রূপ নেই গলায়। যেন উনি একজন ইঞ্জিনিয়ার এইরকম ভঙ্গিতে উচ্চারণ। মিনিটখানেকের মধ্যে উলটে ফুটপাতে পরির মতো সুন্দরী এক যুবতীকে দেখা গেল। পরনে সাদা ঝালোর দেওয়া গাউন, পিঠের মাঝামাঝি চুলের ঢল। আমাদের পার্শ্ববর্তিনীকে দেখামাত্র সে হাত তুলে চিৎকার করে উঠল খুশিতে। দেখলাম, পার্শ্ববর্তিনী শুধু মাথা দুলিয়ে সেটি গ্রহণ করলেন। মেয়েটি প্রায় উন্মাদিনীর মতো ছুটে পেরিয়ে এল চওড়া রাস্তা। এসে দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল পার্শ্ববর্তিনীকে। তিনিও মেয়েটিকে সামান্য আদর করলেন। তারপর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় ঢুকে গেলেন পাশের রেস্টুরেন্টে। বিশ্বাস করুন, একটি পুরুষ এবং একটি নারী যদি দৃশ্যটিতে থাকত তাহলে ঘটনাটাকে প্রেমের বিশেষ নিদর্শন বলে ভাবতে

একটুও খারাপ লাগত না। আমার অনভ্যস্ত চোখ কটকট করছিল। কেন্টকে সেটা বললাম। দার্শনিকদের মতো কেন্ট কিছু কথা বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি কখনই এসব করব না। কিন্তু ধরো যৌনজীবন বাদ দিয়ে নারী এবং পুরুষ পরস্পরের কাছে যা-যা পেতে পারে তা একজন নারী যদি আর একজন নারীর কাছে অথবা পুরুষ যদি আর একজন পুরুষের কাছে পেয়ে গিয়ে সুখী হয় তাহলে আমার কী বলার থাকতে পারে?'

সত্যি কথা। আমাদের দেশে চিরকাল যৌনতাকে আড়ালে রাখা হয়েছে। যৌনজীবন সম্পর্কে বাল্যকাল বা যৌবনে কোনওরকমে কৌতূহল মেটানোর কথা অভিভাবকরা স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না কিছুকাল আগে। ইদানীং স্কুলে পাঠ্য হিসেবে ছেলেমেয়েরা বিশদ জানতে পারছে। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে আমরা যখনই কিছু ভেবেছি তখন যৌনজীবনকে বাদ দিয়েছি সচেতনভাবে। রাধা এবং কৃষ্ণের মধ্যে ওই সম্পর্কে কথা যেমন আমরা চিন্তাও করতে পারি না তেমনি প্রেম সম্পর্কিত ভাবনা ভাবতে গেলে নরনারীকে অতীন্দ্রিয় ভাবতেই ভালো লাগে। সেক্ষেত্রে দুজন লেসবিকে মেনে নিতে এত অস্বস্তি হচ্ছে কেন? অস্বীকার করব না, লেসবিদের দেখতে যতটা খারাপ লাগেনি হোমোদের দেখতে তার চেয়ে অনেক খারাপ লেগেছে। কেমন যেন ঘিনঘিনে ভাব এসেছে মনে। অথচ তারা কোনও অশালীন আচরণ করেনি আমাদের সামনে। পুরুষ বলেই এইরকম অনুভূতি হল কি না জানি না।

খিদে পেয়েছিল জব্বর। একটা বড় রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম আমরা। প্রতিটি টেবিল ভরতি। আর মাঝে মাঝেই উচ্চস্বরে চিৎকার এবং হাসি ছিটকে উঠছে। সাধারণত কোনও টেবিল আগে থেকে কারও দখলে থাকলে সেখানে চেয়ার খালি পেলেও বসা শোভন নয়। কিন্তু কেন্ট আমাকে যে টেবিলে নিয়ে এল সেখানে একজোড়া বৃদ্ধ দম্পতি রয়েছেন। পাকা ফলের মতো টুকটুকে শরীর। বৃদ্ধা একদা নিশ্চয় দারুণ সুন্দরী ছিলেন। হাত মুখে নাড়ার সময় এখনও অহঙ্কার ফুটে উঠেছে। কেন্ট জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা আপনাদের সামনে বসতে পারি?'

বৃদ্ধ বৃদ্ধার দিকে তাকালেন। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি কি জানতে পারি তোমরা ওই ওদের দলে পড় কি না?'

কেন্ট হেসে ফেলল, 'না। উনি আমেরিকায় বেড়াতে এসেছেন। আর আমি ওঁকে এসকর্ট করছি। আপনারা নিশ্চিত থাকুন।'

বৃদ্ধ বলল, 'থ্যাংক গড। বসো তোমরা।'

মেনু দেখে খাবারের হুকুম দিলাম। আশেপাশের সমস্ত টেবিল দুটো ভাগে ভাগ হয়ে আছে। লেসবিরা আমাদের টেবিলে বসছে না। লক্ষ করলাম দুই লেসবি মহিলার একজন একটু পুরুষালি আচরণ করছে। সেটা অন্যজন খুব সমীহের সঙ্গে গ্রহণ করছে। ওরা কী বিষয় নিয়ে এত কথা বলছে বুঝতে পারছিলাম না। আমাদের ঠিক পাশের টেবিলে একজন লেসবি, যে কিনা পুরুষালি বই পড়ে শোনাচ্ছিল তার সঙ্গিনীকে। কানে আসছিল শব্দগুলো। এই হট্টগোলের মধ্যেই সঙ্গিনী ঝুঁকে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে যাচ্ছিল। হঠাৎ মনে হল লেখাটা আমার চেনা। হেমিংওয়ে পড়ছে পুরুষালি মেয়েটি। ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সি। রোমাঞ্চিত হলাম। এতক্ষণ যে বিরূপ ভাবনা মনে শক্ত জমি তৈরি করেছিল মুহূর্তেই চুরমার হয়ে গেল। মনে পড়ল কফি হাউসের তিনতলার কোণে বসে একটি ছেলেকে সুধীন দত্ত পড়ে শোনাতে দেখতাম তার প্রেমিকাকে। এর পরে আমরা কী বলতে পারি! সন্তোষদার একটা কথা মনে পড়ে গেল। অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপার তার একান্ত নিজস্ব। তোমার ব্যাখ্যা দিয়ে তাকে বিচার করতে যেও না। মানুষের মনের আচরণ কোনও ফর্মুলামাফিক চলে না। যে-যার নিজের মতন। তুমি শুধু তোমারটাই দ্যাখো। হ্যাঁ, ব্যক্তির বাইরে যে মানুষ সে নিয়মটিয়ম মেনে চললেই হল।' চট করে শুনলে কথাগুলোতে সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু জীবনে অভিজ্ঞতা এলে ব্যাপারটা দৈনন্দিন সত্যিতে পরিণত হয়।

এরা আড্ডা মারছে তো মারছেই। ঘড়ির কাঁটা এখন একটা ছাড়িয়েছে। কিন্তু আমাদের সামনের

বৃদ্ধ-বৃদ্ধার বাড়ি যাওয়ার বিন্দুমাত্র বাসনা দেখছি না। নিয়মিত ব্যবধানে তাঁরা ওয়েটারকে ডেকে একটা না একটা খাবারের হুকুম দিয়ে যাচ্ছেন। অর্থাৎ এখানে খাবার না চাইলে কলকাতার মতো তুলে দেওয়া হয়। সেইজন্যেই বোধহয় কফিহাউসে বেকারদের চমৎকার আড্ডা জমে। পাশের টেবিলে এখন হেমিংওয়ে নিয়ে আলোচনা চলছে। দাম মিটিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম। নির্জন রাস্তা। গাড়িতে ওঠার আগে দেখলাম একটি কিশোর চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে তার নিজস্ব ঘরানার সঙ্গী সংগ্রহের জন্যে। ইচ্ছে হল বলি, 'খোকা বাড়িতে ফিরে যাও।'

হোটেল ফিরে কেন্ট চলে গেল গাড়ি রাখতে। এখন মধ্যরাত। রিসেপশনিস্ট ভদ্রলোক আমার অচেনা। বিকেলে যিনি ছিলেন তাঁর ডিউটি সম্ভবত শেষ হয়ে গিয়েছে। কাউন্টারে পৌঁছে ঘরের চাবি চাইলাম। ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'ইউ আর, প্লিজ?'

'মজুমদার। এবার নিশ্চয়ই পাসপোর্ট দেখতে চাইবে। আমাকে ইনি হোটেলে চেক-ইন করার সময় দ্যাখেননি। উটকো লোকও তো এসে চাবি চাইতে পারে। রিসেপশনিস্ট কিন্তু সেদিকে গেলেনই না। জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি তো ইন্ডিয়া থেকে এসেছেন?'

মাথা নাড়ালাম। এবার আর একটু কাছে এগিয়ে বললেন, 'আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। আমাদের হোটেলের একটি পরিবারে কিছুটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। তারাও ভারতীয়।

'কী সমস্যা?'

'ওদের মধ্যে নিশ্চয়ই খুব ঝগড়া হয়েছে। রেগেমেগে ভদ্রলোক সেই যে বেরিয়ে গেছে সে আর ফেরেননি। মহিলাটি খুব ভেঙে পড়েছেন। কয়েকবার কাউন্টারে এসেছেন। আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম কারণ ভদ্রমহিলার ভাষা পুরোটা বুঝতে পারছি না। আপনি যদি দয়া করে কথা বলে নেন তাহলেই বোঝা যাবে পুলিশকে জানানো প্রয়োজন কি না। ভদ্রলোক আমাকে একটা নম্বর লিখে দিলেন।

মধ্যরাত্রে মানুষের হৃদয় বড় নির্মল থাকে। পরম শত্রুর সঙ্গে তখন ভালো ব্যবহার করা যায়। কিন্তু কারও পারিবারিক সমস্যায় নাক গলানোর সময় কি না তা আমার অভিজ্ঞতায় ছিল না। প্রথম কথা, ভদ্রমহিলা তাঁদের দাম্পত্য কলহ নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করতে নারাজ হতেই পারেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর স্বামী ফিরে ঘটনাটা শুনলে অসন্তুষ্ট হলে কিছু বলার নেই। এসব কথা বলতেই রিসেপশনিস্ট বললেন, 'না-না, উনি খুব ভেঙে পড়েছেন। ভাষার সমস্যা না থাকলে আমরাই সাহায্য করতাম। আমি বলছি উনি কিছু মনে করবেন না।'

কেন্ট এখনও ফেরেনি। লিফটে চেপে সোজা ওপরে উঠে এলাম। হোটেলের ঘরে এখন ঘুমন্ত মানুষ। করিডোর ভুতুড়ে বাড়ির মতো ফাঁকা। দরজার ওপর নজর রাখতে-রাখতে নির্দিষ্ট ঘরটির সামনে দাঁড়ালাম। ভারতীয় যে মহিলাটি এখানে আছেন তিনি যদি কেরালা বা কচ্ছের মানুষ হন, তাহলে আমার কোনও সাহায্যই কাজে লাগবে না। হঠাৎ সেই দম্পতির ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমরা যখন চেক-ইন করছিলাম তখন ভদ্রলোক খুব দ্রুত বেরিয়ে গিয়েছিলেন স্ত্রীকে নিয়ে।

তিনবার নক করার পর দরজাটা খুলল। কিন্তু পুরো নয়। চেন হুকে আটকানো রয়েছে। বড়জোর আধ ইঞ্চি ফাঁক হয়েছে। এবং পরিষ্কার বাংলায় কাঁপা-কাঁপা গলায় প্রশ্ন ভেসে এল, 'কে?'

যা। বঙ্গতনয়া সানফ্রান্সিসকোতে বিপদগ্রস্ত। অতএব বললাম, 'আমি একজন বাঙালি। হোটেল থেকে আপনার বিপদের কথা শুনলাম। যদি দয়া করে দরজা খোলেন তাহলে এ ব্যাপারে কথা বলতে পারি।'

সঙ্গে-সঙ্গে দরজা খুলে গেল। একটু চটজলদি। আধা সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী এক বঙ্গললনা আমার দিকে শব্দের পিচকারি ছুঁড়লেন, 'আপনি বাঙালি। ও! ভগবান, তুমি আছ। ভয়ে আমার হাত-পা যেন হিম হয়ে যাচ্ছিল এতক্ষণ। আসুন।'

সোজা গিয়ে চেয়ারে বসলাম। মহিলার পরনে শাড়ি, সিল্কের। মুখচোখের কাট ভালো। তবে গায়ের রং চাপা। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী হয়েছে বলুন তো?'

'কাল থেকে আমার সঙ্গে ঝগড়া করছিল। দুপুরে একবার বেরিয়েই ফিরে এসেছিল। আমি বাথরুমে গিয়েছিলাম। এসে দেখি ও নেই।' মহিলা কাতর গলায় শব্দগুলো উচ্চারণ করেই আচমকা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। মধ্যরাত্রে কোনও মহিলা যদি আমার সামনে ওভাবে কাঁদেন তাহলে ভাবাবেগ সামলে থাকা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হয়ে যায়। কিন্তু একজন অপরিচিতা পরস্ত্রীকে আমি শুধু দূর থেকেই সান্ত্বনা দিতে পারি। জিজ্ঞাসা করলাম একটুও না নড়ে, 'আপনি এত ভেঙে পড়ছেন কেন?'

'ও পালিয়েছে। আমি জানি ও পালিয়েছে।'

'পালিয়েছে? যা, পালাবে কেন?'

'না। আমি জানি। এখানে এত সাদা চামড়ার মেয়েমানুষ দেখে, তাদের কত রংঢং দেখে মজেছে। আমাকে আর মনে ধরছে না।' কান্নাটা থামছিল না।

বললাম, 'এসব কেন বলছেন? আপনাদের মধ্যে কোনও কারণে মতান্তর হয়েছিল। হয়তো ওর অভিমান হয়েছে তাই, দেখুন না এখনই চলে আসবেন হয়তো।'

'না। ও আসবে না।' একদম আকাশবাণীর ঘোষিকার গলায় বললেন মহিলা।

'এমন হতাশ হচ্ছেন কেন?'

'আমি জানি। আমার সঙ্গে ওর অন্য কোনও ঝগড়া হয়নি। দু-দিন আগে হঠাৎ আমাকে দেশে চলে যেতে বলেছিল। আমি বলেছিলাম একসঙ্গে এসেছি, একসঙ্গে যাব। তা ছাড়া কত সব কায়দা করে প্লেনে-ট্রেনে যেতে হবে। আমার ভয় লাগে।' মহিলা কথা বলছিলেন আর কাঁদছিলেন। দৃশ্যটা আমার মোটেই ভালো লাগছিল না। অথচ ইনি যা বলছেন তাতে ভদ্রলোকের চরিত্র বুঝতে পারছি না। কেউ কি বাইরে এসে এভাবে নিজের স্ত্রীকে ফেরত পাঠায় নাকি? সম্ভবত রাগ ঊর্ধ্বগামী হয়ে গিয়েছে একটু বেশি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনারা কতদিন আমেরিকায় আছেন?'

'দশ দিন।'

'কোথায় মানে কোন শহরে ছিলেন এর আগে। আপনি আর কাঁদবেন না। এখন কান্নাকাটি করে তো কোনও কাজ হবে না। ঠান্ডা মাথায় ব্যাপারটা বুঝতে হবে।'

'নিউ ইয়র্ক আর লাভগাস না কী যেন।' লা ভেগাস শব্দটির উচ্চারণ বুঝিয়ে দিল মহিলার পড়াশোনা বেশি নয়। বাংলা মিডিয়ামে পড়াশোনা করা ছেলে-মেয়েদের অনেকেই ইংরেজি মোটামুটি লিখতে পারে কিন্তু অনভ্যাসের কারণে বলতে গিয়ে দেখেছি আটকে যায়। হয়তো একটা সংকোচ কাজ করে। ইনি সেই দলেও পড়েন না। কিন্তু এবারে কান্না থেমেছে। রুমালে চোখ মুছলেন। জিগ্যেস করলাম, 'আপনি এভাবে কাঁদছেন কেন? এত ভেঙে পড়ছেন কেন?'

'একা ফিরে যেতে হবে বলে।'

উত্তরটা আমার মোটেই ভালো লাগল না। ঘরের জিনিসপত্রের দিকে নজর বোলালাম। তারপর হেসে বললাম, 'আপনি বলেছেন উনি চলে গিয়েছেন কিন্তু ঘরে ওঁর কিছু জিনিসপত্র দেখতে পাচ্ছি। আপনি মিছিমিছি ভাবছেন।'

'না।' মহিলা উঠে দাঁড়ালেন, 'ওঁর সুটকেস নেই। সঙ্গে একটা টাকার ব্যাগ থাকে, সেটাও নেই। আমার এই পাসপোর্ট টিকিট বাইরে বের করে দিয়েছেন। সঙ্গে এই টাকাগুলোও ছিল।'

দেখলাম ড্রেসিং টেবিলের ওপর গোটা একশো ডলার পড়ে রয়েছে। অন্তত তিনি যে মহিলার ব্যাপারে ভেবেছেন তা বোঝা যাচ্ছে। হোটেলের বিল মিটিয়েছেন কি না তা বুঝতে পারছি না।

হঠাৎ মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি এখানে কাজ করেন?'

হাসলাম। 'না। আমিও বেড়াতে এসেছি। কলকাতায় থাকি।'

'কলকাতা?' চকিতে ওঁর মুখে যেন হাজার পাওয়ারের আলো জ্বলে উঠল। প্রায় ছুটেই এলেন কাছে, 'আপনি কলকাতায় থাকেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি যা বলছেন তাতে তো ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে যাচ্ছে। আপনার স্বামী কেন নিজের পাসপোর্ট এবং সুটকেস নিয়ে না বলে চলে যাবেন? আমি রিসেপশনিস্টকে বলছি পুলিশকে খবর দিতে।' আমি উঠে দাঁড়ালাম।

করুণ গলায় মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা পুলিশকে না জানালে হয় না?'

'আপনি যদি কলকাতার প্লেনে আমাকে তুলে দেন, টিকিট তো আছে—'

'আশ্চর্য! আপনার স্বামী আপনাকে ছেড়ে এখানে থেকে যাবেন আর আপনি কিছু না বলে দেশে ফিরে যাবেন? তা কি হয়? একমাত্র পুলিশ পারে তাঁকে খুঁজে বের করতে।' আমি এগিয়ে গেলাম টেলিফোনের দিকে। হঠাৎ কাতর গলায় মহিলা বললেন, 'শুনুন।'

চমকে ফিরে তাকালাম। মহিলা অন্যদিকে মুখ ফেরালেন। 'উনি আমার স্বামী নন। পুলিশকে আমি কী বলব।'

এমন অবস্থায় কখনও পড়িনি। বজ্রাহত শব্দটির অর্থ এতক্ষণে বোধগম্য হল। কোনওমতে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম। 'উনি আপনার স্বামী নন?'

মাথা নেড়ে না বললেন মহিলা, 'মাস দুয়েক হল আমার কাছে আসতেন। খুব দিলদরিয়া লোক। দুমাসে আমাদের ভাব হয়ে গিয়েছিল বেশ। নিজেই ব্যবস্থা করে আমার পার্সপোর্ট বের করলেন। আমাদের বাড়িওয়ালি আপত্তি করেছিল। দিল্লি, বম্বে যাওয়া যায়, কিন্তু একদম আমেরিকা বলে কথা। এত গল্প বলতেন আমার খুব জেদ চেপে গেল। এ জীবনে তো হবে না, উনি যদি দেখান তাহলে কেন দেখতে যাব না। সবাই কি ইচ্ছে করলেই আমেরিকা যেতে পারে। বাড়িওয়ালি বলেছিল সেদেশে যেতে ওঁর আমার জন্যে বিশ হাজার খরচ হবে। ওই টাকা খরচ করার মতো প্রেম কি হয়েছে? আমি বলেছিলাম, হয়েছে। বাড়িওয়ালি নিশ্চয় ঈর্ষা করেছে আমার সৌভাগ্যকে। সব কিছু করে উনি আমাকে নিয়ে রওনা হলেন। প্রথম তিনদিন খুব ভালো ছিলাম। জীবনে এত ভালোর দৃশ্য এত সুখ কখনও পাইনি। একটা ইংরেজি সিনেমা দেখেছিলাম ঠিক সেইমতো সবকিছু। তারপর যেখানেই যাই উনি আমাকে হোটেলে রেখে রাত্রে একা বেরিয়ে যেতেন। ভোরের আগে ফিরে দুপুর পর্যন্ত ঘুমাতেন। আমাকে নিয়ে ঘুরতে যেতেন না। আমি বললেন বলতে, একটা বয়ফ্রেন্ড জুটিয়ে নিজেই ঘুরে বেড়াও না। এদেশে নাকি শ্যামলা মেয়ের খুব ডিমান্ড। তারপর বলতে লাগলেন সাদা মেয়েদের শরীরের গল্প। কী তাদের ব্যবহার। বললেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে এসে তিনি নাকি খুব ভুল করেছেন। আমাকে দেশে ফিরে যেতে বলতে লাগলেন। তারপর তো এই। আমি কী করব?'

বিরাট গল্প মুখ বুজে শুনলাম। তারপর এগিয়ে ওঁর পাসপোর্ট তুলে নিলাম। নীলা দেবী। তিন, রয় স্ট্রিট। মহিলার ছবিটি সদ্য তোলা।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'রয় স্ট্রিটে থাকেন?'

মাথা নাড়লেন মহিলা, 'না। দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিটে।'

অন্যমনস্ক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সেটা কোথায়?'

'সোনাগাছি।'

এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। ওঁর মুখের দিকে তাকালাম। বারবণিতা বলতে যে ছবি মনে আসে তার সঙ্গে ওঁর কোনও মিল নেই। গল্প শুনেছি অনেক। কিন্তু চাক্ষুষ এই প্রথম করলাম। বললাম, 'আপনার নাম কি নীলা?'

'হ্যাঁ।'

'ওঁর নাম কী?'

'আমরা দেবুবাবু বলে জানতাম। ডি. রায়।'

'বাড়ি কোথায়?'

'বালিগঞ্জে। ঠিকানা জানি না।'

'এরকম অচেনা লোকের সঙ্গে চলে এলেন?'

'আসলে রোজ আসতেন। কত গল্প করতেন। আমাকে বড়-বড় হোটেলে নিয়ে যেতেন। এমন ভালোবেসেছিলাম যে অন্য কিছু ভাবার সুযোগ পাইনি।'

চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'দাদা, আমাকে আপনার খুব ঘেন্না হচ্ছে, না?'

এরকম বোধ আমার আসেইনি। মাথা নেড়ে না বললাম।

মহিলা বললেন, 'বাইশ বছর বয়সে এই লাইনে এসেছি। সাত বছর হয়ে গেল। কাউকে ঠকাইনি কখনও। কিন্তু আমাকে কেন এভাবে ঠকতে হল?'

'এ নিয়ে হা-হুতাশ করবেন না। আপনার কলকাতায় ফিরে যাওয়া দরকার। আমি চেষ্টা করছি একটা ব্যবস্থা করার।'

'আমি সারাজীবন আপনার ঝি হয়ে থাকব দাদা। যা বলবেন তাই করব। আমি নিশ্চয় খারাপ মেয়ে কিন্তু—'

'ঠিক আছে, এসব না বললেও চলবে।'

টেলিফোনের কাছে গিয়ে রিসিভার তুললাম। রিসেপশনিস্টের সাড়া পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি মজুমদার বলছি। ওই ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলেছি। ওঁদের ঘরের বিল কি আউটস্ট্যান্ডিং আছে?'

রিসেপশনিস্ট একটু সময় নিয়ে বললেন, 'ওঁরা যে অ্যাডভান্স করেছিলেন তাতে আগামীকাল দুপুর পর্যন্ত চলবে।'

'থ্যাংকস। পরে কথা বলব।' রিসিভার নামিয়ে রাখতেই সেই পত্রিকাটি দেখলাম। টেবিলের ওপর যা আমার ঘরেও দেওয়া হয়েছিল। পাতা ওলটাতে-ওলটাতে বিভিন্ন ছবির ওপর বাংলায় 'দারুণ' 'দারুণ' লেখা দেখতে পেলাম। শেষে একটি টেলিফোন নম্বরের ওপর তিন-চারবার গোল দাগ দেওয়া নজরে পড়ল।

মহিলাকে বললাম, 'আপনি নিশ্চিন্তে এখানে বিশ্রাম করুন। উনি যদি না ফেরেন তাহলে দেশে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা হবে।' আমি বেরুতে যাচ্ছিলাম পত্রিকাটি নিয়ে। মহিলা বাধা দিলেন, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'আমার ঘরে।'

'দাদা, আপনি কবে দেশে যাবেন?'

'আমার দেরি আছে ফিরতে। আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন?'

'এই বিদেশে খুব একলা লাগছে আমার।'

'আপনি চান উনি শাস্তি পান?'

কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন মহিলা। তারপর বললেন, 'উনি যদি আমাকে যেমন এনেছিলেন তেমন ফিরিয়ে নিয়ে যান, তাহলে আর কিছুই চাই না আমি।'

'ঠিক আছে। আমি দেখছি।'

'দাদা, আপনার নাম কি?'

'মজুমদার।' কথাটা বলতেই মুখে হাত চাপা দিয়ে হাউহাউ কেঁদে উঠলেন মহিলা। হতভম্ব

হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। সেই অবস্থাতেই তিনি বললেন, 'রায় আমার নকল উপাধি। লাইনে আসার আগে আমরাও ছিলাম মজুমদার।'

॥ ২৩ ॥

পুলিশ বলেছিল যদি সকাল দশটার মধ্যে ভদ্রলোক কোনও যোগাযোগ না করেন তাহলেই তারা খোঁজখবর নেবে। হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছে ওঁর কোনও দায় নেই কারণ পুরো টাকা তিনি আগাম দিয়ে দিয়েছেন। যে মহিলা ওঁর সঙ্গে এসেছেন তিনি সাবালিকা। শুধু একটা লোক না বলে চলে গিয়েছে, কোথায় কীরকম আছে এইটেই একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর পুলিশ খুঁজে দেখতে পারে। আমেরিকায় ভদ্রমহিলা এসেছেন নিজস্ব আইডেন্টিটি নিয়ে। অতএব তাঁর ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

কিন্তু এসবের কিছুই প্রয়োজন হল না। ভদ্রলোক সেই সকালেই ফিরে এলেন। ঘুম থেকে উঠে আমি যখন ভাবছি কীভাবে ওঁকে দেশের প্লেনে তুলে দেওয়া যায়, তখন রিসেপশন থেকে আমাকে ফোন করে ঘটনাটা জানাল। বেশ অবাক হলাম। উনি গেলেনই কেন আবার কোন দায় মেটাতে ফিরে এলেন? ভদ্রমহিলার কথায় আমার মনে হয়েছিল আমেরিকার নারীর টান তাঁর কাছে এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে ভারতীয় নারীকে তিনি বর্জন করেছেন। তাহলে ফিরে এলেন যে বড়। প্রচণ্ড রাগ হল। নিজেদের মধ্যে তারা যা করতে চান করতে পারেন কিন্তু সেই সূত্রে যখন বাইরের লোককে ডেকে সাহায্য চাওয়া হয় তখন সেখানে আমরা কৈফিয়ৎ চাইতেই পারি। স্নান শেষ করে পোশাক পরে সোজা ওঁদের দরজায় নক করলাম মিনিটখানেকের মধ্যেও কেউ দরজা খুলল না। গিয়ে কেন্টকে ব্যাপারটা জানালাম। সে আমার সঙ্গে রিসেপশনে নেমে এল।

রিসেপশনিস্ট বলল, 'ওঁরা একটু আগে বেরিয়ে গেলেন।'

'বেরিয়ে গেছেন মানে?'

'ওঁরা হোটেল ছেড়ে দিয়েছেন। সকালেই নিউইয়র্কের ফ্লাইট ধরবেন।'

অস্বীকার করব না একইসঙ্গে দুরকম অনুভূতি এল। প্রথমেই মনে হল, যাক, ভদ্রমহিলার দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে আর আমাকে চিন্তা করতে হবে না। তারপরেই খেয়াল হল আচমকা ফিরে এসে ভদ্রলোক কেন তড়িঘড়ি পালিয়ে গেলেন মহিলাকে নিয়ে। মহিলার কাছে নিশ্চয়ই তিনি আমার কথা শুনেছেন। বুঝেছেন হোটেলে থাকলে আমার মুখোমুখি হতে হবে। সেই ঝুঁকি তিনি আর নিতে চাননি। লোকলজ্জাবোধ এখানে প্রবল হয়েছিল।

তা তো হল। কিন্তু ভদ্রমহিলা কী করে ওঁর সঙ্গে ফিরে গেলেন আমাকে একবারও না জানিয়ে? যে পুরুষ তাঁকে এত বড় অপমান করেছিল কোন মানসিকতায় তাঁকে আবার তিনি গ্রহণ করলেন সেটা কি দেশে ফিরে যাওয়ার সুবিধে হবে বলেই?

নারীচরিত্র আকাশের মতো রহস্যময় যাঁরা বলেন তাঁরা ভুল বলেন বলে মাঝে-মাঝে মনে হয়েছে। আমার বিশ্বাস মেয়েদের মন এত সরল এবং সাধারণ গতিতে চলে যে আমরা সেই স্বাভাবিকটা না বুঝে আরোপিত জটিল ভাবনা নিয়ে তাদের বুঝতে চেয়েই ওইসব কথা বলে থাকি। একজন নারী অল্পেই খুশি হন এবং দুঃখবোধও তার আসে অল্পে। কিন্তু তিনি যাকে একবার গ্রহণ করে ফেলেন ভালোবাসা দিয়ে তাকে কোনওদিন মুছে ফেলতে পারেন না মন থেকে। সেই পুরুষ তাঁকে প্রতারিত, অপমানিত করলে তিনি ততক্ষণই মুখ বুজে পড়ে থাকেন যতক্ষণ তাঁর সহ্যশক্তি সঞ্চিত থাকে। তারপর যখন তিনি সেই পুরুষের ছায়া থেকে সরে আসেন তখন তাঁকে ঘৃণা করতে যে

মন দরকার হয় তাও তিনি খরচ করতে রাজি নন। এই পর্যন্ত বোঝা যায় সরলরেখায়। কিন্তু সেই নারী যদি ওই পুরুষের অত্যন্ত বিপদের দিনে নিজের মর্যাদা বিকিয়ে দিয়ে ছুটে যান সাহায্য করার তাগিদে তখনই তিনি রহস্যময়ী হয়ে ওঠেন সাধারনের চোখে। এইসময় আমরা ভাবতে চাই না ওঁর হৃদয়ে প্রথম পুরুষটি যে ছাঁচ ফেলেছিল সেটি তো কোনওদিনই নষ্ট হয়নি। পরবর্তীকালে অন্যপুরুষ এলেও তারা হয়তো মেঘের মতো সেই ছাঁচের ওপর ঘোরাফেরা করছে মাত্র। যে মুহূর্তে তিনি নিজেকে প্রথম পুরষের কাছে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন তখনই তাঁর সমস্ত অভিমান সরে গেছে আচমকা।

সারাটি দিন আমরা সানফ্রান্সিসকো শহর চযে বেড়ালাম। দুপুরে একটা পঞ্চমুখী সিনেমা হলে ঢুকলাম। পঞ্চমুখী বললাম এই কারণে যে প্রধান দরজা একটিই। ভেতরে ঢুকে পাশাপাশি পাঁচটি কাউন্টার। তাতে পাঁচটি ছবির টিকিট বিক্রি হচ্ছে। যেটি ইচ্ছে সেটিতে টিকিট কেটে ঢুকে পড়ো। আমি একটি স্প্যানিশ ছবির টিকিট কাটলাম। কেন্ট ব্রিটিশ ছবির। সিঁড়ি দিয়ে তিন নম্বর অডিটোরিয়ামে ঢুকে দেখলাম শ-তিনেকের বেশি আসন নেই। ছবি আরম্ভ হতে মিনিটদুয়েকও বাকি নেই, কিন্তু দর্শকসংখ্যা কুড়িতেও পৌঁছোয়নি। আমার মতো বাউন্ডুলে আছেন জনাতিনেক বাকিরা জোড়ায়-জোড়ায়। খুব আরামদায়ক হল। সপ্তদশ শতকের পটভূমিকায় একটি ডন জুয়ান টাইপের ছেলের নারী শিকারের অ্যাডভেঞ্চার ছবির বিষয়বস্তু। সাব টাইটেল আছে। মজার কথা হল ছবিতে যখনই নায়ক চুম্বন করছিল তখনই প্রেক্ষাগৃহে তা প্রতিধ্বনি হচ্ছিল। গুনিনি, তবে মনে হয় তেরো-চোদ্দোবারের পরদার চুম্বনদৃশ্য দর্শকরা আত্মস্থ করেছেন। বলে রাখা ভালো, পরদায় যখন সেরকম দৃশ্য আসেনি তখন দর্শকরা নিজেদের সংযত রেখেছিলেন এবং এটা কম কথা নয়। তবে শব্দ যে ব্রহ্ম তা ছ-সাত জোড়া মানুষ অন্ধকারে আমাকে নতুন করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

সানফ্রান্সিসকো শহর আমার ভালো লেগেছিল। এর পেছনে ছেলেবেলার দেখা সিনেমার স্মৃতি কাজ করছিল যেমন তেমনই কলকাতার আড্ডাবাজ মনও সক্রিয় ছিল। এই শহরেই আমি আমেরিকানদের অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ আটপৌরে জীবনযাপন করতে দেখেছিলাম। লস এঞ্জেলস্ বা নিউইয়র্কের মতো দ্রুতগতিতে ছোটার চেষ্টায় এখানকার মানুষ যোগ দেয়নি বলেই মনে হয়েছিল। তা ছাড়া আমেরিকান নয় এমন মানুষের সংখ্যাও বেশি বলে যে কসমোপলিটন চেহারা নিয়েছে তা আমার মতো ভারতীয়দের পক্ষে খুব স্বস্তিজনক।

সানফ্রান্সিসকো ছেড়ে আমেরিকান এয়ারলাইন্সের টিকিটে উড়ে এলাম আবার নিউইয়র্কে। আমার দ্রষ্টব্য শহরের মধ্যে কেন যে আমি নিউইয়র্কের নাম রেখেছিলাম এইটে আমি এখনও বুঝতে পারি না। মনোজের সঙ্গে তো শহরটাকে নানান চেহারায় আগেই দেখে গিয়েছি। নতুন করে কেন্ট আমাকে আর কী দেখতে পারে। আমরা বাঙালিরা যে পাকাপোক্ত প্র্যাকটিক্যাল নই এ সত্য বুঝেছি মজ্জায়-মজ্জায়।

মনোজ জানত কবে আমি নিউইয়র্কে ফিরব কিন্তু তাঁকে এয়ারপোর্টে আসতে নিষেধ করেছিলাম। এখনও আমি সরকারি অতিথি এবং সঙ্গে কেন্ট আছে তখন আর আসার কী দরকার। নিউইয়র্কে কেনেডি এয়ারপোর্টে নেমেছিলাম পাঁচটা নাগাদ। ভাড়া-গাড়িতে চেপে কেন্ট জিজ্ঞাসা করল, 'কোন রাস্তায় যাব তুমি বলতে পারবে?'

পনেরো দিনেও যদি একটা পাড়া চিনতে না পারি তাহলে আমার সঙ্গে হতোমপুরের হতোমের পার্থক্য কী? কেনেডি এয়ারপোর্ট থেকে কুইন্সের দিকে হাইওয়ে ধরে যেতে যেতে সতর্ক চোখ রাখলাম। পরিষ্কার মনে আছে রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিচ্ছে সেখানেই মনোজ সরে এসেছিল হাইওয়ে থেকে। তারপর একটা অপেক্ষাকৃত ছোট নির্জন রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে ওর বাড়ির কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। অন্তত সেরকম দুটো বাঁক পড়ল এবং প্রতিবারই আমার মনে হল এইখানেই আমাদের হাইওয়ে ছাড়তে হবে। কিন্তু ঘড়ি বলছে আরও কিছুটা সময় আমরা হাইওয়েতে ছিলাম। এবার

কেন্ট ঘোষণা করল আমরা কুইন্স ছাড়িয়ে যাচ্ছি।

অস্বস্তি হল। নারীর কাছে হার মানতে লজ্জা নেই কিন্তু নিজের কাছে, অসম্ভব। ওকে গম্ভীরভাবে বাঁ-দিকের রাস্তা ধরতে বললাম। প্ল্যানড সিটির এইটেই মুশকিল। সবই একরকম মনে হয়। পুরোনো মন্দির, বাজার অথবা সিগারেটের দোকান দেখে রাস্তা চেনার একটা সহজ ব্যাপার আছে। এখানে রাস্তার দুপাশের গাছগুলো পর্যন্ত একই মাপে ছাঁটা। আমি শুধু দুপাশে বেস্লেরোসের দুশো ছেচল্লিশ নম্বর খুঁজছি। নম্বরগুলো অন্তত একশো পিছিয়ে। কেন্ট কি ইতিমধ্যে বুঝতে পেরে গেছে আমি হুতোমপুরের? যদিও আমি খুব গম্ভীর গলায় নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিলুম তবু আমার গলার স্বর নিজের কানেই ক্রমশ নির্জীব হয়ে আসছে। হঠাৎ মাথায় একটা মতলব এল। ছোট দোকানপাটের একটা চত্বর চোখে পড়তে কেন্টকে বললাম গাড়ি থামাতে। বড্ড কফি তেষ্টা পেয়েছে। সে গাড়ি পার্ক করে আমার সঙ্গেই হেঁটে এল কফি কর্নারে। তিরিশ সেকেন্ডের বেশি অপেক্ষা করতে হয় না কফির জন্যে। চুমুক দিতে-দিতে চারপাশে তাকাতেই পাবলিক টেলিফোন বুথ দেখতে পেলাম। কেন্ট তখন মৌজ করে বলছিল, 'তোমার বন্ধু মনোজের সঙ্গে আলাপ করতে আমি খুব আগ্রহী। তোমরা এমনভাবে ছবি করতে যাচ্ছ দেখে আমিও হাত লাগাতে চাই।'

'নিশ্চয়ই। মনোজও তোমাকে পেয়ে খুশি হবে।' কফি শেষ করে আমি গম্ভীরমুখে টেলিফোন বুথের কাছে গিয়ে পয়সা ফেললাম। মনোজের গলা পাওয়া গেল। অনেকদিন পরে বাংলায় বললাম, 'ভাই মনোজ আপনার বাড়িতে আসতে গিয়ে পথ হারিয়েছি। সঙ্গে এসকর্টটি আছেন। কিন্তু এটা তাকে বুঝতে দিতে চাই না।'

মনোজ হাসল, 'কোত্থেকে কথা বলছেন?'

সাইনবোর্ড দেখে ঠিকানাটা আওড়ে গেলাম। মনোজ হাসল হোহো করে। তারপর বলল, 'রিসিভার রেখে উলটোদিকে তাকালেই একটা রাস্তা দেখতে পাবেন। সোজা চলে আসুন রাস্তাটা ধরে যতক্ষণ না একটা মোড় পাচ্ছেন। মোড়ে এসেই ডান দিকে ঘুরলেই আমাদের বাড়ির সামনে এসে পড়বেন।'

নিজেকে চড় মারতে ইচ্ছে করল। এ যেন নন্দনের সামনে দাঁড়িয়ে কাউকে ফোন করে বলা যে আমি রবীন্দ্রসদন চিনতে পারছি না। চল্লিশ সেকেন্ডও লাগল না মনোজের বাড়ি পৌঁছে যেতে। এই ক'দিনেই নিউইয়র্কের আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। সন্ধের সময়টা যেখানে ভারী গরম জামা লাগত সেখানে মনোজ একটা হাফ স্লিভ পরে দাঁড়িয়ে। হাত জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন হল পরিভ্রমণ, জম্পেশ?'

হাসলাম। শেষ হয়ে যাওয়া পরপর আমার কোনওদিনই কোনও কিছুতেই মন ভরে না।

কেন্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। পরে আলাপ করবে বলে কেন্ট গাড়ি নিয়ে চলে গেল কাছাকাছি কোনও হোটেলে। যাওয়ার আগে জিজ্ঞাসা করল আগামীকাল কখন আসবে? কারণ নিয়মমতো আগামীকালও আমি সরকারের অতিথি। বারোটার সময় ওকে আসতে বলে দরজা ঠেলে ভেতের ঢুকতেই মনে হয়েছিল নিজের বাড়িতে এসেছি। আসলে মনোজের বাড়িতে প্রথম দিকে এমন আলস্য নিয়ে কাটিয়েছিলাম যে এই পনেরো দিনের ছোটাছুটির পর পরিচিত বিছানায় শরীর রাখতে খুব আরাম লেগেছিল। এবং তখনই কলকাতার কথা মনে পড়েছিল। এতদিন বাদে কলকাতা আমার সমস্ত সত্তা ধরে জোরে টান মারল। মনোজ বসেছিল খাটের পাশে। ওকে মোটামুটি বৃত্তান্ত বললাম। লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের পল স্পের যা বলেছেন তা ওকে উৎসাহিত করল। ডকুমেন্টারিটা শেষ হলেই ও পলের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। মনোজ বলল, 'জয়ন্তী ফোন করেছিল।'

'জয়ন্তী, সে আবার কে?'

'দুর মশাই। আলাপ করেন অথচ নাম ভুলে যান কেন? জয়ন্তী, আপনার পিংকি।'

সত্যি লজ্জিত হলাম। রমেনবাবুর ছোট মেয়েকে ক্রমাগত 'এই দ্বীপ এই নির্বাসন' উপন্যাসের

পিংকি বলে ভাবতে-ভাবতে ওর আসল নামটাই ভুলে গিয়েছিলাম। জানলাম পিংকি আসবে এই সপ্তাহেই। ওর গলার স্বর টেলিফোনে যা শুনেছে তাতেই মনোজের পছন্দ হয়েছে। কোনও জীবন্ত মানুষকে গল্পকারের নিজের লেখা চরিত্রের সঙ্গে মিলে গেলে যে আনন্দ হয় তার কোনও তুলনা নেই।

মনোজের স্ত্রী এলেন, 'আপনারা তো ন'টা নাগাদ খেয়ে দেয়ে বেরুবেন?'

ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকালাম। ক্ষোভ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যতদিন নিউইয়র্কে ছিলাম ততদিন তো তাই করেছি। একটি বাঙালি কলকাতা থেকে এসে প্রতিরাত্রে তার স্বামীক নিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়—এটা কোনও স্ত্রীর ভালো লাগতে পারে না। মাথা নাড়লাম, 'না। আজ আমি বিছানা ছেড়ে উঠছি না।'

আবার হাসল মনোজ। 'এইজন্যেই বাঙালিকে সবসময় জাগতে বলা হয়। এরই মধ্যে দম ফুরিয়ে গেল আপনার?'

টরেন্টো থেকে সাইমন স্কট, বোস্টন থেকে ফুয়াদ চৌধুরি, মনোজ, আমি আর কেন্ট সারাটা দিন ধরে আলোচনা করলাম। প্রথম দুজনকে মনোজ আসতে বলেছিল আগে থেকেই। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল 'নির্বাসন' ছবি হবেই এবং সেটা নিউইয়র্কেই শ্যুটিং হবে। চিত্রনাট্যের খসড়া পড়ে শোনালাম। মনোজ ইতিমধ্যেই তার ইংরেজি করে রেখেছিল। অতএব সাইমন অথবা কেন্টের বুঝতে অসুবিধে হয়নি এবং এখানেই মজার ব্যাপার হল। মনোজের গল্পের সারাংশ হল এইরকম যা চিত্রনাট্যে ছিল— 'প্রবাল সোম নামক এক মধ্যবয়সি এম.কম. পাস মানুষ খড়্গপুরে কেরানির চাকরি করতেন। তাঁর বড় মেয়ে সপ্তদশী ছোট মেয়ে বছরপাঁচেকের। সংসার কোনওমতে চলত। ওঁদের এক পারিবারিক বন্ধু আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংকে কাজ করতেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় যখন আমেরিকায় অনেক চাকরি খালি হয়েছিল তখন তারা এশিয়ান দেশগুলো থেকে লোক নিয়েছিল। বন্ধুর পরামর্শে প্রবাল আমেরিকায় একটি অ্যাকাউন্টেন্টের চাকরির জন্য আবেদন করেন। কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকেন সেটা পাবেন না। ইতিমধ্যে প্রবালের বড় মেয়ে প্রেমে পড়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের একটি ছাত্রের, সবার অজান্তে। জানা গেল যখন তখন সে অন্তঃসত্ত্বা। ক্ষিপ্ত প্রবাল কন্যাকে প্রহার করেন এবং ঘরে বন্দি করে রাখেন অন্নজল না দিয়ে। বাঙালি পিতা এ ছাড়া মেয়েকে সাহায্য করতে জানতেন না। কন্যা বিলাপ করত। প্রবাল ও তাঁর স্ত্রী নিজেদের অদৃষ্টকে দায়ী করতেন। তৃতীয় দিনে প্রবালের কনিষ্ঠা কন্যা দিদির কান্নায় বিচলিত হয়ে দরজা খুলে দেয়। এবং দিদি একটি জলের উঁচু ট্যাংক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। মৃত বিধ্বস্ত দিদির দিকে তাকিয়ে সেই শিশুটির মনে হয় বাবাই খুন করেছে। বাবা দিদির মৃত্যুর জন্য দায়ী। লোকলজ্জা ব্যক্তিগত শোক যখন প্রবল তখনই প্রবাল আমেরিকায় চাকরি পান। প্রায় পালিয়ে বাঁচতে তিনি চলে আসেন প্রথমে একা। দুবছর পরে কন্যা ও স্ত্রীকে নিয়ে আসেন। বাড়ি কিনেছেন। সিটিজেনশিপ পেয়ে গেছেন। এখন প্রতিমুহূর্তে এক ডলার কত টাকা ভেবে শান্তি পান। মেয়ে সপ্তদশী হয়েছে আমেরিকানদের সঙ্গে মিশে। প্রবাল বঙ্গসংস্কৃতি বর্জন করেছেন। স্ত্রীকে নিয়ে হ্যাট, প্যান্ট পরে ছুটির দিনে পার্কে বসে বিয়ার খেয়ে আমেরিকান মেয়েদের দেখে মনে-মনে আফশোশ করেন বড় দেরিতে এলেন এদেশে। বাড়িতে লুঙ্গি পরেন কিন্তু কেউ এলে ঝটপট স্যুট পরে দরজা খোলেন। বাঙালির অভ্যাসকে ব্যঙ্গ করেন কিন্তু দরজা বন্ধ করে টয়লেটে বসে পান খান আরাম করে। মেয়েকে স্বাধীনতা দিয়েছেন কিন্তু বলে দিয়েছেন তার ছেলে বন্ধুদের সারি হবে এইরকম, ভালো বাঙালি ছেলে, ভালো ভারতীয় ছেলে, ভালো সাদা চামড়ার আমেরিকান কিন্তু কখনই কালো চামড়ার মানুষ নয়। মেয়েটি আমেরিকান সংস্কৃতি গ্রহণ করলেও বাবাকে হিপোক্র্যাট বলে মনে করে। সে দিদির মৃত্যুর জন্যে বাবাকেই খুনি মনে করে এখনও। এবং হয়তো সেই কারণেই সে একটি কালো আমেরিকান ছেলেকে ভালোবেসে ফেলে। প্রবাল ব্যাপারটা জানতে পেরে বর্তমান জীবন বিস্মৃত হয়ে মেয়েকে প্রহার করতে উদ্যত হয় ছেলেটির সামনেই।

ছেলেটি বাধা দিলে মেয়ে বলে, 'না, ওঁকে ছেড়ে দাও। দিদিকে যেভাবে খুব করেছেন ঠিক সেভাবেই আমাকে খুন করে যদি খুশি হন তাহলে ওঁনাকে সেটা হতে দাও।' প্রবাল প্রচণ্ড ধাক্কা খায়। আমেরিকানদের বহিরঙ্গে অনুকরণ এবং অন্তরে গোঁড়ামি নিয়ে থাকা এই লোকটিকে উপেক্ষা করে তাঁর মেয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। গল্পের শেষে বিপর্যস্ত প্রবাল যখন মেয়ের জন্য কাঙাল, তখন মেয়ে দ্বিধায় পড়ে সে কী করবে। তার আমেরিকান বান্ধবী বলে, 'জানো, আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি আমার বাবা তাঁর সমস্ত ইগো ত্যাগ করে আমার দিকে ভালোবাসার হাত বাড়াবেন!' সেইসময় মেয়েটি আশ্রয় নিয়েছিল বান্ধবীর ঘরে। টেলিফোন নম্বর জানতে পেরে বিধ্বস্ত প্রবাল যখন মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে চেয়ে রিং করেছিল তখন শ্বেতাঙ্গিনী রিসিভারটা তুলে কথা বলে মেয়েটিকে ওই অনুভূতির কথা জানিয়েছিল। মেয়েটি যার নাম পিংকি রিসিভার নিয়ে হেলো বলতেই খড়কুটো আঁকড়ে ধরার ভঙ্গিতে প্রবাল কঁকিয়ে উঠলেন, 'মাগো, আমি আর পারছি না।'

এই ছিল মূল কাঠামো। সেইসঙ্গে এসেছিল প্রচুর চরিত্র। যারা বিদেশের একদা ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব করছে। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের বিরোধ যেখানে প্রবল সেখানে দেখা গেছে পিংকি রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে ভালোবাসে প্রবাল সোমের মতে প্যানপ্যানানি সত্ত্বেও। পূর্ব পাকিস্তানি এক ভদ্রলোক চাকরির লোভে জাহাজে কাজ নিয়ে এদেশে এসে ফিরে যাননি আর। রেস্টুরেন্ট খুলেছেন বেনামে কারণ তিনি নাগরিকত্ব পাননি। পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ হয়েছে অথচ তাঁর ফেরার উপায় নেই। গোপনে তিনি শুধু টাকা পাঠিয়ে যান। এই মানুষটির কাছে প্রথম প্রজন্মের মানুষেরা যেমন অহংকার নিয়ে আসে দ্বিতীয় প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা আসে উত্তপ্ত স্নেহ ভালোবাসা পেতে। পিংকির বন্ধু এই বয়স্ক মানুষটিও। যতদূর সম্ভব উপন্যাসের প্রতি অনুগত থেকে চিত্রনাট্য লিখেছিলাম। যদিও প্রচুর ঘটনা ও চরিত্র বাদ দিতে হয়েছিল। শৈবাল আর টিয়া নামের যুবক যুবতী স্থান পেয়েছিল শুধু পিংকি ও প্রবাল সোমের সূত্রেই।

মজার কথাটা হল, শোনার পর কেন্ট মাথা নেড়ে বলেছিল, 'নাঃ, এটা একদম অবিশ্বাস্য। ওদের আমেরিকায় আসার পরের ঘটনা নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুলছি না কিন্তু মিস্টার সোম তো এখানে আসতেই পারবেন না।'

মনোজ চমকে উঠল, 'কেন? আপনি কি জানেন না সাতষট্টিতে—?'

কেন্ট হাত নেড়ে ওকে থামাল, 'তা নয়। ওকে তো ইন্ডিয়ান পুলিশ অ্যারেস্ট করবে মেয়েকে হত্যা করার অপরাধে। লোকটা এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছে যাতে ওর মেয়ে আত্মহত্যা করে। প্ররোচনা দেওয়াটা তো ক্রাইম। ওকে কী করে এদেশে আনলেন আপনারা?'

মনোজ আমার দিকে তাকাল। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইলাম। মনোজ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে বসল। আমাদের দেশে মানসিক অত্যাচারের কারণে সন্তান বা পিতামাতা আত্মহত্যা করলে শতকরা নিরানব্বুইটি ঘটনা নিয়ে থানা পুলিশ হয় না। বাবা-মাকে যদি সন্তান খেতে না দেয় এবং তাঁরা যদি অনশনে থেকে বাধ্য হন মরে যেতে তবে তার জন্যে কখনই সন্তানের শাস্তি হয় না। প্রবাল সোমের বড় মেয়ের আত্মহত্যার কারণ হিসেবে লোকে প্রেম ও সন্তান ধারণকেই স্বাভাবিক মনে করবে। পিতা হিসেবে মারধর করে প্রবাল কোনও অন্যায় করেছেন বলে ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ মনে করবে না। পিতার আচরণ ওইটেই স্বাভাবিক বলে ধরে নেবে সবাই।

কেন্ট এবং সাইমনকে এসব কথা বোঝাতে সময় লাগল অনেক। হঠাৎ সাইমন একটা প্রশ্ন করে বসল, 'আচ্ছা, আমি শুনেছি আগে তোমাদের দেশে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে তার সঙ্গে পুড়িয়ে মারা হত। এবং এটাকে কেউ ক্রাইম মনে করত না। এখন তো এসব ক্রাইম বলে মনে করা হয়। না?'

মনোজ বলল, 'নিশ্চয়ই। আইন এক্ষেত্রে চূড়ান্ত শাস্তি দেবে।'

'এখন তাহলে কেউ ওসব করতে সাহস পায় না?'

'না। প্রত্যেক দেশের মানুষেরই অতীতে কিছু-কিছু খারাপ ব্যাপার থাকে।'

'কিন্তু এখন কোনও যুবক স্বামী মারা গেলে তার বিধবাকে নিয়ে কী করা হয়?'

'তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাপের বাড়িতে ফিরে যান। অনেকেই চান সম্মানের সঙ্গে স্বামীর বাড়িতে থাকতে। সম্পর্কটা অন্য আত্মীয়দের সঙ্গে কীরকম তার ওপর নির্ভর করছে সব।'

'যদি তার বাবা-মা না থাকে। সে কি আবার বিয়ে করবে? তাকে স্বামীর আত্মীয়রা বিয়ে করতে সাহায্য করবে?'

মনোজ স্বীকার করল শতকরা এক ক্ষেত্রেও এই মানসিকতা তৈরি হয়নি।

'তাহলে সেই যুবতী মেয়েটি সারা জীবন একা থাকবে কেন?'

'হ্যাঁ। এই নিয়মটা ভাঙা দরকার।' মনোজ বলল, 'তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওই মেয়েটি একা বেরিয়ে আসতে পারে না অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাবে। আমাদের দেশে এখনও আত্মীয়রা উদ্যোগ নিয়ে বিবাহ ঘটান। কোনও পুরুষ যুবতী বিধবাকে চট করে বিয়ে করতে চাইবে না।'

'প্রেম হলে?'

মনোজ হাসল, 'প্রেম! যে দেশে এখনও প্রেম মানে চাপাচাপি ব্যাপার সে দেশে কোনও বিধবা প্রেম করছে জানলে রীতিমতো অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়।'

'আইনের চোখেও!'

'না। সমাজের চোখে।'

'তোমাদের দেশে সমাজ আছে এখনও?'

'না। নেই। তবে এসব ক্ষেত্রে তারা যেন কোত্থেকে উদয় হয়।'

সাইমন কিছুক্ষণ ভাবল। আমরা ওর মুখের দিকে দেখছিলাম। হঠাৎ সে বলল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। যারা বিধবাদের পুড়িয়ে মারত তাদের সঙ্গে এই লোকগুলোর পার্থক্য কী। পুড়িয়ে মারলে একেবারেই চুকে গেল, সারাজীবন বাঁচিয়ে রেখে তিলতিল করে মারাটা আরও জঘন্য অপরাধ। এর জন্যে আইন নেই কেন?'

এই লেখা যারা পড়ছেন এইসব সত্যি কথা শুনতে আমাদের অস্বস্তির ব্যাপারটা তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আলোচনাটা কোথায় পৌঁছে গেল। দুটো দেশের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য নিয়ে একটা গোঁজামিল সমাধান টানতে আমি রাজি নই। মানুষের সম্পর্কগুলো যদি হৃদয় থেকে জন্মায় তাহলে পৃথিবীর কোনও দেশেই তা আলাদা হতে পারে না। আমরা তো এতদিন শুনতে পেতাম আমেরিকানরা পাখা উঠলেই বাবা-মাকে কলা দেখিয়ে বিয়ে করা বউকে নিয়ে আলাদা থাকে। সেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পিতামাতা, যাঁরা মনোজের প্রতিবেশি তাঁরা আমার ভ্রান্তি দূর করেছিল। এদেশে এক বাড়িতে থেকেও সচ্ছল ছেলে তার বউকে নিয়ে স্বার্থপরতার যে চূড়ান্ত নিদর্শন বাবা-মা ভাই-বোনকে দেখায়, সেটা কি আরও বেশি বেদনাদায়ক নয়? যা সত্যি, যা স্বাভাবিক তা মেনে নেওয়ার সময় আমাদেরও হয়েছে। অসুস্থা স্ত্রীকে কেন রান্না করে স্বামীকে খাওয়াতে হত, বা হয়? কিন্তু এখন তো স্বামীও রান্নাঘরে প্রয়োজন হলে ঢুকছেন অথবা বাইরে থেকে খাবার আনিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে? এই ব্যাপারটা কি আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে কেউ কল্পনা করতে পারতেন? ওঁদের বলেছিলাম, 'আর বড়জোর দশ বছর। আমাদের মেয়েরা যেভাবে শিক্ষিত হচ্ছেন, আত্মমর্যাদাবোধ যেভাবে বাড়ছে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের যে চেষ্টা চলছে তাতে দশ বছরের মধ্যে পুরো পালটে যাবে ব্যবস্থাটা। একজন পুরুষ শুধু বাণী উচ্চারণ করতে পারেন, কাজের কাজটা করবেন নারীরাই। সেদিন আসতে বেশি দেরি নেই।'

প্রায় বিকেল নাগাদ আমরা সিদ্ধান্তে এলাম শ্যুটিং শুরু হবে শীতের মাস দুই-তিন আগে। টানা। ফুয়াদ ইতিমধ্যে বাংলাদেশের দুজন শিল্পীর সঙ্গে কথা বলে রেখেছে। তাঁরাও আগ্রহ দেখিয়েছেন। আমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে যেসব শিল্পী নিউইয়র্কে আসবেন তাঁদের সঙ্গে চুক্তি করব। আমরা কেউ

নিজেদের কাজের জন্যে পারিশ্রমিক নিচ্ছি না। কিন্তু যোগ্যতা ও কাজ বুঝে লাভের অংশ বরাদ্দ করা হবে। সেইসব কাগজ মনোজ ইতিমধ্যে তৈরি করে রাখবে। কলকাতার ও ঢাকার শিল্পীরা থাকবেন এ পাড়াতেই। একটা বাড়ি মাস-দুইয়ের জন্যে ভাড়া নেওয়া হবে। এবং স্থির হল পদ্মিনীকে যেহেতু আর পুরো প্রযোজনার দায়িত্ব দেওয়া যাচ্ছে না তাই আশিভাগ অংশ মনোজ ও পদ্মিনীর মধ্যে থাকবে।

এই প্রথম বাংলা ভাষায় বাঙালির সমস্যা নিয়ে একটা ছবি নিউইয়র্কে হতে চলেছে এমন সম্ভাবনা বিকেলবেলায় যেন আমাদের ধরাছোঁয়ার মধ্যে চলে এল। ওরা চলে গেলে বুঁদ হয়ে ছিলাম কিছুক্ষণ। এইসময় টেলিফোন বাজল। মনোজ কথা বলে এসে আমাকে জিগ্যেস করল, 'আজ রাত্রে কি ঘুমোবেন?' হেসে ফেললাম। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে অন্দরমহলের দিকে তাকালাম। মনোজ বলল, 'একটা রাত না ঘুমোলে কতটা খারাপ ভাববে! আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক ফোন করেছিলেন। কলকাতায় আপনারা যে আড্ডায় যান তার সঙ্গে ওঁর সংযোগ আছে। উনি আজ রাত্রে আপনাকে নতুন কিছু দেখাতে চান। ইচ্ছে হলে এক রাউন্ড ঘুমিয়ে নিন। ঠিক ন'টায় আপনাকে ডেকে দেব।'

॥ ২৪ ॥

জামসেদপুর টেলকোর সঙ্গে রাতের কুইন্সের খুব মিল। তবে টেলকোতে ডিসেম্বরের শেষে যে ঠান্ডা নামে কুইন্সের গরম পড়ার আগের মুহূর্তে সেই ঠান্ডা। মনোজ গাড়ি চালাতে-চালাতে হঠাৎ জিগ্যেস করল, 'রবীন্দ্রনাথ হেমন্ত নিয়ে এত কম, মুষ্টিমেয় গান লিখলেন কেন বলুন তো? বর্ষা বসন্ত তো জোয়ারের মতো অফুরন্ত, আর যত কিপটেমি হেমন্তের বেলায়?'

চোখের সামনে শীতমাখা হাইওয়ে। হুস হাস গাড়ির ছুটে যাওয়া, মসৃণ রাস্তায় একটুও ঝাঁকুনি না খেয়ে চারপাশের দৃশ্য আলস্য নিয়ে দেখা আর এর মধ্যে মনোজ একই প্রশ্ন ছুড়ে দিল? হেসে উঠলাম, 'কিপটেমি হবে কেন? যা পেরেছেন তাই লিখেছেন।'

'এই সমরেশ, এমন বোকার মতো কথা বলবেন না। বর্ষা নিয়ে একশো ষোলোটা গান, বসন্ত নিয়ে ছিয়ানব্বুই, শরৎ এল তিরিশটি গানে, গ্রীষ্ম ষোলোটায় আর শীত পর্যন্ত জায়গা পেল বারোবার সেখানে হেমন্ত মাত্র পাঁচখানা গানে।' মনোজ গাড়ির স্পিড বাড়াতে গিয়ে বাড়াল না।

'আসলে আমাদের দেশে শরৎ-এর পর এত চট করে শীত চলে আসে যে হেমন্তকে চেনা যায় না। আমি তো বলব রবীন্দ্রনাথ ঠিকই করেছেন বেশি গুরুত্ব না দিয়ে।'

'কিন্তু জীবনানন্দ! হেমন্তের বিকেল? শীতের চেয়ে হেমন্ত কি অনেক বেশি বিষণ্ণতা আনে না? তাকিয়ে দেখুন রাত্রের রংও কেমন মায়াময় এখন! মনোজের কথায় আবার তাঁর কথা মনে পড়ল। গীতবিতান যাঁর কাছে গীতার চেয়ে বেশি হৃদয়গ্রাহী ছিল। তিনি যখন পুজোর গান প্রেম নিবেদনের জন্যে কোনও নারীর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতেন তখন মোটেই ঈশ্বরচিন্তা আসত না। সন্ধ্যা পেরিয়ে যাওয়া রাত, ঘন হয়ে রাতের নামা নিউইয়র্কের নীল শুষে নেওয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে একই লাইন অন্যতর মানে নিয়ে এল, 'আজ যেমন করে গাইছে আকাশ তেমনি করে গাও গো।' সন্তোষকুমার ঘোষ বলতেন, 'যৌবন চলে গেল অথচ বার্দ্ধক্য ইতস্তত করছে, এ বড় যন্ত্রণার সময়। এই হেমন্তে শুধু মানিয়ে নেওয়া, আকাশের সুরে সুর মিলিয়ে গান গেয়ে যাওয়া।'

ম্যানহাটনের মুখে একটা নির্জন রাস্তায় ফুটপাতের গা ঘেঁষে গাড়ি থামাল মনোজ, কিন্তু ইঞ্জিন বন্ধ করল না। এখানে পার্কিং নেই বলেই ওই ব্যবস্থা। পুলিশের গাড়ি দেখলেই চাকা গড়াবে। ঘড়িতে এখন রাত সাড়ে এগারোটা। ঠান্ডাটা এখন বেশ জম্পেশ লাগছে। প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে গাড়ির লাইটারে ধরিয়ে নিলাম। কলকাতা থেকে আনা আমার নিজস্ব ব্র্যান্ডের সিগারেট

কবে শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি স্টেট এক্সপ্রেসে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কেনার সময় দেখেছি আমার নিজস্ব ব্র্যান্ডের চেয়েও সস্তা পড়ছে। যিনি আসছেন তাঁর সম্পর্কে মনোজ আমাকে একটা ধারণা দিয়েছিল। বিবাহিত কিন্তু করিৎকর্মা পুরুষ। বেশি কথা বলেন বলে মনোজের না-পছন্দ। কিন্তু কলকাতা থেকে কোনও ঈষৎ পরিচিত লোক এলে এখানকার কেউ যদি যেচে কথা বলতে চায় তাহলে তাকে নিষেধ করতে যাওয়া ঠিক নয়। হঠাৎ মনোজ বলল, 'তিনি আসছেন।'

দেখলাম, একটা লম্বা শরীর, ওভারকোটে মোড়া দ্রুত পা পেলে ফুটপাত পেরিয়ে এগিয়ে আসছে। লোকটাকে বাঙালি মনে হচ্ছে না।

গাড়ির কাছাকাছি আসতেই মনোজ হাত বাড়িয়ে পেছনের দরজা খুলে দিল। ভদ্রলোক একটানে শরীরটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে চিৎকার করলেন, 'হাই! শুভ সন্ধ্যা ভদ্রমহোদয়। আমি কি আপনাদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রেখেছি? আমার তো মনে হয় সেটা করিনি।'

মনোজ বলল, 'শুভ, ইনি সমরেশ।'

'নমস্কার মশাই। আচ্ছা, আপনাকে কলকাতায় দেখিনি কেন বলুন তো?' শুভ একেবারে সামনের সিটের গায়ে ঝুঁকে পড়লেন। ওঁর নিশ্বাসও টের পেলাম।

মনোজ বলল, 'কলকাতা তো বড় শহর শুভ, তাই না?'

'দুর। মোটেই না। লেখকদের কয়েকটা আড্ডা আছে। লেকক্লাবে রবিবারের সকাল, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ক্লাবে শনিবারের রাত, তা ছাড়া অনেকগুলো বাড়ি আছে যেখানে গেট-টুগেদার হয় তার একটাতেও আপনাকে দেখিনি।'

'আপনি ওসব জায়গায় যেতেন?'

'যেতেন মানে? কলকাতায় গেলে অন্য কোথাও যাই না। আমি আপনাকে একটু বোঝার চেষ্টা করি। দাঁড়ান। মনোজের কাছে সব শুনেছি। আমেরিকার কী কী দেখা বাকি আপনার?'

'সব। কারণ আমি বাকির লিস্টে কী আছে জানি না।'

'আপনি কি খুব গোঁড়া টাইপের লোক?'

'মানে?'

'শুনেছি, মিট করিনি, কোনও-কোনও বাঙালি লেখক আছে সতীলক্ষ্মী টাইপের। পিসিমা মাসিমামার্কা গল্প লিখে করে খান। আপনি কি সেই ধরনের? শুভর প্রশ্ন শুনে মজা লাগল। মনোজ হেসে উঠল হোহো করে। শুভ একটুও বিব্রত না হয়ে বলল, 'আপনি জল না পাথর না জানলে এই রাতটাকে ব্যবহার করব কী করে? পাথর পাথরই কিন্তু জল কেমন না পাত্র যেমন!'

'জলে কি না জানি না তবে পাথর নই এটুকু ধরতে পারেন।' সত্যি কথাটাই জানালাম। শুভ বলল, 'গুড। এতেই চলবে। মনোজ, বাঁ-দিকে গাড়ি ঘোরান।'

মনোজ নির্দেশ পালন করল। আমরা জানলাম শুভ যেখানে থাকেন সেখান থেকে ম্যানহাটনে আসতে বাসে লাগে এক ঘণ্টা। বউ শুয়ে পড়ার পর তিনি বেরিয়েছেন। লাস্ট বাসে সেখানে ফেরা যাবে না কারণ ম্যানহাটন থেকে তাহলে সাড়ে বারোটার উঠে যেতে হয়। তিনি ফিরবেন ভোর সাড়ে চারটের ফার্স্টবাসে। যখন বাড়ি পৌঁছোবেন তখনও ওঁর স্ত্রীর নিদ্রিতা থাকবেন। স্ত্রীকে সমীহ করেন কি না মনোজ প্রশ্ন করলে শুভ খেঁকিয়ে উঠলেন, 'এটা আবার একটা প্রশ্ন হল? কেটে গেলে রক্ত পড়ে কি না কাউকে জিজ্ঞাসা করেছেন?'

মানুষটি একটু কথা বলেন বেশি কিন্তু আমার মন্দ লাগছে না। দক্ষিণ কলকাতায় বিশেষ করে একধরনের মানুষ দেখেছি বেশ চিবিয়ে-চিবিয়ে অনর্থক ভারী ভঙ্গি করে কথা বলেন। শুভর মধ্যে সেটা নেই। অনর্গল ইংরেজি শব্দের কায়দাবাজি আছে কিন্তু দু-মিনিটেই বোঝা যায় প্যাঁচ বেশি নেই। শুভ বললেন, 'আপনাকে আমার গার্ল ফ্রেন্ডের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি। আমরা খুব স্টেডি। এই একটি মেয়ে মশাই যার সঙ্গে চার বছর আছি কিন্তু চার বারের বেশি চুমুও খাইনি। ঠান্ডা

মেয়ে আমার একদম ভালো লাগে না।'

'আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন কেন? তা ছাড়া এত রাত্রে—'

'মনোজ, ডান দিকে গাড়ি ঘোরান।'

শুভর সিদ্ধান্ত বদল করতে সময় লাগে না।

মনোজ আদেশ মান্য করে জিজ্ঞাসা করল, 'শুভ, স্ত্রী ছাড়া আপনার প্রেমিকার সংখ্যা কত?'

'নেই। কারণ স্ত্রীই আমার প্রেমিকা। আমার প্রথম। যে আসে তাকেই সুনীল গাঙ্গুলি শুনিয়ে দিই। তোমার আগের নারী সব প্রেম নিয়ে গেছে। ব্যাক ক্যালকুলেট করতে গিয়ে আগের নারী হিসেবে পাই স্ত্রীকেই। এঁরা সবাই মেয়েবন্ধু।'

শুভর নির্দেশে পার্কিং প্লেসে গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমরা হাঁটা শুরু করলাম। গাড়ির বাইরে এসে মনে হল জমে যাব। হুহু বাতাস বইছে। পকেটে হাত পুরেও স্বস্তি নেই। রাস্তায় লোকজন খুব কম। দোকানপাটও বন্ধ হয়ে গেছে। অবশ্য বার-রেস্টুরেন্টের নিওন সাইনগুলো জ্বলছে। শুভ বাঁ-দিকের একটা উঁচু বাড়ির সামনে পৌঁছে বললেন, 'ফলো মি।' কার্পেট বিছানো সিঁড়ি বেয়ে শুভ তাঁর লম্বা চওড়া শরীর নিয়ে গটগটিয়ে উঠলেন। ওপরের সাইনবোর্ড বলছে এটা ক্লাব। ঝকঝকে উর্দিপরা বিশাল চেহারার এক কালো যুবক দাঁড়িয়ে আছে প্রবেশদ্বারের সামনে। শুভ তাকে বললেন, 'হাই জো।'

জো মাথা নাড়ল, আমাদের দেখল তারপর ঈষৎ সরে দাঁড়িয়ে যাওয়ার পথ করে দিল। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে একটা ছোট্ট ঘর পেলাম যার একদিকে কাচের ঢাকা কাউন্টারের ওপাশে বেশ বৃদ্ধা এক শ্বেতাঙ্গিনী বসে আছেন। শুভ পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে দেখালেন এবং দশ ডলার দিলেন। তারপর বললেন, 'আপনাদেরটা আমি দিয়ে দিচ্ছি।' মনোজ আপত্তি করল, 'আপনি দেবেন না, কেউ নাবালক নই।'

কোথায় যাচ্ছি কেন যাচ্ছি জানি না। তবু চল্লিশ ডলার বেরিয়ে গেল। মনোজ বলল, 'এ সেই রেস থেকে পাওয়া ডলার। গায়ে লাগবে না।' শুভর লাগল দশ কিন্তু আমাদের মাথাপিছু কুড়ি। বৃদ্ধা যে কার্ডদুটো এগিয়ে দিলেন তাতে লেখা তিন মাসের মধ্যে কার্ডধারী এখানে যতবার আসবেন তাকে দশ ডলারের বেশি প্রতিবারে দিতে হবে না। বুঝলাম শুভ কেন সুবিধাটা পেলেন। কার্ডের পরে বৃদ্ধা আমাদের দিকে তিনটি চাবি এগিয়ে দিলেন। মনোজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'চাবি দিয়ে কী হবে?'

অত্যন্ত স্মার্ট ভঙ্গিতে শুভ আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ইংরেজিতে বললেন, 'আপনার জন্যে লকারের চাবি দেওয়া হল। ভেতরে ঢুকলে লকার রুম পাবেন। সেখানে চাবির নম্বর মিলিয়ে লকার খুললে পরিষ্কার তোয়ালে দেখবেন। জামা কাপড় খুলে ওই লকারে রেখে তোয়ালে পরে নেবেন।'

আমি হতভম্ব, 'খামোকা তোয়ালে পরতে যাব কেন?'

'এই ক্লাবে সবাই তাই পরে। প্রকৃতির কাছাকাছি আসা আর কী। ভেতরটা একদম শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, ঠান্ডা লাগার সুযোগ নেই। অবশ্য যদি আপনারা পোশাক খুলতে না চান কেউ জোর করবে না। তবে সেক্ষেত্রে আপনারা মূল স্রোতের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবেন। এখন আপনাদের যা অভিলাষ তাই করুন।'

মনোজ আমার দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'আমরা দর্শক হিসেবেই থাকতে চাই।' লকারের দুটো চাবি ফেরত দিয়ে দেওয়া হল। শুভ দরজা ঠেলে আমাদের পাশের হলঘরে নিয়ে গেলেন। বিশাল হলঘর। আমাদের ইচ্ছেমতন বিচরণ করতে বলে শুভ চলে গেলেন লকার রুমে, সম্ভবত তোয়ালে পরতে। হালকা নীল আলোয় হলটাকে রহস্যময় মনে হচ্ছিল। হলের এক কোণায় পার্কের মতো সাজানো চাতাল। তাতে জল বয়ে যাচ্ছে। অজস্র কাগজের ফুল ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। যেন সিনেমার সেট তৈরি, একটুবাদেই শুটিং শুরু হবে।

এই মুহূর্তে আমার বিশেষ কথাটি বলা প্রযোজ্য। অশ্লীলতার প্রকৃত ব্যাখ্যা আমার নিজস্ব বোধ যেভাবে নিয়ে থাকে তার সঙ্গে পাঠকদের একাত্ম হওয়ার কোনও কারণ নেই। জ্ঞানত, লেখালেখি শুরু করার পর এই নিয়ে লেখার প্রবৃত্তি হয়নি। মনে আসে তিন নম্বরের সুধারানী নামক একটি উপন্যাসে সোনাগাছির সেই অশিক্ষিত বারবনিতা যখন আন্তর্জাতিক বারবনিতা সম্মেলনে আমন্ত্রিতা হয়ে প্যারিসে যাচ্ছিল তখন এরোপ্লেনের টয়লেটের সামনে চুম্বনরত নারীপুরুষকে দেখে সে বর্ণনা করেছিল সহযাত্রীর কাছেই এই বলে, ওরা ব্যাবসা করছে এখানে? অর্থাৎ এই নারীটির কাছে জগৎ তার জগতের দৃষ্টিতেই প্রতিষ্ঠিত। অনেকেই বলেছেন এতে নাকি অশ্লীলতা এড়ানো গেল। আমি বুঝি না। কিন্তু শুভবাবু আমাদের যে জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে লকার রুমে গিয়েছিলেন তার বিস্তৃত বর্ণনা নিশ্চয়ই ভারতীয়দের কুৎসিত লাগবে। মিনিটপনেরোর মধ্যে আমার বমি পেয়েছিল। টয়লেটে ঢুকে বমিও করেছিলাম এবং যতক্ষণ না বাইরের খোলা আকাশের নীচে দাঁড়াতে পেরেছি ততক্ষণ গা ঘিনঘিন ভাবটা যায়নি।

অতএব একই অনুভূতি আমি আপনাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চাই না। কিন্তু সারমর্মটি বলা প্রয়োজন। আমি শুভর কাছে কৃতজ্ঞ যে তিনি ওখানে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং না গেলে আধুনিক জীবনের এক ধারার চূড়ান্ত পরিণতি আমার অগোচরে থাকত।

নরনারীর জীবনে প্রেম ভালোবাসা প্রসূত অথবা ব্যতিরেকেই যে যৌনসম্পর্ক আসে তাকেই এতকাল সুস্থাচার বলে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু এই স্বাভাবিক ব্যাপারই কোনও-কোনও মানুষ এবং মানুষীকে আর টানছে না। স্যাডিস্টদের আমরা জানি। যারা একধরনের যন্ত্রণা সৃষ্টি করে আনন্দিত হয়। কিন্তু আমি জানতাম না দুটো হাত ওপরের হাতকড়ায় স্বেচ্ছায় বেঁধে দশ ডলার খরচ করে ভেতরে কোনও মানুষ ঢুকতে পারে শুধু পশ্চাৎদেশে এবং পিঠে কোনও রমণীর হাতে চাবুকের আঘাত খেতে। তার শরীরে যখন লাল দাগ ফুটে ওঠে তখন মুখে তৃপ্তির হাসি ফোটে। সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে স্বামী এখানে আসে কারণ স্ত্রী শরীরে আঘাত পেতে চান যা স্বামীটি দিতে পারে না। বিবস্ত্রা স্ত্রী যখন ক্লিওপেট্রার মতো অহঙ্কারী হয়ে বসে থাকেন তখন স্বামী আহ্বান করেন ইচ্ছুক পুরুষদের। তারা সার বেঁধে দাঁড়ায় সামনে। অত্যন্ত অবহেলায় স্ত্রী একজনকে নির্বাচিত করলে অন্যদের মুখ ভার হলেও বিনা প্রতিবাদে সরে দাঁড়ায়। সেই পুরুষটি যখন স্ত্রীকে চাবুকের আঘাত করে তিনি উল্লাসে চিৎকার করেন আর দর্শকদের মুখ দেখে মনে হয় তারা কোনও স্বর্গীয় দৃশ্য দেখছে। এখানে মদ বিক্রি হয় না। নেশা যাদের উত্তেজনা দেয় এরা তাদের দলে পড়ে না। আমরা চমকিত হয়েছিলাম এক বৃদ্ধ দম্পতিকে দেখে। অন্তত নব্বুই-এর কাছে বয়স এবং তারা সভ্যপোশাকে কোণের দুটো চেয়ারে পাশাপাশি বসেছিলেন। মনোজ তাদের জিজ্ঞাসা করেছিল এই বয়সে এখানে তারা কেন আসে?

বৃদ্ধ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন বৃদ্ধা তাকে ধমকে চুপ করিয়ে রাখলেন। তারপর নিজেই জবাব দিলেন, সারাজীবন আমার স্বামীকেই কৈফিয়ৎ দিইনি কখনও তুমি কোন ছাড়।

শুভকে না জানিয়ে আমরা বেরিয়ে এসেছিলাম। বুঝতে পারছিলাম আমরা তোয়ালে না পরায় শুভ প্রথম দিকে অস্বস্তিতে ছিল শেষে আমাদের অস্তিত্ব ভোলবার চেষ্টা করছিল। এসব গল্প বিক্ষিপ্তভাবে আদিমকাল থেকে চালু আছে। কিন্তু এদের উৎসাহ দেওয়ার জন্যে একটা আইনসঙ্গত ক্লাব চালু রাখার প্রয়োজন ওদেশের মানুষ আজ অনুভব করেছে। শ্লীল-অশ্লীলের দোহাই পেড়ে কোনও লাভ নেই। নরনারীর স্বাভাবিক সম্পর্কের ভিত্তিতে মিলন শ্লীল নয় বলে মানুষ মনে করে বলেই এত দরজা জানলা বন্ধ করতে হয়। সেই বিখ্যাত গল্প মনে পড়ে গেল। একজন জার্মান ও একজন বাঙালির একই সঙ্গে পত্নী বিয়োগ হয়েছে। দুজনেই শোকে মুহ্যমান। জার্মান শেষ পর্যন্ত বলল, 'এই নির্জন পাহাড়ে আমার স্ত্রীকে কবর দিতে হবে। একটা ভালো কাপড় দরকার ওকে ঢেকে দেওয়ার জন্যে। সারাজীবন তো ওকে আমার ঢাকার দরকার হয়নি।' বাঙালি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

'ওকে পুরোপুরি দেখতে আমার তিরিশ বছর লাগল।' জার্মান অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের বিয়ে হয়েছে কত বছর?' বাঙালি জবাব দিল, 'তিরিশ বছর।'

কেন্ট চলে গিয়েছিল হাতে হাত মিলিয়ে। আমাকে নাকি তার ভালো লেগেছে। ঠিক যাকে বলে হুমড়ি খেয়ে দেখতে চাওয়া ট্যুরিস্ট, আমি তা নই। মনোজের সঙ্গে সে নিয়মিত যোগাযোগ করবে ছবিটার ব্যাপারে। আমি মনে-মনে হেসেছি। কেন্টকে নিশ্চয়ই আমাদের এই ভ্রমণবৃত্তান্ত সরকারি দপ্তরকে জানাতে হবে। তাঁরা জানতে পারবেন আমি সবসময় মসৃণ পথে হাঁটিনি। কিন্তু ভরসা এখানেই যে ওঁরা যেভাবে জীবন দ্যাখেন তাতে সংকীর্ণতা নেই বললেই চলে। দেশে ফিরে যাওয়ার টান পড়ছে মনে। কেন যেন মনে হচ্ছে অনেকদিন আমি কলকাতাকে দেখিনি। চা-বাগান ছেড়ে যখন জলপাইগুড়ি শহরে এসেছিলাম তখন কেবলই মনে হত কতদিন চা-বাগান দেখিনি। যখন কলকাতায় এলাম তখন জলপাইগুড়ি আমার শেকড় ধরে টানত। আর এখন কলকাতা টানছে। আমি জানি যদি আরও দশ বছর ধরে এই নিউইয়র্কে থেকে যাই তাহলে নিউইয়র্কও টানবে। আসলে আমি কোনও বিশেষ শহরের নই। শহরটায় থাকার অভ্যাসে অভ্যস্ত হই শুধু। এত বছর কলকাতায় থেকেও কলকাতার জন্যে কিছুই করিনি। করার কথাও মনেও আসেনি। প্রিয়জনের জন্যে কি লোকে কিছু না করে থাকে! তাহলে সবটাই অভ্যেস থেকে বানানো।

মাঝরাত্রে মনোজ আমার ঘরের দরজায় নক করল। লেপের তলায় শুয়েছিলাম। ফিউচার শক নামক একটি বই পড়তে-পড়তে খেয়াল ছিল না রাত কত হয়েছে। আজ সন্ধের পর আমরা বাইরে যাইনি। মনে হচ্ছিল সবই দেখা হয়ে গেছে। অথবা শুভর সঙ্গে সেই নিশিভ্রমণের পর থেকেই এই রাত দেখার আগ্রহে ভাঁটা পড়েছিল। সোয়েটার শাল চাপিয়ে বিছানা ছেড়ে দরজা খুলতেই দেখলাম মনোজ হাসছে খানিকটা অপ্রস্তুত ভঙ্গিতেই। জিজ্ঞাসা করল, 'ঘুমিয়ে ছিলেন?'

আমি আশেপাশে তাকালাম। মনোজের স্ত্রী নেই কোথাও। ওদের শোওয়ার ঘরের দরজা ভেজানো। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী ব্যাপার?'

'একটু নীচে আসবেন?' মনোজ জানতে চাইল।

'চলুন।' সিঁড়ি বেয়ে মনোজকে অনুসরণ করে মাটির নীচে হল ঘরে চলে এলাম। দেখলাম সবকটা আলো সেখানে জ্বলছে। এমনকী একটা টিভি নিঃশব্দে চলছে। সোফার এক কোণে পা মুড়ে চাদর জড়িয়ে আরাম করে বসলাম। মনোজ বলল, 'আমি খুব এক্সাইটেড। ব্যাপারটা ষোলো-সতেরো বছরে হওয়া উচিত সমরেশ, কিন্তু আমার মনে হল আপনাকে না শোনানো পর্যন্ত আমি ঘুমোতে পারব না। আপনি নিশ্চয়ই আমার অবস্থা বুঝতে পারছেন।'

'না। বুঝতে পারছি না। তবে যেহেতু ঘুমাচ্ছিলাম না তাই আড্ডা মারতে খারাপ লাগবে না।' সিগারেট ধরালাম আমি, তারপর বললাম, 'বেশ ঠান্ডা। আমরা এক পাত্তর পেতে পারি?'

'যাক। অ্যাদ্দিনে খেতে চাইলেন।' মনোজ প্রায় লাফিয়ে কোণের দিকে চলে গেল। দুটো গ্লাসে শিভাস রিগ্যাল ঢেলে জল মিশিয়ে টেবিলে রাখল। এ বাড়িতে যে-কোনও আমেরিকান গৃহের মতো নানান মদের বোতল রাখা আছে। যার এক-একটা নাম শুনলে কলকাতার মদ্যরসিকদের জিভ সিক্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু এ বাড়িতে পা দেওয়ার পর থেকেই মাঝে-মাঝে দুই-এক ক্যান বিয়ার ছাড়া আমার বিন্দুমাত্র বাসনা হয়নি ওগুলো গেলার। কেন হয়নি ঈশ্বর জানেন।

একটা চুমুক দিয়ে মনোজ বলল, 'শুনুন, আমি একটা গল্প লিখেছি!'

সোজা হয়ে বসলাম। 'এই দ্বীপ এই নির্বাসন' পড়তে-পড়তে আমার বারংবার মনে হয়েছে মনোজের হাত আমাদের অনেকের চেয়ে ভালো। একজন বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার নিউইয়র্কে বসে কোনও অনুপ্রেরণা ছাড়া একটা উপন্যাস লিখে গেল এটা ভাবা যায়, কিন্তু সেই উপন্যাস যদি চমক তৈরি করে তখন অন্যতর ভাবনা মাথায় আসে। আমি মনোজকে অনেকবার বলেছি গল্প লিখতে। ও এড়িয়ে গেছে, 'দুর আমার দ্বারা হবে না। নিজের পত্রিকার পাত ভরাতে যা দেখেছি তাই লিখেছি, গল্প

লেখার ক্ষমতা আমার কোথায়?' অতএব আমি চোখ বন্ধ করে বললাম, 'পড়ে যান।' মাটির নীচের সেই ঘরে পৃথিবীর কোনও শব্দ আসে না। মনোজের নিকটজনেরা ওপরের ঘরে গভীর নিদ্রামগ্ন। সেই মধ্যরাতে মনোজ একটানা গল্পটি পড়ে যখন শেষ করল তখনও আমি পানীয়ের পাত্রে হাত দিইনি। এবং আবার মনে হল অনেক-অনেক বছর পর বাংলা সাহিত্য একজন সত্যিকারের লেখক পেল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী নাম দিয়েছেন?'

'নামকরণ ব্যাপারটা খুব গোলমেলে, বুঝলেন। পুরোটা যে লিখতে পারব তাই আমি ভাবিনি। খুব খারাপ লেগেছে?'

'না মনোজ। আপনি একটি অনবদ্য গল্প লিখেছেন।'

'কেন অনবদ্য বলছেন?'

আমি থমকে দাঁড়ালাম। মুকুন্দর কাছে গল্প শুনেছি শম্ভু মিত্রের কাছে কেউ যদি তাঁর নাটক দেখে বলত খুব ভালো লেগেছে তাহলে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, 'কেন ভালো লাগল?' কারও খারাপ লাগলে তো আমরা জানতে চাই কী-কী কারণে খারাপ লেগেছে তাহলে ভালো লাগার কারণটা জানতে চাইব না কেন?

ভেবে দেখেছি খারাপ লাগার কারণগুলো বেশ চটপট মনে আসে কিন্তু ভালোলাগা বোধটা মনে ছড়ালে বোধবুদ্ধি দিয়ে তার বিশ্লেষণ করতে হয়। সেইটে করার সময় কেমন যেন বোকা-বোকা লাগে বেশিরভাগ সময়েই। মনোজ যখন প্রশ্ন করল তখন আমাকে ভাবতে হল। মনোজ জানতে চাইল কোন কারণে আমার মনে হল গল্পটি ভালো। আমরা যখন আলোচনা শেষ করেছি তখন ভোর হব হব। হাত জড়িয়ে ধরে সে জানতে চাইল, 'সত্যি বলুন তো গল্প লেখালেখি আমার হবে?'

বললাম, 'দেখুন মনোজ, এইরকম একটা গল্প লিখতে পারলে আমি খুশি হতাম। আপনি এখনই গল্পটা দেশ পত্রিকায় পাঠিয়ে দিন।'

মনোজ হোহো করে হেসে উঠল, 'খেপেছেন! 'দেশ'-এর মতো পত্রিকা একজন নতুন লেখকের গল্প ছাপবে। বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়ার মতো অবস্থা। ছোটখাটো কাগজের নাম বলুন যারা ছাপালেও ছাপাতে পারে।'

মাথা নাড়লাম, 'না। শুরু করতে হলে এক নম্বর দিয়েই করতে হবে।'

'দেশ আমার লেখা খুলেও পড়বে না।'

'আপনি সাগরদার নামে পাঠান। আমার বিশ্বাস ওই একটি জায়গায় বিচারে ভুল হয় না।' গল্পটির কারণে আমরা দুজনেই খুব উত্তেজিত ছিলাম। 'দেশ'-এ পাঠানোর ব্যাপারটা মনোজ মেনে নিতে পারছেন না। ওর ধারণা ভস্মে ঘি ঢালা হবে। ঘুম আসছিল না। আমরা দুজন নিঃশব্দে ওপরে উঠে এসে দরজা খুলে চাবি দিয়ে বাইরে পা দিলাম। তখনও অন্ধকার রয়েছে গাছের মাথায়। ঘাসের ওপর শিশির চপচপে হয়ে রয়েছে। হাড়কাঁপানো শীতে চারপাশ নিস্তব্ধ। দুজনে চুপচাপ রাস্তা ধরে হাঁটছিলাম। নিঃশ্বাস নিলেই বুক ভরে যাচ্ছিল। সারারাতের ক্লান্তির চিহ্ন এক ফোঁট ই শরীরে। মাথায় শুধু পাক খাচ্ছে গল্পের বিষয়বস্তু। আমি জানি সাগরদা নতুন ক্ষমতাবান লেখক খুঁজছেন। গত কুড়ি বছরে বাংলা সাহিত্য একজনও সেইরকম লেখক পায়নি যার লেখা পড়তে পাঠকেরা উন্মুখ হয়ে থাকে। বয়স্ক লেখকরা ক্রমশ স্তিমিত হচ্ছেন, কেউ-কেউ চলেও গেছেন অথচ নতুন কেউ তাঁদের জায়গা নিচ্ছে না। এইরকম চললে কুড়ি বছর পরে ক'জন লেখক বাঙালি পাঠকের জন্যে বেঁচে থাকবে কে বলতে পারে। আমাদের সময় স্কুলে পড়াশোনার যে রীতিনীতি ছিল তাতে আর যাই হোক ভবিষ্যৎ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা কোথাও ছিল না। সেটা হত আপনা আপনি। পাঠ্য বইয়ের বাইরে রাশি-রাশি পড়াশোনার আনন্দ আমরা পেয়েছি। কেউ-কেউ হাত পাকাতে শুরু করেছি তখন থেকেই। এখনকার ছেলেমেয়েদের সেই সুযোগ কম। ক্লাস নাইনে উঠলেই হয় ডাক্তার নয়

ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার প্রতিযোগিতায় নামতে হয় অভিভাবকদের নির্দেশে। সাহিত্য করার ফুসরৎ কোথায়! মনোজের গল্প সাগরদা যদি পড়েন তাহলে 'দেশ'-এ অবশ্যই ছাপা হবে।

হাঁটতে-হাঁটতে মনোজ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি সূর্য প্রণামের মন্ত্রটা জানেন, না? উত্তরাধিকারে পড়েছি।'

সেই কবে ছেলেবেলায় দাদুর সঙ্গে তিস্তা নদীর গা বেয়ে কাকভোরে হাঁটতে-হাঁটতে তাঁর মুখে নিত্য মন্ত্রটা শুনতাম, আজ আমার গায়ে কাঁটা দিল। মুহূর্তেই যেন আমি সেই ছেলেবেলায় পৌঁছে গেলাম। নিউইয়র্কের ভোর আর জলপাইগুড়ির ভোর একাকার হয়ে গেল। কিন্তু কী আশ্চর্য, আমি কিছুতেই মন্ত্রটা পুরো মনে করতে পারছি না। ভুল শব্দে গান গাওয়ার মতো ওটা উচ্চারণ করতে যাওয়া অন্যায়।

সকাল হচ্ছে। আমরা একটা কফি স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে কফি খাচ্ছিলাম। চোখের সামনে রাস্তায় একটু-একটু করে লোক বাড়ছে। কেউ জগিং করছে, কেউ হাঁটছে স্বাস্থ্যের কারণে। হঠাৎ মনোজ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'পেয়েছি।' গল্পটার নাম দেব 'গর্ভ দাও'।

এখানে পাঠকদের একটু পরের কথা বলে রাখি। ভালো গল্প পাঠিয়েছিল মনোজ। সেই গল্প সাগরময় ঘোষ 'দেশ' পত্রিকায় পূজা সংখ্যায় ছেপেছিলেন সরাসরি। এই সৌভাগ্য আর কোনও লেখকের হয়েছে কি না জানি না। ছ'মাসের মধ্যে মনোজের আরও দুটো গল্প দেশে ছাপা হল। শেষ পর্যন্ত সারগদা ওকে 'দেশ' পত্রিকার জন্য ধারাবাহিক উপন্যাস লিখতে বললেন। সাগরদা আমায় বলেছিলেন, 'অনেকদিন পরে একটি জাত লেখক পেলাম হে!'

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছে ছিল অন্যরকম।

ঈশ্বরের ইচ্ছের কথা আপাতত থাক। আমার খুব দৃঢ় ধারণা ভদ্রলোকের তালজ্ঞানের বড্ড অভাব। হঠাৎ কাউকে-কাউকে অনেক কিছু দিয়ে দেন, কাউকে একফোঁটাও নয়। আবার দিয়েই তার মনে হয় কেন দিলাম, তখন কেড়ে নিতে চেষ্টা করেন। যাঁদের কাছ থেকে পারেন না তাঁরাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যজিৎ রায়। যাঁদের কবজা করে ফেলেন তাঁরাই হয় মনোজ ভৌমিক। এই প্রসঙ্গ আজকের লেখার শেষে বলব। একজন লেখককে নাকি নির্লিপ্ত হতে হয়, কিন্তু আপনাদের কাছে বলতে দ্বিধা নেই, এরপর আর লেখার আগ্রহই আমার হচ্ছে না।

আমেরিকায় আমি গিয়েছিলাম মনোজের চিত্রনাট্যের কাজে, সরকারি ব্যবস্থাপনায় দেশ ঘুরে মানুষ দেখতে। সত্যি কথা বলতে গেলে এরপরেও তো কিছুদিন ওখানে ছিলাম। খুব বেশি মানুষের কথা আজ মনে পড়ে না শুধু নিউইয়র্ক টাইম্সের চলচ্চিত্র সমালোচক ভিনসেন্ট ক্যানবি আর বিখ্যাত অভিনেতা ডাস্টিন হফম্যান ছাড়া। ভিনসেন্ট ক্যানবি হলেন সেই ভদ্রলোক যিনি সত্যজিৎ রায়ের গুণমুগ্ধ হিসেবে নিউইয়র্ক টাইমসে অনেক লেখালেখি করেছিলেন। মনোজই ওঁর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিল। ওর আগ্রহ ছিল। আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের নিয়ে যে ডকুমেন্টারিটা ও বানাচ্ছে তা শেষ হলে ভিনসেন্টকে দেখাতে চায়। সেই ব্যাপারেই কথা বলবে। আমি একজন চলচ্চিত্র সমালোচক জেনে ভিনসেন্ট আগ্রহ প্রকাশ করেছেন কথা বলতে।

আমরা দুপুরবেলায় বেরিয়েছিলাম। হাতে সময় ছিল। ব্রডওয়ে পাড়ায় পাক দিয়েছিলাম অনেকক্ষণ। কোথাও টিকিট নেই। আমেরিকায় এসে ব্রডওয়ের নাটক দেখে যাব না ভাবতেই খারাপ লাগছিল। তিনমাস আগেই নাকি হাউসফুল হয়ে যায়। ডেথ অফ অ্যা সেলসম্যান, জোবরা দ্য গ্রীক অথবা ওহ্ ক্যালকাটা'র পোস্টার দেখে ফিরে আসতে হল। থিয়েটার পাড়ার অদূরে একটা সেন্টার থেকে কিছু প্রাত্যহিক টিকিট বিক্রি হয় সব নাটকের। সেখানে লাইন পড়ে কাউন্টার খুলতেই। ফুরিয়ে যায় চোখ মেলতেই।

নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা সম্পর্কে একটা বিশাল ভাবনা ছিল। আমেরিকার অত নামি কাগজ যখন, তখন তার অফিসের কেতাই হবে আলাদা। প্রতি ফ্লোরে অবশ্য ইউনিফর্ম পরা তদারকি অফিসার আছেন কিন্তু যখন আমরা ভিনসেন্টের সন্ধানে একটা হলঘরে পৌঁছোলাম তখন রাইটার্স বিল্ডিং-এর তিন চারতলায় হলঘরগুলোর সঙ্গে কোনও তফাত পেলাম না। সেই একইরকম ডাঁই করে রাখা কাগজপত্র, এ টেবিল থেকে ও টেবিলে চিৎকার করে কথা বলা, যে-কোনও বঙ্গদেশীয় কেরানির মনে হবে ঘরে ফিরে এলাম।

ভিনসেন্ট ক্যানবি অবশ্য ছোটঘরে বসেন কিন্তু সেটি খুবই সাধারণ। ষাট পেরিয় যাওয়া শিক্ষিত আমেরিকান চেহারার মানুষ। আলাপ হওয়ার পর বললেন, 'আজ আমি খুব টেনশনে আছি। ফ্রান্সে আজ "ঘরে-বাইরে" দেখানো হচ্ছে। ওর রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই।'

ব্যাপারটা দেশে থেকেই শুনেছিলাম। 'ঘরে-বাইরে' ওখানকার ফেস্টিভ্যালে দেখানো হবে। কিন্তু সেটা যে আজকেই তা জানতাম না। অতএব ছবিটার প্রসঙ্গ উঠল। ভিনসেন্ট পারিবারিক অসুবিধার জন্যে ফেস্টিভ্যালে যেতে পারেননি। ছবিটাও দেখা হয়নি। মনোজ তো সুবিধে পায়নি। ভিনসেন্ট জানতে চাইলেন কলকাতায় ছবিটা রিলিজ করেছে কি না। আমার অভিজ্ঞতা কী! হঠাৎ অনুভব করলাম যে তর্ক বা মতামত আমি কফি হাউসের টেবিলে বসে সোচ্চারে উচ্চারণ করতে পারি একজন বিদেশির কাছে সেটা করতে বাধছে। আমার মতো একজন সত্যজিৎভক্ত কলকাতায় বসে মনে করছে এটি তাঁর প্রথম সারির ছবি নয়। কিন্তু সে কথা আমি নিউইয়র্কে চেঁচিয়ে বলতে যাব কেন? অনেকের কাছে ব্যাপারটা সরল থাকছে না কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যাঁর কাছে আশাতিরিক্ত পেয়েছি তাঁর কয়েকটা ত্রুটি চোখে পড়লেই মধ্যরাতের কুকুরের মতো চিৎকার করায় আর যাই হোক কিছু পাওয়া হয় না। সারাজীবন যে পিতা নিজেকে সংসারের জন্যে উজাড় করে দিলেন তাঁর বৃদ্ধ বয়সে কিছু অসঙ্গতি দেখলেই সমালোচনার বাণ ছুড়ে নাজেহাল করার রুচি আমার নেই। ভিনসেন্ট দেখলাম ভারতীয় ছবির খবর মোটামুটি রাখেন। হিন্দিতে এখন অনেক ভালো ছবি হচ্ছে তাও জানেন। বললেন সন্ধের পরে জানতে পারবেন ফেস্টিভ্যালের দর্শকদের প্রতিক্রিয়া কী! ইউরোপ আমেরিকায় যাঁরা নতুন ছবির সার্কিট কেনেন তাঁদের এজেন্টরা থাকে এই ফেস্টিভ্যালগুলোতে। একজন বিখ্যাত এজেন্ট গিয়েছেন ফ্রান্সে শুধু সত্যজিৎ রায়ের ছবির জন্যে। দর্শকদের প্রতিক্রিয়া যাচাই করবেন তিনি। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। সাবটাইটেল সাঁটা একটা ছবি দেখে দর্শকরা প্রথমবারেই বিষয়ের সঙ্গে কতটা অন্তরঙ্গ হতে পারেন? সেই প্রতিক্রিয়া ছবির বিক্রির ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা নিলে তো খুব মুশকিল। ভিনসেন্ট মনোজকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে আমন্ত্রণ পেলেই তিনি ওর ডকুমেন্টারি দেখতে যাবেন। আমেরিকায় ভারতীয়দের দ্বিতীয় প্রজন্মের সমস্যা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বললেন, 'ওরা আমাদের চেয়ে বেশি আমেরিকান কারণ আমাদের আমেরিকান হওয়ার জন্যে কোনও উদ্যম নেই যা ওদের আছে। তবে কী জানো, একজন ইউরোপিয়ান যদি আফ্রিকার কোনও গ্রামে দুই পুরুষ ধরে বাস করে তাহলেও এই সংঘাত দেখা দেবে। তোমাদের ছেলেমেয়েরা এদেশে এসে ছুটছে বৈভবের পেছনে আর এরা ওখানে গিয়ে চাইছে বৈভবের জাল থেকে মুক্তি।'

নাটকের কথা উঠল। টিকিটের অভাবে দেখা হচ্ছে না জেনে বললেন, 'তা কি হয়! আমি একটা চিঠি দিচ্ছি। ডেথ অফ অ্যা সেলসম্যানের কাউন্টারে দেখিয়ো। ওদের ম্যানেজার তোমাদের টিকিটের ব্যবস্থা করে দেবে।'

এটুকুই আমার লাভ বলে মনে হয়েছিল সেই মুহূর্তে।

আচমকা ফোন এল আমার। বাফেলো থেকে একটি তরুণ যার নাম জামাল জিজ্ঞাসা করছে আমি সেখানে কবে যাব। বাফেলোতে যাওয়ার কোনও কথাই নেই অথচ সে বলছে তাকে নাকি কামালচাচা বলেছে আমি সেখানে যাব। আমি বিস্মিত বুঝে জামাল জানতে চাইল তাহলে কি আমার নায়েগ্রা ফলস দেখার কোনও ইচ্ছে নেই? জানতাম না নায়েগ্রা বাফেলো শহরের কাছে আর বস্টন

থেকে কামাল এইটে ভেবেছে। জানিয়ে দিলাম যাব। ছেলেটি টেলিফোন নম্বর দিয়ে বলল আগে জানলে সে এয়ারপোর্টে থাকবে।

মনোজ হাসছিল। বলল, 'আমেরিকায় কেউ এলেই নায়েগ্রা দেখতে চায়। ইতিমধ্যে তিনবার গিয়েছি গাইড হয়ে। আপনার বেড়ানোর ধরন দেখে মনে হয় আপনি ইন্টারেস্টেড নন। কিন্তু চলুন, ঘুরে আসি।'

কেনেডি এয়ারপোর্ট ছাড়াও নিউইয়র্কে আর একটি এয়ারপোর্ট আছে যেখান থেকে দেশের ভেতরে ছোট প্লেনগুলো যাতায়াত করে। মনোজ আর আমি ওর গাড়িতে যখন এয়ারপোর্ট পৌঁছোলাম তখন বিকেল পাঁচটা। পার্কিং প্লেসে গাড়ি চাবি দেওয়া পড়ে রইল। টিকিট নিয়ে বেরিয়ে এল মনোজ। যতক্ষণ না ফিরি গাড়ি এখানে ঠিকঠাক থাকবে। এয়ারপোর্ট বিল্ডিংস-এ ঢোকার পর কেন জানি না বারংবার হাওড়া স্টেশনের কথা মনে পড়েছিল। সেই গ্যাঁজাগেজি হইচই, একটুও অহঙ্কারী আবহাওয়া নেই। ঘড়ি দেখে মনোজ বলল, 'চলুন চা খাই, ঘণ্টাখানেক পরে প্লেনে উঠলে বিশ ডলার বাঁচানো যাবে।'

'মানে?'

'আমরা যাব পিপলস এয়ারওয়েজে। এ শহর থেকে ও শহরে যাওয়ার জন্যে এই জনতা প্লেন এখন পাবলিকের ভরসা। ট্রেনের চেয়েও ভাড়া কম। আবার ছ'টা পর্যন্ত এক ভাড়া আর তারপরে আরও কনসেশন। এসব দিচ্ছে কারণ ওদের এস্টাবলিশমেন্ট চার্জ নেই বললেই চলে।' আমি একটি চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা পেলাম। জীবনে প্রথমবার প্লেনে উঠলাম অথচ টিকিট হল না। দূরপাল্লার বাসের কন্ডাক্টর দরজায় দাঁড়িয়ে টিকিট দেখতে চায়, এখানে কেউ চাইল না। প্লেন যখন আকাশে তখন কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে হাতে রসিদবই নিয়ে কন্ডাক্টর এলেন ভাড়া চাইতে। যেভাবে কলকাতার বাসে টিকিট কিনি সেইভাবেই যাত্রাটাকে আইনি করলাম। কোনও এয়ার হোস্টেস নেই। সবার টিকিট কেটে একটা ট্রলি ঠেলতে-ঠেলতে এলেন ওই একই কন্ডাক্টর। তাতে নরম ও কড়া পানীয়ের কৌটো থেকে আরম্ভ করে টুকিটাকি খাবারের প্যাকেট ঠাসা। না, বিনামূল্যে বিতরণ নয়, ফ্যালো কড়ি মাখো তেল ব্যবস্থা। হঠাৎ মনে হল এই ব্যবস্থাটা আমাদের দেশে চালু হলে কেমন হত! মাঝ আকাশে কন্ডাক্টর টিকিট চাইল আর সেই গ্রাম্য মানুষটি মাথা নেড়ে বলল, 'পইসা নাই', বেল বাজিয়ে গাড়ি থামিয়ে নামিয়ে দিতে পারবে না!

কিন্তু ব্যাপারটা ভাবার মতো। আমাদের দেশে আগে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের পাশাপাশি প্রাইভেট কোম্পানির প্লেন চলত। জলপাইগুড়ি, কুচবিহারে সেই প্লেনে সস্তায় যাওয়া যেত। এখন তো এয়ারলাইন্স উত্তরপূর্ব ভারতের প্লেন ভাড়া কিছুটা কমিয়ে রাখলেও বেশিরভাগ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। এখনও কেউ জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতায় প্লেনে আসছে শুনলে ভাবে উঠতি বড়লোক। ভারত সরকার যদি কিছু প্রাইভেট কোম্পানিকে প্লেন চালাতে দেন এবং তারা যদি আমাদের স্টেটবাসের মতো বাস পিছু পঁয়তাল্লিশজন কর্মচারীর ব্যবস্থা না করেন তাহলে আমাদের দেশের বিমানভাড়া দশআনায় নেমে যেতে বাধ্য। বাফেলোতে চমৎকার কাটিয়েছিলাম বাংলাদেশি ছেলেদের মেসে। ওরাই গাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল নায়েগ্রা দেখতে। এপাশে আমেরিকা, ওপাশে কানাডা। পাঠক এই সুন্দর এবং ভয়ংকর জলপ্রপাতের বর্ণনা নিশ্চয়ই অনেক পড়েছেন। আমার সেই উদ্দেশ্যই নেই। তবে লিফটে চেপে যখন জলপ্রপাতের নীচে নেমে গেছি তখন সেই ছিটকে ওঠা জল থেকে তৈরি কুয়াশায় দাঁড়িয়ে মনোজ বলেছিল, 'ঈশ্বর অনেক কিছু আশ্চর্যজনক সৃষ্টি করেছেন ঠিকই, কিন্তু মানুষ যখন লেখে যখন তখন কখনও-কখনও ঈশ্বরকেও অতিক্রম করে যায়, এইখানেই ঈশ্বরের হার।'

কথাগুলো আমার মনে নায়েগ্রার স্মৃতির চেয়েও বেশি উজ্জ্বল।

'ডেথ অফ অ্যা সেলসম্যান।' নাটকটি আমাদের ছাত্রাবস্থায় খুব আলোচনার বস্তু ছিল। চতুর্মুখ দলের অসীম চক্রবর্তী 'জনৈকের মৃত্যু' নামে ওই নাটকটি করতেন। ব্রডওয়ে থিয়েটারে বসে ওই

নাটক দেখা একটা দারুণ অভিজ্ঞতা। বলে রাখা ভালো ভিনসেন্ট ক্যানবির চিঠি আমাদের টিকিট পেতে সাহায্য করেছিল এবং সেটা উপহার হিসেবেই। আমার এর আগে ছবিটবি দেখে ধারণা হয়েছিল আমেরিকান পেশাদারি নাটক মানে বিশাল স্টেজ, মাথা ঘোরানো ব্যাপারস্যাপার। কিন্তু কলকাতার হলের কোনও তুলনা মাথায় না এলেও মনে হল এরা অপ্রয়োজনীয় বা বাহুল্যের ব্যবস্থা করেননি। কিন্তু মুগ্ধ হয়ে গেলাম ডাস্টিন হফম্যানের অভিনয় দেখে। গ্লোবে ক্র্যামার ভার্সেস ক্র্যামার ছবি দেখে চমকে গিয়েছিলাম, টুথসিতে ওর নারী ভূমিকায় অভিনয় করার গল্প শুনেছি কিন্তু এক প্রৌঢ় বৃদ্ধের চরিত্রে সেই মানুষ যেন সমস্ত অতীতস্মৃতি-বিচ্ছিন্ন। নাটকের মাঝখানে একজন লোক এসে বলে গেল যদি চাই আমাদের একজন নাটকের শেষে গ্রিনরুমের সামনে আসতে পারে।

একজন কেন? মনোজ বলল, 'এক-এক করেই তো অনেক হয়। আপনি ঘুরে আসুন।' ফিল্ম স্টার দেখার লোভ আমার কখনই ছিল না। একটু অসত্যি বললাম। কলকাতার কলেজে যখন পড়তে এলাম তখন উত্তমকুমার মধ্যগগনে। কিন্তু তাঁকে দেখার সাধ হত না বরং ছবি বিশ্বাসের সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছে হত, সাহস পাইনি। এখন তো কলকাতার চলচ্চিত্রজগতের প্রায় সবাইকেই কাছ থেকে জানি। কিন্তু ছাত্রাবস্থা থেকে মাত্র একজনই আমার মনে মাটি খুঁড়ে রোমান্টিকতার শেকড়ে রোদ হাওয়া দিয়েছিলেন অথচ তাঁর সঙ্গে আজও আমার পরিচয় হল না। ছেড়ে যাই এ কথা, আমেরিকায় এসে পুরোনো ফিল্মস্টারদের সাক্ষাৎ চেয়েছিলাম কারণ তাঁরা একসময় আমাদের খুব কাছের লোক ছিলেন। এখন কে কেমন আছেন জানতে ইচ্ছে করছিল। শুধু সিডনি পয়েটার ছাড়া কারও সঙ্গেই সেতু তৈরি হয়নি।

গ্রিনরুমের সামনে একটা চওড়া প্যাসেজ। বলে রাখা ভালো, পুরো বাড়িটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। সেই প্যাসেজে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন জনাছয়েক বিভিন্ন বয়সের সুবেশ মানুষ। আমাকে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে বলা হল। মিনিটতিনেকের মধ্যে তিনি এলেন। ইতিমধ্যে মেকআপ তুলে পোশাক পালটেছেন। যেভাবে এয়ারপোর্টে প্লেন থেকে নেমে রাষ্ট্রনায়করা পরিচিত হন সেইভাবে একে-একে করমর্দন করতে-করতে এগিয়ে আসছেন। আমার পাশের ভদ্রলোকের সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাউ ইজ বব?'

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বিগলিত হাসি হাসলেন, 'ফাইন।'

এবার আমার সামনে। ছোটখাটো মানুষ। অস্কার পেয়েছেন। চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইউ আর ফ্রম?'

'ইন্ডিয়া।' নিজের নাম বললাম।

'হাউ ইজ রে?'

'উনি খুব সুস্থ নন।'

'আপনি কী করেন?'

'লেখালেখি।'

'আচ্ছা! নাটক কেমন লাগল?'

'আপনার অভিনয় ভালো লেগেছে।'

'নাটক?'

'ঠিক আছে।'

'কিছু মনে করবেন না আপনার দেশের নাটকের মান কীরকম?'

'কয়েকজন আছেন যাঁরা খুব ভালো করেন।'

'পরিচালক না অভিনেতা?'

'দুই-ই।'

'একটা নাম বলবেন?'

'শম্ভু মিত্র।'

'আমি নাম শুনিনি কেন?'

'প্রচার ব্যবস্থার ত্রুটির জন্যে।'

ডাস্টিন আমার দিকে যেন অবাক হয়ে তাকালেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'রে-কে আপনার কী ধরনের পরিচালক বলে মনে হয়?'

'তিনি একজন মহান পরিচালক।'

'মহানের সংজ্ঞা আপনার কাছে কীরকম?'

'এ নিয়ে শুধু তর্কই হবে।'

'ঠিক। আমি ওঁর ছবি যা পেয়েছি দেখেছি।'

পাঠক এবার ক্ষমা করুন। ডাস্টিন হফম্যান সেই রাতে যা-যা বলেছিলেন তা আমার কাছে রেকর্ড করা নেই। কারণ কোনওরকম প্রস্তুতি ছাড়াই আমি গিয়েছিলাম। অতএব আজ এতকাল বাদে এমন কিছু লেখা উচিত হবে না যার সত্যতা প্রমাণ করতে পারব না। এমন কিছু বলা আহাম্মকী হবে না নিজে বিশ্বাস করি না অথচ অন্যে বলেছেন বলে নির্বিকারভাবে উগরে দিয়ে পরে হাত কামড়াব। সেই মফস্‌সলের বালকটি তো ইতিমধ্যে কলকাতার মানুষ দেখে দেখে চল্লিশের মাঝখানে পৌঁছে গেছে!

এবার আমেরিকা ছেড়ে যাওয়ার পালা। মনোজ আর একবার সমস্ত পরিকল্পনাটা ঝালিয়ে নিল। আমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে শিল্পী, প্রধান কুশলীদের তারিখ নিয়ে পাসপোর্ট রেডি করতে বলব। মনোজ ভিসার কাগজপত্র পাঠাবে এখান থেকে। টিকিট নিয়ে সে নিজেই হাজির হচ্ছে খুব শিগগির। কিন্তু এসব খবর আগাম প্রেসে দিতে চায় না ও। আমিও না।

ইতিমধ্যে মনোজ দুটি গল্প পাঠিয়েছে সাগরদার নামে দেশ পত্রিকার ঠিকানায়। হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোনটে আমার হবে বলুন তো? লেখা না ছবি?' খুব কঠিন ছিল উত্তর দেওয়া। ছবি হবে না বলা যায়? যখন সব কিছু শেষ হওয়ার মুখে? লেখা হবে না বলাটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি হাসছি দেখে মনোজ ব্রুকলিন ব্রিজের দিকে যেতে-যেতে বলেছিল, 'ছবিই হবে। লেখা তো অন্যের দয়ায় নির্ভর করে। তিনি ছাপবেন কি না পাঠক পড়বেন কি না। ছবি আমি তুলব নিজের ক্ষমতায়, কেউ দেখতে না চাইলে জোর করে দেখাব।'

'নিজের পয়সায় তো বই ছাপাতে পারেন।'

'নাঃ। সেটা অক্ষমতাকে প্রমাণিত করবে। আমার 'এই দ্বীপ এই নির্বাসন' কোনওদিন বই হয়ে বেরুবে ভেবেছেন? অসম্ভব। আন্তরিকের পাতায় ছাপা হচ্ছে, এদেশে তো ঠোঙাও হয় না।'

শেষবার নিউইয়র্কের রাতের রাস্তায় আমরা ঘুরেছিলাম এলোমেলো। এই সেই নিউইয়র্ক যার তিনদিকে হাডসন, ইস্ট আর হার্লেম নদী চতুর্থদিকটা অতলান্তিকের নোনা জলে ঘেরা। কেউ-কেউ শহরটাকে বলেন, 'মেল্টিং পট।'

মনোজের কথাই তুলে দিচ্ছি, 'আমেরিকা মূলত ইমিগ্রান্টদের দেশ। কাজেই আমেরিকান সংস্কৃতির পাশাপাশি এখানকার প্রায় প্রত্যেক মানুষেরই আরেকটা শেকড় আছে। যত জ্বালাযন্ত্রণা এই অন্য শেকড়টা নিয়ে।'

পাঠক, কাহিনির এখানেই শেষ হলে খুশি হতাম খুব। কিন্তু ঈশ্বরের খামখেয়ালিপনার একটি নিকৃষ্ট উদাহরণ আমাকে দিতেই হচ্ছে। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন আমেরিকার মানুষদের নিয়ে এই আকাশপাতাল ভাবনার মধ্যে পৃথিবীর মতো দাঁড়িয়ে আছে মনোজ। আজ মনে হয় আমি আমেরিকানদের যতটা না দেখেছি তার চেয়ে অনেক বেশি জেনেছি মনোজকে। ছাত্র হিসেবে সে

ছিল ব্রিলিয়ান্ট। হ্যাঁ, আমি 'ছিল' শব্দটা লিখতে বাধ্য হলাম। খড়্গপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ও কস্ট এবং ওয়ার্কস অ্যাকাউন্টিং পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিল। নিউইয়র্কেই সেন্ট জনস ইউনিভার্সিটি থেকে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পরীক্ষা দিয়ে সে আমেরিকার 'গোল্ড কি' পুরস্কার পেয়েছিল। সেখানে পেশায় যেখানে পৌঁছেছিল তা বাঙালির স্বপ্ন! কিন্তু এহেন দামি ছেলে যখন কাছে আসত তখন মনেই পড়ত না ওইসব ডিগ্রির কথা। এমন হাঁসের মতো জল পালক থেকে ঝেড়ে ফেলার ক্ষমতা অর্জন করা খুবই শক্ত। কিন্তু ওই বলয় থেকে বেরিয়ে এসে মনোজ চাইল একই সঙ্গে লেখক এবং চলচ্চিত্র পরিচালক হতে।

দেশ পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ ডাকে গল্প পেয়ে সরাসরি পুজো সংখ্যায় ছাপলেন। একই বছরে ওর আরও দুটো গল্প বেরুল দেশে। মনোজ চিঠিতে জানাল কৃতজ্ঞতা। বলল, 'খুব জোর পাচ্ছি। উপন্যাস লিখব। কলকাতায় পাঠকরা কেমন নিচ্ছেন আমার লেখা জানতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ছবিটাও তুলব। তৈরি হচ্ছেন তো?'

ঈশ্বর কাউকে-কাউকে অজান্তে অনেক দিয়ে থাকেন। তারপরেই যখন কেড়ে নিতে পারেন তখন তাঁদের নাম হয়ে যায় মনোজ ভৌমিক।

মনোজ আমায় লিখল, 'কলকাতায় যাচ্ছি খুব শিগগির। ইউনিট নিয়ে আমার জন্যে তৈরি থাকুন।'

সেই দিনটা অনেকটা এইরকম। মনোজ সবসময় থাকত খুব আলস্য নিয়ে। পোশাক নিয়ে মাথা ঘামাত না। গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল ব্যাংকে যাবে বলে। গিয়েও ছিল। কাজ সেরে পার্কিং লটে এসে গাড়ি চালু করে রাস্তায় উঠেছিল। আর তখনই ঈশ্বর ওর বুকে যন্ত্রণাটা তৈরি করলেন। মনোজ বলত, 'মানুষের বুকে যদ্দিন যন্ত্রণা থাকবে তদ্দিন সে নিজেকে মানুষ বলে প্রমাণিত করে যাবে।' মনোজ জানত না, আর এক যন্ত্রণা আছে যা মুহূর্তেই সমস্ত আলো মুছে দেয়। বুকে হাত চেপেও যাকে সামলানো যায় না। ছুটন্ত গাড়ির স্টিয়ারিং নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে, পা এগোতে পারে না ব্রেক পর্যন্ত। মনোজ গাড়িটাকে থামাতে পেরেছিল কি পারেনি এ নিয়ে দ্বিমত আছে। কিন্তু যা সত্য তা হল এই, একটা ভাঙাচোরা গাড়ির স্টিয়ারিং-এ মাথা রেখে সে শুয়েছিল নিঃশব্দে। ঈশ্বর ওর শরীরের সব শব্দ কেড়ে নিয়ে আনন্দিত হয়েছিলেন যেভাবে অবোধরা গোবধ করে আনন্দিত হয়।

এই খবর কলকাতায় আমার কাছে পৌঁছোতে সামান্য দেরি হয়েছিল। এবং ততক্ষণ মনোজ আমার কাছে বেঁচেছিল। ততক্ষণ আমি জানতাম ছবিটা হচ্ছে, ততক্ষণ আমি ভেবেছিলাম বাংলা সাহিত্যের স্থির হয়ে আসা জলে ঢেউ উঠতে যাচ্ছে। আর এখন চোখ বন্ধ করলেই একটি দৃশ্য চট করে সামনে চলে আসে। নিউইয়র্কের রাতের রাস্তায় মনোজ গাড়ি চালাচ্ছে, আমি পাশে। দূরে ব্রুকলিন ব্রিজ দেখা যাচ্ছে। ওপাশের লেন দিয়ে মাঝে মধ্যে এক-আধটা গাড়ি উল্কার মতো ছুটে যাচ্ছে। মনোজ আপনমনে গুনগুন করে যাচ্ছে, 'তুমি কিছু দিয়ে যাও।' সারারাত আমরা পাক খাচ্ছি নিউইয়র্কের পথে-পথে। তখনও জানি না জীবন খুঁজে পাওয়া বড় দুষ্কর। এত চাওয়া সত্ত্বেও কিছুই পাওয়া যায় না।

এই লেখালেখি শেষ। তবু হে পাঠক, এই মানুষটিকে জানবার জন্যে আপনাদের আর একটু অপেক্ষা করতে হবে। ওর লেখা থেকেই তুলে দিই। 'নির্বাসনের' মূল নায়ক নায়িকা শৈবাল আর টিয়া। বিচ্ছেদের মুহূর্তে তারা যে কথা বলেছিল তা কি মনোজেরই কথা?

টিয়া বলল, 'আমার সামনে বসো। আর কিছুক্ষণ পরেই তো তুমি চলে যাবে।'

মুখোমুখি বসল ওরা দুজন। টিয়া আবার কথা বলল, 'এতদিন পরে দেশে যাচ্ছ, মুখ গোমড়া করে যেও না। এখানকার ছেলেরা কীরকমভাবে দেশে যায় জানো?'

শৈবালের হাসি পেল, 'কীরকমভাবে?'

'দেশে যাওয়ার আগে ভালো সেলুনে চুল কাটে। ভালো দোকান থেকে লিভাইস জিন কেনে— তার সঙ্গে দামি শার্ট। কাঁধে মিনোলটা কিংবা সাইকন। আমেরিকা থেকে যাওয়ার আগে কতরকম প্রিকশান নিতে হয়।'

'কেন?'

'ওমা! তুমি কী বোকা গো! দেশে যদি কেউ বলে ফেলে আপনি আমেরিকা থেকে এলেন বোঝাই যাচ্ছে না! কী লজ্জার কথা। প্রথমেই ডিফারেন্সটা দেখিয়ে দিতে হয়। মেড ইন হংকং বা কোরিয়া হলে মাথা কাটা যাবে। ব্র্যান্ড নেম হওয়া চাই।'

টিয়ার হাত পা নাড়া দেখে শৈবাল হেসে ফেলল। টিয়া গম্ভীর মুখে বলল, 'আরেকটা সুযোগ আছে। মাইনেটা টাকায় বলতে পারো। অনেকের চোখ বড় হয়ে যাবে।'

শৈবাল বলল, 'তুমি কি রেগে যাচ্ছ আমার ওপর?'

সুটকেস বন্ধ করে টিয়া উঠে পড়ল। চায়ের কাপদুটো নিয়ে রান্নাঘরে যেতে-যেতে বলল, 'না রাগ নয়, তোমর ওপর তো নয়ই।'

শৈবাল টিয়ার মুখোমুখি দাঁড়াল, 'আমার দিকে তাকাও।'

টিয়া মুখ তুলল, ওর চোখে জল। শৈবালের হাতদুটো শক্ত করে ধরে আস্তে-আস্তে বলল, 'যদি না পারি?'

'কী?'

'চাকরি, পড়াশোনা, এক-একা ঘরে ফেরা, এই নির্বাসন!'

টিয়ার চুলগুলো হাত দিয়ে পুরো এলোমেলো করে দিল শৈবাল।

'জানো, কলকাতা থেকে তোমার জন্যে কী আনব?'

'টিয়া তাকাল। শৈবাল বলল, 'কাজল।' টিয়া হেসে ফেলল।

মনোজও কাজল আনতে চেয়েছিল।

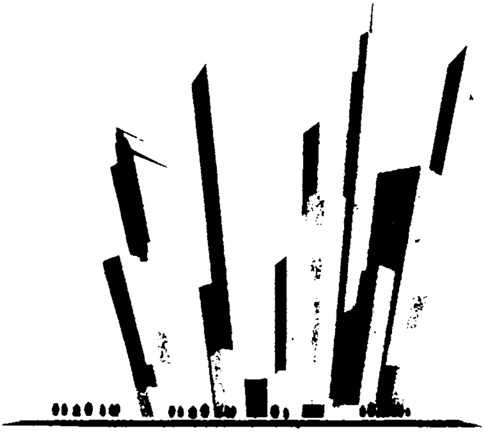

না আকাশ না পাতাল

এই লেখক, যে কিনা লেখকের ভূমিকায় অভিনয় করে এবং সেটা মন্দ করেনি বলেই অল্পবিস্তর পরিচিতি, কিছু স্বাচ্ছন্দ্য পেয়ে গেল আচমকাই যা শুধু এই পশ্চিমবাংলায় হয়ে থাকে, একবার বিদেশ ঘুরে আসার পর তাকেও টানতে লাগল সিকিওরিটি কন্ট্রোল, কাস্টমস চেকিং, তিরিশ হাজার ফুট উঁচুর আকাশ। পাহাড়ে একবার গেলে যেমন পাহাড় টানে তেমনি এও একরকমের টান। আর লেখকের ভূমিকায় ভালো অভিনয় করার প্রমাণ হিসেবে একটা নেমন্তন্ন এল সুদূর নরওয়ে থেকে। ওদেশের বার্গেন শহরের উৎসবে আমাকে যেতে হবে। টিকিট এল উঁচু ক্লাসের। যা ভাঙিয়ে আমি আরও কয়েকটা দেশে চক্কর মারতে পারি। বেশ মজাদার ব্যাপার। লেখাটার নাম পালটে গেছে তা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন অনেকে। মনোজ আমাকে আমেরিকার আকাশ দেখিয়েছিল, পাতালও। সে আজ নেই। কেউ যদি না দেখায় দেখার চোখ তো আজও আমার ফুটল না। ভালোবাসার মতো। কেউ যদি আমায় না ভালোবাসে তো বুঝতে পারি না ভালোবাসা কাকে বলে। আর বুঝি যখন, তখন যন্ত্রণা পাই। ভালোবাসার অন্য নাম যে যন্ত্রণা তা আপ্রাণ বুঝেও মুক্তি চাই তা থেকে ভালোবাসার মানুষের কাছে। তিনি চান যন্ত্রণাটা থাকুক, যদ্দিন থাকবে তদ্দিন তিনি সম্রাজ্ঞীর মতো বিচরণ করতে পারবেন। আকাশ পাতাল যদি ধন্দ, ভালোবাসার এবং না-ভালোবাসার ক্ষেত্রেও তবে, এ লেখা যা লিখতে যাচ্ছি তাতে কোনও ধন্দ নেই। স্নেহের মতো। তাই দু-দুটো 'না' বসল। না আকাশ না পাতাল। বার্গেনে বঙ্গসন্তানের সহ্যশক্তি শেষ সীমায় পৌঁছোবে ঠান্ডার কারণে। একটা ছোট্ট সমুদ্র আছে শহরের গা ঘেঁষে, চমৎকার মাছের বাজার আছে তার বন্দরে, মাছ ধরাই তো ওখানকার অন্যতম কারবার। কিন্তু সহ্যশক্তি যার ঘা খেয়ে প্রস্তরযুগে চলে গিয়েছে, সে যখন উৎসবে যোগ দিয়ে জানতে পারল তাকে কবিতা পড়তে হবে কারণ সম্মেলনটা কবিদের, তখনকার অবস্থা পাঠক কল্পনা করুন। যার কলমে কবিতা বের হয়নি কোনওদিন, ছন্দ দূরে থাক, কবিতার ভাষা যার কাছে সোফিয়া লোরেনের চেয়েও দূরবর্তীণী, মরে গেলেও এক কলম কবিতা লিখতে পারেনি বলে নিজস্ব নারীর মুখে সুনীল গাঙ্গুলির কবিতা শুনে ঈর্ষায় জ্বলতে হয় তাকে, তাকে কবিতা পড়তে হবে বাংলায় এবং ইংরেজিতে। সম্মেলনটা কবিদের। আমার নাম যাঁরা পাঠিয়েছিলেন তাঁরা এ খবর জানতেন না।

কে যেন বলেছিলেন কবিতা আর গল্প কাছাকাছি চলে এসেছে! কবিরা কবিতায় যখন গল্প লেখেন তখন গল্পকারের হাততালি পান, কিন্তু গল্পকারের গল্পে কবিতা? সে যে সোনার পাথরবাটি।

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে মাঝরাতে অনেক চেষ্টা করলাম কবিতা লিখতে। সুনীল গাঙ্গুলিকে ঈর্ষা করা ছাড়া কোনও ফল লাভ হল না। কলম হাতে নেওয়ার পর থেকে তো কবিতা লিখিনি। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। সেখানে ঠান্ডা প্রায় জিরো ডিগ্রি। আমি কাগজ খুঁজছি আর ছিঁড়ছি; হায় ঈশ্বর একটা কবিতাও তো দিতে পারতেন আমার কলমে।

আমাকে যেখানে রাখা হয়েছিল সেটি ওদের কাছে হোটেল নয়। যদিও ভারতবর্ষে ওটাকে থ্রি স্টার বলে স্বীকার করা হয়। নরওয়ের মানুষ বলেন পেঁশন। ঝকঝকে ঘর, পুরু কার্পেট পাতা, বাথরুম মন হরণ করবে কিন্তু খাওয়ার ব্যবস্থা বলতে সকাল ন'টা পর্যন্ত বুফে ব্রেকফাস্ট। অন্য সময় এক কাপ চা চাইলেও পাওয়া যাবে না। আমি নামতাম সাড়ে আটটা নাগাদ, যেহেতু কেউ মানা করার নেই তাই পেট পুরে খেয়ে নিতাম। পরদিন সকালে ওখানে হ্যাম চিবোতে-চিবোতে আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত গল্পটির কথা মনে পড়ে গেল। একটি লোক একদিনের জন্যে এসেছিল বিদেশের শহরে যেখানকার জীবনযাত্রা এখনও মধ্যযুগে আটকে রয়েছে। ভাষার সমস্যা তো ছিলই, লোকটার

পকেটে টাকাও ছিল না। তাই নিয়ে এক রূপক গল্প যা সন্তোষকুমার ঘোষের ভাষায় লিখতে চেয়েছিলাম। মনে হল সেটিকেই পড়ে দিই।

পাঠক, সেই কবিতার আসর বসেছিল দুটি স্কেপে। দুবারই আমাকে গল্পটি ছোট্ট করে পড়তে হলো। মজার কথা হল, শ্রোতাদের নব্বুই ভাগ ইংরেজিও বোঝেন না। ওঁরা হয়তো ভাবলেন আমি একটা লম্বা কবিতা পড়লাম। কেন যে এমন অনুষ্ঠানে এশিয়ার লেখক-কবিকে নিয়ে যাওয়া হয় তা আমার বোধগম্য হয় না। দুটো অধিবেশনের মাঝখানে ঘণ্টাতিনেকের বিরতি। প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে এলোমেলো কিছুটা হেঁটে আমাদের লালদিঘির মতো একটা জায়গা খুঁজে পেলাম। ফিনফিনে রোদ উঠেছে কিন্তু ঠান্ডা যেন রক্তের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। হঠাৎ জলের ধারে একটা ক্যারাভান চোখে পড়ল। ক্যারাভানের গায়ে লেখা রয়েছে 'ভারতীয় মহিলা জ্যোতিষী আপনার ভাগ্য পরীক্ষা করবেন। আসুন, নিজের ভাগ্য জেনে ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করুন।'

চমকিত হলাম। এ আবার কী কাণ্ড। কলকাতার কাগজে দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আজকাল ছবি দিয়ে মহিলা জ্যোতিষীর বিজ্ঞাপন করা হয়। তাঁরা কেমন হাত পড়েন জানি না তবে কয়েকজন তো রীতিমতো সুন্দরী। সেই ভারতীয় নারী এখানেও পৌঁছে গিয়েছেন? ক্যারাভানটি বেশ আধুনিক স্টাইলের। জানলায় পরদা, দরজাতেও কার্পেট। লক্ষ করলাম জোড়ায়-জোড়ায় নারী পুরুষ ঢুকছে আর মিনিট দশেক কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত একটু ফাঁকা হতে পা বাড়ালাম। দরজায় পা রেখে উঁকি মারতে দেখলাম দুজন মহিলা আর একটি বাচ্চা ভেতরের টেবিলে বসে খাওয়া শুরু করেছেন। ক্যারাভানের দেওয়ালে স্লিপিং বাংক ঝুলিয়ে রাখা আছে। আমাকে ইশারায় বসতে বলে এক ভদ্রমহিলা মাঝখানের পরদা টেনে দিলেন। দুটো চেয়ারের উলটো দিকে ফিক্সড টেবিল। টেবিলের ওপাশে আর একটা চেয়ার। পাশের দেওয়ালে নানারকমের জ্যোতিষের চিহ্ন ছড়ানো। দুই ভদ্রমহিলাকে যেটুকু দেখেছি অনেকটাই ইরানিদের মতো, ঘাঘরা পরা।

মিনিটপাঁচেক বাদে একজন পরদা সরিয়ে বাইরে এসে আমার উলটোদিকে চেয়ারে বসলেন, 'ইয়েস?' প্রশ্নের সঙ্গে-সঙ্গে মহিলা আমাকে জরিপ করছেন বোঝা গেল।

'আপনি হাত দেখেন না কুষ্টি বিচার করেন?'

'হাত। কারণ এদেশে কেউ কুষ্টি করায় না। আপনি কি হাত দেখাবেন?'

'আজ্ঞে না। ক্যারাভানের গায়ে আপনার বক্তব্য পড়ে আলাপ করতে এলাম।'

ভদ্রমহিলা একটা সিগারেট ধরালেন। তাঁর চুল কালো, চোখের মণিও। গায়ের রং একটু ফ্যাকাশে। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'এটা আমার ব্যাবসার সময়।'

'জানি। দশ মিনিট করে আপনার ক্লায়েন্টরা থাকেন এখানে। কত চার্জ নেন?'

'হাত না দেখলে পয়সা নিই না আমি। আপনি কোন দেশের লোক?'

'ভারতবর্ষ।'

'জিজ্ঞাসা করুন কী জানতে চান?'

'আপনি কি ভারতীয়?'

মাথা দোলালেন মহিলা, 'হ্যাঁ।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন প্রদেশের?'

'শুনেছি সিন্ধু উপত্যকার কাছে থাকতেন আমার পূর্ব পুরুষেরা।'

'থাকতেন মানে? আপনি ভারতবর্ষে যাননি কখনও।'

'না। তিন-চারশো বছর আগে ওঁরা চলে এসেছিলেন জার্মানিতে।'

'তাহলে আপনি ভারতীয় হচ্ছেন কী করে?'

'আমরা নিজেদের ভারতীয় বলেই মনে করি, ইনফ্যান্ট ভারতীয় ভাবি বলেই জার্মানের সঙ্গে ইংরেজি শিখি।'

'ইংরেজি তো ভারতীয়দের ভাষা নয়।'

'কে বলেছে আপনাকে। আমরা যেসব ভারতীয়কে জানি তাঁরা ইংরেজিই বলেন।'

কিন্তু তিন চারশো বছর জার্মানিতে থেকে আপনাদের তো জার্মান হওয়ার কথা।'

'না। আমাদের যে গোষ্ঠী চলে এসেছিল এখন পর্যন্ত রক্তের সম্পর্ক তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। গোষ্ঠীর মধ্যেই ছেলেমেয়ের বিয়ে হয়। তবে বেশিদিন এই রীতিটা চালু রাখা যাবে না। বুঝতেই পারছেন।'

'আপনি হাত দেখা শিখলেন কার কাছে?'

'মায়ের কাছে। শীতকালে ব্যাবসাটা বন্ধ থাকে। গরম কালে এই ক্যারাভান চালিয়ে প্রত্যেক বছর একা একা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশে চলে আসি।'

'জার্মানি থেকে নরওয়ে তো অনেক দূর। এটা চালায় কে?'

'আমি আর আমার দিদি। হ্যাঁ দূরত্বটা বেশ, কষ্টও হয়। তবে টাকাটা ভালো পাওয়া যায়।

'কীরকম রোজগার আপনার?'

'ভালোই। আপনাকে হিসেব দিতে যাব কেন?'

'বাচ্চাটি কে?'

'আমার।'

'আপনার স্বামী?'

'ও এখন জার্মানিতে। দুদিন অন্তর ফোনে কথা বলি। আমার ক্যারাভানে ফোন আছে। ছেড়ে থাকতে ছেলেদের অবশ্য কোনও অসুবিধে হয় না। মেয়েদের হয়।'

'এখানে কেউ আপনাকে বিরক্ত করে না?'

'করে। রাত্রে দরজায় টোকা মারে। পুলিশকে ফোনে ডাকি। ওরা চটপট চলে আসে। তবে এখানকার লম্পটরাও নিজেদের মন্দ ভাগ্য শুনলে আপসেট হয়ে পড়ে।'

'যেমন?'

'একদিন এক ভদ্রলোক এলেন সন্ধেবেলা। হাফ ড্রাংক। জানতে চাইলেন ভবিষ্যৎ। হাতে যা ছিল বললাম। টাকা দিলেন। তিন ডবল। তারপর জানতে চাইলেন আমাকে পাওয়া যাবে কি না। আমি না বললেও কানেই তুলছেন না। এমন ভাব করছেন যে আমাকে পেয়ে গিয়েছেন। এরকম কেসে পুলিশকে ফোন করলে ওরা আসে না। কারণ ভদ্রলোক আমাকে ব্যাবসার সময় শারীরিক অসুবিধের মধ্যে ফেলেননি। হঠাৎ তিনি জানতে চাইলেন তাঁর স্ত্রীর ভবিষ্যৎ কী? মাথায় মতলব এল। বললাম, 'তিনি আজ রাত্রে খুব সুখী মহিলা হবেন। তিনি ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'সে কী! ও কী করে সুখী হবে?' বললাম, 'হাত বলছে তিনি আজ রাত্রে আপনার সোহাগ পাবেন।' ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। এবং তারপর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না। মনে হল ওকে যেন রাত্রে একটি মৃতদেহের সঙ্গে থাকতে বলছি। কিন্তু ওই যে বললাম, এরা হাত দেখায় ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে। এনি থিং মোর?'

'না কিছু না। শুধু শেষ প্রশ্ন, ভারতবর্ষের সঙ্গে যখন কয়েকশো বছর সংযোগ নেই তখন কেন বিজ্ঞাপনে নিজেকে ভারতীয় নারী বলে প্রচার করছেন? মাথা নাড়লেন মহিলা, স্রেফ ব্যাবসার জন্যে ভারতবর্ষ মানে সাপুড়ে ম্যাজিশিয়ান এবং জ্যোতিষী, এ খবর এরাও জানে। আর আমার শরীরে যখন ভারতীয় রক্ত আছে তখন অ্যাডভানটেজটা নেব না কেন?'

ভদ্রমহিলা দিতে চাইলেও পয়সা নিলেন না। কিন্তু ওঁকে আমি কখনও ভুলতে পারব না। একটি মেয়ে গাড়ি চালিয়ে সন্তান নিয়ে পরবাসে এসে ব্যাবসা করছে হাতের রেখা পড়ে কিন্তু মাথা না নুইয়ে, এটা কম কথা নয়। শুধু ভাবিনি এবং ভাবতে ভালো লাগে না, সিন্ধুপ্রদেশ এখন পাকিস্তানে, সেই অর্থে তিনি কোনওমতেই ভারতীয় নন।

স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে সেক্স নিয়ে কোনও গোঁড়ামি নেই এমন গপ্পো কলকাতাতেই বসে শুনতাম। নরওয়েতে গিয়ে ধারণা পালটে গেল। অবশ্য বার্গেন শহরটা নরওয়ের মূল চরিত্রের ব্যতিক্রম হতে পারে। ঠান্ডার কারণে কি না জানি না বার্গেন শহরের মেয়েদের আমার বেশ সংরক্ষণশীল বলেই মনে হয়েছে। কোথাও কোনও সেক্স শপ দেখিনি, কোনও বিকারের বিজ্ঞাপনও চোখে পড়েনি। এক ফিনিশ কবির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। এ ব্যাপারে কথা উঠতেই তিনি রহস্যময় হাসি হেসে বলেছিলেন, 'বড্ড ঠান্ডা হে। তবে এস্কিমোরাও তো মাঝেমধ্যে স্নান করে।' ভদ্রলোককে বেশ পছন্দ হয়েছিল। পঞ্চাশের ওপর বয়স, শুধু কবিতা লিখে বেঁচে আছেন। স্ত্রী চাকরি করেন, দিনরাত মদ খান। এই একটি জায়গায় কবিদের মধ্যে বোধহয় দেশের সীমানা বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। ভদ্রলোকের নামটা খটোমটো, আজ মনে নেই, বলেছিলেন, 'শরীর-টরির নয় হে, প্রেম চাই প্রেম। মৃত মাছের পেটেও প্রেম থাকে, যদি তা বরফে চাপানো না হয়। কারণ বাসি মাছ কাটলে রক্ত বের হয় না। রক্তের উষ্ণতাই হল প্রেম। মহিলা যতই সুন্দরী হোক কাছে গেলে যদি মনে হয় হিমঘরে এলাম তাহলে তোমার প্রেমের দফা রফা।'

ফেরার পথে ডেনমার্কের শহর কোপেনহেগেনে নেমেছিলাম দু-রাতের জন্যে। গিয়ে জানলাম ওখানে রাত নামে মাত্র দু-ঘণ্টার কড়ারে। ঘড়িতে যখন রাত বারোটা তখনও ফিনফিনে রোদ চারধারে। যে হোটেলে ছিলাম তার বিছানা পালটাতে আসত একটি বৃদ্ধা। বলত, 'ভারতবর্ষ শুনেছি খুব শান্তির জায়গা। তা এখানে এলে কেন? আমাদের দেশটা এখন বদমায়েশ মেয়েতে ছেয়ে গিয়েছে। খবরদার রাস্তায় এপাশ ওপাশে নজর দিও না।' মহিলা কথা বলত ভাঙা ইংরেজিতে। ঠিক যেন আমাদের দেশের ঠাকুমাটি। হোটেল থেকে বেরিয়েই দুপাশে বিজ্ঞাপন দেখতাম, 'মুক্ত বক্ষ সুন্দরীরা আপনাকে পানীয় পরিবেশন করবেন।' খুব লোভনীয় আমন্ত্রণ, সন্দেহ কী! হোটেলের পঞ্চাশ গজের মধ্যেই ফুটপাথে পাঙ্কদের দেখতাম। খুব বীভৎস চেহারা। রাস্তা দিয়ে যারাই যেত তাদের আওয়াজ দিত। মেয়ে পুরুষ সমান। তবে আমেরিকার চেয়ে ওদের পোশাক ও শরীর নোংরায় ঢাকা। ঠান্ডা-ফান্ডা বোধহয় তেমন লাগত না। হোটেল থেকে বলে দিয়েছিল এদের পাত্তা না দিতে। দ্বিতীয় দিন দুপুরে খুব খিদে পেয়েছিল। হোটেলের কাছে একটা ফাস্ট ফুডের দোকানে ঢুকে দোকানদারকে পাঁচ-ছয় বারের চেষ্টায় বোঝালাম আমি কী খাবার চাই। আমার কাছে ইংরেজি থেকে ডেনিশ অনুবাদ করা কথাবার্তা চলানোর বই ছিল। কিন্তু রোমানে লেখা ডেনিশ শব্দ উচ্চারণ করে বেশিরভাগ সময়েই বিপাকে পড়েছি। এমনকী যারা ইংরেজি জানে তাদের উচ্চারণও আমাদের থেকে আলাদা। যে দোকানদার ইংরেজি জানে তাদের উচ্চারণও আমাদের থেকে আলাদা। দোকানদার খাবার গরম করতে চলে গেল কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ভাবছি এভাবে একা থাকা খুব কষ্টকর এমন সময় একজন পাঙ্ক মহিলা দোকানে ঢুকল। পাঁচ-সাত হাত লম্বা, হাঁটুর ওপর ঢোলা হাফপ্যান্ট, একটা টাইট সার্ট এবং দুটোই ময়লা, ফরসা চামড়ায় স্নান না করার ছাপ স্পষ্ট। আড়চোখে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বুঝলাম তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন আমার পাশে। আর একজন অমন চেহারার পাঙ্ক পাশে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ভাবতেই অস্বস্তি হয়। হঠাৎ চাপা খসখসে গলা শোনা গেল, কী শব্দ উচ্চারিত হল বোধগম্য হল না। আমি তাকালাম না। খাবারটা এলেই বাঁচি। এবার ভাঙা ইংরেজি শোনা গেল, 'নো ইংলিশ? হেই মিস্টার?' জবাব দেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। না তাকিয়েই বললাম, 'লিটল বিট।'

'ওহ্। গিভ মি এ সিগারেট।'

সিগারেট এবং দেশলাই আমার ডান হাতের মুঠোয় এবং হাতটা কাউন্টারে রাখা ছিল। প্যাকেটটা ওর হাতে দিতে অনিচ্ছা হল। ওটা খুলে একটা সিগারেট বের করে এগিয়ে দিলাম। সেটা ঠোঁটে চেপে কোনও অনুরোধ না করেই মেয়েটি দেশলাই নিয়ে নিল আমার মুঠো থেকে। সেই

মুহূর্তে লক্ষ করলাম ওর ডানহাতের নখগুলো লম্বা এবং ছুঁচোলো। দেশলাইটা যখন জ্বালল তখন দেখলাম বাঁ-হাতের নখ নিটোল কাটা। আমি লক্ষ করছি বুঝতে পেরে তিনি বললেন হাত দেখিয়ে, 'ফর প্রোটেকশন'। বলে হাসলেন।

এই সময় আমার খাবার এল। মহিলা আমার কাঁধে টোকা দিলেন, 'আই অ্যাম হাঙ্গরি!' যাচ্চলে! অসহায়ভাবে দোকানদারের দিকে তাকালাম। লোকটা যেন কিছুই শোনেনি এমন ভঙ্গি করে অন্য কাজ করতে লাগল। মহিলা আমাকে বললেন, 'আই নিড ফুড। নো মানি! বাই ফুড ফর মি।'

এবার না বলে পারলাম না, 'হোয়াই?'

'বিকজ আই অ্যাম ওম্যান। আই অ্যাম টু এইট, ক্রসিং টোয়েন্টি এইট। ব্যাড অর গুড?'

ঠিক এই সময় একটি পাঙ্ক ছেলে দোকানে ঢুকল। মেয়েটিকে দেখে সে তার ভাষায় চিৎকার করে গালাগালি দিতে লাগল। আমাকে ছেড়ে দিয়ে মেয়েটি তার দিকে এগিয়ে গেল। খাবার খেতে খেতে দুজনের অঙ্গভঙ্গি দেখলাম কারণ ভাষা আমার অজানা। হঠাৎ ছেলেটি হাউ মাউ করে কেঁদে উঠে মেয়েটির বুকে মাথা রাখল। যেভাবে গরু তার বাছুরের শরীর চাটে তেমনি করে তিনবার মেয়েটি ওকে চুমু খেল। তারপর হাতের সিগারেরটটা ছেলেটাকে দিয়ে আমাকে দেখিয়ে বলল, 'হি ইজ গুড। হি বাই ফুড ফর মি। গো ব্যাক। ডোন্ট ওরি।'

লোকটা চোখ মুছল। পাক্কা পাঙ্কের সাজসজ্জা। তারপর সিগারেট হাতে আমার সামনে এসে আঙুল তুলে জিজ্ঞাসা করল। 'ইউ আর নট ব্যাড ম্যান?'

হেসে ফেললাম, 'আই ডোন্ট নো।'

লোকটা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। এই সময় মেয়েটা তাদের ভাষায় কিছু বলতে লোকটা অট্টহাসি হাসল। যেন আমার রসিকতা একটু দেরিতে বুঝতে পেরেছে। আমার পিঠ চাপড়ে সে সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে বেরিয়ে গেল। এবার মহিলা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'হি ওয়ান্টস টু ম্যারি মি। বাট আই উইল নট ম্যারি হিম।'

খেতে খেতেই সময় কাটাবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?'

'আমি সাদা চামড়াকে বিয়ে করব না।'

'তাহলে আফ্রিকা বা আমেরিকার কালো মানুষকে পছন্দ করো।'

'না। আমি কালো মানুষকে বিয়ে করব না। ওদের মুখ খুব খারাপ হয়?'

'তাহলে তো তোমাকে চিনাদের বিয়ে করতে হয়?'

'নো। আই লাইক ইওর স্কিন।'

গলায় খাবার আটকে যাচ্ছিল। মহিলা হাসলেন, 'আমি স্নান করলে তুমি চোখ ফেরাতে পারবে না! কোন হোটেলে উঠেছ তুমি?'

'অ্যাবসন।'

'ওখানে তো আমাদের ঢুকতে দেয় না।'

'ওখানে কেন যাবে তুমি?'

'তুমি তো আমাকে খাওয়াচ্ছ, অতএব কয়েক ঘণ্টা আমরা স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকতে পারি। কিন্তু ওই হোটেলের দারোয়ান খুব কড়া।' আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। খাওয়া না গেলা তা বলতে পারব না। দাম মিটিয়ে যখন ফুটপাতে নেমেছি তখন মহিলা আমার পেছনে। প্রথমে নরম গলায় বললেন, 'তুমি বড্ড ভুলো লোক, বললাম না আমি খেতে চাই। সকাল থেকে কিস্যু খাইনি!'

আমি জবাব না দিয়ে বড় পায়ে হাঁটতে লাগলাম। এবার মেয়েটির ভাষা পালটাতে লাগল।

আমার পেছন-পেছন প্রায় হোটেলের দরজা পর্যন্ত এল সে। এবং পথটুকু পৃথিবীর যত অশ্রাব্য শব্দ একের পর এক উচ্চারণ করে গেল। আমায় ভয় হচ্ছিল অন্য পান্করা যারা ফুটপাথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে তারা না আমায় ওপর হামলা করে। কিন্তু তারা শুধু চিৎকার করে মেয়েটিকে উৎসাহিত করছিল মাত্র।

রিসেপশনিস্টকে ঘটনাটি বললাম। তিনি হাসলেন, 'প্রথমেই আপনার বলা উচিত ছিল সিগারেট দিতে পারবেন না। এরা খুব মুডি। প্রস্টিটিউট নয়। ইচ্ছে না হলে হাজার টাকা পেলেও কোনও পুরুষকে চাইবে না। খিদের সময় আপনাকে হয়তো ভালো লেগে ছিল। তারপর গলা নামিয়ে বলেছিল, 'দেশে গিয়ে এসব গল্প করবেন না।'

কোনও বঙ্গসন্তান যদি কোপেনহেগেনে যান তাহলে তাঁকে বলব দুটো দিন যেন ত্রিবেণীতে কাটান। একটি বিশাল এলাকা জুড়ে নাটক গান বাজনা, ম্যাজিক থেকে আরম্ভ করে সংস্কৃতির দৃশ্যগ্রাহ্য যে-কোনও রূপ পরিবেশিত হচ্ছে সারা বিকেল এবং সন্ধ্যায়। বলছি আর একবার সন্ধে মানে রাত সাড়ে বারোটা। সকাল আড়াইটে। কিন্তু যে অভিজ্ঞতা হল তার কোনও তুলনা নেই।

হিথরো এয়ারপোর্টে যখন নামলাম ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে চেপে তখন লন্ডনের আকাশে সূর্যদেব আছেন। বলতে দ্বিধা নেই, লন্ডনে নামার সময় আমার মনে বন্দেমাতরম্ মার্কা একটা অনুভূতি কাজ করছিল যা বলছিল এই সেই দেশ যাদের কাছে আমরা দুশো বছর পরাধীন ছিলাম। ইতিহাসের সত্যিই তো আমরা মানতে চাই না। আমাদের কোনও মেরুদণ্ড ছিল না, সংহতি ছিল না, একে অন্যের সর্বনাশ চাইতাম আর সেই সুযোগ নিয়েছিল ইংরেজ। যদিও সতেরোশো অষ্টাশি সালে আমরা যেখানে ছিলাম আজ তা থেকে খুব একটা এগোইনি কিন্তু সৌভাগ্য যে-কোনও বিদেশি রাষ্ট্র এই মুহূর্তে দখলের কালো হাতে বাড়াচ্ছে না। হিথরো এয়ারপোর্টে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল 'আমি কেন এসেছি?' হেসে বলেছিলাম, 'এই দেশটাকে ছেলেবেলা থেকে পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে যতটা জানি ততটা ভারতবর্ষকেও জানি না। সেই কারণেই জানার সঙ্গে দেখাকে মেলাতে এসেছি।' লোকটা হাঁ হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, 'এখানে না এসেও এদেশকে জানেন?' মাথা নেড়েছিলাম, 'কী করব বলুন?' শেকসপিয়ার, বায়রন, শেলি, কীটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ডার্বিশায়ার, ল্যাঙ্কাশায়ার, ম্যাঞ্চেস্টার, লর্ডস, লিডস থেকে লেন হাটন, কী জানি না বলুন? ক্লাইভ সাহেব আমাদের সর্বনাশ করে ছেড়েছেন।'

'কে ক্লাইভ?'

'রবার্ট ক্লাইভ। ওর মা নিশ্চয়ই বব বলে ডাকতেন।'

'কী করেন তিনি?'

'করেন না, করতেন। ইস্ট ইন্ডিয়া নামের এক কোম্পানি ছিল লন্ডনে তার হয়ে ব্যাবসা করতে গিয়েছিলেন আমাদের দেশে। যাঁর জন্যে শেষ পর্যন্ত আপনাদের ইউনিয়ন জ্যাক আমাদের দেশে উড়েছিল।'

লোকটি কী বুঝেছিল জানি না, চটপট আমার পাসপোর্টে স্ট্যাম্প মেরে ছেড়ে দিয়েছিলেন। হিথরো কাস্টমস আমাকে আটকায়নি। সুটকেস নিয়ে যখন বাইরে পা দিয়েছি তখনই পাইল এগিয়ে এল।

'আসেন সমরেশবাবু। আমি পাল।'

সিলেটি বাংলা শুনেও খুব ভালো লাগল। বললাম, 'আপনাকে দেখে প্রাণ জুড়োল।'

'আমার লগে একজন তামিল মেয়ে আইছে। সে গাড়িতেই আছে।'

'তামিল মেয়ে?'

'হ্যাঁ। আমার দোকানে কাজ করত। এখন কেয়ার অফ্ গ্রেট ব্রিটেন।'

॥ ২ ॥

আমরা কথা বলতে-বলতে এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ের বাইরে আসছিলাম। হিথরো এয়ারপোর্টে পরে আমার একটা দারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এই ফাঁকে সেটা বলে রাখি।

কলকাতা বোম্বাই দিল্লি থেকে সরাসরি বিদেশে যাওয়ার প্লেন পেলে সুটকেসগুলো যে এয়ারলাইন্সে যাচ্ছি তাদের কর্মীরাই বোর্ডিং কার্ড দেওয়ার সময় সংগ্রহ করেন। শুধু আমাদের টিকিটের পেছনে একটা ছোট্ট কাগজ সেঁটে দেওয়া হয় প্রাপ্তিস্বীকার চিহ্ন হিসেবে। মাঝপথে প্লেন পালটালেও দুশ্চিন্তা করতে তাঁরা নিষেধ করেন, গন্তব্যস্থলে ঠিক সুটকেসগুলো পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দেন। বিদেশে এয়ারপোর্টে নেমে লাগেজ নেওয়ার জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। ফ্লাইট নম্বর অমুকের সুটকেস বাক্স বেল্টে চেপে পাক খেতে থাকে সেখানে। যে-যার নিজেরটা তুলে নিয়ে কাস্টমস এবং ভিসার ঝামেলা সামলে বেরিয়ে যাও। এই অবধি কোনও বিস্ময় নেই। কিন্তু ধরুন বেল্টটা ঘুরছে শ'দুয়েক সুটকেস নিয়ে এবং আপনি আপনারটা খুঁজে পাচ্ছেন না। বেশ কয়েকটি এক রঙা এক কোম্পানির সুটকেসকে নিজের সুটকেস ভেবে ছুটে গিয়ে অন্য যাত্রীর খিঁচুনি খেয়েছেন। এবং শেষে যখন সব ফাঁকা হয়ে গেল তখন আপনি একা দাঁড়িয়ে, তখন কী করবেন? ওই সুটকেসেই আপনার যাবতীয় সম্পত্তি রয়েছে যার অভাবে বিদেশে একদিনও থাকা সম্ভব নয়। হয়তো এয়ারপোর্টের বাইরে যেতে হলে ভারী গরমজামা দরকার তাও রয়েছে ওখানে। কর্তৃপক্ষ বলে থাকেন ওই অবস্থায় আপনার কর্তব্য হল সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সের এয়ারপোর্টে কাউন্টারে গিয়ে বিষয়টি জানানো। তাঁরা জেনে একটা ফর্ম দেবেন। বাক্সের সাইজ, রং, কোম্পানির নাম, ওপরে যা লেখা ছিল তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে সেই শহরে আপনার অস্থায়ী ঠিকানা লিখে ফর্ম ফেরত দিলে তাঁরা হেসে বলবেন, 'কোনও চিন্তা করবেন না, ওটাকে যত শিগগির খুঁজে বের করে আমরা আপনার কাছে পৌঁছে দিচ্ছি।' আমি এবং আমার মতন অনেক বঙ্গসন্তান মুখ কালো করে ওঁদের দেওয়া একটা রসিদ হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসি। আমি খবরই রাখিনি সুটকেস ওঁদের হেফাজত থেকে হারিয়ে গেলে ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব ওঁদের। যদ্দিন আমি ওই শহরে থাকব এবং ওঁরা ফেরত দিতে পারছেন না তদ্দিনের জন্যে প্রতিদিনের হারে একটা ভালো অঙ্কের টাকা আমি পাব। আর সবশেষে যদি কখনওই সুটকেস না পাওয়া যায় তাহলে তার ওজন অনুযায়ী মোটা অঙ্ক আমার পকেটে আসবে। ঠেকে শিখেছি শুধু শার্ট প্যান্টে সুটকেস ভরতি তা, হারিয়ে যাওয়ার পর বলতে নেই। অভিজ্ঞরা জ্ঞান দিয়েছেন দামি ভারী-ভারী বই আছে বলতে। তাতে ওজন বেড়ে যাবে নির্ঘাত। যত ওজন তত ক্ষতিপূরণ। অবশ্য তারও একটা সীমা বাঁধা আছে। ওই হিথরো এয়ারপোর্টে নেমে বেল্টের দিকে চাতকের মতো তাকিয়ে দেখলাম যে যারটা তুলে নিয়ে গেল। শুধু একটি ছোট্ট সুটকেস পাক খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত ভেতরে ঢুকে গেল। ওটা লাগেজ রুমে বিশ্রাম নেবে। আমার পরনে তখন একটা সোয়েটার। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁটা ফুটল। বাইরে নিশ্চয়ই পাঁচ ডিগ্রি, বৃষ্টি হলে কথাই নেই। এয়ারলাইন্সের কাউন্টারে গিয়ে চেঁচামেচি করতে ওঁরা আশ্বাস দিলেন আগামীকাল পৌঁছে যাবে আমার সুটকেস। ওঁরাই সেটা বাড়িতে দিয়ে আসবেন। এনি থিং মোর? রসিদ নিয়ে মাথা নেড়ে কাউন্টার ছাড়ার সময় এক বাঙালি ভদ্রলোক পাউন্ড নিচ্ছেন ফর্ম ভরতি করে। গেটের বাইরে এসে যখন ঠকঠক করে কাঁপছি তখন পেছন থেকে বাংলায় প্রশ্ন হল, 'আপনি ডেইলি অ্যালাউন্স নিলেন না?'

চমকে তাকিয়ে দেখি সেই বঙ্গসন্তান, হাসছেন। মাথা নেড়ে না বলতেই বললেন, 'সে কী মশাই, গৌরী সেনের টাকা ছাড়াবেন কেন?' তখন আমি জানলাম। বোঝা গেল পৃথিবীর সব দেশেই দাবি না করলে কেউ নিজে থেকে তুলে কিছু দেন না। কিন্তু এখন আর ফিরে গিয়ে চাওয়ার কোনও উপায় নেই। আমি কাস্টমসের চত্বর পেরিয়ে এসেছি। ভদ্রলোক বললেন, 'কিন্তু আপনি এ কী করেছেন

একটা হাফ স্লিভে, ভারী কিছু সুটকেস থেকে বের করে নেননি কেন?'

'আমি কি জানতাম ওটা এখানে এসে পাব না।' সত্যি কথাটাই বললাম।

'প্রথম বুঝি!' ভদ্রলোক হাসলেন।

সুটকেস হারাবার পর কেউ এভাবে হাসতে পারে?' বললাম, 'না। আপনি কলকাতার?'

'এককালে। এবার বেড়াতে গিয়েছিলাম।'

'আপনারও সুটকেস হারিয়েছে?'

'না।'

ঠান্ডা-ফান্ডায় কথা ভুলে গিয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকালাম। একটু আগে এই ভদ্রলোক ক্লেইম ফর্ম ভরতি করে কাউন্টারে চোটপাট করে এসেছেন। ক্ষতিপূরণ বাবদ আজকের দিনের জন্যে হাতখরচ নিয়ে এসেছেন। অথচ দেখুন বেমালুম বলছেন তাঁর সুটকেস হারায়নি। অবাক গলায় প্রশ্ন করলাম, 'তাহলে যে ওখানে—।'

ভদ্রলোক বললেন, 'শুনুন মশাই, আমি থাকি লন্ডন থেকে দেড়শো মাইল দূরে। ওই সুটকেস বয়ে নিয়ে টিউব ট্রেন বদলাও। স্টেশন থেকে আমার বাড়ি আড়াই মাইল ভেতরে। গাড়ি বলা নেই। অতএব সুটকেসের জন্যে ট্যাক্সি করতে হত। এত কষ্ট না করে হারিয়ে গেছে বলে দিলাম। ওরাই খুঁজে পেতে শেষ পর্যন্ত এখানকার লাগেজ রুমেই পাবে মালটাকে। আগামীকাল লোক দিয়ে ওদের খরচায় আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে। মাঝখান থেকে আমি এখন যাচ্ছি ঝাড়া হাত পায়ে, পকেটে কয়েকটা পাউন্ডও এসে গেল উপরি।'

'আপনি আপনার সুটকেস বেল্ট দেখেও তুলে নেননি?'

'না। এখানে কেউ কোরো জিনিস নেয় না, আমারটাও নেবে না।'

'ওরা যাচাই করে দেখবে না সত্যি আপনারটা হারিয়েছে কি না!'

'দেখবে না। কারণ প্লেনে উড়ে এসে নিজের সুটকেস দেখেও হাত সরিয়ে নেবে এমন মানুষের সংখ্যা দশহাজারে একজন। আপনারটা যাচাই করল? আরে আমি মশাই বেসিক্যালি ভবানীপুরের ছেলে, এসব কায়দা কানুন আমার জানা আছে।' ভদ্রলোক হাত দুলিয়ে অন্যদিকে হাঁটতে লাগলেন। অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম। একমাত্র বঙ্গসন্তান ছাড়া এমন সুবিধেবাদী চিন্তা আর কার মাথায় আসে, জানি না।

পাল-এর সঙ্গে বেরিয়ে এলাম বাইরে। আর আকাশের তলায় এসে দাঁড়াতেই মনে হল খুব চেনা জায়গায় এসেছি। লন্ডন মানেই মেঘ টিপটিপ বৃষ্টি, স্যাঁতসেতে ব্যাপার-স্যাপার—এই চেনা বর্ণনাটা হুবহু মিলে গেল। মেঘগুলো এত কাছে ভাসছে যে উলটে পড়লেই ভিজে যাব। রাস্তা ডিঙিয়ে গাড়ির দঙ্গল পেরিয়ে যেতে-যেতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মেয়েটি কেয়ার অফ গ্রেট ব্রিটেন মানে?' পাল গম্ভীর গলায় বলল, 'পরে বলব। এসে গেছি।'

সিলেটের লোক দীর্ঘকাল লন্ডনে থাকলেও কোনও অসুবিধা বোধ করে না। কারণ লন্ডনেও ছোটখাটো সিলেট রয়েছে। তাঁদের কথার টান, শব্দের ব্যবহার স্পষ্ট করে দেয়, যে আমরা যে ভাষাটাকে বাংলা বলে জানি তার সঙ্গে এর খুব যোগাযোগ নেই। কিন্তু কলকাতার বাঙালি পেলে এঁরা কথা বলতে চেষ্টা করেন কৃত্রিমভাবে, মধ্যে অতিথির কোনও অসুবিধা না হয়। সিলেটে যখন নিজেদের মধ্যে বাংলা বলেন তখন সেটা কলকাতায় বাঙালির কানে ডেনমার্কের ভাষা বলেও বোধ হতে পারে। পাল আমার সঙ্গে কথা বলতেন সতর্কভাবে। কিন্তু যেটা হল সেটা বেশ মজার। আমি কোনওদিন পূর্ববাংলার মানুষ না হয়েও দ্রুত ওঁর কথা বলার ভঙ্গিটাকে নকল করে ফেললাম। এতে উনি খুশি হলেন। আর আমি একটা দুটো সিলেটি শব্দ শিখে ফেললাম।

চেহারা দেখে মনে হল পালের গাড়িটি যথেষ্ট মূল্যবান। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। ডিকি খুলে আমার সুটকেস সেখানে তুলে দিয়ে পাল বলল, 'ইংল্যান্ডে প্রথম?' 'হ্যাঁ?' শরীরে ভারী জামা থাকায়

ঠান্ডা লাগছে না। কিন্তু নাক জমতে শুরু করেছে। 'ভালো করে জাতটাকে দেখে নিন। আমাদের চাকর করে রেখেছিল।'

পালকে দেখে আমার মোটেই স্বাধীনতাকামী ভারতীয় বলে মনে হয়নি। কিন্তু এই কথাগুলোতে ঝাঁঝ লক্ষ করলাম। গাড়িতে ওর পাশে বসার পর আরাম হল। চমৎকার গরম হয়ে আছে ভেতরটা।

কোমরে বেল্ট বেঁধে জ্যাকেট খুলে ফেললাম। পাল এবার মুখ ফিরিয়ে ডাকল, 'মানি, হেই মানি। গেট আপ।'

অবাক হয়ে দেখলাম, পেছনের সিটে যে উপুড় হয়ে শুয়েছিল সে এবার উঠে বসল। স্বাস্থ্যবতী বেঁটেখাটো কালো চেহারার ভারতীয় মেয়ে। মাথা ভরতি কোঁকড়ানো চুল যা কাঁধের সীমা ছুঁয়েই থেমে গেছে। ঘুম ভাঙা ফোলা-ফোলা চোখে মেয়েটি সরল হাসল, 'হাই।' পাল পরিচয় করিয়ে দিল, 'এই হল মানি। ইনি মিস্টার মজুমদার। মানি আমাদের শহরে থাকে, একা। আগে আমার রেস্টুরেন্টে চাকরি করত। এখন আকাশ থেকে প্যারাসুটে চেপে লাফ দেয়।'

মানি পালের ইংরেজি শুনে খিলখিল করে হেসে বলল, 'ওঃ, ডোন্ট সে লাইক দ্যাট। ওয়ে, আমি আগে চাকরি করতাম। এখন করি না। সরকার আমাকে বেকারভাতা দেয়। একটা ফ্ল্যাট দিয়েছে। তাতেই চলে যাচ্ছে যখন তখন কেন কাজ করতে যাব। আর কাজ করলে তো বেকার ভাতা পাব না। প্যারাসুট জাম্পের ব্যাপারটা হল, আমি সপ্তাহে দুদিন ওই ট্রেনিং নিচ্ছি। খুব থ্রিল লাগছে। না, না চাকরি পাওয়ার জন্যে নয়। এমনি, ভালো লাগে, তাই। তবে ডাক্তার বলে দিয়েছে সামনের মাস থেকে ওটা করা চলবে না।' মানির ইংরেজি ভারতীয়দের মতো। প্রতিটি শব্দ আলাদা করে চেনা যায়। পাল ততক্ষণ গাড়ি বের করেছে পার্কিং লট থেকে। স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'মানির বাবা-মা থাকেন ইংল্যান্ডের আর এক প্রান্তে। ওঁরা মাদ্রাজের লোক। মানি জন্মেছে এখানে। এখন দেশের নাগরিক, তাই বেকার ভাতা পাচ্ছে।'

'এখন বেকারের সংখ্যা কম?'

'তুলনামূলকভাবে। তবে বাড়ছে। নাগরিক হলে এসব সুবিধা পাওয়া যায়।' তারপর বাংলায় বলল, 'শালা, আমাদের ট্যাক্সের টাকায় বেকার পুষছে, ভাবুন।' রাগটা সরাসরি সরকারের বিরুদ্ধে। যদ্দুর জানি পালও ব্রিটিশ নাগরিক। বছরকুড়ি আছে এখানে। একটা রেস্টুরেন্ট আছে। অবস্থা খারাপ বলেই ট্যাক্সের কথা বলল।

এদেশের মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে আমাদের দেশে রাস্তাঘাট, ব্রিজ তৈরি করেছিল। আমরা সেগুলোর প্রশংসা আজও করে থাকি। এই সেদিনও শিলিগুড়ি থেকে মালবাজার যাওয়ার পথে তিস্তার ওপরে সেবক করোনেশন ব্রিজ দেখে আমার এক নবীন বন্ধু চমকিত। বলেছিল, 'ব্রিটিশ যা করে রেখে গেছে তারপর বুঝলেন, 'খুব একটা এগোয়নি।' আমি যতই বলি ওই ব্রিজ তৈরির সঙ্গে একজন বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার জড়িত ছিলেন সেটা সে কানেই তুলছিল না। এয়ারপোর্ট থেকে পালের গাড়ি যখন বেরিয়ে আসছিল তখন আমি কিন্তু মুগ্ধ হচ্ছিলাম না। আধা অন্ধকার করে আসা মেঘ দেখে মন খারাপই হয়ে যাচ্ছিল। কেনেডি এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে নিউইয়র্কের দিকে যাওয়ার সময় যে বিস্ময় ছিল হিথরোতে তা নেই। পালের কাছে শুনলাম আমরা লন্ডন শহর এড়িয়ে যাব।

যাব বোস্টনে। ম্যাঞ্চেস্টারের কাছে। চার ঘণ্টার ড্রাইভ। হাইওয়ের চেহারা অবশ্য অনেকটা আমেরিকার মতো। মাথার ওপরে পথ-নির্দেশক বোর্ডগুলো অথবা পাশের হোটেল রেস্টুরেন্ট পেট্রল পাম্পের সাইনগুলো বলে দিচ্ছে নতুন মানুষদের কোনও অসুবিধা হয় না এখানে। এখন আমার দু-পাশে ধুধু প্রান্তর। কখনও চাষের মাঠ কখনও গরুদের অলস বিচরণ। এইসব গরু যেমন বিলিতি ছবিতে দেখেছি, বিশাল স্বাস্থ্যবান চেহারা, চকচকে কালোয় সাদায় মেলানো। ইংরেজি কবিতায় এই খামারবাড়ির বর্ণনা খুব পেয়েছি। হাইওয়ের পাশাপাশি লেন দিয়ে হুসহাস গাড়ি চলছে। তাদের চেহারার পার্থক্য চোখে পড়ার মতো। আমাদের গাড়ির সবক'টা জানলা বন্ধ। পেছনের সিটে মানি

আবার শুয়ে চোখ বন্ধ করেছে। মেয়েটা এত ঘুমোয় কেন? হঠাৎ পাল বলল, 'বলুন তো কত মাইল স্পিডে আমরা যাচ্ছি।' আড়চোখে মিটার দেখলাম। একশো দশ পনেরোর মধ্যে ঘুরছে ওটা। এবং তখনই খেয়াল হল ইংল্যান্ডে কিলোমিটার চালু নয়। ওঁরা এখনও মাইলেই আছেন। অর্থাৎ ওখানে যদি একশো কুড়ি তা হলে ভারতবর্ষে কিলোমিটারে তা একশো আশি। সঙ্গে-সঙ্গে শরীর হিম হয়ে গেল। অথচ ওটা দেখার আগে বুঝতেই পারিনি যে একশো আশিতে আমি যাচ্ছি। বোকার মতো হাসলাম। পশ্চিমবাংলার কোনও ড্রাইভার একশো কুড়িতে গাড়ি তোলার চেষ্টা করলে অ্যাকসিডেন্ট অনিবার্য। অথচ রাস্তার কল্যাণে পাল স্বচ্ছন্দে একশো আশিতে যাচ্ছে। পাল জিজ্ঞাসা করল, 'আরও স্পিড তুলব?' আমি দ্রুত জবাব দিলাম, 'না।'

ইংল্যান্ডে এসে বোস্টনে যাওয়ার পেছনে আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল। বড়-বড় শহরে রাস্তায় হাঁটা যায়, মিউজিয়ম আর গ্যালারি দেখা যায় কিন্তু সারাক্ষণ মানুষের সঙ্গে জম্পেস আড্ডা মারা যায় না। শুনেছিলাম বোস্টন একটা ছোট্ট শহর, সবাই সবাইকে চেনে এবং পাল ওখানে খুব পরিচিত। ওঁর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা এখন দেশে বেড়াতে গিয়েছে। অতএব ওঁর কাছে হাত-পা মেলে থাকার এবং মেলামেশার সুযোগ পাওয়া যাবে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'এদেশে আপনার অনেকদিন হয়ে গেল?'

পাল মাথা নাড়ল। লোকটার মুখে সবসময়ে একটা রহস্যময় হাসি মাখানো থাকে, 'বেকার এসেছিলাম। রেস্টুরেন্টে কাজ করতাম। লন্ডনে। তারপর একজনের সঙ্গে শেয়ারের রেস্টুরেন্ট করলাম। শেষে এই বোস্টনে। অনেকদিন তো হয়ে গেল। তবে আর ভালো লাগে না। এ শালার দেশে মন পাই না। আই অ্যাম প্ল্যানিং টু গো ব্যাক ইন্ডিয়া।'

ওয়াশিংটন থেকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পথে রমেন পাইন দুঃখের কথা বলেছিলেন। মনোজ বলেছিল, বেশিরভাগ বাঙালি আপনাকে একা পেলে দেশের জন্যে কাঁদবে কিন্তু দেখবেন দেশে পাকাপাকি ফিরবে না।' ওর এই বিশ্লেষণ সত্ত্বেও আমার মনে হয়েছিল রমেনের কষ্টটা খুব খাঁটি। আর আজ পাল যখন একই কথা একটু মোটা ভাষায় ইংল্যান্ডের হাইওয়েতে বলল তখন ধন্ধ লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'দেশে গেলে যে-যে সুবিধা এখানে পাচ্ছেন তা কি পাবেন?'

'মারেন গুলি সুবিধার মাথায়। পাউন্ড গুনি, বাড়ি বানাই আর ইংরেজি শব্দগুলো চিবাই। আরে মশাই, বউ-এর সঙ্গেও কথা বলতে ভালো লাগে না।'

'কেন?' আমি কি কোনও গল্পের গন্ধ পাচ্ছিলাম? জানি না।

'কী কথা বলব। ছ'মাস সব কথা শেষ। এখন সে-ও জানে আমার জীবন কী আমিও জানি তার কথা। যাই বলেন, 'পিসিমা মাসিমা না থাকলে স্বামী-স্ত্রীর জীবনে কোনও বৈচিত্র্য আসে না। শালা এক রান্না এক শোওয়া বসা। বাড়ির বাইরে গিয়ে কারও সঙ্গে মন খুলে অন্য কথা বলার উপায় নেই। পুরুষগুলো টাকা ছাড়া অন্য কথা বলে না, মেয়েগুলো শোওয়া ছাড়া অন্য কিছু দিতে জানে না। আই অ্যাম ফেড আপ। বলেন তো, আমি কেন চার ইন্টু দুই ঘণ্টা ড্রাইভ করে আপনাকে নিতে এলাম এয়ারপোর্টে?' পাল রাগি মুখে তাকাল। সত্যিই তো, কেউ ঘাটশিলায় নামলে আমরা কলকাতা থেকে তাকে আনতে যাই না। তাঁকেই বলি ট্রেন ধরে চলে আসুন হাওড়া স্টেশনে, সেখানেই যাচ্ছি। পাল জবাব দিল, 'মুখ বদলাবার জন্যে। আপনার সঙ্গে বাংলায় কথা বলব। যে ক'দিন থাকবেন একটু বেপরোয়া হয়ে থাকেন। ডিসিপ্লিন মেনে মেনে একদম ভিজে গেছি মশাই। মাল খাই না তিন বছর। স্ত্রীর শাসন। চরিত্র ঠিক রেখে শুধু টাকা রোজগার করে গেলে লোকের, মানে দেশের লোকের হাততালি পাবে। আরে আমি কি মেশিন নাকি?'

এবার মনে হল, মনোজের বোধহয় ভাবনাটায় ফাঁক ছিল। এমন খোলামেলা কথা যে বলে তার মধ্যে ন্যাকামি নেই। সেইসঙ্গে আশান্বিত হলাম, যে জীবন আমাকে পাল যাপন করতে বলছে এখানে তাতে আর যাই হোক নিষেধের লাল চোখ নেই।

ন্যাড়া মাঠ বা গোচারণভূমি পেরিয়ে আচমকাই একটা শপিং কমপ্লেক্স চোখের সামনে উঠে এল। এপাশে পেট্রল পাম্প, কিছু কেনাকাটার দোকান এবং রেস্টুরেন্ট। আর কোনও বাড়িঘর ধারে কাছে নেই। গাড়ির গতি কমিয়ে পাল জিজ্ঞাসা করল, 'কফি খাবেন?' মনে হল মন্দ হয় না। দেখলাম গোটাআটেক গাড়ি সামনে দাঁড়িয়ে। হাইওয়ের খদ্দেরদের জন্যে এই তিনটে ব্যবস্থা। গাড়ির দরজা খুলে নীচে পা দিতেই পৃথিবীর নবম বিস্ময়ের সামনে এসে দাঁড়ালাম। আমি আমার কানকেও বিশ্বাস করতে পারছি না। ওপাশের কোনও গাড়ির টেপ রেকর্ডারে বাজছে 'মৌ বনে আজ মৌ জমেছে বউ কথা কও ডাকে।'

ইংল্যান্ডের এই নির্জনতম হাইওয়ের পাশে বাজছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান। এবং সেই গান আমাকে যৌবন চিনিয়েছিল? কোনও কথা না বলে এগিয়ে গেলাম। তিনটে গাড়ির পরে গানের উৎসটিকে আবিষ্কার করলাম। গাড়ির কাচ নামানো। তাই শব্দাবলি বাইরে বেরুচ্ছে। গাড়ির ড্রাইভিং সিটে কেউ নেই। কিন্তু তার পাশের সিটে একটি মধ্যবয়সি মহিলা একমনে গান শুনতে-শুনতে বই পড়ছেন। এবং পাঠক মহিলাটি পুরোপুরি ব্রিটিশ। এটি দ্বিতীয় চমক। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে গানটা শুনলাম। কয়েকশো বার শোনা গান এই পরিবেশে নতুন হয়ে বাজল যেন। তারপরেই ইন্দ্রাণী ছবির সেই গান, 'সূর্য ডোবার পালা আসে যদি আসুক বেশ তো।' মুহূর্তে আমি চলে গেলাম সেইসব রাতে যখন জলপাইগুড়ির ওপরে চমচমে জ্যোৎস্না হিমে মাখামাখি। শহর নিশ্চুপ। আর আমি, এই আমি পিতামহকে লুকিয়ে বিছানায় পাশবালিশ রেখে ওপরে লেপ চাপা দিয়ে রূপশ্রী হল থেকে নাইটশো দেখে চোরের মতো ফিরছি। স্কুলের ছাত্র হয়েও সেই জ্যোৎস্নার রাত্রে আমার গলায় হেমন্ত মুখার্জি আর মনে সুচিত্রা সেন একাকার হয়ে যেতেন। আমি হাঁটতাম ঘোরে আর 'ঘুম ঘুম চাঁদের' সেই মাধবীরাতটা হয়ে উঠত মায়াময়। ঈশ্বর সময় পাননি নজর দেওয়ার তাই কখনও পিতামহের কাছে ধরা পড়িনি। কিন্তু যে রোমান্টিকতার বীজ বপন হয়ে গিয়েছিল সেই সময়ে তার মূল্য দিতে হল অনেক বছর।

'ইয়েস জেন্টলম্যান, এনি প্রব্লেম?'

চমকে পেছনে ফিরে দেখি এক রোগা সাহেব বেশ কয়েকটা প্যাকেট হাতে নিয়ে আমার পেছনে দাঁড়িয়ে। হেসে বললাম, 'সমস্যাটা আমার একারই। আপনি বাংলা জানেন?'

'না। ওঃ, আই সি! আপনি বাংলাদেশের লোক?'

এই প্রভেদটা বোঝাতে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। মাথা নেড়ে বললাম, 'বাংলা জানেন না অথচ বাংলা গান শুনছেন। রেকর্ডটা পেলেন কোথায়?'

'লন্ডনে। কেন জানি না সুর আর ভয়েস আমার ভালো লাগে। ইন ফ্যাক্ট, আমি গানের কথাগুলোর মানে জানি না।' ভদ্রলোক গাড়ির দরজা খুলে মহিলাকে প্যাকেটগুলো দিলেন। বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম। পাল আর মানি দাঁড়িয়েছিল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান বাজাতে বাজাতে আবার হাইওয়ের দিকে চলে গেল। কেন জানি না, মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

ম্যাঞ্চেস্টার ছাড়িয়ে যখন আমরা বোস্টনে ঢুকছি তখন ঘড়িতে চার ঘণ্টা পার হব-হব কিন্তু মেঘ কেটে গেছে। পরিষ্কার ছবির মতো রাস্তাঘাট। পাল মানিকে তার বাড়ির সামনে নামিয়ে দিল। ছ'তলা ফ্ল্যাট বাড়িগুলোয় বোস্টনের বেকাররা থাকেন। মানি শরীর বেঁকিয়ে হাসিমুখে হাত নেড়ে বিরাট একটা 'বাই' বলে আমাদের বিদায় জানাল। পাল বলল স্টিয়ারিং ঘোরাতে-ঘোরাতে 'মেয়েটা বেসিক্যালি ভালো। কিন্তু এখানকার ইন্ডিয়ান মেয়েরা ভালো চোখে দ্যাখে না।'

'কেন?'

'প্রথম কথা একা থাকে। দ্বিতীয় ব্যাপার ও নিজেই প্রচার করেছে, মা হতে যাচ্ছে।'

'মা হতে যাচ্ছে মানে? বিয়ে থা?'

'দরকার মনে করেনি। অনেক ব্রিটিশ মেয়ে করে না। বেকারভাতা নিতে আরম্ভ করার পর

ওর তো চাকরি করা নিষেধ। সরকার ওকে এর মধ্যে গোটাতিনেক চাকরির অফার দিয়েছে আর ও যে-কোনও একটা কারণ ঘটিয়ে চাকরিগুলো পায়নি। তারপরই মনে হল কনসিভ করলে এক-দেড় বছর আর সরকার থেকে চাকরি করার চাপ দেবে না। মনে হওয়ামাত্র কাজটা সেরে নিল!'

'ছেলেটির সঙ্গে ওর প্রেমট্রেম ছিল না?'

'একেবারে না বলাটা ভুল হবে। ওই বয়সের মেয়ের সঙ্গে অনেকেরই প্রেম থাকে। ইউরোপ আমেরিকায় ষোলো বছর পেরিয়ে গেলেই মেয়েরা ডেটিং শুরু করে। আর ডেটিং মানে তো শুধু হাত ধরাধরি করে বেড়ানো নয়। শোওয়াটা যে একটা শিল্প তাই হাতে কলমে শেখা হয় আর কী। কিন্তু মায়েরা বুঝিয়ে দেয় মেয়েকে যতই ডেটিং করো এই বয়সে মা হয়ো না। অবশ্য শুনছে কে? বেশিরভাগ ব্রিটিশ মেয়ে কাজটা ষোলো-সতেরোর মধ্যে চুকিয়ে বাকি জীবনটা ঝাড়া হাত-পা হয়ে থাকে।'

'বাচ্চাটাকে মানুষ করে কে?'

'ঠাকুমা। তা ছাড়া অনেক ক্রেশ আছে। একটু বয়স হলে বিয়ে থা করে নেয় মিলসই কোনও ছেলে পেলে। বাইশ বছর পর্যন্ত ভার্জিন আছে এমন মেয়ে বোধহয় বিজ্ঞাপন দিয়েও পাওয়া যায় না। পেলেও তার বর জুটবে না। তা এদের সঙ্গেই তো বড় হয়েছে মানি। ওর মানসিকতায় ইন্ডিয়ান ভাবনা নেই। গায়ের চামড়া দেখে যদি কেউ ওকে বিচার করতে চায় তো ভুল হবে। আমি মানিকে সাপোর্ট করতে গিয়েছিলাম বলে কত কথা শুনতে হয়েছে।'

হঠাৎ মাথায় প্রশ্নটা এল, 'আচ্ছা পাল, আপনার মেয়ে যদি এমন কাণ্ড করত তাহলে কি আপনি সাপোর্ট করতেন?'

পাল আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। এদেশের বাঙালিরা মেয়ে পনেরোয় পড়লেই ঘন-ঘন দেশে যায় পাত্র খুঁজতে। সেই মেয়ে যদি দেশে বিয়ের পর থাকে তাহলে ফিফটি পার্সেন্ট কেসে ডিভোর্স অনিবার্য। কারণ তার পনেরো বছরের জীবনে যেসব সংস্কার দ্যাখেনি তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে না। আর যারা এখানে পছন্দমতো বিয়ে করে তারা কিছুটা আরামে থাকে। লন্ডনে আমার এক আত্মীয় আছে। মেয়েটি টিভিতে অভিনয় করে। একা থাকে। বাঙালি। বাচ্চার মা হওয়ার বেশ কিছু পরে অন্য একটি ছেলেকে বিয়ে করেছে।'

'দেখুন, আপনি প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছেন!'

'দেখুন, যে মেয়ে বিয়ে থা না করে মা হয় সে জানে কী করে নিজেকে সামাল দিতে হবে। কাজটা করে ফেলে মা-বাবার কাছে এসে কান্নাকাটি করে বলে না বাঁচাও। একটি মেয়ের ব্যক্তিগত জীবনে তার মা-বাবার কোনও ভূমিকা নেই। ধরুন পাত্র পছন্দ করে বিয়ে দিলেন বাপ-মা। বিয়ের ছ'মাস পরে জানতে পারলেন ছেলেটি মেয়ের কোনও অভাব রাখেনি শুধু কোনওদিন তাকে স্পর্শ করেনি। অথচ ওর ব্যবহার, জীবনযাত্রা খুব ভালো। এক্ষেত্রে বাবা-মা কি ছেলেকে ডেকে উপদেশ দিতে পারেন আমাদের দেশে? তাই যে মুহূর্তে মেয়ে বিয়ের আগে অমন কাজ করে ফেলবে সেই মুহূর্তে আমার দায়িত্ব শেষ। আমার মেয়ে হলেও। আমি তাকে নিশ্চয়ই ইমোশনালি হেল্প করব কিন্তু তার বেশি নয়। তাকে কনডেম করে আমি নিজে তো কিছু লাভ করছি না।' পাল হাসল, 'এসব বলছি কারণ আমার নিজের কোনও মেয়ে নেই। এটা আপনি ভাবতে পারেন। তবে সময়ে যেদিকে বয়ে যাচ্ছে আমি তার বিপরীতে গেলে ক্ষতিটা আমারই। তাই না?' দুপাশের ফুটপাতে কোনও লোকজন নেই। কলকাতায় যদি ফুটপাত ধর্মঘট হয় তাহলে এইরকম চেহারা হবে। একটা বাঁক নিয়ে ঢালুর দিকে গড়াবার মুখে ব্রেক চাপল পাল, 'আবার রেস্টুরেন্ট। বাঁয়ে।' 'এখনও খোলা?' বাইরের দেওয়ালে দোতলা সমান সাইন বোর্ডে চোখ পড়ল। ভারতীয় খাবার খাওয়ার আমন্ত্রণ।

'হ্যাঁ। আজ ভোর চারটে পর্যন্ত খোলা। দিনেরবেলায় বন্ধ থাকে। রবি থেকে বৃহস্পতি একদিন বাদে সন্ধে সাতটা থেকে এগারোটা। শুক্র আর শনি ভোর পর্যন্ত। আমি আসব দশটা নাগাদ। চলুন

আগে বাড়ি যাই।' যেতে-যেতে পাল বাঁ-দিক ডানদিকে যা আছে তার বর্ণনা দিচ্ছিল, রেস্টুরেন্ট থেকে ওর বাড়ি বেশি দূর নয়। পেছনের গলিতে গাড়ি রেখে আমায় নিয়ে সামনের দরজায় এল সে। চাবি খুলে একটা সরু প্যাসেজ। ডান হাতে পড়ার ঘর তারপরই বসার ঘর। পাশ দিয়ে দোতালার সিঁড়ি চলে গেছে। সে আমাকে নিয়ে দোতলায় চলে এসে শোওয়ার ঘর দেখাল। বাথরুম চেনাল। তারপর জিজ্ঞাসা করল কিছু খাব কি না? ইচ্ছে ছিল না। পাল বলল, 'ফ্রেস হয়ে নীচে আসুন। আমি ডিনার তৈরি করছি।'

বাড়িতে আর লোকজন নেই। খুব আরাম লাগল।

বাথটবে শরীর মেঝে ঘষে জামাকাপড় পালটে নীচে এলাম। ওঠা নামার সময় কার্পেট থাকতেও সিঁড়িতে বেশ শব্দ হয়। বসার ঘরে ঢুকে দেখলাম পাল নেই টিভি চলছে। ওপাশের দরজা খোলা। সম্ভবত সেটাই কিচেন। পাল সেখানে মুখ বের করে বলল, 'আপনি আড় মাছ খান?'

'আড়?' হেসে বললাম, 'আমার কোনও কিছুতেই আড় নেই।'

'যাক। কলকাতার বাঙালিরা আড়, বোয়াল খায় না শুনেছি। আড় বানাচ্ছি, সঙ্গে ফুলকপি, ডাল ভাজা, আর ভাত। চলবে?'

'ফাস্টক্লাস।'

আমি টিভি-র দিকে তাকালাম। বিবিসি খবর বলছে। ইংল্যান্ডের সমস্ত হিপিরা একজায়গায় জড়ো হয়ে হাইওয়ে ধরে এগোচ্ছে কয়েকটা দাবি নিয়ে। ওদের থামাবার জন্যে পুলিশ তৎপর। সঙ্গে-সঙ্গে স্পটে চলে গেল ক্যামেরাম্যান।

॥ ৩ ॥

আমেরিকায় গিয়ে আমার মনে হয়েছিল হিপিদের দিন শেষ। আর কোনও ছেলে সংসারে বৈরাগ্য এলে হিপিদের দলে নাম লেখায় না কারণ সেই দলটাই আর নেই। আমেরিকায় এখন হিপিদের জায়গা নিয়েছে পাঙ্করা। তাদের শাখা দেখে এসেছি ডেনমার্কেও। কিন্তু বিবিসি-র সংবাদপাঠক বললেন প্রায় দু-হাজার হিপি ইংল্যান্ডের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে চলেছে মিছিল করে। শুধু বলা নয়, তাঁদের ক্যামেরাম্যান ঘটনাস্থল থেকে ছবি পাঠাতে আরম্ভ করলেন। গাড়ি ক্যারাভান সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে হাইওয়ের ওপর। পুলিশ তাদের পথ আটকেছে। চেহারা দেখেই লোকগুলোকে বাউন্ডুলে যাযাবর বলে মনে হয়। কোট ছেঁড়া, মাথায় কারও কারও বিবর্ণ টুপি। কারও হাতে গিটার। পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। বাচ্চাকাচ্চাও দেখছি আছে সঙ্গে। আর আছে প্ল্যাকার্ড তাতে পুলিশের বিরুদ্ধে নানারকম শ্লোগানে অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে জেহাদ জোরদার করতে। সংবাদপাঠক বলে যাচ্ছেন হাইওয়ে জুড়ে চলা এই মিছিল ট্র্যাফিকের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত করছে। আমাদের প্রতিনিধি হিপিদের নেতার সঙ্গে কথা বললেন। ক্যামেরা এবার একটি হুড খোলা জিপের ওপর চলে এল। সেখানে একজন প্রবীণ হিপি দাঁড়িয়ে কাউকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। বিবিসি-র প্রতিনিধি বললেন, 'হেই মিস্টার, আমাদের শ্রোতারা তোমাকে দেখছে। তুমি কি কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবে?' লোকটা রাগি গলায় বলল, 'ওদের মধ্যে কি কোনও মিনিস্টার আছে?'

'আছেন। তোমরা কেন এই মিছিল বের করেছ?'

'প্রতিবাদ করতে। আমরা হিপিরা খুব শান্ত। কিন্তু পুলিশ অকারণে আমাদের হয়রানি করছে। মিথ্যে কেস সাজিয়ে আমাদের জেলে পোরে। আমাদের অনেকেই বেকারভাতা পেত, কিন্তু ইদানীং সরকার আর মুঠো খুলছে না। এইসব বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে আমরা না খেয়ে মরব? পুলিশ আমাদের সঙ্গে যা ব্যবহার করে তা নাৎসিরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইহুদিদের সঙ্গে করত। আমরা পৃথিবীর

মানুষকে ব্যাপারটা জানাতে চাই।'

'এই যে এত গাড়ি ক্যারাভান, এগুলো আপনাদের?'

'বোকার মতো কথা বোলো না। অন্যের জিনিস হলে পুলিশ এতক্ষণ আমাদের বাইরে রাখত না। কিন্তু ওরা ভেবেছে কী। এর মধ্যে ওদের আদেশে আমরা তিনবার রুট বদলেছি। সোজা পথ ছেড়ে এত ঘুর পথে ওরা আমাদের যেতে বাধ্য করছে যে আমাদের তেল ফুরিয়ে যাবে, পকেটের টাকাও শেষ হয়ে যাবে। আর নয়, আমাদের সোজা পথে যেতে না দিলে এখানেই বসে থাকব।'

'এই মিছিল করে কী লাভ হচ্ছে আপনাদের?'

'আমরা মৃত মানুষ নই তাই প্রমাণিত হচ্ছে।'

এই সময় একজন হিপিনী কোলে বাচ্চা নিয়ে ছুটে এল জিপের সামনে। এক হাত আকাশে তুলে চিৎকার করে উঠল, 'আমার এই বাচ্চা আজ সারা দিন এক ফোঁটা দুধ পায়নি। ও যদি মরে যায় তাহলে ব্রিটিশ সরকার দায়ী থাকবে। ব্রিটেনের সব মা এই কথাটা জেনে রাখুন।'

ব্যাপারটা ভারতবর্ষের মতো গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হয়েও আমার কাছে নতুন। এই সরকারবিরোধী জেহাদ ঘটনাস্থল থেকে সরাসরি আমাদের দেখানো হচ্ছে। ভারতবর্ষের সরকারি আমলারা মন্ত্রীদের ভয়ে ব্যাপারটা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। দিল্লি টিভি যদিও বা মাঝে মাঝে সরকারিবিরোধী সমালোচনাকে জায়গা দেয়, কিন্তু 'তামসে'-এর মতো সিরিয়াল যদি বাংলাভাষায় তৈরি হত তাহলে কলকাতার কর্তারা তা টেলিকাস্ট করতে সাহস পেতেন না। এখানে কোনও রাজনৈতিক ঐতিহাসিক সত্য বলা নিষেধ, বর্তমানের কথা তো দূরে থাক। আজ অবধি কলকাতা টিভি দার্জিলিং-এর আন্দোলন নিয়ে একটা কথাও বলেনি যতদিন না ঘিসিং চুক্তিপত্রে সই করেছে। অ্যাদ্দিন কলকাতার টিভি দেখে মনেই হত না দার্জিলিং-এ কিছু ঘটছে। সরকার শাসিত দূরদর্শন বলেই মন্ত্রীরা যা ভাবেন আমলারা তার বহুগুণ করে থাকেন।

বিবিসি-র প্রতিনিধি এবার ঘটনাস্থলে দাঁড়ানো পুলিশের বড় কর্তার কাছে চলে গেলেন, 'স্যার, ওরা আপনাদের গালাগাল দিচ্ছে।'

'কিছু করার নেই। আমি ওদের এক ঘণ্টা সময় দিয়েছি। যদি তার মধ্যে রুট না পালটায় তাহলে অ্যারেস্ট করতে হবেই। পুলিশের কর্তা চিউংগাম চিবোচ্ছিলেন। 'কিন্তু আপনি কেন ওদের বারংবার রুট পালটাতে বলছেন।'

'আমি না। আদালত। ওরা যেসব গ্রামের সামনে দিয়ে যাবে ইতিমধ্যে আদালতে গিয়ে ইনজাংশন নিয়ে এসেছে সেইসব গ্রামের লোকজন যাদের হাইওয়ের পাশে জমিজমা আছে। আদালত বলে দিয়েছে তাদের জমিতে হিপিরা রাত কাটাতে পারবে না। এরা বাচ্চা নিয়ে সারারাত চলবে না। রাত কাটাতে জমিতে নামবেই। আর আদালতের হুকুম মানতে আমাকেই বাধা দিতে হবে সেই সময়। ওই অপ্রিয় ঘটনাটা ঘটুক তা আমি চাই না। সেইজন্যে ওই পথে যেতে দিচ্ছি না।'

'যে রুটে যেতে বলছেন, সেখানেও তো একই ঘটনা ঘটতে পারে।'

'না। এখন আদালত বন্ধ হয়ে গেছে। আর সবাই জানত এই রুটে ওরা যাবে না। তাই ইনজাংশন নেয়নি।' অফিসার চিউংগাম চিবানো থামালেন, 'আচ্ছা, বলুন তো, এভাবে আমাদের হয়রানি করে ব্যাটাদের কী লাভ হচ্ছে।'

এর পরেই এক গ্রামের খামার বাড়ির সামনে এল বিবিসি-র ক্যামেরা। খামারের বৃদ্ধ কর্তা চিন্তিত মুখে বলে, 'হ্যাঁ, আমি ইনজাংশান নিয়েছি। আমার জমিতে হিপিরা নামতে পারবে না। কেন নিয়েছি? আরে ওরা তো নোংরা জীব। এখানে রাত কাটালে সকালে জমিটার দিকে তাকাতে পারব না। তা ছাড়া ভোর বেলায় দেখব গ্রামের বউ কারও মেয়ে ওই হিপিদের দলে ঢুকে পড়েছে। সরকারকেও বলিহারি, আমাদের দেওয়া ট্যাক্সের টাকায় ওইসব নোংরা জীবকে পুষছে। উই মাস্ট প্রটেস্ট।'

শুধু সংবাদ নয়, ঘটনাস্থল থেকে সরাসরি তিন পক্ষের বক্তব্য প্রচার করার মানসিকতা

আমাদের দূরদর্শন কবে দেখাবে জানি না।

এই সময় পাল ঘরে এল। তার রান্না শেষ। টেবিল সাজিয়ে লজ্জিত মুখে বলল, 'আজ মেনুটা ভালো না। কাল আপনাকে ইলিশ মাছ খাওয়াব।' এই সময় টেলিফোন বাজল। পাল বলল, 'ধরেন তো।' বলে রান্নাঘরে চলে গেল।

রিসিভার তুলে হ্যালো বললাম। ওপাশ থেকে যা শুনলাম তার বিন্দু বিসর্গ বুঝলাম না। রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে চেঁচিয়ে পালকে ডাকলাম। সে দ্রুত চলে এল। মিনিটখানেক সে ওই ভাষায় কথা বলল। দু-একটা শব্দ অনুমানে বুঝতে পারছি। অবশ্য তাড়াতাড়ি বলার কারণে জটিলতা বেড়েছে। রিসিভার নামিয়ে রেখে পাল বলল, 'চিকেন কাবাব বাড়িয়ে দিয়ে চিলি ফিস কমাতে বললাম।'

'কাকে?'

'আমার রেস্টুরেন্টের চিফ কুককে। আপনি আমাদের কথা বুঝতে পারেননি, না? সিলেটি ভাষায় এই সুবিধা বাঙালিরাও বুঝতে পারে না।' পাল হাসেন। পিসিমার আদরে বড় হওয়ার সময় আমাকে কখনও রান্নাঘরে ঢুকতে হয়নি। পরিচিত অনেক পুরুষকেই দেখছি চমৎকার রান্নাবান্না করে থাকেন। তাঁদের স্ত্রীরা নিশ্চয়ই খুব খুশিতে থাকেন। সমর্থনে বলা যায় পৃথিবীর সব বিখ্যাত হোটেলের রাঁধুনিরা পুরুষ, রাজা নবাবদের ভালো রান্না করে দিত পুরুষরাই। এখনও বাবুর্চিরা আছেন। চালতার পিডব্লুডি বাংলোয় বাবুর্চির রান্না তো কোনওদিন ভুলতে পারব না। এমনকী আমাদের বন্ধু মদন গুহ তো পাঁচাশিতে যে মাংস রেঁধেছিল তার তুলনা নেই। কিন্তু আমার রান্না করাটা আজও হয়ে উঠল না। সবার তে: সব হয় না। একবার নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর ছেলে হাবুলদার কাছে লিখিতভাবে পেয়েছিলাম মোগল :ম্রাট হুমায়ুনের প্রিয় মাংসের পদটি কীভাবে তৈরি হত। বিকেল তিনটের সময় সেটি যখন উনুন থেকে নেমেছিল তখন আমরা ছাড়া কারোরই দ্বিতীয়বার ছুঁয়ে দেখার প্রবৃত্তি হয়নি। আমার এক বন্ধু এক কন্যাকে খুব ভালোবাসত। কন্যা আধুনিক, চাকুরিরতা, স্বাধীনচেতা এবং মমতাময়ী। সেই কন্যার ভালোবাসার প্রার্থী ছিল আর একজন পুরুষ। জিমন্যাস্টিকে যেমন বিভিন্ন প্রতিযোগীর লম্ফঝম্পের সাফল্যের ওপর পয়েন্টস কাউন্ট করা হয় কন্যা এভাবেই দুজনকে মনে-মনে পয়েন্টস দিতেন। আমার বন্ধুর দিকে পাল্লা বেশি ঝুঁকছিল। কন্যা একা থাকতেন। একদিন তিনি ঈষৎ জ্বরে আক্রান্ত হলেন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে সেই দিনই তার কাজের লোক হঠাৎ ডুব মেরেছিল। বন্ধু গিয়ে দেখলেন সকাল থেকে অসুস্থ কন্যার কিছু খাওয়া হয়নি। তিনি তক্ষুনি বাস ধরে ধর্মতলা চলে এলেন। তারপর বিভিন্ন দামি রেস্টুরেন্ট ঘুরে-ঘুরে জ্বরের মুখে যা-যা খেতে ভালো লাগে তা সংগ্রহ করে প্রফুল্ল মনে কন্যার বাড়িতে ফিরে গেলেন। গিয়ে আবিষ্কার করলেন কন্যার জ্বর বেশ কমে গিয়েছে। বন্ধুর আনা খাবার দেখে তিনিও অখুশি হলেন না, কিন্তু জানালেন যে সেই দ্বিতীয় পুরুষটি এসেছিল এবং তাঁর অবস্থা দেখে চটপট সুস্বাদু কিছু খাবার তৈরি করে তাঁকে খাইয়ে দিয়ে চলে গেছে। এবং এই একটি ঘটনায় চ্যাম্পিয়নশিপ হাতছাড়া হয়ে গেল বন্ধুর। মেয়েরা সেবা করতেই ভালোবাসে, সেবা নিতে নয়, এই ফরমুলা শরৎচন্দ্র শিখিয়েছিলেন। কিন্তু মেয়েরা যখন মানুষ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর তখন ফরমুলা অচল হবেই। তবে ওই যা বলেছি, কারও-কারও আর সব করা হয়ে ওঠে না।

পালের হাতের রান্নাটি চমৎকার। বিলেতের এক আধা শহরে রাত্রির বেলায় ধনেপাতা লাউ ইত্যাদি পরিবেশিত হচ্ছে এটা আরও ভালো। খাওয়া দাওয়ার পর পাল ফল নিয়ে এল। এ জীবনে খাওয়ার পর ফলের অভ্যাস হয়নি তখন সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলাম। পাল বলল, 'যদি আপনার ঘুম পায় তাহলে শুয়ে পড়ুন আর তা না হলে আমার সঙ্গে বেরোতে পারেন।'

খাওয়াদাওয়ার পর এক ধরনের আরাম ছড়ায় শরীরে। বললাম, 'আপনার রেস্টুরেন্ট তো দেখে এসেছি। একটু পরে ঠিক পৌঁছে যাব।'

একদম সাহেবি বাড়িগুলোতে একটা মিষ্টি গন্ধ সবসময় ঝোলে। আমি চারপাশে তাকিয়ে

কোনও বইপত্তর পেলাম না। একবার মনে হল শুয়ে পড়লে কেমন হয়। কিন্তু পায়ের তলায় যার সরষে সে এই রাত্রে ঘুমাবে এমন তো হওয়ার কথা নয়। সেজেগুজে ঘড়িতে সময় দেখলাম, সাড়ে এগারোটা। যাওয়ার আগে সদরের ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে গেছে পাল।

এইরকম ছিমছাম শীতের রাতে ইংল্যান্ডের একটি বাড়িতে আমি একা। আমার কাছে পিঠে পরিচিত মানুষের মুখ নেই, আত্মীয়, বন্ধু অথবা বন্ধুর মুখোশধারীদের নিশ্বাস পড়ছে না পিঠে। হঠাৎ মনে হল যেসব মানুষ অনেক ভাবে তাদের বড় কষ্ট যারা তাৎক্ষণিক ব্যাপার নিয়েই মগ্ন থাকে তারা বরং ভালো আছে। সকালবেলায় বাজার, দুপুরে অফিস, সন্ধ্যায় ছেলেমেয়ের পড়াশোনা আর রাত্রে ঘুমের বাইরে যাদের জীবন নেই তারা সুখী। কিন্তু যাদের মনে হয় এইভাবে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না, এই একই কাজ করতে করতে বড় হওয়া এবং বুড়িয়ে যাওয়া, একঘেয়েমিতে যারা আক্রান্ত হন তাদের মতো দুঃখী জীবদের নিয়েই গোলমাল। একজনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'পঞ্চাশ বছর পৃথিবীতে রয়েছেন, এমনকী নতুন কিছু করে গেলেন যা আপনার পিতা করেনি?' সে কিছু উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে ঘেমে গিয়েছিল। অনেক সময় ইচ্ছে হয় কলকাতার কোনও মধ্যবয়সি মানুষকে তুলে নিয়ে ফিনল্যান্ডের একটি শহরে বসিয়ে দিয়ে বলি, 'ভুলে যান আপনার নাম হরিদাস পাল, স্টেট ব্যাংকের কলকাতা শাখার কেরানি, রোজ সকালে কলেজ স্ট্রিটে বাজার করেন, অফিসে যান আর বাড়ি ফেরেন। মনে করুন এখন আপনি টম ডিক বা হ্যারি, আপনার পেছনে কেউ নেই, সামনে বাকি জীবন পড়ে আছে। ফিনল্যান্ডের এই নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিন।' প্রস্তাব শুনে কেউ-কেউ বলেছেন, 'যেহেতু লোকটা বাঙালি তাই শেকড় কাটার দুঃখেই মরে যাবে, কারণ নতুন শেকড় গজাবার ক্ষমতা তার নেই। তবে ইংল্যান্ড কিংবা আমেরিকায় পাঠাবেন না। এখানে ভারতবর্ষ পেয়ে গিয়ে টাকা পয়সার ব্যবস্থা করে দেশ থেকে শেকড়বাকড় তুলে আনবে চটপট।' বস্তুত আমেরিকা যতটা নয় ইংল্যান্ড এখন অনেক বেশি এই সমস্যায় ভুগছে। আগে ওরা এয়ারপোর্টে এশিয়ানদের কাছে ভিসা দেখতে চাইত না, এখন আগে ওটা যাচাই করে জেনে নেয় ক'দিনের মধ্যে দেশে ফিরে যাওয়া হবে। ইংল্যান্ডে একজন আধা শিক্ষিত ভারতীয় পৌঁছে গেলে তার বিদেশ বলে মনে হয় না। ভাষার সমস্যা নেই, খাওয়ার-দাওয়ার সব পাওয়া যায়। শুনেছি লন্ডনের টেলিফোন ডাইরেক্টরির বেশ কয়েকটা পাতা প্যাটেলরা দখল করে রেখেছে। লন্ডনের রাস্তায় নাকি পাঁচজনকে ধরলে একজন ভারতীয় পাওয়া যাবে। ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়ে যেসব ব্রিটিশ দেশে ফিরে গিয়েছিল তারা এখন হাঁপিয়ে উঠছে চারপাশে ভারতীয় দেখে। লন্ডনের কর্পোরেশন ইলেকশনে ভারতীয়রা জিতেছে। ওদের সন্দেহ গোপনে এইভাবে ভারতীয়রা ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর পদটার জন্যে এগোচ্ছে। সেক্ষেত্রে কলকাতা থেকে কানপুরে বদলি হওয়ার সঙ্গে লন্ডনে আসার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

টেলিফোন বাজল। রিসিভার তুলতেই মেয়েলি গলা পেলাম, 'পাল, তুমি এখনও বাড়িতে? ভালো হল। আমার এক বান্ধবী এসেছে অ্যাবসন থেকে। ওকে ইন্ডিয়ান ফুড খাওয়াব ভাবছি। তুমি কী বলো?'

জড়ানো ইংরেজির সবকটি শব্দের মর্ম বুঝতে পেরেছি বলেই তো মনে হল অতএব আমার ভারতীয় গলা জানতে চাইল, 'আপনি কে বলছেন?' 'মাই গড। এটা কি পালের টেলিফোন নয়?' ওপাশে বিস্ময়।

'একশোবার পালের টেলিফোন। কিন্তু সে এখন নেই। আপনি যদি নামটা দয়া করে বলেন তাহলে জানিয়ে দিতে পারি।'

'ও কোথায় গিয়েছে?'

'রেস্টুরেন্টে।'

'আমি ভাবিনি ও এত তাড়াতাড়ি কাজে বের হবে। বাই।' টেলিফোন রেখে দিলেন মহিলা।

সম্ভবত অচেনা মানুষকে নিজের পরিচয় দিতে চাইলেন না।

পাল খেতে বসে বলেছিল বড্ড চুরিচামারি হয় এখানে। সাদারাই বেশি চুরি করে। টাকা-পয়সা যদি সঙ্গে নিয়ে বেরোতে না চাই তাহলে শোওয়ার ঘরে কার্পেটের তলায় রেখে যেতে পারি। সাহেব চোরের নজর অত নীচে সাধারণত নামে না। এ বাড়িতে এর আগে কয়েকবার চুরির চেষ্টা হয়েছে।

কার্পেট সরিয়ে তার তলায় পাউন্ড এবং ট্রাভেলার্স চেকের বইটা রাখতে গিয়ে মনে হল সিঁড়িতে কার পায়ের আওয়াজ হল। অথচ আমি নীচে বাইরের দরজাটা লক তুলে দিয়ে এসেছি। আওয়াজটা একবার হয়েই থেমে গেছে। তাহলে কি জঙ্গলের পথে সাপ-সাপ ভাবতেই সাপ চলে এল। জীবনে কখনও চোরের মুখোমুখি হইনি। পুলওভার শরীরে থাকা সত্ত্বেও কেমন শীত-শীত করতে লাগল। কার্পেটটা নিঃশব্দে টান-টান করে তার ওপরে দাঁড়ালাম। এইরকম টাকার ওপরে দাঁড়িয়ে থাকার অভিজ্ঞতাও এই প্রথম। কান খাড়া করে আছি অথচ আর কোনও শব্দ হচ্ছে না। চোর কি নিঃশব্দে ওপরে উঠে আসছে? নাকি টিভির ঘরে ঢুকেছে? যে দেশে সেকেন্ড হ্যান্ড টিভি বিক্রি হয় না সে দেশের চোরেরা টিভি চুরি করবে কেন?

যতটা সম্ভব শব্দ না তুলে নীচে নামতে চাইলাম। কিন্তু এ বাড়ির সিঁড়ি এমনভাবে তৈরি যে পা রাখলেই সারা বাড়িতে ঝনঝনানি ওঠে। মনে হয় চোর যদি ঢুকেও থাকে সে ওই শব্দে সতর্ক হয়ে পালিয়েছে। ঘুরে-ঘুরে দেখেছিলাম সবক'টা জানলা দরজা বন্ধ। কারও পক্ষে ভেতরে কিছু না ভেঙে আসা সম্ভব নয়। হঠাৎ মনে হল ওপরে যে ঘরটায় আমি এতক্ষণ ছিলাম সেখানে কেউ হাঁটছে। চোর চিন্তা ছাপিয়ে যিনি মাথায় এলেন তাঁর সঙ্গে এক বাড়িতে একা থাকা প্রথম রাতেই আমার পক্ষে অসম্ভব।

বাইরে বেরিয়ে মনে হল দৌড়োতে পারলে ভালো হয়। ঠান্ডা যেন অক্টোপাশের মতো আঁকড়ে ধরেছে আমাকে। পুলওভারের ওপর জ্যাকেট ছিল বলে রক্ষা। প্যান্টের তলায় আজ ড্রয়ার পরিনি। বোকামি করেছি কিন্তু বাড়িতে ফিরে সেই চেষ্টা করার ইচ্ছা নেই তা ঠান্ডা যত তীব্র হোক না কেন! রাস্তা নির্জন। দোকানপাট বন্ধ। যে রাস্তা দিয়ে পালের সঙ্গে গাড়িতে এসেছিলাম সেটাকে মনে রেখে এগোতে লাগলাম। ঠান্ডা় কি না জানি না, রাস্তায় আলোগুলোকে হলদে দেখাচ্ছে। পেট্রল পাম্প পর্যন্ত একটি মানুষকেও দেখতে পেলাম না। বারংবার দেখে নিচ্ছি কোন পথ দিয়ে এগোচ্ছি। যদি পালের রেস্টুরেন্টে না পৌঁছোতে পারি! পথ হারিয়ে ফেললে আর দেখতে হবে না! বারংবার দেখে নিচ্ছি কোন পথ দিয়ে এগোচ্ছি।

এবার হুসহাস গাড়ি যাচ্ছে। তে-মাথার মোড় এটা। পালের গাড়ি কোন দিক দিয়ে বাঁক নিয়েছিল ভাবার চেষ্টা করলাম দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে। একটু এগোতেই নিওন সাইন দেখতে পেলাম। রনি'স পাব, বার্ডল্যান্ড, চার্লিস ক্যাসিনো, ডিসকো ক্লাব। এইগুলো হয় রেস্টুরেন্ট নয় মদ বিক্রির জায়গা। রাস্তাটায় উঠে আসতেই দেখলাম জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়েরা এক-একটা দোকানে ঢুকে যাচ্ছে। এই সময় একটা তীব্র সিটি শুনলাম সেইসঙ্গে হেঁড়ে গলায় গান। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওদের দেখলাম। গোটাতিনেক নিগ্রো ছেলে আর দুটি সাদা মেয়ে। পরস্পরের কোমর জড়িয়ে ধরে ফুটপাত জুড়ে হাঁটছে চিৎকার করতে-করতে। ভালো করে দেখে বুঝলাম এরা পাঙ্ক কিংবা হিপি নয়। নিছক মজা করার জনাই এইরকম চিৎকার চেঁচামেচি। একটা ট্রাফিক সিগন্যালের স্ট্যান্ডকে নিগ্রো ছেলেটি এমনভাবে লাথি মারল যে সেটা মুখ থুবড়ে পড়ল। সঙ্গিনী চিৎকার করল হেসে উঠে, 'হেই, সামওয়ান ইজ স্ট্যান্ডিং দেয়ার।' ছেলেটি ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে, 'হু ইজ হি? পিটার? হে পিটার, হোয়াট আর ইউ ডুয়িং হিয়ার? ওয়েটিং ফর দ্যা কপস্?'

প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা ছেলেটি আমার সামনে এসে আঙুল নাড়ল। আমি জানি একটু প্রভোকেশন পেলেই ছেলেটি মারপিট শুরু করে দিতে পারে। হেসে বললাম, 'লুকিং ফর সামওয়ান হু ক্যান গিভ মি কোম্পানি।'

ছেলেটা গলার ভেতর থেকে 'অ্যাঁ' জাতীয় একটা শব্দ বের করে মুখ ফেরাল। 'হেই গার্লি, হি ইজ এলোন।' তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, 'ওয়েল, উই কান্ট হেল্প ইউ জেন্টলম্যান। উই আর বিজি।' ওরা রাস্তা পেরিয়ে ওপাশে চলে গেল। এর মধ্যে লক্ষ করেছিলাম ছেলেগুলোর পরনে জিনসের প্যান্ট আর জিনসেরই জ্যাকেট। মেয়ে দুটোই প্যান্টের ওপর রঙিন গেঞ্জি পরেছে। এই শীতে আমি যখন কুঁকড়ে যাচ্ছি তখন ওরা ওই পোশাকেই বেপরোয়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইসব দেখলে-টেখলে মনে হয় আমাদের বয়সটা সত্যি বাড়ছে।

পালের রেস্টরেন্টের নীচে এসে দাঁড়ালাম। রাস্তা থেকে সিঁড়ি সোজা ওপরে চলে গিয়েছে। সিঁড়ির মুখে নিওন সাইন জ্বলছে নিভছে। মাঝপাথে অবধি উঠেছি সঙ্গে-সঙ্গে ওপরের দরজা খুলে গেল। একজন স্বাস্থ্যবান ইংরেজ আমাকে আপ্যায়ন করল, 'হেলো। কাম ইন প্লিজ।'

লোকটার নাম বিগ জন। পরে জেনেছি ওর কাজ হল সিঁড়িতে কারও পায়ের আওয়াজ হলে দরজা খুলে আপ্যায়ন করা। এদের বলা হয় ডোরম্যান। সাদা বাংলায় যাদের দারোয়ান বলা হয় তাদের সঙ্গে এদের একটা পার্থক্য আছে। যেসব ছেলে বেশিদূর পড়াশোনা করতে পরে না অথচ শরীরচর্চায় মন দেয় তাদের একটা ক্লাব আছে। সেই ক্লাবের শরীরচর্চার সঙ্গে সহবৎ শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। প্রতিটি রেস্টুরেন্টে, ক্লাবে, পাবে এদের চাকরি দেওয়া হয়। এঁরা যেমন দরজা খুলে খদ্দেরকে আপ্যায়ন করে তেমনি শান্তিরক্ষা করে। ডোর ম্যান ক্লাব এদের পেছনে আছে। কোনও ডোরম্যান যদি শান্তিরক্ষার সময় বিপাকে পড়ে, তাহলে পলকেই ক্লাব থেকে সাহায্য এসে পড়ে। যেহেতু এরা আইন ভাঙে না তাই পুলিশ সবসময় এদের সঙ্গে সহযোগিতা করে। খদ্দেররা সাধারণত এদের ঘাঁটায় না। বরং এদের ব্যবহারে মেয়েরা খুব খুশি হয়।

বিগ জন দরজাটা খুলে ধরে রেখেছিল, আমি ভেতের পা দিলাম। ডান দিকে বিশাল ফ্লোরে টেবিল পাতা। সাদা ধবধবে টেবিল চাদর, প্রতিটিতে কাচের পাত্রে মোমবাতি জ্বলছে। সুবেশ খাদ্য সরবরাহকারীরা ব্যস্ত এখন। প্রায় সব টেবিলই ভরতি। আর অত্যন্ত মৃদু স্বরে ভেসে আসছে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান, 'এ শুধু গানের দিন এ লগন গান শোনাবার।' বিগ জন বলল, 'পল বলেছিল তার এক গেস্ট এসেছে, আপনিই কি তিনি?' মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতেই বিগ জন একগাল হেসে হাত বাড়িয়ে দিল, 'দিস ইজ জন, বিগ জন, ডোর ম্যান হিয়ার।' লোকটাকে ভালো লাগল। নিজের নাম বললাম। দু-তিনবার চেষ্টা করার পর হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'তোমাকে যদি সাম বলে ডাকি তাহলে কি খুব আপত্তি করবে?' 'মোটেই না।'

'তাহলে এখানে এই সোফায় বসো। দুটো কথা বলি। আমার ডিউটি তো এই দরজায়। এখান থেকে নড়তে পারব না। ভদকা উইদ টনিক চলবে? ওটাই আমার ড্রিংক। সানি, হেই সানি, দুটো ভদকা উইদ টনিক।' যে তরুণটিকে ডেকে বিগ জন হুকুম দিল তাকে লক্ষ করতে গিয়ে পালকে দেখলাম। কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে আমার দিকে হাত নাড়ল কাজ করতে-করতে। বিগ জনের পাশে বসলাম। সামনেই ছিল একটা পাবলিক টেলিফোন। রান্না হয় নীচে। ওপরে স্টোর। দোতলা থেকে ইন্টারকামে খাবারের অর্ডার পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে নীচে। খাবার তৈরি হলেই একটা বেল বাজে। কপিকলে বাঁধা ট্রেতে চেপে খাবার উঠে আসে ওপরে। ওয়েটারটা সেটা তুলে নিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করছে। এখানে একমাত্র ভারতীয় মোগলাই খাবার পরিবেশিত হয় বলে মনে হচ্ছে। তবে চিলি ফিস কতটা মোগলাই তা আমার জানা নেই। টুকটুকে ফরসা একটি তরুণ ট্রেতে করে দুটো গ্লাস নিয়ে এসে আমায় বলল, 'হ্যালো।' বিগ জন বলল, 'এই হল সানি। খুব ভালো ছেলে। কিন্তু মুশকিল হল ওর চেয়ে চার বছরের বড়, একটা মেয়ে ওকে বিয়ে না করে ছাড়বে না বলছে।'

সানির মুখে রক্ত জমল, 'হ্যাট, এসব কথা বলবে না। আমি বিয়ে করবই না। তুমি পলের বন্ধু? ইন্ডিয়া থেকে এসেছ?'

'ঠিক তাই।'

'তুমি সানি গাভাসকারের খেলা দেখেছ?'

'নিশ্চয়ই।'

'হি ইজ এ গ্রেট প্লেয়ার। না কি?'

'অবশ্যই।'

'আমি ওর ফ্যান। তাই নিজের নাম সানি রেখেছি।' বলতে না বলতেই সিঁড়িতে শব্দ হল। বিগ জন চটপট উঠে দরজা খুলে আপ্যায়ন করল। বিশালদেহী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সোনালী চুলের সুন্দরী ললনা ভেতরে ঢুকলেন। 'হাই জন, হাই সানি।' দুজনের দিকে দুবার হাত বাড়িয়ে দিলেন। বিগ জন এবং সানি সেই বাড়ানো হাতের আঙুল চুম্বন করল; বিগ জন মহিলার ওভারকোট খুলে হুঁকে ঝুলিয়ে দিল। বিশালদেহী বললেন, 'আমার টেবিলে লোক বসিয়েছ কেন সানি? দিস ইজ ব্যাড। হোয়ার ইজ পল?' সানি চটপট জবাব দিল, 'আপনারা আজ একটু আগে এসে পড়েছেন স্যার। পল কাউন্টারে আছে।' বিশালদেহী সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আগে এসেছি আমরা?' সুন্দরী হাসলেন, 'তা ছাড়া রোজ এক টেবিলে বসতে আমার ভাল্লাগে না।' বিশালদেহী বললেন, 'ইন্সপায়ার্ড হলাম। আমি তো ভেবেছিলাম, ওই টেবিলে না বসতে পারলে তুমি রেগে যাবে। টেবিল চেঞ্জ করো কিন্তু ডোন্ট চেঞ্জ ইওর ম্যান।'

মহিলা হেসে বিশালদেহীর বাহু জড়িয়ে সানির প্রদর্শিত পথে এগিয়ে এলেন। বিগ জন গ্লাসে চুমুক দিয়ে আবার আমার পাশে বসল, 'হি ইজ এ ব্যাংকার। খুব দিলদরিয়া মানুষ। প্রত্যেক সপ্তাহে দুদিন খেতে আসেন। বিল মেটানোর পর কখনও চেঞ্জ ফেরত নেন না। গুড ফ্রেন্ড অফ পল।'

'ওঁর স্ত্রীও বেশ মিষ্টি।'

'আরে না না, লিজা ওঁর স্ত্রী নয়। লিজার স্বামী লন্ডনে থাকে।'

এই দুদিন ওরা একসঙ্গে ডিনার খায়, রাত্রে থাকে। ব্যাস।'

এত সহজ গলায় বিগ জন কথাটা বলল যে আমার বিষম লাগার উপক্রম। হঠাৎ রেস্টুরেন্টের ভেতরের কোনও টেবিল থেকে চিৎকার ভেসে এল। কেউ খুব রেগে গিয়েছে। বিগ জন গ্লাস রেখে দিয়ে ব্যস্তভাবে এগিয়ে এল সেদিকে। এবং তখনই চিৎকার থেমে গেল। ফিরে এসে গ্লাস হাতে নিয়ে বিগ জন বলল, 'বুঝলে, কেউ-কেউ চমৎকার কথা শোনে। বউ খেতে চাইছে স্বামী নিষেধ করছে এই নিয়ে চিৎকার। গিয়ে বললাম, 'আপনি ভদ্রলোক এটা ভুলে যাবেন না।' সঙ্গে-সঙ্গে শান্ত হয়ে গেল।'

'আপনাকে নিশ্চয়ই খুব খারাপ পরিস্থিতি ফেস করতে হয়েছে এর আগে?'

'আগে?'

'হ্যাঁ, অনেকবার। দাঁড়াও, ডাক্তার আসছে। খুব নাক উঁচু খদ্দের। খিটকেল বুড়ো। গ্লাস রেখে দিয়ে দরজা খুলে হাসি মুখে আপ্যায়ন করল বিগ জন। শুঁটকো চেহারার এক বৃদ্ধ, আপাদমস্তক মুড়ে ভেতরে ঢুকল। বিগ জন ওঁকে ওভারকোট খুলতে সাহায্য করল।

বৃদ্ধ চারপাশে নজর বুলিয়ে বললেন, 'আজ দেখছি বেজায় ভিড়। আর একটা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট খুলেছে শহরে, কিন্তু সেখানে মাছি তাড়াচ্ছে। হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে পালের খাবার নিয়মিত পরীক্ষা করছে তো? কিছু মিশিয়ে খদ্দের টানছে কি না কে জানে? বিগ জন বলল, 'আপনি নিজে ডাক্তার, আপনাকে ফাঁকি দেওয়া কি সম্ভব?' উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন টেবিলে বসব! না-না, অন্যের সঙ্গে টেবিল শেয়ার করতে পারব না আমি। তুমি নিশ্চয়ই জানো আমি জীবনটাকেই কারও সঙ্গে শেয়ার করিনি। একদম স্টিল ব্যাচেলার আমি।'

বিগ জন ওঁকে একটা খালি টেবিলে বসিয়ে দিতেই রেস্টুরেন্টে আর জায়গা রইল না। ফিরে এসে বিগ জন বিপদে পড়ল। যে আসছে তাকেই অনুরোধ করতে হচ্ছে সোফায় বসে কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে। বুঝলাম এখন আর আমাদের গল্প জমবে না। সোফা ছেড়ে উঠে এলাম কাউন্টারের

দিকে। পাল বলল, 'ভেতরে চলে আসুন।' সরু প্যাসেজ দিয়ে কাউন্টারে চলে আসতে মদের বোতল দেখতে পেলাম। নানান চেহারা বোতল আর হরেকরকম নাম। পাল সেটা লক্ষ করে বলল, 'এগুলো সবই স্কচ। সাতানব্বুইরকমের মদ আছে আমার কাছে। প্রত্যেকটা টেস্ট করে দেখুন।'

'একদিনে সাতানব্বুই?'

'আহা, যে ক'দিন আছেন এই ক'দিনে। আজ বিজনেস খুব ভালো। বিগ জনের গল্প শুনলেন? খুব ভালো লোক। এসব কথা বলছে ক্যাশমেমো কাটতে-কাটতে অথবা পাউন্ডে নোট গুনতে-গুনতে, আপনার নিশ্চয়ই খুব একঘেয়ে লাগছে। মোটেই না। ওহো, আপনার একটা ফোন এসেছিল। ভদ্রমহিলা তার বান্ধবীকে নিয়ে খেতে আসবেন কিন্তু নাম বলবে না।

পাল কাঁধ নাচাল কিন্তু ব্যাপারটা মাথায় নিল না বলে মনে হল।

এবার পালের ডাক এল যে টেবিল থেকে সেই টেবিলেই বিশালদেহী ব্যাংকার বসে আছেন। এই প্রথম ওকে আমি কাউন্টার ছেড়ে যেতে দেখলাম। লক্ষ করেছি প্রতিটি কর্মচারী খেটে যাচ্ছে হাসি মুখে। চারজন ওয়েটারের মধ্যে দুজন ভারতীয়। কথা বলে বুঝলাম ভুল আমার, ওরা বাংলাদেশি। একজন ওয়েটার এসে আমাকে জানাল পল ডাকছে।

ব্যাংকারের টেবিলে পৌঁছোনোমাত্র তিনি চওড়া পাঞ্জা বাড়িয়ে হাত মেলালেন, 'ইউ আর পল'স গেস্ট, সুতরাং এই শহরের গেস্ট। আপনি তাজমহল দেখেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমি সামনের শীতে তাজমহল দেখতে যাব। মমতাজ বেগম খুব সুন্দরী ছিলেন?'

'আমি দেখিনি। ছবিতে সব মেয়েকেই সুন্দরী লাগে।'

ভদ্রলোক হোহো করে হেসে উঠলেন, 'শাবাশ। আচ্ছা, এই ভদ্রমহিলা তো আপনার সামনে জ্যান্ত বসে আছেন, এঁকে আপনার কী মনে হয়? সুন্দরী?'

॥ ৪ ॥

এইরকম প্রশ্নের সামনে কি আমি কখনও পড়েছি? ভদ্রমহিলা প্রায় সুচিত্রা সেনের হাসি এঁকে রেখেছেন ঠোঁটে। চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে আলতো করে হাসলেন, 'কই জবাব দিন! ও আমাকে বলছে তাজমহল দেখতে যাব। সেটা নাকি আমার চেয়ে সুন্দরী এক মহিলার সমাধি। তাই?' 'আমি তো বললাম, মমতাজ বেগম কয়েকশো বছর আগে জন্মেছিলেন, তাঁকে দেখবার কোনও সুযোগ আমার পাওয়ার কথা নয়। সে সময় ফটোগ্রাফি ছিল না। রাজা বাদশার বেগমদের ছবি যেসব শিল্পী আঁকতেন তাঁদের প্রাণের দায়ে সুন্দরী করে তুলতে হত। অতএব তুলনা আসে কী করে?' এই অবধি বলে হাঁফ ছাড়লাম। এরকম ফ্যাসাদে কখনও পড়িনি। আর মানুষও যেমন, ইংল্যান্ডের একটা আধাশহরে মাঝরাতে মৃত বেগমের সঙ্গে রূপের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জ্যান্ত মানুষ ছাড়া আর কেই বা নামে? সুন্দরী ব্রান্ডিমেরির গ্লাস তুলে আলতো চুমুক দিলেন, 'তুলনা করতে হবে না। আমি শুনেছি ভারতবর্ষের মেয়েরা খুব সুন্দরী। মিসেস ইন্দিরা গান্ধিকে দেখেই তো বোঝা যায় কথাটা খুব সত্যি। আমি কি তাদের শ্রেণিতেও পড়ি না?'

বিশালদেহী ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। তিনি খুব মজা পাচ্ছেন। পাল কারি অন গোছের কিছু বলে ফিরে গেল তার কাজে। হঠাৎ ভদ্রলোক আমার দিকে ঝুঁকে পড়লেন, 'আমরা যখন এখানে এলাম তখন আপনি দরজার সামনে সোফায় বসেছিলেন। ওঁকে নিয়ে যখনই আমি কোথাও যাই তখনই লক্ষ করি আশপাশের মানুষের প্রতিক্রিয়া কী! বিগ জন আর সানি যখন ওঁর আঙুলে চুমু

খেল তখন ওঁকে মনে মনে স্তুতি করল। কিন্তু আপনার চোখেমুখে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখতে পাইনি। হয়তো আপনি বড় অভিনেতা তাই বুঝতে পারিনি এখন বলুন, ঈশ্বর যদি আপনাকে এক রাত্রের জন্যে কোনও সঙ্গিনীকে নির্বাচন করতে বলেন তাহলে আপনি কি লিজাকে নির্বাচন করবেন?' লিজা হেসে উঠলেন খিলখিলিয়ে, 'বা, খুব মজার ব্যাপার হবে।'

মাথা নেড়ে বললাম, 'ওটা যদি আমার জীবনের শেষ রাত হয় তাহলে আমি একা থাকতে চাইব। কারণ মেয়েরা আমার সব কিছু গোলমাল করে দেয়।'

লিজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'যেমন?'

বললাম, 'ধরুন একটি মেয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হল। আমার অনেক স্বপ্নের কথা বলাবলি করলাম। তার হয়তো সিগারেট পছন্দ হয় না, আমি ওটা ছাড়া থাকতে পারি না। সে হয়তো লেট নাইট করতে ভালোবাসে আমি চাই না। কিন্তু দুজনকে না দেখে থাকতে পারছি না। একটা সময় শেষ পর্যন্ত এল যখন আমরা একত্রিত হতে পারছি। আর সেই সময় মেয়েটি বলল, সে খুব খুশি হবে যদি একা থাকতে পারে। কারণ সে বুঝতে পারছে জীবন সম্পর্কে যে ভাবনা সে ভাবে তার সঙ্গে আমার কোনও মিল নেই

দুম করে আণবিক বোমা ফাটল আমার সামনে। আমি খুব দুঃখিত হয়েছি দেখে সে হাত নেড়ে বলল, 'মুশকিল হল তোমার সঙ্গে কোনও যুক্তিসঙ্গত আলোচনা করা যায় না। এই মেয়েটি কিন্তু আমাকে ডিচ করে অন্য পুরুষকে কামনা করছে না। অতএব শেষ রাত হলে আমি একা থাকতে চাই। ঈশ্বরের অনুমতি নিয়ে যদি আপনাকে নির্বাচন করি তাহলে ভোরবেলায় হয়তো শুনব ওই ভদ্রলোকের নানারকম গুণের প্রশংসা করছেন। কী দরকার।'

'ভোরবেলা? সেটা তো রাত ফুরিয়ে যাওয়ার সময়।' ভদ্রলোক বললেন। 'ভরপেট আরাম করে খাওয়ার পর যদি শোনেন খাবারে নোংরা ছিল তাহলে কি কারও বমি হয়ে যায় না?' আমি হাসলাম।

সঙ্গে-সঙ্গে ভদ্রলোক আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন, 'চমৎকার বলেছেন। এসব আলোচনা আমরা করছিলাম কেন না আমাদের একটা সমস্যা হয়েছে। অনেকদিন থেকেই আমার ইচ্ছে আগ্রা শহরে গিয়ে তাজমহল দেখার। এবার সেটা পূর্ণ করব ঠিক করতেই লিজা চটে লাল হয়ে গেছে। সে কিছুতেই আমাকে তাজমহল দেখতে যেতে দেবে না।'

লিজা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আমি ভদ্রলোকের কাছে কারণ জানতে চাইলাম।

'লিজার ধারণা ইন্ডিয়াতে প্রচুর সুন্দরী মহিলারা ঘুরে বেড়ান। তাঁরা ম্যাজিক জানেন। আমার মতো সুপুরুষ সেখানে গেলে তাঁরা ম্যাজিক প্রয়োগ করবেনই এবং আমি আর ফিরব না।'

'এরকম উদ্ভট ধারণা হল কেন?'

'একটা বই পড়ে। তা ছাড়া ওর এক আত্মীয় ইন্ডিয়ায় গিয়ে ইন্ডিয়ান বিয়ে করেছে।'

'ওকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন না কেন?'

'কী করে যাবে? ওর স্বামী সেটা মেনে নেবে না।'

হোঁচট খেলাম। সম্পর্কের এতটা অগ্রগতি যদি স্বামী দেবতাটি মেনে নিতে পারেন তাহলে দেশের বাইরে যেতে আর আপত্তি কেন? বললাম, 'লিজা আপনি ভুল ভেবেছেন। ভারতবর্ষের মেয়েরা সত্যি সুন্দরী। তবে তাদের সৌন্দর্য ভেতর থেকে তৈরি হয়ে বাইরে আসে। তাই যে সেটা দেখতে পায় সেই একমাত্র খুশি হয়। কিন্তু এদেশের মেয়েরা কাউকে প্রলুব্ধ করে না সচরাচর। কারণ তাদের মধ্যে সংস্কার তীব্রভাবে কাজ করে। তারা নিজেরা কখনই সক্রিয় হয় না। অতএব ইনি যদি উদ্যোগী না হন তাহলে আপনার ভয়ের কোনও কারণ নেই। হাজার হোক তাজমহলকে তো আপনারা লন্ডনে আনতে পারেননি।' শেষের খোঁচাটা লিজা ধরতে পারল না। মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'উদ্যোগ আবার নেবে না। পুরুষজাতটার স্বভাবই তো তাই। আগ্নেয়গিরির মুখে ধোঁয়া না দেখলে কেউ সেটাকে

মৃত ভেবে ঘর তুলতে পারে, কিন্তু আমি পারব না।'

মণিমাসির কথা মনে পড়ল। লিজা এখন অবিকল মণিমাসি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষের দিকে থাকার জায়গার অভাবে আমি কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরের কাছে আড়িয়াদহে দুটি ছেলের সঙ্গে থাকতাম। তাদের বাড়ি ওটা। মা-বাবা আত্মীয়েরা থাকত ধানবাদে। আমরা তিনজন একটা চাকরের ভরসায় দিব্যি আরামে ছিলাম। সেই সকালে স্নান খাওয়া সেরে বেরিয়ে আসতাম আর ফিরতাম শেষ ট্রেনে। মাঝে-মাঝে দমদম পার হওয়ার আগেই ঘুম আসত শরীরে। যখন কানের ভেতর দুম-দুম শব্দ ঢুকত তখন চমকে চোখ মেলে দেখতাম ট্রেন রাতের বালি ব্রিজ পেরিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ আমরা স্টেশনটি ছেড়ে এসেছি। দুদ্দাড় করে পরের স্টেশনে নেমে সেইসব সুনসান রাতে একা গঙ্গার ওপর বালিব্রিজ পেরিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসতাম। প্রচণ্ড ভয় পেতাম সে সময়। পুরো ব্রিজটা ফাঁকা, তুমুল হাওয়া দিত, আলোগুলো একচোখা ডাইনির মতো নিঃসাড়ে পড়ে থাকত। এমনকী অনেক নীচের গঙ্গার ঢেউ-এর শব্দ পেয়ে যেতাম। অথচ আমার পকেটে তখন দু-এক টাকার বেশি সম্পত্তি থাকত না, তবু ভয় হত। কীসের ভয় তা তখনকার আমিই জানতাম। দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের কাছে এসে স্বস্তি পেলাম। দু-একটা আলো জ্বলছে। যারা ট্রেন থেকে ঠিকঠাক নেমেছিল তারা চলে গেছে। কিন্তু অবিনাশমেসোকে দেখতে পেতাম। দাঁড়িয়ে আছেন, আমি কাছে যেতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতেন, 'সমরেশ না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কোথায় ছিলে? আমি তো প্রায় এক যুগ ধরে এখানে অপেক্ষা করছি।'

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আজও। ব্রিজ পেরিয়ে নেমেছি।'

সঙ্গে-সঙ্গে কাঁধে হাতের ভর রাখতেন ভদ্রলোক, 'উঃ তোমার ভাগ্যটা আমার কেন হল না? ওই স্টেশনটা যদি কোনওমতে ঘুমিয়ে পার করে দিতে পারতাম!'

'কোন স্টশন?'

'শোনো হে।' হাঁটা শুরু করতেন অবিনাশমেসো, 'ছেলেদের জীবনে এক-একটি মেয়ে হল এক-একটি স্টেশন। প্রথম স্টেশন হল জননী যেখান থেকে ট্রেনটা ছাড়ছে। ধর শ্যালাদা। উলটোডাঙা দমদম হল পিসিমা মাসিমাদের মতো মহিলারা। তারপর এক-একটি স্টেশন এক-একজন মেয়ে। এই করতে-করতে একটা জংশন স্টেশন এসে যায় যার পর তোমার ট্রেনটা থ্রু-ট্রেন হয়ে যাবে। পথে স্টেশন পড়লেও থামা চলবে না। তখন তোমার আর ডেস্টিনেশন বলে কিছু নেই, শুধু ছুটে যাও। আমার এই জংশন স্টেশন হল তোমার মণিমাসি। যদি কোনওভাবে ঘুমিয়ে তোমার মতন, মণিমাসির স্টেশনটা পার করে দিতে পারতাম হে, তাহলে আর যাই হোক, এভাবে উলটোমুখে হেঁটে আসতাম না।'

অবিনাশের মুখ থেকে চমৎকার মদের গন্ধ বের হত। সেটা আমাদের এমন একটা বয়স মদ্যপকে ক্ষমা করতে শিখিনি। অথচ অবিনাশমেসোকে মোটেই মদ্যপ মনে হত না। উনি থাকতেন আমার আশ্রয়ের ঠিক পাশেই। মণিমাসির বয়স চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই। বাড়ির ছেলেদুটো ওঁকে মাসি বলতে তাই আমিও দলে ভিড়েছিলাম। দূর থেকে দেখতে পেতাম ওপরের ঘরে আলো জ্বলছে। বাড়ির সামনে আসতেই সেটা নিভে যেত। অবিনাশমেসো দরজায় ধাক্কা মারতেই গালাগাল শুরু হয়ে যেত। সেটা চলত আমার শুয়ে না পড়া পর্যন্ত। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতাম ওরকম স্টেশন যেন আমার কপালে না জোটে। সকালে মণিমাসি কিন্তু অন্য মানুষ, হাসিখুশি, আমাদের রান্নাবান্নার খোঁজখবর নেন। আমায় বলেন, 'অত রাতে বাড়ি ফেরো কেন? ব্যাটাছেলেদের রাত করে বাড়ি ফেরার অভ্যাস খুব খারাপ। মেজাজ ভালো বুঝলে জিজ্ঞাসা করেছি, 'আপনি রাত্রে অবিনাশমেসোকে অত বকেন কেন?' 'পেতনি বাড়ি। পুরুষমানুষ সন্ধের পর বাইরে কাটাচ্ছে আর মেয়েছেলেদের গন্ধ গায়ে মাখছে না এ আমি এক গলা জলে ডুবে বললেও বিশ্বাস করব না। ওরা হল আগুনের মতো, তৃপ্তি নেই

কিছুতেই। ওই বকাঝকা করি বলে বাড়ি ফেরে, নইলে রাত কাবার করত।'

লিজার সঙ্গে মণিমাসির তফাত কতটুকু? সত্য কখনও মানুষবিশেষে ভিন্ন হতে পারে না। সত্য দেখার চোখের তারতম্যে চেহারা পালটাতে পারে মাত্র। রূঢ় কথা হল, একটি পুরুষ শিক্ষা এবং পরিবেশের চাপে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গে নিজেকে যে পরিমাণ সংশোধন করতে পারে একটি মেয়ের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। আজ পাঁড়াগাঁয়ের অশিক্ষিতা কোনও রমণীর সঙ্গে ইংলিশ মিডিয়াম অথবা ভালো স্কুলে পড়া প্রগতির তালে পা মেলানো মহিলার রুচি, চিন্তাধারা আসমান জমিন ফারাক হবেই। কিন্তু যখন নিজস্ব পুরুষটিকে নিয়ে হৃদয়ের টানাপোড়েন শুরু হয় তখন হরিপদ কেরানি আর আকবর বাদশা একাকার হয়ে যান। ঈর্ষার থাবা দুজনকেই একইভাবে আত্মস্থ করে। আমি পালের কাছে উঠেছি এবং ক'দিন থাকব শুনে ওঁরা জানালেন আরও দু-একদিন দেখা হবে। বিল মিটিয়ে দেওয়ার সময় দেখলাম পাঁচ পাউন্ডের নোট ফেরত নিলেন না। ওঁরা চলে যাওয়ার পর কাউন্টারে ফিরে এলাম। এখন মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। অথচ খদ্দের আসার বিরাম নেই। পালের মুখে খুশি-খুশি ভাব। লক্ষ করলাম ওয়েটাররা বকশিশ যা পাচ্ছে তা একটা বাক্সের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। কলকাতায় শুনেছি কাজ শেষ হয়ে গেলে ওই বকশিশ ওয়েটাররা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়। এখন স্পিকারে রবিশংকর বাজছে' পাল ইতিমধ্যেই তিনরকম স্কচ খাইয়েছে আমাকে। জলের কোনও বালাই নেই, সবাই অন রক। অথচ শরীরে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। তিনটে নাগাদ ভিড় কমতে লাগল। কয়েকটি টেবিল খালি। পাল বলল, 'ঠিক চারটেয় বন্ধ করব আজ।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত রাত্রে ডিনার খাচ্ছে কেন এরা।'

পাল জবাব দিল, 'এদের সকাল হবে দুপুর বারোটায়। হিসেব ঠিক আছে। কাল ভোরবেলায় রাস্তায় বেরুলে একটা লোককেও দেখতে পাবেন না। সপ্তাহের দুটোদিন এরা এইভাবে জীবন উপভোগ করে।'

বিগ জনকে দরজা খুলতে দেখলাম। সঙ্গে-সঙ্গে হুড়মুড় করে জনাছয়েক ছেলেমেয়ে ঢুকল। তিনটেই কালো ছেলে সাদা সঙ্গিনী নিয়ে এসেছে। ওরা চিৎকার করতে-করতে নিজেরাই টেবিল জোড়া দিয়ে বসল। পাল বলল, শেষ রাত্রে আবার ঝামেলা। একটি কালো ছেলে চেয়ারে বসেই পাশের সঙ্গিনীকে টেনে নিয়ে এল কোলের ওপর। অন্যেরা চিৎকার করে হাততালি দিল। বিগ জনকে দেখলাম পালের কাছে চলে আসতে। এখনও রেস্টুরেন্টে খদ্দের আছে। এই আবহাওয়া তৈরিতে তারা বিরক্ত হতেই পারে। সানি গিয়ে দাঁড়াল ওদের টেবিলে খাবারে অর্ডার নিতে। তিনবার জিজ্ঞাসা করার পর এক শ্বেতাঙ্গিনী নিগ্রো ছেলেটির, যাকে নেতা মনে হচ্ছিল, দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সে চিৎকার করে বলল, 'নাথিং। উই ওয়ান্ট নাথিং। হা হা হা।'

পাল নীচু গলায় জানাল, 'এই ছোকরারা জামাইকার। স্কলারশিপ নিয়ে এখানে পড়তে এসেছে। ভালো নাচে বলে সাদা মেয়েরা এদের জন্যে পাগল। পড়াশোনা চুলোয় গিয়েছে শুধু এই করছে। এভাবে চললে পঞ্চাশ বছর পর ইংল্যান্ড কালো মানুষে ভরতি হয়ে যাবে।'

ভেতরে উত্তাপ থাকলেও এখন বাইরের শীত আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু মেয়েগুলোর পোশাক দেখে সেসব কিছুই মনে হবে না। নেতা তার সঙ্গিনীকে টেনে টেবিলের ওপর মুখোমুখি বসিয়ে দিতেই পাল কাউন্টার ছেড়ে বের হল, 'এই যে ভদ্রলোকের বাচ্চারা, এবার দয়া করে বিদায় হও।'

একটি মেয়ে তীব্র গলায় বলল, 'কে ভদ্রলোকের বাচ্চা, মোটেই নই।'

'তাহলে তো আরও ভালো। আমার রেস্টুরেন্ট সম্পর্কে তোমাদের নতুন করে কিছু বলতে হবে নাকি? উঠে পড়ো।'

'হে মিস্টার।' নেতা উঠে দাঁড়াল। 'তুমি আমাদের অপমান করছ।'

'তাই নাকি? জন, এদের দেখাশোনা করো।' কথাগুলো বলে পাল চলে এল কাউন্টারে।

বিগ জন শান্ত পায়ে এগিয়ে গেল। আমি একটা চমৎকার ফাইটিং সিন দেখব বলে টানটান হয়ে আছি। বিগ জন এগিয়ে যেতে একটি সাদা ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে সেটা ছুড়ে দিল ওর দিকে, 'ওহো ডিয়ার! হাউ অ্যাবাউট এ ড্রিংক!'

জন কোনও কথা না বলে খপ করে নেতাটির জামার কলার ধরল এবং কিছু বোঝাবার আগেই একটা আলতো শব্দ করে ওর বাঁ-হাত নীচে নেমে এল। দেখলাম নেতার মাথা ঝুলে পড়েছে। বাকি দুটো নিগ্রো ছেলে উঠে দাঁড়িয়েছে, 'ইউ মাস্ট নট, ইউ মাস্ট।' ওরা চিৎকার করে উঠল। মেয়ে তিনটে কিন্তু বসে চুপচাপ, যেন নাটক দেখছে। বিগ জন ছেলে দুটিকে বলল, 'কোথায় যেতে চাও? পুলিশ স্টেশন না ডোরমেনস্ ক্লাবে?'

একটা ছেলে দুটো হাত ওপরে তুলে নাচল, 'ওকে ওকে! আমরা খাবারের অর্ডার দিচ্ছি। ওয়েটার, কাম হিয়ার।' বলেই ওরা শান্ত ছেলের মতো বসে পড়ল।

বিগ জন বলল, 'এইভাবে বসে যদি খেতে পারও তাহলে খাবার না দিয়ে রাগ দেখিয়ে তোমাদের বের করে দেওয়ার মতো মূর্খ আমি নই। অনেক ঝামেলা করেছ এবার শেষ বাজারে খেয়েদেয়ে কিছু পয়সা ছাড়ো।' কথাগুলো শেষ করে বিগ জন কিন্তু চলে এল না। দুটো হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

তারপর একটি চমৎকার দৃশ্য দেখলাম। দুটি ছেলে এবং তিনটি মেয়ে প্রায় নিঃশব্দে খেয়ে গেল চিকেন তন্দুরি আর নানরুটি। ওদের মতো কালো ছেলেটি সেই যে চেয়ারে মাথা হেলিয়েছিল, একবারও ওঠাল না। দেখে মনে হল ওঠাবার সামর্থ ছিল না। বিগ জনের শিক্ষিত আঘাতে বেচারার চেতনাই ফিরে আসছিল না। খাওয়া শেষ হলে সানি প্লেটে বিল নিয়ে ওদের সামনে রাখল। তারপর কফিহাউসি দৃশ্যটি দেখলাম। কলেজ জীবনে কফিহাউসে গিয়ে কফি পকৌড়া খাওয়ার পর বিল মেটানোর সময় আমরা সবাই পকেট থেকে ঝেড়েঝুড়ে পয়সা বের করতাম আর রামু বেয়ারা দাঁড়িয়ে হাসত। কিন্তু এদের ক্ষেত্রে দেখা গেল পাঁচ পাউন্ড কম পড়েছে। নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় কথা বলা, ঝগড়া ইত্যাদি হয়ে যাওয়ার পর একটি লম্বা মেয়ে উঠে এল কাউন্টারের সামনে যেখানে দাঁড়িয়ে আমি দেখছিলাম, 'আই অ্যাম সরি। উই আর রানিং শর্ট অফ ফান্ড।'

'আই কান্ট ডু এনিথিং।' গম্ভীর গলায় বলতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম স্কচ আমার গলার স্বর বেশ পালটে দিয়েছে ইতিমধ্যে।

'অফকোর্স ইউ ক্যান ডু। আমি যদি কাল এসে ওটা দিয়ে যাই তাহলে কিছু মনে করবে না নিশ্চয়ই। আমার ওপর বিশ্বাস করতে পারো। আমি মার্গারেট থ্যাচারের চেয়ে কম বিশ্বাসযোগ্য মহিলা নই।' মেয়েটি ঠোঁটে হাসি চটকাল।

'আই অ্যাম সরি।'

'ও নটি। ডোন্ট সে সো। কাম অন, হাউ অ্যাবাউট এ কিস?'

'কিস। তোমাকে? কেন?' আমার কান ঠিক শুনছে কি না বুঝতে পারছিলাম না।

'ক্ষতিপূরণ। বন্ধুরা বলে আমার একটা কিসের দাম দশ পাউন্ডের কম নয়। আমি তোমাকে সস্তায় দিচ্ছি। ফিফটি পার্সেন্ট।' মেয়েটি বড়-বড় নখে টেবিল বাজাল। তাকিয়ে দেখলাম পাল খুব মজা পেয়েছে, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে। টেবিলে বসে থাকা ছেলেমেয়েগুলো একটা ফয়সালার জন্যে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছে। এমনকি বিগ জনের ঠোঁটেও হাসি। গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললাম, 'মাই মাম টোল্ড মি নট টু কিস এ স্ট্রেঞ্জার।'

'ওহ! আই অ্যাম নট স্ট্রেঞ্জার এনি মোর।'

সেই সময় দরজা খুলে গেল। ইউনিফর্ম পরা বিশাল চেহারার এক সাহেব পুলিশ ভেতরে ঢুকে টুপি খুলল, 'হাই পল। হাউ ইজ ইওর বিজনেস? এ পিসফুল নাইট? সানি। ভদকা উইদ টনিক। হাই জন, কাম অন বয়?' লোকটা দরজার সামনে সোফায় গিয়ে বসল। এদিকে পুলিশটিকে দেখেই

কাউন্টার থেকে মেয়েটি চলে গেছে তাদের টেবিলে ঝটপট। তারপর ঘুমন্ত অথবা জ্ঞানহীন লোকটির পকেট থেকে বের করা পয়সা ওরা আবার চটপট ফিরিয়ে নিল। দাম মিটিয়ে পার্সটা নেতার পকেটে ঢুকিয়ে দুজন দুদিক থেকে তাকে টেনে তুলল। নেচে-নেচে ওরা যখন দরজার দিকে তখন পুলিশটি বলে উঠল, 'এ্যাই খোকাখুকিরা, এত মদ খাও কেন যখন নিজের পায়ে হেঁটে যেতে পার না?' ওরা জবাব দিল না। খাড়া সিঁড়ি বেয়ে নেতার অচৈতন্য শরীর কীভাবে নামিয়ে নিয়ে গেল তা দেখার জন্যে মুখ বাড়াইনি। কিন্তু কী ধরনের আঘাত যা দীর্ঘসময় একটি মানুষকে জ্ঞানহীন করে রাখে? লোকটা যে মরে যায়নি তা বুঝেছি ওকে যখন চেয়ার থেকে টেনে তোলা হল। বিগ জনকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে হেসে বলল, 'অনেক পরিশ্রম করে এসব শিখতে হয় হে।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওরা আগামীকাল বদলা নিতে পারে না?' বিগ জন মাথা নাড়ল, 'না। ওদের সেই মেরুদণ্ড নেই।'

ভোর সাড়ে চারটের সময় আমরা বাড়ি ফিরলাম। পালের রেস্টুরেন্টে কয়েকজন কর্মচারী থাকে। কয়েকজনকে সে বাড়ি ভাড়া করে দিয়েছে কাছাকাছি। এরা সবাই সিলেটের। একজন অবশ্য মেমসাহেব বিয়ে করে আলাদা থাকে। তার নিজস্ব গাড়ি আছে। সানিও নিজের গাড়ি চালিয়ে ফিরে গেল। সাড়ে চারটে অথচ মনে হচ্ছে মধ্যরাত। রাস্তায় দু-একজন ঘরমুখো লোক। ঠান্ডা যেন রক্তে করাত চালাচ্ছে। আমাদের সঙ্গে যে দুজন কর্মচারী আছেন তাঁদের একজন বৃদ্ধ অন্যজন যার স্ত্রী মেমসাহেব।

দরজা খুলে ভেতরে পা দেওয়ামাত্র মচমচ করে উঠল সিঁড়িটা। সঙ্গে-সঙ্গে থমকে দাঁড়ালাম। রাত্রের সেই চোরের অথবা ভূতের শব্দটা মনে পড়ল। পাল বলল, 'এ বাড়ির কোনও দরজা খুললে সিঁড়িতে শব্দ হয়, ওপরে হাঁটলে নীচে প্রতিধ্বনি হয়।' সেটা লক্ষ করলাম। ঘরের একটা দরজা খুলতেই উলটোদিকের লক্ না করা দরজাটা আপনা থেকেই ভৌতিক ছবির মতো খুলে গেল।

যে ছেলেটির মেমসাহেব বউ সে পাউন্ডের থলিটা টেবিলে রাখতেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক গুনতে বসলেন। নোটগুলো সাইজ অনুযায়ী আলাদা করছিলেন প্রথমে। এতরকমের পাউন্ড পেনি একসঙ্গে কখনও দেখিনি। ওদিকে ততক্ষণে ছেলেটি রান্না ঘরে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেছে, 'দাদা আবার ভাত খাইবেন নাকি?' পাল সোফায় শরীর ছেড়ে দিয়ে বলল, 'না। কফি বানাও।'

আমাদের গরম কফি দিয়ে ছেলেটি ভাত নিয়ে বসল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই ভোরবেলায় ভাত খাচ্ছেন? রেস্টুরেন্টে খাননি?'

'না দাদা। রেস্টুরেন্টের খাবার খাইয়া পেটের সর্বনাশ হইয়া গেছিল। রিচতো। বাড়িতে তো ভাত জোটে না। মেমসাহেব ভাত মাছের ঝোল, ধনেপাতার মর্ম বুঝেন না। তাই দাদার বাড়িতে আইস্যা খাইয়া যাই মাঝে-মাঝে।'

মনে পড়ল না পাঁচটার পর ভোরের মুখে আমি কাউকে অমন তৃপ্তির সঙ্গে ভাত খেতে দেখেছি কি না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার দেশে কেউ আছে?'

'সব্বাই। আমরা কিন্তু দাদা এখন ক্যালকাটার লোক। সেভেন্টি ওয়ানে এক মুসলমানের সঙ্গে এক্সচেঞ্জ কইর‍্যা জমি নিছিলেন আমার বাবায়। পার্ক সার্কাসে।'

'যান না?'

'না। তারা ভাবে আমি বিলাইতি সাহেব, যখনই যামু তাদের হাজার-হাজার টাকা দিমু। মেমসাহেব বিয়া করছি বইল্যা মায়েরও মন আমারে নেয় না। কেমন যেন ছাড়-ছাড় সব।'

'মেমসাহেবের সঙ্গে প্রেম হল কী করে?'

'ঠিক প্রেম না দাদা। আমার ল্যান্ডলেডির মেয়ে। ভাড়ায় থাকতাম। তার ইন্ডিয়ান ছেলে পছন্দ। এখানে তো পাকিস্তানি বাংলাদেশি ইন্ডিয়ানকে কেউ আলাদা দ্যাখে না। রাত্তিরে ঘরে আসত। একদিন বলে কনসিভ করছে। তার মায়ে কইল বিয়ে কইর‍্যা ছেলের মতো থাক। তাই আছি।'

কোনও সমস্যা নেই। এমন সরল গলায় জীবনের এতবড় ঘটনা কাউকে বলতে শুনিনি। পাল

আমাদের কথা শুনছিল। এবার বলল, 'ভাববেন না ওকে চাপ দিয়ে বিয়ে করতে বাধ্য করেছে। মেয়েটি চায়নি বিয়ে করতে। মেয়েটির মা মেয়ের ওপর ভরসা রাখতে পারেনি। একটু জমিজমা আছে তাই বাঁচাবার জন্যে ওকে পছন্দ হওয়ায় জামাই করে নিয়েছে। ওর মতো ভাগ্য তো সবার হয় না।'

ছেলেটি খাওয়া শেষ করে ডিস দেখাল, 'ভাগ্যের নমুনা তো দেখতেছেন। নিজের ঘরে ভাত হয় না। টাকা গুনা শেষ হলো করিমচাচা?' করিমচাচা মানে সেই বৃদ্ধ লোকটি এখন কাগজে যোগ করছেন। মুখে উত্তর না দিয়ে মাথা নাড়লেন। তারপর যোগ শেষ করে বললেন, 'ভাই সাহেব, আপনি লাকি আছেন। আমি? লাকি? করিমচাচা বললেন, 'এই ইয়ারের হায়েস্ট সেল হইল আজকা। ওয়ান থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড থার্টি থ্রি পাউন্ডস অ্যান্ড ফরটি পেনি।' টাকাপয়সা গুছিয়ে ব্যাগে ভরে ওরা চলে গেল। অর্থাৎ আজ পালের বিক্রি হল যা তাতে লভ্যাংশ আধাআধি। মন্দ রোজকার নয়। ভারতীয় টাকায়, এভাবে চললে মাসে প্রায় তিনলক্ষ। খুব ভালো লাগল।

কফি খাওয়া হয়ে গেলে পাল বলল, 'ঘুমোবেন তো?'

উচিত কিন্তু ঘুম আসছিল না। যেটুকু ক্লান্তি ছিল তা কফিতেই শেষ হয়ে গেল। তবু উঠলাম। জামাকাপড় ছেড়ে ওপরের ঘরে লেপের তলায় ঢুকে মনে হল, আ কী আরাম। এপাশ-ওপাশ করলাম। হঠাৎ মনে হল, এই যে জীবন আমি যাপন করছি তাতে কোনওদিন অভ্যস্ত ছিলাম না। চিরকাল রাত এগারোটার মধ্যে বাড়ি ফিরেছি। আমেরিকায় মনোজের সঙ্গে রাত দেখতে বের হতাম। সেই প্রথম। কিন্তু এই আমি কোপেনহেগেন থেকে লন্ডন, লন্ডন থেকে এতটা পথ ডিঙিয়ে এখানে এসে চমৎকার রাত জাগছি, স্কচ খাচ্ছি এবং কোনও কষ্ট হচ্ছে না। কে বলে মানুষের শরীর একটাই জীবন পার করে। এক শরীরে দু-দুটো জীবন তৈরি করার সামর্থ্য তো মানুষেরই থাকে। পঞ্চাশ পেরিয়ে যে সমস্ত বাঙালি সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করতেন তাঁদের পক্ষেও তো এক শরীরে দুটো জীবনযাপন সম্ভব হয়েছে। এইসময় নীচে মচমচ শব্দ হল। আর আমি তড়াক করে লেপ সরিয়ে নীচে নেমে কার্পেট তুললাম। বা, আমার সম্পত্তি যেমন রেখেছিলাম তেমনি ঠিকঠাক আছে। আবার বিছানায় ওঠার সময় হাসি পেল। দুটো কেন, অনেকগুলো জীবন মানুষ যাপন করতে পারে যতক্ষণ ওইটে ঠিকঠাক থাকে।

॥ ৫ ॥

নতুন জায়গায় ঘুম ভাঙা সকালটাকে দেখতে ইচ্ছে করে। ঘুমের সঙ্গে আমার ভারী চমৎকার মিত্রতা আছে, এখন পর্যন্ত। সুইচ টিপে আলো নেভানোর মতোই ঘুম আমাকে দখল করে বিছানায় শরীর মেললেই। লম্বা রাতটাকে সুপার এক্সপ্রেসের মতো এক ছুটে পার করে দিয়েও সে ছেড়ে যেতে চায় না, আলস্য হয়ে জড়িয়ে থাকে যতটা পারা যায়। বাল্যকালে পিতামহ বিছানা থেকে তুলে শেষরাতে তিস্তার ধারে আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করে সেই যে বেড়াতে নিয়ে যেতেন তার প্রতিবাদেই সম্ভবত চুপচাপ বিছানায় থাকতে ভারী ভালো লাগে। কে বলে বাল্যকালে যাতে অভ্যস্ত হওয়া যায় জীবনভর তার ব্যতিক্রম হয় না। অন্তত আমি তো সেরকম করলাম না, নিজেকে ভেঙে আবার জুড়ে নিতে বড় আরাম। বোস্টনের সকালটা কেমন দেখবার জন্য একটানে লেপ সরিয়ে উঠে বসতে গিয়েই খেয়াল হল এখন মোটেই সকাল হতে পারে না। শরীরে ক্লান্তি নেই যখন লম্বা ঘুম হয়েছে। আমি যখন বিছানায় ঢুকেছি তখনই কলকাতার মানুষ লোক বেড়াতে যায়। অতএব এখন তো দুপুর হওয়ার কথা। অথচ ঘরে এক ফোঁটা আলো ঢুকছে না। রুম হিটারটাও বন্ধ দেখছি। একটা সোয়েটার পরা ওম্ রয়েছে ঘরে। কোথাও কোনও শব্দ নেই। মাথা ঘুরিয়ে ঘড়িতে সময় দেখলাম, ঠিক বারোটা।

ছেলেবেলায় পিতামহের বৃদ্ধ দেওয়াল ঘড়ি যখন দুটো হাত একত্রিত করে বারোটার ঘণ্টা তুলত তখন আমি কানে আঙুল দিতাম। বারোটা বাজার শব্দ শুনতে নেই, এরকম ধারণা ছিল। যাহোক, সকালটাকে যখন দেখা যাবে না তখন আর এক প্রস্থ ঘুমালে মন্দ হয় না। কিন্তু আলো আসছে না কেন। জানলায় অবশ্য ভারী পরদা রয়েছে, কয়েক পা এগিয়ে সেটাকে সরিয়ে উঁকি মারতে দেখি সারারাতের হিম কাচের ওপর পড়ে দৃষ্টি অগম্য করে তুলেছে। পাজামার ওপর শাল জড়িয়ে দরজা খুলে প্যাসেজে চলে এলাম। পালের ঘরে পাল নেই। মনে পড়ে না কলকাতায় কখনও বারোটা পর্যন্ত ঘুমিয়েছি কি না। এখন পাল যদি বিছানায় থাকত তাহলে স্বস্তি পেতাম। গরম জলে মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে সিঁড়ি ভেঙে নামার সময় শব্দটা বাজল। আশ্চর্য গেঁড়াকল। চোরের মতো বাড়ি ফেরার তো উপায় নেই। পালগিন্নি এখন নেই তাই রক্ষে। নীচের দুটো ঘরেও পালের দেখা পেলাম না। ডাইনিং কাম টিভি রুমে পৌঁছে ওর নোট পেলাম। চা তৈরি করে গরম রাখার ব্যবস্থা করে গিয়েছে। খুব খিদে পেলে একটা বড় কেক যেন বের করে নিই। পাল গিয়েছে ব্যাংকে টাকা জমা দিতে। ফিরে এসে লাঞ্চ করবে এবং আমি যদি ঘুম থেকে উঠে এই নোট দেখি তাহলে যেন সেইভাবেই তৈরি হয়ে নিই।

টিভি খুলে দিয়ে চা কেক বসালাম। আ। এর চেয়ে আরাম আমি খুব কম পেয়েছি। কোনও তাড়াহুড়ো নেই, কেউ টেলিফোন করছে না, সমরেশবাবু আছেন বলে কেউ মুখ দেখাচ্ছে না, এমনকী যে জিনিসটাকে মাঝে-মাঝে কাঁধ থেকে নামাতে পারি না ইচ্ছে হলেও, এই লেখালেখি, সেটিকেও বর্জন করে চুপচাপ বসে আছি। এইরকম আলস্যের ফুলদানিতে ফুল হয়ে বসে থাকার সে কী সুখ—। আহা। টিভির দিকে নজর দিলাম। বিলিতি টিভি-র বিজ্ঞাপনে সুন্দরী যুবতীরা এত কম কেন? এই সময় বিবিসির খবর আরম্ভ হল। একজন স্বাস্থ্যবতী মহিলা হাতে একটা ফাইল নিয়ে নিউজরুমে ঢুকলেন। একে হেলো ওকে ভালো বলে নিজের ডেস্কে পৌঁছে সেখানে পশ্চাতদেশ ঈষৎ ঠেকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'নমস্কার। আজ দুপুরে বিশেষ বিশেষ খবরগুলো আপনাদের প্রথমে শুনিয়ে দিই।'

ভালো লাগল বলার ধরনটা। কোনও সাজানো খবর পড়া নয়, পরিবেশ এবং বলারে ভঙ্গিতে মনে হল আমি যেন ঢুকে গেছি ওই নিউজরুমে। তারপরেই মনে হল আমি খবর শুনছি কেন? পৃথিবীর কোথায় কী হচ্ছে তা জানার কোনও দরকার এই মুহূর্তে আমার নেই। চেনা পৃথিবীর বাইরে চলে এসে অচেনা পৃথিবীর খবর নিয়ে কী লাভ হবে? যন্ত্রটাকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্যে হাত বাড়াতে গিয়ে থেমে গেলাম। যুবতী বললেন, 'এখন হিপিরা। হ্যাঁ, ওরা ব্রিটিশ সরকারকে আরও বিপাকে ফেলেছে। চলুন আপনাদের হাইওয়েতে নিয়ে যাই। সেখানে আমাদের প্রতিনিধি—।' এই পর্যন্ত বলার পর পর্দায় একটি ভদ্রমুখ ভেসে উঠল, 'হাইওয়ে থেকে বলছি। সকালের খবরে জেনেছেন হিপিদের কনভয় পুলিশের নির্দেশিত পথেই এগিয়ে যাচ্ছে। গতরাতটা ওরা মোটামুটি শান্তভাবেই হাইওয়ের পাশের এক গোচরণভূমিতে কাটিয়েছিল। সরকার থেকে ওদের জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।' এইসব যখন ভদ্রলোক বলছিলেন তখন আমরা বিরাট কনভয়টাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। আকাশ মেঘে কালো হয়ে আসছে। টিপটিপিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। তার মধ্যেও কিছু হিপি খোলা জিপে বসে বাজনা বাজাচ্ছে। এবার ক্যামেরাম্যান চলে এল হিপিদের নেতার সামনে। এঁকে গতকাল আমি টিভিতেই দেখেছি। নেতা চিৎকার করে উঠল, 'খাবার দিচ্ছে? একে খাবার বলে? আফ্রিকার ভয়ংকর খরার শিকার মানুষরা এরকম খাবার পেলে গিলতে বাধ্য হবেন। ব্রিটিশ সরকার আমাদের সেই রকম ভাবল, এটাই আপশোশ। আরে আমাদের দেখে সমাজ বিরোধী নরকের কীট বলে মনে হচ্ছে কি?'

প্রশ্ন হল, 'আপনাদের জীবনযাত্রার উদ্দেশ্য কী?'

'এইরকম বোকা-বোকা প্রশ্ন দালালগুলোর জন্যে তুলে রেখো হে। জীবনযাত্রা। আমরা কোনও

যাত্রা-ফাত্রা করতে চাই না। আমরা টেনশন ফ্রি জীবন চাই। খাও পিও আর মজা করো। সাজানো সভ্যতার পাছায় একজোড়া লাথি মারো। ব্যস, আর কিছু না।' নেতা মুখ ঢুকিয়ে নিলেন কনভয়ে।

প্রতিনিধি বললেন, 'একটু আগে পুলিশ একটি সমস্যায় পড়েছিল। গত রাত্রে হিপিরা যে গ্রামের পাশে রাত কাটিয়েছিল সেই গ্রামের এক বাসিন্দা অভিযোগ করেছিলেন, হিপিরা ভুলিয়ে ভালিয়ে তাঁর স্ত্রীকে ইলোপ করেছে। তাঁর বিশ্বাস মহিলাটিকে হিপিদের কনভয়ের মধ্যেই পাওয়া যাবে। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ কনভয়টিকে সার্চ করে। মহিলাটিকে পাওয়া যায় চার নম্বর ক্যারাভানে তিনি তখন একজন হিপিনীকে দিয়ে চুল ছাঁটাচ্ছিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ক্যামেরায় আমরা একজন প্রৌঢ়াকে দেখতে পেলাম। তাঁর পাশে কাঁচি হাতে এক শীর্ণ হিপিনী বসে। চুল কাটা সম্পূর্ণ হয়নি।

'মিসেস স্মিথ, আপনার স্বামী অভিযোগ করেছেন যে হিপিরা আপনাকে জোর করে গ্রাম থেকে তুলে নিয়ে এসেছে। এর প্রতিক্রিয়া খুব খারাপ হবে। মন্তব্য করুন।'

'পাগল। আমি কি কচি খুকি যে কেউ জোর করে ধরে আনবে?'

'আমার বয়স বাহান্ন?'

'কত বছর আপনার বিয়ে হয়েছে?'

'তিরিশ।'

'ছেলেমেয়ে?'

'চারজন। সবাই যে যার মতো জীবন বেছে নিয়েছে।'

'আপনি, মানে আপনার মতো একজন ভদ্রমহিলা, হঠাৎ না বলে এই দলে এলেন কেন? আমি ধরে নিচ্ছি, কেউ আপনাকে বাধ্য করেনি আসতে।'

'বলে আসতে চাইলে আর আসা হতো না।'

'কিন্তু আপনি একজনের স্ত্রী, তার অনুমতি ছাড়া—।'

'আপনি এমনভাবে কথা বলছেন, যেন আমি একজন ক্রীতদাসী, মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছি এমন অপরাধ আমার। এটা কি মধ্যযুগ? আমার স্বাধীনতা আছে নিজের মতো করে চলার। তার যদি আপত্তি থাকে ডিভোর্স নিক।'

'কিন্তু তিরিশ বছরের সংসার ভেঙে আপনি হিপিদের জীবন বেছে নিলেন কেন?'

'ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। বিয়ের পর থেকে ওই সংসারের হাঁড়ি ঠেলতে-ঠেলতে হাড়ে দুব্বো গজিয়ে গিয়েছিল (বাক্যটাকে অন্য ভাষায় বলেছিলেন)। শুধু চারবার গর্ভধারণ করা ছাড়া আমি নিজের জন্যে কিছুই পাইনি। একঘেঁয়েমির শিকার হয়ে গিয়েছিলাম। স্বামী হিসেবে ওর বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই। মানুষ হিসেবে ওর বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই। মানুষ হিসেবে ওর ভাবনাচিন্তা মধ্যযুগীয়।

এই সময় শুনলাম হিপিরা আমাদের হাইওয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এদের জীবনে আর যাই থাক একঘেঁয়েমি নেই। তাই চলে এলাম। এই দেখুন ও আমার চুল কেটে দিচ্ছে। এত যত্নের চুলগুলো রেখেই বা কী লাভ হয়েছিল? মনে হচ্ছে এদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলে বাকি জীবনটা উপভোগ করতে পারব।'

'মিসেস স্মিথ, আপনার বয়স হয়েছে। হিপিদের দলে আপনার বয়সী তো কেউ নেই।'

'তাতে কী এসে গেল। হিপি মানে বাঁধনহারা। বড্ড জ্বালাচ্ছেন, এবার ওকে চুলটা কাটতে দিন।' ভদ্রমহিলা কাঁচির সামনে মাথা এগিয়ে দিলেন।

খবর শেষ হল। আমি স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম। হঠাৎ খুব ইচ্ছে হল ওই ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলার। কিন্তু কোথায় কোন হাইওয়েতে কনভয়টা আছে তাই তো জানি না। আর এই সময় পাল এল, হাতে কয়েকটা প্যাকেট। নিজেই বাইরে থেকে চাবি ঘুরিয়ে, দরজা খুলেছে। 'গুড আফটারনুন। ভালো ঘুম হয়েছে তো?'

'চমৎকার। আপনি কাগজ পড়েন না?'

'ওহো, আনা হয়নি।' পাল কিচেনের দরজা দিয়ে ঢুকে পাশের গলিতে চলে গেল। ফিরে এল কাগজ নিয়ে। জানলাম কাগজওয়ালা ওখানে রেখে দেওয়া একটা বাক্সে কাগজ ঢুকিয়ে দিয়ে যায়। তাড়াতাড়ি প্রথম পাতায় নজর বোলালাম। কোনও খবর নেই। তৃতীয় পাতায় হিপিদের আবিষ্কার করলাম। হিপিদের কনভয় যে পথ দিয়ে যাচ্ছে তার একটা ম্যাপ ছেপে দেওয়া হয়েছে। পালকে সেটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কতক্ষণ লাগবে এখানে পৌঁছোতে?' পাল বলল, 'মিনিটপঁয়তাল্লিশ, কেন?'

'আমি একবার ওখানে যেতে পারি?'

'হিপিদের দেখতে?' সে হেসে উঠল হা হা করে, 'আপনি হিপি দ্যাখেননি?' প্রশ্নটা শোনামাত্র মনে হল এইভাবে ভদ্রমহিলাকে দেখতে যাওয়া ঠিক নয়। একজন তাঁর চেনা পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে নিজের মতো জীবনযাপন করতে চাইছেন, তাঁকে চিড়িয়াখানায় জীব দেখতে যাওয়ার মতো গিয়ে দেখার কোনও যুক্তি নেই। আমার আগ্রহ তাঁর কাছে বিরক্তিকর হওয়াটাই স্বাভাবিক।

দুপুরের খাওয়া প্রায় বিকেলে সেরে পাল বলল, 'চলেন আপনাকে বোস্টনটা দেখিয়ে আনি।' পাল আমাকে একটা ওয়াটারপ্রুফ পরতে দিল। দরজা খুলে বাইরে পা দিয়ে চমকে উঠলাম। সূচের চেয়ে ধারালো হাওয়া বইছে। মুহূর্তেই সমস্ত শরীর কনকনিয়ে উঠল। আকাশ থেকে মেঘ নেমে এসে যেন ঘুড়ির মতো ঘুরছে। টিপটিপিয়ে বৃষ্টি পড়ছে সেই সঙ্গে। ব্রিটিশ ওয়েদার অথবা লন্ডনের স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার যে গল্প এতকাল শুনেছিলাম তা হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পেরে মনে হল ঘরে ফিরে চাদর মুড়ি দিয়ে টিভির সামনে বসলেই ভালো হত। পাল বলল, 'গাড়ি নেব না, হাঁটব। হাঁটলে ভালো দেখতে পাবেন।' মরেছে। কিন্তু প্রতিবাদ করলে নিজের অক্ষমতা ধরা পড়বে। পালের কিছু অসুবিধে হচ্ছে বলে মনে হল না।

এমন মেঘ হাওয়া আর ঠান্ডা দুপুর কখনও দেখিনি। এ জীবনে দার্জিলিং-এ গিয়েছি অন্তত বাইশবার। সেখানেও নয়। ঝকঝকে ভেজা রাস্তায় যেন আঁধার নেমেছে। দুপাশে কোনও দোকানপাট খোলা নেই। রেস্টুরেন্টের রাস্তায় বিপরীত দিকে হাঁটতে লাগলাম আমরা। বিদেশি ছবিতে এমন দৃশ্য মাঝে-মাঝে দেখা যায়। মাঝে-মাঝে গাড়ি যাচ্ছে দু-একটা। মোড়ের মাথায় একটা বই কাম ম্যাগাজিনের দোকান খোলা। দোকানের মালিকান পালকে দেখামাত্র ডাকল, 'হাই পল।'

'হাই?' পল দোকানে ঢুকতে গিয়ে স্বস্তি পেলে আমিও অনুসরণ করলাম। কী ওয়েদার! ছিছি। অন্যবার এই সময় সামার এসে যায়। মানুষ যত আধুনিক হচ্ছে তত প্রকৃতি বিগড়ে যাচ্ছে। তুমি কী বলো?' ভদ্রমহিলার বয়স ষাটের গায়ে। কিন্তু মুখ চোখ এঁকেছেন কিশোরীর মতো। শরীরের বাঁধুনি ঠিক রাখার চেষ্টাও আছে। পাল বলল, 'হতে পারে। আজ রাত্রে মনে হয় রেস্টুরেন্টটা ফাঁকা যাবে। দ্যাখো, বিকেলের পরে ওয়েদার যদি ভালো হয়।'

পাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা হলে যেভাবে মানুষ গল্প করে সেই ধারায় কথাবার্তা চলল। আমি ম্যাগাজিনগুলো ওলটালাম। সিরিয়াস কাগজ যেমন আছে তেমনি বিবস্ত্রা তরুণীর ছবি মলাটে ছাপা কাগজের অভাব নেই। একটার মলাটে ক্যাপশন দেখলাম, 'আই নেভার কিসড মাই মাম, শী কিসড মি।' হঠাৎ ভাবতে চাইলাম, আমি কখনও আমার মাকে চুমু খেয়েছি কি না। মনে পড়ল না। বাঙালির শৈশব বার্ধক্যেও কাটে না, সত্যি কথা, শুধু মায়েরা যে কখন নিজেদের গুটিয়ে নেন সেটাই ধরতে পারা যায় না।

হঠাৎ শুনলাম মালকিন বলছেন, 'ইটস ডেঞ্জারাস পল। তুমি নিশ্চিত যে ওই হিপিদের দল বোস্টনের পাশ দিয়ে যাবে না?'

পাল বলল, 'হ্যাঁ। ওদের রুট তো আলাদা।'

'পুলিশকে বিশ্বাস নেই। যদি এদিকে ওদের ঘুরিয়ে দেয়? আমার মেয়েকে একটুও বিশ্বাস নেই। ওরা এদিকে এলে ও জয়েন করতে পারে। তিরিশ বছর সংসার করার পর ওই বুড়ি কীভাবে

হিপিদের দলে ভিড়তে পারল, বলো? তুই কী পাবি? হিপিমানেই তো ফ্রি সেক্স। তোর আর ওই বয়স আছে? কী লজ্জার কথা?' আমি মহিলার দিকে তাকালাম। মোক্ষদা পিসির মতো গলা এখন। আর তখনই আমার মাথায় গল্পটা চলে এল। 'দেশ' পত্রিকায় গল্প লিখেছিলাম, 'হিপিরা এসেছিল।'

যে-কোনওরকমের উটকো ঝামেলা কেউই পছন্দ করে না, ব্রিটিশরা আবার এককাঠি ওপরে, ঝামেলার সিঁদুরে মেঘ বহুৎ দূরের আকাশে দেখলেই জানলা দরজা বন্ধ করে দেয়। আমরা আমাদের মতো আছি তুমি তোমার মতো দূরে থাকো বাবা—এই হল চল্লিশ পেরিয়ে যাওয়া ব্রিটিশদের ভাবনা। অল্পবয়সিরা নিয়ম ভাঙছে। এখানে বলে রাখি ব্রিটেনে আমি আফ্রিকা আমেরিকার কালো মেয়েকে নিয়ে সাদা ছেলেকে ঘুরতে দেখিনি। পাল মালিকানের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল।

মালিকান এক মুহূর্ত আমায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি এখানেই সেট্‌ল করছ?' 'না। আমি বেড়াতে এসেছি। খামোকা সেট্‌ল কেরতে যাব কেন?'

সঙ্গে-সঙ্গে মহিলার মুখে হাসি ফুটল, 'গুড। ভারতবর্ষ শুনেছি বিরাট দেশ, সেখানে অনেক জায়গা। ব্রিটেনে একেই জায়গা কম তার ওপরে লোকজনের তো আসার বিরাম নেই। আমার এক মাসির বর ভারতবর্ষের চা-বাগানে চাকরি করেছেন পঁচিশ বছর। ওরা ওখানে নাকি রাজারানির মতো ছিল। ফিফটিতে ওরা দেশে ফিরে এল বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটবে বলে। ওমা, তোমাকে বলব কী, মাসি বলে, কেন এলাম রে এখানে। যে দিকে তাকাই, যে পথে হাঁটাচলা করি শুধু ভারতীয় আর ভারতীয়। এখানে আমরা ওরা সমান। এর চেয়ে ওদের দেশে থেকে গেলে চা-বাগানের রাজত্বটা করা যেত।' মহিলা হাসলেন। পাল বলল, 'ডোরা, তুমি কি আমাকে চলে যেতে বলছ?'

'ওঃ নো, পাল তুমি আমাদের লোক।'

বাইরে বের হতে ইচ্ছে করছিল না কিন্তু এইরকম মানসিকতার মহিলার সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলা অস্বস্তিকর। বৃষ্টিটা বেড়েছে, সেই সঙ্গে হাওয়ার দাপটও। পাল জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি ঠিক আছেন তো?'

আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম। দুপাশের বাড়িগুলো বেশ পুরোনো হলেও মজবুত। গঠনে প্রাচীন গন্ধ আছে। চওড়া রাস্তা ঝকঝকে। ফুটপাতে লোক নেই। আমরা একটা চৌমাথায় এসে দাঁড়ালাম। জল ওয়াটারপ্রুফ বেয়ে নেমে যাচ্ছে। পোস্ট অফিস, ব্যাংক এবং সুপার মার্কেট। সবকটার দরজা খোলা কিন্তু লোকজন নেই।

মিনিটপাঁচেক হাঁটার পর বাঁ-দিকের একটা বাড়িতে সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেল। চওড়া খোলা দরজার একপাশে উর্দি পরা দারোয়ান দাঁড়িয়ে। সে পালকে চেনামাত্র মাথা নাড়ল, 'হাই পল!'

আমরা ওয়াটারপ্রুফগুলো খুলে পাশের স্ট্যান্ডে ঝুলিয়ে দিলাম। তারপর একটা [illegible] দরজা ঠেলে ভেতরে পা বাড়ালাম। পাল বলল, 'এটা একটা গ্রামীণ ক্যাসিনো। বহু বছর ধরে চলছিল। তবে লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নোটিশ দিয়েছে এটাকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্যে। আর বড় জোর মাসখানেকের পরমায়ু।'

'কেন বন্ধ করে দিচ্ছে?'

'এক-এক সময় এক-এক দল ক্ষমতায় আসে। এরা মনে করছে ক্যাসিনো চালাতে দিলে ইয়াং জেনারেশনের ক্ষতি হবে। তারা যা আয় করছে তা ক্যাসিনোতে দিয়ে যাচ্ছে।'

'আমি মেম্বার এবং আপনি আমার গেস্ট বলে কিছু দিতে হল না কিন্তু সাধারণ মানুষকে পাঁচ পাউন্ডের টিকিট কিনে এখানে ঢুকতে হয়।' কথা বলতে-বলতে পাল হাত নাড়ল কাউকে উদ্দেশ্য করে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিছু মনে করবেন না, এখানে কি সবাই সবাইকে চেনে? একটা ছোট শহরেও তো তা সম্ভব নয়।'

পাল বলল, 'আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমার একটা রেস্টুরেন্ট আছে। এই ক্যাসিনোর মালিক আমার নিয়মিত খদ্দের ছিল। আগে যখন মেয়েদের কাজ দিতাম তখন এখানকার অনেক মেয়েই আমার রেস্টুরেন্ট কাজ করেছে। এই করেই চেনাজানা হয়।'

'গত রাত্রে রেস্টুরেন্টে কোনও মেয়েকে কাজ করতে দেখলাম না।' 'এখন তো রাখি না। বহুৎ ঝামেলা। ঘরে বাইরে দু-জায়গাতেই।' পাল হাসল।

এই বাদলদিনে ক্যাসিনোর ভেতরেও তীব্র আলো জ্বলছে। যেন ফাল্গুনের কলকাতার দুপুর। ডানদিকে তিনটে কাউন্টার যেখানে পাউন্ড ভাঙিয়ে টোকেন নেওয়া যায়। ক্যাসিনোর ভেতর পাউন্ড চলবে না, ওই টোকেনে হিসেব হবে। পাল বলল, 'ঘুরে দেখুন তবে বেশি হারবেন না।'

এক পাউন্ড মানে তখন কুড়ি টাকার ওপরে। হারতে কোন নবাবের ইচ্ছে হয়? বন্ধুরা বলেন আমার নাকি জুয়ো ভাগ্য খুব ভালো। যে দশ টাকা হারিয়ে দুটো টাকা জেতে তার ওই জিতটাই সকলের নজরে পড়ে, হারটা নয়। পাল চলে গেল সেই পরিচিতের সঙ্গে গল্প করতে, এটা আমিও চাইছিলাম। কাউন্টার থেকে পাঁচ পাউন্ড টোকেন নিলাম। বুড়ি মেমসাহেব আমার দিকে এমন চোখে তাকালেন যেন বলতে চাইলেন, ট্যাকের জোর না থাকলে কেন বাবা ডানা গজাল তোমার? প্রথমে যে টেবিলটা পড়ল তার পাশের টুলে বসে একটা উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে বই পড়ছে। এই ঠান্ডাতেও, অবশ্য ভেতরে ঠান্ডা নেই, লাল হাত কাটা গেঞ্জি আর নীল প্যান্ট পরে আছে। পরে বুঝেছি এইটেই এখানকার চাকুরে মেয়েদের ইউনিফর্ম। সুন্দর ডিজাইনের বড় টেবিলে বৃত্তাকার কাঠের ওপর এক থেকে কুড়িটি ঘর কেটে নম্বর লেখা। মাঝে-মাঝে অবশ্য সরি শব্দটিও লেখা রয়েছে। বৃত্তাকার কাঠটির কেন্দ্রে একটা স্ট্যান্ড থেকে সরু ইস্পাতের ফলা সমান্তরালভাবে ইঞ্চিদুয়েক ওপর দিয়ে চলে এসেছে নম্বর গুলোর দিকে। তার মুখ থেকে একটা পেরেক নীচের দিকটাকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করছে। সুইচ টিপলেই বৃত্তাকার কাঠটা প্রবল বেগে ঘুরতে আরম্ভ করবে কিন্তু ইস্পাতের ফলাটি থাকবে স্থির। তারপর সুইচ অফ করলেই গতি কমে আসবে কাঠের চাকতিটার। শেষে যখন একেবারে স্থির হয়ে যাবে তখন ইস্পাতের ফলাটির মুখ থেকে নামা পেরেক যে ঘরটাকে চিহ্নিত করবে সেই ঘরটির ওপর যদি টোকেন রাখা হয় তাহলে যত নম্বর ঘর ততগুণ পেমেন্ট পাওয়া যাবে। স্রেফ ভাগ্য পরীক্ষা। এরই এমনি চেহারা দেখেছি পশ্চিমবাংলার গ্রামে গঞ্জে মেলায়-মেলায়। এমনকি চা-বাগানের রবিবারের হাটেও সাঁওতাল মদেশিয়া কুলিদের পাঁচ দশ পয়সা এই খেলায় বাজি ধরতে দেখেছি।

মেয়েটি বই রেখে এবার উঠে দাঁড়াল। খুব রোগা মেয়ে। মুখশ্রী ব্রণের প্রাবল্যে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এইরকম একটি মেয়েকে বিয়ে করে কিছুদিন আগেও আমাদের দেশের সুপুত্ররা বাড়ি ফিরতেন মেমসাহেব এনেছি বলে। হঠাৎ খেয়াল হল, কুড়ি পঁচিশ বছর আগে যে রেটে বাঙালি ছেলেরা পড়তে এসে মেমসাহেব বিয়ে করত এখন সেটা একেবারেই কমে গিয়েছে। এর কারণ যদি ভাবা হয়, আমাদের ছেলেরা হয় চালাক-চতুর নয় বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে গেছে এখন, তাহলে খুশি হওয়ার কারণ ঘটবে। কিন্তু উলটোদিকে এই সাধারণ মেয়েরাও এখন ভারতীয় যুবকের চেয়ে নিগ্রো যুবককে বেশি গ্রহণীয় মনে করছেন সেটা না ভাবার কোনও কারণ নেই। মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি আপনার ভাগ্য পরীক্ষা করবেন?' বেচারার গলার স্বর শুনে মনে হল সকাল থেকে ভরপেট খাওয়া জোটেনি। বললাম, ওকে খুশি করতেই, 'আপনাকে দিয়ে আমার ভাগ্যটা যাচাই করলে কেমন হয়।'

দ্রুত মাথা নাড়ল মেয়েটি, 'না। আমার ভাগ্যটা কীরকম তাতো বুঝতেই পারছেন। নইলে এইরকম ওয়েদারে আমাকে এই টুলে বসে থাকতে হয়।'

বাহ্! মেয়েটাকে ওপর থেকে দেখে যা মনে হয় তা তো নয়। এই সময়ে টগবগে এক যুবক আমার পাশে এসে দাঁড়াল। সদ্য ঢুকেছে সে। দশ নম্বর ঘরে এক পাউন্ডের টোকেন রেখে সে চালাতে ইশারা করে বলল, 'আজকের দিনটা কেমন যাবে এটা থেকেই বুঝে নিই। মনে-মনে নিজেকে হুঁশিয়ার করলাম। এরকম চালাকি আমি অনেক জানি। খদ্দের গাঁথবার জন্যে জুয়াড়িরা সাজানো লোককে দিয়ে প্রথমে খেলিয়ে জিতিয়ে দেয় যাতে দর্শক প্রলুব্ধ হয়। হুইল ঘুরল বনবন করে। এই সময় যুবক বলল, 'স্টপ' সঙ্গে-সঙ্গে সুইচ অফ করল মেয়েটি আর হুইলটার গতি কমে

এগিয়ে আসছে ইস্পাতের ফলার দিকে। না। সেটা পেরিয়ে গেল এবং ইস্পাতের ফলার পেরেক যে ঘরটাকে চিহ্নিত করল তাতে লেখা আছে, 'সরি।'

যুবক কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে গেল অন্য টেবিলে। মেয়েটি টোকেন তুলে নিয়ে বাক্সে ফেলল। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'টোকেন রাখবে না?'

মাথা নাড়ালাম, 'তোমার কাছে আমার ভাগ্যটা তো এখনই জানতে পারলাম। হেঁটে গেলাম ওপাশের একটা কাঁচের বাক্সের সামনে। এখানে কোনও মেয়ে নেই। এক পাউন্ড লাভ হল। যুবকের বদলে আমি খেললে তো এক পাউন্ড হারতাম। হারিনি সেটাই লাভ। প্রায় এক মানুষ লম্বা কাঁচের বাক্সটির তিনটে খোপ। তিন খোপে তিনরকমের তাসের ছবি। এক পাউন্ডের টোকেন গর্তে ফেললে বাঁ-দিকের খোপে আলো জ্বলে উঠবে। এবার বাঁ-দিকের খোপের দিকে যে নবটা আছে তা তিনবার ঘোরানো যাবে। ঘোরানো মাত্র টেক্কা থেকে রাজার মধ্যে তাসের ছবি ফুটবে। সেই ছবিটাকে রেখে দুই এবং তিন নম্বর নব দুটোকে তিন-তিনবার ঘুরিয়ে যদি ট্রায়ো তৈরি করতে পারা যায় তাহলে তিরিশ ডলারের টোকেন বেরিয়ে আসবে। যদি জোড়া হয় দুই ডলার আসবে। নইলে কিছুই নয়। কিছুটা সময় নিয়ে ভেবে সরে এলাম। না, এটাও আমার নয়। লম্বা একটা টেবিল। টেবিলের এক প্রান্তে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক থেকে দশ নম্বর লেখা দশটি প্লাস্টিকের ঘোড়া। টেবিলের প্রান্তে ঘোড়ার নম্বর অনুযায়ী গর্ত রয়েছে। এক পাউন্ড পছন্দমতো ঘোড়ার গর্তে ফেলে দিতে হবে। সুইচ টিপলেই রেস শুরু হবে। যে ঘোড়া জিতবে তার ওপর বাজি ধরলে পেমেন্ট পাওয়া যাবে। দূরে দাঁড়িয়ে দেখলাম একবার এক নম্বর ঘোড়াটা জিতল। তার পরের বার পাঁচ নম্বর। তৃতীয়বার এক নম্বর। এইভাবে সাতটি রেসের মধ্যে চার বার এক জিতেছে এবং বাকি তিনটে দুই থেকে পাঁচের মধ্যে ভাগ হয়েছে। রেস হচ্ছে কম্পিউটার মেশিনের মাধ্যমে। অঙ্কটা এমন গড় পড়তায় কোম্পানির ক্ষতি হবে না ওইভাবে এক জিতে গেল।

যাই বলুন, এইসব দাঁড়িয়ে দেখায় এক ধরনের নেশা আছে। ভালোমন্দ বিচার অন্য কথা। মানুষের রক্তে জুয়ার নেশা থাকবেই। যারা খেলছে পরিণতি জেনেই খেলছে।

একটা টেবিলে দেখলাম বেশ ভিড়। এক বৃদ্ধা টেবিলের ওপাশে, এপাশে এক বৃদ্ধ। বৃদ্ধার সামনে টোকেনের পাহাড়। অন্তত শ-পাঁচেক পাউন্ড বলে মনে হল। বৃদ্ধের সামনে পাউন্ডপাঁচেক অবশিষ্ট। তাঁকে বেশ ভেঙে পড়া মানুষ বলেই মনে হচ্ছে। যে দেখবে সেই বুঝবে ভদ্রলোক খুব হারছেন। দুটি লাল গেঞ্জি পরা মেয়ে টেবিলের দুপাশে। তারা হিসাব রাখছে। যে জিতবে তাকে শতকরা পনেরো ভাগ ক্যাসিনোকে দিতে হবে। আর এ ছ-সাত জন দর্শক আগ্রহ নিয়ে খেলা দেখছে। তাদের কেউ কেউ বৃদ্ধকে বলছে, 'ও জন, ইউ মাস্ট স্টপ।' জন মাথা নাড়ছে 'নো নেভার।'

খেলাটা হল বৃদ্ধা, যিনি জিতছেন, তাস সাফল করে প্রতিপক্ষকে একটি এবং নিজে একটি তাস উলটো করে দেবেন। জনকে দেখলাম তাসটি তুলে নিয়ে গোপনে হাতের আড়ালে রেখে দেখল ওটা ছয়। টেবিলে বাজি বাবদ চার পাউন্ডের টোকেন রাখা হয়েছে দু'পক্ষ থেকে। বৃদ্ধা নিজের তাস দেখে বললেন, 'কাম অন জন, তুমি কি সেকেন্ড তাসটা নেবে?'

কোনও খেলোয়াড় যদি মনে করে তার তাসটা নয়ের অনেক নীচে তাহলে সে ইচ্ছে করলে দ্বিতীয়বার তাস তুলতে পারে। দ্বিতীয় তাসটার নম্বর প্রথমটার সঙ্গে যোগ হওয়ার পর মোট যে নম্বর হবে সেটাই তার নম্বর। জন কাঁপা-কাঁপা হাতে দ্বিতীয় তাসটা তুলে নিল। সাত। অর্থাৎ সাত আর আগের ছয় মিলে হল তেরো। তেরোর এক আর তিন জুড়ে চার। জনের নম্বর কমে গিয়ে হল চার। জন যদি টেক্কা দুই অথবা তিন তুলতেন তাহলে নম্বরটা বেড়ে যেত। বৃদ্ধাকে দেখলাম না দ্বিতীয়বার তাস টানতে। লাল গেঞ্জির মেয়েটি বলল, 'শো ইওর কার্ডস।' তাস দেখমাত্র বৃদ্ধা হাততালি দিয়ে টোকেনগুলো নিজের দিকে টেনে নিলেন। তাঁর তাসের নম্বর পাঁচ। জন যদি দ্বিতীয়বার তাস না টানতেন তাহলে তিনিই জিতবেন। এই তাসের প্যাকেটে সাহেব থেকে দশ পর্যন্ত তাসগুলো

সরিয়ে রাখা হয়েছে। যার এক বা দুইবারে নয়ের কাছাকাছি হবে সেই জিতবে। হঠাৎ জন দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলেন। সবাই ওঁকে বলতে লাগলেন বাড়িতে ফিরে যেতে। কিন্তু তিনি নড়ছেন না। বৃদ্ধা উসখুস করে বললেন, 'যদি তোমার খেলার টোকেন থাকে তাহলে আমি খেলতে পারি নইলে চলে যাচ্ছি।' জন হাত চোখ থেকে সরিয়ে এক পাউন্ডের টোকেনের দিকে হাত বাড়ালেন। সেটাই তাঁর শেষ সম্বল। মানুষটাকে দেখে মায়া হচ্ছিল। মনে হলো বৃদ্ধা জনের ওপর এক ধরনের মানসিক চাপ তৈরি করে জিতে যাচ্ছেন। তা ছাড়া কার্ড-লাক বোধহয় আজ ভালো নয়। কথায় আছে যার লাভ লাক ভালো তার কার্ড লাক ভালো হয় না। আবার সেইভাবেই উলটোটা হয়। হঠাৎ জনের কাঁধে হাত রাখলাম। ভদ্রলোক আমার দিকে কাতর চোখে তাকালেন। বললাম, 'তোমার হয়ে আমাকে দুখানা দান খেলতে দেবে?'

'আমার হয়ে?' জন অবাক হল।

'হ্যাঁ। তোমার এক আর আমার পাঁচ মোট ছ'পাউন্ডের খেলব। যদি জিতি তুমি আমায় পাঁচ পাউন্ড ফেরত দিয়ে দিয়ো।' আমি হাসলাম। জন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সম্ভবত তাঁর ওঠার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অসম্মানিত হওয়ার ভয়ে উঠতে পারছিল না। জনের চেয়ারে বসে আমি তিন পাউন্ডের টোকেন মাঝখানে এগিয়ে দিলাম। বৃদ্ধা আমার দিকে এক পলক দেখে নিয়ে বললেন, 'সো ইউ আর অ্যাক্টিং অ্যাজ এ জকি অফ জন? গুড লাক।' সাফল করে আমার দিকে একটা তাস এগিয়ে দিলেন মহিলা। আমি হাত বাড়ালাম।

তাসটা তুলে সামনে ধরতেই জনের দীর্ঘ নিশ্বাস আমার কানে এল। টেক্কা। টেক্কা মানে এক। বৃদ্ধার তাস দুই থেকে নয় হলেই তিন পাউন্ড হার। অতএব দ্বিতীয় কার্ডটা তুললাম। দুই। অর্থাৎ যোগ ফল তিন। পাঁচ থেকে নয় বৃদ্ধার হতেই পারে। আমার ভাগ্য জনকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করছে না; এসব ভেবেছি এক সেকেন্ডের চেয়ে কম সময়ে। এবং তখনই গবুর কথা মনে পড়ল। তাস তুলেই এমন ভাব করত যেন সেরা তাস পেয়েছে। আমি শিস দিলাম এবং জিতে গেছি এইরকম ভঙ্গিতে জনের দিকে তাকালাম। বৃদ্ধা এতক্ষণ সহজ ছিলেন। নিজের তাস দেখে, এবার অস্বস্তিতে পড়লেন। প্রতিপক্ষের নিশ্চিতভাব তাঁকে একটু টলাল। তাসের নম্বর বাড়াবার জন্যে দ্বিতীয় তাসটা টানলেন তিনি। লাল গেঞ্জি পরা মেয়েটি বলল, 'শো'। বৃদ্ধা তাস দিয়েছেন অতএব আমাকেই দেখাতে হবে। টেক্কা আর দুই দেখে উদ্‌গ্রীব দর্শকরা হতাশ-শব্দ উচ্চারণ করল। বৃদ্ধা তাস নামালেন। ছয় আর পাঁচ। দুটো মিলে এগারো, এগারো মানে দুই। আমি তিন আর বৃদ্ধা দুই। জন এমন গলায় চিৎকার করে উঠল যেন হাজার পাউন্ড জিতেছে। আমার কাঁধে একটা চড় মেরে বলল, 'ক্যারি অন ব্রাদার।' কিন্তু ঘরে এল তিন পাউন্ড বাড়তি। আমি নিলাম না। আমার তিন বৃদ্ধার তিন, অর্থাৎ মোট ছয় পাউন্ড মাঝখানে রেখে তাস টেনে নিলাম। যে দাম পাবে সেই দেবে। অভিজ্ঞরা বলেন, ভাগ্যলক্ষ্মীর দর্শন পাওয়া বিরল ব্যাপার। কিন্তু আচমকা যদি তিনি স্নেহবর্ষণ করেন তাহলে তার জের চলে কিছুক্ষণ। সেই সময়ের মধ্যে যা জেতার জিতে নিতে হয়। অতএব আমি এবার ছয় পাউন্ড ধরলাম। নয় উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে মন বলল, আর পেছনে তাকানো নেই। দেড় হাজার পাউন্ডের টোকেন যখন আমার দিকে, তখন বৃদ্ধা বললেন, 'থ্যাংক ইউ জন, বাট আই উইল ট্রাই সাম আদার ডে।' বলে তিনি ধীরে-ধীরে টেবিল ছেড়ে চলে গেলেন। দর্শকরা তখন আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। জন আমার বাজু ধরে থরথর করে কাঁপছে। লাল গেঞ্জি পরা মেয়ে হিসেব করে ক্যাসিনোর কমিশন নিয়ে নিল। জনের হাত ছাড়িয়ে আমি বললাম, 'আমাকে সুযোগ দিয়েছেন বলে ধন্যবাদ। চলি। জন যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'সে কী? তোমার জেতা টোকেনগুলো নিয়ে যাও।' বললাম, 'আমি তোমার হয়ে খেলেছি। জিতেছ তুমি, আমি নই।' বলে নিজের তিন পাউন্ড তুলে নিলাম। দর্শকরা সম্ভবত ভাবছিল আমি সব টোকেন দাবি করব। কিন্তু ব্যাপারটা শোনার পর তারা হইচই করতে লাগল। সবাই জনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে খাওয়াতে বলছিল। জনের চোখ আমার দিকে। আমার খুব ভালো লাগছিল।

ক্যাসিনোটাতে তিনটে পাক দিয়ে পালকে খুঁজে পেলাম বার কাউন্টারে। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আর পাল গল্প করছে। ভদ্রলোক এই ক্যাসিনোর মালিক। শরীরের চামড়া কুঁচকে গিয়েছে কিন্তু গলার স্বর তেজি। পাল আলাপ করিয়ে দেওয়ামাত্র ভদ্রলোক পেছন ফিরে বললেন, 'ওঁকে একশো ড্রিংক দাও অ্যালিস।'

হাত জোড় করলাম, 'না, এই সময়ে আমি মদ্যপান করি না।' লাল গেঞ্জি পরা একটি মেয়ে এগিয়ে এসেছিল, আমায় অপাঙ্গে দেখে ভদ্রলোকের কানের কাছে মুখ নামিয়ে কিছু বলল। বাল্যকাল থেকে তৃতীয়জনের সামনেও এভাবে কথা বলাকে অত্যন্ত অভদ্র ব্যাপার বলে ধরা হয় এবং সেটা ব্রিটিশরাই আমাদের শিখিয়েছেন। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে তো সবকিছুই মেনে নেওয়া যেতে পারে।

সন্দেশটি শুনে ভদ্রলোক যেন চমকে তাকালেন, 'ইজ ইট? আপনি একটু আগে কার্ডে দেড় হাজার পাউন্ড জিতেছেন?'

'আমি নই, যার হয়ে খেলেছিলাম জিতেছেন তিনিই।' বলামাত্র লাল গেঞ্জি সপ্রশংস চোখে বলল, 'আপনি ব্যতিক্রম। আপনার মতো মানুষ আমি দেখিনি।'

আমি ঈষৎ মাথা নোয়ালাম। আজকাল বুঝেছি প্রশংসা পাওয়ার সময় লজ্জিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। ওটা বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করতে হল।

বৃদ্ধ আমাকে বসতে বললেন। ক্যাসিনোর হইচই এখানে ভেসে আসছে না। ভদ্রলোকের নাম এড বায়রন। হেসে বললেন, 'না না। কবির সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক নেই। কবিতা আমার আসেও না। পঞ্চাশ বছর ধরে ক্যাসিনোর ব্যাবসা করছি। এবার বন্ধ করতে হবে। তোমাদের ইন্ডিয়াতে ক্যাসিনো আছে?'

মাথা নাড়লাম, 'না।'

'হুম্। ইন্ডিয়ানরা খুব কনজারভেটিভ হয়।'

'এটা আমি ব্রিটিশদের সম্পর্কেও শুনেছি।'

'সে একটা সময় ছিল। তোমাদের দেশে আমাদের কীরকম চোখে দেখা হয় এখন?'

'স্বাভাবিক। আর পাঁচটা বিদেশির মতোই।'

'কোনও বিদ্বেষ নেই এতো বছর কলোনি করে রেখেছিলাম বলে?'

'না। আমরা খুব দ্রুত ভুলে যেতে ভালোবাসি।'

'আচ্ছা। শুনেছি ব্রিটিশরা চলে এলেও তোমরা তোমাদের বিচার ব্যবস্থা, পুলিশি ব্যবস্থা নাকি ব্রিটেনের প্যাটার্নেই রেখেছ। এটা ঠিক নয়।'

'কারও ভালো ব্যাপারটা গ্রহণ করতে আপত্তি কী?'

'আপত্তি নেই। কিন্তু ধরো ব্রিটিশরা তাদের সুবিধের জন্যে উনিশশো একুশ সালে ভারতবর্ষে একটা আইন করেছিল। এখনও সেটাকে তোমরা আঁকড়ে থাকবে কেন?'

এড সাহেবের কথা সত্যি বলে মনে হল। প্রায়ই তো আমরা বলে থাকি এটা ব্রিটিশ আমল থেকে চলছে। খবরের কাগজে বের হয় পুলিশ কিছু করতে পারছে না কারণ এই ব্যাপারে ব্রিটিশদের করা আইনের পরিবর্তন হয়নি। কেন হয়নি তা কে বলবে? কাগজে দেখলাম একটি মানুষ আর একটি মানুষকে হত্যা করলে যাবজ্জীবন কারাবাস হতে পারে। কিন্তু জেনেশুনেও একজন আর একজনকে গাড়ি চাপা দিলে দু-বছরের বেশি শাস্তি হয় না। এক্ষেত্রেও নাকি ব্রিটিশদের করা আইনকেই অনুসরণ করা হচ্ছে। শুধু পুলিশি ব্যবস্থা, বা বিচার ব্যবস্থা কেন জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ইংরেজি সভ্যতা যে জায়গা নিয়েছে তা উপড়ে ফেলা মুশকিল। তবে মার্কিনি সভ্যতার প্রাবল্য সেটাকে করে তুলেছে দো আঁশলা। আমরা মোগলদের কাছে অনেকদিন শাসিত হলেও তাদের যতটা ম্লেচ্ছ বলে দূরে সরিয়ে রেখেছি তার চেয়ে অনেক নিবিড় করে নিয়েছি ইংরেজদের। এড বায়রনের মতো লোক সেসব কথা তুলে মনে-মনে আনন্দ পেতেই পারেন।

॥ ৬ ॥

আমাদের আলোচনা অন্য খাতে ঘুরল। খুব অলসভাবে বোস্টনের পুরোনো দিনের জাবর কাটছিলেন এড। সে এক সুখের সময় ছিল। তখন বড়দের ছোটরা মান্য করত। স্ত্রীলোকরা স্ত্রীলোকদের মতোই ব্যবহার করত। এত ভিড় ছিল না রাস্তায়। সম্ভ্রম হারিয়ে বেঁচে থাকার কথা মানুষে চিন্তাও করতে পারত না। হেসে বললাম, 'ইংল্যান্ডে যে এত এশিয়ান আফ্রিকানের ভিড় তার জন্যে দায়ী কিন্তু আপনারাই।'

'কেন?' এড অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'আপনারা যদি সমস্ত পৃথিবী জুড়ে কলোনি তৈরি করার জন্যে বেরিয়ে না পড়তেন তাহলে সেইসব দেশের মানুষ এখানে আসার কথা ভাবতই না। একসময় ব্রিটেন তার কলোনি থেকে অজস্র সম্পদ তুলে নিয়ে এসে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে আজ তো তার মূল্য কোনও না কোনওভাবে দিতেই হবে।' কথাগুলো এডকে খুব প্রসন্ন করল বলে মনে হল না। পাল উঠে দাঁড়াল, 'বলল, চলুন, আর একটু পাক দিই।' সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে গেল বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। ঠান্ডা বাতাস বইছে। এই আবহাওয়ায় রাস্তায়-রাস্তায় ট্যাঙস-ট্যাঙস করে ঘুরতে মোটেই ইচ্ছে করছে না। এডকে বিদায় জানিয়ে ঘরের বাইরে এসে পাল বলল, 'যে মুদি আমার রেস্টুরেন্টে জিনিসপত্র সাপ্লাই দেয় তার সঙ্গে আধঘণ্টাটাক বসব। আপনার একটু খারাপ লাগতে পারে।'

'তার চেয়ে আমি ক্যাসিনোতেই অপেক্ষা করি আপনি যাওয়ার সময় আমাকে ডেকে নেবেন।' হাঁটাহাঁটি থেকে বাঁচবার জন্যে চটপট বলে ফেললাম। এই সময় সেই লাল গেঞ্জি যে আমার প্রশংসা করছিল এডের সামনে এগিয়ে এল কাছে, 'হাই পল!'

পাল বলল, 'ইয়েস?'

লাল গেঞ্জি বলল, 'তোমার বন্ধুর ব্যাখ্যা এডের ভালো না লাগলেও আমার পছন্দ হয়েছে।'

পাল হাসল, 'আমার বন্ধুর আর কী কী তোমার পছন্দ হয়েছে অ্যালিস?'

অ্যালিস বলল, 'তা কী করে বলব? আমি তো ওকে চিনিই না।'

পাল বলল, ' ওহো, আমি আলাপ করিয়ে দিই। সমরেশ আমার গেস্ট, ইন্ডিয়া থেকে এসেছে, একজন লেখক আর এ হল অ্যালিস, রিসার্চ করছে আর এখানে পার্ট টাইম কাজ করে।' অ্যালিস আমার দিকে হাত বাড়াল। মেয়েটির হাত বড্ড নরম। অথচ লম্বায় পাঁচ ফুট সাত হাত তো হবেই। পাল চলে গেল। বলে গেল যাওয়ার সময় আমাকে ডেকে নিয়ে যাবে। অ্যালিস বলল, 'এখানকার সবাই তোমাকে নিয়ে আলোচনা করছে। এরকম কাণ্ড কেউ এর আগে দ্যাখেনি। তুমি কী লেখো?'

'গল্প। তুমি কী নিয়ে রিসার্চ করছ?'

'আমি অঙ্কের ছাত্রী।'

'ওরে বাব্বা। তাহলে তো তোমার বিষয় আমি কিছুই বুঝব না। কিন্তু অঙ্ক নিয়ে যে মেয়ে রিসার্চ করে সে কেন এই ক্যাসিনোয় কাজ করবে?'

'এখানে আমার মা থাকে। মাসখানেকের জন্যে মায়ের কাছে এসেছি। বাড়িতে বসে থাকার চেয়ে কিছু রোজগার করা তো অনেক ভালো। লন্ডনেও আমি রোজ বিকেলে ম্যাকডোনাল্ডে কাজ করি। আর ছ'মাসের মধ্যে পেপার সাবমিট করতে পারব। তারপর ওটা অ্যাপ্রুভড হলে কোথাও পড়াতে যাব।' অ্যালিস হাসল। এবং তখনই তার ডাক পড়ল। হাত নেড়ে যাচ্ছি বলে সে আমায় জানাল, 'ডিউটির সময় গল্প করা ঠিক নয়। আমার মায়ের বাড়ি তিন নম্বর বার্ক লেনে। সন্ধের পর চলে আসুন, যদি কোনও কাজ না থাকে। বাই।' অ্যালিস চলে গেল।

খুব ভালো লাগল। তুলনা করে লাভ নেই। আমাদের দেশের সাধারণ কাজগুলোর পরিবেশ আমরাই এমন বিশ্রী করে রেখেছি যে ছাত্রছাত্রীরা সেখানে যেতে ভরসা পায় না। তা ছাড়া যে

দেশে বেকারের সংখ্যা অগুনতি সেখানে পকেটমানির জন্যে কোনও ছাত্র কাজ পাবে কী করে? এখনও এম.এ. পাস করেও অনেক মেয়ে মাত্র ছ'শো টাকায় খবরের কাগজ অথবা ছোটখাটো অফিসে চাকরি নিতে বাধ্য হয়। ছাত্রাবস্থায় যেটা ভাবতে চায় না তারা ডিগ্রি পাওয়ার পর সেটা মানতে অসুবিধা হয় না। দুপকেটে হাত ঢুকিয়ে খানিকটা এগোতেই দেখলাম দুটো হাত তুলে চেঁচাতে-চেঁচাতে জন আমার দিকে ছুটে আসছে, 'হ্যালো জেন্টলম্যান, আমি তোমাকে তখন থেকে খুঁজে মরছি। তুমি যে ক্যাসিনো থেকে বেরিয়ে যাওনি সেটা বুঝতে পেরেছি বলেই এখানে দাঁড়িয়ে আছি শেষ পর্যন্ত। আগে বলো তোমার নাম কী?'

নাম বললাম, জন তিন-চারবার চেষ্টা করে বলল, 'সমরেশ। আমি তোমার কাছে প্রচন্ড কৃতজ্ঞ। না না, তুমি না বোলো না। খুব কাছেই আমার বাড়ি। সেখানে একবার তোমাকে যেতে হবে। কাম অন।' জন আমার হাত ধরল।

ছোটখাটো চেহারার বৃদ্ধ মানুষটির গলায় আন্তরিকতা ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কেন আমাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইছেন?'

'তোমাকে নিজের হাতে কফি তৈরি করে খাওয়াব বলে। তুমি কফি খাও তো?'

পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ এখন অকৃতজ্ঞ। বাকি অর্ধেকের নিরানব্বুই ভাগ ঠিকঠাক জানেন না কীভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয়। এক ভাগ জানেন। বৃদ্ধকে শেষ শ্রেণিতে ফেলব কি না যখন ভাবছি তখন আমি ওভারকোট পরে রাস্তায়। বেরুবার আগে এডকে বলে এসেছি যেন তিনি পালকে জানিয়ে দেন ব্যাপারটা।

শীত আরও বাড়ছে। আসলে হাওয়া বাড়লেই শীত বাড়ে। দুপাশের বাড়িগুলোও যেন জবুথবু হয়ে রয়েছে। মাথা নীচু করে জন হাঁটছিল। হঠাৎ বলল, 'ইন্ডিয়াতে সবসময় আলো ঝলমলে দিন, না? আচ্ছা সেখানকার বুড়োদের বড় আরাম।'

জনকে আমার খুব পছন্দ হল এই একটা কথায়ই। কোনও ইংরেজের বাড়িতে এই প্রথম যাচ্ছি। ধরে নিতে পারি জনের ছেলেমেয়ে আলাদা থাকে। ওঁর স্ত্রী মিশুকে হলেই বাঁচি।

বড় রাস্তা ছেড়ে একটা গলির মধ্যে ঢুকলাম। বাঁ-হাতের তিন নম্বর বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে পকেট থেকে চাবি বের করল জন। দরজা খুলে বলল, 'আসুন।'

যত্ন করে আমার ওয়াটারপ্রুফ খুলে দেওয়ালে ঝুলিয়ে দিল জন। তারপর আলো জ্বলতে লাগল একের পর এক। তিনখানা ঘর তার। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমরা বসার ঘরে বসলাম। ফার্নিচারগুলোর বয়স হয়েছে কিন্তু ওরা বেশ যত্নেই আছে। পৃথিবীর সমশ্রেণি সাপেক্ষে মানুষের বসবাসের ধরন বোধহয় একই। আমি এই বাড়িটিকে স্বচ্ছন্দে ইলিয়ট রোড রিপন স্ট্রিটের মধ্যবিত্ত বাড়ি হিসেবে ভাবতে পারি। দেওয়ালে দুই বৃদ্ধবৃদ্ধার ছবি, একটা টিভি, সোফাসেট, একটা ছোট কাচের আলমারিতে বইপত্তরের সঙ্গে কিছু টুকিটাকি, টেবিলে পরিষ্কার অ্যাসট্রে। জন কি ব্যাচেলার? বাড়িতে আর কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। যতদূর জানি ব্যাচেলাররাই খুব খুঁতখুঁতে হয় এবং সেই কারণেই পরিষ্কার থাকে। আমাদের বন্ধু মুকুন্দ যেমন। তার ফ্ল্যাটে গেলে যে-কোনও গোছানো মেয়ে ঈর্ষান্বিত হবেন। একটি ব্যাচেলার পঞ্চাশের কাছে এসেও রোজ ফুলদানিতে যত্ন করে রজনীগন্ধা পালটায়, গোলাপ গাছ টবে পুঁতে জল দেয়, বিছানার চাদর এবং বালিশের ওয়াড়ে এক ফোটা ময়লা পড়তে দেয় না। আমাদের এক বন্ধুদম্পতির বাড়িতে মুকুন্দ এক রাত ছিল। পরদিন সে চলে যাওয়ার পর বন্ধু-পত্নী আবিষ্কার করেছিলেন যে তাঁদের বাড়ির পুরোনো অ্যাসট্রেটাকে মুকুন্দ ধুয়ে ঝকঝকে করে গেছে। এবং তখনই তিনি স্বামীকে সেটা দেখিয়ে ভর্ৎসনা সহ উপদেশ দিয়েছিলেন যেন মুকুন্দর কাছ থেকে জীবন কীভাবে যাপন করা উচিত তা শিক্ষা নেয়। বন্ধু আমায় টেলিফোনে এই খবর দিল্লি থেকে জানিয়ে বলেছিল, 'খবরদার, কোনও ব্যাচলারকে বাড়িতে ঢোকাবেন না।'

মনে হচ্ছে জন আর মুকুন্দর মিল আছে। দুজনের বয়সের প্রচুর পার্থক্য সত্ত্বেও।

দু-কাপ কফি ট্রে-তে চাপিয়ে জন ঘরে এল। যত্ন করে একটি কাপ ধরিয়ে দিয়ে বলল 'খেয়ে দ্যাখো, পছন্দ হয় কি না। তুমি নিশ্চয়ই চিনি বেশি খাও না?'

চুমুক দিয়ে ভালো স্বাদ পেলাম। মিষ্টি যদিও নেই বললেই হয়। মনে হল একটু কষ্ট করি। শরীরের যত্ন তো নেওয়াই হয় না। তেতো কফি খেয়ে একটু সামঞ্জস্য আনা যাক। জিগ্যেস করলাম,

'আপনি এখানে একা থাকেন?'

'হ্যাঁ ভাই। ডিভোর্সের পর থেকে একদম একা।'

'ছেলেমেয়ে নেই?'

'নাঃ। হয়নি।'

'কিছু যদি মনে না করেন, আজ অমন পাগলের মতো জুয়ো খেলছিলেন কেন?'

'মাঝে-মাঝে জেদ চেপে যায়। দ্যাখো হে, জুয়ো খেলার ব্যাপারে আমি খুব সমঝে চলি। সারা জীবনের সঞ্চয় যা এখানে-ওখানে ইনভেস্ট করেছি তা থেকে মাসের খরচ চলে যায়। জুয়োর জন্যে বরাদ্দ তিরিশ পাউন্ড। আজকের ব্যাপারটা ছেড়ে দাও। তুমি না এলে এই মাসটা আমাকে না খেয়ে থাকতে হত।'

'জুয়োর জন্যে বরাদ্দ রেখেছেন যখন তখন বোঝা যাচ্ছে নিয়মিত জুয়ো খেলেন।'

'হ্যাঁ। নইলে সময় কাটবে কী করে? আমি খুব ভোরে উঠি। কফি খেয়ে মর্নিং ওয়াকে বের হই। কাগজ নিয়ে ফিরে এসে ব্রেকফার্স্ট বানাই। তারপর কাগজ পড়া শেষ হয় সকাল ন'টায়। তারপর তো আর কিছু করার নেই। বইপত্তর পড়তে ভালো লাগে না। কোনও কালে অভ্যেসও ছিল না। মাঝে-মাঝে লাঞ্চ বাড়িতেই বানাই, বাইরেও খাই। দুপুরে ঘুম আসে না। শরীর উত্তেজনা চায়, সময় কাটাবার উত্তেজনা। এক পাউন্ডের জুয়ো খেলি রোজ। সন্ধের পর বাড়ি ফিরে খেয়ে দেয়ে ঘুম। বুড়োদের সঙ্গে মিশতে পারি না। প্রত্যেকের বুকে আফশোশের পায়রা বকম-বকম করছে।' জন কফিতে চুমুক দিলেন। 'আপনি কিন্তু এক নয় কয়েকশো হারছিলেন আজ।' ঠিক। কিছুদিন হল বাড়িতে সময় কাটানোর জন্যে রেসের ওপর গবেষণা করছিলাম। এটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। লন্ডনে রেস হয়। এখানে বুকি আছে। কিন্তু আমি আজ পর্যন্ত রেস খেলিনি। আগের দিন যেসব ঘোড়া দৌড়োবে তাদের লিস্ট নিয়ে বসি। আমার ফরমুলা দিয়ে হিসেব কষি। রেসের পরে কাগজ পড়ে জেনে নিই আমার পছন্দের ঘোড়াগুলো জিতল কি না। রোজ সিক্সটি ফরটি মেলে। আজ কাগজ খুলে দেখলাম সবকটা মিলে গেছে। খুব আনন্দ হল। আমি তো একটা পেনিও খেলিনি। কিন্তু ক্যাথি যখন চ্যালেঞ্জ করল তখন ভাবলাম রেস খেললে যখন গুডলাক হত তখন তাসেও হারব না। উলটো হয়ে গেল ফলটা।'

'লন্ডনে রেস নিয়মিত হয়?'

'নিয়মিত মানে? সপ্তাহে অন্তত দুবার গোটাপাঁচেক মাঠে রেস হয়। আমি এ্যারসনের মাঠটাকে ফলো করি। এই যেমন, আগামী সপ্তাহে ডার্বিতে 'সিওর চ্যাম্পিয়ন' নামের একটা ঘোড়া জিতবেই। ফর্মুলা তাই হবে।'

জন থামতেই বেল বাজল। জন বলল, 'কে এল। এখন তো কারও আসার কথা নয়।' বললাম, 'আমি দেখব?'

আপত্তি করতে গিয়েও জন হেসে ফেলল, 'এ বাড়িতে আজকাল আমি ছাড়া আর কেউ দরজা খোলে না। ব্যতিক্রম হলে ভালো লাগবে আমার। তবে সেলসম্যান হলে বিদায় কোরো।' জন চলে গেল কিচেনে। এ বাড়ির দরজা জন ছাড়া কেউ খুলে দেয় না। দরজার দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় ভাবতে চাইলাম জন কি আফশোশ করল?

দরজা খুলতেই চমকে উঠলাম। আপাদমস্তক ঢেকে রাস্তা ভেঙে এসেছেন কিন্তু মুখ আমি ভুলব কী করে? আমাকে দেখেও তিনি অবাক হলেন। হয়তো ঢুকবেন কি না ভাবছিলেন।

বললাম, 'আসুন।'

'জন নেই?'

'আছেন?'

'তাহলে তুমি দরজা খুললে কেন?'

'উনি একটু ব্যস্ত বলে।'

পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন আমার দরজা খোলা তিনি অপছন্দ করেছেন। সেইভাবেই ভেতরে ঢুকলেন। বসার ঘরে ঢোকার আগে নিজের ওভারকোট খোলার চেষ্টা করতেই আমি তাঁকে সাহায্য করলাম। তিনি একটা কাঠখোট্টা ধন্যবাদ দিয়ে সোফায় গিয়ে বসলেন। অবশ্যই ষাট পেরিয়েছে বয়স, একদা সুন্দরী ছিলেন এবং সেইসঙ্গে স্বাস্থ্যবতী, এখনও প্রসাধন ও পোশাকে সেই চটক ধরে রাখার চেষ্টা আছে। বটুয়া খুলে আয়না বের করে ঠোঁটে লিপস্টিক বুলিয়ে নিলেন। আমার ভালো লাগছিল। বাঙালি মেয়েরা এককালে পঁয়ত্রিশ পার হলেই শাড়ির রং সাদার দিকে নিয়ে যেত। চল্লিশে প্রসাধনদ্রব্য ছুঁয়েও দেখত না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজেকে বুড়ি বানাবার প্রতিযোগিতায় নেমে যেত। যদি তার তরুণী মেয়ে থাকত তাহলে তো কথাই ছিল না। আজ পঞ্চাশেও রঙিন শাড়ি হালকা মেক-আপ নেন সকলে। ষাটে সেটা করতে চান না। কেন চান না তা বোঝা অসাধ্য। মেয়েরা, তিনি যে বয়সেরই হোন, সাজলে আমার ভালো লাগে। বাঙালি মেয়ে পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশে উঠেছে পঁচিশ বছরের মধ্যে। বেঁচে থাকতে-থাকতে ষাট পর্যন্ত উঠতে দেখে যাব আশা রাখি।

ভদ্রমহিলা আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করছেন। উনি কেন এখানে এসেছেন তা আমি বুঝতে পারছি না। জনকে খবর দেব কি না ভাবছি এই সময় জনের গলা পাওয়া গেল।

'ক্যাথি! কী বিস্ময়! তুমি?'

ভদ্রমহিলা লিপস্টিক বটুয়াতে ঢোকালেন, 'বিস্ময়ের কিছু নেই ওতে। প্রয়োজন হয়েছে বলে এসেছি। এই লোকটি তখন তোমার হয়ে না খেললে আসতাম না।'

জন এগিয়ে এল, 'সামরেশ, আলাপ করিয়ে দিই। সামরেশ ফ্রম ইন্ডিয়া আর ক্যাথি, ক্যাথলিন, আমরা একসময় স্বামী-স্ত্রী ছিলাম, এখন আলাদা।'

ক্যাথি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পলের বাড়িতে উঠেছ?' আমি মাথা নাড়লাম। 'খবরটা কোথায় পেলেন ইনি, এডের কাছে?' তুমি খুব ভালো জুয়ো খেলো ছোকরা। তাসে আমি চট করে হারি না। তুমি না এলে এই বুড়োকে আমি মজা দেখিয়ে দিতাম। শোনো জন, খেলাটা হচ্ছিল তোমার সঙ্গে আমার। তুমি একজনকে হায়ার করে জিতেছ। এই জেতাটা বেআইনি। আমার পাউন্ড ফিরিয়ে দাও।' ভদ্রমহিলা তেজি গলায় বললেন।

'প্রতিবাদটা তখনই করলে চিন্তা করতাম, খেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আর এসব কথা তোলার মানে হয় না ক্যাথি।' জন উলটোদিকের সোফায় বসল।

'কিন্তু আমার পাউন্ড ফেরত চাই।'

'তোমার স্বভাব পালটাল না। শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তুমি জের টানো।'

'আমি কোনও কথা শুনতে চাই না। পাউন্ড না পেলে তোমার বাড়ির থেকে আমি নড়ছি না। এখানেই আমি থেকে যাব।'

'তুমি থাকতে চাইলেই আমি অ্যালাও করব কেন? আমার যে বয়স তাতে একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে রাত কাটানো অসম্ভব।'

তুমি ভালো করে চেনো না কিন্তু পাউন্ডটা জিতিয়ে দিয়েছে বলে বাড়িতে ডেকে এনে কফি খাওয়াচ্ছ। অথচ আমাকে অফার পর্যন্ত করলে না।'

'সামরেশ উটকো লোক হতে পারে কিন্তু জেতার টাকাটা নেয়নি।'

'এটাই ওর পরিচয় আমার কাছে। কফি অফার করলে তুমি খেতে না আমি জানি।'

'কেন? আমি আজকাল কফি খাই।'

'তাহলে ডিভোর্সের পর খাওয়া শুরু করেছ।'

এবার আমি উঠে দাঁড়ালাম, 'জন, আমি চলি। পাল নিশ্চয়ই চিন্তা করবে।'

'আরে না না। তুমি তো এডকে খবর দিয়ে এসেছ।'

'তা হোক। আপনারা কথা বলুন।'

ক্যাথি বলল, 'আমাদের কোনও কথা নেই।'

জন হাসল, 'তোমাকে এ জীবনে বুঝতে পারলাম না ক্যাথি।'

কৌতূহল চাপতে পারলাম না, 'আপনারা কত বছর বিবাহিত জীবন যাপন করেছেন?'

'বাইশ।' জন জবাব দিল।

'ডিভোর্স কবে হয়েছে?'

'আটমাস।'

'উনিও কি একাই থাকেন?'

'তাই তো শুনেছি। আমি যাইনি দেখতে।'

'শুনেছ মানে?' ক্যাথি ফোঁস করে উঠলেন, 'আমি মাইকের দোতলার ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়ে আছি তুমি জানো না?'

'মাইক তোমাকে কী শর্তে থাকতে দিয়েছে তা তো জানি না। মেয়েদের ব্যাপারে মাইকের সুনাম আছে এটা একটা ক্রেশের বাচ্চাও বলবে না।'

'এই জন্যেই তোমার মুখ দেখতে নেই জন। হ্যাঁ, মাইকের চরিত্রে গোলমাল আছে। কিন্তু ভুলে যেও না ওর বয়স আশি।' বলা শেষ করে উঠে দাঁড়াল ক্যাথি। তারপর বলল, 'আমার খিদে পেয়েছে, দেখি কী আছে কিচেনে!'

'ওঃ, নো। তুমি এখন আউটসাইডার, আমার কিচেনে ঢুকবে না।' জন ক্যাথির পেছন-পেছন ছুটল। হতভম্বের মতো আমি দাঁড়িয়ে। ক্যাথির শরীরের তুলনায় জনকে খুবই খর্বকায় দেখাচ্ছিল। মারপিট হলে জনের হার অনিবার্য। ওদিকে কিচেনে জনের তর্জন-গর্জন চলছে। ক্যাথির গলা পেলাম। 'পাউন্ডগুলো ফেরত দাও আমি এখনই এখান থেকে চলে যাচ্ছি।'

ঠনঠন করে কিছু পড়ার শব্দ হল। তারপরেই জন ছুটে এল এই ঘরে, 'মরে গেলেও আমি পাউন্ডগুলো ফেরত দেব না। চিরকাল আমাকে টাকা পয়সা নিয়ে বিব্রত করেছে ও। জীবনে কখনও শুনিনি ডিভোর্স হওয়ার পরেও কোনও মেয়ে তার একলা স্বামীর কিচেনে ঢোকে।' উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিল জন কিন্তু আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম। জনের কপালে লিপস্টিক রাঙানো ঠোঁটের ছাপ স্পষ্ট। বেচারাকে খুব অসহায় লাগছিল। বললাম, 'জন, মুখটা মুছে ফেলুন।' চট করে রুমাল বের করে মুখ মুছল জন, 'ওই তো মুশকিল। ক্যাথি চুমু খেলে আমি কিছু বলতে পারি না। ডিভোর্সের আগে একবছর চুমু খায়নি তাই তো ডিভোর্সটা করতে পারলাম। আজ যে কী হবে তা ঈশ্বর জানেন।'

তবু, বাইরে ঠান্ডার ভেতর হাঁটতে-হাঁটতে আমার কিন্তু ভালো লাগছিল। ক্যাথি নিশ্চয়ই যাওয়ার সময় তাঁর হেরে যাওয়া পাউন্ড নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। কিন্তু আবার আসবে তো? যে অস্ত্রে জন ঘায়েল হয় তা যদি জানা হয়ে যায় তাহলে না আসার কোনও কারণ নেই কিন্তু এতগুলো বছর একত্রিত থেকেও ক্যাথি অস্ত্রটার কথা জানত না তাই বা কেমন করে হয়!

পাল দাঁড়িয়েছিল ক্যাসিনোর দরজায়। বলল, 'শুনলাম জনের বাড়িতে গিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ।' হাঁটতে-হাঁটতে ওকে ঘটনাটা বললাম।

পাল বলল, 'বেচারা জন!'

আমরা বাড়িতে ফিরে এলাম। আজ আর বের হচ্ছি না আমি। এর মধ্যে সন্ধ্যে নেমেছে

আর বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়েছে। চাদর মুড়ি দিয়ে পালের ভি সি আরে রবিনহুড সিরিজ দেখব বলে ঠিক করলাম। পাল বলল, 'কাল আপনাকে নিয়ে ব্ল্যাকপুলে যাব। সমুদ্রের গায়ে জায়গাটা। ভালো লাগবে। আজ কী রাঁধব বলুন।'

'যা খুশি।'

'ইলিশ আর ভাত।' পাল চলে গেল রান্না ঘরে। আমি ভি সি আর চালালাম। এ এক চিরকালীন রূপকথা। রবিনহুডের কাণ্ডকারখানা দেখতে-দেখতে মজে গেলাম। হঠাৎ রান্নাঘরের দরজা খুলে পাল বলল, 'আপনার সেই হিপিদের পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে, জানেন?' মনটা খারাপ হয়ে গেল! সেই নব্যহিপিনী মহিলার মুখ মনে এল। পুলিশ কি তাকেও অ্যারেস্ট করেছে? পঞ্চাশ পেরিয়ে জেলখানার ভাত খেতে হবে তাকে। আমি পালকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানকার জেলে কী খেতে দেয় জানেন?' পাল হাঁ হয়ে আমার দিকে তাকাল 'ভারতবর্ষের জেলগুলো তো ব্রিটিশদের করা। খাবার আলাদা হওয়ার কোনও কারণ নেই। তবে আমি কোনও দিন থাকিনি তো তাই বলতে পারছি না।' এই সময় ফোন বাজল। পাল বাঁ-হাতে রিসিভার তুলে বলল, 'হ্যালো।'

॥ ৭ ॥

টেলিফোন নামিয়ে রেখে পাল বলল, 'মনে হচ্ছে আজকের রাতটা জমবে খুব'। জমে যদি জমুক তবে তার জন্যে আমি কিছুতেই বাড়ির বাইরে যাচ্ছি না। সামনে রবিনহুডের ছবি এখন উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। শেরউড ফরেস্টের গাছে-গাছে তীরন্দাজরা উঠে বসেছে। আমি সেইদিকে মন দিলাম। এই রবিনহুড আমি দেখেছিলাম জলপাইগুড়ির দীপ্তি টকিজে। তখন যে বালক মুগ্ধতা ছড়াত, সে এখন অনেক পোড় খেয়ে, জীবনের অনেক ক্ষত এবং সামান্য সবুজ দেখে মধ্য বয়সে পৌঁছে চট করে মুগ্ধতাকে খুঁজে পায় না, তাকেও ছবিটি টেনে নিয়ে যাচ্ছে ছেলেবেলায়। অনেক ভেবে দেখলাম, যে মানুষের ছেলেবেলায় স্নিগ্ধতা নেই, অ্যাডভেঞ্চার নেই, বিস্ময় নেই, ভালোবাসা নেই বাকি জীবনে সে কিছুই পেতে পারে না। কারণ পাওয়ার পর সেটার মূল্যায়ন করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না।

বোস্টন শহরে বসে ইলিশ মাছ খাওয়ার অভিজ্ঞতা অতি চমৎকার। পাল বলল এখন এই মাছ আসছে সরাসরি বাংলাদেশ থেকে। লোকটি রাঁধেও চমৎকার। একটি বাঙালি ছেলে নিজের সমস্ত বাঙালিত্ব নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে মিশে প্রবলভাবে বেঁচে আছে, ভাবতেই খুব ভালো লাগছে। পালকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানকার ইংরেজরা আপনাকে ঈর্ষা করে না?'

'করে। আমি বলে নয়, যে কোনও ভারতীয়কে এরা ঈর্ষা করে। আফ্রিকানরা এখানে এসে এখনও তেমনভাবে ব্যাবসা করতে বসেনি কিন্তু গুজরাটি আর মাড়োয়ারিরা যেভাবে জুড়ে বসছে তাতে ভারতীয়কে দেখলেই এদের মন অপ্রসন্ন হয়। আর সেই কারণেই আমি এইসব বিক্রি করে দেশে ফিরে যাব ভাবি।'

আমি রাত্রে বের হব না বলতে পাল বিষণ্ণ হল। বলল, 'আরে মশাই, রবিবার থেকে বৃহস্পতি পর্যন্ত বাড়িতেই মুখ গুঁজে থাকি। দুটো দিন তো হাতে। তাও যদি বাড়িতে কাটাই তাহলে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না। ওয়েদারের কথা বলছেন? এখানকার ওয়েদার ওয়েদারের মতো থাকে, মানুষ মানুষের মতো।

'তখন বেরিয়ে তো রাস্তায় মানুষ দেখলাম না। কেউ বের হয়নি।'

'কাল সারারাত জেগে আজ দিনের বেলায় সবাই ঘুমিয়েছে। ন'টার পর বাইরে বেরিয়ে দেখুন না কী কাণ্ড হয়।' পাল জানাল।

উদ্বুদ্ধ করার পক্ষে ব্যাপারটা যথেষ্ট। চিরকালই আমার মধ্যে কাণ্ড দেখার জন্যে একজন

ওৎ পেতে থাকে। কিন্তু পাল যাবে তার রেস্টুরেন্টে। সেখানে থাকবে বারোটা পর্যন্ত। তারপর আমাকে নিয়ে টহল দিতে বের হবে। রেস্টুরেন্ট বন্ধ হওয়ার আগে সে আবার ফিরে যাবে। কিন্তু বারোটা পর্যন্ত রেস্টুরেন্টে বসে থাকতে হবে আমাকে। যদিও বিগ জন এবং সানির সঙ্গ আমার মোটেই খারাপ লাগেনি তবু সবাই যেখানে কাজ করছে সেখানে বসে থাকার মধ্যে একটা অস্বস্তি থাকেই। হঠাৎ অ্যালিসের কথা মনে পড়ে গেল। আজ এক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ইংরেজের বাড়ি দেখেছি, অ্যালিস তো অল্পবয়সী। আমাকে নেমন্তন্ন করে রেখেছে। পালকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বার্ক লেনটা কোথায়?'

'এখান থেকে বেরিয়ে বাঁ-দিকে হেঁটে গেলে একটা মোড় পাবেন। মোড়টা পার হয়ে কিছুটা যাওয়ার পর ডান হাতের রাস্তা। কেন বলুন তো?'

'অ্যালিস আমাকে যেতে বলেছিল ওদের ওখানে।'

'বাঃ। তাহলে তো ভালোই হলো। আপনি ওদের ওখানে থাকুন সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত। তারপর সোজা রেস্টুরেন্টে চলে আসবেন। বলেছে যখন তখন থাকবে নইলে এই রাতে কেউ সন্ধ্যের পর বাড়িতে থাকে না।' পাল আমাকে সদরের চাবি দিয়ে সেজেগুজে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে বলল, 'আজ আপনার অনারে শ্যাম্পেন খুলব আমরা।' যাঁরা মদ ভালোবাসেন তাঁরা শ্যাম্পেনের কথা খুব একটা বলেন না। খানদানি মানুষেরা তাঁদের আভিজাত্য প্রমাণের জন্য শ্যাম্পেন খান। জিসিনটি মোটেই দামি নয়। কিন্তু সম্মান পায়। আমি কলকাতার সুরারসিকদের কাছে স্কচের গল্প শুনতাম। আমার এক লেখকদাদা স্কচ ছাড়া খেতেন না। বিয়ার খেতেন নিউজিল্যান্ডের। মাঝে-মাঝে আমাদের দরাজ দিলে সেগুলো খাওয়াতেন। যে-কোনও বিদেশি জিনিসের মতো কলকাতায় স্কচ পাওয়া যায় অঢেল। এবং অবশ্যই ভারতীয় সেরা মদের চেয়ে তার দাম বেশি। হঠাৎ এক সকালে দাদার মাথা ধরল। আগের রাত্রে পরিমিত স্কচ খেয়েছিলেন তিনি। মাথা ধরার কারণ নেই। একটি ইংরেজি পত্রিকার ডাকসাইটে সম্পাদক তাকে জানালেন এদেশের স্কচগুলোতে এখন দিশি মাল মেশানো হচ্ছে। দশটার মধ্যে সাতটাই জাল। খেতে যদি হয় তাহলে দিশি রাম খাওয়াই ভালো। জ্যামাইকার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। অতএব দাদা এখন রাম খাচ্ছেন নাক টিপে। যাহোক, কলকাতায় সুরারসিকরা স্কচ বা সুরার মধ্যে যাকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন তার নাম হলো রয়াল স্যালুট। ভারতবর্ষে ওর একটা বোতলের দাম নাকি দুআড়াই হাজার। সেই মহার্ঘ বস্তু কোনওদিন চেখে দেখিনি। হঠাৎ আমাদের চা-বাগানের বন্ধু, যাকে আমরা আলাদিনের গল্পের দৈত্যের সঙ্গে তুলনা করতাম, যিনি মধ্যরাত্রে এক চা-বাগানে সমরেশ বসুর জন্মদিন শুনে এক ঘণ্টার মধ্যে শিভ্যাস রিগ্যালের বোতল আনিয়েছিলেন, তিনি কলকাতার হোটেলে উঠে জানালেন যে রয়াল স্যালুট খাওয়াবেন। নিমন্ত্রিতের মধ্যে আমিও ছিলাম। পান করে মনে হল না খুব দামি কিছু খাচ্ছি। আমেরিকা ইংল্যান্ডে এসে যাকেই জিজ্ঞাসা করেছি রয়াল স্যালুটের কথা সেই অবাক হয়েছে। কেউ নামই শোনেনি কেউ বলেছে ওটা আবার মদ নাকি? প্রচারের কল্যাণে কি না জানি না সেই জিনিস ভারতবর্ষে এক নম্বর। খানিকটা সেই অভিজ্ঞতার মতো, কলকাতার বই-এর স্টলে জেম হ্যাডলি চেজ খুব জনপ্রিয়। নিউইয়র্কের স্টলে তাঁর বই চাইতে প্রশ্ন শুনেছিলাম, 'হু ইজ হি?' মদ নিয়ে মারাত্মক রসিকতার গল্প লিখে গেছেন সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেব। অতুলনীয় সে-সব। পড়ার সময় লোকগুলোকে মোটেই ভিলেন বলে মনে হয় না। অথচ পঁচিশ বছর আগের বাঙালি কেউ কেউ মদ খাচ্ছে শুনলে নাক কোঁচকাতো। বাড়িতে বসে মদ খাওয়ার কথা ভাবতে পারত না। ওইসব গল্প পড়েও। আজ কোথাও পার্টি হচ্ছে জানলে লোকে প্রথমেই জানতে চায় ওটা ককটেল কি না? আসলে মদ খাওয়া আর মাতলামি করা যে দুটো আলাদা ব্যাপার সেই বোধ ক্রমে-ক্রমে কিছু মানুষের মনে ছড়িয়েছে। ভালো মন্দ নিয়ে শেষদিন পর্যন্ত তর্ক করা যেতে পারে।

এসব কথা মনে হয়েছিল অ্যালিসের বাড়িতে গিয়ে। দরজা খুলেছিল সে। খুশি হয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। নরম হাত। তারপর টেনে নিয়ে গিয়েছিল ভেতরের ঘরে। এখন অ্যালিসের পরনে

একটা জিনসের প্যান্ট আর নীল পুলওভার। ভেতরের ঘরে তখন টিভির সামনে বসেছিলেন এক মধ্যবয়স্ক পুরুষ ও রমণী। দুজনেই পান করছিলেন। অ্যালিস পরিচয় করিয়ে দিল, 'আমার মা রীতা আর আমার সৎ বাবা টম।'

দুজনেই উঠে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন। রীতা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি কিছু নেব কি না?' আমি মাথা নেড়ে না বলতে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করলেন না। মহিলা বেশ সুন্দরী, সুন্দর ফিগার। অ্যালিসের মা বলে মোটেই মনে হয় না। মেয়েরা বয়স বাড়লে মুখের মেরামত যতই সূক্ষ্মতায় নিয়ে যাক, বুক কোমর এবং নিতম্বের স্বরূপ লুকিয়ে রাখতে পারে না। অ্যালিস যদি ওর মেয়ে হয় তাহলে ঈশ্বরকে আর একবার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। টম বললেন, 'অ্যালিসের কাছে শুনলাম আপনি লেখক। সত্যি বলতে কী একজন লেখককে আমি প্রথম দেখেছি। লেখকরাই বোধহয় উদার হয়ে জেতার টাকা ছেড়ে দিতে পারে।' হাসলাম। বলতে পারলাম না লেখক এবং উদারতার মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই। আমার একটা পঞ্চাশ টাকার বই এক বছরে ছ'টা সংস্করণ হয়েছে শুনে বাংলা সাহিত্যের একজন জনপ্রিয় লেখক সেই প্রকাশককে লিখেছিলেন, 'এখন থেকে আপনারা তাহলে সমরেশ মজুমদারের বই ছাপুন, আমাকে কী দরকার।' আর একজন দাদা-স্থানীয় লেখক বলেছিলেন, 'ওরকম সংস্করণ আমি ঢের দেখেছি। খোঁজ নাও, হয়তো দুশো কপিতে সংস্করণ করেছে।' অতএব লেখক যদি বাঙালি হন তাহলে উদারতা আশা করা এই দশকে অন্তত সোনার পাথরবাটির মতো অসম্ভব।

ওঁদের সঙ্গে গল্প জমে গেল। যার আমন্ত্রণে এসেছি সেই অ্যালিস বসে রইল চুপচাপ। রীতার প্রথম পক্ষের মেয়ে অ্যালিস। অ্যালিসের বাবার সঙ্গে বিয়ের পর রীতা ভালোই ছিলেন। মানুষটি মারা যান বিমান দুর্ঘটনায়। তখন ওঁরা লন্ডনে থাকতেন। সেই সময় স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। মানুষটি ভালোবাসার ক্ষেত্রে সততা দেখাননি। বিয়ের দিন কিছু প্রমাণ পেয়ে রীতা সরে আসেন। তারপর দীর্ঘকাল একা। একবছর আগে মেয়েকে নিয়ে ব্ল্যাকপুলে বেড়াতে এসেছিলেন তিনি। সেখানেই টমের সঙ্গে আলাপ। ওকে দেখামাত্র তাঁর শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়েছিল। অ্যালিস সেটা লক্ষ করেই হয়তে বলেছিল, 'টম তোমার সম্পর্কে আগ্রহী। ওকে স্টেপ ফাদার হিসেবে ভাবতে আমার খারাপ লাগছে না মা।' টমের ব্যাবসা এই বোস্টনে। বিয়ের পর এখানেই থাকেন, স্বামীকে ব্যাবসার কাজে সাহায্য করেন। অ্যালিস ছুটি পেলেই চলে আসে। এসব কথা হচ্ছিল একটু-একটু করে গল্পের সূত্র ধরে। মাঝে-মাঝে অ্যালিস উঠে যাচ্ছিল। পৃথিবীর সব দেশের মেয়েই সম্ভবত বাবা-মায়ের অন্তরঙ্গ গল্প শুনতে লজ্জা পায়। লক্ষ করেছিলাম টম এবং রীতা মাঝে-মাঝে পরস্পরকে আদর করছিলেন। এটা এমন আদর যা আমরা প্রকাশ্যে করতে সংকোচ বোধ করি অথচ তাতে কোনও যৌনতা নেই। যে আদর ছেলে বা মেয়েকে সবার সামনে করা যায় সেই একই আদর স্ত্রীকে করতে গেলে এখনও আমরা আড়াল খুঁজি। টম বা রীতা সেই জড়তা থেকে মুক্ত। ব্যাপারটা আমার খারাপ লাগছে না। রীতা কখনও টমের কাঁধে হাত রাখছেন, টম কথা বলতে-বলতে একটা আঙুল রীতার গালে বুলিয়ে দিলেন। দুই পুরুষ এবং রমণী যে জীবনের অনেক সমস্যা অতিক্রম করে মিলিত হয়েছেন তা আচরণে বোঝা যাচ্ছিল না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনারা আজ বের হবেন না?'

টম বললেন, 'এরকম ওয়েদারে আমি রীতার সঙ্গে ঘরে থাকতে পারলেই খুশি হব।' বলে একটা চোখ টিপলেন। রীতা মাথা দুলিয়ে বললেন, 'আমিও।'

টম এবার হঠাৎ সচেতন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হোয়াট অ্যাবাউট অ্যালিস?'

অ্যালিস পোশাক পালটে তখনই ঘরে এল, 'আমি বরং বাইরে থেকে ঘুরে আসি।' রীতা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই কি বাইরে ডিনার করবি?'

'দেখি।' অ্যালিস দ্বিধায় পড়ল।

'দেখি-টেখি না। তুই যদি বাড়িতে খাস তাহলে তোর জন্য অপেক্ষা করব।'

অ্যালিস বলল, 'না। বাইরেই খাব।'

ওঁদের কাছে বিদায় নিয়ে আমিও অ্যালিসের সঙ্গে বাইরে এলাম। বৃষ্টি নেই। হাওয়া দিচ্ছে। তাতে শীত যেন আরও বেড়েছে। অ্যালিস জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কোনও প্রোগ্রাম আছে? আমি কিছু না জিজ্ঞাসা করেই বেরিয়ে এলাম।'

'কিছু না। সাড়ে এগারো থেকে বারোটার মধ্যে পালের রেস্টুরেন্টে যাব। ওখান থেকে বেরিয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করব, ব্যস। তুমি আমাদের সঙ্গে খেতে পারো।'

যদিও রাত্রের খাওয়া পালের কল্যাণে সন্ধেবেলাতেই হয়ে যায় তবু গতরাতের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি ঘণ্টাসাতেক পরেই আবার খিদে পেয়ে যায়। আর এখানে শুক্র-শনিবারে অনেকেই ভোর তিনটের সময় ডিনার করে।

আমরা পাশাপাশি হেঁটে চলেছি শহরের ডাউনটাউনের দিকে।

অ্যালিস জিজ্ঞাসা করল, 'আমার মাকে তোমার কেমন লাগল?'

'খুব ভালো।'

'সুন্দরী না?'

'খুব।'

'টমকে দেখার আগে পর্যন্ত মা এমন দুখী ছিল যে আমার কিছু ভালো লাগত না। মনে-মনে খুব ভেঙে পড়েছিল মা। টম ওকে অনেকগুলো বছর ফিরিয়ে দিয়েছে। আমি টমের কাছে কৃতজ্ঞ।'

আনন্দিত গলায় বলল অ্যালিস।

'তোমার মাকে টম কেড়ে নিয়েছে বলে।'

'ও নো। হিংসে হবে কেন? মা দিন-দিন বিমর্ষ হয়ে পড়েছে, জীবন সম্পর্কে কোনও আগ্রহ নেই এটা কোন সন্তানের ভালো লাগে। তারপর আমিও বড় হয়েছি। চাকরি পাওয়ার পর বিয়ে করব তখন মায়ের কী হবে? টম তো সবদিক থেকে মাকে জীবন ফিরিয়ে দিল। আর মা আমাকে একফোঁটা কম ভালোবাসে না। ভালোবাসা শেয়ার করার কথা বলছ? তুমি লেখো, তুমি নিশ্চয়ই জানো মেয়েদের ভালোবাসা হল সমুদ্রের মতো। কখনোই কমে না।'

ও রকম বোকার মতো প্রশ্ন করেছিলাম বলে নিজেই লজ্জিত হলাম। আবার সৎ বাবার সঙ্গে সন্তানের সুসম্পর্ক দেখতে তেমন অভ্যস্ত নই বলেই চিন্তাটা মাথায় এসেছিল। দুজনে পেট্রল পাম্পের কাছাকাছি পৌঁছোতেই থমকে গেলাম। মনে হচ্ছে ওপারে রাস্তা জুড়ে মারপিট হচ্ছে। ছেলেমেয়েরা বীভৎসরকমের চিৎকার করছে দলে-দলে। আমাকে থামতে দেখে অ্যালিস জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?' আমি বললাম, 'ও পাশে কোনও গোলমাল হচ্ছে।' অ্যালিস গলা খুলে হেসে উঠল, 'আরে না। ওরা শনিবার এনজয় করছে। বন্ধুবান্ধব মিলে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়।'

সেই রাত্রে বোস্টনের রাজপথে আমার নতুন অভিজ্ঞতা হল। ফুটপাতগুলো ওই ঠান্ডাতেও পনেরো থেকে পঁচিশ বছরের ছেলেমেয়েদের দখলে। তারা চিৎকার করছে গান গাইছে হেঁড়ে গলায়। কেউ বিয়ার খাচ্ছে টিনে মুখ ডুবিয়ে, কেউ নাচছে। ফুটপাতের একটা দল যে গলায় চিৎকার করছে অন্যদল তার চেয়ে বেশি শব্দ করছে। এবং এরা যে খুব শান্তশিষ্ট তা মোটেই নয়। হঠাৎ একজন ফুটপাত ছেড়ে ছুটে এল রাস্তায়। ট্রাফিক পুলিশের খালি স্ট্যান্ডটাকে তুলে ছুড়ে ফেলে দিল একপাশে। তারপর ছুটে গেল নিজের দলে। দুপাশের ছেলেমেয়েরা কপট ভয়ার্ত চিৎকার করে ছুটে যেতে লাগল আশেপাশে। দেখলাম চারটে পুলিশ তেড়ে আসছে মোটর সাইকেলে চেপে। অকুস্থানে ব্রেক কষে নেমে ওরা শান্ত ভঙ্গিতে ট্রাফিক স্ট্যান্ডটাকে তুলে নিয়ে এসে ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিল। কিন্তু কাউকে তাড়া করল না। অ্যালিসকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'পুলিশ নিশ্চয়ই এবার খুব ঝামেলা করবে?' অ্যালিস মাথা নাড়ল, 'না। আজকের রাত্রে ওরা এইসব ঠাট্টা ইয়ার্কিকে প্রশ্রয় দেয়। বেশি কিছু

করলে আলাদা কথা।'

আমরা আর একটু হেঁটে দঙ্গলটার মধ্যে আসতেই একটি মেয়েলি গলা চিৎকার করে উঠল, 'অ্যালি! অ্যালি!'

মুখ তুলে বাঁ-দিকে হাত নাড়ল অ্যালিস। দেখলাম একটা বিশাল স্তম্ভের ওপর বসে পা ঝুলিয়ে বিয়ার খাচ্ছিল একটি মেয়ে, হাত নাড়া মাত্র সে লাফিয়ে চলে এল নীচে। অত ওপর থেকে লাফাল কিন্তু কিছুই হল না ওর। দৌড়ে কাছে এসে হাসতে-হাসতে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছ?' অ্যালিস কাঁধ ঝাকাল, 'তুমি একা?'

'হ্যাঁ। কিন্তু খারাপ লাগছে না।'

অ্যালিস আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল, 'টিনা, ওই ক্যাসিনোতেই কাজ করে। আজকে ওর ছুটি ছিল।'

টিনা বলল, 'অ্যালিস খুব ভালো মেয়ে। তবে মুশকিল হল ওর সমস্ত বন্ধু ঠিক দ্বিগুণ বয়সের।' বলে বিয়ারের ক্যানটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। হয়তো পরিবেশের প্রভাব, আমি ক্যানটাকে নিয়ে এক চুমুক দিয়ে অ্যালিসকে অফার করলাম। অ্যালিসও আধ চুমুক দিয়ে টিনাকে ফিরিয়ে দিল। এখন এই তল্লাটে যৌবনের মেলা বসেছে। আগামী কালের ছুটিটাকে আজ উপভোগ করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সবাই রাস্তায় বেরিয়ে। এরকম উৎসবী মেজাজ আমি আগে কখনও দেখিনি। চোখের সামনে প্রেমিক-প্রেমিকারা চুম্বন করছে কিন্তু কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। টিনা বলল, 'তোমরা তো এদিকে যাচ্ছ। ফেরবার সময় আমাকে ডেকো। আমি তাড়াতাড়ি আমার জায়গায় চলে যাই নইলে কেউ দখল করে নেবে। টিনা ছুটল স্তম্ভের ওপরে উঠতে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'টিনার বয়ফ্রেন্ড নেই?'

'ছিল। বাচ্চা হওয়ার পর সে চলে গিয়েছে।'

'টিনার বাচ্চা আছে?' মেয়েটাকে আমার বিবাহিত বলে ভাবতেই ইচ্ছে করল না। তার পরেই মানির কথা মনে পড়ল। এখানে কুমারী মায়ের সংখ্যা বাড়ছে।

'হ্যাঁ। দেড় বছর বয়স। ও যখন সিক্সটিন প্লাস তখন হয়েছিল।'

'বাচ্চাটা কোথায়?'

'ওদের কাছেই। ও মায়ের সঙ্গে থাকে।'

'বিয়ে হয়নি?'

'না।' বলে হাঁটতে-হাঁটতে অ্যালিস বলল, 'আমি এটা পছন্দ করি না।'

'কেন?' এই প্রথম মেয়েটাকে অন্যরকম চোখে দেখলাম।

'বিয়ের আগে বাচ্চা হলে ঝামেলাটা একা শেয়ার করতে হয় কিন্তু তা হবে কেন? দুজনের ইচ্ছেতেই তো বাচ্চা হয়েছে। অতএব সেই কারণেই বিয়ের পর বাচ্চা হওয়া উচিত। তোমার কি তাই মনে হয় না।' অ্যালিস তাকাল।

মাথা নাড়লাম, হ্যাঁ। কিন্তু গোলমাল হয়ে গেল। আমি হয়তো অ্যালিসের মুখে একটি ভারতীয় নারীর সংলাপ আশা করেছিলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার বয়স কত অ্যালিস?'

'বাইশ।'

'বিয়ে করোনি কেন?'

'চাকরি করার আগে বিয়ে করব না। রিসার্চ না করলে হয়তো চাকরি করতাম।'

'কিছু মনে কোরো না, তোমার স্টেডি বয়ফ্রেন্ড আছে?'

'ওমা মনে করব কেন? হ্যাঁ, আছে। ও আমার মতো রিসার্চ করছে লন্ডনে।'

'তাহলে আমি কি মনে করতে পারি তোমার সেক্স এক্সপেরিয়েন্স আছে?'

'ও সিওর। আমি পনেরো বছর বয়স থেকে ডেটিং করেছি।'

'ওই ছেলেটির সঙ্গে?'

'না-না। ওর সঙ্গে তো আমার কলেজে পড়তে গিয়ে আলাপ।'

আমার জেদ চেপে গেল, 'ছেলেটি সে-সব জানে?'

'নিশ্চয়ই। ও নিজেই ওইরকম এক্সপেরিয়েন্সের মধ্যে বড় হয়েছে।'

'তাতে তোমার খারাপ লাগে না?'

'না। খারাপ লাগবে কেন? কিন্তু যেদিন আমরা স্বীকার করেছি যে পরস্পরকে ভালোবাসি সেদিন থেকে আমরা পরস্পরের কাছে সৎ আছি। অতীতকে নিয়ে কে মাথা ঘামায় যদি না সেই অতীত বর্তমানকে বিব্রত করে।'ক্ষ

ঘড়িতে এখন রাত বারোটা। অ্যালিসকে নিয়ে রেস্টুরেন্টের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই বিগ জন হাসিমুখে ওয়েলকাম বলে দরজা খুলেই আমাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'হাই ব্রাদার, তুমি এত বড়লোক তা তো জানতাম না।'

'মানে?' বিগ জনের থাবার আদরে আমি হকচকিয়ে গেলাম।

পেছনে সরে গিয়ে একটা বিশাল কেক নিয়ে এল বিগ জন, 'তোমার জন্যে এই উপহার এসেছে। তুমি নাকি কয়েকশো পাউন্ড জিতেও ছেড়ে দিয়েছ। বড়লোক না হলে কেউ পাউন্ড ছাড়ে।'

বিগ জনের কথা রেস্টুরেন্টের অনেকেই শুনতে পাচ্ছিল। তারা উৎসুক হয়ে আমায় দেখল। পাল এগিয়ে এল কাউন্টার ছেড়ে, 'ক্যাথি এসেছিল আপনার খোঁজে। যাঁকে আপনি তাসে হারিয়েছিলেন। কেকটা দিয়ে গিয়েছে সঙ্গে এই কার্ডটা।' দেখলাম কার্ডের ওপরে লেখা রয়েছে, 'গ্রেটফুল টু ইউ, বোথ অব আস।'

রাত একটায় আমি আর পাল রেস্টুরেন্ট থেকে বের হলাম। আজও খুব ভিড়। আজকের জন্যে একজন অতিরিক্ত লোক নিয়েছে পাল। ঘণ্টাদুয়েকের ছুটি নিচ্ছে সে রেস্টুরেন্ট থেকে সবাইকে বলে এল। অ্যালিসকে ভারতীয় খাবার খাইয়েছি। বেশি রাত করবে না বলে সে বাড়ি চলে গিয়েছে। যাওয়ার আগে লন্ডনে তার ঠিকানা দিয়ে গেছে আমায়। আগামী সোমবার সকালে সে লন্ডনে ফিরে যাবে। মেয়েটি খুব শান্ত, ভদ্র এবং অবশ্যই শিক্ষিত।

আমরা দুজন রাস্তায় বেরিয়ে একটু হাঁটলাম। এখন ঠান্ডায় বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছি। পাল বলল, 'চলুন, ক্লাবে নিয়ে যাই আপনাকে।' বললাম, 'আমার জন্যে রেস্টুরেন্ট ছেড়ে এলেন, খারাপ লাগছে।'

পাল হাত নাড়ল, 'আপনার জন্যে কে বলল? নিজেরই তো ইচ্ছে করছিল একটু ফূর্তি করি। তা ছাড়া সন্ধেবেলায় একজন ফোন করেছিল, মনে নেই?'

বিশাল বাড়ির গেটে ইউনিফর্ম পরা ডোরম্যান দাঁড়িয়ে। সে পালকে বলল, 'ওয়েলকাম স্যার। রেস্টুরেন্টে কোনও ট্রাবল নেই তো? বিগ জন ঠিক আছে?'

উত্তরগুলো দিয়ে সিঁড়ি উঠে পাল আমায় বলল, 'এ হল ডোরমেন ক্লাবের অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি।' চেহারা দেখে সেইরকম মনে হয়। আমরা দোতলায় উঠতেই চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পেলাম। নাচ চলছে উদ্দাম। সবই মধ্যবয়স্ক পুরুষ রমণী। ক্লাবের মালিক এগিয়ে এসে পালকে কিছু বললেন। চেঁচামেচিতে কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। ওপাশে নাচতে চাইছে না এমন একটি মহিলাকে অনুরোধ করে যাচ্ছে এক যুবক। পাল নৃত্যরতদের পাশ কাটিয়ে তেতলার সিঁড়িতে চলে এল। অনেকগুলো ঘর এপাশে-ওপাশে। সবখানেই নাচগান চলছে। আমরা শেষপর্যন্ত যেখানে পৌঁছোলাম সেটা একটা বারকাউন্টার এবং অপেক্ষাকৃত শান্ত। বারম্যান পালকে দেখে উল্লসিত। পাল দুটো ভদকা উইথ টনিক বলে জুড়ে দিল, 'তুমিও একটা নাও।' লোকটা খুশি হল। এখানে একটা মদ চাইলে যে পরিমাণ দেয় তা কলকাতার আধ পেগ। ভালোই। খাওয়া কম হয়। লোকটা মদ খেতে-খেতে কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমাকে অনেকদিন পরে এখানে দেখলাম পাল। ক্লাবের সেই

যুগ তো আর নেই।'

পাল দু-একটা কথা বলে আমায় জানাল, 'এই ক্লাবে বাইরের লোক ঢুকতে পারে না। একমাত্র মেম্বাররাই গেস্ট আনতে পারেন। তবু দেখুন ভিড় বেড়েই চলেছে।' ঠিক সেই সময় দুজন সুন্দরী সম্ভ্রান্ত ব্রিটিশ রমণী প্রবেশ করলেন। প্রথমজন একটু খাটো কিন্তু বেশি সুন্দরী। দ্বিতীয় জন বেশ লম্বা এবং স্বাস্থ্যবতী, লাবণ্যটা কম। পালকে দেখে তাঁরা উচ্ছ্বসিত। আলাপ হওয়ার পর পাল বলল, 'আজ আমার বন্ধুর সম্মানে আমরা শ্যাম্পেন খুলব।' সঙ্গে-সঙ্গে বাকেটে বরফের মধ্যে ঢোকানো শ্যাম্পেনের বোতল এল। শব্দ করে ছিপি খোলা হল কিন্তু বস্তুটি উপচে পড়ল না। তারপর শ্যাম্পেনের গ্লাসে-গ্লাসে সেটি বিতরিত হল। চুমুক দিয়ে আমার মোটেই পছন্দ হল না। খাটো মহিলার নাম অ্যান, দ্বিতীয়জন মার্গারেট। অ্যান জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কী করেন?' জবাব দিলাম। শোনামাত্র তারা পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর বলল, 'একটু আস্তে বলো। তোমার উচ্চারণ আমি বুঝতে পারছি না।' আমরা বাঙালিরা যে ধরনের ইংরেজিতে অভ্যস্ত ছিলাম ইদানীং তার পরিবর্তন ঘটেছে। আমেরিকান শব্দ এবং উচ্চারণের ভঙ্গি এসেছে খুব দ্রুত। ওদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রায় প্রতি পদেই হোঁচট খাচ্ছিলাম। কিন্তু এই ব্যাপারটা জন, ক্যাথি, এড কিংবা অ্যালিসের সঙ্গে কথা বলার সময় অনুভব করিনি তেমনভাবে। পাল সমস্যাটা বুঝতে পেরে বাংলায় বলল, 'এরা খুব গোঁড়া ব্রিটিশ। আমেরিকান ইংরেজি শুনলেই না বোঝার ভান করে। আপনি চালিয়ে যান।'

ক্রমশ আমি আর মার্গারেট কথা শুরু করলাম। অ্যান গল্প করছে পালের সঙ্গে। আমি কথা বলছি খুব কেটে-কেটে, সন্তর্পণে। মার্গারেটের স্বামী এই শহরের দু-নম্বর পুলিশ কর্তা। আজ রাত্রে বাড়িতে ফিরবে না বলে সে বেরিয়েছে বান্ধবীর সঙ্গে। অ্যানের এসব কোনও সমস্যাই নেই। কোনও পুলিশ অফিসারের স্ত্রীর সঙ্গে মধ্যরাত্রে গল্প করা মোটেই সুখদায়ক ব্যাপার নয়। আমার যত অস্বস্তি হচ্ছিল তত যেন মার্গারেটকে গল্পে পেয়ে গেল। শেকসপিয়ার আমাদের বন্ধু, শেলি. কিটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বায়রনকে বাল্যকালেই পড়তে হয় শুনে সে চমকিত। বলল, 'তাহলে তো তোমাদের দেশে গিয়ে আমাদের কোনও অসুবিধে হবে না। আমি আমার স্বামীকে বলব ভারতবর্ষে নিয়ে যেতে। কিন্তু ও খুব গোঁড়া, তোমার সঙ্গে এভাবে কথা বলছি জানলে ক্ষেপে যাবে।'

শুনে আমারও ভালো লাগল না। ওদিকে পাল আর অ্যান একটা ব্যাপারে একমত হতে পারছে না। পাল বলল, 'সমরেশ, অ্যান জামাইকান রাম খেতে চাইছে। এখানে পাওয়া যায় না। আমার বাড়িতে আছে। আপনি ওদের নিয়ে যান। আমি রেস্টুরেন্ট ঘুরে আসছি।' অ্যান ব্যাপারটা মার্গারেটকে বলল। মার্গারেট দোনামনা করছে। যাওয়ার জন্যে আমরা তৈরি। সরল মনে আমি মার্গারেটকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আর ইউ কামিং?' সঙ্গে-সঙ্গে এ্যাটম বোম ফাটল যেন। প্রচণ্ড রেগে গেল সে। আর অ্যান হাসতে-হাসতে ভেঙে পড়ল। কী অপরাধ করলাম বুঝতে পারলাম না। এত স্পষ্ট উচ্চারণ করেছি যে মার্গারেটের ভুল বোঝা উচিত নয়। মার্গারেট আর এক মুহূর্তও থাকতে চাইল না। অ্যান তাকে সামলাতে চেষ্টা করেও বিফল হল। অ্যান বলল, 'সরি পাল, শি ইজ ক্রেজি। ও আর থাকবে না। আমার আজ জামাইকান রাম খাওয়া হল না। নেক্সট টাইম খাওয়া যাবে গুড নাইট।' ওরা চলে গেল। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। পাল বলল, 'কী করলেন বলুন তো।' অপরাধীর গলায় বললাম, 'কী করেছি তাই বুঝতে পারছি না। ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমাদের সঙ্গে আসছে কি না।'

'পাল হাসল, 'আপনার দোষ নেই। আমরা ছেলেবেলায় বই-এর ইংরেজি ওভাবেই শিখেছি। তুমি কি আসছ? আর ইউ ক্যামিং? আপনি যদি কাম এর বদলে গো ক্রিয়া ব্যবহার করতেন তাহলে এই গোলমালটা হত না। নরনারীর বিশেষ মুহূর্তে সাধারণত ওই প্রশ্নটা একে অন্যকে করে যা আপনি করেছেন। চলুন।'

হেসে ফেললাম। ক্লাব থেকে বেরিয়ে মনে হল আমাদের বাংলা ভাষাতেও এমন অনেক

শব্দ আছে যা আপাত নিরীহ, শুধু ব্যবহার করার দৌলতে তার মানে পালটে যায়। অথবা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে-করে কিছু শব্দ বা বাক্যকে তার নিজস্ব অর্থ নস্যাৎ করে অন্য চেহারা দিয়ে দিয়েছি আমরা। স্রোতের মধ্যে যে নেই সেটা তার পক্ষে জানা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু জানার পর তো আমার উচিত মার্গারেটের কাছে ক্ষমা চাওয়া। সেই শুনে পাল বলল, 'পাগল। ছাড়ুন তো!'

॥ ৮ ॥

শনিবারের মতোর রবিবারও শহরটা ঘুমোয় দুপুর অবধি। তফাতটা হল, শনিবারের রাত্রে যেমন রাস্তা জুড়ে হইচই, ক্লাবে রেস্টুরেন্ট উপচে পড়া ভিড়, রবিবারে কিন্তু সব ফাঁকা। বেশিরভাগ দোকানপাট ক্লাব বন্ধ। এদিন প্রয়োজন জরুরি না হলে কেউ বাড়ি ছেড়ে বের হয় না। কারণ দু-রাত হুল্লোড়ের পর সবাই বিশ্রাম নিয়ে তৈরি হয় আগামীকারে জন্যে। সোম থেকে শুক্র এখানকার মানুষ কাজ ছাড়া আর কিছু বোঝে না। ব্যাপারটা আমরা কেন ভাবতে পারি না? আধুনিক ভাবনা চিন্তা যা আমাদের মগজে এসেছে তা তো সব ব্রিটিশদের কাছ থেকেই পাওয়া। দুশো বছরে ওরা এত কিছু করল আর আমাদের মনে কাজ করার ইচ্ছেটাকে তৈরি করতে পারল না। মানলাম, এদেশে নিজেদের প্রয়োজনে ওরা রাস্তাঘাট শহর তৈরি করেছে, শাসনব্যবস্থা শক্ত করার জন্যে আমাদের শিক্ষিত করেছে ইংরেজি ভাষায়। কিন্তু এইসব করতে গিয়ে ওরা আরও অনেক কিছু দিয়ে ফেলেছে যা আমাদের ছিল না। তবে কেন শৃঙ্খলাবোধ এল না? যার জন্যে পৃথিবীর ছোট-ছোট দেশগুলো যা করতে পারে আমরা তা করতে পারি না।

কিছুদিন আগে একটা লেখা পড়েছিলাম। মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ভেতরে একটু আড়ষ্ট হয়েছিলাম। লেখাটার বিষয়বস্তু এইরকম। এক বণিক ব্যাবসা করতে নতুন দেশে গেল। গিয়ে দেখল তার জিনিসের কেনার সামর্থ্য সেখানকার কয়েকটি ধনী পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেই দেশে কোনও নিয়ম-শৃঙ্খলা নেই, দেশপ্রেম নেই, কয়েকটি পরস্পর বিরোধী শক্তি শুধু ক্ষমতা দখলের জন্যে পরস্পরের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে। বণিককে কেউ পছন্দ করল না কিন্তু তাদের প্রতিপক্ষ প্রশ্রয় দিতে লাগল। বণিক দেখল তাকে ওরা ওদের কলহের মধ্যে জড়িয়ে নিচ্ছে। এবং তখনই সে ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে গেল। একটু বুদ্ধি ব্যবহার করে সে দেশটির মালিক হয়ে গেল একদিন। অর্থাৎ চৌদ্দ আনা যদি পড়ে থাকে তাহলে তা তুলে নিতে কোন মূর্খ দ্বিধা করবে? পৃথিবীতে তো কেউ বিবাগি হতে জন্মায়নি। তাহলে এই বণিককে কি সাম্রাজ্যবাদী বলে চিহ্নিত করা উচিত? ভারতবর্ষে মোগলরা যেভাবে ঢুকেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ঠিক সেইভাবে ঢোকেনি। বলা যেতে পারে আমরাই তাদের অন্দরমহলে ডেকে এনেছিলাম। আজ ব্রিটিশদের গালাগাল দেওয়ার সময় সেই সময়কার ইতিহাস ভাবতে অবশ্য ভালো লাগে না। এবং যদি দুশো বছর একটি শক্তির অধীনে একত্রিত না থাকতাম তাহলে আজ আসাম থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত আমরা জাতীয় সংহতির বাজনা বাজাতে পারতাম না। উলটোটা হলে দারুণ কিছু ঘটত এমন আশাবাদী মানুষ থাকতেই পারেন, কিন্তু যেটা সত্যি তা হল স্বদেশকে আপন বলে ভাবা তো দূরের কথা নিজের কাজটাকে যত্ন করে করার মানসিকতাই অধিকাংশ ভারতীয়ের নেই। এখন তো আমরা ঠিকঠাক আনন্দ করতেও জানি না।

ব্রেকফাস্ট খেয়ে পাল আর আমি বের হলাম। আজ বৃষ্টি নেই। রোদও। হাওয়া চলছে সেই সঙ্গে শীত। নিজেকে যতটা সম্ভব মুড়ে নিয়েছি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে দোতলা বাসে উঠলাম। গাড়ি নিতে আমি পালকে নিষেধ করেছি। বাসে উঠে বসতে পেলাম। রবিবারে এরকম ঘটনা কলকাতায় ঘটে থাকে। টিকিট পঞ্চাশ পেনি। দূরত্ব মাইলদেড়েক। টাকার হিসেব করলে তা এগারো টাকায় চলে যাবে। অতএব পঞ্চাশ পেনিকে পঞ্চাশ পয়সা ভাবাই ভালো। শহরটাকে একটা চক্কর মেরে

বাস থেকে আমরা নামলাম রেলওয়ে স্টেশনের সামনে। বাইরে থেকে দেখে সেটা বোঝা যায় না। শুধু সাইনবোর্ড পড়ে এগিয়ে যাওয়া। সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে এই মফস্‌সলি স্টেশনটিতে সুন্দর কাউন্টার আর ইন্ডিকেটার বোর্ড দেখতে পেলাম। কোন ট্রেন আজ ছাড়বে কখন আসবে তা জিজ্ঞাসা করতে ছোটাছুটির কোনও প্রয়োজন নেই। পাল টিকিট কিনে বলল, 'চলুন ভেতরে গিয়ে কফি খাই। মিনিট কুড়ি দেরি আছে।' আমার হাতে সদ্য জ্বালানো সিগারেট। ইংলন্ডে সিগারেটের দাম অত্যন্ত বেশি। পার্ক স্ট্রিট পাড়ায় যে সিগারেট আমরা পনেরো টাকায় পাই তা এখানে বাইশ টাকা। কিন্তু যেহেতু আমাকে দাম দিতে হচ্ছে এক পাউন্ড এবং এক সংখ্যাটি মনকে প্রফুল্ল রাখে তাই আপাতত গায়ে লাগছে না। টিকিট পাঞ্চ করিয়ে ঢোকার সময় কর্মচারীটি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'রেলওয়ে বিশ্বাস করে ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। অতএব আপনি যদি ওই বস্তুটিকে না নিয়ে ঢোকেন তাহলে সুবিধা হয়।'

কুড়ি মিনিট সিগারেট ছাড়া বিশেষ করে কোনও সদ্য ধরানো সিগারেট ফেলে দিতে আমি রাজি হলাম না। পালকে এগিয়ে যেতে বলে আমি কাউন্টারের সামনে ফিরে এলাম। সেখানে মোটেই ভিড় নেই। এক সর্দারনী দ্রুত টিকিট নিয়ে ভেতরে চলে গেল। দেখলাম একটি অদ্ভুত চেহারার মানুষ আমার দিকে তাকিয়ে। চোখাচোখি হতে বিগলিত হাসি ফুটল তার মুখে। শুধু মুখ ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছি না। পরনে ঢলঢলে প্যান্ট, ওভারকোট। মাথায় মাংকি ক্যাপের সঙ্গে মাফলার। সঙ্গে বিরাট একটা ঝোলা। লোকটি এগিয়ে এসে সুন্দর উচ্চারণে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল, 'ভারতবর্ষ থেকে আসা হচ্ছে না বাংলাদেশে?' বললাম 'ভারতবর্ষ।'

'কোন ভাষা মাতৃভাষা?'

'আপনি কি ভারতীয়?'

'বাঙালি তো? বুঝতে পেরেছি। বাঙালি ছাড়া কেউ প্রশ্ন করে জ্বালায় না। হ্যাঁ গো, আমি বাঙালি, সুভাষ বোস রবীন্দ্রনাথের দেশের মানুষ। পড়ে আছি এই হতচ্ছাড়া দেশে। যাব ব্ল্যাকপুল। টিকিটের দাম কম পড়ে যাওয়ায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আর অমনি তোমায় দেখলাম। একটা পাউন্ড দাও তো, অভিলাষ পূর্ণ করি।' হাত বাড়ালেন তিনি। এইসব কথাবার্তা বাংলাতেই এবং আমাকে স্বচ্ছন্দে তুমি বলছেন ভদ্রলোক। বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কী করেন?'

'সেবা।' ভদ্রলোক হাসলেন, 'ইংল্যান্ডের গ্রামে শহরে ঈশ্বরের নাম বিলিয়ে বেড়াই। এই পোশাক দেখে বিভ্রান্ত হচ্ছো তুমি? মাংকি ক্যাপটা খুললেই বুঝতে পারতে কিন্তু তাতে আমার শীত লাগবে। এই ঠান্ডার জন্যে গৌরাঙ্গ বিলেতে জন্মায়নি, বুঝলে! দাও দিকিনি।'

'এক পাউন্ড মানে বাইশ টাকা! দেশে একজন অপরিচিত মানুষের কাছে এইভাবে বাইশ টাকা চাইতে পারতেন? আপনার শিষ্য-শিষ্যা নেই? তাদের কাছ থেকে নিন!'

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে আমি শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেট ফেলে দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। পরপর গোটাপাঁচেক প্ল্যাটফর্ম। পাল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে টিভি দেখছিল। আমায় বলল, 'হিপিরা লন্ডনে যেতে চেয়েছিল। পুলিশ আপত্তি করেছে।'

অবাক হলাম, 'ওরা কি এখনও হাইওয়ে ছাড়েনি?'

'না। তবে ওরা শেরউড ফরেস্টের দিকে পৌঁছে গেছে। ওখানেই আপাতত থাকবে।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, শেরউড শব্দটা আগেও শুনেছি। রবিনহুডের জঙ্গল। সেটা এখনও এখানে আছে?' আমার ভালো লাগল।

'হ্যাঁ। চলুন ট্রেন আসছে।'

ঠিক সময়ে ট্রেনটি প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। এত ফাঁকা ট্রেন আমি কখনও দেখিনি। নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটন যাওয়ার আমেরিকান ট্রেনে যথেষ্ট ভিড় ছিল। একেবারে প্রথমদিকের কামরায় উঠে জানলার পাশে বসলাম। একটু অভিনব ব্যাপার। দ্বিতীয় শ্রেণির মুখোমুখি চারটে আসনের মাঝখানে

একটা সাঁটা টেবিল রয়েছে। পড়ালেখা খাওয়া... কাজে সেটাকে দিব্যি ব্যবহার করা যায়। কলকাতার লোকাল ট্রেনে টেবিল পাতার কল্পনা স্বাভাবিক ...ণেই কারও মাথায় আসে না। এইসময় সেই ঈশ্বরপুত্রকে দেখতে পেলাম। ট্রেনের টিকিটের দাম পেয়ে ...গেলে উনি এই প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে পারতেন না। এখন কামরায় নজর বুলিয়ে শিকার খুঁজছেন যাতে যাত্রাটা এ... আরামের হয়। পালকে বললাম ওঁর কথা। পাল বলল, 'আমার রেস্টুরেন্টেও প্রত্যেক সপ্তাহে একজন আসে। ...শায়ারে কালীবাড়ি বানাবে। ওটা এমন একটা ব্যাপার চাঁদা না দিয়ে পারা যায় না। যাই বলুন বাঙা... হিন্দুদের কালীঠাকুরের ওপর একটা দুর্বলতা আছেই। ইংল্যান্ডের মাঠ চাষের ক্ষেত্র কলকারখানা দুপাশে রেখে ট্রেনটা এগিয়ে যাচ্ছিল স্টেশনগুলোকে বুড়ি ছুঁয়ে-ছুঁয়ে। কামরার ভেতরে মেশিনজাত উত্তাপ খুব আরাম দিচ্ছিল। আমাদের দুটো কামরা পরেই স্ন্যাকার। গরম চা কফি থেকে টুকিটাকি সব খাবার বিক্রি হচ্ছে সেখানে। যার যেমন ইচ্ছে কিনে নিয়ে এসো। ট্রেন যাত্রা এত আরামের তা ভাবতেই আরও চমক লাগে যখন দেখি দ্বিতীয় শ্রেণির টয়লেটে শুধু ফ্ল্যাশই কাজ করে না, সেখানে টয়লেট পেপারও ঠিকঠাক মজুত থাকে। প্রায় আড়াই ঘণ্টার যাত্রা শেষ হল যে জায়গায় তার সঙ্গে সকরিকলি মণিহারি ঘাটের বেশ মিল আছে। উত্তরবঙ্গে যেতে হলে আগে গঙ্গার ধারের এই স্টেশনগুলোতে ট্রেন আসার আগেই মাটি দেখে আমরা টের পেয়ে যেতাম। একটু-একটু করে মাটির রং পালটে যেত। শেষে ছাড়া-ছাড়া ঘাসের ফাঁক দিয়ে বালি উঁকি দিত। শেষতক বাতাসে মিশে থাকা জলের গন্ধ আমরা পেয়ে যেতাম।

ট্রেনটা যেখানে থামল সেখানে কোনও বাড়িটাড়ি নেই। একটা স্টেশন যেন থাকতে হয় বলেই আছে। তাই প্ল্যাটফর্মেও কোনও মানুষজন দেখছি না। কামরা থেকে নামার পর কোনও রেলের কর্মচারীরও দর্শন পেলাম না। একটা রঙিন ড্রামের বুক পকেটে সবাই টিকিট ফেলে বেরিয়ে যাচ্ছে। এরা কি ধরেই নেয় যারা ট্রেনে উঠবে টিকিট কাটবেই। পাল অবশ্য অন্য কথা বলল। আজকে যে এমন নিরিবিলি, চারধারে শিথিলভাব তার কারণ একটাই, ছুটির দিন।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে সুন্দর পিচের রাস্তায় আমরা হাঁটছিলাম। দুপাশে পাঁচিলে ঘেরা জমি। ভবিষ্যতে যাঁরা বাড়ি করবেন এখানে তাঁরা সংরক্ষিত করে রেখেছেন। জলের গন্ধ বাড়ছিল। এবার বেশ কিছু বাড়ি ঘর চোখে পড়ল। সরলরেখার মতো অনেকদূর চলে গেছে বাড়িগুলো। ক্রমশ আমরা মোটামুটি শহুরে এলাকায় ঢুকে পড়লাম। পাল বলল, 'চলুন, দুপুরে খাওয়াটা এখান থেকেই সেরে নিই। তাহলে আর সমস্যায় পড়তে হবে না।'

বললাম, 'যে জন্য এসেছি সেই সমুদ্র কোথায়?'

পাল বলল, 'ওই বাড়িগুলোর সামনে। কিন্তু সেখানকার রেস্টুরেন্টগুলোয় ফিফটি পার্সেন্ট দাম বেশি।' আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি এই বাড়িগুলোর পেছনেই। এতো কাছে এসে সমুদ্রে না দেখে খেতে বসতে কারও ইচ্ছে হয়? তবু নিজেকে সামলালাম। এরকম কৌতূহলের জন্যে জীবনে অনেকবার খুব হতাশ হতে হয়েছে আমাকে। সুন্দর একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম দুজনে। মহিলারা পরিবেশন করছেন। তাঁদের মধ্যে যিনি সুন্দরীতমা তাঁর টেবিলেই বসলাম আমরা। রোস্ট চিকেন আর রুটির অর্ডার দিয়ে পাল বলল, 'আপনি বিয়ার খাবেন?'

বাইরে রোদ নেই তেমন, ঠান্ডাটাও জমকালো, এই আবহাওয়ায় বিয়ার খাওয়ার ইচ্ছে হল না।

যে মহিলারা পরিবেশন করছেন তাদের জীবিকা এটাই এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। জীবনের অন্য ক্ষেত্রে কিছু উদ্বৃত্ত সময় এখানে ব্যয় করে উপার্জন করছেন এঁরা। কিন্তু পরিবেশনকারিণী বড্ড বেশি আমাদের দিকে তাকাচ্ছেন। পালও সেটা লক্ষ করছিল। খাবারের প্লেট নিয়ে তিনি টেবিলে আসতেই পাল জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কোনও সমস্যা হয়ে থাকলে নির্দ্বিধায় বলতে পারেন।' মহিলা আমাদের দিকে তাকালেন না। দক্ষ হাতে খাবার সাজিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'সমস্যাটা

আমার নয়, আপনাদের। একটু বাদেই টের পাবেন।' কথা বলার সময় এমন ভঙ্গি করলেন একটু দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ করলেও বোঝা যাবে না তিনি আমাদের কিছু বলছেন। পাল আর আমি মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। সুন্দরী ততক্ষণে ফিরে গিয়েছেন নিজের জায়গায়। এবার লক্ষ করলাম শুধু তিনিই নন রেস্টুরেন্টের সমস্ত কর্মচারী আমাদের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে আর নিজেদের মধ্যে চাপা স্বরে কথা বলছে। ব্যাপারটা এমন অস্বস্তিকর যে খাবার উপভোগ করা আর হয়ে উঠল না। পাল বলল সে-ও ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না।

কফির ভাবনা আমিই বাতিল করলাম। বিল দিতে বললাম। সুন্দরী সেটা এগিয়ে দিয়ে জানালেন, আমরা যেন অনুগ্রহ করে একটু অপেক্ষা করি। কারণ জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, 'একজন আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

যেহেতু আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন এবং আমার প্রশ্নের জন্যে অপেক্ষা করলেন না অস্বস্তি আরও বেড়ে গেল। ব্ল্যাকপুলে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইতে পারে এমন কাউকে তো আমার চেনার কথা নয়। পালকে বললাম, 'আমি রহস্য বুঝতে পারছি না। চলুন বেরিয়ে পড়ি।'

পাল মাথা নাড়ল, 'না। ওরা ভদ্রভাবে অনুরোধ করেছে যখন তখন শেষ পর্যন্ত দেখাই যাক কী হয়।' এই সময় একটি স্বাস্থ্যবান লোক এগিয়ে এল। লোকটাকে আমার মোটেই রাগি বলে মনে হল না। 'হ্যালো' বলে চেয়ার টেনে বসল। কাউন্টারের সামনে ললনারা দাঁড়িয়ে সাগ্রহে আমাদের দেখছে। লোকটি আমার দিকে একপলক তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ভারতীয়?'

মাথা নাড়লাম, 'হ্যাঁ। কিন্তু ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না। তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও?' লোকটা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। তোমার নাম?'

বললাম। লোকটা পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে আবার উচ্চারণ করতে বলল। ফের নামটা বললাম। লোকটা মাথা নাড়াল। তারপর হাত বাড়াল, তোমার পাসপোর্ট দেখতে পারি?'

'কারণ না বললে আমি দেখাতে বাধ্য নই।'

'একটি ভারতীয় আমাদের কিছু অসুবিধেয় ফেলেছে। সে যে ঠিকানা বলেছে সেখানে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেছে ওটা ফলস্। তার চেহারার সঙ্গে তোমার খুব মিল আছে। অথচ তুমি যে নামটা বলছ তার সঙ্গেও ওর নাম মিলছে না। এমন হতে পারে নামটাও বানানো। সেটা তোমার পাশপোর্ট দেখে নিশ্চিত হতে চাই।'

পাল এবার জিজ্ঞাসা করল, 'লোকটা কিছু অন্যায় করেছিল?'

'হ্যাঁ। আমার বোন রেস্টুরেন্টে কাজ করত।—না এই রেস্টুরেন্টে নয়। লোকটার সঙ্গে আলাপ হয়। ওরা প্রেমে পড়ে তারপর না জানিয়ে লোকটা উধাও হয়ে যায়। এখান থেকে আমাকে খবর দেওয়া হয়েছে তোমার সঙ্গে তার চেহারার মিল আছে।' লোকটা হাত বাড়িয়েই ছিল।

'না তখন আমি বাইরে ছিলাম।'

এবার আমি সোজা হয়ে বললাম, 'সবচেয়ে ভালো হয় যদি তোমার বোন এখানে আসে। সে নিশ্চয়ই তার প্রেমিককে চিনতে পারবে।'

'তার পক্ষে এখন আসা সম্ভব নয়। কাল রাত্রে তার বাচ্চা হয়েছে।'

প্রথমে অস্বস্তি, তারপর বিরক্তি শেষে কৌতুক বোধ করছিলাম এতক্ষণ, কথাটা শোনার পর মন খারাপ হয়ে গেল। পাল জিজ্ঞাসা করল তবু, 'তোমার বোন কি বিবাহিতা? লোকটা মাথা নাড়ল, না। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'বাচ্চাটাকেও পৃথিবীতে আনতে চেয়েছে। আমাদের কথা কানেই তোলেনি।'

বিনাবাক্য ব্যয়ে আমার পাসপোর্ট তুলে দিলাম। লোকটা ছবির সঙ্গে নামটা পড়ল অর্থাৎ আমি যে নাম বলেছি সেটা সত্যি বুঝতে পেরে ইশারায় সুন্দরীকে ডাকল। সুন্দরী এলেন। লোকটা তাকে পাসপোর্ট দেখাল। সুন্দরী অনেকক্ষণ আমার মুখ এবং পাসপোর্টের ছবি দেখলেন। তারপর বললেন, 'আমি মাত্র একবার দেখেছিলাম। তবে এখন মনে হচ্ছে সেই লোকটা আলাদা।'

পাল বলল, 'এবার আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে পুলিশকে বলতে পারি। এটা শুধু অনর্থক ঝামেলাই নয় অপমানও। কিছু বলতে চাও?'

লোকটা কাঁধ নাচাল, 'হ্যাঁ, সেটা তোমরা করতেই পারো। কিন্তু তার আগে আমাদের মনের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করো।'

খারাপ লাগছিল যেমন অবাকও হচ্ছিলাম সেইসঙ্গে। এসব তো অসভ্য দেশে সম্ভব যেখানে একজন বিদেশি এসে ক'দিনের ঘনিষ্ঠতায় এইরকম কাণ্ড করে স্বচ্ছন্দে মেয়েটিকে ফেলে রেখে চলে যেতে পারে। বেচারা মেয়েটি হয় আত্মহত্যা করে নয় সারাজীবন বেদনা বহন করে। কিন্তু ইংল্যান্ডের একটি সামুদ্রিক শহরে সেটা সম্ভব হয় কী করে?

আমরা উঠে পড়লাম। লোকটিও। বাইরে বেরুবার সময় শুনলাম সুন্দরী বলছেন, 'আমি দুঃখিত।' কথা বাড়ালাম না। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কি এখানে বেড়াতে এসেছ?'

পাল বলল, 'আমি এদেশেই থাকি। আমার বন্ধু বেড়াতে এসেছে।'

লোকটা জানতে চাইল 'আমি যদি তোমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকি তাহলে অসুবিধা হবে?'

পাল আমার দিকে তাকাল। আমি উলটোটাই বললাম, 'মোটেই না। থাকলে আমরা খুশিই হব। নতুন জায়গায় গাইড করতে পারবে।' বুঝতে পেরেছিলাম আহাম্মুকি আচরণের জন্যেই লোকটা একটু ভালো ব্যবহার করতে চাইছে এখন।

বাড়িগুলোর মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসতেই হাওয়ার মুখে পড়লাম। এবং সমুদ্র দর্শন হল।

আদিগন্ত প্রায় স্থির জলরাশি। শুধু উড়াল হাওয়ার দাপটে ভাঙা-ভাঙা ছোট ঢেউ তার বুকে ছড়ানো। জলের রঙে সবুজের ছোঁয়াই বেশি। এমন স্থির বিপুল সমুদ্র আমি কখনও দেখিনি। জ্যাকেটের সবক'টা আটকেও মনে হচ্ছে হাড়ে শীত ঢুকছে। আমরা এসে দাঁড়িয়েছি যে ফুটপাতে তার সামনে একটা বিশাল চওড়া রাস্তা। রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে ট্রাম লাইন চলে গিয়েছে। এদিকে পর পর দোকানপাট রঙিন করে রেখেছে, যতদূর দৃষ্টি যায়। উলটো পিঠে সমুদ্রের গায়ে ভাসমান মেলা, রেস্টুরেন্ট, বার। এইসবে একবার নজর বোলাতেই কার্নিভাল শব্দটা মাথায় আসে। লোকটা বলল, 'তোমাদের কি বোটিং করার ইচ্ছে আছে। তাহলে বলো, আমার এক বন্ধু নৌকা ভাড়া দেয়।'

একে এই ঠান্ডা বাতাস তার ওপর সমুদ্রের জলে ভাসতে আমার মোটেই আগ্রহ নেই। পাল এখানে কয়েকবার এসেছে। ট্রেনে বসে ওর মুখে শুনেছি দেশ থেকে কেউ বেড়াতে এলে তাকে নিয়ে একবার ব্যাকপুলের সমুদ্র আর লেকডিস্ট্রিক্টে ওকে যেতেই হয়। এই কথাই নিউইয়র্কে মনোজ বলছিল। ওকে যে কতবার বাফেলোতে যেতে হয়েছে নায়েগ্রা দেখাতে। তার ফলে নায়েগ্রা সম্পর্কে ওর কোনও আগ্রহ অবশিষ্ট নেই। আমার মনে হল এবার পালকে বেশি হাঁটাহাঁটি না করানোই উচিত। ওকে কোথাও বসে অপেক্ষা করার প্রস্তাব দিতে সে খুশি হল। সামনেই একটা লম্বা টাওয়ারের ওপর কাচের দেওয়ালের রেস্টুরেন্ট। পাল জানাল সে ওখানেই আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। এক মাইল দূর থেকে যখন ওই টাওয়ারটাকে দেখা যায় তখন আমার হারিয়ে ফেলার কোনও ভয় নেই।

লোকটার নাম বব। বলল, ব্যাবসা করে। কীসের ব্যাবসা জিজ্ঞাসা করিনি। কিন্তু ক্রমশ ওর সঙ্গে আমার একটু ভাব হয়ে গেল। এর মধ্যে যেটুকু বুঝেছি বব-এর পেটে বেশি বিদ্যে ঢোকেনি। একজন কর্মঠ অশিক্ষিত যুবক হিসেবে তার মতো মানুষ পৃথিবীর সব দেশেই আছে। ববকে বললাম, 'ভারতীয় দেখলেই তোমরা যদি তাকে এভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করো তাহলে তো খুব মুশকিল।'

বব বলল, 'সবাইকে তো করি না। মাসখানেক আগে একজনকে করেছিলাম সে আসলে পাকিস্তানি।'

বললাম, 'এরকম কাণ্ড করে যে একবার ব্ল্যাকপুল থেকে চলে যায় সে কেন আবার এখানে ফিরে আসার ঝুঁকি নেবে?'

বব বলল, 'তা অবশ্য। কিন্তু বলা তো যায় না, যদি ফিরে আসে।' ব্ল্যাকপুলে সারা বছর

কার্নিভাল লেগেই আছে। ডানদিকে পরপর জুয়ো খেলার দোকান। এদেরই একটা মিনি সংস্করণ দেখেছিলাম বোস্টনের ক্যাসিনোতে। ইতিমধ্যে হ্যান্ডেল টেনে তিন তাস মেলাতে দু-পাউন্ড হেরে বসে আছি। পরপর বোটিং সেন্টার চলে গেছে রাস্তা ধরে। পুতুল ঘোড়ার রেস যে বোর্ডে হচ্ছে তার আয়তন একটা ব্যাডমিন্টন কোর্টের মতো। আজ রবিবার বলেই ভিড় নেই। আমার এইসব দেখার আগ্রহ ববের ভালো লাগছিল না। সে বলল, 'চলো, ট্রামে চেপে ওপাশে যাই।' আপত্তি করলাম না যদিও, কিন্তু দু-পাউন্ডের জন্যে মন খচখচ করছিল। ট্রামে উঠে টিকিট কাটতেই এক পাউন্ড বেরিয়ে গেল। তবু কলকাতার রাস্তায় যখন নতুন ট্রাম বের হয় তখন তার অবস্থা প্রথমদিকে এইরকমই থাকে। জানলার পাশে বসে সমুদ্র দেখতে-দেখতে চললাম। এর মধ্যে কেউ-কেউ পালতোলা নৌকা নিয়ে একলা বেরিয়ে পড়েছে। জলের বুকে তাদের রঙিন চমৎকার দেখাচ্ছে। সমুদ্রের গা ঘেঁষেই ট্রাম চলে। ক্রমশ আমরা দোকানপাট মেলা চত্বর ছাড়িয়ে এলাম। এবার বব বলল, 'চলো, নেমে পড়ি।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে কী দেখার আছে?'

'তেমন কিছু নেই। হয়তো তোমার ভালো লাগবে না। না লাগলে ফিরে আসব।'

অতএব নামলাম। ট্রাম চলে গেলে একদম নির্জন হয়ে গেল। সমুদ্রের ওপর বয়ে যাওয়া বাতাস আর সামনে বড়-বড় গাছের সারি। প্রায় অচেনা একটা লোকের সঙ্গে এরকম জায়গায় যেতে পণ্ডিতেরা আপত্তি করবেন কিন্তু আমার কৌতূহল হচ্ছিল। রাস্তা পার হয়ে ববের সঙ্গে খানিকটা যেতেই ছোট-ছোট বাড়িঘর দেখতে পেলাম জঙ্গলের আড়াল সরলে। অবশ্য অনেক গাছের সমষ্টিকে জঙ্গল বলা যায় কি না তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে যদি সেই গাছগুলোকে পরিকল্পনামাফিক বড় করা হয়।

দেখলেই বোঝা যায় যে বাড়িঘরগুলো স্বল্পবিত্ত মানুষের। অনেক ছোট-ছোট নৌকো উলটে রাখা আছে। মাছের আঁশটে গন্ধ নাকে এল। কেউ-কেউ নৌকো সারাচ্ছে, রং করছে। আমাদের দিকে মুখ তুলেও তাকাল না। বব জিজ্ঞাসা করল, 'বিয়ার খাবে?' এর আগে পাল একই প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু আমি না বলেছিলাম। কিন্তু এখন এই আঁশটে গন্ধের মাছমারাদের ডেরায় ঢুকে মনে হল আকাশে রোদ না থাকলেও খাওয়া যেতে পারে।

মদের ব্যাপারে আমার গুরুদেব রামচন্দ্রদা বলেছিলেন, 'যারা বলে এই সময়ে ওটা খেতে হয় ওই সময়ে এটা, তাদের মতো মূর্খ পৃথিবীতে নেই। যার যেমন খেতে ইচ্ছে করে সে তখন এই খাবে। কথায় বলে আপরুচি খানা। কেউ-কেউ তো চারবেলা ভাত খায়, খায় না? দুপুরে বিয়ার খাব, সন্ধের পর খাব না, এ কী কথা? আমার যদি হুইস্কি রাম ভদকা জিন খেতে খারাপ লাগে তাহলে সন্ধে হয়ে গেলেই পছন্দসই বিয়ার খাব না? এগুলো তোদের শিখিয়েছেন সাহেবরা যাতে সব ব্র্যান্ডের মদ বিক্রি হয়। তা ওরা তো জল না মিশিয়ে কাঁচা মদ খায়। অত যদি নিয়ম মানো খাও না বাঙালি কাঁচা মদ।'

রামচন্দ্রদার মতো অভিজ্ঞতা মদের ব্যাপারে আমার নেই। কিন্তু বিদেশে এসে একটা তফাৎ খুব লক্ষ করছি। কলকাতায় বন্ধুরা যখন মদ্যপান করতে বসেন বাদাম পাঁপরভাজা জাতীয় কিছু থাকেই চাঁট হিসেবে। জারে থাকে জল। এদেশে কাউকে এসব সাজিয়ে নিয়ে মদ খেতে দেখিনি। বরফের টুকরো নেওয়া চলতে পারে। মনে পড়ছে একবার আমরা দার্জিলিং-এ ছিলাম। বরেন গাঙ্গুলি, অভ্র রায় ছাড়া খগেনদা নামের একটি সরল মানুষ সঙ্গে ছিলেন। সমরেশ বসু সেই সময় দার্জিলিং-এ। তিনি আগের রাত্রে আমাদের খুব খাইয়েছেন। ফলে আমরা তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম পরের সন্ধ্যায় একত্রে পান করতে। খগেনদার ওপর ঘরদোর ঠিক করে রাখার দায়িত্ব দিয়ে আমরা তিনজন দুপুরে বেরিয়েছিলাম। ফেরার সময় সমরেশদাকে নিয়ে ফিরলাম। খগেনদা দরজা খুলে সমরেশদাকে দেখে প্রায় নতজানু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, 'আপনি এসেছেন আমি ধন্য

এঁরা আমার ওপর ভার দিয়েছেন ব্যবস্থা করার জন্যে। কিন্তু বিদেশ বিভুঁইতে সব কিছু পাওয়া তো সম্ভব নয়। তবু—।' তিনি নবাবদের যেমন দুহাত নেড়ে আপ্যায়ন করা হয় সেইভাবে সমরেশদাকে টেবিলে নিয়ে গেলেন। টেবিল দেখে আমাদের চক্ষুস্থির। টেবিলক্লথের অভাবে নিজের গামছা পেতেছেন খগেনদা। তার ওপর দু-দুটো হুইস্কির বোতল। পাশে ভাঁড়ের মধ্যে কাবুলি ছোলা ভেজানো। আর একটি ভাঁড়ে ছাড়ানো বাদাম। গ্লাসগুলো গায়ে-গায়ে রাখা। সমরেশদা অট্টহাস্য হাসলেন। আমাদের লজ্জা বাড়ল। খগেনদা থতমত হয়ে বললেন, 'কোনও ত্রুটি হল? ছোলাবাদাম দিয়েই তো মদ খায়। তার ওপর জল ঢালার পরিশ্রম বাঁচাতে আমি এক বোতলের মদ দু-বোতলে ঢেলে আগেই জল মিশিয়ে রেখেছি।'

প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সম্মতি জানাতেই বব আমাকে নিয়ে এগিয়ে গেল। যাওয়ার পথে কর্মরত মানুষগুলোর সঙ্গে কথা বলতে লাগল ডেকে-ডেকে। বব জানাল এটা জেলেদের আস্তানা। সামনের সমুদ্রে মাছ ধরে এরা। বেশিরভাগেরই মাছ ধরার লঞ্চ আছে। তবে নৌকোও ব্যবহার করে কাছে পিঠে।

একটি গ্রাম্য পাবে আমরা ঢুকলাম। আধা অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে আঁশটে গন্ধ পাবের ভেতর ঝুলছে। কাউন্টারের পেছনে পাকা ঝোলা গোঁফ নিয়ে রোগাটে বৃদ্ধ দাঁড়িয়েছিল। ববকে দেখামাত্র বলল, 'হ্যালো বব। জুলিকে আমার অভিনন্দন। শুনলাম ওর ছেলে হয়েছে।' বব বলল, 'থ্যাংক ইউ জো। দুটো বিয়ার দাও।'

দেখলাম এই অবেলাতে পাবের প্রতিটি টেবিল ভরতি। পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের সংখ্যাই বেশি। পেছনের দেওয়ালে টিভি চলছে। বিয়ারে চুমুক দিয়ে বুঝতে পারলাম এখানকার সবাই যে মদ্যপান করছে তা নয়। অনেকের হাতেই কফির কাপ। ওপাশে একজন প্রবীণা মহিলা প্রায় মাতাল হয়ে গান করছেন। তাঁকে ঘিরে অনেকেই হইহই করছে। জো বলল, 'তোমার মা নাতি হওয়ার আনন্দে সেলিব্রেট করছে। বব বিয়ারের জাগ কাউন্টারে রেখে এগিয়ে গেল ভিড়টার উদ্দেশ্যে। দেখলাম সে ওই প্রবীণার কানে-কানে কিছু বলল। প্রবীণা গান থামিয়ে চট করে মুখ ফিরিয়ে কাউন্টারের দিকে তাকালেন বব তাঁকে আবার কিছু বলতেই তিনি টলোমলো পায়ে আসতে লাগলেন আমার দিকে। প্রবীণা উঠে আসায় জমায়েতের ছন্দপতন হল। তারাও আমাকে নিজেদের চেয়ারে বসে লক্ষ করতে লাগল।

প্রবীণা আমার সামনে এসে সেকেন্ডতিরিশেক দাঁড়িয়ে রইলেন মুখের দিকে চেয়ে। অবশ্য সোজা স্থির হয়ে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রবীণা শেষ পর্যন্ত কথা বললেন, 'আই অ্যাম সরি। আমার ছেলে তোমাকে হ্যারাস করেছে বলে আমি দুঃখিত।'

বললাম, 'ওটা আমি এতক্ষণে ভুলে গিয়েছি।'

'ধন্যবাদ।' প্রবীণার ঠোঁটে হাসি ফুটল, 'তোমরা, ছেলেরা, দেখেছি তাড়াতাড়ি ভুলে যেতে পারো, কিন্তু আমরা মেয়েরা কিছুতেই পারি না।'

কী বলব বুঝতে পারছি না। অবশ্যই কথাগুলোর মধ্যে যে ব্যথা মিশে আছে তাতে সদ্যপ্রসবা কন্যার ভাবনা মাখামাখি। হঠাৎ প্রবীণা বললেন, 'আমার নাতি হয়েছে। খুব আনন্দের দিন এটা তুমি আমাদের সঙ্গে জয়েন করবে? আমি সেলিব্রেট করছি।'

অনেক রাত্রে আমরা বোস্টনে ফিরে এলাম। রাত এবং রবিবার বলেই রাস্তায় কোনও মানুষ নেই। ঠান্ডাও বেড়েছে তিনগুণ। কয়েক পাত্র বিয়ার খেয়েও শরীরে তেমন প্রতিক্রিয়া হয়নি। পালকে ফেরার পথে সবই বলেছি। ও শুধু বলেছে, 'আপনি ভাগ্যবান, অচেনা জায়গায় বিপদে পড়তে পারতেন।' কিন্তু আমার সে কথা একবারও মনে হয়নি। একটা বিকেল এবং প্রায় সন্ধ্যা আনন্দিতা দিদিমার সঙ্গে কাটিয়ে মনে হচ্ছিল একজন ভারতীয়ের করা অন্যায়ের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করে এলাম। কানে বাজছিল চলে আসার মুহূর্তে প্রায় মাতাল প্রবীণা বলেছিলেন, 'গুডবাই মাই সন। আই অ্যাম হ্যাপি, বিকজ আই অ্যাম সেলিব্রেটিং মাই গ্রান্ডসন্স বার্থ উইথ ইউ, অ্যান ইন্ডিয়ান।'

॥ ৯ ॥

লন্ডনে একটা থাকার জায়গা দরকার। কলকাতার অধিকাংশ বাঙালির অবশ্য সেখানে থাকার সমস্যা খুব বেশি হয় না। কারণ, কোনও না কোনও পরিবারের সূত্রে লন্ডনের বাঙালিকে পাকড়াও করা যায়। তিনি মনে-মনে না চাইলেও দিনকয়েক তাঁর বাড়িতে থাকতে অসুবিধে নেই। এই প্রসঙ্গে এক ভদ্রলোকের কথা জেনেছি। লেখক শৈবাল মিত্র আমায় বলেছিল, 'লন্ডনে যাচ্ছিস সুভাষের ওখানে উঠিস, চিঠি দিয়ে দেব।' কিছুদিন বাদে অভিনেতা ভীষ্ম গুহঠাকুরতা, যার সঙ্গে শৈবালের যোগাযোগ নেই, বলেছিল, 'লন্ডনে যাচ্ছেন সমরেশদা? সুভাষকে লিখে দিচ্ছি, সোজা ওর ওখানে গিয়ে উঠবেন।' সুভাষ গাঙ্গুলির বাড়িতে ওঠার কথা আমাকে এমন কয়েকজন বলেছেন, যাঁদের মধ্যে পরিচয়ের সুযোগ নেই। তাই মানুষটি সম্পর্কে আমার কৌতূহল হয়েছিল। নয় নম্বর ওয়াশিংটন ক্রিসেন্টের বারো তলায় ভদ্রলোকের বাস। টেলিফোন নম্বর আছে। ইচ্ছে হচ্ছে লন্ডনে গেলে ওঁর ফ্ল্যাটটা একবার দেখে আসার। কীভাবে তিনি এত বঙ্গসন্তানকে থাকার জায়গা দেন?

বোস্টন থেকেই পালকে বললাম টেলিফোনে দীপঙ্করকে ধরতে। দীপঙ্কর ঘোষ বি বি সি-র কর্মচারী। কলকাতা বুক ফেয়ারে এসেছেন ওই সংস্থার সঙ্গে। কলকাতায় বাড়ি। এখন স্ত্রী ও দুই কন্যা নিয়ে পাকাপাকি লন্ডনের বাসিন্দা। দেশ পত্রিকায় লন্ডনের চিঠি লেখার সুবাদে একটু নৈকট্য হয়েছে। আমার গলা শুনে দীপঙ্কর চমকে গেল। নরওয়ে থেকে লন্ডনে না এসে বোস্টনে গিয়েছি শুনে আরও অবাক। অনুযোগ করতে লাগল। বললাম, 'লন্ডনে যাচ্ছি, অল্প পয়সায় একটা থাকার জায়গা দেখুন। দিনপাঁচেক থাকব।' দীপঙ্কর বলল, 'আপনি সোজা আমার বাড়িতে চলে আসুন।'

আপত্তি করলাম, 'সেটা করলে ভালো লাগত কিন্তু সুবিধে হত না। আমি একা থাকতে চাই, তাতে হাজারটা সুবিধে। আপনি হোটেল বা গেস্ট হাউস নিদেনপক্ষে মেস দেখতে পারেন আমার জন্যে।'

দীপঙ্কর বলল সন্ধের মধ্যে আমাকে নামিয়ে দেবে। অতএব বোস্টনের পালা চুকল আমার। আজ সারাদিন কাটল গড়িমসি করে। শুধু ভিডিও দেখা। এমনকী স্নান পর্যন্ত করলাম না। পাল আমার অনারে কোথা থেকে কাঁঠাল আনিয়েছে। বাঙালি। সাহেবদের দেশটাকে আর সাহেবি রাখছে না। স্নানটান না করেই পাল আমাকে জোর করে বের করল একসময়। সে নতুন বাড়ি করেছে। আমাকে দেখাবে। এই রাস্তায় আমি যাইনি। গাড়ি ক্রমশ ওপরে উঠছে ঠান্ডা বাড়ছে। সেইসঙ্গে হাওয়া। তারপর হাওয়াটা বন্ধ হল। দেখলাম দার্জিলিং-এর মতো কুয়াশায় পথ আটকে ছড়িয়ে।

পাল মাইলদুয়েক গাড়ি চালিয়ে যেখানে থামল সেখানে ঠান্ডা সম্ভবত জিরো ডিগ্রিতে। গাড়ির আরাম ছেড়ে বেরুতে বাসনা হচ্ছিল না। কিন্তু নিজের বাড়ির ব্যাপারে বাঙালির অদ্ভুত মমতা থাকে। নির্মাণের সময় থেকেই সে পাঁচজনকে ডেকে দেখাতে চায় তার ভালোবাসার জিনিসকে। কিছু মানুষকে এ ব্যাপারে এমন ইনভলভ্ড হতে দেখেছি যে মনে হয়েছে পৃথিবীর সব সম্পর্ক নস্যাৎ করে তিনি তাঁর সমস্ত ভালোবাসা বাড়িটিকেই দান করেছেন। সিলেট থেকে পরবর্তীকালে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ছিন্নমূল বঙ্গসন্তান পাল নিজের ক্ষমতায় ইংল্যান্ডে জমিয়ে বসেছিল এতদিন। এবার নিজস্ব বাড়ি তৈরি করছে। অতএব সে চাইবেই আমি একবার দেখি।

গাড়ি থেকে নামতেই মনে হল না। গেট খুলে ভেতরে পা দিতে গিয়েই পাল দাঁড়িয়ে পড়ল, 'এখনও কমপ্লিট হয়নি, বুঝলেন। কিন্তু স্ট্রাকচার দেখে আপনার কেমন মনে হচ্ছে বলুন তো?' বত্রিশ পাটির বাজনা শুনতে-শুনতে মাথা নাড়ালাম, ভালো। এইসময় পাশের বাড়ি থেকে এক বৃদ্ধ বারান্দায় বেরিয়ে এলেন, 'গুড আফটারনুন পাল। কাল সারাদিন তোমার বাড়িতে খুব আওয়াজ হয়েছে। আমি অবশ্য কাউকে বের হতে দেখিনি। তাই বলি, তাড়াতাড়ি শেষ করে এখানে চলে এসো।'

পাল বলল, 'মিস্ত্রিগুলো ঝোলাচ্ছে। নইলে কবেই চলে আসতাম।'

'তোমার উচিত ছিল ডাইরেক্ট কন্ট্রাক্টারকে দায়িত্ব দেওয়া।'

পাল উত্তর না দিয়ে হেসে এগিয়ে চলল। যেতে-যেতে চাপা গলায় বলল, 'তাহলে আমি ফতুর হয়ে যেতাম। এসব ব্যাপারে মানুষের চিন্তা দেশকাল ভেদে পৃথক হয় না। দূরদর্শনের প্রাক্তন আঞ্চলিক অধিকর্তা নির্মল শিকদার মশাই আমাকে একই গল্প শুনিয়েছিলেন, সল্টলেকে বাড়ি তৈরি হচ্ছিল তাঁর। প্রতিদিন ছাতি মাথায় রোদ বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি মিস্ত্রিদের কাজকর্ম দেখতেন। স্বভাবত ওই বয়সে পরিশ্রম কম হত না। জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন কাউকে কন্ট্রাক্ট দিচ্ছেন না? তিনি তাঁর স্বভাব অনুযায়ী বললেন, 'একটা গল্প বলি শুনুন। ভিত পুজো করব। আমার স্ত্রী পুরুতকে ডেকে বললেন যা-যা লাগবে তা জোগাড় করে আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে। ওসব ঝামেলা আপনি পোহাবেন। কত লাগবে বলুন একেবারেই ধরে দিচ্ছি। পুরুতমশাই অনেকক্ষণ হিসেব করে বললেন তিনশো টাকা। স্ত্রী তাতেই রাজি। আমার খটকা লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার দক্ষিণা কত?' পুরুত বললেন, 'পঞ্চাশ।' যে-যে জিনিস লাগবে তার লিস্ট নিয়ে বাজার করে ফিরে এসে দেখলাম নব্বুই টাকা খরচ হয়েছে। আগেই কথা ছিল গল্ফগ্রিন থেকে সল্টলেকে পুরুত আমাদের গাড়িতেই যাবে। অতএব তার এক পয়সা ট্রান্সপোর্ট বাবদ খরচ নেই। তাহলে পুজো বাবদ তিনি মাত্র একশো চল্লিশ ব্যয় করবেন আর চাইলেন তিনশো। আমি হিসেব পেয়ে গেলাম। যে বাড়ি নিজে দাঁড়িয়ে করলে দু-লাখ আশিতে শেষ হবে তা কন্ট্রাক্টরকে দিলে পড়বে ছ'লাখ। যতই দাঁড়িয়ে থাকি যতই রোদে পুড়ি তার দাম কি তিন লাখ কুড়ি হবে?'

ছবির মতো একটা রাস্তার দু-ধারে ফাঁকা-ফাঁকা সুন্দর বাড়ি। রাস্তাটা ঈষৎ পাহাড়ি। যদিও ইংল্যান্ডে কোনও পাহাড় নেই তবু অবস্থান অনুযায়ী পাহাড়ি আবহাওয়ায় সারাবছর জুড়ে আছে। পালের বাড়িতে কাজকর্ম প্রায় শেষ শুধু জানলা দরজা বসেনি, চুনকাম হয়নি। এখানে অবশ্য চুনকাম হয় না। পেইন্টস সেই জায়গা নিয়েছে। ইলেকট্রিকের লাইন বসছে। একতলায় একটা হলঘর, গ্যারেজ, দেড়তলায় কিচেন, দোতলায় যতটা সম্ভব সুবিধে দিয়ে কয়েকটা বেডরুম। হঠাৎ মনে হল, এই বাড়িতে একটা বিছানা পেতে এবং রুমহিটার জ্বালালে থাকা যেত। এবং সেই একা থাকাটা কেমন হত? সকালে উঠে কাঁপতে-কাঁপতে চা বানাতাম, বাজারে যেতাম, লিখতাম, যখন ইচ্ছে খেতাম, অনেক অনেকক্ষণ ঘুমাতাম। পৃথিবীর কোনও নিয়মকানুন মানতে হত না। কেউ এসে বলত না এটা করতে হবে, ওখানে চলো। প্রথম দিন যদি এই বাড়িটাকে দেখতাম তাহলে একটা চেষ্টা করা যেত। পাল বলল, 'এর পরের বার যখন আসবেন এই বাড়িতে থাকতে পারবেন। এত নির্জনতা নিশ্চয়ই লেখকদের পছন্দ হবে।' সবই ঠিক। কিন্তু তখন তো আমি এ বাড়িতে একা থাকার সুযোগ পাব না।

আর্থার ফ্রমারকে ইউরোপ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বলা যায়। কোন শহরের কোথায় কত অল্প পয়সার হোটেল থেকে পাঁচতারা হোটেল পাওয়া যায়, কী-কী দেখার আছে, দিনে ও রাতে কী-কী পার্থক্য, এক কথায়, ইউরোপের নাড়ি নক্ষত্র তাঁর জানা। ভদ্রলোক তাঁর এই অভিজ্ঞতা নিয়ে যে বইটি লিখেছিলেন তার বর্তমান নাম, 'ইউরোপ, প্রতিদিন পঁচিশ ডলারে।' যতদূর মনে পড়ছে বইটার একসময় নাম ছিল একই, শুধু পঁচিশের বদলে পাঁচ ডলার। সময় এগিয়েছে। জিনিস পত্রের দাম পাঁচ-গুণ বেড়েছে। এবং এই বেড়ে যাওয়াটা ইউরোপে যতটা হয়েছে এশিয়ার দেশগুলোয় ততটা হয়নি। বোস্টন থেকে লন্ডনে আসার পথে ট্রেনে বসে ফ্রমারের বইটা পড়েছিলাম। ভদ্রলোক লন্ডন সম্পর্কে শুরু করেছেন এভাবে, 'লন্ডন, কারও কারও কাছে, দাগকাটা শহর, যাকে সম্মান দেখানো যায়, উপভোগ করা যায় না। যখন লন্ডনের সব কিছু দেখা হয়ে যায় তখন স্মৃতিতে মনুমেন্ট বা মিউজিয়াম বড় জায়গা নেয় না, বরং ছোট-ছোট কিছু দৃশ্য, যেমন কোভেন্ট গার্ডেনের গ্যালারিতে উপচে পড়া ছাত্রদের ভিড়, রাস্তার এক কোণায় ধোঁয়ায় ভরা শান্ত পাব, কেনিংটোন পার্কে বাচ্চাদের হুল্লোড় অনেককাল মনে পড়ায়। তা ছাড়া লন্ডন হল ইউরোপের সবচেয়ে দরাজ শহর। যে কোনও

বিদেশির এখানে মিশে যেতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না।' পড়তে-পড়তে মনে হল এসব কথা আমি কলকাতা সম্বন্ধেও বলতে পারি। শুধু শেষ কথাটি ছাড়া দুশো বছর সাদা চামড়ার শাসনে থেকেও বিদেশি আমাদের কাছে বিদেশি। ধর্মতলা পার্ক স্ট্রিটের কিছু দালাল ছাড়া একজন সাধারণ চামড়ার ট্যুরিস্ট দেখে কেউ পুলকিত হই না। বরং সার্পেনটাইন লেনে অথবা হরিঘোষ স্ট্রিটে যদি কোনও সাদা চামড়াকে দেখি, এখনও এই সময়েও, পাড়ার ছেলেরা বেশ কৌতুক অনুভব করি। নিগ্রো হলে কথাই নেই। দিলদরাজ কেউ-কেউ এঁদের সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করেন বটে কিন্তু আড়ষ্টতার আবরণ এখনও খসেনি।

স্টেশনে নেমে চমকে যাওয়ার ব্যাপারটা ঘটল না। বরং হাওড়া স্টেশনের কথাই মনে হওয়ায় স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে আসতে পারলাম। নতুন জায়গায় সুটকেশ সঙ্গে থাকলে বাস ট্রামে ওঠা অসম্ভব; অন্তত আমার কাছে। আমেরিকায় ট্যাক্সির ভাড়া চোখ কপালে ওঠার মতো, একবার সেই অভিজ্ঞতা হয়ে যাওয়ার পর লন্ডনের ট্যাক্সিওয়ালা আর কতটা গলা কাটবে? কিন্তু ট্যাক্সি দেখে মন জুড়িয়ে গেল। লম্বা, অনেকটা জায়গার পুরোনো আমলের গাড়ি। ড্রাইভার গম্ভীর মুখে জানতে চাইল, কোথায় যাব। কোনওরকম আড়ষ্টতা না দেখানোর জন্যে গ্রেগরি পেকের গলায় বললাম, 'স্ট্র্যান্ড'। লোকটা এক মুহূর্ত চিন্তা করল। তারপর চটপট একটা কলম আর ছোট প্যাড আমার দিকে এগিয়ে ধরে বলল, 'কিছু যদি মনে না করেন তাহলে বানানটা লিখবেন?' প্রায় গালে চড় খাওয়ায় মতো অবস্থা। আমি এতো কায়দা করে শব্দটা বললাম আমার লোকটা বুঝতেই পারল না! মুখ চোখ লাল করে বানানটা লিখে দিতেই লোকটা কাঁধ ঝাঁকাল, 'ওঃ স্ট্র্যান্ড।' ও যখন ইঞ্জিন চালু করল তখন মনে হচ্ছিল জিজ্ঞাসা করি আমি কী ভুল বলেছি? একটা য-ফলা, সেটা দেওয়া দরকার, সুধাময়বাবু স্কুলে শিখিয়েছিলেন। এ-র উচ্চারণ এ্যা হয়। গাড়ি চলছে লন্ডনের রাস্তা দিয়ে। আমার চোখ ম্যাপের দিকে। এখন আমি বাড়ি ঘর দেখব না। লোকটা আমায় ঠকায় কিনা সেটা দেখতে হবে। এক মিনিটের পথ দশ মিনিট করতে তো এদের জুড়ি নেই। রাস্তাটার নাম কিংসওয়ে, তাতো দেখতেই পাচ্ছি একদম সোজা গিয়ে বাঁ-দিকে ঘুরে নিল। ম্যাপ যদি ঠিক হয় তাহলে এই জায়গাটার নাম অল উইর হওয়া উচিত। ওই তো স্ট্র্যান্ড রোড দেখতে পাচ্ছি। দীপঙ্কর বলেছিল এইখানেই বিবিসি-র বিশাল অফিস। দূর থেকে স্ট্র্যান্ড ইন্টারন্যাশনালের সাইনবোর্ড। সাইন বোর্ড চোখে পড়তেই ট্যাক্সি থামালাম। মোট তিন পাউন্ড দিতে হবে আমাকে। বেশি না কম বুঝতে পারছি না। তিন টাকা ভাবলে লোকটা আমাকে মোটেই ঠকায়নি। কিন্তু ভারতীয় মুদ্রায় পাউন্ডকে পরিবর্তন করলে ওই টাকায় শ্যামবাজার থেকে যাদবপুর যাওয়া আসা করা যেত।

ফুটপাথে এক বৃদ্ধ ভিখিরি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে। দোকানপাটগুলো ঝকঝকে। দুটো দোকানের মাঝখানের ফাঁক থেকেই সরু সিঁড়ি ওপর উঠে গিয়েছে। দীপঙ্কর বলেছিল সাংবাদিক তারাপদ বসু এই হোলেটটি করেছিলেন। তখন নাম ছিল ইন্ডিয়া ক্লাব। ভারতের পরলোকগত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কৃষ্ণ মেননজিও এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। দোতলায় উঠতেই অফিস দেখতে পেলাম। একজন ভারতীয় ভদ্রলোক টেবিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে কাজ করছেন। কাছে গিয়ে বললাম 'আমার একটা ঘর চাই।' তিনি মাথা নাড়লেন, 'সরি। আমাদের সব ঘর ভরতি।' 'কিন্তু আমাকে জানানো হয়েছে যে একটা ঘর আজ থেকে বুক করা হয়েছে।'

'কে করেছেন?'

'বি বি সি-র দীপঙ্কর ঘোষ!'

'ও হ্যাঁ।' ভদ্রলোক দুটো চাবি এগিয়ে দিলেন। একটা আমার ঘরের অন্যটি সদর দরজার। স্নান করতে হবে কমন বাথে। আমার ঘর চারতলায়। দিতে হবে প্রত্যহ এগারো পাউন্ড। এই হোটেলে একটা রেস্টুরেন্ট আছে তিনতলায়। সেটা খাবার সার্ভ করে সময় মেপে। আমাকে ব্রেকফাস্ট দেওয়া হবে এগারো পাউন্ডের মধ্যেই। শুধু খেতে নামতে হবে সকাল দশটার ভেতরে। এইসব কথাবার্তা

হচ্ছিল ইংরেজিতেই। একবার মনে হচ্ছিল লোকটি পাঞ্জাবি, পরক্ষণেই ভাবছিলাম সিন্ধি হতে পারেন। ভারতীয় দেখে বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বাস নেই। সুটকেস টেনে-টেনে চারতলায় উঠলাম। ঝকঝকে প্যাসেজ। নিজের ঘরের দরজা খুলে আলো জ্বেলে চোখ জুড়িয়ে গেল। ঘরটি সুন্দর বিছানা পরিষ্কার। জানলা খুলে দিতেই ওয়েলিংটন ল্যাঙ্কাস্টার প্লেস ও স্ট্র্যান্ড রোডের মোড় দেখতে পেলাম। বাঃ। বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলাম তারপর। অতএব আমি এখন লন্ডনে, একা হোটেলের বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ে আছি। ঘরের দেওয়ালে কোনও দাগ নেই ছাদ নিষ্কলঙ্ক। হঠাৎ মনে হল আমি হাসপাতালে একা। এ জীবনে এখনও আমায় হাসপাতালে যেতে হয়নি। কিন্তু এখন ক্রমশ একাকিত্বের অসুখে আক্রান্ত হলাম। ব্যাপারটা একসময় অসহ্য হয়ে পড়ায় লাফিয়ে নামলাম বিছানা থেকে। এইসময় দরজায় শব্দ হল। কয়েক পা হেঁটে সেটাকে খুলতেই দেখতে পেলাম এক মধ্যবয়সী মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, 'এক্সকিউজ মি, আপনার ঘরে কি ডাবল কম্বল দেওয়া আছে?'

মুখ ফিরিয়ে দেখে নিয়ে জানালাম আছে। ভদ্রমহিলা মাথা নেড়ে চলে গেলেন জুতোর শব্দ তুলে। ভারতীয় মহিলার মুখে পরিষ্কার ইংরেজি উচ্চারণ। হাঁটাচলায় স্মার্টনেস। পরনে সালোয়ার কুর্তার ওপরে একটা ছোট শাল। পরে জেনেছি এই হোটেলটি পরিচালনা করেন যে লোকটি ইনি তার বড় বউ। কাউন্টারে বসে থাকা ভদ্রলোকের স্ত্রী।

দরজা বন্ধ করে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামলাম। এখন ভর বিকেল। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দুপাশে তাকালাম। সিগারেট কেনা দরকার। ভারতবর্ষের মতো পান সিগারেটের ছোট দোকান বিলেতে নেই। অতএব বাঁ-দিকের রকমারি দোকানে ঢুকে পড়লাম। দোকানটি এক ভারতীয়ের। সিগারেটের প্যাকেটের দাম বোস্টন থেকে বিশ পেনি বেশি। কারণ জিজ্ঞাসা করলে সেলসম্যান মাথা নাড়ল, 'আমরা ওই দামেই বিক্রি করি।' অতএব নিতে হল। পরখ করে দেখলাম অন্যান্য জিনিসের দামও একটু বাজার ছাড়া। অবশ্য সেই বাজারটা আমার জানা মফসসল শহর বোস্টনের। সিগারেট ধরিয়ে ফুটপাতে দাঁড়াতেই ডাক পেলাম, 'এই যে স্যার।'

দেখলাম কম্বল মুড়ি দিয়ে বসা সেই বৃদ্ধ সাহেব ভিখিরি আমায় ইশারা করছে। কাছে যেতেই বলল, 'নেশা মানুষ একা করে না। আমাকেও একটা দাও।'

লোকটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে তার সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে। মাথার ওপর একটা ব্যালকনির আড়াল আছে বটে কিন্তু তিনপাশ খোলা। লালমুখো এত বয়সি ভিখিরি আমি আগে দেখেনি। কলকাতার রাস্তায় ভিখিরিরা সিগারেট চায় বটে কিন্তু কখনোই দিইনি। আর এ তো বিলিতি সিগারেট। কিন্তু কৌতূহল হল, জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি এখানেই থাকো?'

'দশ বছর আছি। পুলিশ জানে, হোটেলওয়ালাও জানে, আমি এখানে বসে চারপাশে নজর রাখি। শুধু শীত বাড়লে বিপদ হয় বরফের জন্যে।' বৃদ্ধ হাসল।

একটা সিগারেট দিলাম। কথা বলতে ভালো লাগছে। লোকটার কাছে দেখলাম লাইটার আছে। ধরাল। ইংরেজি ভাষায় সুবিধে হল আপনি তুমি ঝামেলাতে পড়তে হয় না।

'কিন্তু এখানে তো রাত্রে প্রচণ্ড ঠান্ডা, অসুবিধে হয় না?'

'এ আর কী এমন ঠান্ডা। কম্বল মুড়ি দিলে টের পাই না।' সিগারেটে টান দিয়ে বৃদ্ধ এবার জিজ্ঞাসা করল, 'শহরে এর আগে কোনও দিন আসা হয়েছে?'

'না। আজই প্রথম দিন।'

'খুব সাবধানে চলাফেরা কোরো। চোর জোচ্চরে লন্ডনটা ছেয়ে গিয়েছে।'

'তুমি কোন দেশের? ভারতীয় না পাকিস্তানি?'

'ভারতীয়।'

'আ। পকেটে বেশি পাউন্ড নিয়ে হাঁটবে না। সোহোর দিকে যাবে তবে কোথাও ঢুকবে না। আজকাল হাঁটতে আমার খুব কষ্ট হয় নইলে তোমায় গাইড করতাম।'

'বিবিসি-র অফিসটা কোন দিকে?'

'ডান দিকে এগিয়ে রাস্তা পার হয়ে উলটো ফুটপাথে গেলেই পাবে। আর বাঁ-দিকে একটু এগিয়ে দেখবে টেমস নদীকে। যাও, ওদিকটা দেখে এসো।'

লোকটা কথা বলছিল গার্জেনের ভঙ্গিতে। ভালো লাগছিল। ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে এগোলাম। ওয়েলিংটন ল্যাঙ্কস্টার প্লেস ধরে যাওয়ার সময় দেখলাম বন্যার মতো গাড়ি আসছে যাচ্ছে। অথচ একটা হর্ন বাজছে না, ডিজেলের ধোঁয়া বের হচ্ছে না। ঠান্ডা লাগছে। দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাঁটছিলাম। এবং তখনই নদীটাকে দেখতে পেলাম। চওড়ায় আমাদের গঙ্গা তুলনায় কিছুই নয়। ব্রিজটার নাম ওয়াটারলু। নিজেদের কীর্তির কথা স্মরণ করার জন্যেই কি নামকরণ? ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে সেই অপরাহ্নে নদীর দিকে তাকিয়ে অনেকগুলো কবিতার নাম মনে পড়ে গেল। সেই টেমস নদী! নদীতে এখন জল পুলিশের লঞ্চ। স্রোতের টান বড় অল্প। কিন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হল। নির্জনতা এবং নৈঃশব্দ যাদের প্রিয় তাদেরও কখনও-কখনও একটা সময় আসে যখন কথা বললে ভালো লাগে। উলটো দিকে হাঁটতে লাগলাম। বিবিসি-র রিসেপশনে পাহারাদারি বড় কড়া। ইউনিফর্ম পরা কিছু স্বাস্থ্যবান মানুষ সতর্ক চোখে আগন্তুককে দেখে যায়। রিসেপশনিস্ট টেলিফোনে দীপঙ্করকে খবর পাঠাল। আরও দুজন আমার মতো অপেক্ষায় বসে। ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাই। ওই মুহূর্তে আমার ম্যাগাজিন দেখার কথা ছিল না, প্রয়োজনও নেই। তবু কত কি না আমরা অকারণে করে থাকি। দীপঙ্কর এল। পাকা চুল তারপর আমার জামিনদার বলে নিজেকে ঘোষণা করলে ভেতরে যাওয়ার ছাড়পত্র পাওয়া গেল। বুকে একটা ব্যাচ মেরে দেওয়া হল আমার।

সমস্ত পৃথিবীতে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন তাদের প্রোগ্রাম প্রচার করে থাকে এই বাড়ি থেকেই। ভাবতে অবাক লাগে তারা এর জন্যেই কয়েক ভাষায় আলাদা কর্মচারী রেখেছে। দীপঙ্কর সিরাজুর রহমানের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। বাংলাদেশি এই ভদ্রলোক বাংলা বিভাগের প্রধানকর্তা। খুব জমাটি মানুষ। নিজেরও নাটক লেখার অভ্যেস আছে। বললেন, 'এখন তো কাজকর্ম শেষ। চলুন ক্যান্টিনে গিয়ে আড্ডা মারি। দীপঙ্কর তুমিও ডেস্ক গুছিয়ে চলে এসো।' কর্তাব্যক্তিদের এরকম কথাবার্তা বলতে শুনিনি আগে। ক্যান্টিন বলতে এতকাল যে ধারণা ছিল বিবিসি-র ক্লাবরুমে ঢুকে সেটা হোঁচট খেল। যে-কোনও বড় বার কাম রেস্টুরেন্টের চেয়ে কিছু কম নয়। উর্দি পরা কর্মচারীরা কাউন্টারের ওপাশে। তবে যা চাই নিজে নিয়ে আসতে হবে সেখান থেকে। টেবিলগুলো জমজমাট। সিরাজুরকে দেখে অনেকেই হাত নাড়লেন। পছন্দসই টেবিল বেছে নিয়ে সিরাজুর জিজ্ঞাসা করলেন, কী খাবেন, ভদকা না হুইস্কি?'

এখানে সম্ভবত কেউ চা কফি জিজ্ঞাসা করে না। ভদকা আর টনিক দিতে বললাম। বেঁটে খাটো মানুষটি তরতরিয়ে চলে গেলেন। চারপাশে যাঁরা আড্ডা মারছেন তাঁদের একটা আন্তর্জাতিক চেহারা আছে। ব্রিটিশ তো আছেই, আফ্রিকান, জাপানি, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের মানুষদেরও দেখতে পাচ্ছি। সম্ভবত সহকর্মী বলেই আড্ডাটা খোলামেলা। সিরাজুর সেই ভুলটা ভাঙালেন। বললেন, এক-একটা টেবিলে এক-একটা ভাষাকে কেন্দ্র করে আড্ডা জমছে। মাঝে মধ্যে আমার মতো দলছুটরা এ টেবিল ও টেবিলে লাট্টুর মতো ঘোরে। কোথায় উঠেছেন?'

'স্ট্র্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল।'

'ও ইন্ডিয়া ক্লাব! ভালো, পিসফুলি থাকতে পারবেন। নিন।' নিজের গ্লাসটা তুলে ধরে হেসে বলল, 'আনন্দ।'

মদের আসরে যে কোনও বাঙালিকে আমরা 'চিয়ার্স' বলতে শুনি। সিরাজুর সম্পর্কে আমি অবিলম্বে আকৃষ্ট হলাম। সুট পরে থাকা সত্ত্বেও ইনি পুরোপুরি বাঙালি। দীর্ঘদিন বি বি সি-র সঙ্গে জড়িত। ওঁর মুখে পাকিস্তানি আমলের বাংলাদেশের নানান ঘটনা শুনছিলাম। এই সময়ে শঙ্করলাল ভট্টাচার্য আর মানসী বড়ুয়া এল। আনন্দবাজারের শঙ্করলালকে এখানে দেখে আমি অবাক। হেসে

বলল সানন্দার কাজ নিয়ে এসেছে। লন্ডন সম্পর্কে শঙ্করলাল একজন বিশেষজ্ঞ। এই শহরের জীবনযাত্রার নাড়ি নক্ষত্র জানে। শঙ্করলাল বলল, খেতে হলে এই ক্লাবে চলে আসবেন। সস্তায় এত ভালো খাবার কোথাও পাওয়া যায় না। আর মানসীর মতো কেউ থাকলে দামটা দিতে হবে না, সেটা পুরো লাভ।'

মানসী সুন্দরী। কলকাতার মেয়ে। ছড়ায় ভালো হাত আছে। খবরটা পঙ্কজ সাহা বলল। ইনি সেই পঙ্কজ যিনি কলকাতার দূরদর্শনে দর্শকের দরবারে পরিচালনা করতেন। এখন বিবিসি-তে চাকরি করছেন। একটু বাদে পঙ্কজ এসে জমিয়ে তুলল আড্ডা। পঙ্কজকে দেখলাম একইরকম আছে। শুধু শরীরের আবরণ শীতের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য কিছুটা বদল হয়েছে। কিন্তু একমুখ দাড়ি নিয়ে কথা বলার সেই কায়দাটা ঠিকঠাকই রয়েছে। অর্থাৎ সিরাজুর রহমানের বাংলা বিভাগের সংসারটি বেশ চমৎকার। নানান মজার গল্প হচ্ছিল। দীপঙ্কর বলল, 'জানেন মিসেস গান্ধি খুন হওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা খবরটা প্রচার করেছিলাম। অথচ আকাশবাণী অনেক সময় নিয়েছিল। কলকাতার মানুষ প্রথমে বিবিসি থেকেই ঘটনাটা জানতে পারে।' যে ব্যাপারটা আমাকে মুগ্ধ করল সেটা নিয়ে কলকাতায় এক সময় আমরা অনেক ভেবেছি। কাজ হয়েছে অত্যন্ত সামান্য। বাংলা দেশ এবং পশ্চিমবাংলার মানুষের লেখার ভাষা এক। গল্প, কবিতা, উপন্যাসে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, জীবনানন্দ দুই বাংলার সাহিত্যকেই রক্ত যোগাচ্ছেন। অথচ ওপার বাংলার লেখকদের লেখা আমরা পড়ি না। কোনও পশ্চিমবঙ্গীয় পাঠককে যদি দুজন বাংলাদেশি ঔপন্যাসিকের নাম জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে তিনি উত্তর দিতে পারবেন না। এদেশের কাগজে এবং কয়েকজন প্রকাশক শামসুর রাহমন বা সামসুল হক বা জিয়া হায়দারের কবিতা ছেপেছে বলে অনেকে এঁদের নাম জানেন। কিন্তু গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে একদম অন্ধকার। অথচ কনিষ্ঠতম পশ্চিমবঙ্গীয় লেখকের লেখার কথা ঢাকার সাহিত্যরসিকরা জানেন। বাংলাদেশের পাঠকরা তাঁদের মতামত চিঠিতে জানান। ঢাকায় আমাদের গল্প উপন্যাস তিনগুণ দামে বিক্রি হয়। এদেশের পত্রপত্রিকার চাহিদা ওদেশে বেশি। কিন্তু কেন এই একতরফা ব্যাপার। এখন বাংলাদেশে যা লেখালেখি হচ্ছে তার মান আমাদের থেকে কোনও অংশেই কম নয়। বরং আন্তরিক সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা রয়েছে ওঁদের লেখায়। ওঁদের বইপত্র বাংলাদেশি পাঠকেরাও সাগ্রহে কেনেন। একুশে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় বাংলাদেশি লেখকদের বই-এর বিরাট মেলা হয়। তাহলে? আমার ধারণা এর অন্যতম কারণ অনভ্যাস। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে একমাত্র সৈয়দ মুজতবা আলি ছাড়া আর কোনও গদ্য লেখক চূড়ান্ত সফল হয়নি। নজরুল ইসলাম বা জসিমউদ্দিন গদ্য লিখতেন না। মুজতবা আলি সাহেবের লেখা পড়ে মনে হত না তিনি আমাদের অচেনা মানুষ। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছাড়া তাঁর হাস্যরসসৃষ্টির ক্ষমতা এবং বিচিত্র চরিত্রচিত্রণ পাঠকদের আগ্রহ আকাশছোঁয়া করেছিল। ওঁর পরে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজকে পশ্চিমবঙ্গীয় পাঠক নিয়েছে কারণ সিরাজের লেখায় হিন্দু মুসলমান জড়িয়ে ছিল। কিন্তু মুজতবা আলির মতো সাফল্য সিরাজ পাননি। হিন্দু পাঠক নানান কারণে প্রতিবেশী মুসলমানের জীবনযাত্রা সম্পর্কে উদাসীন ছিল এতকাল। ফলে মুসলমানদের জীবনভিত্তিক উপন্যাসকে সাবলীলভাবে গ্রহণ করতে কোথায় যেন আড়ষ্টতা লেগে থাকত। গৌরকিশোর ঘোষ মুসলমানদের জীবন নিয়ে 'দেশ' পত্রিকায় দারুণ একটি উপন্যাস লিখেছিলেন, 'প্রেম নেই।' সেটিকে পাঠকরা দেশ পত্রিকায় পড়ে প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু আলাদাভাবে বই কত বিক্রি হয়েছে তা অনুসন্ধানের বিষয়। পশ্চিবঙ্গীয় মুসলমান পাঠকেরা সংখ্যায় অল্প। সাহিত্যের ব্যাপারে তাঁদের জাতিভেদের উন্নাসিকতা নেই, ধর্ম সক্রিয় ভূমিকা নেয় না। তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গীয় লেখকদের লেখাতে তাঁরা অভ্যস্ত, ফলে বাংলাভাষায় এপারে মুসলমান চরিত্র নিয়ে লেখালেখির চল নেই বললেই হয়। বাংলাদেশি এক মহিলা আমাকে বলেছিলেন, 'সাহিত্যের আবার হিন্দু-মুসলমানত্ব কিছু আছে না কি? সাহিত্য মানে মানুষের কথা। মুসলমানদের কেউ যদি তাঁদের জীবনযাত্রা নিয়েই লেখালেখি করতে থাকেন তাহলে

তাঁকে সরকারি কোটায় একটা জায়গা দেওয়া যেতে পারে বটে কিন্তু সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর আয়ু বেলুনের মতো। মুজতবা আলি সেটা বুঝেছিলেন বলেই তাঁর মানসিকতা ব্যাপক করে নিজেকে এসবের উর্ধ্বে তুলে নিতে পেরেছিলেন।'

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'বাংলা সাহিত্যে হিন্দু লেখকরা যে শুধু তাঁদের নিয়েই লিখে যাচ্ছেন অথচ আয়ু কমছে না, সে ব্যাপারে বক্তব্য কী?'

মুসলমান মহিলা বলেছিলেন, 'বঙ্কিম মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন কি না তাঁর লেখা পড়ে সে কথা মাথায় আসেনি। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র আমাদের পাঠ্যের অভ্যাস তৈরি করে দিয়েছেন। সেই অভ্যাসেই যখন আপনাদের লেখা পড়ি তখন কিছুতেই আটকায় না। শুধু ভাবি লেখাটা সাহিত্য হয়েছে কি না। তা, অন্তত এই সাহিত্য হিসেবে আপনারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সাম্প্রদায়িক।'

বিবিসি এই দুই বাংলার সাহিত্যকে একত্রিত করতে পেরেছেন। যাঁরা নিয়মিত বিবিসি শোনেন তাঁদের কাছে সুনীল গাঙ্গুলি আর শামসুর রাহমনকে একই সংসারের মানুষ বলে মনে হয়। এবং এইটেই কাম্য।

আড্ডাতেই খবর পেলাম অমিতাভ চৌধুরী সস্ত্রীক লন্ডনে এসেছেন। লন্ডনকে এখন আর আমার বিদেশ বলে মনে হচ্ছে না। মানসী আমাদের নেমন্তন্ন করলেন ওঁর বাড়িতে আগামী কাল রাত্রে খাওয়ার জন্যে। ঠিক হল বিকেলে বিবিসি-তে আসব এবং পঙ্কজ আমাকে নিয়ে যাবে সেখানে। তার পরের সন্ধ্যায় দীপঙ্করের বাড়িতে তাবত বাঙালিদের খাওয়াদাওয়া। শঙ্করলাল আমায় বলল, 'এইটেই সুবিধে। এত নেমন্তন্ন পাওয়া যায় যে আর পকেটে হাত দিতে হয় না।'

সকালে ঘুম থেকে উঠে মনে হল কাগজটা দেখলে হয়। জানলা খুলে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম উলটো ফুটপাতে একটা স্টলে কাগজ বিক্রি হচ্ছে। পরিষ্কার হয়ে নীচে নামলাম। এখনও হোটেলের খাবার ঘরের দরজা খোলেনি। অথচ এক কাপ চা খাওয়া দরকার। নীচে নামতেই দেখলাম বৃদ্ধ ভিখিরি সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'চায়ের দোকান কোথায় আছে?'

বৃদ্ধ বলল, 'আধ ঘণ্টা পরে খেলে তো হোটেলে বিনি পয়সায় পাবে ফালতু ষাট পেনি খরচ করতে যাচ্ছ কেন?' চমকে গেলাম। মানুষটিকে ভিখিরি ভাবতে এবার লজ্জা করল। ষাট পেনি মানে বারোটা টাকা। আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করা যায়। কাগজের স্টল থেকে এক পত্রিকা কিনে ঘরে ফিরে এলাম। পাতা ওলটাতেই নজরে পাল, 'এপসন ডার্বি।' এপসন নামক কোনও একটি জায়গায় রেসকোর্স আছে। পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা বাজি এপসন ডার্বির রেস আজ সেখানে হবে। সঙ্গে-সঙ্গে জনের মুখ মনে পড়ে গেল। পড়াশোনা করে বোস্টনে বসে সে আমাকে বলেছিল সিওর চ্যাম্পিয়ন নামের একটি ঘোড়া ডার্বি জিতবে। লন্ডনের প্রথম দুপুরে রেসকোর্সে ডার্বি দেখতে যাব বলে ঠিক করলাম।

॥ ১০ ॥

কলকাতার রেসের মাঠে গিয়ে কিছু মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল যাঁরা নিজস্ব কিছু তত্ত্ব তৈরি করে নিয়েছিলেন। সে-সব যেসব সময় মেলে তা ভাবার কারণ নেই। মিললে তো তাঁরা এতদিনে টাটা-বিড়লাকে ছাড়িয়ে যেতেন। যখন মেলে না তখন পালটা একটা কারণ ঠিক বেরিয়ে যায়। এরকম একটা তত্ত্ব হল, যখন কোনও ঘোড়া জিততে আরম্ভ করে তখন সে না হারা পর্যন্ত তার ওপর বাজি ধরো। চলতি ফর্ম সব অঙ্কের হিসেব গোলমাল করে দিতে পারে। রামচন্দ্রদা বলেছিলেন, জীবনের ক্ষেত্রেও ভাই একই ব্যাপার। যার ওঠার পালা শুরু হয় তাকে আটকানো খুব মুশকিল। সিনসিয়ারিটি এবং এফর্ট থাকলে সে আরও ওপরে উঠবেই তা তুমি যতই বাধা দাও। ঘোড়ার

রেসে এসে আমি জীবনের দর্শন খুঁজে পাই।

ঠিক এই ধরনের মানুষজনের সন্ধান আমি বোম্বাই-এর মহালক্ষ্মী রেসকোর্সে পাইনি। নিউইয়র্কে মনোজের সঙ্গে রেসকোর্সে গিয়েও দেখেছি কিছু লোক উদাসী আলাপ করছে। হয়তো সেখানে আমি বাইরের মানুষ বলেই ভেতরে ঢুকতে পারিনি। তবে ভারতবর্ষে রেস নিয়ে গিয়েছিল সাহেবরা তাদের বিনোদনের জন্য। এবং এখনও যে ব্যাপারটার ওপর জোর দেয় সেটা হল, ন্যায়বিচার। অন্যায় করে ধরা পড়লে কঠোর শাস্তি পেতে হয় এখানে। তা যাঁরা ভারতবর্ষে ঘোড়ার রেস চালু করেছিল তাদের নিজস্ব জায়গায় রেস দেখতে তৈরি হলাম। যে কাগজটা সকালে কিনেছি সেটিতে কোন-কোন ঘোড়া কোন বাজিতে দৌড়চ্ছে এবং তাদের আগের বাজির ফলাফল দেওয়া আছে। উলটেপালটে দেখলাম তত্ত্ব অনুযায়ী যে ঘোড়া দুটি জিতবে বলে মনে হল তাদের কাগজওয়ালা নির্বাচন করেনি। কিন্তু কথা হল এপসনে যাব কী করে। রেস আরম্ভ হওয়ার ঘণ্টাদুয়েক আগে সেজেগুজে রিসেপসনে এলাম। পকেটে পঁচিশ পাউন্ডের বেশি নিইনি। বিদেশে পাউন্ডের দাম অনেক, চাইলেও পাব না। এপসনের নাম শুনে ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'ওয়াটার্লু স্টেশনে চলে যান!' বাঁ-দিকে ঘুরে একটু এগোলেই ওয়াটার্লু ব্রিজ টেমস নদীর ওপরে সেটা গতকাল দেখে এসেছি। স্টেশনটা নিশ্চয়ই সেদিকে হবে। কিন্তু লন্ডনের রেসকোর্সে যেতে গেলে লন্ডন থেকেই ট্রেন ধরতে হবে কেন? নীচে নেমে সেই বৃদ্ধ ভিখারিকে দেখলাম। একটু স্থান বদল হয়েছে। লোকজন গাড়িঘোড়া অবিরত চলছে কিন্তু সে বসে আছে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে। কেউ কেউ দুচার পেনি ছুঁড়ে দিচ্ছে ওর কম্বলের ওপর। আমাকে দাঁড়াতে দেখে বৃদ্ধ বিরক্ত হল, 'এখন গল্প নয়।' এটা ব্যাবসার সময়। যেখানে যাচ্ছ যাও।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্রিজটা পার হয়েই তো ওয়াটার্লু স্টেশন?'

'কোন চুলোয় যাবে?'

'এপসন। রেসকোর্সে।'

'তুমি তো দেখছি চ্যাম্পিয়ন লোক হে। কেটে পড়ো।'

চ্যাম্পিয়ন শব্দটা কানে যাওয়ামাত্র জনের কথা আবার মনে পড়ল। সিওর চ্যাম্পিয়ন ঘোড়াটা নাকি আজ জিতবে ডার্বিতে। বোস্টনে বসে কেউ অনুমান করলে সেটা যে হবেই তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। প্রায় মিনিট কুড়ি হেঁটে নদী পেরিয়ে আমি ওয়াটার্লু স্টেশনে পৌঁছে গেলাম শিয়ালদা স্টেশনের মতোই বড়সড় চেহারা তবে অনেক ঝকঝকে। তিনমিনিট অন্তর একটা করে লোকাল ট্রেন আসছে যাচ্ছে। এপসনের ট্রেন কখন কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে তা খুঁজে বের করলাম ইলেকট্রনিক বোর্ড থেকে। প্রায় আট-ন'টা স্টেশন পেরিয়ে ওখানে নামতে হবে। একটা ট্রেন এখনই বেরিয়ে গেল। কাউন্টারে খোঁজ নিয়ে জানলাম এক পিঠের ভাড়া তিন পাউন্ড। যাতায়াত পাঁচ। মানে একশো টাকা। মনে হল খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে। রেস দেখতে যাওয়ার জন্যে একশো টাকা গাড়ি ভাড়া দেওয়ার বিলাসিতা পোষায় না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে জনতা দেখছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হল এত লোক স্টেশনে ভিড় করছে কিন্তু তাদের মধ্যে ব্রিটিশদের সংখ্যা তিরিশ শতাংশের বেশি নয়। সবই কালো অথবা বাদামি চামড়ার মানুষ। এমনকী যারা রেলওয়ের স্টাফ তাদের মধ্যে একজন সর্দারণীকেও দেখলাম। জায়গাটাকে এখন আর বিলেত বলে ভাবতে ইচ্ছে করছে না। টিকিট কাউন্টারের সামনে ভিড় আছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালাম। এই সময় দুটি মানুষকে প্রায় দৌড়ে কাউন্টারের লাইনে ঢুকতে দেখলাম। ভদ্রলোকের বয়স বছর পঞ্চাশেক। মহিলা পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। মহিলা ফরসা লাল স্কার্ট এবং কালো জ্যাকেট পরনে। মাথার চুল ঘাড় অবধি টুপির মতো, সোনালি রং করা। ভদ্রলোক রোগাসোগা। পরনে সুট। লাইনে দাঁড়িয়েই মহিলা পরিষ্কার বাংলায় ঝাঁজিয়ে উঠলেন, 'তোমার সঙ্গে আমার আর চলবে না। ফার্স্ট রেস তো পাবই না যদি সেকেন্ডটাও মিস করি তাহলে আস্ত রাখবে না।' ভদ্রলোক মিনমিন করে কিছু বললেন। আমি চমকিত। একজন বঙ্গতনয়া এই

সাজে ওয়াটার্লু স্টেশনে টিকিটের জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন, ভাবা যায়। ওঁর শরীর এবং রূপের সঙ্গে সাজগোজের বেমিল খুব একটা না হলেও বয়সটা যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে এটুকু বোঝার সামর্থ কি নেই? বাংলা না বললে তিনজন্মেও বুঝতে পারতাম না বাঙালি। এরা যখন রেসের কথা বলছে তখন নিশ্চয়ই এপসনেই যাচ্ছে। অতএব একশো টাকার মায়া ছেড়ে যখন লাইনে গিয়ে দাঁড়ালাম তখন আমার আগে আরও দুজন এসে গিয়েছে। শুনতে পেলাম মহিলা বলছেন। 'তুমি নিশ্চয়ই ঘুমাচ্ছিলে তাই আমাকে তুলতে দেরি করেছ।'

'না-না। ট্রাফিক জ্যাম। আর হবে না রতি।'

'চুপ করো। কতবার বলেছি আমাকে রতি বলে ডাকবে না। আমার নাম আরতি।' এপসনের রিটার্ন টিকিট কাটল দুজনে। লক্ষ করলাম দুজনে নিজেদের টিকিটের দাম আলাদা দিল। আমি একজন বঙ্গসন্তান সামান্য পেছনে দাঁড়িয়ে আছি তা ওঁরা লক্ষই করলেন না। এখানে বাংলায় কথা বললে কেউ বুঝবে না—এমন ভাবনা কাজ করছিল সম্ভবত ভদ্রলোকের মনে। তাই মহিলার কথাতে বিচলিত হচ্ছিলেন না। খানিকটা দূরত্ব রেখে টিকিট পাঞ্চ করিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকলাম। ওঁদের নজরে রাখলেই হবে। আমাকে আর ট্রেন খোঁজাখুঁজি করতে হবে না। মহিলার মুখ সমানে চলছে। দূরত্বের কারণে বুঝতে পারছি না কথাগুলো। তবে ঘন-ঘন ঘড়ি দেখছেন। তিনটে ট্রেন এল এবং বেরিয়ে গেল ওঁরা উঠলেন না। চতুর্থটিতে উঠে বসলেন ওঁরা স্মোকিং কামরা দেখে। চটপট আমিও উঠলাম এবং জায়গা নিলাম ওঁদের স্মোকিং দুটো সিট ছেড়ে। মুখোমুখি সিটটায় একজন মোটাসোটা ব্রিটিশ এসে বসল। মহিলা আয়না বের করে লিপস্টিকটা ঠোঁটে বুলিয়ে নিলেন। তারপর গম্ভীর বাংলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেকেন্ড রেসে কে জিতবে?'

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'ধরতে পারছি না। খুব টাফ রেস হবে।'

'ডার্বিতে?'

'মনে হচ্ছে দি এম্পায়ার জিতবেই।'

'না যদি জেতে তাহলে তোমার সঙ্গে আজই আবার ছাড়াছাড়ি।'

'তোমাকে তো আমি কত উইনার হর্স দিয়েছি।'

'পাস্ট ইজ পাস্ট। ইদানীং তোমার ব্রেন খুব ভালো হয়ে যাচ্ছে।'

কানখানা ছিল ওদিকে। সামনের সিটের ব্রিটিশ হাত বাড়াল, 'লাইটার প্লিজ।' দিলাম। হাউন্ডের মতো মুখে সিগারেটটাকে খেলনা মনে হল। তিনবার টান দিতেই দেখলাম সেটা অর্ধেকের নীচে নেমে এল। একটু তৃপ্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'গোয়িং ফার?'

এই ট্রেন কতদূর যায় জানি না। মাথা নেড়ে বললাম, 'এপসন।'

'আঃ। রেসকোর্স?'

'ইয়েস।'

'এনি গুড হর্স?'

মাথা নাড়লাম। লোকটা উত্তেজনা নিয়ে আমার দিকে ঝুঁকে এল। খুব আস্তে ওকে আমার পছন্দের ঘোড়ার নাম বললাম। লোকটা খানিকটা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে তাকাল। তারপর জামার হাত গুটিয়ে উল্কি দেখাল। জীবনে অনেক উল্কি দেখেছি কিন্তু এমন উল্কি দেখিনি। একটি মৎসকন্যা পেটে বর্শা বেঁধানো, সে যন্ত্রণায় কাতর। লোকটি উল্কিতে হাত দিয়ে বলল, 'দিস ইজ মাই ড্রিম আই হ্যাভ টু ক্যাচ হার। আই নিড মানি। লট অফ মানি। ডু ইউ নো দ্য প্রাইজ অফ দ্যাট হর্স'

'নো।' মাথা নাড়লাম। লোকটার ভাবভঙ্গি মহিলার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি নিশ্চয় বুঝেছিলেন আমি ওকে কোনও ঘোড়ার নাম বলেছি। বোঝামাত্র ভেতরে-ভেতরে একটা ছটফটানি শুরু হয়ে গিয়েছে বুঝতে পারছি। আমি গম্ভীর হয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলাম। একটার পর একটা স্টেশন এসেছে। বাইরে আর শহর নেই। মাঠঘাট চাষের জমি, বালি বেলুড় ভদ্রেশ্বর। ভারতবর্ষে যে-কোন

রেসকোর্স শহর বা শহরতলিতে। এ তো দেখছি কোলাঘাটে যাওয়ার অবস্থা। স্টেশন আসার আগে ঘোষণা করা হচ্ছে না। আমার চিন্তা নেই। নিয়মিত যাত্রীরা আছে সঙ্গে। প্রতিটি স্টেশনের নামের সঙ্গে আমাদের কোথাও না কোথাও একটু পরিচয় আছে। ইংরেজি ভাষা নিয়ে স্কুল কলেজের বিদ্যেতেই এই পরিচিতি গড়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত এপসনের নাম ঘোষিত হল। ট্রেনটা থামতেই প্রায় অর্ধেক ট্রেন খালি হয়ে গেল। এত ভিড় এড়াতেই আমি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রইলাম। যাত্রীরা বেরিয়ে গেলে একটু হালকা হলে এগোব। তাড়াহুড়োয় আর বাঙালি দম্পতির দিকে নজর রাখিনি। মিনিট পাঁচেক বাদে স্টেশন থেকে বের হলাম। একটা মানুষও পড়ে নেই। দূরে ডাবলডেকার বাস দাঁড়িয়ে আছে। কোনও বাড়ি ঘরদোর নেই। আশেপাশে। শুধু মাঠ আর জঙ্গল। মনে হচ্ছিল আমি ঠিক স্টেশনে আসিনি। একটু এগোতেই নীচে দাঁড়িয়ে থাকা ইউনিফর্ম পরা কন্ডাক্টর ধমকে উঠলেন, 'রেসকোর্স?' আমি মাথা নাড়তেই একই গলায় বললেন, 'হাঁ করে দেখছ কী? উঠে পড়ো যদি সেকেন্ড রেস ধরতে চাও। টিকিট কেটে সোজা দোতলার খালি জানলার পাশে বসলাম। মাত্র জনাদশেক মানুষ গাড়িতে। তাহলে শুধু ট্রেনে এসেই হল না, আবার বাসেও উঠতে হল রেসকোর্সে পৌঁছোতে।

এপসনের যে রাস্তা দিয়ে বাস চলছে তা গুসকরা নলহাটি পাকুড়ের চেহারা। ক্রমশ তাও ছাড়িয়ে গেল। এখন দুপাশে মাঠ জঙ্গল। এক সময় জঙ্গল গভীর হল এমন দোতলায় জানালার পাশে বসেও আমি দেখতে পাচ্ছি না ভালো করে। সন্দেহ হল কন্ডাক্টর রসিকতা করেনি তো! আমি কি ঠিক জায়গায় যাচ্ছি? নীচে নামব বলে ভাবছি এই সময় সমুদ্রের গর্জনের মতো শব্দ তরঙ্গ ভেসে এল। এই শব্দ ফুটবল ম্যাচে প্রিয় দল গোল করলে যে আওয়াজ ওঠে তার সঙ্গে মেলে না, বোলার বল করতে শুরু করলে উইকেট নেওয়ার জন্যে দর্শকরা যেভাবে উৎসাহ দেন তাও অনেক দূরের, এই শব্দের সঙ্গে যেহেতু মানুষের আনন্দ এবং কষ্ট ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাই কয়েক সেকেন্ড দূরে একটা অদ্ভুত আকার নেয়। এবং একমাত্র রেসকোর্সে ঘোড়াগুলো যখন বাঁক ঘুরে শেষ দৌড় শুরু করে তখন পৃথিবীর সবদেশের দর্শকরা ওই শব্দ তৈরি করেন নিজেদেরই অজান্তে। অর্থাৎ আমি ঠিক জায়গায় এসেছি।

বাস থেকেই দেখতে পেলাম কয়েক হাজার গাড়ি পার্ক করে রাখা হয়েছে। বাস টার্মিনাসে প্রচুর বাস দাঁড়িয়ে। প্রায় সিকি মাইল পথ গাড়ি আর বাসের ফাঁক দিয়ে হেঁটে রেসকোর্সের সদর দরজায় পৌঁছোলাম। এর মধ্যে বুঝেছি জায়গাটা রেস ছাড়া নির্জন চুপচাপ থাকে। অর্থাৎ শহর এবং লোকালয় থেকে অনেক দূরে রেসকোর্স করা হয়েছে এবং উৎসাহীদের সংখ্যা তো গাড়ি দেখেই অনুমান করা যাচ্ছে। টিকিটের দাম শুনে হকচকিয়ে গেলাম। কিন্তু এতদূর এসে ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না তখন ছ'পাউন্ডের মায়া ত্যাগ করতেই হল। দু-একজন যারা তখনও ভেতরে ঢুকছে তাদের পেছন-পেছন পা চালালাম।

সুড়ঙ্গ দিয়ে ওপরে উঠে এলাম। দু'পাশে গ্যালারি। সামনে এপসনের সবুজ রেসকোর্স দেখে ভালো লাগল। ডিমের সাইজের বিরাট মাঠ। একটা রেস সবে হয়ে গিয়েছে। দর্শকদের মধ্যে ঢিলেঢালা ভাব। বুকিদের জন্যে কোনও পাকা বন্দোবস্ত নেই। এরিনাতেই যে যার মতো চেয়ার টেবিল নিয়ে বসে গেছেন। পরের রেসে দশটা ঘোড়া দৌড়চ্ছে। আমার পছন্দ, যার কথা ট্রেনে ব্রিটিশ উদ্ধিপরা লোকটাকে বলেছিলাম, এই বাজিতে দৌড়চ্ছে। বুকে ট্রে নিয়ে বুকিদের এজেন্টরা বেটিং দিয়ে বেড়াচ্ছে। ওপরে উঠে গেলাম। সুন্দর রেস্টুরেন্ট। কফির দাম লনের মতো। কফি খেতে-খেতে রেস দেখব ভাবলাম। ডানদিকে জ্যাকপট উইন প্লেস খেলার কাউন্টার। লক্ষ করলাম বয়স্ক দর্শকদের সংখ্যা বেশি। বৃদ্ধবৃদ্ধাদের মধ্যে উচ্ছ্বাস কম, হাঁটা চলায় শিষ্টতাবোধ স্পষ্ট। এবং তখনই সেই লোকটাকে দেখতে পেলাম। উল্কিবাজ আমাকে দেখে হাত নাড়ছে। সটকে পড়ার কোনও উপায় নেই। ওকি আমার পছন্দের ঘোড়া খেলছে? হেসে কাটাতে চাইলাম কিন্তু ও ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠে এল ওপরে। 'হেই মিস্টার। এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তুমি যে ঘোড়াটা বলেছিলে তার প্রাইস জানো?' মাথা

নাড়ালাম। রাগত ভঙ্গিতে লোকটা বলল, 'টোয়েন্টি টু ওয়ান। প্রমোশন পেয়ে এই ক্লাসে এসেছে। ক্লাস মিট করতে পারবে না। তার ওপর অ্যাপ্রেন্টিস জকি চালাবে। নো চান্স।'

খুব আরাম লাগল কথাটা শুনে। আমার জন্যে কেউ হেরে যাবে ভাবতেই খারাপ লাগে। লোকটা কিন্তু গোলমেলে। বলল, 'তুমি তো আমাকে ঘোড়াটা খেলতে বললে, নিজে খেলেছ?'

'খেলব। তবে আমি এখানে নতুন, কীভাবে খেলতে হয় জানি না।'

'নতুন? নতুন হয়ে তুমি ঘোড়া বলছ? আর সেই এশিয়ান মহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে আমি বলে দিলাম তুমি এই ঘোড়াটার নাম বলছ। হেই মিস্টার। আমি অনেক ভাঁওতাবাজ দেখেছি। যদি তুমি ওই ঘোড়ার ওপর টাকা না লাগাও তাহলে—।'

কফি শেষ করে বললাম, 'চলো, আমাকে সাহায্য করো।'

লোকটা আমার সঙ্গে এল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোনও এশিয়ান মহিলাকে তুমি বলেছ?'

'ট্রেনে আমাদের কামরায় ছিল। বাসে ওঠার সময় জিজ্ঞাসা করেছিল।' মনে মনে বললাম সর্বনাশ হয়ে গেল। দু পাউন্ডের টিকিট কাটলাম। লোকটা দেখল। তারপর বলল, 'আমি বাবা কোনও পয়সা লাগাচ্ছি না। ডার্বিতে একটা ঘোড়া মোটা করে খেলব। তোমাকে নামটা বলে দিচ্ছি, দি এম্পায়ারার।'

জনের মুখ মনে পড়ল। বোস্টনে বসে জন ঠিক করেছে ডার্বিতে জিতবে সিওর চ্যাম্পিয়ন। এখন এই বাজিতে আমার ঘোড়ার দর পনেরো। জিতলে তিরিশ পাউন্ড পাব। দু পাউন্ডের বেশি হারতে রাজি নই আমি। গ্যালারির ওপরে উঠে গেলাম হোঁৎকার সঙ্গে। লোকটা আমার সঙ্গ ছাড়বে না। ঘোড়াটা হেরে যাবেই ধরে নিয়েছে এবং তখন মারটার লাগাতে পারে যদিও ভরসা আমি দু-পাউন্ড খেলেছি এবং ওর কিছু ব্যয় হয়নি। আমার পছন্দের ঘোড়ার নম্বর আট। বেশ চকচকে টগবগে। চোখের সামনে দিয়ে যখন স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে নিয়ে গেল তখন ওকে আমার ভালো লাগল। নীচের ক্লাসে জিতেছে বলে কেউ ওকে পাত্তা দিচ্ছে না এখন। এই সময় মাঠে একটু শোরগোল উঠল। ভদ্রমহিলাকে আমি চিনতে পারলাম। সোফিয়া লোরেন্স তার ছেলেকে নিয়ে মাঠে এসেছেন। দর্শকরা তাকে দেখে একটু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে থেমে গেল। সোফিয়ার সঙ্গে রয়েছে তার কিশোর পুত্র। শুনেছি এর মধ্যে দু-দুটো ছবিতে মায়ের সঙ্গে বড় কাজ করে ছেলেটি দর্শকদের নজর কেড়েছে। সোফিয়া লোরেনকে আমি প্রথম দেখি রূপশ্রী সিনেমাহলে 'টু ওমেন' ছবিতে। তখন কিশোর। সুচিত্রা সেনের বাইরে ওই মহিলা আমাকে তখন খুব টেনেছিলেন। জলপাইগুড়িতে বসে যা ওঁর সম্পর্কে জানা সম্ভব জেনেছিলাম। পরে একটার পর একটা ছবি দেখেছি আর মুগ্ধতা বেড়েছে। কর্তাব্যক্তিদের একটা দল সোফিয়াকে সযত্নে নিয়ে গেলেন ভি আই পি গ্যালারির দিকে। মেয়েরা মরে যাওয়ার পরেও সুন্দরী থাকেন যদি আমরা সেইভাবে দেখতে চাই। মনে হল বয়স ওঁকে ভারী করেছে সামান্য কিন্তু আর কিছু নিতে পারেনি কেড়ে। এই সময় সেই শব্দ শুরু হল। সবাই যে যার নিজের ঘোড়ার নাম ধরে চেঁচাচ্ছে। আমার পাশের হোঁৎকা আমাকে ধরল, 'হেই ম্যান, ইওর হর্স ইজ স্টিল লিডিং'। দেখলাম বাঁক ঘুরে আট নম্বর প্রাণপণে ছুটছে আর গোটাআটেক ঘোড়া ঝড় তুলে ধেয়ে আসছে তাকে ধরতে। দূরত্ব কমছে ক্রমশ। আট নম্বরের জকি প্রাণপণে চাবুক চালাচ্ছে। আমাদের সামনে ওরা এল যখন তখন দুনম্বর প্রায় আট নম্বরের পেটের কাছে এসেছে। কিন্তু, সোফিয়া লোরেন এসেছিলেন বলেই হয়তো; আট নম্বর উইনিং পোস্টে প্রথম মুখ বাড়িয়ে থাকতে পারল। সমস্ত মাঠে হতাশার শব্দ গড়িয়ে গেল আর আমাকে ছেড়ে দিয়ে হোঁৎকা দু-হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল। আমি হতভম্ব। অত বড় চেহারার মানুষ প্রকাশ্যে কাঁদছে কেন? দুবার জিজ্ঞাসা করতে কোনওমতে হাত সরাল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করিনি। কী গাধা আমি। উহ্। আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করছে এখন। মাঠে আসার আগে ভেবেছিলাম একটাই ঘোড়া হাজার পাউন্ড খেলব। বিশেষ দর দেখে পিছিয়ে গেলাম। ভাবলাম তুমি ভাঁওতা দিয়েছ। তখন খেলে দিলে এখন একশো হাজার

পাউন্ড পকেটে এসে যেত। ওহ্, কী গাধা।'

শোকের প্রকাশ কমে এলে দেখলাম লোকটার চোখে আমি প্রায় ঈশ্বর হয়ে উঠলাম। পেমেন্ট কাউন্টারে গিয়ে বত্রিশ পাউন্ড নিলাম। বুকিদের কাছে খেললে ট্যাক্স দিতে হত কিছু তাও বেশি পেতাম। বত্রিশ পাউন্ড মানে সাড়ে ছশো টাকা। বাঃ। আর তখনই কাণ্ডটা ঘটাল। কোথায় ছিলেন দেখিনি ভিড়ের কারণে, কচি খুকির মতো ছুটে এলেন মহিলা। হোঁৎকার হাত ধরে গলে পড়তে লাগলেন যেন। হোৎকা বোধহয় নিজের ওপর আরও রেগে গেল। বুড়ো আঙুল নেড়ে আমাকে দেখিয়ে বলল 'ঘোড়াটা ও বলেছিল।' ভদ্রমহিলা আপ্লুত হয়ে সামনে দাঁড়ালেন, 'আমি ট্রেনেই শুনেছিলাম। কী বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব ভেবে পাচ্ছি না। আপনি তো এশিয়ান?' খুব কায়দা করা ইংরেজি বলছিলেন মহিলা। মাথা নাড়লাম, 'হ্যাঁ। কত খেলেছিলেন?'

'একশো পাউন্ড। ট্যাক্স কেটে নিতে বলেছিলাম বেটিং-এর সময়। তাই দু'হাজার পেয়েছি।'

'দু-হাজার পাউন্ড' চল্লিশ হাজার টাকার ওপর। সর্বনাশ!'

'আপনি কি সাউথ ইন্ডিয়ান?' প্রশ্ন ইংরেজিতেই।

'না, আমি পশ্চিমবাংলার মফসসলের লোক।' জবাব দিলাম বাংলাতেই।

প্রায় ভগবান দেখলেন মহিলা, 'কী আশ্চর্য! আমি বুঝতেই পারিনি।' আবেগে এবার হাত জড়িয়ে ধরলেন তিনি, কী যে ভালো লাগছে বোঝাতে পারব না। ও, হাউ সুইট। আমি মিসেস দত্ত। লন্ডনেই আছি পনেরো বছর। আপনি?'

নাম বললাম। কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। মিসেস দত্ত বললেন, কী করেন? নিশ্চয়ই সোর্স আছে। অবশ্য আপনাকে কখনও দেখিনি আগে। এই রেসকোর্সে যারা আসে তাদের মধ্যে বাঙালি থাকলে চিনব না এ হতে পারে না।'

বললাম, 'আমি গত কাল প্রথম লন্ডনে এসেছি।'

'আই সি। দেন বিগিনারস লাক।' ভদ্রমহিলা আমার হাত ছাড়ছিলেন না। দেখলাম দূরে সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক জড়সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে। মিস্টার দত্তরা চিরকালই স্ত্রীদের এভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন? এর পরপরই মিসেস দত্ত প্রশ্নটা করলেন, 'এই রেসে কী খেলব?' ইতি মধ্যে তিনি ফিরে গিয়েছেন ইংরেজিতে ফলে হোঁৎকার বুঝতে অসুবিধে হল না আমি মাথা নাড়লাম, 'দুঃখিত। আমি কিছুই জানি না।'

ভদ্রমহিলা তখন রীতিমতো পীড়াপীড়ি শুরু করলেন। হোঁৎকা বলল, 'তুমি কেন ভাবছ জিতলে আমি তোমাকে কমিশন দেব না। টোয়েন্টি পার্সেন্ট। ঠিক আছে?' আমি হাত তুললাম, 'সারেন্ডার করছি। সত্যি আমি কিছুই জানি না।' মিসেস দত্ত এবার বাংলায় বললেন, 'ঢং করবেন না, বলুন না?'

'এই বাজিতে কিছু নেই।'

'ও, তাই বলুন। তাহলে এই বাজি খেলব না। চলুন রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসি। এই মোটা লোকটা আবার সঙ্গে আসছে কেন? কাটিয়ে দেব?'

বললাম, 'যা ভালো ইচ্ছে করুন। আপনার সঙ্গে কেউ নেই?'

'ও হ্যাঁ। এ্যাই শোনো।' আঙুল তুলে দূরে দাঁড়ানো প্রৌঢ়ের দিকে ইশারা করতেই তিনি এগিয়ে গেলেন। মিসেস দত্ত বললেন 'ইনি বাঙালি। সমরেশ। ওঁর জন্যে দু-হাজার জিতেছি। তুমি যে ছাই কী টিপ করো। আর এ হচ্ছে চাকলাদার। আমার বয় ফ্রেন্ড। আগে খুব ভালো ক্যালকুলেট করত এখন গোলমাল হয়ে যায়।'

স্বামী নন অথচ বকুনি খেয়ে যাচ্ছেন স্বামীর মতনই। চাকলাদার বিমর্ষ গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কী করে ভাবলেন ব্যাচ মিট করবে আট নম্বর। আমার কাছেও ফার্স্ট টাইমার ও-ই হয়েছিল কিন্তু।' বললাম, 'দেখুন পশ্চিমবাংলার গ্রামের ছেলেও মেধা আর পয়সার জোরে বিলেতে এসে ডিগ্রি নিয়ে গেছে ব্রিটিশদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। নেয়নি?'

প্রৌঢ় খুশি হলেন, 'থ্যাংকস।'

'গল্প করার সুযোগ পেলে আর রক্ষে নেই। তুমি এই মোটা লোকটাকে নিয়ে ওপাশে যাও তো আমি আর সমরেশ একটু কোক খাব।' মিসেস দত্ত হোঁৎকার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'এক্‌সকিউজ্ মি।' তারপর চাপা গলায় বললেন, 'চলুন।' আবার আমরা রেস্টুরেন্টে উঠে এলাম। তাকিয়ে বুঝলাম রেস্টুরেন্ট বটে তবে একইরকম চেহারার আর-একটিতে এসেছি। এখানে যা শীত তাতে আমার তৃষ্ণার্ত হওয়ার কোনও কারণ নেই। তা ছাড়া একটু আগে খাওয়া কফির স্বাদ জিভ থেকে যায়নি। আমি কোক খাব না জেনে মহিলা যেন রীতিমতো শোকগ্রস্ত হয়ে বললেন, 'তাহলে আমার জন্যেই আনুন।'

দাম মিটিয়ে দিয়ে এলাম। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রেসকোর্স দেখতে-দেখতে মহিলা বললেন, 'আমার অল্পেই গরম লাগে। এই জন্যেই কলকাতায় যেতে পারি না। যখন উপায় থাকে না তখন রিলেটিভসদের বলি তোমরা দার্জিলিং-এ এসে আমার সঙ্গে দেখা করো। আমি এখান থেকে সোজা দার্জিলিং-এ চলে যাই। আপনি কী করেন?'

'লেখালেখি।'

'রেসের ওপর?'

'না-না! গল্প উপন্যাস!'

'আচ্ছা। তা মশাই পনেরো কুড়ি বছর বাংলা গল্প উপন্যাস দেখিনি, পয়সা হয়?'

'তা হচ্ছে।'

'শুনেছি বাংলা সাহিত্যে এমন লেখা আছে ট্রান্সলেট করালে নোবেল পেয়ে যেতে পারে। দ্যাটস অ্যানাদার ওয়ে অফ বিজনেস। কিন্তু সময়সাপেক্ষ। কী খেলব এই রেসে?'

'বললাম তো, আমি জানি না।'

'আহা ন্যাকা, বলুন না।' সোনালি চুল বাঁ-হাতে চোখের ওপর থেকে তিনি এমন ভঙ্গিতে সরালেন যে সেগুলো আরও দ্রুত চোখের সামনে ছড়িয়ে গেল। বললাম, 'মিসেস দত্ত, আমার রেস সম্পর্কে পাণ্ডিত্য নেই যেটা চাকলাদার সাহেবের আছে। এখানে এসেছি স্রেফ কৌতূহলে। ডার্বি খেলতে।'

'বেশ, ডার্বিতে কে জিতবে?'

'অনেকে বলেছে দি এম্পায়ারার।'

'সেটা তো চাকলাদারও বলছে।'

'দেখা যাক।' সঙ্গে-সঙ্গে পরের রেসটা শুরু হল তীব্র উত্তেজনায় সেটা শেষ হলে মিসেস দত্ত আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন, 'ও সমরেশ, তুমি কী ভালো।' বুঝতে না পেরে হাত ছাড়াতে চাইছি ওর মুঠো আলগা হচ্ছে না, 'চাকলাদার তিন নম্বর খেলতে বলেছিল। তিন নম্বর ফোর্থ হয়েছে। আমার একশো পাউন্ড চলে যেত। তুমি বললে বলে আমি এক পয়সা খেললাম না। তার মানে তুমি একশো পাউন্ড পাইয়ে দিলে।'

শেষ পর্যন্ত ডার্বি রেস এল। মাঠ কানায়-কানায় ভরতি। মিসেস দত্ত বোঝাচ্ছেন আজ ইংল্যান্ডের আশিভাগ মানুষ এই রেসটা কোনও না কোনওভাবে খেলছে। রেসকোর্সে না এসেও এদেশে রেস খেলা যায়। শহরের বিভিন্ন রাস্তায় আইনসঙ্গত বেটিং সেন্টার আছে। সেখানকার টিভিতে প্রতিটি রেস দেখিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে পেমেন্ট দেওয়া হয়। অনেকক্ষণ থেকেই চেষ্টা করছিলাম এদের সঙ্গ ত্যাগ করার। হোঁৎকা এক পাশে মিসেস দত্ত আর-একপাশে এবং চাকলাদার পেছনে। আর আমার মনে হচ্ছিল এই ব্রিটিশ দর্শকদের সঙ্গে ভিড়ে যেতে পারলে আমি বেশি লাভবান হতাম। মিসেস দত্ত এখানে বেশ পরিচিত। কারণ প্রতি দু-মিনিটে অন্তত একবার কাউকে না কাউকে 'হাই' বলছেন। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললাম, 'আমি আজ প্রথম এসেছি, একটু ঘুরে দেখতে চাই।'

'ও। তাই নাকি! চলুন আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি।' মিসেস দত্ত গ্যালারি থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

হোংকা জিগ্যেস করলেন, 'ডার্বিতে তোমার পছন্দ কী?'

'কিছু নেই। তার পরের রেসে একটা আছে?' যে দুটো ঘোড়া হোটেলে বসে স্থির করেছিলাম তার একটিতে পেমেন্ট পেয়েছি। দ্বিতীয়টি ডার্বির পরের বাজিতে। ওদের অন্যমনস্কতার সুযোগে আমি ভিড়ের মধ্যে ভিড়ে গিয়েছিলাম। ডার্বিতে দি এম্পায়ারার আড়াই-এর দর, কিং অফ দি কিংস নামের ঘোড়া ইভান মানি আর জন সাহেবের পছন্দ সিওর চ্যাম্পিয়ন দশের ছয়। দশ পাউন্ড খেললাম সিওর চ্যাম্পিয়ন। জনের ভাগ্য আমার সঙ্গে জড়াক। রেস আরম্ভ হল। জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত হয়ে দেখলাম কিং অফ দি কিংস সিওর চ্যাম্পিয়নসকে হারিয়ে জিতে গেল। দশ পাউন্ডের জন্যে কষ্ট করতে হল না, জনের মুখটা মনে পড়তেই খারাপ লাগছিল। অতদিনের হিসেব এক লহমায় ভুল প্রমাণিত হল। নইলে ডিভোর্সের পরও স্ত্রীকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয় বেচারা।

আবার আমি আমার ভাগ্য দেখতে মোটেই রাজি নই। পরের রেস শুরু হওয়ার মুখে হোংকার সঙ্গে দেখা। 'দি এম্পয়ারার' খেলেছে পাঁচশ পাউন্ড। উন্মাদ হওয়ার দশা। রাগতভঙ্গিতে ঘোড়াটার নাম জানতে চাইল। বললাম। ছুটে গেল কাউন্টারের দিকে। আর আমিই মিসেস দত্তকে দেখলাম। আমাকে দেখে দৌড়ে এলেন, 'আপনি কি লন্ডনে যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'চলুন। আমি আগে চলে যেতে চাই।'

'মিস্টার চাকলাদার?'

'ওকে আমি অ্যাভয়েড করছি। ওর সঙ্গে আমার লাক মিলছে না। এম্পায়ারার খেলিয়ে দুশো পাউন্ড হারাল। আজকাল ওর সঙ্গে আমার লাক ক্লিক করছে না। চলুন।' আর রেসকোর্সে না থেকে বাস এবং ট্রেন ধরে আমরা লন্ডনে ফিরে এলাম। ওয়াটার্লু স্টেশনে পৌঁছে মিসেস দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'পরের দিন রেসে আসবেন?'

আমি মাথা নাড়লাম, 'না। চোখে চোখ রাখলেন মহিলা, 'যদি কোনওদিন এপসনে যান দেখা হবে। বাই।' বড়-বড় পা ফেলে চলে গেলেন রঙিন মহিলা। খারাপ লাগেনি তা নয়, কিন্তু মনে হল আর যাইহোক, মিসেস দত্ত সম্পর্কের চারপাশে বেড়া তুলতে জানেন।

॥ ১১ ॥

লন্ডন শহরের কী-কী দেখার বস্তু রয়েছে তা বাঙালি পাঠক এতদিনে প্রচুর ভ্রমণ কাহিনিতে পেয়ে গিয়েছে। লন্ডন ট্রান্সপোর্ট মাত্র চার পাউন্ড পঁচিশ পেনিতে শহরের কুড়ি মাইল লাল বাস চালান। পিকাডিলির দক্ষিণ প্রান্ত থেকে 'রাউন্ড লন্ডন সাইটসিয়িং ট্যুর' নামক একটি ব্যবস্থায়। স্যামুয়েল জনসন বলেছিলেন, 'কেউ যখন লন্ডন সম্পর্কে অনাগ্রহ প্রকাশ করে তখন বুঝতে হবে তার জীবন সম্পর্কে কোনও আগ্রহ নেই।' খুব বড় কথা। কিন্তু মিউজিয়াম, বাকিংহাম প্যালেস, ওল্ড বেইলি, স্টক এক্সচেঞ্জ অথবা ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবে দেখার আগ্রহ আমার কোনওদিনও হল না। অতদিন নিউইয়র্কে থেকেও আমি স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখতে যাওয়ার কথা ভাবিনি। বরং মনে হয়েছে এই শহরে ডিকেন্সের বাড়ি রয়েছে, শার্লক হোমসের বেকার স্ট্রিট দেখা যেতে পারে, ওল্ড কিওরিওসিটি শাপ যেতে আপত্তি নেই। আর সব চেয়ে ভালো লাগবে রাস্তায়-রাস্তায় হাঁটতে।

গত রাত্রে হোটেলে ফিরিনি। ফিরেছি আজ ভোরে যখন অন্ধকার নেই আবার আলোও ফোটেনি। মানসী বড়ুয়া বিবিসি-র ক্লাবে নেমন্তন্ন করেছিলেন ওঁর বাড়িতে রাত্রে খেতে যাওয়ার জন্যে। পঙ্কজ আমাকে নিয়ে যাবে সেখানে ছুটির পরে এমন কথা ছিল। রাত সাড়ে ন'টার সময় আমরা বি বি সি থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম পাতলা আলো তখন মরেও মরেনি। কিন্তু শীত

তার রেগুলেটার ঘোরাতে আরম্ভ করেছে। আমরা খানিকটা সুখ এবং দুঃখের গল্প করে ট্রেনে উঠলাম। মানসী থাকেন শহরতলিতে। পঙ্কজ জানালে অন্তত মিনিটপঁয়তাল্লিশ লাগবে।

কলকাতা দূরদর্শনে পঙ্কজকে দেখেছি দর্শকের দরবারে চিঠির উত্তর দিতে। যে ভঙ্গিতে তখন কথা বলত এখনও সেই ভঙ্গিটি রয়েছে। ওর জামাকাপড় মুখ চোখ কথাবার্তায় সেই সারল্য মাখানো যা কলকাতায় আসা মফস্‌সলের ছেলেদের প্রথম বছরে থাকে। বিবিসি-তে চাকরি নিয়ে চলে এসে পঙ্কজ ইতিমধ্যে এখানে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ওর ব্যবহারে। শহরের বাইরে একটা ফ্ল্যাটে ভাড়া নিয়ে আছে সে। বরফ গলার সময় সেই ফ্ল্যাটের জলের পাইপ ফেটে ওর অনেক ক্ষতি হয়েছে। পঙ্কজকে জিজ্ঞাসা করলাম কলকাতায় এতদিন আড্ডাবাজ জীবনযাপন করে এখানে এসে কেমন লাগছে?

পঙ্কজ বলল, 'মন খারাপ লাগা, দেশের জন্যে টান বোধ করা—এসব আমি বলব না। আমি তো আর একটু বড় জায়গায় কাজ করব বলে জেনেশুনেই এসেছি। কিন্তু মাঝে মাঝেই খুব একা লাগে। এত বছর কলকাতায় থেকে যে অভ্যেসটা রক্তে ঢুকে গিয়েছিল তার ব্যতিক্রমই একাকীত্ব আনে। আমি তো কখনও চিন্তা করিনি রাত দুপুরে ট্রেন থেকে নেমে একা হাঁটব প্রচণ্ড ঠান্ডায় কুঁজো হয়ে। রাস্তাটাকে গোটাতে-গোটাতে ঘরের দরজায় নিয়ে গিয়ে চাবি হাতড়ে সেটাকে খুলে আলো জ্বালব। প্রথম-প্রথম খুব রোমাঞ্চ হত। এখন একা লাগে। লন্ডনের বাঙালিরা না-বাঙালি না-ইংরেজ। বউ-এর আসার কথা আছে। এলে ঘরের বেল বাজালেই চলবে, তালা খুলতে হবে না। ট্রেন পালটালাম। শুনলাম মানসী মাঝে-মাঝে নিজের গাড়িতেও আসেন। সেটাও কম পরিশ্রমের নয়। কারণ এদেশেও ড্রাইভার রাখতে পারেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন। প্রায় এগারোটা নাগাদ আমরা স্টেশনে নামলাম। টিকিট চেকার গেটে দাঁড়িয়ে। পঙ্কজ তাঁকে ফেরার ট্রেনের সময় জিজ্ঞাসা করল। মাথা তুলে দেওয়াল ঘড়ি দেখে চেকার বললেন, 'এক ঘণ্টা সময় আছে। লন্ডনে ফিরবেন? উপায় থাকলে রাতটা থেকেই যান। ভোরের ট্রেন চারটে পাঁচ-এ।' বাইরে বেরিয়ে এসে মানসীর বাড়িতে একটা টেলিফোন করে পঙ্কজ ব্যাপারটা বোঝাল। ইদানীং রাত্রের ট্রেনগুলো যদি ফাঁকা থাকে তাহলে কিছু হামলাবাজ এশিয়ান দেখলেই ঝামেলা করছে। ছিনতাই তো হচ্ছেই, দু-তিনটে খুনও হয়ে গিয়েছে। লন্ডন থেকে আসার সময় মোটামুটি ভালোই যাত্রী থাকে। কিন্তু ফেরার দুটো ট্রেন প্রায় ফাঁকা।

অস্বস্তিতে পড়লাম। মানসী আমাদের খাওয়ার কথা বলেছেন থাকতে নয়। আমার সমস্ত টাকাপয়সা সঙ্গেই আছে। হোটেলে ফেরার চিন্তাটা মাথা দখল করল। পঙ্কজকে যেতে হবে তিন-চারটে স্টেশন। কাল সকালে তার কাজ রয়েছে। পঙ্কজ বলল, 'ভেবে লাভ নেই। চলুন বাইরে যাই।'

স্টেশনের বাইরে এসে মনে হল সবে সন্ধে হয়েছে। ঘড়ি বলছে এগারোটা পনেরো। যে কোনও মফস্‌সলি শহরের স্টেশন যদি স্টিল টাউন ঘেঁষা হয় তাহলে এমন চেহারা পাবে। মানসীর স্বামী এলেন গাড়ি নিয়ে। সুন্দর হাসিখুশি একটি বঙ্গসন্তানকে দেখে চোখের আরাম হল। মিনিটপাঁচেকের মধ্যেই ওঁদের বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। ছিমছাম রাস্তার ধারে ছবির মতো বাড়ি। মানসী আপ্যায়ন করলেন, 'আসুন, আসুন, দেরি দেখে ভাবলাম আপনারা আবার সোহোতে ঢুকে গিয়েছেন কি না।'

'সোহো।'

'ও পঙ্কজদা, আপনি এখনও সমরেশবাবুকে সোহো দেখাননি?'

'সমরেশদাকে কিছু দেখাতে হবে না। উনি নিজেই পথ চিনে এপসনে গিয়ে রেস খেলে পাউন্ড জিতে এসেছেন আজ।' পঙ্কজ জানিয়ে দিল।

সঙ্গে-সঙ্গে সবাই খুব হইচই করে উঠল। মানসী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি রেস নিয়ে একটা বই লিখেছিলেন, না? দৌড়?'

ভেতরের ঘরে জমিয়ে আড্ডা মারছিল শঙ্করলাল, এক দম্পতি এবং মোটাসোটা এক ভদ্রলোক। মহিলা নাচেন। কলকাতা থেকে লন্ডনে এসেছেন নাচের প্রোগ্রাম করতেই। জানা গেল

ইনি সন্তোষকুমার ঘোষকে চিনতেন। শঙ্করলাল তখন কিছুটা পান করেছেন। ঠাট্টা করে বললেন, 'রবীন্দ্রসঙ্গীত গায় অথবা নাচে, কলকাতার এমন কেউ যদি বলে সন্তোষদাদাকে চিনি না তাহলে তাঁর জীবনে কিস্যু হবে না।' ঠাট্টা হলেও কথাটা সত্যি। দু-বছর ওঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে এই ব্যাপারটা দেখেছি। কিছু হয় কি হয় না সেটা অন্য প্রশ্ন কিন্তু শিল্পীরা মনে করতেন মানুষটি খুব কাছের। রবীন্দ্রনাথ ওঁর রক্তে। ভালোবাসা তৈরি হয়ে যেতে সময় লাগত না। মাঝ দুপুরে পূরবী মুখার্জির বাড়িতে হঠাৎ ঢুঁ মেরে তিনটে গান শুনে এসেছি ওঁর সঙ্গে। রবিবারের বিকেলে বাণী ঠাকুরের বাড়িতে গিয়ে তাসের আড্ডায় জমে যেতে দেখেছি যাঁকে তিনিই মুহূর্তে তাস ফেলে দিয়ে ঝগড়া করেছেন গোরা সর্বাধিকারীর সঙ্গে। সকাল ন'টায় আমার বাড়িতে এসে বাধ্য করেছেন দাবা নিয়ে বসতে। অস্নাত অভুক্ত তিনটে পর্যন্ত খেলে এবং হারিয়ে আমায় নিয়ে গিয়েছেন সুচিত্রা মিত্রের কাছে। এমন মানুষকে বড় অনুভব করি আজ।

লক্ষ করলাম শ্রী ও শ্রীমতী বড়ুয়া পালা করে উঠে যাচ্ছেন আড্ডা ছেড়ে। মানসী কবুল করলেন রান্নাটি কর্তাই ভালো করেন। সেটাকে উৎসাহ দিতে তিনি প্রায়ই ছুটি নিয়ে নেন। আমাদের সামনে তখন সন্ধ্যা মুখার্জির পুরোনো দিনের গান বাজছে। মধ্য রাত্রে লন্ডনের শহরতলিতে কুয়াশা ভেদ করে চাঁদ ওঠে কি না জানি না কিন্তু ঘরের মধ্যে "ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারার মাধবী রাত" ছড়িয়ে পড়েছে।

শেষ ট্রেন চলে যাওয়ার অনেক পরে খাবার পরিবেশিত হল। এবার মানসীকে সমস্যার কথা বললাম। মানসী বলল, 'কোনও সমস্যাই নেই। যদি যেতে চান টেলিফোনে ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি, পঙ্কজকে নামিয়ে হোটেলে চলে যেতে পারেন। পাউন্ডপনেরোর বেশি পড়বে না।'

মধ্যরাত্রে একা অচেনা পথে যেতে আমার সাহস হচ্ছিল না। ট্রেনে ছিনতাই হয় এটা না জানলে হয়তো ঝুঁকি নিতাম। পথে যে ট্যাক্সিওয়ালাই গোলমাল করবে না তার কী নিশ্চয়তা আছে? আর পনেরো পাউন্ড পঁয়ত্রিশ হতে কতক্ষণ। শঙ্করলাল বললেন, 'তিন ঘণ্টার জন্যে টাকাটা কেন খরচ করছেন মশাই। বেশ তো আড্ডা হচ্ছে। এই করে চারটে পর্যন্ত কাটিয়ে দিয়ে ভোরের ট্রেন ধরুন। তখন ট্রেনগুলো খুব সেফ, ছিনতাইবাজরা ঘুমাতে যায়।'

চমৎকার খাওয়া আর সারাদিনের ক্লান্তিতে আমার ঘুম আসছিল। ওঁরা গল্প করে যাচ্ছিলেন। আবছা একটি মুখ আমার সামনে ভেসে উঠছিল বারংবার। পঙ্কজ অথবা মানসী অথবা শঙ্করের গলা দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সেই বাইশ বছরের যুবক যার কোনও আত্মীয় নেই কলকাতা শহরে, যাকে তিরিশ টাকায় মাস চালাতে হয়, রাজা বসন্ত রায় রোডে এক অফিস ঘরের টেবিলে ঘুমিয়ে যার রাত কাটে। মেট্রোর পাশের গলির থেকে তড়কা আর রুটি খেয়ে দৈনিক এক টাকার শেষ দশ পয়সা নিয়ে যে হেঁটে যায় চৌরঙ্গি ধরে গাঁজা পার্ক পর্যন্ত তার চোখের সামনে তখন একটা পাঁচিল ছিল। যা কিছু স্বপ্ন তা সেই পাঁচিলের ওপারেই যা সে দেখতে পেত না। এত বছর ধরে সে প্রাণপণে পাঁচিলটাকে ঠেলে একটু-একটু করে সরিয়েছে জায়গা বড় করতে। কিন্তু সে জানত না কোনও কিছুকে ঠেলে সরাতে গেলে নিজেকেও সেই সঙ্গে সরাতে হয়। ফলে স্বপ্ন থেকে যায় পাঁচিলের ওপারেই। গাঁজা পার্ক থেকে সেকেন্ড ক্লাসে রাতের শেষ ট্রামে ওঠার পর নিয়মিত এক কন্ডাক্টরের সঙ্গে দেখা হত। খালি ট্রামে যুবকের সঙ্গে সে গল্প করত। সুখ দুখের কথা নয়, সায়গলের গান নিয়ে। সেই প্রৌঢ় সায়গলের খুব ভক্ত ছিলেন। যুবক তন্ময় হয়ে শুনত। হয়তো সারাদিনে যে চাপের মধ্যে থাকত রাত দুপুরে সেই মানুষ গুনগুনিয়ে গাইত সায়গলের গলা নকল করে, 'আজ সবার রঙে রং মিশাতে হবে।' লন্ডনের শহরতলিতে মধ্যরাত্রে হঠাৎ সেই যুবক যেন আমায় প্রশ্ন করল, 'কেমন আছ সমরেশ?'

চারটের সময় পঙ্কজ আর আমি বের হলাম। শঙ্করলাল মানসীর বাড়িতেই উঠেছেন, ও ঘুমোতে গেল। জীবনে অনেক ঠান্ডা সহ্য করেছি, সেই বিবর্ণ হয়ে আসা রাস্তার আলো মাখানো ভোরে বাইরে পা দিয়ে মনে হল এমন অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি। শরীরের সমস্ত হাড় কনকনিয়ে

উঠছে, পকেটে হাত ঢুকিয়েও কুঁকড়ে উঠছি। নির্জন রাস্তায় পা ফেলাই ক্রমশ মুশকিল হয়ে দাঁড়াল। ভোর চারটের সময় সান্দাকফুর পি ডবলু ডি বাংলোর বাইরে সূর্যোদয় দেখতে বেরিয়েছি জিরো ডিগ্রিতে যখন উত্তাপ, তখনও এমনটা হয়নি। কোনওমতে পঙ্কজকে বললাম, 'আমি দৌড়ব।' এবং বলামাত্র ছুটতে শুরু করলাম। ডান দিকে শূন্য মাঠ, মাথার ওপরে ঘোলাটে আকাশ, আমার শরীরে উত্তাপ ফিরে আসছিল। অনেক দিন শরীরটাকে এভাবে ছোটাইনি। শীত কমে আসছিল এবং হঠাৎ নিজের ওপর আস্থা বেড়ে গেল। ভোরের ট্রেন কফির গন্ধ জড়ানো। জানলা বন্ধ। আমরা দুজন পাশাপাশি গল্প করতে-করতে আসছি। পঙ্কজ নেমে যাওয়ার পর কামরায় আমি আর এক বৃদ্ধ মহিলা। দুজনের মধ্যে অনেকটা দূরত্ব। এই সময় ছিনতাইকারীরা ঘুমোতে যায়। এটুকুই বাঁচোয়া। ট্রেন পালটে স্ট্র্যান্ড রোডে নেমে যখন হোটেলের দিকে হেঁটে এলাম তখনও আলো ফোটেনি। হোটেলের সদর দরজায় চাবি ঢোকাতে গিয়ে বৃদ্ধের কথা মনে পড়ল। কয়েক পা হেঁটে আবিষ্কার করলাম আপাদমস্তক কম্বলে মুড়ি দিয়ে লোকটি পড়ে আছে। ওই কম্বল কত শীত আটকাতে পারে।

ডাকতে ইচ্ছে হল। পরিষ্কার বাংলায় ডাকলাম, 'দাদু, ও দাদু।'

চতুর্থবারে কম্বল নড়েচড়ে উঠল। বৃদ্ধ ধীরে-ধীরে মুখ বের করল। আমাকে চিনতে পেরে ঘড়ঘড়ে গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'মর্নিং ওয়াক?'

মাথা নেড়ে বললাম, 'না। কিন্তু তোমার ঠান্ডা লাগছে না।'

'আজ একটু লেগেছিল রাত্রে। হোটেলে ছিলে না?'

'না।'

'ঘুমাওনি।'

'না।'

'খুব খারাপ। রাতগুলো ঘুমোনোর জন্যে। তুমি বোকামি করলে আমি ফল ভোগ করব না।'

'পঞ্চাশ পেনি দিয়ে যাও। আর একটা সিগারেট।'

বাধ্য ছেলের মতো হুকুম মান্য করে হোটেলে ঢুকে গেলাম। বিছানায় শুয়েও মুশকিল হল। কিছুতেই ঘুম আসছে না। শুধু এপাশ-ওপাশ সার।

স্নান করে ব্রেকফাস্ট সেরে যখন পথে নামলাম তখন শরীর ঝরঝরে। সোজা স্ট্র্যান্ড রোড ধরে বেয়ারিং রোড পেরিয়ে চলে এলাম ট্রাফালগার স্কোয়ারে। কয়েকশো পায়রা মেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিশাল চাতালে। পাথরের সিংহ তাদের দিকে দার্শনিকের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। সিগারেট ধরিয়ে একটা বেঞ্চিতে চুপচাপ বসেছিলাম। লন্ডনের মানুষেরা এখন ব্যস্ত। তবে আমার মতো অথবা আমার চেয়ে অলস মানুষের সংখ্যা কম নয়। তবে এদের বেশির ভাগই মনে হয় এশিয়ান। গল্প করছে তো করছেই।

হাঁটতে শুরু করলাম। শ্যাফট্স্‌বারি অ্যাভিন্যু ধরে খানিকটা গিয়ে ডিন স্ট্রিটে ঢুকতেই সোহো অঞ্চলে পৌঁছে গেলাম। সোহোতে বিদেশি রেস্টুরেন্ট এবং বারের ছড়াছড়ি। লন্ডনের থিয়েটার পাড়ার উত্তরে, পিকাডিলির খুব কাছেই এই অঞ্চলটা। গোটাপাঁচেক রাস্তা যা অক্সফোর্ড স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে শ্যাফট্স্‌বারি স্ট্রিটে শেষ হয়েছে তাই নিয়েই সোহো। খিদে পাচ্ছিল এর মধ্যেই। দেখলাম ফ্রিথ স্ট্রিটে একটি রেস্টুরেন্টের নাম দি এশিয়া ইন্ডিয়ান। পাল যেমন বোস্টনে ভারতীয় খাবার বিক্রি করছে এটিও তার সমগোত্রীয় নিশ্চয়ই। খোঁজ নিয়ে জানলাম চিকেনকারি, ভাত আর চাটনির দাম সাড়ে চার পাউন্ড। অসম্ভব। নব্বুই টাকা দিয়ে এই খাবারের জন্যে বসা আর আমার পোষাবে না। পার্ক স্ট্রিট পাড়ায় পাঁচরকমের কাবাব, ডিমের পোচ আর মাখন দেওয়া ভাত পাওয়া যায় মাত্র আঠাশ টাকায়। পিটার ক্যাটে। তবে তার নীচে ফ্লুরিতে চা খেতে গিয়ে আবার প্রায়ই মনে হয়েছে বিদেশের যে কোনও মাঝারি দোকানে ওর চেয়ে ঢের সস্তায় চা পাওয়া যায়।

এর পরেই শুরু হয়ে গেল লাইভশো-এর পাড়া। এর কথাই গত রাত্রে ঠাট্টা করে বলেছিলেন মানসী। দুপাশের বাড়িগুলোর গায়ে বিজ্ঞাপনে খোলাখুলি বলা হয়েছে যৌন আনন্দ বিতরণ করার

কী-কী অদ্ভুত ব্যবস্থা তারা করেছে। বেস্ট বেডগেম অফ দি ওয়ার্ল্ড থেকে আরম্ভ করে নানা ক্যাপশন। সেই সঙ্গে নগ্ন মহিলাদের ছবি। নিউইয়র্কের টাইব স্কোয়ারে মনোজের সঙ্গে এই দৃশ্য দেখেছি। আগ্রহ দূরের কথা, একটা গা ঘিনঘিনে ভাব শরীরে এল। ইতিমধ্যে দালাল জুটে গেছে চারপাশে। তারা নানান প্রলোভন দেখাচ্ছে। সন্ধ্যেবেলায় ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে হেঁটে গেলে যেসব বাক্য এককালে খুব শুনতে হত তাই এরা আওড়াচ্ছে। তফাত এই যে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের দালালরা কালো চামড়ার, এরা সাদা। হঠাৎ একজন বলল, 'ইন্ডিয়ান গার্ল স্যার, ফ্রেস ফ্রম ইন্ডিয়া। ওয়ান্স সি। বিউটিফুল উইদ লং হেয়ার।'

অবাক হলাম। সোহোর শরীর প্রদর্শন কেন্দ্রে ভারতীয় মেয়ে? ভারতবর্ষে গ্রাম থেকে যেসব মেয়েকে আরবদেশে পাচার করা হয় তাদের কেউ? হতে পারে। দলটাকে এড়াতে বললাম, 'আমি এ ব্যাপারে আগ্রহী নই মোটেই। তোমরা নিজেদের সময় নষ্ট করছ।' মিনিটখানেক একা হেঁটেছি এমন সময় সেই লোকটি দৌড়াতে-দৌড়াতে এল, 'স্যার লুক শি ইজ কামিং'। ওর হাত লক্ষ করে উলটো ফুটপাথে তাকালাম। শো হাউসগুলোর সামনে দিয়ে ভিড়কে তোয়াক্কা না করে একটি দীর্ঘাঙ্গিনী শাড়ি পরা মেয়ে এগিয়ে গিয়ে ডান দিকে ঢুকে গেল। যেমনটি হাঁটা চলা এবং শাড়ি পরার ধরন বলে দিচ্ছে সে দক্ষিণ ভারতের নয়। গায়ের রং খুব ফরসা নয়, তবে সে কালোও নয়। বললাম, আমি তো আগ্রহী নই। লোকটা হাসল, 'ইউ আর ফ্রম ক্যালকাটা?'

মাথা নাড়লাম। সে আরও বিনয়ী ভঙ্গিতে জানাল, 'শি ইজ ফ্রম ক্যালকাটা।' এবার থমকালাম। 'হ্যাঁ, বাঙালি বলে মনে না হওয়ার কোনও কারণ নেই। এবার কৌতূহল হল। লন্ডনের সেক্সশপে বাঙালি মহিলা? লোকটাকে বললাম, 'দ্যাখো তোমাদের ব্যাবসায় আমি আগ্রহী নই। ওই মেয়েটির সঙ্গে আমি পাঁচ মিনিট কথা বলতে চাই।'

'নো প্রবলেম। টোয়েন্টি পাউন্ডস।'

আমি আর বাক্য না করে হাঁটতে শুরু করলাম। লোকটা পেছন ছাড়ল না। কুড়ি থেকে নামতে-নামতে পনেরো দশ, সাতে এসে বলল, 'স্যার পে মি টু পাউন্ডস। বাট শি উইল নট মিট উইদাউট এ বিয়ার।' তার মানে বড়জোর পঞ্চাশ টাকা খরচ হবে কিন্তু সেটা এমন একটি অভিজ্ঞতার বিনিময়ে কি খুব বেশি? রাজি হলাম। যাওয়ার আগে চারপাশে নজর বুলিয়ে নিলাম। সোহোতে এই পাড়ায় লোকে আসে সেক্সশপ দেখতে। ভারতীয়রা অবশ্য দোকানগুলোর সাইনবোর্ড দেখেই চলে যায় বাকিংহাম প্যালেস দেখতে। যেহেতু আমি দলটার সঙ্গে হাঁটছি তাই কেউ আমাকে আর বিরক্ত করছে না। একটা দোকানের দরজায় বিশাল চেহারার মহিলা দাঁড়িয়ে কাউকে খুব বকছিল অসভ্যতা করার জন্যে। মেয়েটার পরনের জিনসের প্যান্টটাকে ড্রামের মতো দেখাচ্ছে। দালালটা তার কাছে আমাকে ছেড়ে দিয়ে সুড়ুৎ করে পাশের গলিতে ঢুকে গেল। মহিলার রাগ তখনও কমেনি। সেই মুখেই আমায় বলল, 'ওয়েলকাম। গো ইনসাইড।' সামান্য যেটুকু জায়গা মিলল সে সরে যাওয়ায় তার ফাঁক গলে দরজা ঠেললাম। ঢুকতেই ছোট্ট একটা কাউন্টার। কাউন্টারের পেছনে টিকটিকির মতো একটা লোক বসে। বলল, 'ফাইভ পাউন্ডস।' আচ্ছা ফ্যাসাদ। জানালাম আমি শো দেখতে আসিনি। প্রায় মিনিটতিনেক লাগল ওকে বোঝাতে, দালালের সঙ্গে আমার কী কথা হয়েছে। একটু বিরক্ত হয়েই টিকটিকি ডানদিকের দরজা ঠেলতে ইঙ্গিত করল। ভেতরে ঢুকলাম। রেস্টুরেন্টের মতো টেবিল চেয়ার সাজানো। ঘর শূন্য। তবে টেবিল চেয়ারগুলো এমনভাবে রাখা আছে যে সবাইকে এক দিকে মুখ করে বসতে হবে। আর সেই দিকটায় বিশাল পরদা টাঙানো। হঠাৎ কোত্থেকে একটি নিগ্রো মেয়ে এগিয়ে এল যার পরনের পোশাকের জন্য মোটেই বেশি কাপড় খরচ হয়নি। সমস্ত শরীরে মোচড় দিয়ে মেয়েটি বলল, 'শো শুরু হতে সামান্য দেরি আছে। আমরা ততক্ষণে একটু বিয়ার খেতে পারি, কী বলো?'

বললাম, 'খুব দুঃখিত। আমি শো'র জন্যে আসিনি। একজনের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। সেটা শেষ করেই চলে যাব।'

'কিন্তু আমি যে তোমার সঙ্গে কথা বলে ফেললাম।'

'সেটা তোমার সমস্যা।'

মুখ ভেংচে মেয়েটি চলে গেল। পর্দার শেষ প্রান্ত দিয়ে তাকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম। অর্থাৎ ওদিক দিয়ে যাতায়াতের পথ আছে। একটা চেয়ার টেনে বসলাম। অস্বীকার করব না আমার বেশ ভয়-ভয় করছিল। ঝোঁকের মাথায় এমন কাজ না করলেই হত। এখন যদি এরা জোর করে আমার পকেটের সব পাউন্ড নিয়ে নেয় তাহলে কোনও ঝামেলাও করতে পারব না। সিগারেট ধরিয়ে ভাবছিলাম উঠে যাওয়া যায় কি না। এই সময় পরদার প্রান্ত নড়ল। মিনি স্কার্ট পরা কাঁধ খোলা এক মধ্যবয়সিনী দুলকি চালে এগিয়ে আসতে লাগল। তার কালো চুল থেকে জেল্লা ছড়াচ্ছে টান টান নিতম্ব পর্যন্ত। এই মেয়েটিকেই যে রাস্তায় শাড়ি পরা অবস্থায় কিছুক্ষণ আগে দেখছিলাম তা বুঝতে সময় লাগল। আমার সামনের টেবিলের এক কোণে নিতম্বের কিছুটা তুলে নিয়ে মেয়েটি কায়দা করে বলল, 'হাই।'

কিন্তু আমি বুঝে গিয়েছি। স্পষ্ট বাংলায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করব বলে এসেছি। আপত্তি আছে?'

মুখ চোখ শক্ত হয়ে গেল। মেয়েটা আমাকে বুঝতে চাইছে। বললাম, 'কোনও বদ মতলব নেই। সোহোতে বাঙালি মেয়ে দেখে অবাক হয়েছি তাই।'

'কেন? অবাক হওয়ার কী আছে?' মেয়েটি উঠে হাততালি দিয়ে বলল, 'দুটো বিয়ার।' ভাবলাম বলি দুটো নয়, একটার কথা ছিল। কিন্তু মেয়েটি আমায় সময় দিল না। পাশের চেয়ারে এসে বলল সে, 'দেখুন মশাই লাইট হাউস, গ্র্যান্ড হোটেলের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতাম সন্ধেবেলা। দুশো টাকাও কোনওদিন হাতে পাইনি। ঘর ভাড়া, পুলিশকে দিতেই চলে যেত অর্ধেক। মাঝে-মাঝে লালবাজারেও চলে যেতে হত। এখানে রোজ পঞ্চাশ থেকে একশো পাউন্ড রোজগার করছি নেট। মানে এক থেকে দু-হাজার টাকা। ব্যাবসা তো একই।'

'এলেন কীভাবে?'

'এক সাহেবকে খদ্দের হিসেবে পেয়েছিলাম। তার আমাকে পছন্দ হয়ে গেল। বলল, 'তোমার এমন চমৎকার শরীর নিয়ে এখানে কেন পচে মরছ? তার পরামর্শে আমি পাশপোর্ট ভিসা করলাম। করে চলে এলাম।' মেয়েটা হাত বাড়িয়ে বিয়ার নিল। যে এনেছিল তার পোশাকও তদ্রুপ।

'আপনি কি...মানে এই ব্যাবসায় ছোটবেলাতেই এসেছেন?'

'মোটেই না। যাদবপুরে থাকতাম। সেখান থেকে সিনেমায় নামতে গিয়েছিলাম। হয়ে গেলাম বেশ্যা। রাত্রে বাড়ি ফিরে যেতাম।'

মেয়েটা হাসল।

'কলকাতা থেকে লন্ডনে আসার সময় ভয় লাগেনি?'

'মিথ্যে বলব না, লেগেছিল। ইংরেজি জানতাম না তো! সেই সাহেব আমাকে রুডির জিম্মায় দিয়ে গেল। রুডি হল এ পাড়ার একজন শের। আমাকে যাচাই করে রুডি বলল, 'এখন থেকে তোমার জিম্মা আমার। যা পাবে তার পঁচাত্তর তোমার, পঁচিশ আমার। কিন্তু কোনও বাস্টার্ড তোমার গায়ে হাত দিতে পারবে না। তাই হল। রুডি আমাকে ইংরেজি শিখিয়েছে। বাঙালি বলে ডিমান্ড আছে আমার। এখানকার পেতনিরা তো হিংসেতে জ্বলে পুড়ে মরে।'

খিলখিল করে হেসে উঠল সে।

'দেশে ফিরে যাবেন না?'

'কোন দুঃখে? ওই কলোনি, ওই রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোতো ক্যাপ্তেনদের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকা? উ ম্যাগো!' মুখ বাঁকাল সে।

'এখানে কোথায় থাকেন?'

'কাছেই ফ্ল্যাট নিয়েছি। ওই দালালটাকে রেখেছি স্বামী হিসেবে। নইলে তো এদেশে থাকার অনুমতি পেতাম না। বাড়িতে আমি কিন্তু ভাত খাই। ভাত না খেলে আমি বাঁচবই না। বিয়ার শেষ।

আপনার তো শুনলাম কোনও ধান্দা নেই।'

'না নেই। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। এবার আপনার নামটা বলুন।'

তাজ।

তাজ? বাঙালি মেয়ের নাম? অবশ্য মুসলমান হলে আলাদা কথা।

না। এখানে আমার নাম মমতাজ। মানে তাজ। লোকে খুব সহজে ডাকতে পারে।

'দেশে কী নাম ছিল?'

'মমতা। মমতা ভট্টাচার্য। বামুনের মেয়ে।' একচোট হেসে নিল সে। তারপর বলল, মমতার সঙ্গে একটা 'জ' দিলেই কিন্তু মমতাজ।'

'আপনি কলকাতায় থাকেন?'

'হ্যাঁ। বেড়াতে এসেছি।'

'হুম। কাটুন এখন। যদি কখনও আসেন রুডির কাছে আমার খোঁজ করবেন। অবশ্য এইডস না হলে। ওই ভয়ে আজকাল সিটিয়ে থাকি। জানাশোনা কারও হয়েছে?

'দুজন। একটা মরে গেছে। লোকগুলোকে তো বুঝতে পারে না কেউ, তারপর মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'কলকাতায় এইডস পৌঁছে গেছে?'

'হ্যাঁ। যেখানে এই ব্যাবসা সেখানে না গিয়ে পারে?' উঠে দাঁড়ালাম। মেয়েটা অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে, 'ছেলেবেলায় উলটোরথে সিনেমায় নায়িকাদের ইন্টারভিউ পড়তাম। আপনি ঠিক সেইভাবে জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে। আচ্ছা চলি।' সে চলে গেল পরদার প্রান্ত দিয়ে। আর তার শরীর ঘেঁষে পরিবেশনকারিণী বিল নিয়ে এল। বিল দেখে আমার চক্ষু চড়ক গাছ। দুটো বিয়ারের দাম দশ পাউন্ড, সার্ভিস চার্জ তিন পাউন্ড। অর্থাৎ তেরোটি পাউন্ড আমাকে দিতে হবে। আক্কেল সেলামি আর কাকে বলে। দেওয়ার পর মেয়েটি দাঁড়িয়ে রইল হাসি মুখে। অর্থাৎ টিপস চাই। তাও দিলাম।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই সেই দালালটি এগিয়ে এল 'কথা কয়ে গেছে স্যার।'

'বিয়ারের দাম যে এত তা তখন বলোনি কেন?'

'আপনি তো জিজ্ঞাসা করেননি।'

রাগটাকে গিললাম। কিন্তু শরীর জ্বলছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি তাজের স্বামী?'

'হ্যাঁ, এটাও আগে জিজ্ঞাসা করেননি।'

'তোমার বাড়িতে আর কে আছে?'

'দারা। আমাদের ছেলে।'

'দারা? তাজের ছেলে আছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। এখানে আসার পর হয়েছে। দেশে নাকি দুটো আছে।'

'বলেনি? ও দেশেই বিয়ে করেছিল?'

বা। এসব আপনি জিজ্ঞাসা করেননি? করেননি বলেই বলেনি। দিন আমাকে আমার কমিশন। দু-পাউন্ড। খুব গম্ভীর মুখে লোকটা আমাকে কথাগুলো বলল। আর প্রশ্ন করলাম না, যদি এতক্ষণ শোনা সত্যিগুলো মিথ্যে হয়ে যায়।

॥ ১২ ॥

এ যাত্রায় লন্ডনের বলার মতো কোনও ঘটনা আমার ঘটেনি। দিন রাত হেঁটেছি যেভাবে ট্যুরিস্টরা হাঁটে। একমাত্র মাদাম তুশোর বাড়ি ছাড়া আর কিছুই তেমনভাবে টানেনি আমায়। ব্রিটিশদের ইতিহাস

নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও প্রয়োজন বোধ করিনি। অতএব মিউজিয়াম, স্ট্যাচু, রানির বাড়ি বা বিভিন্ন গ্যালারি দেখার আগ্রহ হয়নি। মাদাম তুশোর বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিলাম বেকার স্ট্রিট টিউব স্টেশন থেকে বেরিয়ে। অতীত ও বর্তমানের খ্যাতনামা মানুষের মূর্তি মোমে ঢালাই করে সেখানে রাখা আছে। এত নিখুঁত সেইসব মূর্তি যে জীবন্ত বলে মনে হয়। মাইকেল জ্যাকসন, জন ম্যাকেনর, এলভিস প্রেসলি, জন এফ কেনেডি থেকে শুরু করে পাবলো পিকাসো অথবা উইনস্টন চার্চিলের সামনে দাঁড়ানো একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা। চোখের দিকে তাকাতেই মনে হয়েছিল পিকাসো আমাকে দেখছেন এবং এইমাত্র কথা বলে উঠবেন। চার পাউন্ড দক্ষিণা, ঢোকার আগে খুব গায়ে লাগছিল কিন্তু 'দি চেম্বার অফ হররস' দেখে বেরিয়ে আসার পর সেটা ভুলে গিয়েছিলাম।

লন্ডনের রাস্তায় সেই বৃদ্ধ ভিখারি ছাড়া আর কারও সঙ্গে রাত-বেরোতে রাস্তায় পা দিলে ছিনতাইবাজদের কবলে পড়তেই হবে। তারা নাকি এশিয়ান দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাই নিউইয়র্কের মতো লন্ডনের রাত দেখার সৌভাগ্য হয়নি। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ আমি সর্বত্র দেখেছি। প্রথমবার যখন গিয়েছিলাম তখন ভিসা লাগেনি। দ্বিতীয়বারে প্রয়োজন হয়েছিল। ইংল্যান্ডে ভারতীয়দের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে যাচ্ছিল। এক মাসের নাম করে ঢুকে সারা জীবন কাটিয়ে দেওয়া মানুষের সংখ্যা কম নয়। তাদের পরবর্তী প্রজন্মের সংখ্যাও কম নয়। এই জনস্রোত আটকানোর জন্যেই ভিসার ব্যবস্থা। ইউরোপের দেশগুলোর নাগরিকদের পরস্পরের সীমানা পার হতে পাশপোর্ট ভিসার প্রয়োজন হয় না। একজন ফরাসি ইংল্যান্ডে বিপজ্জনক নয় কারণ সে সেখানে জেঁকে বসবে না। ভারতীয়দের বিশ্বাস করছে না ওরা। এই প্রতিক্রিয়া পড়েছে সাধারণ মানুষের ওপর। ঠিক যেভাবে এখনও কেউ-কেউ কলকাতায় বসে বলে থাকে, 'বিহারিরা এসে দখল করে নিল শহরটা, প্রতিমাসে কত কোটি টাকার মানিঅর্ডার যায় মুলুকে,' ঠিক একই ভাবনা ওদের আমাদের সম্পর্কে। বাঙালি নন এমন ভারতীয় মানেই নানারকম ব্যাবসা ফেঁদে বসেছেন। দেশ থেকে আত্মীয়দের এনে সেই ব্যাবসাতে ঢোকাচ্ছেন। বাঙালি দু-একটা রেস্টুরেন্ট করেছে নইলে চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের দেশে শিক্ষিত ভারতীয়দের সংখ্যা কম নয়। ফলে খুব চটে যাচ্ছে তরুণ ব্রিটিশরা। শাড়ি পরা মেয়ে দেখলে যেমন তারা আওয়াজ দেয় তেমনি ভারতীয়দের ওপর হামলাও করে। লন্ডনের প্রতিটি রাস্তা যখন সভ্যভব্য মনে হয়েছিল তখন বিবিসি-র দীপঙ্কর ঘোষের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে অন্য অভিজ্ঞতা হল। ওর বাড়ির পেছনে একটা বাজার আছে। সেখানে পৌঁছে আমি হতভম্ব। মনে হল বড়বাজারে চলে এসেছি। ফুটপাত জুড়ে জিনিসপত্র ডাঁই করে রেখে কেনাবেচা চলছে। পুরো এলাকায় কোনও ব্রিটিশের দোকান নেই। এমনকী বাজারের ভেতরে যে লোকটা সবজি বিক্রি করছে সেও অভারতীয়। আফ্রিকা থেকে আখ এনে ফুটপাতে সাজিয়ে রেখেছে। একেবারে দেশজ অভ্যাস নিয়ে আরাম করে রয়েছে মানুষগুলো। বেশির ভাগই গুজরাতি। ওখানেই জানতে পেরেছিলাম লন্ডনের টেলিফোন ডাইরেক্টরির অনেকগুলো পাতা প্যাটেলরা দখল করে রেখেছিল এতদিন এবার মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনও তারা জিতেছে। একজন আমাকে বলেই ফেললেন, 'সতেরোশো সাতান্ন সালে বাঙালিদের বিশ্বাসঘাতকতায় ব্রিটিশ ভারতবর্ষ দখল করেছিল। দুশো বছর ওরা রাজত্ব করেছে। ঠিক হ্যায়। কিন্তু দেখবেন বিশশো সাতচল্লিশের মধ্যেই ইংল্যান্ডের প্রাইম-মিনিটস্টারশিপ আমাদের হাতে চলে আসছে। অন্তত ওই গুজরাতি অধ্যুষিত এলাকায় দাঁড়িয়ে মনে হল ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। যে দেশের রেলের কুলি, বিমান বন্দরের জমাদার, ট্যাক্সিওয়ালা থেকে শুরু করে স্বৈরিণী পর্যন্ত ভারতীয় সেই দেশ-এর চেহারা পঞ্চাশ বছর বাদে কী হবে কে বলতে পারে। আর এই কারণে এত ভারতীয় বিদ্বেষ। এখন পাকাপাকিভাবে থাকার অনুমতি সরকারই দিচ্ছে না। কিছুদিনের মধ্যে যদি 'ভারতীয় হঠাও' আন্দোলন শুরু হয়ে যায়, বিচ্ছিন্নভাবে কোনও কোনও শহরে এর মধ্যে হয়েছেও, তাহলে আমরা এদেশে বসে ক্রুদ্ধ হব, দুঃখ পাব, এই পর্যন্ত। আগেই বলেছি। ব্রিটেনকে নিজের দোষে পস্তাতে হচ্ছে। একটা দেশের কিছু লোক নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে

তাদের ডেকে রাজত্বটা দিয়ে দিয়েছিল, দশ বছর ধরে তাদের শোষণ করেছিলি, তারপর ছিবড়ে হয়ে গেলে চলে গেলি, এই ভালো ছিল। তা না করে সেই দেশের মানুষকে শিক্ষিত করতে গেলি, শেক্সপিয়র শেলি পড়ালি, খ্রিস্টান করতে আরম্ভ করলি, ভদ্রতা সভ্যতা শেখালি, এর ওপর মেধাবী ও বড়লোকদের ছেলেদের তোদের দেশের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার অনুমতি দিলি। অত বছর ধরে একটা পাসপোর্ট ভিসার ব্যবস্থা করলি পাফেলে কালাপানি পার হওয়ার কড়ি যোগাড় করেই রাম-শ্যাম-যদু-মধুরা হুড়মুড় করে তোদের দেশে চলে যেতে লাগল সাহেব হওয়ার জনে। আর ধর্মভাইরা তো ভেবে নিল তাদের ওটা হকের ব্যাপার। আফ্রিকায় এই ভুলটা খুব বেশি করিসনি। এমন কি বার্মাতেও নয়। ছাগলকে বেড়ার ফাঁক দেখালে কি আর বাগানটাকে বাঁচানো যায়। এখন বেড়া মেরামতের চেষ্টা করলে কী হবে কাজ যা হওয়ার তো হয়েই গেছে। ধর্মের কল বোধহয় এইভাবে বাতাসে নড়ে। আর এইসব অভাজনরা যারা দেশের বাইরে গেলেই হোমসিকনেসে ভোগে তারা লন্ডনে পা দিয়ে স্বস্তি পায় এই ভেবে যে বাবার দেশে এলাম।

পাহাড়ে যেমন একবার হাঁটলে আর একবার যেতে ইচ্ছে করে বিদেশের বেলাতেও সেটা খুব খাটে। এই আমি, যার অনেক কিছু করার কথা ছিল না, অথচ একটার পর একটা তো হয়েও গেল, দুবার বিদেশ ঘুরে এসেই মনে হয়েছিল, যাক বাবা, এত কপালে লেখা ছিল, সেই আমি জানতাম না পরের বছর আবার যেতে হবে ইতালি আর ফ্রান্সে। সে এক লম্বা সফর। ভারী-ভারী ব্যাপারগুলো নিয়ে আর কলম চালাতে চাই না। কয়েকটি মানুষের মুখ এই মুহূর্তে মনে পড়ছে যাদের কথা বলে এবারের মতো লেখা শেষ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

এতদিন যার সুটকেস নিয়ে বিদেশ ঘুরেছি সেই মুকুন্দ আর আমার অনুজ দেবনাথ ছিল সঙ্গে। ওরা হিসেব করে দেখেছিল চার বছর দেশের ভেতর ঘুরেবেড়িয়ে যা খরচ সেই টাকায় একবার বিদেশ ঘুরে আসতে পারে। প্রথমবার যাওয়ার সময় ওরা নির্বাচন করেছিল ইতালি আর ফ্রান্স। উঁচু নজর সন্দেহ নেই।

রোমের এয়ারপোর্টের নাম লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চি। একজন শিল্পীর নামে এয়ারপোর্ট এখন পর্যন্ত আমরা ভাবতে পারিনি। এক্সচেঞ্জ কাউন্টারে পৌঁছে মন ভরে গেল। একটা ডলার ভাঙিয়ে দু-হাজার লিরা পেয়ে গেলাম প্রায় এক টাকায় একশো ষাট লিরা বলা চলে। রোম শহরের প্রধান স্টেশনটির নাম টার্মিনি স্টেশন। শব্দের পেছনে ই অথবা আ যোগ করলে অনেক ইতালিয়ান শব্দ তৈরি হয়ে যায়। দেবু এ ব্যাপারে খুব পারদর্শী ছিল। স্টেশন থেকে বেরিয়ে ডান দিকে হেঁটে খানিকটা গেলে ভিয়া ক্যাসেফিডারো। তার একত্রিশ নম্বর বাড়ির বন্ধ দরজার গায়ে বেল। সেটি টিপলাম। বেলের গায়েই স্পিকার। সেখানে গলা বাজল। প্রথমে ইতালিয়ানে 'বুঅন জোরনো?' এক বিন্দু বুঝলাম না, শুনেছি এখানে থাকা যায়। আমরা বিদেশি, থাকতে চাই। এবার সুন্দর ইংরেজি শুনলাম, 'দরজা খুলে গেলে ভেতরে ঢুকে সেটাকে চেপে বন্ধ করবেন দয়া করে। তারপর কয়েক পা সোজা হেঁটে এলে একটা লিফট দেখতে পাবেন। লিফটের গর্তে পাঁচ লিরা ফেলে তিনতলার বোতাম টিপুন। আমি অপেক্ষা করছি।'

কলকাতায় আমরা এমন আকাশবাণীতে অভ্যস্ত নই। আলাদিনের স্বপ্নের মতো দরজা খুলে গেল। পয়সা ফেলে লিফটে চড়ার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। তিনতলার বারান্দায় একজন মধ্যবয়সি মহিলা দাঁড়িয়ে। সামান্য ঝুঁকে হাসিমুখে বললেন, 'গুড আফটারনুন। আমি সিলভা মস্টোভানি। এই পেনসন চালাই। কীরকম ঘর আপনাদের চাই?'

জানলাম তিনটে বিছানা, পরিষ্কার ঘর আর একটা ঝকঝকে বাথরুম পেলেই চলবে। বাথরুম ঘরে নয়। তিনটি ঘরের বাসিন্দাদের জন্যে দুটো রয়েছে কমন প্যাসেজের শেষে। ইউরোপে ঘরের ভেতর বাথরুম চাওয়া বিলাসিতা। তিন ডবল দাম হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। কেন জানি না। ঘর দেখিয়ে সিলভা জানালেন, আমাদের তিনজনের জন্যে তিনি নেবেন পঁয়তাল্লিশ হাজার লিরা। স্নানের জন্যে পয়সা লাগবে না। অন্য জায়গায় নাকি গরম জলের জন্যে পয়সা দিতে হয়। সকালে এক

কাপ চা করে দিতে পারবেন। প্রতি কাপ একশো লিরা পড়বে। খাবার খেতে হবে বাইরে। ঘরের এবং সদরের চাবি দিয়ে দেবেন। আর যদি সম্ভব হয় কাজ চালানোর মতো কিছু ইতালিয়ান শব্দ যেন শিখে নিই। সিলভা চলে গেলে মুকুন্দ কাগজপত্র নিয়ে বসল। এর মধ্যেই বারেবারে বিদেশি মুদ্রাকে ভারতীয় টাকায় পরিণত করে যাচাই করে দিচ্ছে। হিসেব করে সে বলল, 'এই ঘরটায় থাকার জন্যে দৈনিক আমাদের দুশো একাশি টাকা দিতে হবে। দেশে তো আজকাল ভালো জায়গায় দেড়শো টাকার নীচে ঘর পাওয়া যায় না। ঠিক আছে। কী?' মুকুন্দ এবং দেবু ইতিহাসের স্তম্ভ। রোম মানেই ঠাসা ইতিহাস। রোম মানেই চার্চ। রোম মানে যেমন নীরো তেমনি মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, রাফায়েল, ব্রামন্তে, বোনিনি। সবার ওপরে আছে সেই প্রাচীনকালের রোমের স্মৃতি বুকে নিয়ে কলোসিয়াম। এসবের বর্ণনায় যাওয়া এই রচনার লক্ষ্য নয়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দুই সঙ্গীর তাড়নায় এসব দেখে নিলাম কয়েকদিন ধরে। খাওয়াদাওয়া নিয়ে আমার বা দেবুর কোনও বাছবিচার ছিল না। বেচারা মুকুন্দ পড়ত মুশকিলে। কেক বা পাঁউরুটির ওপর থাকতে হত ওকে। আমরা যে ঘরে থাকতাম তার পাশের দরজাটি সারা দিনরাত আধ ভেজানো থাকত। একটি লোককে দু-একবার দেখেছি সেখান থেকে বের হতে। মধ্যবয়সি। জামাপ্যান্টে খুব স্বাচ্ছন্দ্যের ছাপ নেই। একদিন আলাপ করলাম। হাত নেড়ে বলল, 'ইংলিশ নট মাচ। ইতালিয়ান।' শেষ শব্দটি উচ্চারণ করার সময় বুকে হাত দিল। এই ক'দিনে বুঝে গিয়েছি ইতালীয় মানুষও ইংরেজি ব্যবহার করে না। তাদের প্রয়োজন পড়ে না বলেই। কয়েকজন গাইড ভাষাটা শিখে নিয়েছে ব্যাবসার সুবিধের জন্যে। ফরাসিদের শুনেছি এ ব্যাপারে স্পষ্ট জেহাদ আছে। ঈর্ষার কারণেই তারা ইংরেজি শেখেনি। কিন্তু ইতালিয়ান গোছের বই কিনে নিয়েছিল। তাই দেখে প্রশ্ন করত সে। বেশিরভাগ সময় উচ্চারণের গোলমালে বিপাকে পড়তে হত। লোকটিকে পছন্দ হচ্ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় সমীরদা আমাকে খুব টানত। রোগা গলাভাঙা মানুষটি ছবি আঁকতেন হাওড়ার এক গলির ভেতরে চিলেকোঠার ঘরে বসে। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'ইচ্ছে হলে ছবি আঁকি নইলে ঘুমাই।' অনেকটা শিবরামদার কথা। শিবরামদার সঙ্গে গল্প হত বালক দত্ত লেনে দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাসা করতেন, 'তুমি ঘুমাও তো? ভালো। ঘুম ভালো জিনিস। ঘুমালে মানুষ বদলে যায় না। আমি সকালে উঠে দই মিষ্টি নিয়ে গিয়ে পেটে চালান করে দিয়েই ঘুমিয়ে পড়ি। দুপুরে চারটি মেসের ভাত পেটে পুরে ঘুমিয়ে থাকি। বিকেলে একটু চোখ মেলে আবার ঘুমিয়ে পড়ি। আর এত ঘুমের পরিশ্রম করলে সারা রাত না ঘুমিয়ে থাকা যায়?' তাহলে লেখেন কখন? শিবরামদার সেই উত্তর তো সবাই জানেন। 'কেন? পরের দিন।'

এই ইতালিয়ান লোকটাকে দেখে মনে হল ঘুমের সঙ্গে তার মিত্রতা প্রগাঢ়। আমার সঙ্গে কথা বলার সময় মাঝে-মাঝেই চোখ বন্ধ করছিলেন। ঝট করে মাথায় এল ড্রাগ খায় নাকি? শিবরামদার সময় ড্রাগ নিয়ে এত শোরগোল ওঠেনি। নইলে তাঁকেও ওই সন্দেহ করা হত। ভাঙা ইংরেজিতে লোকটি যা বলল তার সারমর্ম হল, পেন্সনের এই ঘর তার আস্তানা। সম্পত্তি যা ছিল তা বিক্রি করে ব্যাংকে রেখেছে। খিদের সময় রাস্তায় বের হয় নইলে দিনরাত পড়ে-পড়ে ঘুমায়। অনেকে দেখে বুঝেছে যে ঘুমানোর মতো সুখ আর কিছুই নেই। মদ বা ড্রাগ খায় না। ও সবে পয়সা নষ্ট হয়। সপ্তাহে একদিন সন্ধের পর বের হয়। কাছেই একটা থিয়েটারে সুন্দরী মেয়েদের নগ্ন নৃত্য হয়। ঘণ্টাদুয়েক তাই দেখে আসে। কারণ জানতে চাইলে বলল, 'আমার স্বপ্নের সুন্দরীদের এক সপ্তাহের মধ্যে এক ঘেয়ে লাগে। তাই ওটা দেখে নিয়ে পরের সপ্তাহের স্বপ্ন-সুন্দরীদের চেহারা পালটে দিই।' লোকটা হাসল, 'মন খুলে যদি ঘুমাতে পার তাহলে দেখবে তোমার কোনও কষ্ট নেই। আরে শরীরটা জন্মেছে আরাম পেতে, তাকে আরাম না দেওয়া অপরাধ। খরচের বালাই নেই, নির্দোষ ব্যাপার।' লোকটা ঢুকে যেত নিজের ঘরে। পৃথিবীর কিছু মানুষ দেশ কাল ভেদেও বেশ একই ভাবনা ভাবতে পারে। তার মধ্যে ডুবে যেতে চাইলে ওরা দুইজন।

দুপুরবেলায় ভাটিকান সিটিতে পোপের বাড়ির সামনের বিশাল চাতালে দাঁড়িয়ে আপেল পাহ

খাচ্ছিলাম। ধর্মপ্রাণ মানুষেরা এখানে প্রতিনিয়ত আসছেন। শুনেছি এখানে পোপের কথাই শেষ কথা। ইউনিফর্ম পরা প্রহরীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাটিকানের শিল্পসংগ্রহ দেখে বন্ধুরা অত্যন্ত মুগ্ধ। আমার ঠিক স্বস্তি হচ্ছিল না। রাস্তায় যেটুকু হাঁটছি, নিজেদের মধ্যে কথা বলছি। কোনও ইতালিয়ানের সঙ্গে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে গেলে তিনি ইংরেজি সম্পর্কে অক্ষমতা জানিয়ে চলে যাচ্ছেন। এ অবস্থায় মানুষ জানা সম্ভব নয়। আপশোশ হচ্ছিল, এখানে আসার আগে কেন ইতালিয়ান ভাষাটা শিখে এলাম না।

রোমাটার্মিনিস্টেশন থেকে ভেনিসে যাওয়ার পথে নামলাম ফ্লোরেন্স। পথে একটা মজার ব্যাপার হল। সেকেন্ড ক্লাস ট্রেনেও ছয়জন করে বসতে পারে এক-একটা কুপেতে। সেই আসন হয়তো আমাদের রাজধানী এক্সপ্রেসেই পাওয়া যায়। আমার পাশে একটি মেয়ে খুব টানটান বসেছিল। ট্রেন চলেছে। বন্ধুরা পাশের কুপেতে। হঠাৎ মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে মাতৃভাষায় কিছু বলল। আমি হেসে বললাম, 'সরি। আমি তোমার ভাষা জানি না।' ওপাশের এক ভদ্রলোক কিছু বললেন। মনে হল ভাষাটা ফরাসি। মাথা নাড়লাম বুঝতে পারছি না। এবার মেয়েটি ব্যাগ খুলে প্যাড বের করল। ঘসঘস করে কিছু লিখে এগিয়ে দিল। দেখলাম তাতে লেখা—ইন্ডিয়ান? আমি মাথা নাড়লাম। সঙ্গে-সঙ্গে ওরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতে লাগল। মেয়েটি প্যাডটার ওপর দুটো ছেলেমেয়ের ছবি আঁকল। ছেলেটার তলায় লিখল ইন্ডিয়া, মেয়েটির তলায় ইতালি। মাঝখানে এক যোগচিহ্ন। বুঝলাম এরা রাজীব আর সোনিয়ার কথা বলতে চাইছে। আমি মাথা নাড়লাম। এইভাবে মূকাভিনয় ছবি আর টুকরো ইংরেজি শব্দ নিয়ে প্রায় চার ঘণ্টায় পথ কেটে গেলে আমরা ফ্লোরেন্সে নামলাম।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে ভারী সুটকেস টানতে-টানতে আমরা নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। দেবু গাইড বুক দেখে জেনে নিয়েছে কোন রাস্তার কোন হোটেলে আমরা উঠব। যেন অনেকবার এসেছে এমন ভঙ্গিতে সে রাস্তা চিনিয়ে আমাদের নিয়ে যাচ্ছিল। এক সময় প্রায় কাউকে জিজ্ঞাসা না করে ম্যাপ দেখে আমরা পৌঁছে গেলাম। হাতে একবেলা সময়। রাতটা কাটিয়ে কাল সকাল বেলাতেই ভেনিস রওনা হব। ভেনিস আমাকে টানছে। ইতালির এই পুরোনো শহরে মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর দারুণ-দারুণ কাজ আছে। ইতালিয়ান রেনেসাঁসের দলিল এখানে ছড়ানো। র‍্যাফেলের 'ম্যাডোনা অফ দি চেয়ার' মানেই ফ্লোরেন্স। প্রায় চল্লিশটা মিউজিয়াম আর আর্ট গ্যালারির মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল ইউফিজি গ্যালারি আর পিত্তি প্যানে। কিন্তু পণ্ডিতরা বলেন পিয়াজা স্যান মাকোর কাছে 'অ্যাকাডেমিয়া' দেখা মানে সমস্ত ইউরোপ ঘুরে বেড়ানো সার্থক। এখানেই মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর মূল ছবিগুলো রয়েছে যার মধ্যে 'ডেভিড' অন্যতম।

অ্যাকাডেমিয়া থেকে যখন বেরিয়ে এলাম তখন সন্ধে হয়ে গিয়েছে। গ্যালারির সামনের ফুটপাতে দোকান বসে গিয়েছে। ট্যুরিস্টদের কাছে নানারকমের স্যুভেনির বিক্রি করছে এরা। এই ব্যাপারটি একেবারে ভারতীয় মেজাজের। সম্ভবত মুসোলিনী না জন্মালে এদের সঙ্গে বাঙালিদের কোনও পার্থক্য থাকত কি না বলা মুশকিল।

'হ্যালো স্যার।' ইংরেজি শব্দ দুটো কানে আসামাত্র ঘুরে তাকালাম। মধ্যবয়সি একটি স্মার্ট লোক ছোট্ট একটা স্যুভেনির স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে হাসছিল, 'ইউ আর ফ্রম ইন্ডিয়া, মাইট বি ক্যালকাটা?' বললাম, ঠিকই বলছ। 'আই ওয়াজ ইন ইন্ডিয়া। কলকাতাতেও গিয়েছি। এখান থেকে হিচহাইক করতে-করতে পৌঁছে গিয়েছিলাম। ভারতীয়দের আমি পছন্দ করি।' লোকটা হাসল।

হঠাৎ যেন মনে হল চেনা মানুষকে দেখছি। লোকটিকে আমরা চা খেতে অনুরোধ করলাম কিন্তু সে রাজি হল না। বলল, 'এই দোকান আমার বন্ধুর। বেচারার অসুখ তাই আমি অ্যাটেন্ড করছি। এখন গল্প করতে পারব না। তোমাদের যদি ইচ্ছে হয় কাল সকালে আমার বাড়িতে চলে এসো। ফ্লোরেন্স থেকে বেরিয়েই ডান দিকে একটা মাঝারি পাহাড় দেখতে পাবে। বাস যায়। চলে এসো। সেই পাড়াতেই আমার বাড়ি।'

'জায়গাটার নাম কী?'

'নাম ঠিক কিছু নেই। বাসে উঠে কন্ডাক্টরকে বলবে সাদা বাড়িতে নামব। জঙ্গল পাথর

দেখতে-দেখতে, তোমরা নিজেরাই দেখতে পাবে বাড়িটাকে। আমার কোনও প্রতিবেশী নেই। আমি আর আমার স্ত্রী থাকি। আজ আমার শাশুড়ি এসেছেন। কাল সকালেই চলে যাবেন। পাহাড়ে চাষ-টাস করি। পয়সা ফুরিয়ে গেলে শহরে নেমে কাজ করি। নির্জনতা যদি পছন্দ হয় চলে এসো।'

দেবু বলল, 'খুব লোভ হচ্ছে কিন্তু আমরা কাল সকালেই ভেনিস যাচ্ছি। প্রোগ্রাম ঠিক করাই আছে।' ইট বাঁধানো রাস্তা দিয়ে ফেরার সময় লোকটাকে খুব ঈর্ষা হচ্ছিল। এইরকম নির্জনে চুপচাপ থাকার সাধ ছিল আমারও।

দুপুর নাগাদ আমরা ভেনিস পৌঁছোলাম। ট্রেনে আসার সময় অনেক দূর থেকেই জল আর জল দেখতে পাচ্ছিলাম। বন্যার সময় ফরাক্কায় ঢোকার আগে যেমন দুপাশ জলে ভরা থাকে, ট্রেন চলে ধীর গতিতে অনেকটা সেই অবস্থা। ভেনিসের একমাত্র রেল স্টেশনটার নাম স্ট্যাজোন সেন্ট্রাল সান্তা লুসিয়া। চার মাইল পাথরের ব্রিজ ভেনিসকে ইউরোপের সঙ্গে যুক্ত রেখেছে। ফ্লোরেন্স থেকে এখানে পৌঁছোতে চার ঘণ্টা লাগল।

ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমেও অনুমান করতে পারিনি শহরের চেহারা। আর পাঁচটা স্টেশন থেকে সান্তা লুসিয়া আলাদা নয়। থাকার জায়গা দরকার। এর মধ্যে দালালের দেখা পেলাম। দেবু দরাদরি করতে লাগল। বইপত্র বলছে ভেনিসের হোটেলগুলো মোটামুটি দুটো জায়গায় ঠাসা। স্টেশনের ধারে আর শহরের প্রাণকেন্দ্র সেন্ট মার্কাস স্কোয়ারের কাছে। জিনিসপত্র রাখার ব্যবস্থা করে ফেলল দেবু। যাকে দালাল ভাবছিলাম সে হোটেলের মালিকের ছেলে। একটু-আধটু ইংরেজি জানে। বলল, 'এত কমে তোমাদের ঘর দিচ্ছি জানতে পারার পর বাবা যে কী বলবে তাই ভাবছি। এসো সঙ্গে।' স্টেশন থেকে বেরিয়ে মন ভরে গেল। বিশাল চাতালের গায়েই ক্যানেল। গন্ডোলা, লঞ্চ, বোট চলছে। ওপাশেও রাস্তা। রাস্তার গায়ে সার দেওয়া বাড়ি। একটা ব্রিজ আছে খালের ওপরে। হাঁটতে-হাঁটতে দেখলাম ফুটপাত জুড়ে রকমারি দোকান। ইতালিয়ান সুন্দরীরা দোকান চালাচ্ছে। আমাদের দেখে হাসিমুখে মাথা নাড়ছে কেউ কেউ। চট করে দার্জিলিং-এর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। রোম বা ফ্লোরেন্সে এইরকম দোকান দেখিনি। গায়ে-গায়ে রেস্টুরেন্ট, তার মেনু কার্ড বাইরে টাঙানো। দেবু জানাল ভেনিসের পিজ্জা খেতে হবে। রাস্তা থেকেই সিঁড়ি উঠে গেছে সোজা। খাতাপত্তরে নামধাম পাসপোর্ট নম্বর লিখে চাবি নিয়ে ঘরে ঢুকলাম। চমৎকার। মুকুন্দ হিসেব করল ভারতীয় টাকায় প্রায় তিনশো পনেরো টাকা পড়ছে প্রতিদিন। দেবু বলল, 'মুকুন্দা, অত হিসেব করবেন না। ভেনিসে আসব তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।'

তিনদিন ভেনিসে ছিলাম। একটা ছোট্ট শহর আর তার জল আমাকে বিভোর করেছিল। দিনরাত লঞ্চে চেপে পাড়ি দিয়েছি এদিক-ওদিক। ঢেউ-এর ধাক্কা লেগেছে জলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা বারান্দায়। এখানে কোনও মিউজিয়াম বা স্ট্যাচু দেখার নেই। প্রকৃতি আর মানুষের আশ্চর্য সহাবস্থান অনুভব করার জন্যই আসা। এমনকী সেন্ট মার্কাস স্কোয়ারের বিশাল চাতালে অগুনতি পায়রা দেখতে-দেখতে উগান্ডার যুবকের সঙ্গে গল্প করা, অথবা নীল সমুদ্রের জলরাশি ভেঙে ছোট্ট মোটর বোটে চেপে মুরানো, বুবানো অথবা টরসেল্লো দ্বীপে সারাদিন পাড়ি দিয়ে আসার তুলনা নেই। মুরানোর গ্লাস ফ্যাক্টরির নাম পৃথিবী বিখ্যাত। দেবুর কিছু কাচের জিনিস কেনার বাসনা হয়েছিল। দাম শুনে আঁতকে উঠল। কিন্তু চোখের সামনে যখন কাচ গলিয়ে এক একটা সুদৃশ্য পাত্র তৈরি করছিল ওরা, তখন মুকুন্দ বলেছিল, 'কিনেই বা কী হত দেবু, যেতে-যেতেই অত সুন্দর জিনিসটা ভেঙে যেত।'

আমরা চুপচাপ জলের ধারে বসে থাকতাম। প্রেমিক প্রেমিকারা আমাদের চারপাশে সশব্দে চুম্বন করত কিন্তু আমরা সেদিকে নজর দিতাম না। অন্ধকারে ক্যানেলের নৌকোয় লঞ্চে ওঠার সময় টিকিট কাটতাম। কিন্তু কোনও বেকারকে কখনও দেখিনি। শুনেছি ভেনিস নাকি একটু-একটু করে বসে যাচ্ছে। সমুদ্রের জল এক সময় শহরটা গিলে ফেলবে। নিশ্চয়ই আমি মরে যাওয়ার আগে নয়। প্রতিটি মানুষ হাসিখুশি। এমনকী যে কিশোরী মদ বিক্রি করে সে-ও হাসি মুখে ওদের

গুণাগুণ বর্ণনা করে। চা খেতে গিয়ে এক অভিজ্ঞতা। দাঁড়িয়ে খেলে যা দাম বসে খেলে তার দেড়া। আবার কেউ এক প্রস্থ লাঞ্চ খেলে এক গ্লাস ওয়াইন বিনি পয়সায় খাওয়ায়। কার্নিভাল শব্দটি সমস্ত শহরের চরিত্রের সঙ্গে চমৎকার মিশে আছে। রাত বারোটায় যখন সন্ধে নামে তখনও ঘরে ফেরার টান আসে না। মোট দুটো রাস্তা। বাকি সব পথ এমনকী লিগুলোও খাল। গাড়ির বদলে সবাই গণ্ডোলা বা স্টিমবোট রাখেন। ফেরার টিকিট কাটতে স্টেশনে গিয়েছিলাম। দেবু কিনে নিয়ে এল টিকিট, কী আশ্চর্য, আসার সময় যা পড়েছে এখন তার অর্ধেক পড়ল। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। অথচ টিকিটে দাম লেখা আছে। অন্তত লিরা পড়তে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। মুকুন্দ খুঁতখুঁত করল। টিকিটটাকে যাচাই করিয়ে নিতে বলল সে। অপমানিক অপমানিত ভাব নিয়ে দেবু আবার গেল কাউন্টারে। ফিরে এসে বলল, 'ওটা রিজার্ভেশনের চার্জ ছিল। মূল টিকিট কাটতে বলেছিল নিজের ভাষায়, সেটা বুঝব কী করে বলুন।' আমরা হাসলাম। টিকিট ছাড়া ট্রেনে কী হত তা নিয়ে গবেষণা করলাম। এই সময় দুই মহিলাসমেত এক ভারতীয় প্রৌঢ়কে দেখলাম। তিনি জানালেন যে, এই মাত্র এখানে পৌঁছে হোটেলের চার্জ শুনে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে তাঁর। আমরা যদি সাহায্য করি তাহলে ভালো হয়। তিনি মাদ্রাজে থাকেন, ডাক্তার। কনিষ্ঠা মহিলা বললেন, 'যে ঘরে অ্যাটাচড বাথ নেই সেখানে আমি থাকব না। আর তিনটে বিছানা চাই।' ওদের নিয়ে এলাম আমাদের হোটেলে। দশ হাজার লিরা বেশি নিলেন বৃদ্ধা মালিক। মহিলাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে প্রৌঢ় ভদ্রলোক ধন্যবাদ জানাতে এলেন আমাদের ঘরে। খুব মুশকিলে পড়েছেন দুই বউকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে। ছোট কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না। আমরা তাজ্জব। উনি চলে গেলে মুকুন্দ বলল, 'লোকটির হিম্মত আছে। একটাতেই সবাই জেরবার দুটোকে সামলাচ্ছে।' দেবু ফোড়ন কাটল, 'বিয়ে না করে এসব বুঝলেন কী করে।'

বিকেলে একটা ফাস্ট ফুডের দোকানে খেতে গিয়ে খোল করতালের শব্দ পেলাম। হরেকৃষ্ণ নাম নিতে-নিতে সাহেব বৈষ্ণব মেম বৈষ্ণবীরা নাচতে-নাচতে যাচ্ছেন। তাঁদের পরনে গেরুয়া শাড়ি ব্লাউজ, হরেকৃষ্ণ শব্দটা স্পষ্ট। ভিড়ে-ভিড়ে একাকার। মুকুন্দ বলল, 'এতদিনে লোকগুলোকে খুব আপন মনে হচ্ছে সমরেশ। ভাবতে পারেন দেশ থেকে কত দূরে এসে আপনি হরেকৃষ্ণ নাম শুনছেন।'

রাত একটায় ট্রেন। রোমাটার্মিনিতে ফিরব। ট্রেনটায় প্রতিটি কামরা খুঁজে কোনও রিজার্ভেশন চার্ট পেলাম না। যাকেই জিজ্ঞাসা করি সে ভাষা বোঝে না। এদিকে সময় এগিয়ে আসছে। রিজার্ভেশন লেখা কামড়াগুলোয় দেখি যাত্রী ঠাসা। অসহায়ের মধ্যে অফিসারকে দেখতে পেলাম। দেবু তাঁকে টিকিট ধরিয়ে জানতে চাইল কোন কামরায় উঠব। তিনি অনেকক্ষণ ধরে সেটা দেখতে লাগলেন। ট্রেন ছাড়ব-ছাড়ব। আমরা অসহিষ্ণু। দেবু হঠাৎ বাংলায় বলল, 'আপনি কি পড়তে পারছেন না দাদু পকেটে চশমা নেই? বের করে পড়ুন।'

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন। তারপর পকেট থেকে চশমা বের করে নাকে লাগিয়ে আমাদের হদিস দিলেন। আমরা হতভম্ব। ভেনিসের রেল স্টেশনে রাত দুপুরে এক ইতালিয়ান ইংরেজি বুঝল না অথচ বাংলা কথার উত্তরে এমন সাড়া দিল কী করে? ট্রেনের কামরায় বসে দেবু বিজ্ঞের মতো বলল, 'আবার কোন শালা ইংরেজি বলে। এই জন্যেই সরকার স্কুল থেকে ইংরেজি তুলে দিতে চাইছে, বুঝলেন।'

॥ ১৩ ॥

প্যারিসের দ্য গল এয়ারপোর্টে কাণ্ডটা হল। আমাদের তিন জনেরই জিনিসপত্র একে-একে কনভেয়ার বেল্টে উঠে ঘুরতে লাগল শুধু দেবুর একটি সুটকেসের দেখা নেই। বিদেশে এসে যে সমস্ত উপহাররাশি কিনেছিল তা ছিল সেই সুটকেসে। একসময় বেল্ট থেকে সবাই নিজের জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেল।

দেবু যেন মুখে মাছি পড়বে। ছুটলাম। ছুটলাম কে.এল.এমের. কাউন্টারে। সব শুনে ওরা একটা ফর্ম এগিয়ে দিলেন। তাতে সুটকেসের সাইজ রং, কী কী জিনিস ছিল তার বিশদ বিবরণ লিখে দিতে হল। তাঁরা ভরসা দিলেন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সুটকেশ বের করবেন। স্থানীয় ঠিকানা চাইলেন তাঁরা। তখনও ঠিক নেই কোথায় উঠব আমরা। টেলিফোন নম্বর নিলাম, পরে জানাব বলে। দেবুর খুব মন খারাপ। বলল, 'যদি না পাওয়া যায় সমরেশদা খালি হাতে দেশে ফিরতে হবে।' সান্ত্বনা দিলাম, 'পাওয়া যাবেই, আমারটাও পাওয়া গিয়েছিল। জীবনের ধন কিছুই যায় না হারিয়ে। সমুদ্রের মতো, ফিরিয়ে দেয়।'

এয়ারপোর্টের লাউঞ্জেই ধাক্কা খেলাম। কেউ কথা বুঝছে না। ইংল্যান্ডের এত কাছের দেশের মানুষ ইংরেজি শুনলেই মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। এক সুন্দরী ফরাসি ললনা দাঁড়িয়েছিলেন। দেবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করল হোটেল-টোটেলের খোঁজ কোথায় পাওয়া যায়? তিনি কাঁধ নাচিয়ে চলে গেলেন। শেষ পর্যন্ত হদিস মিলল ইলেকট্রনিক বোর্ডে প্যারিসের সব হোটেলের ঘরের দৈনিক ভাড়া আর ফোন নাম্বার দেওয়া আছে। বিনি পয়সায় ফোন করে জেনে নেওয়া যায় সেখানে খালি জায়গা আছে কি না। দেবু তৎপর হল। মোটামুটি চারশো টাকার মধ্যে একটা ঘর জোগাড় করে ফেলল সে টেলিফোনেই। কথা বলে জেনে নিল কোথায় তার অবস্থান, কীভাবে পৌঁছোতে হবে।

বাইরে বেরিয়ে দেখলাম ঠান্ডা মোটেই হালকা নয়। ট্যাক্সি স্ট্যান্ড খুঁজতে একটু হন্যে হতে হল। মুকুন্দ বলল, 'প্যারিসের ট্যাক্সিওয়ালারা খুব অসৎ হয় সমরেশ। পৃথিবীর সব বড়লোকদের পায় তো এখানে। কী করব বলুন?'

কথাটা আমারও মনে হয়েছিল। কিন্তু হোটেলে পৌঁছোতে নতুন লোকের ট্যাক্সি ছাড়া কোনও উপায় নেই। ট্যাক্সিতে উঠে তিন চারবারের চেষ্টায় হোটেলটার অবস্থান বোঝাল দেবু। লোকটা বেশ ওস্তাদ। সর্দারজিদের চেয়ে বেশি ইংরেজি বোঝে অথচ উচ্চারণ ধরতে পারে না। ট্যাক্সি চলছে আর দেবু ম্যাপ দেখছে এবং সমানে বাংলায় রিলে করে যাচ্ছে। হোটেলের সামনে পৌঁছে বলল, 'একদম ঘোরায়নি। একে বকশিশ দেওয়া উচিত।' আমরা শুনেছিলাম প্যারিসের ট্যাক্সিওয়ালা নাকি টিপস নেয়। কিন্তু লোকটা কিছুই চাইল না। হোটেলের মালিক ইরানি। খোমেইনির বিরোধী দলের মানুষ পালিয়ে এসে প্যারিসে ব্যাবসা করছে। ঘর মিলল দোতলায়। বাথরুম সমেত। তিনটে খাট। আ কী আরাম! মুকুন্দ বলল, 'করি ন্যাশনাল ইন্সট্রুমেন্টে চাকরি, শ্যামবাজার থেকে যাদবপুর যাই রোজ এখন বসে আছি প্যারিসে। হিসেব মেলে না।'

তা তো হল। রাত বাড়ছে। খিদেও পাচ্ছে। হোটেলে খাবার দেওয়া হয় না। সেজেগুজে প্যারিসের রাস্তায় বের হলাম। অফিসপাড়ায় রাত নামলে রাস্তায় যে অবস্থা হয় তাই দেখছি। বন্ধু আমাদের সাবধান করে দিয়েছিলেন আর যেখানেই যাও প্যারিসের রেস্টুরেন্টে খেতে যেও না নিজে পয়সায়। গলাটি নাকি ওরা কুঁচ করে কেটে দেয়। আমরা ফাস্ট ফুডের দোকান খুঁজছিলাম। কোথা তার চিহ্ন নেই। আসলে ওই পাড়াটাতেই দোকান-পাট কম। হঠাৎ দূরে একটা নিওন সাইন দেখা পেলাম, ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট। ধড়ে প্রাণ এল। রাস্তা পার হয়ে দেখি এক সর্দারজি মহারাজ সো গেটে দাঁড়িয়ে আছেন। কাচের দেওয়ালের ওপাশে মোমবাতির আলোয় খাচ্ছেন খদ্দেররা। দেবু স্ম গলায় বলল, 'নমস্তে সর্দারজি, হামলোক ইন্ডিয়াসে আ রহা হ্যায়।'

সর্দারজি মাথা নাড়লেন তারপর আঙুল তুলে একটা নোটিস দেখিয়ে দিলেন। তাতে ফর এবং ইংরেজিতে লেখা আছে রাত এগারোটার পর বিক্রি বন্ধ। ঘড়িতে এখন এগারোটা বেজে দ আমি অনুরোধ করলাম ভেতরে খেতে দেওয়ার জন্যে। বললাম, সবাই খুব ক্ষুধার্ত। সর্দার ইংরেজিতে অপেক্ষা করতে বলে দরজা ঠেলে ভেতরে চলে গেলেন। মুকুন্দ বলল, 'দেখুন পাঞ্জাবি কী ভালো ব্যাবসা করছে প্যারিসে এসেও।'

খানিক বাদে সর্দারজি বেরিয়ে এসে আমাদের কাউন্টারে যেতে বললেন ইংরেজি

রেস্টুরেন্টটি বেশ ঝকঝকে। কাউন্টারে বসে আছেন এক সুন্দরী মহিলা। তিনি ইংরেজিতে বললেন, 'এখন তো বিক্রি হবে না। আইন মানতে হবে। তবে যেহেতু আপনারা ভারতীয় তাই খাবার প্যাক করে দিতে পারি।' তাই হোক। মেনু দেখে দেবুর চক্ষু চড়ক গাছ। মাংসের ঝোল পঁচানব্বই টাকা, পরোটা একটা চল্লিশ পয়সা। ওরা যখন মেনু দেখছে তখন আমি মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি কোন প্রদেশের মেয়ে? মহিলা বললেন, 'তিনি সাউথ আফ্রিকার মানুষ। এখন প্যারিসের নাগরিক। ভারতবর্ষের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। জানতে চাইলাম এটা কোনও সর্দারজির হোটেল কি না। তিনি হাসলেন, 'না না। বাইরে যে ফরাসিটিকে দেখলেন মহারাজা সর্দারজি সেজে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আর আমি মিলে এই রেস্টুরেন্ট করেছি। ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের খুব চাহিদা আছে এখানে। তবে আমার যারা কুক তারা ইন্ডিয়ান। আপনি তো সর্দারজি নন, আপনার কোন প্রদেশ?'

হতভম্ব আমি জবাব দিলাম, 'বাংলা।'

'আই সি। আমার একজন কুক আছে বাংলার।' বলে সঙ্গে-সঙ্গে তাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তখন ভাবছি বাইরে যিনি সর্দারজি সেজে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি একজন ফরাসি সাহেব, অথচ আমরা বুঝতেই পারিনি। এবার সাদা অ্যাপ্রোন পরা এক যুবক সামনে এসে দাঁড়াল। তাকে মহিলা ইংরেজিতে ব্যাপারটা বললেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি বাঙালি?'

যুবক মাথা নাড়ল। 'বাড়ি কোথায় ছিল?'

সে কিছু একটা জবাব দিল। শুধু চিটাগাং শব্দটা ছাড়া কিছুই বুঝলাম না। যুবক নমস্কার করে চলে গেল। মহিলা বললেন, 'মনে হল, তুমি ওর ভাষা বুঝতে পারলে না। কিন্তু আমি জানি ও বাঙালি।'

বললাম, 'হ্যাঁ। আমরা দুজনেই বাঙালি হলেও আমাদের ভাষা আলাদা।'

মহিলা অবাক, 'আচ্ছা?'

দেবু বলল, 'সমরেশদা, পরোটা আর মাংসের ঝোল নিলাম। না নিলেই ভালো হত।'

রাত্রের খাবার হোটেলে ফিরে এসে দেখার পর মুকুন্দ খেপে গেল। প্রায় একশো টাকার ঝোল পাওয়া গিয়েছে তাতে দুটো আধ-ইঞ্চি মাপের মাংস ভাসছে।

প্যারিসে কলকাতার বন্ধুদের ঘনিষ্ঠ একটি মানুষ থাকেন। তাঁর নাম অসীম রায়। ওঁর সঙ্গে এর আগে কয়েকবার চিঠিতে আলাপ হয়েছিল। উনি তখন লিখেছিলেন যদি কখনও প্যারিসে আসি তাহলে ওঁর ওখানেই যেন উঠি। কলকাতার অনেক পুরুষ মহিলা নিয়মিত অসীমবাবুর বাড়িতে আশ্রয় নেন। ভোরবেলায় আমি অসীমবাবুকে টেলিফোন করলাম। আমার গলা শুনে উনি বললেন, 'ও আপনি এসে গিয়েছেন। কিন্তু এখন তো ফ্লাইট নেই। ও, হোটেলে উঠেছেন। হোটেলে তো বড্ড বেশি চার্জ। আমার ওখানে আসতে পারেন। তবে আমি আমার মতো থাকি আপনারা আপনাদের মতো থাকবেন। সকাল আটটায় বেরিয়ে যাই, আমি কিন্তু আপনাদের সময় দিতে পারব না।' মন খারাপ হয়ে গেল খুব। সত্যি কথা বলতে কী মনে হল যেচে অপমানিত হলাম। যতদূর জানি ভদ্রলোক অবিবাহিত। একা থাকেন। কিন্তু কথাবার্তায় কোনওরকম আগ্রহ নেই। এ অবস্থায় ওঁর ওখানে ওঠা যায় না। যদিও ভদ্রলোক আমাদের নাম জেনে নিয়েছেন কিন্তু আসবেন বলেননি।

সকাল থেকেই হোটেলের টেলিফোনে এয়ারপোর্টে ফোন করে সুটকেসের হদিস চাইল দেবু। ভাষায় গোলমাল হচ্ছে। অবশেষে সে বুঝতে পারল এখনও সেটা পাওয়া যায়নি। আমাদের হোটেলের নামধাম দিল সে। পেলেই যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

না। সেদিন আমরা যেখানে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম তার বিবরণ এই লেখার বিষয় নয়। আইফেল টাওয়ার, সেইন নদী, নোতরদাম গির্জার বর্ণনার কোনও প্রয়োজন নেই। প্যারিসের মাটির তলায় রেল লাইন আমাকে আকর্ষণ করল খুব। পরপর তিনটে স্টেশন নীচে নেমে গেছে। অনেকটাই গোলকধাঁধা। ফরাসিরা ব্রিটিশ বা আমেরিকানদের ছাড়িয়ে গেছে এই প্রযুক্তি বিদ্যার ব্যবহারে। ঢোকার আগে টিকিট কাটতে হয়। একই মূল্যের টিকিটে শহরের যে কোনও স্টেশনে নেমে ওপরে উঠে

যান। আমাদের প্রাইভেট বাসের টিকিটের মতো বস্তুটি প্ল্যাটফর্মে ঢোকার সুড়ঙ্গের মুখে মেশিনে পাঞ্চ করা হয়। সেটিতে ছাপ পড়ে বেরিয়ে এলেই বন্ধ দরজা খুলে যাবে একজনের জন্যে। সুড়ঙ্গের মধ্যে অবশ্য কালো ছেলেরা হকারি করছে। কেউ গান গেয়ে পয়সা তুলছে। আর ওইসব গান যন্ত্রপাতি সমেত। কিন্তু পুলিশের উপস্থিতি সর্বত্র। পাসপোর্ট ভিসা না নিয়ে বা সময়সীমা পার হয়ে গেলেও নাকি অনেক মানুষ ফ্রান্সে থেকে যায়। তাদের ধরার জন্যে এরা মাঝে-মাঝে যাত্রীদের কাছে পাশপোর্ট দেখতে চায়। সারাদিন ঘোরার পর বিকেলে আমরা পিগালে পৌঁছোলাম। যথারীতি দেবুর ম্যাপ এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করেছিল। বিশাল চওড়া রাস্তার গায়ে পরপর সাজানো প্যারিসের রাতের আনন্দের আস্তানা। ম্যুঁলারুজ নামক প্রেক্ষাগৃহটি একটু সম্ভ্রান্ত। তার শো বোর্ডে যেসব ছবি তাতে প্রাচুর্যের চিহ্ন। সবচেয়ে কম দামের টিকিট, একটি শো দেখার জন্যে, ভারতীয় মুদ্রায় পাঁচশো টাকা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সুট নাকি প্যারিস থেকে কাচিয়ে যেত। সত্যি কি না জানি না তখনকার মূল্য স্তর যা তাতে তাঁর টাকাপয়সার পরিমাণ কত ছিল তা আন্দাজেও বুঝতে পারব না। ম্যুঁলারুজের পাশে সেক্সশপ। প্রকাশ্যে নরনারীর মিলনদৃশ্য অথবা নারীর শরীরের ফটোগ্রাফ সেঁটে টিকিট বিক্রির চেষ্টা সেখানে। এর ওপর দালালরা পথচারী দেখলেই চেঁচিয়ে ডাকছে। সবচেয়ে অদ্ভুত লাগল এর মধ্যেই সম্ভ্রান্ত ফরাসি নারী পুরুষ শিশুদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। বৃদ্ধারা কেনাকাটা করছেন। নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে তাঁরা এদের উপেক্ষা করছেন। টাইম স্কোয়ার, সোহো অথবা ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে এইরকম চোখে পড়েনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই, ফুটপাতে হেঁটে শরীরে একটা গা ঘিনঘিন ভাব ছড়িয়ে পড়ল। যা নিউইয়র্কেও হয়নি। দেবু এবং মুকুন্দ প্রথম দেখছে এসব। তাও উইন্ডোশপিং। কিন্তু ওরাও বললে পছন্দ হচ্ছে না। একটা পত্রিকার স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল ইংরেজি কাগজ কিনি। সেটা চাইতে লোকটা এমন চেঁচিয়ে উঠল যেন আমি অশ্লীল শব্দ বলেছি। ব্যাবসা করতে বসেও এই লোকটা ঘোর ইংরেজ বিরোধী। এলাকাটায় ছিলাম মিনিটপঁয়তাল্লিশ কিন্তু একটি বারবনিতা আমাদের নজরে আসেনি, যা ছিল খুবই স্বাভাবিক।

আজও ভুল হয়ে গেল। খাবার কিনে আনা হয়নি রাতের জন্যে। ডিউটি ফ্রি শপ থেকে কেনা স্কচ হুইস্কি খাওয়ার পর মুকুন্দ পাঁউরুটিতে জেলি মাখাতে বসল। দেবু বলল, 'এরকম ঘটনা আমরাই ঘটালাম মুকুন্দদা। প্যারিসে রাত এগারোটায় হোটেলে বসে স্কচ খাওয়ার পর পাঁউরুটি চিবানো। পাবলিক শুনলে কী ভাববে বলুন তো।' কিন্তু ক্ষুধা তীব্র হলে সর্বগ্রাসী হয়। সত্যটা জানালাম।

ভোরবেলায় টেলিফোন আমাদের ঘুম ভাঙাল। অসীমবাবু। বললেন, 'কী মশাই, হোটেলে খুব আরাম পেয়ে গেছেন মনে হচ্ছে। ফালতু পয়সা নষ্ট করছেন। চলে আসুন। আজ দুপুর অবধি বাড়িতে আছি। তিনি পথনির্দেশ দিয়ে লাইন কেটে দিলেন। মনে হল এবার অনেক আন্তরিক আহ্বান। বোধহয় ফাঁ-এর দিকে তাকিয়ে এইরকম একটা আমন্ত্রণের অপেক্ষায় ছিলাম।

শিয়ালদা থেকে কল্যাণি যতদূর ততদূরই ট্রেনে চেপে এলাম কিন্তু সময় লাগল প্রায় অর্ধেক। তার আগে গল্প বলে দিই। গতকাল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছিলাম হোটেল ছেড়ে, রাত্রে এসে দেখেছিলাম সব কিছু পরিপাটি করে রাখা হয়েছে। যিনি করেছিলেন আজ তার দর্শন পেলাম। সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী ফরাসি যুবতী ঘর পরিষ্কার করতে এল। ওর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হল খুব কিন্তু দেখা গেল সে ইংরেজি জানে না। দেবু বাংলায় তাকে বলল, 'আমরা আজই হোটেল ছেড়ে দিচ্ছি।' মেয়েটি হেসে ফরাসিতে কিছু বলল। বাইরে বেরিয়ে এসে দেবু বলেছিল, 'ফরাসি না শিখে প্যারিসে আসার কোনও মানে হয় না সমরেশদা।'

এইরকম একটি বিষয় নিয়ে, সন্তোষকুমার ঘোষের কাছে গল্পটা শুনেছিলেন। সেবার তিনি, দক্ষিণারঞ্জন বসু আর সাগরময় ঘোষ জার্মানিতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সন্তোষদার কথায় বলি, 'তখন আমি দারুণ টগবগে, হ্যান্ডসাম। মেয়েদের সবাইকে সময় দিতে পারছি না এত চাহিদা। দক্ষিণাবাবু বয়স্ক মানুষ, গায়ের রং কালো আর একটু শ্লথ। সাগরবাবু তখন যুবকই বলতে পার কিন্তু তিনি তো খাটো

চেহারার মানুষ। যেখানে আমরা উঠেছিলাম তার দায়িত্বে ছিল মোটামুটি সুন্দরী এক মহিলা। বুঝলাম আমি যদি একটু আগ্রহ দেখাই তাহলে ওর কৃপা পাওয়া যাবে। কিন্তু তখন আমাকে বিশ্বলোক ডাকছে। বাইরে কত কাজ, কত সুন্দরী। ভাবলাম, এ তো রইলোই, যাওয়ার আগের দিন দেখা যাবে।

'এর মধ্যে একদিন শুনলাম মেয়েটি চিৎকার করছে ভয়ে। ছুটে গিয়ে দেখলাম দক্ষিণাদা তোয়ালে পরে দাঁড়িয়ে, হাতে আন্ডারওয়ার। সেটার ফিতে ভেতরে ঢুকে গেছে। ভাষা জানা না থাকায় মেয়েটিকে ডেকে ইশারায় সাহায্য করতে বলেছিলেন তাতেই ওই দৃশ্য দেখে সে আতঙ্কিত। পরিস্থিতি সামলালাম। ক'দিন খুব ব্যস্ততায় কাটল। যাওয়ার দিন এসে গেল। তখন মনে পড়ল মেয়েটির কথা। ওর সঙ্গে ভালো করে আলাপ করাও হয়নি। এয়ারপোর্টে যাওয়ার সময় দেখি সে আমাদের সঙ্গ নিয়েছে। সি-অফ করতে যাবে। এমন তো সচরাচর হয় না। এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এর ভেতরে ঢুকে পড়ে খেয়াল হল সাগরবাবু আসেননি তখনও। ফিরে দেখি মেয়েটি তাঁর সঙ্গে করমর্দন করছে তো করছেই। ঈর্ষান্বিত হলাম। মেয়েটি আমাদের মধ্যে ওকেই ভালোমানুষ বলে ঠাওরাল। বুঝলে, মেয়েদের বোঝা মুশকিল নয়, অহংকারীদের তারা মোটেই সহ্য করে না। ভাষা না বুঝতে পারলেও না।' গল্পটির মধ্যে কতটা সত্যি আছে জানি না তবে সন্তোষদার বলার গুণে সেই মহিলাকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম আমি। সাগরদাকে যখন ঘটনাটার কথা পরে বলেছি তখন একটা রহস্যময় হাসি হেসেছেন তিনি। কিন্তু এই মেয়েটিকে দেখে সন্তোষদার গল্প মনে পড়ল।

স্টেশনটা নির্জন। ট্রেন চলে গেলেই ঘুঘু ডাকে। ট্রেনে আসার সময় দেখেছি দুপাশে বাড়িঘরও কম। স্টেশন চত্বরে একটা দোকানও নেই। ভারী সুটকেস টেনে হাঁটছিলাম আমরা। দেবুর একটা সুটকেস কম। সেটা থাকলে কী হত জানতে চাইতেই সে জানাল, 'বইতাম, কষ্ট হলেও বইতাম।'

শেষ পর্যন্ত আমরা অসীমবাবুর বাড়ির নম্বরটা পেলাম। জায়গাটার নাম অ্যাস্টনি। বারো নম্বর রু দ্য গেইমেস-এ। একটি গেট রয়েছে। ভেতরে অনেক গাছপালা। গেট খুলে ভেতরে ঢুকতেই অসীমবাবুকে দেখতে পেলাম। একটি দীর্ঘদেহী শরীরের প্রৌঢ় বাগান করছিলেন, আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন, 'এসে গেছেন। ভালো। চলুন, আপনাদের ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি।'

বাড়ির চারপাশে বাগান, পেছনের গেট খুলে বললেন, 'আসুন।' কাঠের পালিশ করা সিঁড়িতে পা রাখতেই শব্দ হতে লাগল। দোতলায় একটা হল-ঘর, কিচেন, টয়লেট। জিনিসপত্র রাখার পর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি সমরেশ?'

কিছুক্ষণ কথা বলার পর ভুল ভেঙেছিল। মানুষটির কথাবার্তার ধরনই ওইরকম। একা প্যারিসের উপকণ্ঠে ছিমছাম বাড়িতে ভালোবেসে থেকে এক ধরনের কাঠ-কাঠ ভাব ওপরে এসে গিয়েছে।

অনেকেই সেখানে ধাক্কা খেতে পারে।

অসীমবাবু একটা রেস্টুরেন্ট চালু করেছেন। সে বিষয়ে খুব ব্যস্ত। আমাদের কফি করে খাওয়ালেন। মুকুন্দর অভ্যেস ছিল। কলকাতায় ওর বিশাল ফ্ল্যাটে একা থাকতে হয় বলে অনেক কাজ নিজেই করে। কাপ ডিস ধুতে-ধুতে দেবু বলল, 'এই দৃশ্য যদি একবার শ্যামনগরের বাড়ির লোকজন দেখত তাহলে আঁতকে উঠত। কিন্তু ভালো লাগছে, জানেন।'

অসীমবাবু বললেন, 'শুনুন। সব কিছু দেখে নিন। চাবি দিয়ে যাচ্ছি। যখন বের হবেন তখন বন্ধ করে যাবেন ভালো করে। আর হ্যাঁ, আপনাদের মধ্যে কার রান্নাঘরে যাওয়ার অভ্যেস আছে?'

মুকুন্দ বলল, 'আমি একটু-আধটু নিজের জন্যে করি।'

'তাহলে আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। একবার কলকাতা থেকে কয়েকজন এসেছিল। তার মধ্যে একজন নামকরা লেখিকা ছিলেন। তিনি খুব স্মার্টনেস দেখিয়ে গ্যাসে রান্না করতে গিয়ে এমন কাণ্ড করেছিলেন যে বিরাট দুর্ঘটনা থেকে রক্ষে পেয়েছি।' অসীমবাবু রান্নাঘর বুঝিয়ে দিলেন। আমরা জানলাম হাতের নাগালে সব কিছু রাখার ব্যবস্থা তিনি নিজেই করেছেন। এমনকী কাঠের মিস্ত্রির কাজ পর্যন্ত। বললেন, 'এ বাড়ির অনেক কিছু আমার করা, হাতে সময় পেলে করে ফেলি। ও হ্যাঁ, বিছানায় শুয়ে সিগারেট খাওয়ার অভ্যেস কারও আছে? থাকলে দয়া করে খাবেন না। সুনীল,

আমার বন্ধু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ওই করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে এক কাণ্ড করে রেখেছে।' নিষেধগুলো পরপর শুনলে আতঙ্ক হওয়া স্বাভাবিক। পরে মনে হল ভদ্রলোক খুব খারাপ কিছু বলছেন না। ওঁকে দেবু সুটকেস হারানোর গল্প বলল। এয়ারপোর্ট থাকে যে রসিদ পাওয়া গিয়েছিল তা নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে ফোন করলেন। ওপাশে সাড়া দেওয়ামাত্র ফরাসিতে বেশ ঝাঁজিয়ে কথা বলতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত বললেন, 'আপনাদের চিন্তা নেই। সুটকেস আসছে। আমি একটু বেরোচ্ছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরব। আপনারা ততক্ষণ বিশ্রাম করতে পারেন।'

সুটকেস প্রাপ্তির খবরে দেবু উল্লসিত। অসীমবাবু বেরিয়ে গেলে আমরা বাগানে নেমে এলাম। বালিগঞ্জের এক বঙ্গসন্তান প্যারিসের উপকণ্ঠে বাড়ি কিনে নানারকমের গাছগাছালি লাগিয়ে দাপটে আছেন নিঃসঙ্গ হয়ে, ভাবা যায়? আমরা এই নিঃসঙ্গতা নিয়ে গবেষণা করতে লাগলাম। অনেক বছর যখন তখন অসীমবাবুর জীবনে কি কোনও ফরাসি ললনা আসেনি? আর এলেও এখন তো দেখছি না। একা-একা এইভাবে জীবন কাটানো কি সম্ভব? মুকুন্দ জানাল সে পারবে কিন্তু দেবু বা আমি একমত হলাম না।

এই সময় একটা ভ্যান এসে দাঁড়াল বাড়ির গেটে। আমি এগিয়ে গেলাম। ড্রাইভার পেছন থেকে একটা সুটকেস নামিয়ে রেখে ফরাসিতে কিছু বলে কাগজ বের করল। বুঝলাম সই করে মাল বুঝে নিতে বলছে। দেবুকে ডাকতেই সে ছুটে এল, 'কী আশ্চর্য! এটা আমার সুটকেস নয়। কার জিনিস কোথায় এসেছে?'

লোকটি মাথা নাড়ল। তার মুখ থেকে অনর্গল ফরাসি বের হচ্ছিল। দেবু ইংরেজি চালাল কিছুক্ষণ, শেষপর্যন্ত বাংলা বলা শুরু করল। ফরাসি আর বাংলায় চাপান-উতোর চলার পর লোকটি রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল যদিও বাইরে বেশ ঠান্ডা। আমি শেষপর্যন্ত দেবুকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা ফেলে দিও না। রেখে দাও, তোমারটা পেলে ফেরত দেবে। কুপরামর্শ সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা বলতে লোকটিও সাহায্য করেছিল। সে যেন সুটকেস নামিয়ে দিয়ে চলে যেতে পারলেই বেঁচে যায়। এই সময় অসীমবাবু এলেন। ফরাসিতে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে জানালেন, 'এ এরোপ্লেন কোম্পানির লোকই না। চুক্তিতে মালপত্র বাড়ি-বাড়ি পৌঁছে দেয়। সই না করে দিলে ভাড়ার পয়সা পাবে না। আমি লিখে দিচ্ছি এই স্যুটকেস আমাদের নয়।' মাল ফেরত নিয়ে লোকটি চলে গেল। আমরা অনুমান করলাম। ওই সুটকেসের ভেতরে হয়তো কয়েক হাজার ডলার ছিল। কল্পনা করতে গিয়ে আমরা কিন্তু হাজারের বেশি উঠতে পারলাম না।

অসীমবাবু বাড়িতে আমরা সম্রাটের মতো ছিলাম। পাশের ডিপার্টমেন্টাল শপ থেকে বাজার করে আনতাম। মুকুন্দ রান্না করত। খাওয়াদাওয়া শেষ করে বাসন ধুয়ে দরজায় তালা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে স্টেশন যেতাম। ট্রেন ধরে প্যারিসে। মুকুন্দ ল্যুভ দেখল প্রাণভরে। প্রতিটি ছবি খুঁটিয়ে। সেখানে গিয়ে মোনালিসার সামনে দাঁড়িয়ে স্বপ্নভঙ্গ হল আমার। আকৈশোর জানা রহস্যময়ীর হাসিটা বিন্দুমাত্র স্পর্শ করল না। অন্য কোনও ছবির সামনে ভিড় না থাকলেও মোনালিসার সামনে মানুষ জমছেই। খুব খারাপ লাগল। এইজন্যেই পণ্ডিতরা বলেছেন স্বপ্নের সুন্দরীদের সামনে কখনও যেতে নেই। অথচ ভেনাসের মূর্তির সামনে পৌঁছে শিহরিত হলাম। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূর থেকে শ'খানেক মানুষের মাথা ডিঙিয়ে সেই অহংকারিণী আমাকে চুম্বকের মতো টানল। ঘুরে-ঘুরে যেদিক দিয়েই তাকে দেখতে চাইলাম মনে হল অদূরে অহংকার জ্যোৎস্নার মতো ছড়িয়ে পড়ছে চিবুক, গাল, কপাল থেকে, শুধু ভেনাসকে দেখতে আমি আর একবার প্যারিসে যেতে রাজি।

প্যারিসের আড্ডাখানাগুলো, বর্ণাঢ্য রাস্তা, ফলি বাজারে গিয়ে নগ্ন অপেরা দেখে মোহিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দিনগুলো যখন ফুরিয়ে যাচ্ছিল তখন মুকুন্দ আফশোশ করছিল যে অনেক দেখা বাকি থেকে যাচ্ছে যার অন্যতম হল ভার্সাই-এর প্রাসাদ। এই সময় প্রীতি সান্যাল টেলিফোন করলেন। দেশ পত্রিকায় প্যারিসের চিঠি লেখেন মহিলা, এটুকুই জানতাম। অসীমাবুর কাছে শুনেছেন আমাদের

কথা। যাব কি যাব না ভাবছি তখনই জানলাম ওঁর বাড়ি থেকে ভার্সাই-এর প্রাসাদ খুব কাছেই। অতএব আর না বলা নেই।

দেবু প্যারিসের পাতালরেল সম্পর্কে প্রায় বিশেষজ্ঞ হয়ে গিয়েছে। ও-ই পথ চিনিয়ে যে স্টেশনে নিয়ে এল তার সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে দেখলাম নিরিবিলি দুটো চওড়া রাস্তা সামনে। আর খানিকটা দূরে পার্কিং লটে এক বঙ্গললনা বসে আছেন গাড়ির ড্রাইভিং সিটে। আমরা এগিয়ে যেতে শাড়ি পরা মিসেস সান্যাল হাসিমুখে নেমে এসে বললেন, 'স্বাগতম। ঠিক সময়ে এসে গেছেন আপনারা। চলুন আপনাদের আগে রাজপ্রসাদ দেখিয়ে তারপর গরিবের বাড়িতে নিয়ে যাব।' আমরা খুব ছিমছাম এবং নির্জন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেশ পত্রিকার সুবাদেই মিসেস সান্যাল আমাদের সাহিত্যের হালফিল খবর রাখেন। বললেন, 'দশ বছর উপন্যাস না লিখেই আপনি অকাদেমি অ্যাওয়ার্ড পেয়ে গেলেন, এটা কিন্তু দারুণ ব্যাপার।' নিজের কথা আলোচনা হোক চাইছিলাম না। জানলাম জাতিপুঞ্জের বড় একজন অফিসার ওঁর স্বামী। ভদ্রলোককে প্রায়ই বাইরে যেতে হয়। ছেলেমেয়েরা প্যারিসেই পড়াশোনা করে।

আধ ঘণ্টাটাক যাওয়ার পর আমরা সবুজ ঘাসের বনে ঢুকলাম। ইংরেজিতে কাকে উড বলে ব্যাখ্যা অভিধানে আছে কিন্তু শব্দটি শুনলেই আমার মনে যে ছবিটা ভেসে ওঠে তাই এখন চারপাশে। ফাঁকা-ফাঁকা গাছেরা আকাশ ছুঁয়েছে। তলায় যতদূর তাকানো যায় সবুজ ঘাসের গালিচা বিছানো। গাড়ি পার্ক করে আমরা হাঁটতে লাগলাম। ফরাসি রাজারানিরা যেখানে প্রমোদবিহার করতেন সেই বিশাল জলাশয়টির পাশ দিয়ে আমরা রাজপ্রাসাদের ওপরে উঠে এলাম। এই সেই প্রাসাদ যেখানে বিপ্লবের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। রাজকীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রথম সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করতে পেরেছিল। এখানেই থাকতেন সেই মহিলা যিনি রুটি খেতে পায় না বলে কেক খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। রাজার বাড়ি, রানির বাড়ি, ঘোড়াশালা এবং সেই গেট যেখানে হাজার হাজার মানুষ জমায়েত হয়ে ফরাসি বিপ্লবের সূচনা করেছিল। দেখতে-দেখতে আলো নিভল।

সন্ধেবেলায় আমরা খুব আন্তরিক আড্ডা মারলাম মিসেস সান্যালের বাড়িতে। অসীমবাবু চলে এসেছেন এখানে। মিসেস স্যানালের মেয়ে ভালো ছাত্রী, নাচে। ওর বন্ধু একটি যুগোশ্লোভিয় ছেলে এসেছিল বাড়িতে। লন্ডনে উচ্চশিক্ষার্থে যাবে মেয়েটি সেই বিষয়ে আলোচনা। বাঙালি মেয়ের সমস্যা অনেক খাতে কথা বলে গেল। জানা গেল প্যারিসেও ভারতীয় বারবনিতা আছে। মধ্যরাত্রে আমরা যখন বিদায় নিলাম দরজায় দাঁড়িয়ে মিসেস সান্যাল বললেন, 'আবার আসবেন।' কে বলে আমরা কলকাতায় নেই।

আসলে ওই কথাটাই ঠিক। একজন বাঙালি বিদেশে গেলে বিদেশটা বিদেশই থাকে। তাকে সেই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয় আর তা থেকেই এক ধরনের একাকিত্ববোধ জন্মায়। কিন্তু দুজন বাঙালি একত্রিত হলেই বিদেশের পরিবেশকে টপকে নিজেদের আবহাওয়া টেনে আনতে বাঙালির জুড়ি নেই মুকুন্দ বলেছিল, 'রাজস্থানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। একজন বিদেশিনীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল দেখেছিলাম ওরা কীভাবে নিজেদের চটপটে রাখে। এবার বিদেশ এসে বুঝলাম আমাদের মাঝে-মাঝে বেরুনো উচিত। শুধু একবার বিদেশে এলেই তিন-চার বছর তার আর্থিক ঝামেলা সামলাতে হিমসিম খেতে হবে। এই যা। দেবু বলেছিল, 'এই জন্যেই সরকার তিন বছরের মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা ইস্যু করছে না। সামলে ওঠার সময় দিতেই।' হয়তো। কিন্তু আমরা যা করি তার উলটোটাই করা উচিত। বিদেশে গেলে ফিরে আসার দিন ছাড়া কোনও বাঙালির সঙ্গে দেখা করা উচিত নয়। প্রতিকূল পরিবেশে নিজের অস্তিত্ব আবিষ্কারের আনন্দ যাঁরা পেতে চান তাদের জন্যে এই একটি সৎ উপদেশ।

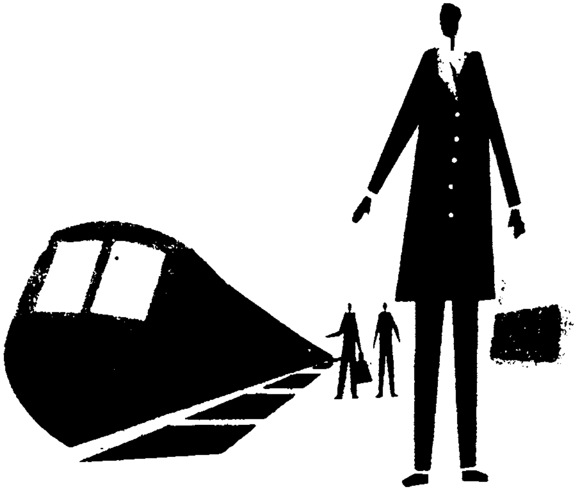

বিনিসুতোয়

বড় বিস্ময় লাগে। যখনই নিজের দিকে তাকাই তখনই অপলক হই। এই আমি কোন আমি? মাঝে-মাঝে নিজেরেই সন্দেহ জাগে, কোন আমিটা ঠিক? যে আমি সকালবেলায় লেখার টেবিলে উপুড় হই সেই আমি, না, জুয়োর টেবিলে পাই পয়সার হিসেব কষি সেই আমি? দুপুরবেলার সিরিয়াল তৈরির হিসেবে ব্যস্ত মানুষটার সঙ্গে রেসের মাঠের আমি অথবা বইমেলায় সই বিলিয়ে যাওয়া লেখকের সংযোগ কোথায়? এক জীবন দূরের কথা, একটা দিনেই নিজেকে কতরকম ভূমিকায় দেখে যাচ্ছি। মাঝরাতে চুপচাপ শুয়ে থেকে মনে হয় অনেকগুলো ভূমিকায় কী চমৎকার অভিনয় করে যাচ্ছি আমি।

তবু, কেউ-কেউ এখনও বলে থাকেন, আমার মধ্যে নাকি সেই মফস্‌সলি গন্ধটা তিরতিরিয়ে বেঁচে আছে। যাই করি, যে ভূমিকায় নামি গন্ধটা থেকে যায়ই। ইলিশ খাওয়া থালা সাবানজলে ধুলেও যেমন গন্ধের অস্বস্তিটা সরিয়ে ফেলতে পারা মুশকিল। তিরিশ বছরে এই কলকাতা শহর আমাকে অনেক দিয়েছে। আমার যা প্রাপ্য ছিল তার ঢের-ঢের বেশি। যদি প্রশ্ন হয় কতটুকু প্রাপ্য ছিল তবে তার সরল জবাব, যতটুকু যোগ্যতা। সেই যোগ্যতা কতটুকু তা নিজের চেয়ে বেশি কারও জানার কথা নয়। হয়তো সেই মফস্‌সলি গন্ধটা থেকে যাওয়ার জন্যেই, এখনও আমি, সব কিছু থেকে সরে গিয়ে নিজের দিকে নির্লিপ্তভাবে তাকাতে পারি। আর এই পারাটাই কাল হয়ে ওঠে।

শৈশব, বাল্যকাল এবং যৌবনের শুরুটা ছিল যে বৃত্তে, যার গণ্ডি এখনও অতিক্রম করেনি আমার অনেক শৈশবসঙ্গী, সেখানে কোনও উচ্চাশা ছিল না। মাটি গাছ আর আকাশের মতো জীবন ছিল স্বচ্ছন্দ, সমস্যাহীন। বালক বয়সে পুরো তল্লাটে একটি মাত্র রেডিও বাজত। খবরের কাগজ আসত একদিনের বাসি হয়ে। সারা দিনে শহরে বাস যেত বার চারেক। ঝরনায় লাল চিংড়ি থাকত, সন্ধে হতেই চা-বাগানের কুলি লাইনে মাদল বাজত। তখন যা ছিল স্বাভাবিক এখন তা স্বপ্নের মতো মনে হয়। আর এই স্বপ্নটাই বারে-বারে ঘুরে এসেছে আমার লেখায়। অমরাবতী চাই না আমি, শেষ সময়ে কেউ যদি সেই চা-বাগানের ঘুঘুডাকা ছায়ামাখা ঘাসের গালিচায় আমাকে শুইয়ে দেয়, আহা, কী আপন হবে সে। কিন্তু শেষ সময়ে কোন সময়? আর তখনও কি আমি এই আবেগে আপ্লুত থাকব? জানি না? আজকাল নিজেকেই সবসময় বুঝে উঠতে পারি না। বিস্ময় বাড়ে।

সে বড় সুখের সময় ছিল। আমাদের পৃথিবীটা ছিল একটা চা-বাগানের গণ্ডিতে আবদ্ধ। তারপর যেদিন প্রথম জলপাইগুড়িতে গেলাম জয় মা কালী বাসে চেপে সেদিন দু-চোখে শুধু বিস্ময়। অত বড় নদী তিস্তা, তার চরের পক্ষীরাজ ট্যাক্সি, শহরের সিনেমা হল, রাস্তায় রিকশা আর মানুষ— তাল রাখতে না পারার আনন্দে টইটুম্বুর। পিতামহের হাত ধরে স্কুলে যাওয়া, ক্রমশ সেই হাত ছাড়িয়ে মাথা তুলতে-তুলতে একসময় জলপাইগুড়ি শহর নিজের হয়ে গেল। বাড়ি থেকে পালিয়ে রাতদুপুরে সিনেমা দেখে চোরের মতো ফেরার সময় জ্যোৎস্না যখন ফিনিক দিচ্ছে তখন বুকের মধ্যে সেই সিনেমার গান বেজেছে, আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যে থাকে। সাতসাগর আর তেরো নদীর পার মানে কলকাতা। সেই মফস্বল শহরের সদ্য কৈশোর ছাড়ানো তরুণকে তখন কলকাতা বারংবার হাতছানি দিচ্ছে। কলকাতা মানে সত্যজিৎ রায়, উত্তমকুমার। কলকাতা মানে সুচিত্রা সেন। কলকাতা মানে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি লাভপুরের কথা জানিনি, নিশ্চিন্দিপুরের ঠিকানাও খুঁজিনি। কলেজ স্ট্রিট আর টালিগঞ্জ দু-হাত হয়ে হাতছানি দিয়ে গেছে সামনে। এটা সেই সময় যখন আমার পিতামহ সঙ্গে নিয়ে গেছেন দিনবাজারে। সস্তার কাপড় কিনে দর্জির দোকানে আমার প্যান্টের মাপ দেওয়াবার পর গম্ভীর মুখে বলেছিলেন, 'তোমাকে এবারও একটা ভালো প্যান্ট দিতে পারলাম

না। খারাপ লাগে, কিন্তু আমি অক্ষম। তবে কি জানো, পোশাক মানুষের চেয়ে বড় নয়।' আমার দুটোর বেশি ফুলপ্যান্ট ছিল না যেদিন স্কুলের পালা চোকে।

এখনও চোখ বন্ধ করলেই পিতামহের মুখ দেখতে পাই। চা-বাগানের মতো বারংবার তিনি আমার লেখায় এসেছেন। আমার কলকাতায় যাওয়ার অভিলাষ তাঁর জানা ছিল। ওই আর্থিক কাঠামোয় সেটা বিলাসিতার শামিল ছিল আমার পিতৃদেবের কাছে। কিন্তু পিতামহ বলতেন, 'নিশ্চয়ই যাবে। কিন্তু তার জন্যে যোগ্যতা অর্জন করো। অযোগ্যদের কেউ ঠাঁই দেয় না। যেতে হলে মাথা উঁচু করে যাবে।'

এই মাথা উঁচু করে যাওয়া মানে শেষ পরীক্ষায় ভালো ফল। ঝরনা যখন নদী হতে চায় তখন কোন পাহাড়ের সাধ্য নেই তাকে ধরে রাখার। আজ বুঝি, আমার প্রতিটি রক্তকণায় সেই বাসনা তীব্রতর হয়েছিল নইলে আমার সহপাঠীরা আজও জলপাইগুড়ির নিস্তরঙ্গ জীবনে তাদের মতো চমৎকার বেঁচে আছে কী করে? বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথ নয়, কুড়ি একুশ সাল থেকে লেখা বঙ্গসাহিত্য গিলে ফেলেছি এরই মধ্যে। কলকাতা মেসে থাকা, প্রেসে প্রুফ দেখা অথবা ছাত্র পড়ানো বা খবরের কাগজে পার্ট টাইম চাকরির সঙ্গে কলেজে পড়ার গল্প সেইসব সাহিত্যে বারংবার পড়ে নিজেকে তার একটি চরিত্র ভেবে নিতে কষ্ট হয়নি একটুও। সতেরো বছর বয়সে ট্রেনে চড়লাম। সন্ধের মুখে জলপাইগুড়ি ছেড়ে পরের ভোরে মণিহারি ঘাট, গঙ্গায় স্টিমারের ভেঁপু, বাক্সপ্যাঁটরা নিয়ে বালির চর ডিঙিয়ে এপারের ট্রেনে ওঠা আর ভর সন্ধেবেলায় শিয়ালদা। আজ মনে নেই দিনটা কী ছিল, কী বার, কী তারিখ। কিন্তু একটা বিশাল তিমি আমায় টুক করে গিলে ফেলল। গিলল কিন্তু তিরিশ বছর পরও যার গায়ে মফস্‌সলি গন্ধ থাকে তাকে নিশ্চয়ই হজম করতে পারেনি কলকাতা। প্রতিটি মানুষের একটা বয়স থাকে যখন অনটন, আর্থিক সংগ্রাম তুচ্ছ হয়ে যায় বিস্ময়ের কাছে। এইভাবেই তো কেটে গিয়েছিল অনেকদিন।

সকালে প্রেসে কাজ করি প্রুফ দেখি, দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি, সন্ধেয় কফিহাউসে আড্ডা চলে, রাত বাড়লে হেঁটে-হেঁটে সুশীল মুখোপাধ্যায়ের কৃপায় পাওয়া এক অফিসের টেবিলে পৌঁছে বিছানা পাতি। কোনও কষ্ট নেই। সেটা কলকাতার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার সময়। হারব না। জেতার যোগ্যতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই। কফিহাউসের আড্ডা ছেড়ে থিয়েটার শুরু করেছি। গ্রুপ থিয়েটার। শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, বিজন ভট্টাচার্য তখন জীবনের ধ্রুবতারা। কাউকে চিনি না, মঞ্চে নাটক দেখে আর কাগজে সমালোচনা পড়েই সমীহ বেড়েছে। কিন্তু ষাটের দশকে গ্রুপ থিয়েটার করে যাঁরা মাথা নোয়াননি। তাঁরা আমার কাছে নমস্য। দশটা ভিন্নমুখী ঘোড়াকে এক লাগামে বেঁধে একমুখী করার হিম্মত আমার ছিল না। অভাব.আর অসামর্থ্য পায়ের তলার মাটি কেড়ে নিচ্ছিল। সব ছেড়েছুড়ে যখন কলকাতার জনসাধারণ হয়ে যাচ্ছি তখনই লেখা ছাপা হল 'দেশ'-এ। সে-ও ছিল খেলা। সেই খেলা খেলতে-খেলতে এখন নিজের দিকে তাকিয়ে শুধুই বিস্মিত হই।

এ প্রসঙ্গ থাক। চা-বাগান থেকে জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতা। তিরিশ বছরেও কলকাতাকে কবজা করা গেল না। কলকাতার মানুষ আমার কাছে এখনও অজানা। আমি ঠিক বুঝতে পারি না। শূন্য অবস্থা থেকে যাঁরা সাফল্যের শিখরে ওঠেন তাঁদের সংগ্রাম করার বাসনা সবসময় একমুখী থাকে। তাঁরা জানেন কী করতে চলেছেন। স্বীকার করতে লজ্জা নেই মাঝে-মাঝে মনে হয় এসবই আমার পাওনা ছিল না। কারণ আমি জানতাম না কী করব।

সেটা চুরাশি সাল। দেশে কালবেলা লিখে ফেলেছি। কেউ বলছেন বাঃ, কেউ ঠোঁট মুচড়ে, যাচ্ছেতাই। লেখা নিয়ে ভাবার কষ্ট করতে তখনও বাসনা নেই, মাথায় নাটক ছেড়ে সিনেমা পাক মারছে। প্রতি সপ্তাহে রদ্দি বাংলা ছবি দেখে দেশের পাতায় সমালোচনা লিখে ক্লান্ত। হয়তো ওই বাধ্যতামূলক দেখাই আমার ছবি তৈরি করার ইচ্ছেটাকে প্রবল করছিল। এই সময় মনোজের সঙ্গে আলাপ। মনোজ ভৌমিক।

থাকে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে। ছবিতে দেখা বিদেশি শহরগুলো আমার কাছে একরকম লাগে। আর আমেরিকা মানে বুর্জোয়া বড়লোকদের দেশ। ছাত্রাবস্থায় ভিয়েৎনামী মানুষের সমর্থনে আমেরিকার বিরুদ্ধে মিছিল করেছি। যা কিছু মন্দ তার দায় ওদের ওপর চাপিয়ে দিলে বেশ সুখ পাওয়া যায়। মনোজের সঙ্গে কথা বলে থতোমতো খেলাম। সে চল্লিশের নীচে। হইহই করে কথা বলে। নিউইয়র্ক শহরে বসে কলকাতার কল্যাণ সর্বাধিকারীকে সঙ্গী করে বাংলা কাগজ বের করে। অফ ব্রডওয়েতে নাটক করেছিল। বাংলা থিয়েটার করে সেখানে নিয়মিত। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। দিন পাঁচেক আড্ডা মারার পর একদিন ফস করে বলল, 'সমরেশ, আপনি আমেরিকায় আসবেন? কিছুদিন থাকতে হবে কিন্তু।'

আমি হতভম্ব। তখনও আমেরিকায় যাওয়ার টিকিট আমি ছয় মাসের মাইনে দিয়ে কিনতে পারতাম না। জলপাইগুড়িতে যাই সেকেন্ড ক্লাসে। মনোজ বলল, 'বেশ কিছুদিন ধরে আমি একটা বাংলা ছবির কথা ভাবছি। আমেরিকায় যেসব বাঙালি শেকড় খোঁজার চেষ্টায় হন্যে হচ্ছেন, দ্বিতীয় প্রজন্ম এসে যাওয়ায় যাঁদের সমস্যা আরও বেড়েছে তাঁদের নিয়ে ছবি। ইতিমধ্যে একটা ডকুমেন্টরি করেছি আমি, এবার ফিচার।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আমায় কী করতে হবে?'

মনোজ বলেছিল, 'আপনি যদি চিত্রনাট্য লিখতে আমায় সাহায্য করেন তাহলে খুব ভালো হয়। আপনার সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়ে মনে হচ্ছে আপনি ঠিক লোক। আমার কাগজে আমি এই বিষয় নিয়ে একটা উপন্যাস লেখার চেষ্টা করেছি। একটু কাঁচা লেখা। আপনাকে দিচ্ছি, পড়ে ফেলুন।'

হেসেছিলাম, 'আপনি পেশাদার চিত্রনাট্যকারদের কাছে যাচ্ছেন না কেন?'

'আমি টাটকা ভাবনা চাই।' মনোজ বলেছিল।

সেটা চুয়াত্তর সাল। এর দশ বছর আগের কথা। 'দেশ' পত্রিকায় পুজো সংখ্যায় উপন্যাস লেখার প্রথম প্রস্তাব পেয়েছিলাম সাগরদার কাছ থেকে। হঠাৎ আকাশ থেকে হিরে পকেটে পড়লে যত আনন্দ হয় তার লক্ষ্যগুণ আনন্দিত হয়েছিলাম। আগে কখনও উপন্যাস লিখিনি। কী করে লিখতে হয় তাও জানি না। অনেক ঘষে-ঘষে 'দৌড়' লিখে ফেলেছিলাম। কম্পোজও হয়ে গেল। পরিচিত কাউকে বাদ রাখিনি জানাতে। হঠাৎ আকাশ ভেঙে পড়ল। শরৎচন্দ্রের একটি অপ্রকাশিত উপন্যাস পেয়ে গেলেন সাগরদা। সেই কারণে জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছিল আমাকে। কী কষ্টে সময়টা কেটেছিল তখন। তাই কেউ লোভ দেখালে উৎসাহিত হই না আর। কিন্তু মনোজ নাছোড়বান্দা।

ওর লেখা পড়ে ফেললাম। প্রচুর অবান্তর কথা আছে। ও সেটা স্বীকার করল। কিন্তু গল্পের বিষয়বস্তু এত নতুন যে বেনোজল ঢুকে গেল মনে। তবু জানতে চাইলাম, 'কলকাতায় বসেই তো এর চিত্রনাট্য লেখা যায়। যায় না?'

মনোজ মাথা নাড়ল, 'যায় না। দুটো জীবনযাপনের ধরন একেবারে আলাদা। ধরুন, আপনার সিগারেট দরকার। এখানে বাড়ি থেকে বেরিয়েই পানের দোকানে সেটা পেয়ে যাবেন। ওখানে সিগারেট কিনতে যেতে হবে গ্যাস স্টেশনে। অফিসের দিনে আমরা ভাত খাই সন্ধের পর, সারাদিনে বাড়িতে রান্নাই হয় না। না দেখলে লিখতে পারবেন না। আপনি গল্প সাজাতে পারবেন হয়তো কিন্তু সেটা ইট সাজিয়ে ঘর বানানোর মতো ব্যাপার হবে, তাতে সিমেন্ট থাকবে না।'

জলপাইগুড়ির সেনপাড়ার কনকমাসির কথা খুব মনে পড়ে। দারুণ রান্না করতেন আবার নিজের হাতে ঘুঁটেও দিতেন। পৌষমাসে গোকুল পিঠে করে আমায় ডেকে পাঠাতেন। কনকমাসির বিয়ে হয়নি। কেন হয়নি জানি না। যখন তাঁকে প্রথম দেখি তখন আমি স্কুলের নীচের ক্লাসের ছাত্র।

জেলা স্কুলের পাশেই ওঁরা থাকতেন। কনকমাসি আর তাঁর বাবা। ছুটির সময় সেজেগুজে বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। দেখতে পেলেই কাছে ডেকে নানান গল্প। আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাদের নতুন বাংলার স্যার শান্তিবাবুর কথা জিগ্যেস করতেন, ওবাড়িতে তৃতীয় কোনও মানুষ ছিল না। একগাদা বেড়াল ছিল কনকমাসির। গায়ের রং বেশ চাপা, মুখ-চোখ মন্দ নয়। তখন বুঝতাম না পরে মনে হয়েছিল শান্তিবাবুকে নিশ্চয়ই ওঁর ভালো লেগেছিল। কিন্তু আমরা কেউ ওঁদের কথা বলতে দেখিনি। সে সময় জলপাইগুড়িতে কোন ছেলেমেয়ের একটু ঘনিষ্ঠতা হলে দেওয়ালে দেওয়ালে তাদের নাম লিখে মাঝখানে যোগচিহ্ন দিয়ে দেওয়া হত। কনকমাসি আর শান্তিবাবুর নাম দেওয়ালে ওঠেনি। আমি যখন স্কুলের শেষ ধাপে তখন শান্তিবাবু কৃষ্ণনগরে চলে গিয়েছিল। কনকমাসি যেমনটি ছিলেন তেমনই আছেন। কলকাতায় পড়তে যাওয়ার অভিলাষ শুনে ভ্রূ কুঁচকে চিবুকে হাত দিয়ে বলে উঠেছিলেন, 'কেন? এখানে কি কলেজ নেই?'

আমি নিজের মতো যুক্তি দেখিয়েছিলাম। তিনি শুনতে চাননি। পরের দিন আবার ডেকে বলেছিলেন, 'শোন, ভালো কথা বলছি, কলকাতায় পড়তে যাস না।'

'কেন?' আমার কথাটা ভালো লাগেনি।

'ওখানে গেলে তুই নষ্ট হয়ে যাবি।'

'মানে?'

'কলকাতায় ছেলেধরা মেয়ে থিকথিক করছে। তুই তো এখন বড় হচ্ছিস, ঠিক ধরে নেবে তোকে। কলকাতার মেয়েরা খুব স্বাধীন হয় বলেই লজ্জার মাথা খেয়ে বসে থাকে। তোর ভালোর জন্যেই বলছি, যাস না ওখানে।'

কতটুকু দূরত্ব? তখন ছিল চব্বিশ ঘণ্টার। এখন বারো। এই সেদিনও এক বৃদ্ধাকে বলতে শুনেছি 'ছেলে যে কলকাতার মেয়েকে বিয়ে করেছে, নাকের ডগায় লাঠি তো ঘোরাবেই।' কনকমাসিদের এইসব ভয়ের পেছনে হয়তো কোনও ঘটনা আছে। তা থেকে ব্যবধান তৈরি করে ছিলেন তাঁরা। বঙ্গসন্তানের বিদেশ যাত্রায় তো আরও বেশি ভয় কাজ করত। বিলেত যাচ্ছে, নিশ্চয়ই মেমসাহেব বিয়ে করবে। আর মেমসাহেব মানে ঝি মেথরের মেয়ে। ভালো মেম কেন এদের বিয়ে করবে? বাঙালির স্বভাব হল আগবাড়িয়ে খারাপ ভাবা। তিনি সপরিবারে দক্ষিণ ভারত ঘুরে আসবেন আট হাজার টাকার খরচ করে কিন্তু যদি বলা যায় এই টাকায় আপনি স্বচ্ছন্দে ব্যাঙ্কক দেখে আসতে পারতেন তখন স্বীকার করতে দ্বিধা করবেন ঠিক সাহস হচ্ছে না। যদি বিদেশে কিছু অঘটন ঘটে যায়।

শেষ পর্যন্ত মনোজের আগ্রহে এবং সুপ্রিয়দার উৎসাহে ওদেশটা ঘুরে আসা গেল। আমেরিকার ইতিহাস তিনশো বছরের। ওখানকার স্মৃতিসৌধগুলোর বয়স তার বেশি কী করে হবে? সেসব দেখার আগ্রহ আমার ছিল না। মনোজ আমাকে মানুষ দেখিয়েছিল। বিচিত্রতর মানুষ আর তাদের জীবনযাপন। সেইসঙ্গে আমাদের জীবনযাত্রার হাজার অসংলগ্নতা বড় হয়ে উঠল ওদের নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা দেখে। ওই ছবির চিত্রনাট্য লেখা আমার পক্ষে সম্ভবই হত না যদি ওদেশে না যেতাম। অর্থনৈতিক কাঠামো নড়বড়ে হয়ে গেলে যে হতাশা বোধ আসে তা রুচিকে আঘাত করে পুরো মাত্রায়। আধপেটা খাওয়া মানুষ বস্তির ঘরে যখন পা ছড়িয়ে বসে দেখে তার শিশু গ্লাসের জল ঢেলে দিল মেঝেতে তখন এক ধরনের ক্লান্তিতে আক্রান্ত হয়ে সেটা পরিষ্কার করার তৎপরতা দেখাতে চায় না সে আর। এমনিতে যা অস্বাভাবিক অভাব তাকে স্বাভাবিক করে দেয়। আর সেটা যদি একবার স্বভাবে ঢুকে যায় তাহলে এই দীনতা ক্ষমা করো প্রভু বলে দীনতাকে অলংকার করেই সে বেঁচে থাকতে চায়। ওদেশের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য এখানেই।

একটা ছোট্ট উদাহরণ। আমার মাস্টারমশাই নারায়ণবাবু রোগগ্রস্ত শরীরে মাইকের অবিরাম চিৎকার সহ্য করতে পারেননি। মারা যাওয়ার আগে দেশ পত্রিকায় সুনন্দর জার্নালে সেকথা লিখেও

গিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। এখন কারণে অকারণে সকাল থেকে সন্ধে মাইক বাজে। বড়-বড় পুজোর কথা বাদ দিলাম, ছেলেরা তারকেশ্বরে বাঁক বয়ে যাবে সন্ধেবেলায় সকাল থেকে মাইক বাজছে। দিব্যেন্দু বড়ুয়া গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েছে বলে বাজাও মাইক। থানায় ফোন করলে শুনতে হয়, আহা, একদিনই তো বাজাচ্ছে, বাজাক না। হার্টের রুগির নাভিশ্বাস উঠল তো প্রশাসনের বয়ে গেল। এদেশের প্রধান সংগঠিত রাজনৈতিক দল কখনই চেষ্টা করেনি নাগরিকদের একটু ভদ্র আচরণ শেখাতে। ওদেশে আমি কোথাও মাইক বাজতে শুনিনি। মনোজের সঙ্গে নায়েগ্রা দেখে বাফেলো শহরে বাংলাদেশের ছেলে জামিলের বাড়িতে উঠেছি। চমৎকার আড্ডা হচ্ছে। জামিলের সংগ্রহে সন্ধ্যা মুখার্জির প্রায় সমস্ত রেকর্ড দেখে গানে মোর ইন্দ্রধনু বাজাতে বললাম। জামিল জানলা বন্ধ করতে উঠলে তাকে নিষেধ করলাম। সে হেসে বলল, 'তাহলে আপনি ফেস করবেন।' বেশ চড়া পরদায় গান বাজছিল। মিনিট দশেক বাদে দরজায় শব্দ। জামিল আমায় ইশারা করল খুলতে। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম দশাসই চেহারার এক পুলিশ অফিসার। হেসে বললেন, 'মহ'শয়, আপনাকে আমার সঙ্গে একবার একটু ই এন টি স্পেশালিস্ট ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন?'

'নিশ্চয়ই আপনার কান খুব খারাপ হয়েছে নইলে অত জোরে বাজানো গান শুনতে হচ্ছে কেন? চলুন?'

লজ্জা পেয়েছি দেখে বললেন, 'আপনার প্রতিবেশীর অধিকার আছে একটু শান্তিতে থাকার। আপনারও অধিকার আছে গান শোনার। জানলা বন্ধ করে একটু আওয়াজ কমিয়ে শুনলে সম্ভবত দুজনের অধিকার বজায় থাকে।'

যেহেতু আমি ওদেশে নতুন তাই ফাইন আদায় করেননি ভদ্রলোক। জামিল বলেছিল এক্ষেত্রে ফাইন অবধারিত। আমার নারায়ণবাবুর কথা মনে পড়েছিল। এইরকম একটা ঘটনা কলকাতা শহরে কবে ঘটবে? যা অবস্থা তাতে কি কেউ আশা করতে পারি কখনও ঘটতে পারে? বস্তির যেসব ছেলে মাইক বাজায় তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি হাজারবার বাজানো গানগুলো কেউ শোনে না। ওরা শুধু শব্দ চায়। বৈচিত্র্যহীন জীবনে যে-কোনও একটা শব্দ তাদের অনেক কিছু ভুলিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

তরুণ বয়সে কেউ আমেরিকার প্রশংসা করলে তাকে দালাল বলতাম। ফ্রান্সের প্রশংসা করলে তেমন গালাগালি খুঁজে না পেয়ে গম্ভীর হয়ে যেতাম। আমেরিকায় কোন ভালো জিনিস থাকতে পারে না, থাকলেও বলা মাত্র সি আই এ-র এজেন্ট হয়ে যেতে হবে—এমন একটা আবহাওয়া তখন চালু ছিল, এখনও বিশেষ একটি দুটি রাজনৈতিক দল তেমনই ভাবেন। বস্তির মানুষদের এককাট্টা করতে দেরি হয় না যদি কোঠাবাড়িতে থাকা মানুষ প্রতিপক্ষ হয়। সেই কোঠাবাড়ির মানুষ যদি অভুক্ত থাকে তাতে কী এসে গেল। মনোজের ছবির বিষয়বস্তুতে ও এই দিকটা একেবারে বাদ দিয়েছিল।

মনোজ চেয়েছিল আর্থিক নিরাপত্তা এবং নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের জন্যে ষাট সত্তরের দশকে যেসব শিক্ষিত বাঙালি আমেরিকায় এসেছিলেন এবং ক্রমশ গ্রিনকার্ড এবং নাগরিকত্ব নিয়ে নিজেদের আলাদা করে ফেলেছেন তাঁদের নিয়ে ছবি করতে। দেশ থেকে শেকড় উপড়ে ফেলেছিলেন কেউ-কেউ, কারও অজান্তেই আলগা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু নতুন দেশে সেই শেকড় মাটি পেল না। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় প্রজন্ম এসে গেছে। তারা বড় হচ্ছে। দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে কোনও ধারণা তাদের নেই। উলটে তাদের শেকড় বসে যাচ্ছে দ্রুত জন্মভূমিতে। ফলে দুই প্রজন্মের মধ্যে কোথাও চাপা কোথাও সোচ্চার ব্যবধান প্রকট হয়ে উঠেছে। এরা না বাঙালি না আমেরিকান। প্রথম প্রজন্ম এখনও দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক, দ্বিতীয় প্রজন্ম তাদের বন্ধুদের অনুসরণ করে প্রথম শ্রেণিত্ব পাওয়ার চেষ্টা করছে। এই বিরোধ নিয়ে মনোজের ছবি। আমাদের চিত্রনাট্য শেষ হয়ে গেল। মনোজ খুব খুশি। কাকে

কোন চরিত্রে নেওয়া হবে তাও ভাবা হল। আমি ফিরে আসার কিছুকাল পরে সে দেশে এসে টালিগঞ্জের কয়েকজন অভিনেতা অভিনেত্রীর সঙ্গে কথা বলে গেল। দল নিয়ে আমাকেই যেতে হবে শুটিং-এর জন্যে। ফিরে গিয়ে সে লিখল, 'আমার স্বপ্নের ছবিটা যে শেষ পর্যন্ত হতে চলেছে তা আপনার জন্যেই। এই ছবির সঙ্গে আপনি যুক্ত না থাকলে কখনই সম্পূর্ণ হবে না। আপনার আসা চাই।' একটু বাড়াবাড়ি, ও আবেগের শিকার হয়েছিল হয়তো।

আর তার পরেই খবরটা পেলাম। ব্যাংকে গিয়ে টাকা তুলে পার্কিং লট থেকে গাড়ি বের করা মাত্র ওর পুরোনো রোগ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বুকের যন্ত্রণা সামলে উঠতে পারেনি সে। চল্লিশের নীচে একটি টগবগে জ্যান্ত মানুষকে ঈশ্বর টেনে নিলেন নিষ্ঠুর হাতে। এমন জীবন্ত মানুষ আমি আর দেখিনি।

সব শেষ হয়ে গেল। কিন্তু বুকের মধ্যে কষ্টটা তিরতির করত। কষ্টটা মনোজের জন্যে, কষ্টটা ছবিটা না হওয়ার জন্যে। নিউইয়র্কে থাকার সময় ছবিটার পরিকল্পনা সফল করতে আমরা বাংলাদেশি চলচ্চিত্রবিদ ফুয়াদ চৌধুরী, কানাডার সাইমন স্কট, আমেরিকান ক্যামেরাম্যান কেন্ট মুরহেডের সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছি। ফুয়াদ পরামর্শ দিয়েছিল জেনারেশনগ্যাপ এবং শেকড় ছেঁড়ার সমস্যা শুধু কলকাতার বাঙালিদের নয়, ঢাকার বাঙালিদেরও। আমেরিকায় যদি এক লক্ষ বাঙালি থাকেন এপারের তাহলে দু-লক্ষ ওপারের। অতএব ওই ছবিতে ঢাকার শিল্পীদেরও রাখা হোক। সেই পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছিল। যেহেতু আমেরিকায় ছবিটি তৈরি এবং প্রযোজিত হবে তাই আমেরিকান সার্টিফিকেট নিয়ে ভারত বাংলাদেশে একসঙ্গে দেখানো যেতে পারে। এতে ব্যাবসা বাড়বে। ভারতীয় ছবি বাংলাদেশে রপ্তানি করা যায় না। ছবির নায়িকা, কুড়ি বছরের মেয়ে পিংকি, যে ওদেশেই বড় হয়েছে, সেই চরিত্রে নির্বাচন করা হয়েছিল ওয়াশিংটনের রমেন পাইনের মেয়ে জয়ন্তীকে। কিন্তু মনোজ চলে যাওয়ায় সব শেষ হয়ে গেল।

অথচ মনের ভেতরে বসে কেউ বলত ছবিটা করা দরকার। মনোজের ইচ্ছেটাকে পূর্ণ করতেই হবে। কিন্তু কীভাবে কী হবে সেই পথটাই আমার জানা ছিল না।

দিন যায় দিনের মতো। বুঝতে পারছি লেখালেখির জীবনটাই আমার একমাত্র পরিচয় হয়ে উঠছে। অথচ লেখক বলতে যাঁদের ছবি সামনে ভাসে তাঁদের মতো জীবনযাপন আমার পক্ষে কখনই সম্ভব হল না। আসলে নিজেকে লেখক বলে ভাবতে না চাওয়ার ইচ্ছেটাই ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই সময় সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। কলকাতায় তখনও টিভি সিরিয়াল চালু হয়নি। সোনেক্স-এর জোছন দস্তিদার সেই ঝুঁকি নিচ্ছেন। সুপ্রিয়দার মতে একজন বাঙালি বড় কিছু করতে চাইছে, বাঙালি হিসেবে তাঁকে আমাদের সাহায্য করা উচিত। মনের মতো কাজ পেয়ে গেলাম। জোছনবাবুর সঙ্গে সেই প্রাথমিকপর্ব থেকে শুরু করলাম। অনেকেই বললেন, হয়ে গেল লেখালেখি। এইটেই আমি বুঝি না। একজন মাস্টারমশাই যদি ছাত্র পড়িয়েও লিখতে পারেন তাহলে সিরিয়াল তৈরির কাজ করেও আমি পারব না কেন? ছাত্রাবস্থায় সিনেমা পত্রিকা, পরে গ্রুপ থিয়েটার, চলচ্চিত্র সমালোচনা এবং মনোজ যে ইচ্ছেটাকে প্রবল করে তুলেছিল তার তাগিদে তেরো পার্বণ শুরু করলাম। সোনেক্সে আমার ভূমিকা ছিল পরামর্শদাতার। তাতে মন ভরছিল না। শেষ পর্যন্ত নিজেরাই কাজ হাতে নিলাম। আমি, অরিজিত আর রমাপ্রসাদ। শেষ দুজনের নাটক সম্পর্কে গভীর অভিজ্ঞতা আছে। বাংলা ভাষায় সিরিয়াল করতে গিয়ে যেসব সমস্যা হয়েছে তার সমাধান ওই অর্থনৈতিক কাঠামোয় সম্ভব নয়। তবু আমরা চেষ্টা করেছি ভালো কিছু করার। এই করতে-করতে একদিন হঠাৎই অরিজিতকে মনোজের কথা বললাম। তখন আমরা টাকা ধার করে সিরিয়াল বানাই। স্পনসরার টাকা দিলে ধার শোধ করে যা থাকে তা দিয়ে পরেরটা ধরি। বস্তুত পকেটে কিছুই যায় না। আমার প্রস্তাব শুনে অরিজিত নড়েচড়ে বসল। তারপর গল্প শুনে বলে ফেলল, 'এসো, আমরা গল্পটা নিয়ে সিরিয়াল করি।'

বললাম, 'সেটা করতে হলে নিউইয়র্কে শুটিং করতে হবে।'

অরিজ্জিত বলল, 'তা তো বটেই।'

'কিন্তু আমাদের টাকা কোথায়?'

অরিজিৎ হাসল, 'জোগাড় করতে হবে। লক্ষ-লক্ষ বাঙালি আজ বিদেশে পাকাপাকি রয়েছে। তাঁদের কথা, তাঁদের সমস্যার কথা কেন একটা সিরিয়ালের বিষয় হবে না? আমরা সাহায্য চাইব, সবার কাছে।'

ঢাল তরোয়াল ছাড়া যে নিধিরাম সর্দারের গল্প শুনেছি তার সঙ্গে আমাদের কোনও তফাত ছিল না। কিন্তু মনোজের ইচ্ছেটা তখন আমাদের মনে ফুলে ফেঁপে উঠছিল। কত টাকা লাগবে এই কাজে তারও কোনও আন্দাজ নেই। সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় তখনও মার্কিন প্রচার বিভাগে রয়েছেন। এক দুপুরে আমরা তাঁকে ইচ্ছেটার কথা জানালাম। তিনি লাফিয়ে উঠলেন, 'সাবাস। এই তো চাই। এগিয়ে যাও তোমরা।' তিনি নিয়ে গেলেন তাঁর বড়কর্তার কাছে। ভদ্রলোক সব শুনে বললেন, 'ইন্টারেস্টিং। কিন্তু কী করতে চাইছ তোমরা? আমরা চাই না বিদেশিরা আমেরিকায় গিয়ে তার জনসংখ্যা বাড়াক। তোমাদের সিরিয়ালে কি একই কথা বলছ?'

বললাম, 'আমরা কোনও প্রচার করছি না। যা সত্যি তাই বলতে চাই।'

তিনি চিত্রনাট্য পড়তে চাইলেন। মনোজের জন্যে লেখা চিত্রনাট্যের কপি আমার কাছে ছিল না। নতুন করে লিখতে বসে দেখলাম সব গুলিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে আরও অনেক নতুন ঘটনা জেনেছি আমি যা সিরিয়ালে ঢোকালে বক্তব্য জোরদা হবে। তা ছাড়া ছবি হয় মাত্র দু-ঘণ্টার। আর একটা সিরিয়ালের সময়সীমা আড়াইখানা ছবির সমান। এই বাড়তি গল্পটা কোত্থেকে আসবে।

অরিজিত প্রস্তাব দিল, 'চলো, একবার ভালো করে ওদেশের মানুষদের দেখে আসি। তারপর চিত্র্যনাট্য লেখা যাবে।'

তখনও মার্কিন সরকার আমাদের কোনও প্রতিশ্রুতি দেননি। ভারত সরকার টিভি-তে দেখাবেন কি না তাও জানি না। কিন্তু আমরা ঠিক করে ফেলেছি কাজটা করবই। যেখান থেকে হোক টাকা জোগাড় করে। আর এই সিদ্ধান্তটা নিতে একটি ঘটনা সাহায্য করল খুব। স্টেটসম্যানে বিজ্ঞাপন দেখে নিজের মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন আমাদের পরিচিত এক ভদ্রলোক। ছেলে আমেরিকায় থাকে। ইঞ্জিনিয়ার। তার পিতামাতা কলকাতায় থাকেন। তাঁরাই বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। ছেলে মাসখানেকের ছুটি নিয়ে এসে বিয়ে করবে। কথাবার্তা পাকা হলে ছেলে এল। তাকে ভালো লাগল সবার। জামাই আমেরিকায় বছরে ষাট হাজার ডলার মাইনে পায় বলতেও ভালো লাগে। এক ডলারের মূল্য তখন পনেরো টাকা ছিল। বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু আমেরিকান সরকারের নিয়ম অনুযায়ী বউকে পাকাপাকি নিয়ে যেতে কিছু সময় লাগে। নতুন বউকে রেখে ছেলে চলে গেল। একটা পৌঁছনো সংবাদ এসেছিল। তারপর সব চুপচাপ। মেয়ের বাবা ছেলের বাবার কাছে ছুটে যান। তিনিও ছেলের কোনও খবর পাচ্ছেন না। কিছুদিন বাদে তাঁরাও যেন নিজেদের গুটিয়ে নিলেন। মেয়ে একের পর এক চিঠি দিয়ে যাচ্ছে তাব স্বামীকে। কোনওটার জবাব নেই। মেয়ের বাবা পরিচিতির সূত্র ধরে ওদেশের বাঙালিদের চিঠি দিচ্ছেন জামাইয়ের খোঁজ পেতে। দুজন জবাব দিলেন। ভদ্রলোক যেখানে থাকেন বলা হচ্ছে সেখানে কোনও বাঙালি নেই। টেলিফোনেও তাকে ধরা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় মেয়েটি সিদ্ধান্ত নিল সে আমেরিকায় গিয়ে তার স্বামীকে খুঁজে বের করবে। জানতে চাইবে কেন এমন ব্যবহার তার সঙ্গে করা হচ্ছে? তাহলে বিয়ে করল কেন? ওই বিয়ে সম্পর্কে তার কোনও আগ্রহ নেই। কিন্তু উত্তরটা পেতে চায়।

আমরা নড়েচড়ে বসলাম। প্রায়ই তো বিদেশি পাত্রের জন্যে পাত্রী চেয়ে বিজ্ঞাপন দেখি। এই মেয়ে আর ওই ছেলে তো সিরিয়ালে থাকতে পারে। মনোজের গল্পটাকে মাঝখানে রেখে আমরা ওদেশের মানুষকে খুঁজতে পারি। একটা দেশকে জানা মানে আগে তার মানুষকে জানা।

ঠিক হল, আমেরিকার পূর্ব থেকে পশ্চিম গ্রে হাউন্ড বাসে চেপে আমরা দেশটাকে দেখব। যেখানে পছন্দ হবে নেমে পড়ব। এই সাড়ে চার হাজার কিলোমিটার ধরে চলবে আমাদের তথ্যসন্ধান যা মনোজের কাহিনিকে সমৃদ্ধ করবে। অজিরিত আর আমার সঙ্গে যোগ দিল সুব্রত। ঠান্ডা মাথার আইন ব্যবসায়ী। কলেজ থেকে ওকে দেখছি। বেড়ানো ওর শখ। আমরা যাব জ্যাট এয়ারলাইন্সে অল্প পয়সায় উচ্চশ্রেণিতে। যেতে হবে বেলগ্রেড হয়ে।

এমনটা কি হওয়ার কথা ছিল? চা-বাগানের ঝরনার ধারে বসে যে মুগ্ধ বালক পরম বিস্ময়ে লাল চিংড়িদের খেলা দেখত সে কি জানত জীবন প্রকৃতির থেকে অনেক বেশি বিস্ময়কর?

॥ ২ ॥

ক্রুস কোয়াৎজার কলকাতায় আছেন কয়েক বছর। যখনই পৃথিবীতে কোনও গোলমাল হয় তখনই তাঁর দপ্তরের সামনে কলকাতার কিছু মানুষ বিক্ষোভ জানান। কিন্তু ওঁর সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হওয়ার আগে আমারও জানা ছিল না ইনি একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র। আমাদের সমস্যা যেন ওঁর সমস্যা হয়ে গেল। যে পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি তাকে বাস্তবায়িত করতে ওঁর উৎসাহ চিরকাল মনে রাখব কিন্তু ওঁর ক্ষমতা সীমিত। ওয়াশিংটন এবং দিল্লির আমেরিকান কর্তারা ওঁর প্রস্তাবে মত দিচ্ছে না। ক্রুস কলকাতাকে ভালোবাসেন অকপটভাবে। এবং সেটা প্রকাশ করতে লজ্জা পান না। মার্কিন সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁকে গালাগাল খেতে হয় এই শহরের মানুষের কাছে, কিন্তু সেটা গায়ে মাখেন না। ক্রুস বললেন, 'তোমরা এগোও, আমি যতটা সম্ভব তোমাদের সাহায্য করব।'

সাহায্য বলতে দুটো জিনিসের প্রয়োজন। এক, আমেরিকায় শুটিং করতে ওদেশের সরকারের অনুমতি, দুই, আর্থিক অনুদান। অনুদান ডলারে নয়, যেসব যন্ত্রপাতি শুটিং-এর জন্যে ব্যবহার করতে হবে সেগুলো বিনা দামে পাওয়া। ক্রুস চেষ্টা করেছিলেন খুব। শেষ পর্যন্ত তিনি উপদেশ দিলেন দিল্লির মার্কিন সদর দপ্তরের রোগান মার্টিনের সঙ্গে দেখা করতে। তিনিই ভারপ্রাপ্ত অফিসার।

বিদেশযাত্রার আগে আমি আর অরিজিত দিল্লিতে গেলাম। সঙ্গে মনোজের গল্পের সারাংশ রয়েছে। টেলিফোনে সময় স্থির করা ছিল। মার্কিন তথ্যকেন্দ্রে ঢুকতে গিয়ে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। বারংবার যাচাই করা হল আমাদের। সঙ্গে যা ছিল তা খুলে দেখানোর পর মেটাল ডিটেকটার অনুমতি দিলে ভেতরে যেতে পারলোম। ওরা আমাদের দেশে এসে নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারে এত সতর্ক কেন হয়েছে জানি না। কিন্তু আমাদের রাইটার্স বিল্ডিং-এ মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের সামনে তো যে কেউ সহজ পায়ে হেঁটে যেতে পারে।

মার্টিন অল্পবয়সি মার্কিন যুবক। মুখের হাসি কিন্তু সন্দেহপ্রবণ। স্পষ্ট বলে দিল আমাদের পরিকল্পনা অবাস্তব। আমেরিকার এক শহর থেকে আর এক শহরে শুটিং আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। ওখান থেকে কোনও যন্ত্রপাতি দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। তা ছাড়া এই কাহিনি ওদের সরকারকে কোনও সাহায্য করছে না। আমরা তর্ক চালালাম। হঠাৎ মার্টিন জানতে চাইল, 'আপনারা যে শুটিং করতে যাচ্ছেন, এই ছবি দূরদর্শন দেখাবে এমন কোনও প্রমাণপত্র আছে আপনাদের কাছে?'

না নেই। আমরা এমন আবেগে ভাসছিলাম যে এদিকটা নিয়ে চিন্তাও করিনি। অরিজিত বলল, 'আমাদের বিশ্বাস যে দূরদর্শন রাজি হবে।'

মার্টিন হাসল, 'আমার অভিজ্ঞতা অন্যরকম। আপনারা দূরদর্শনের অনুমতি নিয়ে আসুন, তারপর কথা হবে।'

মার্টিনের অফিস থেকে মান্ডি হাউস বেশি দূরে নয়। কলকাতায় বসে মান্ডি হাউস সম্পর্কে শোনা কথাগুলো খুব প্রীতিপ্রদ নয়। কলকাতা দূরদর্শনেই স্ক্রিপ্ট জমা দিলে দু'বছর অপেক্ষা করতে

হয় অনুমোদিত হল কি না জানার জন্যে। মান্ডি হাউসে তো সারা ভারতবর্ষের ফাইল পড়ে। অরিজিত টেলিফোনে দূরদর্শনের ডি জি-র পি এ-কে ধরে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইল। কলকাতা থেকে এসেছি শুনে হয়তো ভদ্রলোক নরম হলেন। আমাদের বলা হল সাড়ে তিনটের সময় দেখা হতে পারে। তিনটে নাগাদ মান্ডি হাউসে পৌঁছে দেখলাম ইতিমধ্যে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের তালিকায় আমাদের নাম উঠে গেছে। ভেতরে ঢুকে একজন ভদ্রমানুষের কথা মনে পড়ল। কলকাতা দূরদর্শনের সহৃদয় এবং পণ্ডিত মানুষ নির্মল সিকদার মশাই তো এখন মান্ডি হাউসেই আছেন। আমাদের সঙ্গে তাঁর বেশ সুসম্পর্ক। নির্মলবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম। আমাদের পরিকল্পনা শুনে তিনি খুব উৎসাহিত। বাঙালি যদি এমন সাহসী উদ্যোগ নেয় তাহলে তিনি তার সঙ্গে আছেন। ডি জি-র সঙ্গে দেখা নিশ্চয়ই করব আমরা কিন্তু এ ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত এক পাঞ্জাবি অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিলেন তিনি।

পাঞ্জাবি অফিসার আমাদের উৎসাহের আগুনে জল ঢেল দিলেন, 'আপনারা অপেক্ষা করুন। যখন আমরা স্ক্রিপ্ট জমা নেব তখন ওটা জমা দেবেন। স্ক্রিপ্ট পড়ে যদি ভালো লাগে তাহলে অনুমোদন পাবেন।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'এতে কতদিন লাগতে পারে?'

'জানি না। হয়তো দু-তিন বছর।' ভদ্রলোক হাসলেন, 'আপনারা কি ভেবেছেন শিশুর খেলনা? চাইলেই পাবেন?'

আমরা আর কথা বাড়াইনি। ঠিক সাড়ে তিনটের সময় ভারতীয় দূরদর্শনের এক নম্বর মানুষটি আমাদের ডেকে পাঠালেন। নমস্কার করে বসতে বলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কলকাতার খবর কী?'

অরিজিত বলল, 'ভালো।'

'আপনাকে আমি কোথায় যেন দেখেছি। আপনি কি বহুরূপীতে ছিলেন?' শিব শর্মা প্রশ্ন করলেন, 'যদি আর একবার নাটকে, তাই না?'

আমরা অবাক। নির্মলবাবুর কাছে শুনে এসেছি শর্মা সাহেব কিছুদিন কলকাতায় ছিলেন। এখন জানলাম তিনি বাংলা নাটকের ভক্ত। অনেকের সঙ্গে ভালো আলাপ আছে। দেখা করার উদ্দেশ্য কী জানতে চাইলে অরিজিত বিস্তারিত বলল। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থেকে বললেন, 'এর সঙ্গে আর একটা পয়েন্ট যোগ করতে পারেন! যদি সুযোগ থাকে!'

বললাম, 'বলুন।'

'আমাদের দেশের অনেক ভালো ছেলে প্রতি বছর ওদেশে গিয়ে আর ফিরে আসছে না। এর ফলে দেশ তাদের সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই ব্রেনড্রেনের ব্যাপারটা একটা বড় সমস্যা। যাঁরা ওখানে থেকে গিয়েছেন তাঁরা কাজের সুবিধে হয়তো পেয়েছেন কিন্তু মর্যাদা কতখানি পেয়েছেন সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে।' শিব শর্মা বললেন।

অরিজিত বলল, 'আপনি খুব ভালো পয়েন্ট বলেছেন। আমরা চেষ্টা করব যাতে এরকম ঘটনা চিত্রনাট্যে রাখতে পারি।'

শিব শর্মা স্টেনোকে ডেকে পাঠালেন। তিনি ডিটকেশন দিলেন। আমাদের কাগজপত্র, কাহিনি সারাংশ নিয়ে ফাইল তৈরি হল। টাইপ হয়ে চিঠি এলে শিব শর্মা তাতে সই করলেন। তর্জমা করলে দাঁড়ায়, 'আপনাদের আমেরিকায় ভারতীয়দের নিয়ে একটি কাহিনিকে অবলম্বন করে শুটিং করার পরিকল্পনা আমার কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছে। আপনারা যদি ছটি এপিসোডে বিষয়টি শেষ করতে পারেন এবং আমাদের স্ক্রিনিং কমিটির কাছে তা গ্রণনীয় হয় তাহলে দূরদর্শনে দেখাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। আপনাদের উদ্যোগ সার্থক হোক। শুভেচ্ছা সহ—।'

অনেক ধন্যবাদ দিয়ে চিঠির কপি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই সেই পাঞ্জাবি অফিসারের সঙ্গে দেখা। তিনি ডি জি-র সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। আমাদের দেখতে পেয়ে বললেন, 'শোনো, তোমরা পরে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো।'

অরিজিত বলল, 'আমরা এই মাত্র ডি জি-র সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি চিঠি দিয়েছেন।'

ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে পড়লেন। দেখলাম ওঁর মুখ বেশ গম্ভীর হয়ে উঠল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে চিঠি ফেরত দিয়ে বললেন, 'তাহলে তো হয়েই গেল।'

বাইরে বেরিয়ে পুরো ব্যাপারটাকেই স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল। ভারতীয় আমলাতন্ত্র এখন যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে মান্ডি হাউসের মতো জায়গায় গিয়ে এমন চিঠি পাব কল্পনাও করতে পারিনি। আমরা মরিয়া হয়েই গিয়েছিলাম, ফলের কোনও আশা না করেই। সরকারি অফিসে একটা ছোট্ট কাজ করাতে যেখানে দিনের-পর-দিন ঘুরতে হয় সেখানে এটি অবিশ্বাস্য।

পরের দিন মার্টিনের সঙ্গে দেখা করে চিঠিটার কপি দিলাম। দিল্লিতে বাস করে লোকটার বোধ হয় এদেশীয় সরকারি কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল তাই চিঠি দেখে খুব অবাক হল। এবার সে স্পষ্ট জানাল আমাদের ছবির গল্প তার পছন্দ হচ্ছে না। এতে আমেরিকার মহিমান্বিত কোনও ব্যাপারই নেই। ক্রস কী করে যে এই প্রজেক্টকে সমর্থন করছে তা সে বুঝতে পারছে না।

আমরা হতাশ হলাম কিন্তু হাল ছাড়লাম না। সব শুনে ক্রস খুব ব্যথিত হলেন। তিনিই আমাদের উপদেশ দিলেন, আমেরিকায় ভিডিও শুটিং করতে সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় ইনসুওরেন্সের। কোন রাস্তায় শুটিং করব ঠিক করলে তার ওপর আগে থেকে ধার্য করা ইনসুওরেন্স পেমেন্ট করে দিলে সরকারের কোনও আপত্তি নেই। আবার শহর অনুযায়ী আইন পালটে যায় সেখানে। কোথাও কোনও ইনসুওরেন্স দেওয়ার নিয়মই নেই। কিন্তু তুমি যানবাহন চলাচল বন্ধ করতে পারবে না, পথচারীকে বিরক্ত করা চলবে না ইত্যাদি। ম্যানহাটনের মতো ব্যস্ত অঞ্চলে গাড়ি পার্ক করে শুটিং করার কথা কল্পনা করা যায় না। আর এইসব ইনসুওরেন্স পেমেন্ট অল্প টাকায় হয় না। ক্রস বললেন, 'আপনারা তো ওদেশে যাচ্ছেনই তাহলে ওয়াশিংটন যাবেন। আমি আপনাদের ঘটনা বলেছি ওখানকার এক অফিসারকে। তাঁর নাম সিনক্লেয়ার। ওঁর সঙ্গে দেখা করবেন। হয়তো একটা কিছু সুরাহা হবে। সিনক্লেয়ার পারে আপনাদের সেই অনুমতি জোগাড় করে দিতে যাতে আপনারা দেশের নিয়ম মেনে শুটিং করতে পারেন।'

এই আশাটুকু যথেষ্ট ছিল। খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো। এই ব্যাপারটা আমরা প্রচার করতে চাইনি। আমরা জানতাম না শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা সফল হবে কি না। মনোজের গল্পের দুটি চরিত্র নিয়ে একটা চিত্রনাট্যের খসড়া আমার ততদিনে হয়ে গিয়েছে। এবার ওদেশে গিয়ে খোলা মনে সব দেখে ফিরে এসে ওটাকে সম্পূর্ণ করব। আমেরিকা বিশাল দেশ। দেশটাকে ঘুরতে ওখান থেকে যে টিকিট লাগে তা হয়তো ডলারে বেশি নয় কিন্তু আমাদের এফ টি এসে কুলোবে না। আমরা কলকাতা থেকেই গ্রে-হাউন্ড বাসের টিকিট কিনে নিলাম। এক মাসের মধ্যে আমেরিকার যে-কোনও শহরে ওই টিকিট দেখিয়ে ঘুরতে পারব। শুনলাম গ্রে-হাউন্ড বাস নাকি খুব আরামদায়ক এবং কয়েক ঘণ্টা পরপর যাতায়াত করে।

আমাদের তিনজনের চরিত্র তিনরকম। এয়ারফোর্সে ছিল বলেই সম্ভবত অরিজিত খুব সিস্টেমেটিক। সব কিছু ভেবেচিন্তে করে। সুব্রত বাহুল্য পছন্দ করে না, গম্ভীর প্রকৃতির। আইনজ্ঞ বলেই বোধ হয় স্থির থাকতে ভালোবাসে। বহিরঙ্গে এঁদের সঙ্গে আমার কোনও মিল নেই কিন্তু আমরা পরস্পরকে পছন্দ করতাম।

আকাশে ওড়ার অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যে অনেক হয়েছে। অবশ্যই ট্যুরিস্ট ক্লাসে। সেখানে পাশাপাশি অনেক যাত্রী বসে থাকে বটে কিন্তু বিমান-বালিকাদের সাহায্য চাইলেই পাওয়া যায়। জ্যাট এয়ারলাইন্সের ক্লাব ক্লাসে উঠে অন্য অভিজ্ঞতা হল। সুবেশ পুরুষ কর্মচারী এগিয়ে এসে অভিবাদন জানিয়ে কোট খুলে নিয়ে যত্ন করে হ্যাঙারে ঝুলিয়ে দিয়ে আসন দেখিয়ে দিল। মোটা গদি, অনেকখানি পা ছড়াবার জায়গা। কিন্তু প্লেন যখন আকাশে উড়ল তখন ক্লাব ক্লাসের আশি ভাগ আসনই ফাঁকা।

এর পরেই এক সুন্দরী ট্রে হাতে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন। কয়েকটি ভেজা গরম তোয়ালে থেকে ধোঁয়া উঠছে। একটি তুলে নিয়ে মুখ মুছলাম। আহ্, কী সৌরভ, চমৎকার আরাম।

মুখ মোছার পর বেশ তৃপ্ত হলাম। সুবাস সমেত গরম তোয়ালেতে মুখ মোছার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। অরিজিত বলল, 'ব্যবস্থাটা বাড়িতে চালু করলে কেমন হয়?'

সুব্রত মন্তব্য করল, 'মারবে। এমনিতেই সব ব্যাপারে বডি ফেলে দাও তার ওপর যদি গরম তোয়ালে দিয়ে সেবা করতে হয়—!'

বিমান-বালিকা এবার এগিয়ে এলেন শ্যাম্পেন নিয়ে, 'আপনারা আমাদের বিমান ব্যবহার করছেন বলে শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে একটু শ্যাম্পেন গ্রহণ করুন।'

এরপর ঠিক স্বপ্নের মতো ব্যাপারস্যাপারো ঘটতে লাগল। এত আদরযত্ন এবং রকমারি খাবার কেউ কখনও আমাকে দেয়নি। ইতিমধ্যে অন্য বিমান কোম্পানিগুলোর সৌজন্য দেখেছি। শুধু শ্রেণি পালটানোর জন্যে এমন আকাশপাতাল পার্থক্য হয়? দুটো শ্রেণির পার্থক্য কিন্তু তিন হাজার টাকার বেশি নয়। শুধু উৎকৃষ্ট পানভোজন নয়, নানানরকমের উপহার পাওয়া গেল। একবার ট্যুরিস্ট ক্লাসটা ঘুরে এলাম। বেশ কিছু আসন ফাঁকা। এমনিতে শুনি আন্তর্জাতিক প্লেনে চট করে টিকিট পাওয়া যায় না। এদের এই অবস্থা কেন? মনে হচ্ছিল জ্যাট এয়ার লাইনস কলকাতা হয়ে বেশিদিন প্লেন চালাতে পারবে না।

বেলগ্রেডে পৌঁছোলাম বিকেল-বিকেল। আগে থেকেই কথা ছিল আমরা এখানে এক রাত্রি থাকব এবং সেটা জ্যাটের ব্যবস্থাপনায়। এর জন্যে ভিসাও করতে হয়েছিল। আইনকানুন মেনে বাইরে বেরুতে-বেরুতে সন্ধে পার। এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এর বাইরেই হোটেলের বাসে উঠে পড়লাম।

যুগোস্লাভিয়া সম্পর্কে ভারতবাসীর ধারণা তৈরি হতে আরম্ভ করেছিল মার্শাল টিটোর আমল থেকে। ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের নেহরুজির সম্পর্কে ভালো ছিল। দুজনেই শান্তির জন্য চেষ্টা করেছেন। মার্শাল অবশ্যই সামরিক মানুষ কিন্তু কমিউনিস্ট। এটুকু জানতাম কমিউনিস্ট হলেও তিনি তাঁর দেশে ইউরোপের অন্য দেশগুলোর মতো বাইরের জানলা দরজা বন্ধ রাখেননি। স্বাধীনতার সামান্য হাওয়া সেখানে বইতে দিয়েছেন।

এয়ারপোর্ট থেকে শহরের উচ্চ শ্রেণির একটি হোটেলে যাওয়ার পথে বাসের জানলা দিয়ে দেখে একটা দেশকে যে বুঝতে চায় সে উন্মাদ। তার ওপর প্রচণ্ড ঠান্ডা তখন বেলগ্রেডে। প্লেন নামার সময় শুনেছি জিরো ডিগ্রির কাছাকাছি। কলকাতা ছাড়ার আগের দিন খেয়াল হয়েছিল আমার ওভারকোট নেই। সেটা শুনে দেশ পত্রিকার অফিসে বসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'খুব বিপদে পড়বে। তুমি আমারটা নিয়ে যাও।'

বাসে ওঠার আগেই সেটা চাপিয়ে নিয়েছি তিন রকম পোশাকের ওপরে। মনে হচ্ছিল ঠান্ডাটা থেকেই যাচ্ছে। সুব্রত কাচের জানলায় চোখ রেখে চেষ্টা করছিল বেলগ্রেড দেখতে। কিছুক্ষণ বাদে হাল ছেড়ে বলল, 'মাঝে-মাঝে আলো ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। রাস্তায় একটাও মানুষ নেই।'

হোটেলের সামনে গাড়ি থামল। নীচে নামতেই কাঁপুনিটা টের পেলাম। মানুষজন চোখে পড়ছে না। মালপত্র নেওয়ার জন্যে হেটেলের পোর্টার ছুটে এল। এই কারণে ডলার খচর করব না ঠিক করায় তাদের নিরস্ত্র করতে চাইছিলাম। দু-তিনটে খুচরো ইংরেজি শব্দ এরা জানে কিন্তু আপত্তি শুনল না। চেক-ইন করে ছ'তলার ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কত দিনে হবে?'

লোকটা হাসল, ইশারায় আমার হাতের উইলস সিগারেটের প্যাকেট দেখিয়ে দিল। আমি একটা নতুন সিগারেটের প্যাকেট ওকে দিতে দুবার ঝুঁকে সেলাম জানিয়ে চলে গেল। আমি বেশ অবাক। ভারতীয় মুদ্রায় প্যাকেকটি ছ'টাকায় পাওয়া যেত তখন। লোকটা এতেই অত খুশি হল। আমাদের কলকাতার বড় হোটেলের পোর্টারকে যদি এক প্যাকেট উইলস পারিশ্রমিক দিতাম সে কী করত? শুনেছি কুড়ি পঁচিশ টাকার নীচে তাদের মুখে হাসি ফোটে না। ভারতীয় সিগারেটের

এত চাহিদা এখানে?

কারণটা জেনেছিলাম পরের দিন সকালে। ব্রেকফাস্ট সারবার পর ঘণ্টা দুয়েক সময় পাওয়া গিয়েছিল। ঠান্ডা থাকলেও দিনের বেলা বলেই রাস্তায় লোকজন ছিল। অফিস ছুটির পর শেয়ালদা স্টেশনের মানুষদের সঙ্গে খুব পার্থক্য নেই। রাস্তায় টিকি লাগানো বাস চলেছে। ট্রাম কাম বাস। অরিজিত নামকরণ করল ট্রাস। একটা যুগোশ্লাভ সিগারেট কিনে টান দিতেই বুঝলাম খাওয়া আমার কম্মো নয়। আমরা যে রাস্তাটা দিয়ে হেঁটেছি তা শহরের মাঝখানে। কিন্তু দোকানপাট মানুষজন জিনিসপত্রের মধ্যে শ্রীহীনতার ছাপ স্পষ্ট। স্পষ্ট বোঝা যায় মানুষজনেরা মোটেই আরামে নেই। যে হোটেলে আমরা আছি সেখানেও লোক বেশি নেই। যাঁরা আছেন তাঁরা বিমানের যাত্রী। শুধু বেড়াবার জন্যে বেশি মানুষ যুগোশ্লাভিয়ায় আজকাল আসে না। এক প্যাকেট ভালো সিগারেট, তা সেটা ভারতে তৈরি হলেও ওদের কাছে মহার্ঘ বস্তু।

পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলোর যে আর্থিক দুরবস্থা যুগোশ্লাভিয়া তার একটু ওপরে। আমরা আমেরিকায় থাকতে-থাকতে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। একটার পর একটা দেশে কমিউনিস্ট সরকারের পতন হচ্ছিল কিন্তু যুগোশ্লাভিয়া শান্ত ছিল। হয়তো তখনও তারা কিছু স্বাধীনতা পাচ্ছিল বলে। আমার মনে হয়েছিল বেশিদিন সামান্য পাইয়ে সঠিক পাওয়া থেকে ওদের বঞ্চিত রাখা যাবে না। ইদানীং কাগজ খুলে দেখছি এতদিন বাদে সেখানেও আন্দোলন শুরু হয়েছে। পোলান্ডের অবস্থা ছিল সবচেয়ে খারাপ। দুজন পোলিশ যুবক-যুবতীর সঙ্গে আলাপ হয়। দুজনেই শিক্ষকতা করেন। মহিলা বয়সে একটু বড়।

ওয়ারশতে একটা এক ঘরের ফ্ল্যাট শহরতলিতেও ভারতীয় মুদ্রায় আড়াই হাজার টাকার নীচে পাওয়া যায় না। ভদ্রলোকের বেতন দু-হাজার টাকা। ওঁর পক্ষে ফ্ল্যাট ভাড়া করা সম্ভব নয়। ভদ্রমহিলা পান আঠারোশো টাকা। দুজনে এক সঙ্গে থাকার জন্যে ফ্ল্যাট নিয়েছেন। এবার দুজনের হাতে রইল তেরোশো টাকা। এতে যাতায়াত খাওয়াদাওয়া পোশাক হয় না। ফলে সকালে এক কাপ করে কফি খেয়ে দুজনেই কলেজে চলে যান। সেখানকার ক্যান্টিনে অপেক্ষাকৃত কম দামে খাবার মেলে। দু-বেলার খাবার সেখানেই খেয়ে ওঁরা বাড়ি ফেরেন। এই ছবিটা আমাদের দেশে যাঁরা কলেজে পড়ান তাঁদের সঙ্গে মেলে না। ওঁরা ভালো জামাকাপড় কিনতে পারেন না মহার্ঘ বলে। দিশি জিনিসের মান খুব খারাপ। শহরের গায়ে ক্যানটনমেন্টে রুশ সৈন্য ছিল। প্রথম দিকে তারা যা খুশি করত। এখন তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু পোল্যান্ডের মানুষ আশেপাশের দেশের স্বাধীনতা এবং আরাম যাতে দেখতে না পায়, বিদেশি ছবি আমদানি করা হয় না, টিভি নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে। তবু খবর যাচ্ছে। পূর্ব জার্মানির মানুষ পশ্চিম জার্মানির খবর পাচ্ছে; যুগোশ্লাভিয়ায় যেটুকু সুবিধে তাও ওদের জন্যে জুটছে না। দীর্ঘকাল পূর্ব ইউরোপের মানুষ স্বপ্ন দেখেছিল কমিউনিজম ওঁদের উন্নতমানের সমাজব্যবস্থায় নিয়ে যাবে—যেখানে অভাব নেই। এই কারণে তারা সবসময় শাসন মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতা হাতে পেয়ে তথাকথিত নেতারা ধীরে-ধীরে স্বৈরাচারী হয়ে উঠলেন। কমিউনিজমের দোহাই দিয়ে দেশের মানুষকে নিপীড়ন করে অনন্তকাল কাটানো যায় না। কেউ-কেউ বলেছেন পূর্ব ইউরোপে যখন আন্দোলনের আগুন জ্বলছে তখন রাশিয়া নির্লিপ্ত ছিল। তারা সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। অথচ রাশিয়ার ওপর নির্ভর করে কমিউনিস্ট দলগুলো চাবুক চালাত ওখানে। কিন্তু চুপচাপ সরে যাওয়া ছাড়া রাশিয়ার আর অন্য কোনও উপায় ছিল না। এই দেশগুলোকে সাহায্য করতে গিয়ে যে পরিমাণ অর্থ খরচ হত তা টানতে পারছিল না তারা। বরং ঘাড় থেকে বোঝা নামিয়ে দিতে পেরে বেঁচে গেল। রাশিয়ার ভেতরেই কোনও-কোনও রাজ্য স্বাধীনতার কথা বলতে চাইছিল। ঘর বাঁচানো ওদের কর্তব্য হয়ে পড়ায় পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট শোষকরা মুখ থুবড়ে পড়ল।

বেলগ্রেডের টিভিতে দেখেছি প্রচুর আমেরিকান সিনেমা দেখানো হয়। জেমসবন্ডের ছবি

আমি নিজে দেখেছি। তবে বন্ড সেই ছবিতে ইংরেজির বদলে যুগোশ্লাভ ভাষায় কথা বলেন। সিন কোনারির মুখে ডাব করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। লিপ না মিললেও দর্শকরা কিছু মনে করছে না। এটা এক ধরনের ঘুষ দেওয়া। সাধারণ মানুষকে মার্কিন প্রমোদ বিতরণ করে সন্তুষ্ট রাখা। যেহেতু ছবিটা ইংরেজির বদলে স্বদেশি ভাষায় দেখানো হচ্ছে তাতে জাত গেল না অথচ সাধারণ মানুষকে খুশি করা হল, এমন ভাব।

বেলগ্রেডের রাস্তায় যেসব গাড়ি দেখছি সেগুলোর অধিকাংশের অবস্থাই খুব ভালো ছিল না। মডেলগুলো বেশ পুরোনো। তবে এ কথা ঠিক আমাদের কাছে কেউ ভিক্ষে চায়নি। চাইলে অবশ্য বেশ লজ্জায় পড়তাম। পকেটে ওদেশীয় টাকাকড়ি ছিল না। ডলার বা ট্র্যাভেলার্স চেক কেনার সময় খুব গায়ে লাগত। মনে হত ইংরেজ বা আমেরিকানরা আমাদের থেকে কুড়ি ত্রিশ গুণ বড়লোক। যুগোশ্লাভিয়ানদের সঙ্গে আমাদের একটাই পার্থক্য। আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে যা ইচ্ছে করতে পারি, প্রধানমন্ত্রী থেকে পঞ্চায়েত প্রধানকে গালাগাল দিতে পারি, ওরা পারে না। ব্যস, এইটুকু।

বেলগ্রেড থেকে সরাসরি নিউ ইয়র্কে না গিয়ে আমরা লন্ডনে ক'দিনের জন্যে থেমেছিলাম। বছর চারেক আগেও সাহেবদের ওই শহরে ঢুকতে আমাদের ভিসা লাগত না। মনোজের আমন্ত্রণে প্রথমবার বিদেশ সফরের পর আমার ভাগ্যে আরও দুবার নেমন্তন্ন জুটেছিল। সেই সময় লন্ডনে এসেছিলাম। শহরটা এখন বেশ পরিচিত। এবার অন্য একটা ঘটনা ঘটল। বেলগ্রেড এয়ারপোর্টে সবরকম চেকিং হয়ে যাওয়ার পর বোর্ডিং কার্ড নিয়ে যখন আমরা প্লেনের দরজায় তখন একজন কাস্টমস অফিসার এসে জিগ্যেস করলেন আমরা কোথায় যাচ্ছি? উত্তর পাওয়ার পর পাশপোর্ট দেখতে চাইলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেননি। সচরাচর এমন ঘটনা ঘটে না। প্লেনে উঠে ভুলেও গিয়েছিলাম। লন্ডনে নেমে মালপত্র উদ্ধার করে যখন গ্রিন চ্যানেল দিয়ে বেরুচ্ছি তখন দুপাশে সার দিয়ে দাঁড়ানো ইংরেজ কাস্টমস অফিসারদের একজন আমায় ডাকলেন 'এক্সকিউজ মি জেন্টলম্যান।'

আমি দাঁড়ালাম, ভদ্রলোক আমাকে ইশারা করলেন সুটকেস দুটো পাশের কাউন্টারের ওপর নিয়ে যেতে। এরকম অভিজ্ঞতা আমার কখনই হয়নি। অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি কিছু ডিক্লেয়ার করচে চান?'

'একমাত্র নিজেকে ছাড়া আমার কিছু ডিক্লেয়ার করার নেই।'

উত্তরটা শুনে সাহেবের মুখ লাল হল। তিনি সুটকেস খুলতে বললেন। সুটকেস জিনিসটাকে আমি কোনওদিনই কবজা করতে পারলোম না। ভরার সময় ডালা বন্ধ করতে কষ্ট হয়। খুললে ভেতরের জিনিস এমন ফুলে ওঠে আবার ডালা বন্ধ করা দায় হয়ে ওঠে। অনেকেই সুটকেসের ভেতর নির্দিষ্ট জিনিসটা একবারে খুঁজে পান। আমি পাই না। সেটা আরও বিশ্রী ব্যাপার। অফিসার আমার জামা প্যান্ট, বই, কিছু উপহার, সোয়েটার ইত্যাদি স্যুটকেস থেকে বের করে কাউন্টারের ওপর পাহাড় করে ফেললেন। আবিষ্কারের আনন্দ তখন ওঁর চোখে মুখে। খালি সুটকেসের নীচে খবরের কাগজের তলায় কয়েকটা ন্যাপথলিন ছিল। সেগুলোকে সতর্ক হাতে এক জায়গায় রেখে পাশের এক্সরে মেশিনের সামনে সুটকেসটাকে ধরলেন। হঠাৎ আমার কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। এই সুটকেস আমার ছোট ভাই এনে দিয়েছিল জলপাইগুড়ি থেকে। মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট থেকে কেনা। তখন কোনও বেআইনি জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়েছিল নাকি? বেলগ্রেডের অফিসার সেটা জানতে পেরেই আমাদের জেরা করেছিল শেষ সময়ে? বোঝা যাচ্ছে সেই লোকটাই এদের খবর দিয়েছে। কেমন শীত-শীত করতে লাগল। এক্সরে মেশিন কোনও তথ্য না দেওয়ায় লোকটা আবার ফিরে এল সুটকেস নিয়ে। তারপর একটা হাতুড়ি দিয়ে পিটিতে লাগল সুটকেসের তলাটা। আমি প্রতিবাদ করলাম। সুটকেস ভেঙে গেলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। লোকটা বলল, 'দেওয়াচ্ছি। কুড়ি বছর লন্ডনের জেলে বসে সেটা পাবে।' লোকটা আবার নিয়ে গেল সুটকেসটাকে এক্সরে মেশিনের

সামনে। এবার অরিজিত জিজ্ঞাসা করল, 'কী সমরেশ, তুমি কিছু নিয়ে এসেছ নাকি?' অসহায় হয়ে ওর দিকে তাকালাম। লোকটা কাজকর্ম দেখে আমারই যখন মনে হচ্ছে কিছু নিয়ে এলেও আসতে পারি তখন ওর তো মনে হতেই পারে। দ্বিতীয়বার এক্সরে মেশিন থেকে ফিরে এল লোকটা। এখন ওঁকে খুব হিংস্র দেখাচ্ছে। ন্যাপথলিনগুলো দেখিয়ে খিঁচিয়ে উঠল, 'এগুলো কী?'

এই সময় আর একজন অফিসার এগিয়ে এলেন,'জন, এরা তারা নয়।'

আমাদের অফিসারটি মাথা ঝাঁকালেন। তারপর সুটকেসটা এগিয়ে দিয়ে চলে যাওয়ার আগে বললেন, 'যাও, কেটে পড়ো।'

ওই সুটকেসে জামাকাপড় নতুন করে কীভাবে ভরেছিলাম আমিই জানি। তখন মনে হয়েছিল আমাদর পুরোনো ব্যবস্থা সত্যি ভালো ছিল। দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলতে পারলে ল্যাটা চুকে যেত। এবার ডালা বন্ধ হতেই চায় না। ঘেমে নেয়ে যখন হিথরো এয়ারপোর্টের বাইরে এলাম তখন সুব্রত আপ্লুত গলায় বলল, 'সেকসপিয়রের দেশে এলাম।'

রেগেমেগে বললাম, 'তিনি অনেক অনেকদিন আগে গত হয়েছেন।'

হ্যাঁ, এখনও, জিনিসপত্রের দাম বাড়ার পরেও, আমরা লন্ডনে গেলে স্বস্তি পাই। রাস্তাঘাট জায়গাগুলোর নাম অবশ্য পড়ে আসছি। কবি সাহিত্যিকদের কথা জানি। রাস্তায় প্রচুর লোক প্রায় গড়িয়াহাটের মতো আড্ডা মারে। লন্ডন আরেক ঘরোয়া শহর কিন্তু ক্রমশ ভারতীয়দের সম্পর্কে ওরা আক্রমণাত্মক হচ্ছে। রাত ন'টার পর টিউবে কোনও ভারতীয় একা যেতে সাহস পান না।

ইংল্যান্ড বুদ্ধিমানদের দেশ ছিল। তার আগে সৎ সাহিত্যের দেশ। রুচিবাদী শব্দটা বোধ হয় ইংরেজদের সম্পর্কেই সবচেয়ে ভালো প্রয়োগ করা যায়। এই দেশ এককালে পৃথিবীর অনেকটাই দখল করে রেখেছিল। চার্চিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই সেদিন মেজর উপসাগরীয় যুদ্ধে নাক গলিয়েছেন। অর্থাৎ দিন চলে গেলেও ছোট্ট দেশটার ক্ষমতার কিছুটা রয়ে গেছে। ভাবতে অবাক লাগে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি কারেন্সি ইংল্যান্ডের। একটা জাত নষ্ট হয়ে গেলে এটা সম্ভভ নয়। আমি কলকাতায় যে সিগারেট পঁচিশ টাকায় কিনেছি তা লন্ডনে দু-পাউন্ডের নীচে পাওয়া যায় না। দু-পাউন্ডের মূল্য যাট টাকার বেশি। এই হিসেব তাই সবসময় ঠিকঠাক চলে না। ইংল্যান্ডে এশিয়ানদের সংখ্যা প্রচণ্ড বেড়ে গেছে। লন্ডনের একটা পাড়ায় তো শুধুই প্যাটেল। মিউনিসিপাল ইলেকশনে ভারতীয়রা জিতছে। লন্ডনের রাস্তায় প্রতি দশজন পথচারীর মধ্যে চারজন এশিয়ান। সম্ভবত এই কারণেই ইংরেজরা আমাদের পছন্দ করে না। একজন বৃদ্ধ আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'কেন আমি ইন্ডিয়া থেকে চলে এলাম। অত সুন্দর বাংলো, চাকরবাকর, সস্তায় খাবার ছেড়ে দেশে ফিরলাম কি চারপাশে ভারতীয়দের দেখব বলে? সেটা তো সেখানেই দেখতাম।' পঞ্চাশ বছর বাদে যদি ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রীর উপাধি প্যাটেল হয় তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। দিলীপ দোশীর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলছিলাম। কলকাতার ছেলে দিলীপ একটু বেশি বয়সেই টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছিল। বেদি প্রসন্ন চন্দ্রশেখর তার সুযোগ আড়াল করে রেখেছিলেন দীর্ঘকাল। এই ছিমছাম গুজরাতি যুবকটি অনেক বাঙালির চেয়ে বেশি বাঙালি। ইংল্যান্ডে প্রতি মরসুমে খেলতে খেলতে ব্যাবসা ফেঁদে বসেন। এখন নিজের বাড়ি, চমৎকার অফিস, মার্সিডিজ চালান। বললেন, 'সমরেশদা, আমার তো মনে হয় আমি কলকাতাতেই আছি। শুধু কতগুলো জিনিস মিস করি। পুরোনো বন্ধুবান্ধব, যাদের কাছে সময়ের কোনও মূল্য ছিল না, বিশৃঙ্খল মনোভাব, যা কলকাতার বিশেষ গুণ, খবরের কাগজে সরকারের অস্তিত্ব জানা। আমরা এখানে এসে শিখেছি সময়ের মূল্য কী, ডিসিপ্লিন কাকে বলে এবং সরকারি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কেমন হওয়া উচিত। এখন দেশে গেলে তাই অসুবিধে হয়।'

দিলীপের সন্তানরা অবশ্য এসব নিয়ে ভাবে না। ইংল্যান্ডই তাদের দেশ।

মনোজের এই দ্বীপ এই নির্বাসনের মূল বক্তব্যও তাই। আমেরিকা ইংল্যান্ড এ ব্যাপারে একাকার হয়ে যায়।

তিনদিন বাদে এক বিকেলে আমরা কেনেডি এয়ারপোর্টে নামলাম। লাইন দিয়ে পাশপোর্টে

ইমিগ্রেশনের ছাপ মেরে বাইরে বেরিয়ে এলাম অনায়াসে। আমাদের নিয়ে ওদেশীয় কাস্টমস আদৌ চিন্তিত নয়। অরিজিত-এর বন্ধু সিদ্ধার্থ দাঁড়িয়েছিল। একটু খুঁতখুঁতে অথচ মেজাজি মানুষ। দুটো চরিত্র এক মানুষের কী করে হল জানি না। ভলভো গাড়িতে চড়িয়ে হাইওয়ে দিয়ে যেতে-যেতে অজয় চক্রবর্তীর ক্যাসেট চালিয়ে দিল সিদ্ধার্থ। আটটি লেনে নানান সাইজের গাড়ি ছুটছে। মাথার ওপর দিয়ে রোড ইনডিকেটর বেরিয়ে যাচ্ছে সাঁসাঁ করে। সিদ্ধার্থ পাইপ মুখে দিয়ে তাকালেন, 'তাহলে আপনারা আমাদের নিয়ে ছবি করতে চলেছেন? দারুণ ব্যাপার।'

॥ ৩ ॥

আপনারা কি ভাবেন আমরা খুব কষ্টে আছি? দেশ-দেশ করে হেদিয়ে মরছি? বাজে কথা। আমরা চমৎকার আছি। দেশে যা রোজগার করতে পারতাম তার থেকে অনেক অনেক গুণ রোজগার করি এখানে, যা স্বাচ্ছন্দ্য পাই তা দেশে কল্পনাও করতে পারি না। একটাই তো জীবন মশাই, এখানে এসে চুটিয়ে সেটা উপভোগ করছি।' শুভদীপের গলা সবাইকে ছাপিয়ে গেল।

সিদ্ধার্থর বাড়িতে আমরা সবাই বসেছিলাম। আমাদের পরিকল্পনাকে উপলক্ষ করে সিদ্ধার্থ এবং তার স্ত্রী বনানী গোটা আটেক দম্পতিকে নেমন্তন্ন করেছিল। শুভদীপ আমাদের ছবির বিষয়বস্তু উড়িয়ে দিল, 'আর কে কী ভাবছে জানি না, আমি মশাই ভালো আছি।'

'আপনারা খারাপ আছেন এ কথা আমরা কিন্তু বলছি না।' মৃদু হেসে জানালাম।

'মুখে বলছেন না, কিন্তু ভাবলে আপনাদের ভালো লাগছে। কেউ সুখে থাকলে বাঙালি ঈর্ষায় জ্বলে যায়।' শুভদীপ রীতিমতো উত্তেজিত

'সুখ শব্দটা ব্যবহার করলে কেন? সুখ আর ভালো থাকা এক নয়।' স্পষ্ট অথচ মৃদুগলায় বললেন শুভদীপের স্ত্রী জয়িতা।'

'আমি তো কোনও ডিফারেন্স পাই না' কাঁধ ঝাকাল শুভদীপ।

অরিজিত জিজ্ঞাসা করল, 'তা হলে আপনি কখনও দেশে ফিরে যাবেন না?'

'না। নেভার দু বছর পর একবার যাই, মা আছেন বলে। ভদ্রমহিলাকে এখানে নিয়ে আসার প্রচুর চেষ্টা করেছি, তিনি আসবেন না। অতএব আমাকে যেতে হয়।'

'দেশ সম্পর্কে কোনও অনুভূতি আপনার নেই?'

'সত্যি বলতে বললে বলব, নেই। আপনার আছে? আপনি নিজেকে ভারতীয় ভাবেন? দেশ কোথায় জিজ্ঞাসা করলে এখনও অনেক বঙ্গসন্তান বলেন ঢাকা, বরিশাল। জাত জানতে চাইলে উত্তর দেবেন বাঙালি কখনও ভারতীয় বলবেন না। ভুল বলছি?'

সুব্রত চুপচাপ শুনছিল এবার জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা শুভদীপবাবু, ধরুন নিউইয়র্কে ভারত বনাম আমেরিকার একটা ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছে—

'সরি, এরা ক্রিকেট খেলে না।'

'বেশ, ধরুন ফুটবল খেলা হচ্ছে, আপনি কাকে সাপোর্ট করবেন?'

শুভদীপ চুলে হাত বুলিয়ে হাসল, 'হয়তো ভারতকেই করব।'

সুব্রত মাথা নাড়ল, 'কলকাতায় ভারত-পাকিস্তান খেলা হলে খিদিরপুর আর রাজাবাজারের কিছু মুসলমান পাকিস্তানকে সমর্থন করে। তখন আমরা তাদের দেশদ্রোহী বলি। আপনি ভারতকে সমর্থন করলে আমেরিকানরা তো একই কথা বলতে পারে।'

এসব তর্ক কখনই শেষ হয় না। সেই সন্ধে এবং রাত্রে আমাদের আলোচনা একসময় চোরাবালিতে আটকে গেল। কিন্তু আমি বুঝে গেলাম, 'আন্তরিক' পত্রিকার সৌজন্যে মনোজের এই

দীপ প্রায় সব মহিলারই পড়া। প্রত্যেকেই জানতে চাইছেন কোন চরিত্রে কে অভিনয় করছেন। ক্রমশ একটা ব্যাপার আমার কাছে স্পষ্ট হল। শুভদীপ যতই চিৎকার করুন, পঞ্চাশ পেরিয়ে যাওয়ার পর অধিকাংশ পুরুষ দেশে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবেন। রক্তের তাপ কমে এলে এ-দেশে নিজেকে আউটসাইডার বলে ভাবনা শুরু হয়ে যায় তাঁর। সমীরণবাবু একজন সফল ইঞ্জিনিয়ার। বললেন, 'সব ঠিক আছে। এখানে যা পাচ্ছি তা দেশে পেতাম না। কিন্তু পাওয়াটা কীরকমের? কোম্পানিতে আমার মাথার ওপর যিনি আছেন তাঁর বিদ্যেবুদ্ধি আমার অর্ধেক। সাদা চামড়া বলে তিনি আমার বস। বাড়ি-গাড়ি যা করেছি তার জন্যে ধার দিয়েছে এরা। মাইনে থেকে সেই ধার শোধ করতে-করতে অনেক বছর কেটে গেল। একা থাকতে ভালো লাগে। কিন্তু সকালে এক কাপ কফি খেয়ে গাড়ি নিয়ে ছুটি রেল স্টেশনে। সেখান থেকে ট্রেনে ম্যানহাটন। সারাদিন অফিস করে বাড়ি ফিরে দেখি স্ত্রী অফিস থেকে ফেরেননি। ছেলে কলেজে। স্ত্রী বাড়ি ফিরলে রান্না গরম করে টিভির সামনে বসা হয়। তারপর ঘুম। আর এইরকম উইক এন্ডে বাঙালির সঙ্গ পাওয়ার জন্যে পঞ্চাশ-ষাট মাইল ড্রাইভ করে আড্ডা মারতে যাওয়া। এমন নিঃসঙ্গতা চাইনি কখনও। সোম থেকে বৃহস্পতিবার কাউকে ডাকলেও পাবেন না। এটা সত্যি কথা। আমি নাগরিক কিন্তু বুঝি দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। মূল স্ট্রিমে আমি কখনওই ঢুকতে পারব না। কোনও সাদা চামড়ার আমেরিকানকে আমাদের আড্ডায় দেখতে পাবেন না। তাঁদের সন্ধের আড্ডায় আমরা নেমন্তন্ন পাই না। এ-দেশে এসে আমরা নিজেদের মধ্যে কোনও একটা গোষ্ঠী তৈরি করে দিন কাটিয়ে যাচ্ছি। কেউ-কেউ তাতেই আরাম বোধ করি। যখন এসেছিলাম তখন বয়স কম ছিল। বিয়ের ব্যাপারটা সেরেছি দেশের মেয়ের সঙ্গে। একটু বাঙালি রান্না, বাংলা কথা বলা, বাংলা গান শোনার ইচ্ছে পূর্ণ হয়েছে তাতে। এখন আমাদের ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে দেশ সম্পর্কে তাদের কোনও নস্টালজিক ফিলিংস নেই। তারা কেন দেশের ছেলেমেয়েকে বিয়ে করবে? ফলে চাপ পড়ছে আমাদের ওপর। এই চাপ যারা মেনে নিয়ে মানিয়ে থাকছে তাদের কোনও সমস্যা এ-দেশে নেই।'

সমীরণবাবুর বক্তব্য আমার পছন্দ হল। মনোজও এধরনের কথা বলত। সে একটু বেশি বলত। বুধবার বিকেল সাতটায় ইচ্ছে করে কোনও টিপটপ বাঙালির বাড়িতে হাজির হত ফোন না করে। বুধবার অফিস থেকে ফিরেই সেই বঙ্গসন্তান বৃহস্পতিবারের জন্যে সাধারণত নিজেকে গুটিয়ে রাখতেন। মনোজ তাঁর বাড়িতে রাত দশটা পর্যন্ত আড্ডা মেরে সমস্ত রুটিন বানচাল করে দিয়ে ফিরত। এতে মজা পেত সে।

স্বাতী বাগচি কিন্তু অন্য কথা বললেন, 'না মশাই, আমি দেশে ফিরব না।'

'কেন?'

'কেন ফিরব বলুন? দেশ অনেক বড় কথা, আমি আমারটা ভাবি। বিয়ের আগে একান্নবর্তী পরিবারে ছিলাম, আমার নিজস্ব ঘর ছিল না। কাপড় ছাড়তে হলে বারোয়ারি ভেজা বাথরুমে ঢুকতে হত বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে দেখলাম আমার স্বামীর জন্যে একটাই ঘর বরাদ্দ। বন্ধুবান্ধব এলে সেখানেই ঢোকাতে হত। আলাদা ফ্ল্যাট নিয়ে চলে গেলে বউ-এর বদনাম হবে। কোথাও বেরুতে গেলে স্বামীর কাছে দশটা টাকার জন্যে হাত পাততে হত। কী হরিবল সময় ছিল সেটা।' স্বাতী বাগচি বলতে-বলতে যেন শিউরে উঠলেন।

'আপনি চাকরিবাকরির চেষ্টা করেননি কেন?'

'কে দেবে চাকরি আমাকে? কম চেষ্টা করেছি নাকি। ওকে না বলে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম পর্যন্ত লিখিয়েছিলাম। একটাও ফল পাইনি। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করেছি কত! কিস্যু হয়নি।' নিঃশ্বাসে কষ্ট ছিল স্বাতী বাগচির। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে নিশ্চয়ই আপনি চাকরি করেন?'

'নিশ্চয়ই। প্রথমে কিছুদিন একটা দোকানে সেলসে ছিলাম। মাসে সাতশো ডলার। চৌদ্দ হাজার টাকা। ভাবা যায়? তারপর একটার পর একটা চেঞ্জ করে এখন সরকারি অফিসের কেরানি।

মাস গেলে তিরিশ হাজার টাকা হাতে পাই।' স্বাতী হাসলেন, 'আসলে এখানে যে-কেউ যে-কোনও কাজ করতে পারে। দেশের মতো কেউ নাক সিঁটকোয় না, ওমা বাড়ির বউ দোকানে ওষুধ বিক্রি করবে কী!'

'তা হলে ভালো আছেন আপনি?'

'অবশ্যই। আর্থিক স্বাধীনতা কি জিনিস তা আমি বুঝেছি। এখন আর কারও কাছে আমাকে হাত পাততে হয় না। আমার স্বামীর যা-যা করার অধিকার আছে আমি তার একটা থেকেও বঞ্চিত নই। এখন দেশে গিয়ে থাকার কথা হলেই তাই ভয় হয়। দেশে কেউ আমাকে চাকরি দেবে না। স্বাধীনতা হারিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হবে। দেশে পাকাপাকি চলে যাওয়ার কথা আমি ভাবতেও পারি না।'

'শুধু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা—।'

'না। আরও আছে।' থামিয়ে দিলেন স্বাতী বাগচি, 'আমি মেয়ে। রান্না করতে ভালোবাসি। আমার কিচেনে গিয়ে দেখুন, শুধু আমার কেন, যে-কোনও সুস্থির পরিবারের রান্নাঘরে গিয়ে দেখুন কত কম পরিশ্রমে আমরা কী-কী সুবিধে ভোগ করি। যন্ত্র এখানে প্রায় শিল্প হয়ে উঠেছে।'

'যন্ত্রশিল্প?'

'না। যন্ত্রের সাহায্যে অল্প সময়ের যে-কোনও সেরা রান্না রাঁধতে পারি। লোডশেডিং নেই। ঘর পরিষ্কার করতে পাঁচ মিনিট। টেলিফোনের লাইন গোলমাল পাকায় না। দেশে গাড়ি চালাবার কথা ভাবতে পারতাম না। এখানে নিজের গাড়ি। আপনি বলতে পারেন এ-সব পেয়ে আমি একটু স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছি কি না। আমি বলব, না। আমি দু-বছরে একবার কলকাতায় যাই। দিন কুড়ি থাকি। এক ডলার কুড়ি টাকা হয়ে যায় বলে দেদার খরচ করি। প্রত্যেকের জন্যে গিফট নিয়ে যাই। মা-বাবা এবং আত্মীয়স্বজন আমাকে পেয়ে খুশি হয়। নখদন্তহীন হয়ে ওঁদের মধ্যে আর একজন হয়ে পড়ে থাকলে এই খুশিটা দিতে পারতাম না। আমার স্বামী নিয়মিত টাকা পাঠান। যদি আমরা বোম্বে কিংবা চণ্ডীগড়ে থাকতাম তা হলে যে দূরত্ব থাকত প্লেনের কল্যাণে তার বেশি কিছু হচ্ছে না। আমার দিদি থাকে সিমলায়। গত তিন বছরে কলকাতায় যায়নি। কই, তা নিয়ে তো কেউ কিছু বলছে না?'

সুব্রত চুপচাপ শুনছিল। জিজ্ঞাসা করল, 'দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে আপনার যোগাযোগ তো ছিন্ন হয়েছে, তাই না?'

'মোটেই না। প্রতি সপ্তাহে দেশ আর প্রবাসী আসে আমার বাড়িতে। যখন যাই ভালো বাংলা বই আর গানের ক্যাসেট যা বেরিয়েছে নিয়ে আসি। কলকাতা থেকে নিয়মিত শিল্পীরা আসেন এখানে। তাঁদের গান নাটকের স্বাদ পাই। এই তো সিদ্ধার্থদা আছেন, নিয়মিত বাংলা নাটক করি আমরা। এখানে।'

'আপনাদের পরবর্তী প্রজন্ম?'

'হ্যাঁ। ওদের যে সমস্যা সেটা আমরা সমাধান করতে পারব না। আমাদের যা আছে তার যতটুকু পেরেছি ওদের দিয়েছি। ওরা এক হাতে সেটা যেমন নিয়েছে তেমনি এ-দেশের জলহাওয়ায় বড় হয়ে এখানকারটাও নিয়েছে। ধরুন, একটি ছেলে এখানে জন্মে বড় হয়ে পাসটাস করে ভালো চাকরি পেল। সে বাড়িতে বাংলায় কথা বলে বটে কিন্তু আচার আচরণে বাঙালি থাকতে পারে না। ব্যতিক্রমের কথা ধরবেন না। তা এই ছেলেটির বিয়ে আমি বাসন্তী দেবী কলেজের কোনও মেয়ের সঙ্গে দিতে কি পারব? দেওয়া ভুল হবে না? বরং এখানকার বাঙালি ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে বিয়ে করলে তাদের টেম্পারমেন্টে মিলবে।'

'সেটা ওরা করছে?'

'খুব কম। বাপ-মা পছন্দ করলে তাই হচ্ছে। কিন্তু অন্য ভাষাভাষী মেয়ে আমাদের ছেলেদের

বউ হয়ে যাচ্ছে। হোক। তিনশো বছর আগে আমেরিকার অস্তিত্ব কি ছিল? এই দেশটা তো পুরোটাই ইমিগ্রান্টদের। হেথায় সবারে হবে মিলিবারে যাবে না ফিরে, লাইনটা আমেরিকা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য। তিনশো বছর ধরে পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকে মানুষ এসে মিলেমিশে গিয়েছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা বাদ পড়বে কেন?'

হ্যাঁ, আমি মনে করি স্বাতী বাগচি ঠিক কথাই বলেছেন। সত্যি কথা স্বীকার করতে আমাদের কষ্ট হয় কিন্তু স্বাধীনভাবে আগে দেশ নিয়ে যে ভাবনাটা সক্রিয় ছিল তা এখন কোনও বাঙালি সেইভাবে ভাবতে পারেন না। এই কলকাতা শহরের অনেক বাঙালি পরিবারের ছেলেমেয়েরা নকল আবহাওয়ায় বড় হয়ে উঠছে। জয়ন্তী আমাকে চমৎকার একটা কথা বলেছিল। সে ওয়াশিংটনে গিয়েছিল শৈশবে। সেখানেই পড়াশুনা করেছে, চাকরি করছে, নিজের পয়সায় বাড়ি কিনেছে। বাবা রমেন পাইন চমৎকার আবৃত্তি করেন। তাঁর সঙ্গ জয়ন্তীকে অনেকখানি ভারতীয় করে রেখেছে। নাচ শিখেছে, এখন শেখায়। রাত দুটোয় নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটন একা গাড়ি চালিয়ে যায়। যে-কোনও আমেরিকান মেয়ের মতো সে ও-দেশে স্বচ্ছন্দ। কোনও ভান নেই। সেই মেয়ে কলকাতার হরিশ মুখার্জি রোডের মামার বাড়ির পুরোনো ঘরে দিব্যি স্বচ্ছন্দে থাকে। আমাদের একটি উচ্চবিত্ত পরিবারের ইংলিশ মিডিয়াম স্ট্যাম্প মারা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে এসে সে বলেছিল, 'ও সমরেশদা, এ কী দেখছি। আমেরিকান ছেলেমেয়েরা এদের দেখে ঘাবড়ে যাবে। এরা কারা?'

স্বাতী বাগচি যদি ঠিক বলে থাকেন তা হলে সমীরণবাবু কি ভুল বলেছেন? না। দেখেশুনে আমার বারংবার মনে হয়েছে আমেরিকান বাঙালিদের মধ্যে ছেলেরাই বেশি নস্টালজিক। বাল্য ও কৈশোরের স্মৃতি প্রবীণ বয়সে তাঁদের খুব আঁচড়ায়। প্রায় সবাই ভাবেন অবসর নিয়ে দেশে চলে যাবেন। সল্টলেকে একটা বাড়ি কিনে দেশের মাটিতেই মারা যাবেন। আর এটা মাথায় এসে গেলে স্ত্রীর সঙ্গে সংঘাত শুরু হয়ে যায়। তদ্দিনে স্ত্রীর পিতামাতা চলে গেছেন। শেষবার দেশে গিয়ে ভাইয়ের বউয়ের আচরণ ভালো লাগেনি। দেশে ফিরে যাওয়ার কথা তিনি ভাবতেও পারেন না। স্বামী তাঁকে বোঝান, আমেরিকান বাড়ি বিক্রি করে সঞ্চয় যা আছে তা সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরতে পারেন তা হলে ট্যাক্স বাদ দিয়ে মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যাংক সুদ পাওয়া যাবে। কলকাতায় মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করলে সবরকম আরাম কেনা সম্ভব যা আমেরিকায় পাওয়া যাবে না। হিসেবটা সত্যি, কিন্তু মজার কথা হল, এত স্ত্রীরা বোঝেন না। অধিকাংশ বয়স্ক পুরুষকেই তাই একটা ভারী হৃদয় বহন করতে হয়। এবং সেটা মাঝে-মাঝে ব্যক্ত করে তাঁরা এক ধরনের আনন্দ পান।

পার্টি যখন ভাঙল তখন মধ্যরাত। এই প্রচণ্ড ঠান্ডাতেও গাড়ি গরম করে মাইলের পর মাইল ফিরে যেতে ওদের যেন বিন্দুমাত্র কষ্ট হচ্ছে না। আমেরিকায় মদ্যপান করে গাড়ি চালানো গুরুতর অপরাধ। তাই পার্টিতে এসে চালক নিজেকে নির্লিপ্ত রাখেন। যেদিন স্বামী পান করেন সেদিন স্ত্রী সারথি হন। কেউ কাউকে নেমন্তন্ন করলেই দেখেছি অতিথি কিছু না কিছু উপহার হাতে নিয়ে ঢোকেন। আর এই নেমন্তন্নটা ঘুরেফিরে প্রতি সপ্তাহেই চলে। গাড়িগুলো যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন আমার ফরিদার কথা মনে পড়ল।

ফরিদা বাংলাদেশের মেয়ে। এককালে সুন্দরী ছিলেন। কয়েকটা ভাষা জানেন। কবিতা লেখার চেষ্টা করেন। শামসুর রাহমানকে বন্ধু মনে করেন। থাকেন নিউইয়র্কে। মনোজের কাছে প্রথমবার যখন এসেছিলাম তখন একটা সিঙ্গলস্ বারে অদ্ভুতভাবে ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়। কোনও-কোনও মানুষ চট করে অন্তরঙ্গ হয়ে যেতে পারেন, মন যেটাকে সত্যি বলে মনে করে সেটাই করেন এবং রীতিনীতির ধার ধারেন না। ফরিদা সেইজাতের মানুষ। দুবার বিয়ে হয়েছিল। একবার সম্ভবত ডিউকের সঙ্গে। কিন্তু কোনও বিয়েই সফলতা পায়নি। প্রথমবার যখন তাঁকে দেখি তখন তিনি থার্টি সেভেন স্ট্রিটের একটা পাঁচতলার ফ্ল্যাটে প্রচুর বইপত্তর নিয়ে একা থাকেন। কলেজে পড়ান। মনে আছে সিঙ্গলস্ বারে তাঁকে পাশ থেকে দেখে মন্তব্য করেছিলাম, 'ওই ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই স্প্যানিশ কিন্তু

পিসিমা-পিসিমা মনে হচ্ছে।' সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি স্পষ্ট বাংলায় বলেছিলেন, 'কী আশ্চর্য! পিসিমা তো কারও মেয়ে, বোন, প্রেমিকা, স্ত্রী অথবা মা। তাই না?' প্রচণ্ড অবাক, আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে তিনি কয়েক মিনিট সময় নিয়েছিলেন।

মনোজের বাড়িতে একটা পার্টিতে ফরিদাকে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। সেই পার্টিতে ফরিদার কথাবার্তা অনেক মহিলার পছন্দ হয়নি। স্পষ্ট একজনকে বললেন, 'রবীন্দ্রনাথ না পড়ে যে বাঙালি নিজেকে শিক্ষিত বলে দাবি করেন তার পশ্চাৎদেশে লাথি মারা দরকার।' পার্টি ভাঙলে সবাই নিজের স্ত্রীকে নিয়ে মধ্যরাত্রে যখন বাড়ির দিকে রওনা হলেন তখন দেখা গেল ফরিদার জন্যে কোনও গাড়িতে জায়গা নেই কেউ নাকি ম্যানহাটনের দিকে যাচ্ছেন না। ফরিদা শিশুর মতো হেসে বলেছিল, 'আমি তো ফকির আদমি, গাড়ি নেই, কাল সকালের ট্রেন ধরা ছাড়া কোনও উপায় নাই।' বেচারাকে থাকতে হয়েছিল সেই রাতটা।

আজ আমার ফরিদার কথা মনে পড়ল। ফরিদা বাড়ি পালটেছেন। হাডসন নদীর ধারে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন। ডায়েরি দেখে নতুন নম্বর টিপলাম। ওপাশে ফোন বাজল। এখন মধ্যরাত। কাউকে টেলিফোন করার সময় এটা নয়। জানি। কিন্তু ফরিদা তো নিয়মটিয়মের ধার ধারেন না। তৃতীয়বার রিং হওয়ার পর ফরিদার গলা পেলাম, একটু ঘুমঘুমে, 'হেলো!'

'কেমন আছেন ফরিদা?'

'এক মিনিট!' শব্দদুটো উচ্চারণ করে ওপাশে একটু নীরবতা, তারপর নিশ্বাস ফেলে উচ্চারণ, 'নাঃ, আজকাল কিছুই মনে করতে পারি না। জনাবের নাম কী?'

'আপনাকে আমি একসময় পিসিমা বলেছিলাম।'

'আরে! কোত্থেকে? কী আশ্চর্য!' চেঁচিয়ে উঠলেন ফরিদা, 'আপনি কোত্থেকে বলছেন?'

'নিউজার্সির ক্লাস্টার থেকে।'

'মাই গড। আপনি তো খুব শয়তান মানুষ। কবে এসেছেন?'

'কয়েকদিন। কী করছিলেন?'-

সঙ্গে-সঙ্গে গলা পালটে গেল, 'আর বলবেন না, এই মানুষটাকে নিয়ে খুব ঝামেলায় ছিলাম। আপনি ফোন করে আমাকে বাঁচালেন।'

আমি একটু থতোমতো খেলাম। শেষবার ফরিদা আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁর বিয়ের শখ মিটে গেছে। ভালো বন্ধু পেলে একসঙ্গে থাকতে পারেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেউ কি অসুস্থ হয়েছেন?'

'অসুস্থ? কে আবার অসুস্থ হবে?'

'আপনার বাড়িতে তা হলে কে ঝামেলায় ফেলল?'

'আপনি একটি ভোলানাথ।' ফরিদা শব্দ করে হাসলেন 'কেউ নাই কেউ নাই। বিদেশে বেড়াতে এসে অনেক নাচনকোদন হল, শরীরের যা অবস্থা তাতে দেশে ফেরার ডাক যে-কোনও দিন পেতে পারি।'

তা হলে এই মানুষটাকে নিয়ে ঝামেলা মানে নিজেকে নিয়ে ঝামেলা? ফরিদা কি বাংলাদেশে চলে যাচ্ছেন? সেকথা বলতেই আবার একপ্রস্থ হাসি, 'দূর! এই যে পৃথিবীতে জন্মেছি, বড় হয়েছি, দেখছি সব, এ তো বেড়াতে এসে দেখা। প্রবাসে। কেউ তো এই প্রবাসে থাকবে না। ঠিক সময় হলে নিজের-নিজের দেশে চলে যেতে হবে। মুশকিল হল নিজের দেশটা ঠিক কোথায় তাই কেউ জানি না। কিন্তু আপনি খুব অন্যায় করেছেন। সোজা আমার এখানে ওঠা উচিত ছিল। তা হলে এই ফকিরকে একটু সাহায্য করা হত।'

'ব্যাপারটা বুঝলাম না।'

'আমর একটা বাড়তি ঘর আছে। মাঝেমাঝেই এক হপ্তা দু-হপ্তার জন্যে পেয়িং গেস্ট রাখি। আপনার কাছে থাকার জন্যে টাকা নিতাম না কিন্তু খাওয়ার জন্যে বাজারটা করে দিতে বলতাম,

আমারও খাওয়া হয়ে যেত। এই দেখুন, আজ পঁচিশ তারিখ, আমার পকেটে মাত্র তিন টাকা পড়ে আছে।'

'এরকম অবস্থা হল কেন?'

আবার হাসি, 'ওই তো বললাম। এই প্রবাসী জীবনের সবচেয়ে বিস্ময় বলুন আর ঝামেলাই বলুন, ওই মানুষটি। তাকে নিয়ে পড়ে আছি। তিন বছর আগে মনে হত কাজটা করা দরকার। সময় চলে যাচ্ছে আর ফুর্তি করছি, ফুর্তিই করে যাচ্ছি; এটা কেমন কথা? চাকরি ছেড়ে দিয়ে কাগজপত্তর নিয়ে বসে গেলাম। এক পয়সা তো দুর্দিনের কথা ভেবে আলাদা রাখিনি। তার ওপর বাংলাদেশের কয়েকজনকে কিছু পাঠাতে হয়। যে ফ্ল্যাটে আছি তার মাসিক ভাড়া নশো টাকা। বেকারভাতা পাই বারোশো টাকার মতো। তাই দিয়ে সব খরচ চালিয়ে পেটে দেওয়ার জন্যে যা থাকে তাতে কুড়ি-বাইশ দিন চলে। মদ কেনার কথা এখন ভাবি না। রুটি আর কফি খাই বেশিরভাগ দিন। কিন্তু সমরেশ, কাজটা এখন প্রায় শেষ। আর এক হপ্তার মধ্যে পেপারো সাবমিট করতে পারব ইউনিভার্সিটিতে।

খুব অবাক লাগছিল। ফরিদার মতো প্রাণচঞ্চল মানুষ, যাঁর আঙুলে সিগারেট, হাতে হুইস্কির গ্লাস, ঠোঁটে চারটে ভাষার সেরা কবিতা সবসময় মজুত থাকত তিনি এই নিউইয়র্ক শহরে প্রায় স্বেচ্ছাসেবী হয়ে এমন কষ্ট সহ্য করছেন কোন কাজের জন্যে? ভেবেছিলাম প্রশ্ন করলে বিরাট এবং খটমটে কিছু শুনব। কিন্তু উত্তর হল, 'আন্তর্জাতিক রবীন্দ্রনাথ।'

নভেম্বরের দারুণ শীতে নিউজার্সির সিদ্ধার্থ দত্তর বাড়িতে যন্ত্রের কল্যাণে যথেষ্ট গরম থাকা সত্ত্বেও আমি যেন বরফ হয়ে গেলাম। তা হলে এতক্ষণ যে মানুষটা ফরিদার সঙ্গে ঝামেলা করছিল তিনি রবীন্দ্রনাথ? এই মধ্যরাত্রে আমার জন্যে এর চেয়ে বেশি কী বিস্ময় অপেক্ষা করে থাকবে?

ফরিদা বললেন, 'মানুষটা যাচ্ছেতাই। বিশ্বাস করুন এই তিন বছরে আমার শরীর মন নিয়ে পিংপং খেলে গিয়েছে। তবে আমি বাঁদী সহজে ছেড়ে দিইনি। বিস্তর গালাগালি দিয়েছি। আপনাদের কলকাতার কায়েত সমালোচকদের মতো শুধু ছিদ্র অন্বেষণ করে গাল দিয়ে নিজেকে বিখ্যাত করার ধান্দা আমার নেই। রবীন্দ্রনাথের ত্রুটি কী ছিল, কী বলতে কী বলেছেন তাই লিখেছি। এক বাঙালি মেমসাহবে তো ওঁর সঙ্গে ওকাম্পোর প্রেম নিয়ে ডগমগ লেখা লিখেছেন। ছ্যা ছ্যা। আরে মানুষের জীবনে প্রেম তো স্বাভাবিক। তার ওপর তিনি রবীন্দ্রনাথ হলে কথাই নেই। বাংলা ভাষায় যেসব পুরুষ কথা বলেন, তাঁরা যদি ঘাস হন তো তিনি একটা বিশাল শালগাছ। আমি যদি তখন জন্মাতাম তো—! না, অন্যকে গালি দিয়ে কি লাভ? রবীন্দ্রনাথ আমার বন্ধু। আমার লেখায় এই বন্ধুত্বটুকু একটুও নষ্ট হয়নি। অনেক বকলাম। কখন আসছেন?'

বললাম, 'ফরিদা কাল আমরা লস এঞ্জেলসে যাচ্ছি। ফিরে এসে দেখা করব।'

আমরা ঠিক করেছিলাম দেশটাকে দেখব পশ্চিম থেকে। আমাদের এক মাসের গ্রেহাউন্ড বাসের টিকিট আছে। ওই সময়ের মধ্যে একটা পাক দিয়ে এলে কিছুই ভালো করে দেখা হবে না। সিদ্ধার্থ যথেষ্ট কম টাকায় একপিঠের টিকিট যোগাড় করে দিল। এখানকার বাঙালিরা ডলারকে টাকা বলে। সেন্টকে পয়সা।

সকালে সিদ্ধার্থ আর বনানী অফিসে বেরিয়ে গেছে। ওদের মেয়ে টুলটুল খুব মিষ্টি। কলেজে পড়ছে। বাংলা বলে যথেষ্ট জড়তা নিয়ে। মনোজের গল্পের নায়িকা পিংকির সঙ্গে বেশ মিল আছে। কলেজের পর একটা ওষুধের দোকান কয়েক ঘণ্টা কাজ করে টুলটুল। আজ প্রথম ওকে একা পেয়ে কথা বলছিলাম। মেয়েটার মধ্যে এখনও শৈশব রয়ে গেছে বলে আমার ধারণা ছিল। ওদের বাড়ির পাশের লনে তখন যন্ত্রপাতি নিয়ে দুটো ছোকরা কাজে লেগেছে। তিন মিনিটে সব বাড়তি ঘাস

কাটা হয়ে গেল, চার মিনিট হাওয়া ছুঁড়ে সেই ঘাস জড়ো করে নিয়ে ওরা চলে গেল। পনেরো দিনে একবার আসে। মাসের টাকা একবারে নেয়। টুলটুল জানাল এরা দুজনেই ছাত্র। ঘাস কাটতে বাড়ি-পিছু তিরিশ ডলার রোজগার। এ-দেশের নিয়ম নিজের লন, বাড়ির সামনেটা সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে, নইলে ফাইন দাও। যারা সময় পায় না তারা এদের সাহায্য নেয়।

টুলটুলকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার বন্ধু নেই?'

টুলটুল ঘাড় কাত করল, 'আছে।'

'ছেলে বন্ধু আছে?'

অকপটে বলল সে, 'হ্যাঁ। অনেক।'

'তাদের সঙ্গে মিট করো তুমি?'

'মিট? তা তো হয়ই। তবে নিউজার্সির মধ্যে।'

সিদ্ধার্থর কাছে শুনেছি মেয়ে কোনও বান্ধবীর বাড়িতে রাত্রে গেলে প্রথম-প্রথম খুব টেনশনে থাকতেন তিনি। রাত এগারোটা নাগাদ একটা ফোন করত। ভোর তিনটের সময় বাড়িতে ফিরত। সেইসব পার্টি নিছকই মেয়েলি, তবু টেনশন হত। এখন অনেকটা অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। ওর সমবয়সী মেয়েরা প্রায় প্রতি সপ্তাহে এই রকম আড্ডা মারে। ওকে জোর করে আলাদা করতে যাওয়া বোকামি।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার কোনও বন্ধু নিউইয়র্কে থাকে?'

'হ্যাঁ। বাবা যেতে দেবে না সেখানে।'

'কেন?'

'আই ডোন্ট নো।'

'তুমি মেনে নাও?'

হাসল টুলটুল, 'মানতে ভালো লাগে না, কিন্তু আমি বাবাকে খুব ভালোবাসি।'

নিউজার্সি থেকে চোদ্দর-টি বাসে চেপে ওয়াশিংটন ব্রিজ পর্যন্ত পৌঁছতে মিনিট কুড়ি লাগে। নিউজার্সি একটা বিরাট স্টেট। সময়টা মেপেছি ক্লোস্টারের বাসস্ট্যান্ড থেকে। এ-সব জায়গায় বাস পেতে ধৈর্য ধরতে হয়। অফিসের সময় আধঘণ্টা অন্তর তাদের দেখা মেলে, দুপুরবেলায় কদাচিৎ। রবিবারে এক-আধটা। বাস এখানে খুব প্রয়োজনীয় যান নয়। প্রত্যেকেরই গাড়ি একাধিক থাকায় বাসের ওপর কোনও চাপ পড়ে না। যে কবার ক্লোস্টার থেকে বাসে চেপেছি দুই-তৃতীয়াংশ আসন ফাঁকা পেয়েছি। এখন বাসে উঠলেই এক ডলার পনেরো সেন্ট দিতে হয়। আমাদের তেইশ টাকা। হাডসনের ধারে ব্রিজের এপাশে নিউজার্সি ওপারে নিউইয়র্ক। আজ ঠান্ডা বেশি লাগছে হাওয়ার জন্যে। তিনটে সুটকেস নিয়ে আপাদমস্তক মুড়ে ওয়াশিংটন ব্রিজ স্টেশনে পৌঁছে টিউবের দিকে এগিয়ে গেলাম। ইতিমধ্যে জায়গাটা আমার বেশ চেনা হয়ে গিয়েছে। ডানদিকে টিকিট কাউন্টার, বাঁ দিকে অফ ট্র্যাক বেটিং সেন্টার। সামনে টানেল। এই টানেল সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছি। এক পেলে কালো মানুষেরা প্রায়ই ছিনতাই করে এখানে। এক বাঙালি মহিলা নিউজার্সি থেকে এখা পৌঁছে টানেল পেরিয়ে টিউব ধরতেন ম্যানহাটনে চাকরি করতে। প্রথমদিন যখন হনহনিয়ে যাচ্ছি তখন খুব সকাল। হঠাৎ দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো এক কালো মানুষ ওঁর দিকে হাত বাড়ি বলল, 'ম্যাম, তোমার ব্যাগটা দাও।'

লোকটার চেহারা চাহনি দেখে ভদ্রমহিলা প্রচণ্ড নার্ভাস হয়ে হুকুম মান্য করলেন। গে তিরিশ ডলার ছিল। সেটি নিয়ে ব্যাগ ফেরত দিয়ে লোকটা আবার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। কাঁপতে-কাঁপতে গেটের কাছে পৌঁছে ভদ্রমহিলা একজন পুলিশ অফিসারের দেখা পেলেন। তাঁকে সব কথা বলতে তিনি বললেন, 'জানেন দূর থেকে লোকটাকে আমি দেখতে পেলাম। তেমনই ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। অফিসারকে বললেই ওকে হাজতে যেতে হত। কিন্তু বলতে পারলাম না। মনে হল হাজত থেকে বেরিয়ে এসে এই পথে আমাকে দেখলে ও হিংস্র হয়ে

উঠবে।' টানেলটার শেষমাথায় এসে অফিসারকে বললাম, 'লোকটাকে দেখতে পাচ্ছি না।' অফিসার বললেন, 'ঠিক আছে, ভয় পেয়ো না, আমি এখানে রোজ সকালে থাকি, নেক্সট টাইম এমন হলে যোগাযোগ করো।'

ফেরার সময় আমি একা ছিলাম। শুনলাম লোকটা বলছে, 'থ্যাংকু ম্যাম। তোমার মাথা বেশ ঠান্ডা। ঠিক আছে, একটা চুক্তি করা যাক, প্রতি মাসে তুমি আমাকে দশ ডলার করে দিও, কোন শালা তোমাকে বিরক্ত করবে না।' এরপর থেকে ভদ্রমহিলা প্রতিমাসে বিনা বাক্যব্যয়ে দশ ডলার লোকটা হাতে তুলে নিয়ে নিরাপদে ওই টানেলে যাতায়াত করেন।

এবারে এসে দেখছি, কালো চেহারার অনেক মানুষ ঠিক মানুষের মতো আচরণ করছে না। তাদের বিশাল শরীরর নিয়ে সারা দিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে অদ্ভুত দৃষ্টিতে পথচারীদের লক্ষ করে। কিছুটা বিরক্তি এবং অনেকটা ভয়ে অরিজিত ফরটি সেকেন্ড স্ট্রিটে যেত না। আঙ্কল টমস কেবিন পড়ে মার্টিন লুথার কিং-এর জীবনী জেনে পৃথিবীর নির্যাতিত কালো মানুষদের সম্পর্কে আমার মনে অনেকটা নরম জায়গা ছিল। এবার তার অনেকটা নষ্ট হচ্ছিল। হার্লেম কেন্দ্রিক এলাকায় ওরা গায়ের জোরে নিয়ম ভাঙতে দ্বিধা করে না। ফর্টি সেকেন্ড স্ট্রিটে একদিন দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছি একটা কালো ছেলে এসে বলল, 'হাই ম্যান, গিভ্ মি এ সিগারেট।'

দিতে ইচ্ছে করল না। মাথা নেড় সরি বললাম।

সঙ্গে-সঙ্গে আমার সিগারেট ধরা হাতের কবজির তলায় সে আঘাত করল। সিগারেট ছিটকে পড়ল ফুটপাতে। ছেলেটা কয়েক পা হেঁটে ওটাকে কুড়িয়ে নিয়ে টানতে-টানতে চলে গেল।

কেন এমন হল? কেন কালোদের একটা অংশ এমন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে? প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সদ্য আলাপ হওয়া পূর্ব জার্মানির এক বৃদ্ধ আমাকে মনে করিয়ে দিলেন, নিউ ইয়র্কের মেয়র কিন্তু একজন ভদ্র শিক্ষিত কালো মানুষ।

॥ ৪ ॥

আজকাল কোনও কিছুতে সহজে অবাক হই না। এমন বলা যেতে পারে, অবাক হলেও সেটা প্রকাশ করতে চাই না; বেমালুম উপেক্ষা করতে পারি। যেন যা হচ্ছে সেটাই স্বাভাবিক এবং আমি তার সঙ্গে নিত্য পরিচিত, এমন একটা ভঙ্গি অনায়াসে ধরে রাখতে পারি। আমেরিকার জীবনযাত্রায় অনেক কিছু ছড়িয়ে আছে যা ভারতীয়দের কাছে বিস্ময়কর ঠেকবে। চা-বাগান কিংবা জলপাইগুড়ির ছেলের কাছে তো মাথা ঘুরে যাওয়ার মতো ব্যাপার। কিন্তু কলকাতা আমাকে চমৎকার ভান করতে শিখিয়ে দিয়েছে। এই যে বাস থেকে নেমে আঠারো নম্বর দরজা পেরিয়ে সরু চলন্ত সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে নিমেষে নেমে এলাম পাতালের দোতলায় তা শুধু দেওয়ালে লেখা নির্দেশগুলোতে চোখ রেখে তা কে জানবে। চোখ খোলা রাখলে ও-দেশে হাঁটতে কোন গাইডের দরকার হয় না। সব জায়গায় স্পষ্ট লেখা কোথায় কীভাবে যেতে হবে।

পাতালের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আমরা যখন অপেক্ষা করছি টিউবের জন্যে তখনই ঘোষণা করা হল, সামনে হাডসন নদীর জল ঢুকে পড়েছে। এ পথে পাতাল রেল আপাতত অচল। শোনামাত্র আমার সমস্ত স্মার্টনেস উধাও। টিউবে যদি ম্যানহাটন না যেতে পারি তাহলে ট্যাক্সি করতে হবে। তার ভাড়া অনেক। অরিজিত বলল, 'দেশটা তো ভারতবর্ষ নয়, নিশ্চয়ই কোনও বিকল্প ব্যবস্থা রেখেছে।'

তখনই সেই পূর্ব-জার্মানির বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হল। ভদ্রলোক আমাদের কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, দেখে মনে হচ্ছে আপনারা নতুন, তা কোথায় যাওয়ার জন্যে বেরিয়েছেন।'

অরিজিত জবাব দিল, 'ম্যানহাটন।'

'ম্যাটহাটনের কোথায়?'

'পোর্ট অথরিটি।'

'নিশ্চয়ই শুনেছেন এই লাইনে ট্রেন বন্ধ। আমিও পোর্ট অথরিটিতে যাব। চলুন, ওপরের প্ল্যাটফর্ম থেকে ট্রেন ধরি। সরাসরি যাওয়া যাবে না, ট্রেন বদলাতে হবে।' ভদ্রলোক কথা বলছিলেন ধীরে, ইংরেজি উচ্চারণ স্পষ্ট। আমার ওঁকে বেশ ভালো লাগল। অনেকটা পাহাড়ি সান্যাল মশাই-এর মতো দেখতে।

হাঁটতে-হাঁটতে কথা হচ্ছিল। ভারতবর্ষে বলতে উনি নেহরু এবং ইন্দিরাকে জানেন। কখনও যাননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কম্যুনিস্টরা যখন পূর্ব জার্মানি দখল করে নিল তখন পালিয়ে এসেছিলেন এ-দেশে। তারপর থেকে আর যাওয়া হয়নি। ছেলেমেয়েরা এখানে জন্মেছে, বড় হয়েছে, তারা তাদের মতো আছে। এই পঞ্চাশ বছর ধরে দেশ তাঁকে সমানে টেনে যাচ্ছে। কিন্তু যেতে পারেননি। দেশের সঙ্গে তার যোগাযোগ রয়েছে। তাঁর মা এখনও জীবিত। পূর্ব জার্মানির মানুষের শোচনীয় আর্থিক দুর্গতির খবর তিনি জানেন। মাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। এখন ওখানকার মানুষ আন্দোলন শুরু করেছে কমিউনিজম থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে। দুই জার্মানি এক হবে এমন কথাও শোনা যাচ্ছে। এই আশায় তিনি দিন গুনছেন। সেই দিনটি এলেই তিনি রওনা হবেন। জানলাম শুধু এই ভদ্রলোকই নয়, পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট শাসিত দেশগুলোর অনেক মানুষ এখন আমেরিকায় ছড়িয়ে আছেন। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট শাসন নেই, না?'

বললাম, 'কেন্দ্রীয় সরকার এখনও কমিউনিস্টরা পায়নি তবে প্রাদেশিক সরকার ওরা গঠন করতে পেরেছে ভোটে জিতে এসে।'

'ওদের আচরণ কীরকম?'

'খুব ভালো। রাশিয়া কিংবা চিনের যে গল্প শুনি তার সঙ্গে কোনও মিল নেই।'

ভদ্রলোক খুব অবাক, 'সেটা কী করে সম্ভব?'

সুব্রত বলল, 'জলহাওয়া মাটি অনুযায়ী তো সব কিছু বদলে যায়।'

ভদ্রলোকের যেন কথাটা বিশ্বাস হল না।

দোতলার ট্রেনে বেশ ভিড়। সুটকেস সামলে দাঁড়াবার জায়গা পেলাম। আমাদের সামনে বিশাল চেহারার একটি কালো মানুষ সবার আসনে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে পা ছড়িয়ে। তার মুখ টুপিতে ঢাকা। এত লোক কষ্ট করে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু কেউ ওকে উঠে বসতে বলছে না। ভদ্রলোক চাপা গলায় বললেন, 'এই এক যন্ত্রণা। পাঁচ-ছয় বছর আগেও দেখিনি। ড্রাগ সব শেষ করে ফেলল।'

ড্রাগ। আমেরিকায় এসে দেখছি সরকার ড্রাগের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছেন। ড্রাগ কারবারিদের ধরিয়ে দিলে মোটা পুরস্কার দিচ্ছেন। ড্রাগ খাইয়েদের ভালো করার জন্যে অনেক সেন্টার খোলা হয়েছে। টিভি, কাগজে এর বিরুদ্ধে প্রচার এখন তুঙ্গে। সম্প্রতি পানামা সরকারের বিরুদ্ধে আমেরিকা অভিযোগ করেছে যে, ড্রাগ আসছে ওদের দেশ থেকে। কিন্তু এই লোকটি যদি ড্রাগ খেয়ে প্রকাশ্যে ট্রেনের সিট দখল করে এভাবে ঘুমোয় তা হলে পুলিশ কিছু বলছে না কেন?

বৃদ্ধ বললেন, 'পুলিশ এখন এদের নিয়ে নাজেহাল। ফর্টি সেকেন্ড স্ট্রিটে দেখবেন সারাদিন এরা দাঁড়িয়ে থাকে পাথরের মূর্তির মতো। এদের সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। আপনারা পোর্ট অথরিটিতে যাচ্ছেন; খুব সাবধানে জিনিসপত্র রাখবেন। ওখানে হতে পারে না এমন কোনও কাজ নেই।

নিউ ইয়র্কের পাতাল রেলে কোনও সৌন্দর্য নেই। কলকাতার মতো স্টেশনগুলোকে ছবি বানাবার কোনও ইচ্ছে ওদের হয়নি। এই যে জল ঢুকে একটা লাইন বন্ধ হয়ে গেল তার প্রতিক্রিয়া অন্য লাইনে পড়েনি সম্ভবত ছবি হয়নি বলেই। এখানে টিউব রেল বিলাস নয়, প্রতি মুহূর্তের

প্রয়োজনীয় যান, তাই এখানে ছুটোছুটিটাই আসল ব্যাপার। কথাটা মনে পড়ল কারণ গতকাল টিভিতে বলেছে কোনও এক সমীক্ষায় কলকাতার পাতাল রেলকে পৃথিবীর এক নম্বর জায়গা দেওয়া হয়েছে। শুনে ভালো লেগেছিল। কিন্তু নিউইয়র্ক সিটির মাটি ফুটো করে এখানে যেভাবে সাপলুডোর মতো ট্রেনের ছোটাছুটি দেখছি কলকাতায় তা আমরা দেখে যেতে পারব না।

এই সময় একজন কালো মহিলা এগিয়ে এসে শুয়ে থাকা লোকটির মাথার কাছে ঝুঁকে ধমকে উঠলেন, 'অ্যাই, উঠে পড়ো। আমরা সবাই দাঁড়িয়ে আছি, তোমার লজ্জা করছে না?'

লোকটা কোনও সাড়াই দিল না। তার সেই ক্ষমতাও ছিল না। দু-তিনবার ডাকার পর ভদ্রমহিলা সজোরে চড় মারলেন লোকটির গালে। দ্বিতীয়বারে সে চোখ মেলে ওই ক্রুদ্ধ মুখ দেখে ধীরে-ধীরে উঠে বসল। ভদ্রমহিলা তখন সমানে বকে যাচ্ছেন। দেখলাম বিশাল চেহারার কালো লোকটি সিট ছেড়ে উঠে হেঁটে চলে গেল অন্য কম্পার্টমেন্টে। এ-বার ভদ্রমহিলা আমাদের বললেন, 'আসুন বসা যাক।'

মহিলার চেহারা সাধারণ, রোগাই বলা যেতে পারে। বোঝা যাচ্ছে ইনি লোকটির পরিচিতাও নন। অথচ যে কাণ্ডটি করলেন তা যে-কোনও পুরুষের পক্ষে দুঃসাহসের ব্যাপার। লোকটি বাঁ-হাতে ছুড়ে ফেলে দিতে পারত। আমার পাশে বসে জার্মান ভদ্রলোক বললেন, 'এইটেই প্লাস পয়েন্ট। ছেলেদের একাংশ যেমন কুঁড়ে আর ড্রাগ অ্যাডিক্টেড হয়ে গেছে তেমনি মেয়েদের মধ্যে কাজ করার, প্রতিবাদ করার স্পিরিট বেড়ে গিয়েছে। বেশিরভাগ সংসারের হাল ধরে আছে মহিলারাই।'

ভদ্রমহিলা আমার বাঁ-দিকে। চাপা গলায় কথা হচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন এমন হচ্ছে?' জার্মান ভদ্রলোক জানালেন 'হয়তো হতাশায়। এখনও এরা তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে ট্রিটেড হয়। অবশ্য কাগজেকলমে নয়। এর কারণ পড়াশুনার প্রতি বেশিরভাগ কালো মানুষের অনাগ্রহ। হয়তো যে পরিবেশে ওরা বড় হয় সেখানে ওই আগ্রহ মনে আসে না। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে কালোদের জন্যে চাকরি সংরক্ষিত আছে কিন্তু ক্যান্ডিডেট পাওয়া যায় না। প্রাপ্তবয়স্করা বেকারভাতা পায়। খারাপ টাকা নয়। দিন সাতেকের মধ্যে শেষ করে দেয় অনেকেই। তারপর ড্রাগের জন্যে মারপিট, ছিনতাই ছাড়া আর কোনও পথ থাকে না। আপনাকে বলছিলাম এই শহরের মেয়র একজন কালো মানুষ। চমৎকার ভদ্রলোক। অনেক ভালো চাকরি এখন কালোরা করছেন। ওপরে উঠে আসার চেষ্টা এঁদের আছে। কিন্তু বাকিদের সেই আগ্রহটাই নেই।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আজ পর্যন্ত এ-দেশের প্রেসিডেন্ট কোনও কালো মানুষ হয়নি। সরকার কি কালোদের স্বাভাবিকভাবে বাঁচার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন?'

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, 'মোটেই নয়। কারণ সরকারি অফিসারদের মধ্যে অনেক কালো আছেন। খাতায় কলমে নেই কিন্তু বৈষম্য সূক্ষ্মভাবে যে আদৌ নেই, অন্তত ব্যবহারে, তা বলতে বাধছে।'

পোর্ট অথরিটি একটি বিস্ময়কর স্টেশন। বিশাল এলাকা জুড়ে কয়েকতলা প্রাসাদ। তিনতলা পর্যন্ত বাস উঠে যাচ্ছে। মাটির নীচে ট্রেন এসে থামছে। প্রায় গোলকধাঁধার মতো। ওই একটা বাড়ি থেকে তাবৎ দূরপাল্লা এবং শহরের বাসগুলো ছাড়ছে। গেটের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ। খুঁজে পেতে জেরবার হতে হয়। জার্মান ভদ্রলোক বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আমরা যাব কেনেডি এয়ারপোর্টে যাওয়ার জন্যে বাস ধরতে। চলন্ত সিঁড়িতে চেপে তিনতলায় উঠে হাঁটছি, এমন সময় একটি কালো এসে সিগারেট চাইল। সুব্রত বলল, 'সরি। আমি সিগারেট খাই না।'

ছেলেটা জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছ তোমরা?'

সুব্রত ভালোমানুষের মতো জবাব দিল, 'এয়ারপোর্টের বাস ধরতে।'

'ঠিক আছে চলো, আমি তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি।' হঠাৎ গাইডের মধ্যে সে আমাদের সামনে এগিয়ে গিয়ে চিৎকার করতে লাগল, 'এদিক দিয়ে ম্যান।'

অরিজিত ধমকে উঠল, 'এই যে, তোমাকে গাইড করতে হবে না।'

ছেলেটা মাথা নাড়ল, 'আমি অলরেডি করতে আরম্ভ করেছি এখন না বললে চলবে না। কাম অন ম্যান!'

মহা মুশকিলে পড়ে গেলাম। আশেপাশে মানুষজনের যাতায়াত কম নয়। এরই মধ্যে ছেলেটি নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে আছে। অনেক চেষ্টা করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে নিরস্ত করা গেল। অনেকখানি হাঁটার পর আমরা এয়ারপোর্টে যাওয়ার টিকিট কেনার কাউন্টারের দর্শন পেলাম। কাচের দেওয়ালে ঘেরা একটা বড় ঘরের কোণে কাউন্টারের ওপারে একজন কালো মহিলা বসে আছেন। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গিয়ে সুটকেসগুলো নামিয়ে রেখে টিকিট চাওয়া হল। এই ম্যানহাটন থেকে এয়ারপোর্টের ভাড়া প্রায় দশ ডলার। ডলার দিয়ে টিকিট নিয়ে স্যুটকেস তুলছি এই সময় অরিজিত বলে উঠল, 'আরে, আমার সুটকেস?'

অরিজিত-এর সুটকেসটা নেই। বড় ঘরটায় পঞ্চম কোনও মানুষ ঢোকেনি কিন্তু ম্যাজিকের মতো ওর সুটকেসটা উধাও। এমন হতভম্ব কখনও হইনি। আমরা তিনজনেই নিশ্চিত যখন দরজা ঠেলে এই ঘরে ঢুকেছিলাম তখন ওই মেয়েটি ছাড়া কেউ ছিল না। মিনিটখানেক পরে কেউ নেই। তা হলে সুটকেস গেল কোথায়? অরিজিতের অবস্থা খুব খারাপ। তার জামাপ্যান্ট থেকে পাঁচশো ডলার ট্রাভেলার্স চেক, সিদ্ধার্থর কাছ থেকে নেওয়া ওভারকোট ওই সুটকেসে ছিল। এখন ওর পকেটে প্লেন, গ্রে-হাউন্ডের টিকিট এবং মাত্র কুড়ি ডলার পড়ে আছে। এ ছাড়া আমাদের প্রস্তাবিত কাজের সমস্ত কাগজপত্র সে ওই সুটকেসে রেখেছিল। অরিজিত মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার সুটকেসটা উধাও হয়ে গেছে এখানে রাখার পর। তুমি তো দরজার দিকে মুখ করে বসে আছ, কাউকে ঢুকতে দেখেছ?'

মেয়েটি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল তার কাজে। মাথা নেড়ে বলল, 'আমি কাউকে দেখিনি। আমি তো তোমাদের টিকিট দিচ্ছিলাম।'

অরিজিত বলল, 'পুলিশকে খবর দাও।'

মেয়েটি টেলিফোন তুলে পুলিশকে চাইল।

মিনিট দেড়েকের মতো আমরা অপেক্ষা করেছিলাম। তখনও ঘরে কেউ ঢুকছে না। অনুমান করছি আমাদের পেছন-পেছন কেউ পায়ে পা মিলিয়ে এই ঘরে ঢুকেছে। অরিজিত সুটকেস রাখা মাত্র সেটা তুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেছে। কতখানি বুকের পাটা হলে এটা করা সম্ভব তা ভেবে পাচ্ছিলাম না। এই সময় এক যুবক পুলিশ অফিসার হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে জানতে চাইল, 'ইয়েস মেন, তোমাদের সমস্যাটা কী? চটপট বলে ফেল।'

অরিজিত বলল, 'এইমাত্র এখানে সুটকেস নামিয়ে টিকিট কাটছিলাম, সেটা কেউ চুরি করেছে।'

'চুরি? আর ইউ সিওর?'

'না বলে নিলে তো চুরিই বলা হয়।'

অফিসার কড়া চোখে তাকালেন, 'কাকে সন্দেহ হয়?'

'কাউকে নয়। কেউ এ ঘরে ছিল না।'

'ছিল, কিন্তু তুমি দেখনি। ওরা কে?'

'আমার বন্ধু।'

'বাঃ, তিনটে পুরুষমানুষ দেখতে পেলে না? তা হলে কাউন্টারের ওপারে একমাত্র মেয়েমানুষটি নিশ্চয়ই দেখেনি।' অফিসার বলতে-বলতে কোমর থেকে রিভলভার বের করে ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। দরজা ঠেলে তখন এক বৃদ্ধা ব্যাগ নিয়ে ঢুকছিলেন। অফিসারের কাণ্ড দেখে তিনি হতভম্ব। হাউমাউ করে চেঁচিয়ে কি বললেন।

রিভলভার উঁচিয়ে অফিসার তাকে ধমকালেন, 'কী চাও এখানে?'

'শো মি ইওর আইডি।'

বৃদ্ধা তাঁর পাশপোর্ট বের করে দেখালেন।

অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছুক্ষণ আগে তুমি এ ঘরে ঢুকেছিলে?'

'না। এই প্রথম আসছি।'

এবার রিভলভার কোমরে চালান করে দিয়ে অফিসার বললেন, 'সরি, এখন তো কিছুই করা যাবে না। কী ছিল সুটকেসে?'

অরিজিত বলল, 'আমার পোশাক, কাগজপত্র, পাঁচশো ডলারের ট্রাভেলার্স চেক। আমরা লস অ্যাঞ্জেলস যাচ্ছিলাম।'

অফিসার এক পা পিছিয়ে আমাদের দেখলেন। তাঁর মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। হঠাৎ গর্জে উঠলেন তিনি, 'আমি ভেবে পাচ্ছি না তোমরা কী! ইডিয়ট বললেও তো কম বলা হয়। একজন পুলিশ অফিসার হয়েও আমি কখনও দু-ডলারের বেশি পকেটে রাখি না। তোমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সেটা হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অপরাধীদের কর্মক্ষেত্র। ওঃ, অতগুলো টাকা সুটকেসে নিয়ে এখানে এসেছ? ঠিকই হয়েছে, উচিত শাস্তি হয়েছে।'

খুব রাগ হল আমার। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই কথাগুলো আপনি লিখে দেবেন?'

সঙ্গে-সঙ্গে লম্ফঝম্ফ শুরু হয়ে গেল। রিভলভার বের করে আমাকে প্রায় অ্যারেস্ট করেন আর কি! আমি বদমতলবে ঘুরছি। তাঁর চাকরি খেতে চাই।

সুব্রত এবং অরিজিত অনেক কষ্টে তাঁকে ঠান্ডা করল। তিনি তখন জানালেন, 'কোনও অফিসার লিখবে না কিন্তু ফর্টি সেকেন্ড স্ট্রিটের এই অঞ্চলটা ক্রিমিনালদের স্বর্গরাজ্য। ওই যে দেখুন, ওদের আশিভাগই যে কোনও ক্রাইম করতে পারে।'

হাত বাড়িয়ে পোর্ট অথরিটির বিশাল হলঘরে জমায়েত জনতাকে দেখালেন তিনি। অরিজিত বলল, 'বুঝলাম, কিন্তু যে করেই হোক আমার সুটকেসটা ফেরত পাওয়া দরকার। ওটা না পেলে আমি কীরকম ঝামেলায় পড়ব বুঝতেই পারছেন। ভারতবর্ষে আমেরিকান পুলিশদের খুব সুনাম শুনেছি, প্লিজ, একটু সাহায্য করুন।'

ভদ্রলোক একটু নরম হলেন, 'ঠিক আছে। পাবেন কি না জানি না। তবে আপনারা আমার সঙ্গে চলুন, একটা ডায়েরি করবেন

অফিসারের পেছন-পেছন আমরা পোর্ট অথরিটি থেকে বেরিয়ে এলাম। এদিকটায় বাস চলে না। গলিটাও সরু। ডায়েরি করতে থানায় যাওয়া হচ্ছে কিন্তু সেটা কতদূর তাই বুঝতে পারছি না। অথচ হাতে একদম সময় নেই এখান থেকে কেনেডি এয়ারপোর্টে পৌঁছতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগবে, সিদ্ধার্থ জানিয়েছিল। প্লেন ছাড়তে আর মাত্র দু-ঘণ্টা দেরি আছে। অফিসার অরিজিতের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে আমাদের সামনে হাঁটছিলেন আমি সুব্রতকে সমস্যাটা জানালাম। সুব্রত বলল, 'এই অবস্থায় এমন নিঃস্ব হয়ে অরিজিতের পক্ষে কি যাওয়া সম্ভব?' তার মানে আমাদের পুরো ট্যুরটাই বাতিল হওয়ার উপক্রম বলে মনে হল

মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর একটা গুদামঘরের মতো বাড়িতে ঢুকে অফিসার চিৎকার করলেন, 'হাই এড, এই লোকগুলো টাকা ভরতি সুটকেস হারিয়েছে।'

দেখলাম লম্বা টেবিলের ওপাশে একজন অফিসার বসে কাজ করছেন। চোখ তুলে আমাদের দেখে আবার কাজে মন দিলেন। আমাদের অফিসার ভেতরে গিয়ে একটা জার থেকে কালো কফি ঢেলে চুমুক দিতে লাগলেন কাজ শেষ করে এড জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে?'

অরিজিত তাঁকে ঘটনাটা জানাল। এড বললেন, 'ফেরত পাওয়ার কোনও চান্স আমি দেখছি না। যা হোক ডায়েরি নিচ্ছি, বসুন।'

এই সময় আর একজন অফিসার ঘরে ঢুকেছিলেন। তিনি বললেন, 'চার্লির কাজ।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'চার্লি কে?' মনে হল একটা সূত্র পাওয়া গেছে।'

সঙ্গে-সঙ্গে এড আমার দিকে তাকালেন, 'আপনি কে?'

'ওর বন্ধু!' অরিজিতকে দেখালাম।

'সুটকেসটা কার ছিল?'

'ওর।'

'তা হলে দয়া করে বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন। যান!' তারপর বিড়বিড় করলেন, 'চার্লি কে! মামার বাড়ি।'

আমাদের আগের অফিসার ইঙ্গিত করলেন বাইরে বেরিয়ে যেতে। অতএব আমি আর সুব্রত বেরিয়ে এলাম। অরিজিতকে তখন জেরা করা হচ্ছে। কয় ইঞ্চি সুটকেস, তার রং কী ছিল, ভেতরে যেসব জিনিস ছিল তার বিস্তারিত বিবরণ দাও।

এই সময় আমাদের অফিসারটি বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন, 'সরি। এড খুব রাগি মানুষ। তবে কথা দিচ্ছি খুঁজে বের করতে খুব চেষ্টা করব।'

সুব্রত জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছ, চার্লি কে?'

'একজন এক্সপার্ট চোর। ছিনতাই করে না। নিঃশব্দে মাল সরায়। যদি চার্লি নিয়ে থাকে তা হলে এতক্ষণে ওটা হার্লেমের কোনও ডাস্টবিনে পড়ে আছে।'

'হার্লেম কতদূরে?'

'পাশেই। কিন্তু সেখানে যাওয়ার চেষ্টা কোরো না ভাই। লোকটা খেতে খুব ভালোবাসে।'

'লোকটার দেখা এখনই পাওয়া যায় না।'

'কোথায় পাব? হয় তো কোনও ম্যাকডোনাল্ডে বসে মুরগি চিবোচ্ছে। অনেকগুলো টাকা ফালতু পেয়ে গেল তো!'

'তার মানে মালগুলো সরিয়ে সুটকেসটাই ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে বলছেন?'

'হ্যাঁ। তবে লক না ভাঙলে ওই সুটকেসের দাম কম হবে না। আচ্ছা, ওর ওই সুটকেসে কোনও খাবার ছিল?'

ভেতরে তখন অরিজিত কী স্টেটমেন্ট দিচ্ছে আমরা জানি না। খাবার থাকার কথাও নয়। মাথা নাড়লাম, না। অফিসার আবার ভেতরে চলে গেলেন। আমার মনে পড়ল আজ সকালে অরিজিতের সুটকেসে গোটা চারেক প্যাকেট দেখেছি। ও বলেছে, 'প্যান্টাগো ওভাটা।' আসলে ইসব্গুল। কোনও-কোনও মানুষের মুখ নিয়মিত ইসবগুল সেবনে নরম হয়। অরিজিত সেই শ্রেণির। কিন্তু ইসবগুলকে কি খাবার বলা যায়?

অরিজিত বেরিয়ে এল, 'সুটকেস গোছাবার সময় আমাদের আলাদা কাগজে সবসময় ডিটেলসে লিখে রাখা উচিত কী-কী নিচ্ছি। বাপ্স! চলো।'

'কোথায়? তুমি এই অবস্থায় যাবে?' সুব্রত জিজ্ঞাসা করল।

'না গেলে প্লেনের টিকিটটা নষ্ট হবে। সস্তার টিকিটের দাম ফেরত দেবে না। আমি সিদ্ধার্থকে টেলিফোন করে ব্যাপারটা জানাচ্ছি। ও যদি কিছু টাকার ব্যবস্থা করতে পারে। না গেলে তো পুরো প্ল্যানটাই নষ্ট হয়ে যাবে।' পাশের টেলিফোন বুথের দিকে এগোল সে।

পকেটে মাত্র কুড়ি ডলার নিয়ে এতদূরে যাওয়ার ঝুঁকি আমি কখনও নিতাম না। অরিজিত নিল: ওর বিশ্বাস ট্রাভেলার্স চেকের টাকা কালই পেয়ে যাবে। এই ডায়েরির নম্বর এবং চেকের কাউন্টার নম্বর আমেরিকান এক্সপ্রেসে দেখালে ওরা টাকা দিতে বাধ্য।

টিকিট তো ছিলই। নরম গদির বাস পোর্ট অথরিটি থেকে বের হল। নিউ ইয়র্ক শহরকে অনেকে 'দি বিগ আপেল' বলে থাকেন। হয়তো এর আকৃতি এবং রসালো জীবনযাত্রার জন্যে। পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম শহরটিকে আবিষ্কার করেছিল ফরাসি নাবিকেরা এবং ওলন্দাজ জাহাজিদের

হয়ে আসা এক ইংরেজ প্রথম বসবাস শুরু করেন। পৃথিবীর সব দেশের মানুষ এখানে এসে এক সময় আমেরিকান হয়ে গিয়েছে। পাঁচটা দ্বীপ নিয়ে নিউইয়র্ক। আমাদের বাস যে অংশ দিয়ে চলেছে সেটা সেন্ট্রাল আইল্যান্ড অথবা ম্যানহাটন, ঠিক হাডসনের ধারে। হাডসন, ইস্ট আর হার্লেম নদী শহরটিকে জড়িয়ে রেখেছে। বাকি চারটে দ্বীপ হল, কুইনস, ব্রুকলিন, ব্রঙ্কস, স্ট্যাটেন আইল্যান্ড। উত্তর থেকে দক্ষিণে টানা রাস্তাগুলোকে বলা হয় এভিনিউ, পূর্ব থেকে পশ্চিমে গিয়েছে স্ট্রিট। গতবার এসে আমি এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং কিংবা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার দেখিনি, এবারও নয়। নিউইয়র্কে যেটা দেখার বস্তু তা হল মানুষ। এমন বিচিত্র মানুষের সমাবেশ আর কোথায় আছে কি না আমি জানি না।

পৃথিবীর যে-কোনও দেশ, অস্ট্রেলিয়া ছাড়া, আমেরিকার থেকে স্বভাবে চরিত্রে আলাদা। এই দেশ আমেরিকানদের মাতৃভূমি নয়। মাত্র কয়েকশো বছরে ইতালি, পর্তুগাল, স্পেন এবং অবশ্যই ব্রিটেন থেকে আসা মানুষেরা একটু-একটু করে আমেরিকান হয়ে গেছেন। মনোজ লিখেছিল, 'আমেরিকা মূলত ইমিগ্রান্টদের দেশ, কাজেই আমেরিকান সংস্কৃতির পাশাপাশি এখানকার প্রায় প্রত্যেকটা মানুষেরই আরেকটা শেকড় আছে। (যারা পরে এসেছে) যত জ্বালা যন্ত্রণা ওই শহরটাকে নিয়ে। এখানকার স্থায়ী বাঙালি বাসিন্দারাও একই অর্থে কোনও ব্যতিক্রম নয়। আমেরিকার বাঙালিদের স্থায়ী বসবাসের ইতিহাস কুড়ি পঁচিশ বছরের বেশি নয়।'

নিউইয়র্কের রাস্তায় হাঁটলে মানুষের চেহারায় এই ছবিটা বোঝা যায়। কিন্তু তাঁদের ফেলে আসা দেশের মাটিতে শেকড় আছে কি না তা বলা মুশকিল। পুরো জীবনযাপন এখন এক মালার মতো যার কোনও সুতো নেই। এই দেশ সেই সুতোটা একটু-একটু করে তৈরি করছে যে বোধ দিয়ে তা হল আমরা আমেরিকান। মুশকিল হল, প্রথম প্রজন্মের ভারতীয়রা নিজেদের ভারতীয় বলে ভাবতে পারত না দেশে থাকার সময়, নাগরিকত্ব নিয়ে ওদেশে থেকে আমেরিকান বলে ভাবাটা তাদের আসে না।

এলডোরডার টানে যারা এসেছিল কয়েক শতাব্দী ধরে তাদের সংখ্যার তুলনায় আমেরিকার কালোদের সংখ্যা কম। আবার পূর্বাঞ্চলে ওরা যত বেশি সংখ্যায় আছে পশ্চিমাঞ্চলে অনেক কম। এরাও কিন্তু শিকড়সন্ধানী।

যখন কালো মানুষদের আমেরিকায় আনা হয়েছিল তখন তারা ছিল আফ্রিকান, বিদেশি। তাদের জীবনযাপন, সংস্কৃতি আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে এই মাটির কোনও মিল ছিল না। পশ্চিম আফ্রিকা থেকে ষোলোশো উনিশ সালে যে ক্রীতদাস বাহিনীকে আনা হয়েছিল তারা কখনও ভাবেনি যে বংশধররা একদিন নাগরিক হবে, আমেরিকান বলে পরিচিতি পাবে। বিদেশিরা যখন দেশটায় জুড়ে বসল তখন দেখল এদেশীয় আদিবাসীদের দিয়ে কাজ করানো অসম্ভব। তারা দলবদ্ধ, অনমনীয় এবং নির্জনে থাকতে ভালবাসে। নিজস্ব প্রয়োজনেই সাদা মানুষেরা কালোদের এখানে এনেছিল যারা যন্ত্রের মতো কাজ করত। রেডিয়োর নব ঘুরিয়ে যেমন মুহূর্তেই যে-কোনও স্টেশন ধরা যায় তেমনি সাদা মনিবের ইচ্ছে পূর্ণ করত নিমেষেই সেই কালোরা।

কিন্তু পরবর্তীকালে দৃশ্য পালটালে দেখা গেল স্বাধীন আমেরিকায় কালো মানুষেরা অনেক কথা স্পষ্ট বলতে পারছে যা সাদারা পারেনি। তাদের গানে রক্তমাংসের গন্ধ পাওয়া গেছে। জীবনের কথা বারংবার সেই গান গল্পে ফুটে উঠেছে। এই জীবন কিছুটা বুনো কিছুটা মেকি-ভদ্রতা ছাড়াই ব্যক্ত। যেমন,

'টেক্সাসে আমার বাড়ি, এখানে কী করছি?
সেই টেক্সাসে আমার বাড়ি, কী করছি এখানে?
হ্যাঁ, কিছু ভালো হুইস্কি, শিশু আর মেয়েমানুষ
নিয়ে এসেছে এখানে।'

অথবা,

'তুমি যদি প্রচুর মেয়েমানুষ চাও
শিকাগোর মিলে কাজ করছ না কেন?
তোমার যদি কিস্যু না দেওয়ার থাকে,
শুধু মনের ইচ্ছেটা খুলে বলো।'

অথবা

প্রেমিক প্রেমিকাকে বলছে—
'আমি চাই না তুমি ক্রীতদাসী হও,
আমি চাই না তুমি সারাদিন কাজ করো,
আমি চাই না তুমি খুব সৎ থাকো,
আমি শুধু তোমার পাশে শুয়ে থাকতে চাই।'

এগুলোই কালোদের গান ছিল। হয়তো আছে। দিন পালটাচ্ছে। কিন্তু বলার বিষয় বদলে গেলেও মনটা বদলায়নি। খুব সম্প্রতি একটা গান শুনেছিলাম। পেরি ব্র্যাডফোর্ডের ক্রেজি ব্লুস। গানের কথা এইরকম,

'নির্ঘুম রাত কেটে যায়
আহারে রুচি নেই আদৌ
কারণ যাকে আমি ভালোবাসি
তার ব্যবহার দুঃখ দেয়।'

একেবারে সরাসরি মনের কথা। কোনও বাহানা নেই। সাজানো কথার আড়াল নেই। এইটেই ওদের সাদা আমেরিকানদের থেকে আলাদা করেছিল। কিন্তু হঠাৎ কী হল। ওদের এখনকার ছেলেমেয়েদের একাংশ হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে নিজেদের ধ্বংস করতে নেশার দিকে হাত বাড়াল হিংস্র মেজাজ তৈরি করে ফেলল। মনে পড়ছে সিদ্ধার্থর কাছে শোনা একটা ঘটনা। কলকাতা থেকে এক দম্পতি এসে কুইনসে আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছিলেন আত্মীয় তাঁদের রাস্তাঘাটে কালোদের আচরণ সম্পর্কে গল্প বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। একদিন দম্পতি ঘুরেটুরে সন্ধে নাগাদ বাড়িতে ফিরছেন যখন তখন একজন কালো মানুষ তাঁদের পেছনে হাঁটছিল। এঁরা এমন ভয় পেয়ে গেলেন প্রায় দৌড়তে লাগলেন। বারোতলা বাড়ির সামনে এসে দেখলেন লিফট ওপরে আর কালো মানুষটিও সিঁড়ি ভেঙে উঠছে। ওঁরা আরও আতঙ্কিত। লিফট এল। ভেতের ঢুকে নিজেদের ফ্লোরের বোতাম টিপতেই দরজা বন্ধ হল এবং কালো মানুষটিও ওঁদের পাশে এসে দাঁড়াল। ভদ্রমহিলা কেঁদে উঠলেন, সঙ্গে যা-যা দামি জিনিস ছিল সব কালো মানুষটির হাতে তুলে দিয়ে মিনতি করতে লাগলেন প্রাণে না মারতে। লিফটের দরজা খুলে যেতে দম্পতি দৌড়ে গিয়ে তাঁদের আত্মীয়ের দরজায় বেল টিপলেন। আত্মীয় দরজা খুললেই তাঁরা উত্তেজিত হয়ে ঘটনাটা জানিয়ে বললেন, 'অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে গেছি।' দরজা বন্ধ করতে না করতেই আবার বেলের আওয়াজ। আত্মীয় দরজা খুলে হাসি নিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আরে মিস্টার জোন্স, কী খবর?'

বাইরে দাঁড়ানো কালো মানুষটি বললেন, 'তোমার গেস্ট যে কেন অত ভয় পেয়ে আমার হাতে এসব জিনিস তুলে দিলেন বুঝতে পারছি না। যা হোক, তুমি এগুলো ওদের দিও।' মিস্টার জোন্স আত্মীয়টির প্রতিবেশী।

কেনেডি এয়ারপোর্টে যখন পৌঁছলাম তখন প্লেন ছাড়তে আধ ঘণ্টা দেরি। কিন্তু সব সাহায্য পাওয়া গেল। আমেরিকান এয়ার লাইন্সের প্লেনে বসে জানলাম আমাদের ছয় ঘণ্টা ধরে উড়তে

হবে। কিন্তু সময় লুকোচুরি খেলবে। নিউইয়র্কের রাত লস এঞ্জেলসের সন্ধে। একটা লম্বা ঘুম দেওয়া যেতে পারে। হঠাৎ মনে পড়ল অরিজিতের পকেটে মাত্র কুড়ি ডলার রয়েছে। ওর দিকে তাকালাম। যিনি বলেছেন মুখ মানুষের মনের দর্পণ তিনি অরিজিতকে দেখেননি।

॥ ৫ ॥

পানামা কোম্পানির এই বিমানটি পূর্ব থেকে পশ্চিমে পৌঁছবে ঠিক ছয় ঘণ্টায় সে সময়ে দুবারের বেশি কলকাতা থেকে বোম্বে ঘুরে আসা যায়। যখন পৌঁছল তখন ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দিতে হবে ঠিক তিন ঘণ্টা। অর্থাৎ আমরা কিছুটা সময় পেয়ে গেলাম উপরি। কলকাতায় যে তারিখে প্লেনে উঠেছি পশ্চিমের নিউইয়র্কে বত্রিশ ঘণ্টা পাড়ি দিয়েও সেই তারিখেই পৌঁছচ্ছি। প্রায় একদিন জীবনকে ফিরিয়ে দেওয়া। সুব্রত বলেছিল, এইভাবে যদি সূর্যের দিকে আমরা এগিয়ে যেতাম তা হলে একসময় অনেক-অনেক বছর ধরে সময় স্থির হয়ে থাকত, আমরা বুড়ো হতাম না। কিন্তু না, বত্রিশ ঘণ্টা পরেও যদি একই তারিখ থাকে তাহলে কামানো গালে খড়খড়ে দাবি বের হয় কেন? এ যেন ভাবের ঘরে চুরি করা।

তবু ছয় ঘণ্টা কে তিন ঘণ্টা মেনে যখন লস এঞ্জেলসে নামলাম তখন রাত দশটা। আর আহা, এ তো আমাদের শরতের আবহাওয়া। বিমানবন্দরেই লক্ষ করেছি কালো মানুষের ভিড় কম। অরিজিত ইতিমধ্যে তার সম্পত্তি হারিয়ে বিমর্ষ ছিল, এখানকার আবহাওয়া তাকে বিন্দুমাত্র উৎসাহিত করল না। নিউইয়র্কের ঠান্ডার হাত থেকে বেঁচে গেছি এই আনন্দটাও অবশ্য আমরা দুবার বলাবলি করে থেমে গেলাম। এক যাত্রায় কারও ক্ষতি হলে একটু ম্রিয়মাণ থাকাই ভালো।

লস এঞ্জেলস চিরকালই আমাদের টানছে। যারা নাটক কিংবা চলচ্চিত্রের সঙ্গে সামান্য জড়িত তাদের টানবেই। অরিজিতের স্ত্রীর বান্ধবী আমাদের নিতে আসবেন এয়ারপোর্টে। তাঁর কাছেই থাকার কথা। অতএব এখনই অরিজিতের ডলারের প্রয়োজন নেই। অপেক্ষা করার সময় অরিজিত জানাল সে অনেককাল ভদ্রমহিলাকে দ্যাখেনি। টেলিফোনেই কথা হয়েছে। শুধু মনে আছে তিন সুন্দরী কোন এককালে গড়িয়াহাটে অনেক তরুণের হৃদকম্প সৃষ্টি করত। তাঁদের একজন ওর স্ত্রীর বান্ধবী ছিল। আমরা অভয় দিলাম, একজন বাঙালি মহিলা আসবেন আর আমরা তাকে চিনতে পারব না, এ হতেই পারে না। বাঙালি মহিলাদের দেখে দেখেই তো এতকাল জীবন কাটালাম।

আমাদের সহযাত্রীরা বেরিয়ে গেলেন। ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের পাশে তিনজন দাঁড়িয়ে আছি দুটো সুটকেস নিয়ে। এখানে দেখছি কলকাতার মতো 'বাবু কোথায় যাবেন' বলার রেওয়াজ ট্যাক্সিওয়ালাদের আছে। কিন্তু আমরা অনড়, বান্ধবী আসবেন। ইতিমধ্যে দুজন শাড়িপরা মহিলাকে দেখে হাত নেড়ে বেকুব হয়েছি। এই সময় তিনি এগিয়ে এলেন। ছিপছিপে, প্রচণ্ড ফরসা, মুখেও সামান্য মেদ নেই, পরনে পাজামা প্যান্ট আর টি শার্ট। দুটোরই রং কালো। কবজিতে সোনার চেন। অরিজিত চাপা গলায় বলল, 'হয়তো, কিন্তু কি বদলে গিয়েছে!'

ততক্ষণে মহিলা আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'অরিজিত? কী মোটা হয়ে গেছ! আরে, আমাকে চিনতে পারছ না? আমি নূপুর।'

অরিজিত চিরকালই যা করে, গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'দেখছিলাম। যাক, এসে গেছ তাহলে। আলাপ করিয়ে দিই, সুব্রত নায়েক—উকিল, সমরেশ মজুমদার—লেখক।'

সুব্রতর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমার দিকে ফিরে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অদ্ভুত হাসলেন মহিলা, 'আমি নূপুর, নূপুর দত্ত।'

এরকম পরিস্থিতি আমাকে খুব গোলমালে ফেলে। এতগুলো বছরে কোথায় কোন মহিলার

সঙ্গে হয়তো সামান্য আলাপ হয়েছিল তা সবসময় স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারি না। একটু বোকা-বোকা লাগে নিজেকে এই সময়। বললাম, ও, নমস্কার!'

'ব্যস! এইটুকুই!' নূপুর হাসলেন। তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন, 'চল, ওইখানে গাড়ি পার্ক করেছি। তোমাদের মালপত্র নিয়ে যেতে পারবে তো?' বলেই এগিয়ে গেলেন।

অরিজিত চাপা গলায় বলল, 'আর মালপত্তর।'

আমি কিন্তু হকচকিয়ে ছিলাম। ভদ্রমহিলা অমন নাটকীয় ভঙ্গিতে আমার সঙ্গে কথা বললেন কেন? এই দুনিয়ার কোনও পরিচিত মুখের সঙ্গে ওঁর মিল খুঁজে পাচ্ছি না। না, আমি নিশ্চিত কখনও আলাপ হয়নি। তাহলে? অরিজিতের কাছে প্লেনে বসে শুনেছি ভদ্রমহিলা থাকতেন দক্ষিণ কলকাতায়। বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে চলে যান বিদেশে। ঘুরে আমেরিকায়। কিছুদিন আগে স্বামী মারা গিয়েছেন। এরকম কোনও মহিলাকে আমি চিনি না।

কালো রঙের একটা ছোট গাড়ির পাশে একটি যুবক দাঁড়িয়েছিল। নূপুর তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। কলকাতা থেকে এসেছেন। আগামীকাল চলে যাবেন। একটা রাত আমাদের একটু কষ্ট করতে হবে। তবে তিনি ব্যবস্থা করে রেখেছেন। ওঁর বাড়ির কাছেই এটা ভালো মোটেলে আমাদের জন্যে ঘর ভাড়া করেছেন। একটাই রাত, আগামীকালই আমরা ওঁর বাড়িতে চলে আসতে পারব।

গাড়িটা ছোট। পাশাপাশি তিনজনে বসে বেশ অস্বস্তি হল। একটা রাত মোটেলে কাটানো মানে কিছু ডলার খরচ। ইতিমধ্যে খোঁজ নিয়ে দেখেছি বাইশ থেকে পঁচিশ ডলারে মোটেলে ঘর পাওয়া যায়। আমরা তিনজনে তাতে সেঁধিয়ে যেতেও পারি। অরিজিতের পক্ষে অসম্ভব হলেও আমরা দুজনে ম্যানেজ করে নেব। আমরা তো ঠিকই করেছি ফিরে যাওয়া পর্যন্ত যা খরচ হবে আমরা দুজনে সেটা দেখব। একটু কষ্ট হবে কিন্তু আটকে থাকবে না। গাড়ি চালাতে-চালাতে নূপুর বললেন, 'এত রাত্রে এদিকে একা আসতে পারতাম না। একা কোনও মেয়েকে গাড়ি চালাতে দেখলেই ওরা ঝামেলা করে।'

অরিজিত জিজ্ঞাসা করল, 'কারা?'

'নিউ ইয়র্কের হার্লেমের মতো এখানে কিছু কালো মানুষ আছে যারা কাজকর্ম করতে চায় না। তাদের সঙ্গে মিশেছে কিছু সাদা বদমায়েশ।'

অর্থাৎ লস এঞ্জেলসেও কালোদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা আছে। আবার বলছি, চুরাশিতেও এটা দেখিনি। এই সাত বছরে এমনকী নৈরাশ্য জমল যে ওদের একশ্রেণি এমন বেপরোয়া হয়ে গেল? রাস্তায় তো একটিও কালোমানুষ দেখছি না। অবশ্য, নিউ ইয়র্ক এবং সানফ্রান্সিসকো ছাড়া আমেরিকার শহরগুলোর রাস্তায় কেউ হাঁটে বলে মনে হয় না। লস এঞ্জেলসে তো নয়ই। মনে হল বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আসার অজুহাত হিসেবে নূপুর ওই গল্প শোনাচ্ছেন। বাড়িতে যদি স্থানাভাব হয় তাহলে বন্ধু থাকবে জেনেও আজ উনি আমাদের আসতে বললেন কেন? কিন্তু এসব প্রশ্ন মনেই রইল, আমরা রাস্তা দেখছিলাম। রাত্রের লস এঞ্জেলসের রাজপথ ইতিমধ্যে চমকিত করছে। একটা গল্প শুনেছিলাম। রাত্রে এক সরাইখানায় দুই মুসাফিরে দেখা। নানান কথার পর প্রশ্ন উঠল কী দেখে একটা শহরকে চেনা যায়। যিনি কনিষ্ঠ তিনি জানালেন, বাজার দেখে। শহরের বাজারটিতে গিয়ে কিছুক্ষণ কাটাও, শহরটার চরিত্র বুঝতে পারবে। প্রবীণ নাকি বলেছিলেন, উঁহু! কোনও শহরকে চিনতে হলে তার পতিতালয়ে যেতে হবে তোমাকে। পাপীতাপীদের পাপের বহর দেখে শহরের পুণ্যবানদের অবস্থা জানতে পারবে। আমার ধারণা একটু আলাদা। শহরকে চেনা যায় তার পথঘাট দিয়ে। লস এঞ্জেলসের পথ বলে দেয় শহরটা ভদ্রমানুষদের পক্ষে বাসযোগ্য। আর এসব দেখলেই আমার কলকাতার জন্যে কষ্ট হয়। পথঘাটের স্বল্পতাই কলকাতার মানুষকে নিয়মভাঙার প্রবণতা এনে দেয়। ঘিঞ্জি রাস্তা, ট্রাফিক আইন মানার কোনও ইচ্ছেই নেই, ফুটপাতে হাঁটতে পারা স্বপ্নাতীত ব্যাপার আর এইসব মিলিয়ে একটা শহরের মানুষকে বিশৃঙ্খল করে তুলেছে। তামাম আমেরিকায় আইন

আছে, মানুষের সুবিধে দেখার জন্যে। রাজনৈতিক দলগুলো সেটাকে নিষ্ক্রিয় করতে সাহস পায় না। আমাদের দেশে ঠিক এর উলটো ব্যাপার ঘটে।

যে জিনিসটা আমাকে এখনও অবাক করে রেখেছে তা হল আমাদের কিছু বানানো ধারণা এখনও অনেকে লালন করেন। আমরা এখন কথায়-কথায় জাতীয় ঐক্যের কথা বলি। পঞ্জাব থেকে অসম সবাই গায়ে গা মিলিয়ে ভাই-ভাই বলব। শক হুন পাঠান মোগল এখানে এসে লীন হয়ে গেছে, কেউ ফিরে যায়নি; অতএব সবাই ভারতবাসী। গান গেয়েছি, ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। কবে নিয়েছিলাম যে আবার নেওয়ার আশা দেখানো হচ্ছে জিজ্ঞাসা করলে পণ্ডিতরা ইতিহাস খুলে হাস্যকর প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করবেন। পঞ্জাব বা অসমের কথা ছেড়ে দিলাম, দক্ষিণের রাজ্যগুলোও মনেপ্রাণে দিল্লির চাপানো বক্তব্যকে মানতে চায় না। আর আমাদের পশ্চিমবাংলা, যার দ্বিগুণ হল নিউজার্সির মতো একটা প্রদেশ, তার জেলায়-জেলায় শুরু হয়ে গেছে বিচ্ছিন্নতাবাদের হুমকি। পারলে দার্জিলিং, ডুয়ার্স কিংবা ঝাড়গ্রাম এখনই স্বাধীনতা চেয়ে বসতে পারে। কেউ-কেউ চেয়েছে। অনেকেই বলেছেন এত বিভিন্নমতের ধর্মের ভাষার মানুষকে এক জায়গায় আটকে রাখা মুশকিল। এই তো, রাশিয়ার কোনও-কোনও প্রদেশও মস্কো থেকে আলাদা হয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু বিস্ময় লাগে যখন দেখি কয়েকটা ভারতবর্ষের সমান একটা আমেরিকায় বিচ্ছিন্নতাবাদের স্লোগান এখনও ওঠেনি। আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানরা না হয় সংখ্যায় নগণ্য কিন্তু এখানকার নাগরিকদের ভাষা ধর্ম সংস্কৃতি তো সারা পৃথিবী থেকে ছিটকে আসা। তাহলে? এদেশের সংবিধান যখন তৈরি হয়েছিল তখন নিশ্চয়ই বিষয়টি নিয়ে ভাবা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার তাবৎ বৈদেশিক ব্যাপার দেখবে। অভ্যন্তরীণ ব্যাপারটা দেখাশোনার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের ওপর। এক একটি স্টেট তাদের সুবিধেমত আইন তৈরি করে নিয়েছে। একের সঙ্গে অন্যের অনেক ক্ষেত্রেই তাই মিল নেই। একজন আমেরিকান নাগরিককে যে প্রদেশে থাকবেন সেই প্রদেশের আইন মানতে হবে। এই যে মূল কাঠামোয় থেকে নিজস্ব স্বাধীনতা বজায় রাখার অধিকার ওঁরা পেয়েছেন তাতেই বিচ্ছিন্নতাবোধ তৈরি হওয়ার সুযোগ পায়নি। এতে অবশ্য কিছু অসুবিধেও হয়। যে প্রদেশে কোনও একটি ব্যাপারে আইনের কড়াকড়ি নেই সেখানে সুযোগসন্ধানীরা ভিড় জমান। কিন্তু এখন পর্যন্ত ব্যাপারটা মাত্রা ছাড়ায়নি। দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করছেন জনসাধারণ। তিনিই কেন্দ্রীয় সরকার গড়ছেন। আবার প্রাদেশিক সরকার গড়তে ভোট দিয়েছেন ওই সাধারণ মানুষই। ফলে জাতীয় ঐক্যে চিড় ধরার কোনও ইঙ্গিত এখন পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা কিছু লোককে ভোট দিয়ে পার্লামেন্টে পাঠালাম। তাঁরা অনেক সময়েই দল ভাঙাভাঙির খেলা করে এক একজনকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে দেন। দক্ষিণ থেকে একটিও আসন না পেয়ে পার্লামেন্টে যদি সংখ্যাধিক্যের জোরে কেউ প্রধানমন্ত্রী হন তাহলে তাঁকে দক্ষিণের মানুষ মানবে কেন? আবার এবার চন্দ্রশেখরের প্রধানমন্ত্রিত্ব, এটাও তো গণতন্ত্রের বিধান। দেশের ভাঙন আমরা নিজেরাই ডেকে আনছি। ওদিকে মিয়ামি এদিকে সানডিয়াগো, কয়েক হাজার মাইলের ফারাকের দুটি মানুষ ভাবেন তাঁদের ভোটেই বুশ সাহেব ক্ষমতায় আছেন। বুশবিরোধী ভোটাররাও এটাকে মানতে বাধ্য হন।

লক্ষ্য করেছি, এখানে কেউ দূরত্ব মাইল কিলোমিটারে বলে না। বলে সময়ে। যেমন, এই তো, আধঘণ্টার পথ। সেটা যে চল্লিশ কিলোমিটার বুঝতে সময় লেগেছিল। নূপুর বলেছিলেন, আমাদের পঁয়তাল্লিশ মিনিট যেতে হবে। তার মানে কলকাতা থেকে ব্যান্ডেল ছাড়িয়ে। অথচ রাস্তার কল্যাণে টেরই পেলাম না।

দূর থেকে হলিডে ইনের নিওন সাইন লক্ষ করছিলাম। এরা আমেরিকান মোটেলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কুলীন। দশতলা মোটেলের চেহারা আমাদের হোটেল হিন্দুস্থানের চেয়ে কম কিছু নয়। গাড়ি ঢুকল সেই মোটেলের চত্বরে।

এর আগে যেসব মোটেল দেখেছি সেগুলো বড়জোর দোতলা, শহরের একটু বাইরে,

অনেকখানি জায়গা রাখা হয় গাড়ি পার্ক করার জন্যে। মোটরের যাত্রীদের নৈশাবাস হল মোটেল। হলিডে ইনকে মোটেল বলতে একটু ইচ্ছে করছিল না। দেখলাম নূপুরের সঙ্গে রিসেপশনিস্টের আগেই কথাবার্তা হয়েছে। চাবি নিয়ে খাতায় নাম সই করিয়ে আমাদের ছয়তলায় নিয়ে এলেন। কার্পেটে মোড়া প্রশস্ত ঘর। দুটি বড় বিছানা। বাথরুমেও চমক। কাঁচের বিশাল জানলার বাইরে লস এঞ্জেলস ছটফট করছে আলো জ্বেলে। চোখ জ্বলে যায়।

রাতের খাওয়া প্লেনেই সেরেছি আমরা। অগত্যা নূপুর বিদায় নিলেন। যাওয়ার আগে জানালেন, যে কোনও প্রয়োজনে আমরা যেন তাঁকে ফোন করি। আর আগামীকাল সকালেই তিনি আমাদের দর্শন দেবেন। দরজা টেনে দেওয়ার আগে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গুডনাইট সমরেশ।'

তিনজন একলা হতেই দেখা গেল মাথায় চিন্তা জমেছে, এই মোটেলের ঘর ভাড়া কত? অরিজিত ততক্ষণে টেলিফোনের পাশে রাখা মোটেলের কাগজপত্তর ঘেঁটে ফেলেছে। ঢোকার সময় রিসেপশন আমাদের অ্যাডভান্স দিতে বলেনি। এই কাজটা যদি নূপুর করে ফেলে থাকেন তাহলে খুবই অস্বস্তিকর ব্যাপার হবে। মিনিট পনেরো বাদে নূপুরের ফোন এলে অরিজিত ধরল। কোনও অসুবিধে হচ্ছে না বলে জানাল। তারপর জানতে চাইল সবিনয়ে। নূপুর বললেন, 'না দিইনি। কাল চেক আউটের সময় দিলেই চলবে। মাত্র তো ষাট ডলার ভাড়া।'

টেলিফোন রেখে অরিজিত বলল, 'কাল থেকে আমি সত্যিকারের নিঃস্ব।'

আমরা তিনজনেই বেশ বিরক্ত হয়েছিলাম। ষাট ডলার মানে বারোশো টাকার ঘরের তো কোনও প্রয়োজন ছিল না। পঁচিশ ডলারের মোটেলে স্বচ্ছন্দে ওঠা যেত। আমাদের পকেটের যা অবস্থা, অরিজিতের সুটকেস খোয়ানোর পরে, এই মোটেল তো বিলাসিতা। হ্যাঁ, এ কথা ঠিক, যে-কোনও আমেরিকানদের কাছে ষাট ডলার মানে আমাদের ষাট টাকার সমান। কিন্তু আমরা তো সেটা কুড়ি একুশ গুণ দিয়ে কিনেছিলাম। নরম বিছানায় শুয়েও তাই স্বস্তি হচ্ছিল না। এখন থেকে আমার এবং সুব্রতর যা আছে তাকে তিনভাগ করে খরচ চালাতে হবে। নূপুরের এইরকম আচরণ যদি আর বেশি হয় তাহলে বিপাকে পড়তে হবে।

কাত হয়ে শুয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'নূপুরকে তুমি ওর বিয়ের আগে চিনতে?'

অরিজিত ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ। শি ইজ এ নাইস লেডি। আরে, তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, ও তো জলপাইগুড়ির মেয়ে।'

জলপাইগুড়ির মেয়ে? অবাক হলাম। নূপুর? সঙ্গে সঙ্গে জল তোলপাড় হল। আমি স্কুল শেষ করে কলকাতায় পড়তে আসার পর জলপাইগুড়ির মেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাইনি। ছুটিছাটায় যখন গিয়েছি তখন দিনগুলো গিয়েছে চকোলেটের মতো গলে। আমার যা কিছু ভালো স্মৃতি তা এই ছাত্রাবস্থায়। চোখ বন্ধ করে শুয়ে-শুয়ে হঠাৎ অস্থির হলাম। জীবন গল্পের চেয়েও বিস্ময়কর, মানি, তাই বলে এমন বিস্ময়কর! কিন্তু আমার ধারণা তো ভুল হতেই হবে। অরিজিতকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওঁর বাবা বা মায়ের নাম জানো?'

'সরি।' অরিজিত গম্ভীর গলায় জবাব দিল।

সুব্রত চিমটি কাটল, 'জলপাইগুড়িতে কোনও মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলে তার বাবা মায়ের নাম জানতে চাইতিস নাকি?'

উত্তর দিলাম না। অন্ধকার ঘরে কাচের জানলা চুঁইয়ে আসা রাত্রের আকাশের আলোর দিকে তাকিয়ে মনে হল, নাঃ, হতেই পারে না। আমি যাকে চিনতাম সেই নূপুর ছিল খুব রোগা, চোখে চশমা তবে রং ছিল এমনি, ফিনকি দেওয়া। স্মৃতি বলছে সে ছিল খুবই গোবেচারা। স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ত। দিশি ফ্রক পরে অনেক লজ্জা নিয়ে হাঁটত। কিন্তু সেই মেয়েকে নিয়ে আমার কোনও কৌতূহল ছিল না। সে ছিল, এই পর্যন্ত।

অস্বস্তি এত বেড়ে গেল যে সময় ভুলে টেলিফোনের বোতাম টিপলাম। একটি মেয়েলি গলা জানান দিল মার্কিন উচ্চারণে। তাকে জানালাম, আমি সমরেশ; নূপুরের সঙ্গে কথা বলতে চাই, যদি অসম্ভব না হয়। মেয়েটি বলল, 'মা বোধহয় শুয়ে পড়েছেন, একটু ধরুন।'

হঠাৎ মনে হল আমি তো কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারতাম। এই আবেগতাড়িত কার্যকলাপ চিরকাল আমাকে অস্বস্তিতে নিয়ে যায়। তবু তো শিক্ষা হল না। তাই ঘুমন্ত এক ভদ্রমহিলাকে বিরক্ত করা। নূপুরের গলা শুনলাম, বলুন স্যার। কোনও অসুবিধে হয়েছে?'

'না, না। আমি দুঃখিত, আপনি ঘুমাচ্ছেন জানলে—।'

'ও হো। ঠিক আছে। আমি ঘুমাইনি। মেয়ে নাম বলতেই উঠে এলাম।'

'মেয়ে কত বড় হল?'

'ও? ষোলো।'

'এমনকী বড়?'

'বাবা মায়ের কাছে অবশ্য নয় কিন্তু বাইরের লোকের চোখে অবশ্যই।'

'আপনি জলপাইগুড়িতে থাকেতন?' এবার প্রসঙ্গে এলাম।

একটু হাসির শব্দ, 'একদা। আমার মেয়ের বয়স পর্যন্ত।'

'আপনারা কি তিন বোন?'

এবার হাসির ঝাড় উঠল যেটা থামতে সময় লাগল। তারপর বললেন, 'আমি কিন্তু প্রথম যখন শুনেছিলাম আপনাকে ঠিক প্লেস করতে পারিনি।'

'কী শুনেছিলেন?'

'আপনার উপন্যাসে আমরা জায়গা পেয়েছি। আমরা তিন বোন।'

'নিশ্বাস বন্ধ হল, 'আপনি পড়েছেন?'

'নাঃ। ওট তো 'দেশ' পত্রিকায় বেরিয়েছি। 'দেশ' তখন রাখতাম না। বই হয়ে কি বেরিয়েছে। এই দেখুন, কী বোকার মতো জিজ্ঞাসা করলাম। আপনার লেখা বই না হয়ে পড়ে থাকবে নাকি! কলকাতা থেকে খবর পেয়েছিলাম। কী লিখেছিলেন?'

সামলে নিলাম, 'বানানো গপ্পো।'

'তাই? একটুও সত্যি নেই?' একটু চুপচাপ, তারপর বললেন, 'আপনাকে আজ দেখার পরে মনে করার চেষ্টা করেছিলাম, কিছুতেই পারলাম না।'

'সেটাই স্বাভাবিক। আমি খুব সাধারণ ছিলাম।'

'আমাদের কথা এতদিন কী করে মনে রাখলেন?'

'মনে শুধু ভাবনার স্মৃতি ছিল। আপনারা অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন।'

'দূর! আমি না। দিদি ছিল। দারুণ। আমার বোনও। আমি তো তখন খ্যাংরাকাঠির ওপর আলুর দম ছিলাম।' আবার হাসি।

'ঠিক আছে। আবার ঘুমাতে যান। কাল দেখা হবে।'

টেলিফোন নামিয়ে রাখামাত্র পাশের বিছানায় শুয়ে সুব্রত জিজ্ঞাসা করল, 'কেসটা কী বল তো? হঠাৎ পুরোনো দিন সামনে এসে গেল?'

সেই মুহূর্তে কথা বলতে আমার ভালো লাগছিল। বললাম, 'দশ বছর আগে দেশ পত্রিকায় প্রথম ধারাবাহিক লিখেছিলাম, উত্তরাধিকার।'

অরিজিত মন্তব্য করল, 'ওটা না লিখলে তুমি আজ লেখক হতে পারতে না।'

কথাটা উপেক্ষা করলাম, 'উপন্যাসে আমার শৈশব, কৈশোর এবং তরুণকাল হালকা মিশেছিল। অনেকের ভালো লেগেছিল। চা-বাগান আর জলপাইগুড়ি শহর ছিল পটভূমি। দেশে যখন বের হত তখন জলপাইগুড়ির মানুষ পরিচিত চরিত্র খুঁজে নিত অনায়াসে। যাকে নিয়ে হয়তো লিখিনি

সে-ও তাঁদের কাছে চরিত্র হয়ে যেত। এমনকী আমার মাকে শুনতে হয়েছে তিনি নাকি সৎমা। সত্যি, উত্তরবঙ্গের মানুষ বেশ ইনভলভড হয়ে গিয়েছিল ওই উপন্যাসটির সঙ্গে।'

সুব্রত উকিলি ঢঙে বলল, 'এসব নতুন তথ্য নয়। তিন বোনের ব্যাপারটা বল।'

হাসলাম, 'জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে পড়তাম। গুডি বয় ছিলাম না। আমাদের স্কুলের পাশেই এক ভদ্রলোক থাকতেন। তাঁর স্ত্রীকে সবাই খুব প্রগতিশীল মহিলা বলত। ওঁদের তিন মেয়েকে সেইসময় জলপাইজগুড়ির সেরা সুন্দরী বলা হত। আমার তখন পনেরো বছর বয়স। শেষের কবিতা এবং চরিত্রহীন লুকিয়ে পড়ে ফেলেছি, মনে নতুন আবেগ। কিন্তু বয়স এত কম যে মুখ নামিয়ে সরে থাকতেই ভালো লাগত। তারপর একসময় ওরা চলে গেল কলকাতায়। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে মনে হত খাঁ খাঁ করছে। কিন্তু উত্তরাধিকারে উর্বশী মেনকা এবং রম্ভার কথা পড়তেই জলপাইগুড়ির লোক বলল এরা ওরাই। অস্বীকার করলেও কেউ শোনেনি।'

'তুই কখনও যাসনি ওদের বাড়িতে?'

'একদিন। দাদু কি একটা প্রয়োজনে পাঠিয়েছিলেন ওদের বাবার কাছে। তখন আর একটু কাছ থেকে দেখেছিলাম। কথা হয়নি। সুচিত্রা সেন ছিলেন সেই সময় আমাদের স্বপ্নের নারী। ওঁদের বড় বোনকে দেখে সমস্যায় পড়েছিলাম কাকে এক নম্বর জায়গাটা দেব। এই পর্যন্ত।'

'কিন্তু তোর অনিমেষ তো রীতিমতো রম্ভার প্রেমে পড়ব-পড়ব হয়েছিল।'

'পুরোটাই বানানো।'

'অর্থাৎ যেটা হলে ভালো লাগত অথচ হয়নি সেইটেই তুই লেখায় এনে তৃপ্তি পেতে চেয়েছিস?'

আমি হাসলাম। ফ্রয়েড সাহেবও হয়তো এমন ব্যাখ্যাই করতেন। তারপর ঘর যখন চুপচাপ হয়ে গেল তখন মনে হল কোথায় লস এঞ্জেলসের হলিডে ইন আর কোথায় জলপাইগুড়ির হাকিমপাড়া। অথচ যোগাযোগ হয়ে গেল কীরকম আশ্চর্যজনকভাবে। সেই সময়ের আবেগ আজ অবশিষ্ট নেই। থাকার কথাও নয়। এক কৈশোর পার হওয়া তরুণের উলটোপালটা ভাবনাটাকে কি আমি বয়স্ক মনে ধরতে চেয়েছিলাম উপন্যাসে? কিন্তু এও তো জানি আমি একাই সেই কল্পনা করিনি। আমার সমবয়সি বা কিছুটা বড় অনেক তরুণই একই ভাবনা ভেবে গেছে ওদের নিয়ে। উত্তরাধিকার বেরুবার পর তাদের কেউ-কেউ অকপটে বলেছে আমায়, 'আমার ব্যাপারটা তুমি কেমন করে জানলে?'

সকালে ঘুম ভাঙল টেলিফোনের শব্দে। অজিরিতকে ফোন করছে নিউজার্সি থেকে সিদ্ধার্থ। অভয় দিয়ে জানাল, ডলার নিয়ে ভাবনার কোনও কারণ নেই। অরিজিত হতাশ গলায় বলল, 'চমৎকার। চার হাজার কিলোমিটার দূর থেকে তুমি বলছ কোনও কারণ নেই এদিকে মোটেলের ভাড়া মিটিয়ে আমার পকেট একদম খালি। এখানে যে আছি জানলে কী করে?'

সিদ্ধার্থ জবাব দিল, 'তোমাদের হোস্টেসকে ফোন করেছিলাম। সকাল সাড়ে ন'টায় বেরিয়ে পড়বে। কাল যে ডিরেকশন দিয়েছি সেইমতো গিয়ে পাসপোর্ট দেখালেই টাকা পেয়ে যাবে। এখানে তোমার দ্বিতীয় সুটকেস ঘেঁটে ট্র্যাভেলার্স চেকের নম্বর পেয়ে গেলাম। লিখে নাও।'

টেলিফোন রেখে অরিজিতকে বিড়বিড় করতে শুনলাম, 'এ কি সম্ভব!'

প্রশ্নটা আমার মাথাতেও ঠোকর খেল। কলকাতায় কারও টাকার দরকার। বোম্বেতে ফোন করে জানাতেই সেখানে টাকা জমা দেওয়া হল। আর আমি ডালহৌসিতে গিয়ে সেই টাকা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তুলে নিলাম। হুন্ডি যারা টাকা দেওয়া নেওয়ার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে তারা শুনেছি এই সুযোগ পায় কিন্তু সরকারি পর্যায়ে তো কল্পনাও করা যায় না। দেখা যাক।'

নূপুর এলেন সুন্দর সৌরভ নিয়ে। হেসে বললেন, 'কী আমাকে এবার চেনা যাচ্ছে?'

'মাথা নেড়ে বললাম, 'একটুও মিল নেই।'

'যাক, বাঁচা গেল। আচ্ছা, আমাদের নিয়ে কি খুব বেশি রস করা হয়েছিল।'

'না, না। ও সবই কল্পনা ছিল।'

'ঠিকই। কল্পনায় কি আপনার নায়ক প্রেমে পড়তে পেরেছিল?'

'অনিমেষ, মানে আমার নায়কের বয়স ছিল পনেরো।'

'ওঃ। তাই বলুন। আমার এক বন্ধু লিখেছিল আপনি নাকি আমাদের নাম পালটে খুব খারাপভাবে লিখেছেন। হয়তো জলপাইগুড়িতে থাকলে অনেক কিছু মনে করতাম। এখন মজা লাগছে। আমাকে বইটা পড়তে হবে। এটুকু মনে আছে সেসময় জলপাইগুড়ির ছেলেবুড়ো সবাই দিদির দিকে তাকাত। দারুণ দেখতে ছিল দিদি। যাকগে। আজ কি প্রোগ্রাম? বেরুবেন কখন?'

অরিজিত বলল, 'বেরুবার আগে রেস্ত জোগাড় করতে হবে।'

নূপুরকে এবার পোর্ট অথরিটির ঘটনাটা বলা হল। তাঁর চোখ কপাল উঠল। ওই ঘটনার পরেও যে অরিজিত এত দূরে এসেছ তা ভাবতেই পারছেন না তিনি।

সেই সকালটায় আমাদের বিস্ময় বাড়িয়ে ঘটনাটা ঘটল। নূপুরের গাড়িতে সিদ্ধার্থর নির্দিষ্ট ব্যাংকে পৌঁছে, পাসপোর্ট দেখাতেই অরিজিত ডলারগুলো পেয়ে গেল। কাউন্টারের ভদ্রমহিলা শুধু একবার গুনেই পাসপোর্ট দেখে নোটগুলো দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে বললেন, 'হ্যাভ এ নাইস ডে।'

সেখান থেকে সোজা অরিজিত পৌঁছে গেল একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে। দোকান যে কত বড় হতে পারে, এবং তাতে আলপিন থেকে মোটরগাড়ি পর্যন্ত সব প্রয়োজনীয় জিনিস থরে-থরে সাজানো থাকতে পারে তা প্রথম দেখলাম। সদ্য পাওয়া ডলারের কিছুটা খরচ হয়ে গেল অরিজিতের পোশাক কিনতে, মায় টুথপেস্টও। এরকম অবস্থায় কেনাকাটা অনেকটা বাধ্য হয়েই, কিন্তু নূপুর সঙ্গে থাকায় মনে হল অরিজিত পুজোর বাজার করছে। উঁচু নজরের সঙ্গী নিয়ে সবসময় দোকানে যেতে নেই, কথাটা বারংবার মনে হচ্ছিল। স্টোর থেকে বেরিয়ে আমরা ঠিক করলাম আজ ডিজনিল্যান্ডটা ঘুরে আসব। এইসময় নূপুর আমাদের বন্ধুর মতো উপদেশ দিলেন। ওর বাড়ি থেকে ডিজনিল্যান্ডের যা দূরত্ব তাতে প্রচুর সময় ব্যয় হবে। ডিজনিল্যান্ড থেকে ইউনিভার্সাল স্টুডিও খুব কাছে। আমরা যদি আজ ডিজনি দেখে কাছাকাছি মোটেলে থাকি তাহলে কাল ইউনিভার্সাল স্টুডিও দেখে ফিরে আসতে পারি। লস এঞ্জেলসে এসে নিশ্চয়ই হলিউড দেখবই। সুব্রত জিজ্ঞাসা করল, 'ওখানেও কি হলিডে ইন?'

নূপুর চটপট মাথা নাড়লেন, 'না, না। পঁচিশ ডলার নেবে। আমাদেরই পরিচিত ভদ্রলোকের মোটেল। খুব ভালো মানুষ ওরা। ইন্ডিয়ান।'

হলিডে ইন থেকে চেক আউট করে নূপুরের গাড়িতেই ঘন্টা দেড়েক ছোটার পর আমরা যখন মোটেলটিতে পৌঁছোলাম তখন দুপুর। মোটেলের মালিক দেশে গিয়েছে। দেশ থেকে এক গুজরাটি দম্পতিতে আনিয়ে দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছে। বেচারারা এখনও আমেরিকান হতে পারেনি। লস এঞ্জেলসে এমনিতেই শীত নেই। কিন্তু কাউকে চটি পরে হাঁটতে দেখিনি। মধ্যবয়সি এই ভদ্রলোকটিকে চটি পায়ে হেঁটে আসতে দেখলাম রাস্তা পার হয়ে। নূপুর ফিরে গেলেন, ঠিক হল আগামী কাল বিকেলে তিনি এসে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।

দোতলা মোটেলটি ছোট। ঘর মন্দ নয়। আমাদের খিদে পেয়েছিল খুব। আমি নীচে নেমে ম্যানেজার ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে জানতে চাইলাম খাবারের দোকান কোথায়? ভদ্রলোক সহানুভূতির চোখে তাকালেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাইসাহেব, আপনি এদেশের হ্যামবার্গার আর কেন্টাকি চিকেন দু'বেলা খেতে পারছেন?'

বললাম, 'এখনও সেরকম সমস্যায় পড়িনি।'

'পাগল হয়ে যাবেন। আমার বউ যদি সঙ্গে না থাকত তাহলে এখানে থাকতেই পারতাম না। তিন মাস হল এখানে এসেছি, মনে হচ্ছে কতদিন।'

'কেন এলেন?'

'পেটের ধান্দায়। দেশে একটা ব্যাবসা করতাম। লস হল। ধার বাড়ল। তা আমার স্ত্রীর আত্মীয় যিনি এই মোটেলের মালিক প্রস্তাবটা দিতেই রাজি হয়ে গেলাম। আমাদের বাড়িভাড়া লাগে না। হাজার ডলার দেয়। সাতশো বাঁচাই। মানে চৌদ্দ হাজার টাকা। দু'বছর বাঁচাতে পারলে সব ধার শোধ হয়ে যাবে।'

'তখন ফিরে যাবেন?'

'অবশ্যই। কী আছে এখানে? কারও সঙ্গে মনের কথা বলতে পারি না। চারধার ফাঁকা আর রাস্তায় গাড়ি ছুটছে। আপনাদের মতো ইন্ডিয়ান খদ্দের পেলে একটু ভালো লাগে। সেই গল্পটা মনে পড়ে যায়। সোনা চেয়েছিল লোকটা। বর পেল, যা ছোঁবে তাই সোনা হয়ে যাবে। তার খাবারটাও যে সোনা হয়ে যাবে তা ভাবেনি। ভাইসাব, আজ আপনি রুটি আর সবজি খাবেন? আমার স্ত্রী দারুণ বানায়।'

ওপাশের ঘর থেকে ভদ্রলোকের স্ত্রীর গলা ভেসে এল, 'শুধু ওঁকে বলছে কেন? ওঁর দুই বন্ধুও তো সঙ্গে আছেন। তিনজনকেই বলো

ভদ্রলোক হাতজোড় করলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিনজনেই আসুন।'

মাথা নাড়লাম, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাদের। কিন্তু এখনই আমরা ডিজনিল্যান্ডে যাব। এই খাওয়াটা রাত্রের জন্যে তুলে রাখা যায় না? আরাম করে খেতাম।'

ভদ্রলোক বললেন, 'সেটা ঠিক কথা। তাহলে আপনাদের দেরি করা উচিত হবে না। ডিজনি একদিনে ঘুরে দেখা যায় না। অন্তত ভালোভাবে নয় আপনারা রাত্রেই খাবেন এখানে। পথে একটা ম্যাকডোনাল্ড পেয়ে যাবেন। বেশি দূরে নয়, চলুন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।'

কলকাতার মতো পাজামা পাঞ্জাবি পরে বেরুলে আরাম লাগত। কিন্তু এ যাত্রায় সেসব বেশি সঙ্গে আনিনি। ম্যানেজার ভদ্রলোক অনেকটা সঙ্গে এসে ম্যাকডোনাল্ড আর ডিজনির গেট দেখিয়ে দিয়ে ফিরে গেলেন। আমেরিকা এবং ইউরোপে ম্যাকডোনাল্ডের দোকান মধ্যবিত্ত মানুষের কী উপকার করেছে তা না দেখলে বোঝা যাবে না। অল্প পয়সায় হাতে গরম ঝকঝকে খাবার পরিবেশন করতে এদের জুড়ি নেই। সুব্রত স্বইচ্ছায় নিরামিষ খায়। কিন্তু এক প্লেট ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর মিল্কশেক পেটে দিলে সারাদিন আর আহারের চিন্তা মাথায় আসে না। মাথাপিছু আড়াই ডলারে ভালো মুরগিভোজন হয়ে গেল। এখনও এদেশে আমাদের আঠারো টাকায় মুরগি পাওয়া যায়, পাঁচ টাকায় দুধ। তাতে ডবল জল না দিলে পেট সহ্য করতে পারবে না। বিদেশে সরকার কী করছে তা দেখার দরকার নেই, দেশে খাবারের দাম বাড়ানো চলবে না—মার্কিন নাগরিকদের মানসিকতা এইরকম। হাজার ডলার যার মাইনে তার খাওয়া খরচ একশো। ভাবলেই নিজেদের কষ্ট বাড়ে।

ডিজনি ঢোকার টিকিট কিন্তু বেশ দামি। ঢোকার পর মন জুড়িয়ে গেল। ওরা বলেন জাদুনগরী। একটু বাড়িয়ে বলেন না। বিশাল জায়গা নিয়ে গোড়ে তোলা ডিজনি সাহেবের এই শহর শুধু শিশুদের নয় যে-কোনও বয়সের মানুষকেও বারে-বারে চমকে দেবে আজব কাণ্ডকারখানা ঘটিয়ে। মাথার ওপর দিয়ে ছোট রেল পাক খাচ্ছে। বিজ্ঞানের যা কিছু চমকের সঙ্গে পুরোনো রহস্য এবং ভৌতিক ব্যাপার-স্যাপারগুলোর অভাব নেই। ডিজনি সাহেবের বিখ্যাত চরিত্ররা চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবশ্যই মিকি মাউসের পোশাক পরে যিনি রয়েছেন তিনি দক্ষ অভিনেতা। গিজগিজ করছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ, ছেলেমেয়েরাই সংখ্যায় বেশি। দুপাশে একটার পর একটা শো হাউস। তাতে ঢুকে চমকে ওঠা কাণ্ডকারখানা। এইরকম এক রঙিন পরিবেশে দেখলাম দুটি বালক-বালিকা কানে হেডফোন লাগিয়ে নেচে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে চোখ বন্ধ করে কানে ঢোকা গানটি উঁচু গলায় গেয়ে

উঠছে। এবং এই বাচ্চারা কী ধরনের গান ভালোবাসে? কাছে গিয়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম। বাচ্চাগুলো গাইছিল, 'পৃথিবীর সবচেয়ে নোংরা লোকটা কে? কার নিশ্বাসে আমরা অসুস্থ হব? সে আর কেউ নয়, নোরিয়েগা, নোরিয়েগা।' হতভম্ব হয়ে গেলাম। কদিন থেকে কাগজে এবং টিভিতে লক্ষ করছি পানামার রাষ্ট্রপ্রধান নোরিয়েগার বিরুদ্ধে মার্কিন সরকার অভিযোগ করে যাচ্ছেন ভদ্রলোক নাকি মার্কিন দেশে ড্রাগের ব্যাবসা ফেঁদেছেন। এ ব্যাপারে হাওয়া বেশ তপ্ত। কিন্তু সেই লোকটির বিরুদ্ধে গান তৈরি করে শিশুদের মধ্যে ক্যাসেট ছড়িয়ে দেওয়ার পেছনে কী যুক্তি থাকতে পারে? কিছুদিন বাদে প্রশ্নটির উত্তর জানা গেল।

॥ ৬ ॥

মানুষটির পুরো নাম জেনারেল আন্তনিও নোরিয়েগা। আজীবন মার্কিন সরকারের স্নেহে লালিতপালিত তিনি। আমেরিকার মূল ভূখণ্ডের খুব কাছে ছোট্ট দেশ পানামা। নোরিয়েগা তারই জেনারেল। পানামা স্বাধীন রাষ্ট্র। দুই দেশের মাঝখানে যে খাল তার ওপর আমেরিকার আধিপত্যের চুক্তিকাল শেষ হয়ে যাচ্ছিল। এদিকে নোরিয়েগার আচার আচরণ দেখে মনে হচ্ছিল লোকটা এবার এমন কিছু করবে যাতে আমেরিকার স্বার্থ নষ্ট হয়। প্রেসিডেন্ট বুশ সাহেব সে কারণে বেশ শঙ্কিত ছিলেন। যদি পানামা সরকার ওই খালের ওপর কর্তৃত্ব করতে আরম্ভ করে তাহলে শুধু জাহাজ চলাচলের ওপর নিয়ন্ত্রই নয়, আরও কিছু সম্ভাবনা আছে।

অথচ পানামার অর্থনৈতিক কাঠামোকে শক্ত রাখতে আমেরিকাকে নিয়মিত ডলার যোগাতে হয়। ওই স্বাধীন দ্বীপটি গণতান্ত্রিক নয়, নোরিয়েগা যা করবেন তাই মানতে হত সে-দেশের নাগরিকদের। ফলে আমেরিকার এত কাছে থেকেও পানামার সাধারণ নাগরিকদের জীবনযাপনে বিন্দুমাত্র স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না।

নোরিয়েগা একসময়, সেটা উনিশশো ষাট সালের কথা, মার্কিন সামরিক বিভাগের গোয়েন্দা দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তারপর পানামার জাতীয় রক্ষী বাহিনীতে তাঁর দ্রুত অভ্যুত্থান হতে শুরু করে। পানামায় থেকে ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য রাষ্ট্র সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য ভদ্রলোক এক সময় আমেরিকাকে জোগান দিয়ে এসেছিলেন। ফলে এই লোকটির যখন রাষ্ট্রপতি হলেন তখন নিশ্চয়ই আমেরিকা ভালো লেগেছিল। কিন্তু উননব্বুই-এর শেষে তাঁকে গদি থেকে সরাতে বুশ সাহেব তৎপর হয়ে উঠলেন। তিনি নোরিয়েগার বিরুদ্ধে ড্রাগ চোরাচালানের অভিযোগ আনলেন। প্রকাশ্যেই বললেন পানামা থেকে প্রতিদিন আমেরিকার ছেলেমেয়েদের মারবার জন্যে ড্রাগ পাঠাচ্ছেন নোরিয়েগা। মেডেলিন, কলম্বিয়া থেকে পানামা হয়ে আমেরিকায় যাতে কোকেন আসতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিয়ে নোরিয়েগা সাড়ে চার মিলিয়ান ডলার ঘুষ নিয়েছেন।

এইরকম একজন অপরাধী নিশ্বাসের মধ্যে বসে রয়েছে জেনে আমেরিকার মানুষ আতঙ্কিত হল। কিন্তু আরও প্রবলভাবে জনমত তৈরি করা দরকার। মার্কিন সরকার কখনই দেশের বাইরে কে কী বলল তা নিয়ে ভাবিত হননি। ভিয়েতনামে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছেন ততদিন যতদিন না দেশের মানুষ বেঁকে বসেছিল। নোরিয়েগাকে থামানোর একমাত্র উপায় ছিল সেই দেশ দখল করে তাঁবেদার কাউকে সেখানকার রাষ্ট্রপ্রধান করে দেওয়া। এ ব্যাপারে একটু অস্বস্তি ছিল আফগানিস্থানের ঘটনায়। রাশিয়া সেই দেশ দখল করার পর সারা বিশ্বে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য কোনও সার্বভৌম দেশকে এভাবে দখল করা নীতিবহির্ভূত কাজ। আমেরিকা সেই সময় রাশিয়ার কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কীভাবে রাশিয়াকে সরে যেতে হয়েছে তাও দেখেছিল। কিন্তু সেই সুযোগ নিয়ে একটি ছোট্ট রাষ্ট্র তাদের দেশে বিষের ধোঁয়া পাঠিয়ে যাবে তাও মেনে নেওয়া যায় না ঠিক এই সময়

পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো স্বাধীনতা ঘোষণা করল। দেখা গেল যেসব দেশে বিপ্লব হচ্ছে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে সেখানে রাশিয়ান বাহিনী থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদের নিষ্ক্রিয় রেখেছে। বোঝাই গেল ওইসব দেশে অর্থনৈতিক ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতা রাশিয়ার আর ছিল না বলে তারা বোঝা ঘাড় থেকে নামাতে চাইছে। বুশ সাহেব জানতেন এই সময় আমেরিকা যদি পানামাকে স্তব্ধ করে রাশিয়া কিছু বলবে না। বাকি রইল চিন। চিনের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার সব চেষ্টা চালিয়ে গেলেন তিনি। প্রতিনিধি দল যাওয়া-আসা শুরু করল।

আগেই বলেছি, এ নিয়ে বুশ সাহেব খুব চিন্তিত ছিলেন না। নিজের মানুষদের আগে ঠান্ডা রাখতে হবে। কিন্তু আমেরিকার প্রচার মাধ্যম অত্যন্ত শক্তিশালী এবং স্বাধীন। তাঁদের দিয়ে জোর করে কিছু করানো যাবে না। এই সময় এক অদ্ভুত গানের ক্যাসেট বাজার ছেয়ে ফেলল। সুরটি মজার। কথাগুলো অদ্ভুত। পৃথিবীর বিখ্যাত মানুষের নামাবলি আছে সেই গানের কথায়। পেলে থেকে বুদ্ধদেব কেউ বাদ যাননি। কিন্তু প্রায় প্রতি তিন-চার লাইন পরে পরেই প্রশ্ন হচ্ছে, দুনিয়ায় সবচেয়ে নোংরা মানুষ কে? গানেই তার জবাব, পানামার নোরিয়েগা।

এই ক্যাসেট আমেরিকার ঘরে-ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। বাচ্চারা ওয়াকম্যান কানে দিয়ে ওই গান শুনতে-শুনতে নাচতে লাগল, বাড়িতে গাইতে লাগল। বড়দের কানে গেল গানের লাইন। তারাও মাথা নাড়লেন, ঠিকই তো, নোরিয়েগা অত্যন্ত বদলোক।

কিছু-কিছু ব্যাপার ঘটে যা আইন করে বন্ধ করা যায় না। যেমন সিগারেট খাওয়া। এখন সারা পৃথিবীর মানুষ জেনে গিয়েছে সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু ক্ষতি কতখানি মারাত্মক তা না জানায় সরকার আইন করে বন্ধ করতে পারছেন না। যাট বছর ধূমপান করেও বহাল তবিয়তে আছেন এমন মানুষের সংখ্যা প্রচুর। সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে সতর্কীকরণ লিখে কর্তব্য শেষ করতে হচ্ছে সে কারণে। কেউ যদি প্রশ্ন তোলে, তুমি যেটাকে ক্ষতিকর বলছ সেটা বিক্রি করতে দিচ্ছ কেন তাহলে সরকার বিব্রত হবেন। মৌলিক অধিকারের দোহাই দেবেন। মদ স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়। সেটা সব জায়গায় পাওয়া যায় না, প্রকাশ্যে খাওয়া যায় না এবং সপ্তাহের মাত্র একটি দিন তার বিক্রি বন্ধ রাখতে পেরেছেন সরকার। কিন্তু একেবারে বন্ধ করতে চাননি বা পারেননি। মন্দ লোকে বলে তা করলে মোটা আয় থেকে বঞ্চিত হবে দেশ। কিন্তু মদের ব্যাপক ব্যবহার সম্পর্কে সামাজিক আপত্তি থাকায় তার বিক্রি সীমিত। শুধু সতর্কীকরণের ছাপ মেরে সিগারেট বাজারে ছাড়া কিন্তু হাস্যকর। মদের বোতলের গায়ে কিন্তু ওসব লেখা থাকে না। এর আগেরবার দেখেছিলাম, এবারও লক্ষ করলাম মার্কিনিরা এক অভিনব পদ্ধতি বেছে নিয়েছে। ছোট্ট শিশু যখন স্কুলে ভরতি হয় তখন দিদিমণি তাদের সঙ্গে গল্প করে। ভাব জমায়। সেই সময় দিদিমণি তাদের বুঝিয়ে দেয় সিগারেট খাওয়া কী পরিমাণে ক্ষতিকর। শুধু যে খায় তারই ক্ষতি হয় না, যার সামনে ধোঁয়া ছাড়া হল তারও সমান ক্ষতি। তুমি যদি বাবা-মা'কে না হারাতে চাও তাহলে তাদের সিগারেট খেতে দিও না। তোমার সামনে খেলে তুমিও মরে যাবে। ওই বয়সে দিদিমণির কথা মানে ঈশ্বরের বাণী। বাড়ি ফিরে বাবাকে সিগারেট খেতে দেখে শিশু প্রতিবাদ জানাতে কাঁদতে লাগল, তুমি মরে যাবে, আমাকেও মেরে ফেলবে। এই শিশুদের চাপেই বাড়িতে সিগারেট খাওয়া বন্ধ হল। গাড়িতে সিগারেট খাওয়া চলবে না বাচ্চা থাকলে। ধরালেই তারা নাকে হাত চাপা দিয়ে চেঁচাতে আরম্ভ করে। ফলে সিগারেট খাওয়া কমতে লাগল। আর এই বাচ্চাগুলো বড় হচ্ছে সিগারেট-বিরোধী মানসিকতা নিয়ে। অফিসে ধূমপানের আলাদা ঘর আছে। ট্রেনে দশটির মধ্যে মাত্র একটিতে ধূমপান করা যায়। দেশের ভেতরের বিমানে ধূমপান নিষেধ। আমি আমেরিকার একটি পরিবারও দেখিনি যেখানে বাচ্চা আছে এবং কর্তাগিন্নি ধূমপান করছেন। আইন করে যা বন্ধ করা যায় না তা এইসব শিশুকে কাজে লাগিয়ে অনায়াসেই বন্ধ করা গেছে। শিশুদের দাবি কে উপেক্ষা করতে পারে। এই ব্যাপারটা আমাদের দেশেও তো হতে পারে।

পানামার ব্যাপারে শিশুদের কাছে ক্যাসেট পৌঁছে যাওয়ায় বুশ সাহেবের চমৎকার উপকার হল। তিনি পানামায় সৈন্য পাঠালেন। ছোটখাটো যুদ্ধ হল। এবং নোরিয়েগা তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে গেলেন। একটি বিদেশি রাষ্ট্র পানামায় নেমেছে সৈন্য নিয়ে কিন্তু পৃথিবীর বড় রাষ্ট্রগুলো মুখ বন্ধ করে রইল। পানামার পথে-পথে তখন অরাজকতা। দোকানপাট লুট হচ্ছে। ছোটখাটো সংঘর্ষ হচ্ছে মার্কিন সৈন্যদের সঙ্গে। যেসব মার্কিন সৈন্য তাতে মারা যাচ্ছে তাদের বীরের সম্মান দেওয়া হচ্ছে। টিভি কর্মীদের দক্ষতা এমন যে দেখে মনে হচ্ছিল আমরা ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু সবই হল অথচ নোরিয়েগাকে পাওয়া যাচ্ছিল না। প্রতিদিন কাগজে হেডিং, নোরিয়েগা কোথায়? বুশ সাহেবের কাছে ব্যাপারটা খুব লজ্জার। ছোট্ট দেশ কিন্তু দাগি লোকটাকেই তাঁর সৈন্যরা খুঁজে বের করতে পারছে না। দিন কয়েক বাদে হঠাৎ জানা গেল নোরিয়েগা সোজা চলে এসেছেন সঙ্গীদের নিয়ে ভাটিকানের দূতাবাসে। সেখানে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন। টিভিতে দেখলাম মার্কিন সৈন্য পানামার ভাটিকান দূতাবাস ঘিরে ফেলেছে কাঁটাতার দিয়ে। রোমে পোপের কাছে আবেদন জানানো হচ্ছে নোরিয়েগাকে বের করে দেওয়ার জন্যে। পোপ হ্যাঁ কিংবা না বলছেন না। দূতাবাসের ভেতর সৈন্য ঢুকতে পারছে না কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা মাইকে ওই গান বাজানো হচ্ছে নোরিয়েগাকে নার্ভাস করার জন্যে। এ যেন গর্তে ঢোকা জন্তুকে বের করে আনার জন্যে ধোঁয়া ছড়ানো। এদিকে দেখানো হচ্ছে নোরিয়েগার বাড়ি থেকে কোটি-কোটি ডলার পাওয়া গেছে। গেছে মাদকদ্রব্য চোরাচালানের কাগজপত্র। একেবারে হাতে-হাতে ধরা পড়া আর কি। এরই মধ্যে কেউ-কেউ সন্দেহ করল মার্কিন সৈন্যরা ওগুলো সাজিয়ে ছবি তুলেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পোপ কিছু বলার আগেই নোরিয়েগা আত্মসমর্পণ করলেন। পলকেই তাঁকে তুলে নিয়ে আসা হল হেলিকপ্টারে। নিয়ে যাওয়া হল জলের তলায়, সাবমেরিনে, সাংবাদিকদের ত্রিসীমার বাইরে।

যেহেতু জমি আগেই তৈরি করা ছিল তাই পানামা অধিগ্রহণের কারণে দেশে কোনও প্রতিবাদ উঠল না। রাশিয়া কিংবা চিন চুপ করে রইল।

কিন্তু লাতিন আমেরিকার অন্য দেশগুলো শঙ্কিত হল। পানামার রাষ্ট্রপ্রধানের পদে বুশ সাহেবের মনোনীত পানামিয়ান মিস্টার এন্ডারা তখনও টলমলে। বুশ সাহেব তাঁর উপরাষ্ট্রপতিকে হন্ডুরাসে পাঠাবেন বলে স্থির করলেন। ল্যাটিন আমেরিকার নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করতে। কারণ এইসব দেশের মানুষ মনে করছিল পানামায় যেমন ড্রাগের কারণ দেখিয়ে আমেরিকা ঢুকে পড়েছে তেমনি একটা অজুহাত খাড়া করে আমেরিকা তাদের দিকেও থাবা বাড়াতে পারে। এখানে বুশ সাহেব খুব স্পষ্ট কথা বললেন। বুশ সাহেব বললেন, 'যখন আমেরিকানদের জীবন রক্ষার প্রশ্ন সামনে আসবে, আমাদের দক্ষিণ সীমান্তের বন্ধুরা অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, প্রেসিডেন্ট নিশ্চিতভাবে তা রক্ষা করবেই। তবে আমার সৈন্যদের বিনা কারণে আমি কখনই ব্যবহার করব না।'

এরপরে একটু বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটল। বুশ সাহেব ঘোষণা করলেন, 'যে-কোনও অপরাধীর যেমন কোর্টে গিয়ে নিজের স্বপক্ষে বলার অধিকার আছে তেমনি মার্কিন সরকার মনে করে ম্যানুয়েল আন্তনিও নোরিয়েগারও সেই স্বাধীনতা আছে।'

নোরিয়েগা যদি সংঘর্ষের সময় মারা যেত তাহলে কিছু বলার ছিল না, কিন্তু তাকে জীবন্ত ধরার পর সরকার সমস্যায় পড়বেন বিচার পদ্ধতির সুযোগ দেওয়ায়, এমন কথা অনেকের মনে হল। বুশ সাহেবও বললেন, 'মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তরের সঙ্গে একদা সংশ্লিষ্ট নোরিয়েগা হয়তো নিজের মুখ বাঁচাবার জন্যে অনেক কথা বলতে পারে কিন্তু তাঁর সঙ্গে এসবের কোনও সম্পর্ক নেই। নোরিয়েগার অধিকার আছে যা ইচ্ছে বলার এবং করার কিন্তু সেইসঙ্গে আইনমন্ত্রকের দায়িত্ব থাকছে তা খতিয়ে দেখার।'

এই যে একজনকে দেশে ধরে এনেও বিচার ব্যবস্থার সুযোগ করে দেওয়া আমার কাছে অভিনব নয়। আমাদের দেশেও ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকারীকে সেই সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কম্যুনিস্ট

দেশগুলোতে তা দেওয়া হয় না রাষ্ট্রের স্বার্থে। যেটা বিস্ময়কর তা হল প্রচার মাধ্যমের ওপর বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণ না রাখা। কাগজগুলো রোজই পাতার পর পাতা নোরিয়েগার খবর ছাপছে। দু-একটি লেখায় সরকারের সমালোচনাও করা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে না পেরে বুশ সাহেব মৃদু অনুযোগ আনেন। পানামায় মৃত আমেরিকান সৈন্যদের দেহ যখন আনা হচ্ছে তখন ছবি তোলা হয়েছিল। সেই ছবি ছেপে তার পাশে বুশ সাহেবের মজাদার ভঙ্গির একটি ছবি ছাপা হয়েছিল। এরকম কিছু ব্যবহার করার আগে তা অবশ্যই প্রেসিডেন্টকে জানানো উচিত। কিন্তু সংবাদপত্রের মালিকরা এই অনুরোধে তেমন কান দেননি। পাশাপাশি ছবি দুটো দেখলে মনে হতেই পারে দেশের সৈন্যরা যেখানে প্রাণ দিচ্ছে প্রেসিডেন্ট তখন হাসিমস্করা করছেন। দুটো দুই পরিবেশের ছবি কিন্তু লোকে মনে করতেই পারে ওই শহিদদের জন্যে প্রেসিডেন্ট দুঃখিত নন। বুশ সাহেবকে তাই চেঁচিয়ে বলতে হয়, 'অ্যান্ড আই ডু, আই ডু।'

একটি পুতুল সরকারকে পানামায় বসিয়ে আমেরিকা কিন্তু দায়িত্ব শেষ করতে পারেনি। খালের ওপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ রইল। কিন্তু সে কারণে কোটি-কোটি ডলার খরচ করতে হল পানামার অর্থনৈতিক কাঠামো পুনর্গঠনের জন্যে। এর দশ মাস বাদে যখন শুটিং-এর কারণে আমেরিকায় গিয়েছিলাম তখন দেখেছি সেখানকার মানুষ নোরিয়েগার কথা প্রায় ভুলেই গেছে। দশ মাসেও তার বিচার শুরু হয়নি। কিন্তু আমেরিকায় ড্রাগ আসা বন্ধ হয়েছে বলে মনে হয় না। নইলে ড্রাগ-বিরোধী প্রচারের কাজে লক্ষ-লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে কেন? পৃথিবীর সব দেশেই মাফিয়ারা প্যারালাল সরকার চালায়। আর ড্রাগ এমন একটা ব্যাবসা যা থেকে প্রচুর অর্থ আসে। মাফিয়ারা হাত গুটিয়ে রাখবে তার কোনও কারণ নেই। মনে আছে আটলান্টিক সিটি থেকে নিউজার্সিতে ফিরছি, একটি সাদা ছেলে এগিয়ে এল, 'তোমাদের বাসে জায়গা আছে? আমি নিউজার্সি যাব।'

জায়গা নেই শুনে বিমর্ষ হল। তারপর নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা তো ট্যুরিস্ট। কোত্থেকে এসেছ?' ভারতবর্ষ শুনে যেন স্বস্তি পেল। বলল, 'আমি একটা প্যাকেট দিচ্ছি, তোমাদের ঠিকানা বলো, আমার বন্ধু তোমার কাছ থেকে নিয়ে নেবে।' কীসের প্যাকেট জানতে চাইলে কাঁধ ঝাঁকাল সে। বলল, 'গাড়িতে পায়ের কাছে ফেলে রেখ, তোমাকে পঞ্চাশ ডলার দেব।' আমরা রাজি না হলেও অনেক ছেলেই এইভাবেই ক্যারিয়ার হয়ে যায়। আগে কালোরা কাজটা করত পয়সার লোভে। শেষপর্যন্ত ওরা চিহ্নিত হয়ে যেতে সাদা ছেলেদের কাজে লাগানো হল। এখন এশিয়ানদের হচ্ছে। কারণ এশিয়ানদের ওপর পুলিশের সন্দেহ কম। নিউজার্সি থেকে ম্যানহাটনে একটা মাঝারি প্যাকেট পৌঁছে দিতে পারলেই শ'খানেক ডলার পাওয়া যায়। এই প্রলোভন সামলানো মুশকিল।

অথচ জীবনের এইসব কালো দিকগুলোকে বেমালুম ভুলে যেতে হয় ডিজনিতে ঢুকলে। বুদ্ধি এবং বিজ্ঞান জড়িয়ে মিশিয়ে চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা দেয় শিশুদের। আর তখনই আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়ে। ওরা এই অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত। আহা, যদি আমাদের শিশুদের জন্যে এমন ডিজনিল্যান্ড ভারতের শহরে-শহরে করা যেত।

মোটেলে ফিরতে-ফিরতে সন্ধ্যা। চারধার শুনসান। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া মাত্র ডিনারের আমন্ত্রণ এল। ঘড়িতে এখন মোটে সাড়ে ন'টা কিন্তু দিনের আলো সবে মরেছে। আমরা চমৎকার গুজরাটি রান্না খেলাম। ভদ্রমহিলা পরিবেশন করতে-করতে জানালেন কলকাতার ল্যান্সডাউনে তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে। কলকাতা থেকে এসেছি শুনে তিনি খুব খুশি। আবহাওয়া একসময় এমন ঘরোয়া হয়ে গেল যে ভদ্রমহিলা আমাদের সন্তানের খবর নিতে লাগলেন। আমার কটি সন্তান এ খবর আমেরিকার কেউ নেওয়ার চেষ্টা করেননি এর আগে। খাওয়া শেষে ভদ্রমহিলা বললেন, 'এভাবে একা-একা বেড়ানো ভালো নয়। আপনি এর পরে যখন আসবেন মেয়েদের সঙ্গে আনবেন। স্বামীরা কিছুই দেখায় না, যা দেখার তা বাবার জন্যেই মেয়েরা দেখে। আর সেটাই সারাজীবন মনে রাখে।'

ভদ্রলোক হাসলেন, 'দেখলেন কাণ্ড। আমি যে ওকে আমেরিকায় এনেছি সেটা কোনও

ব্যাপারই নয়। ওর বাবা শুধু দ্বারকা দেখিয়েছিল, আর সেটাই মনে রেখেছে।'

রাত্রে বিছানায় শুয়ে ব্যাপারটা ভাবতে খুব ভালো লাগছিল। এতদূরে এসেও এক ভারতী মহিলা চমৎকার ভারতীয় আছেন। বাবার প্রতি টান ভারতীয় মেয়েদের মতো আর কার আছে?

ইউনিভার্সাল স্টুডিয়ো দেখার জন্যে অরিজিৎ খুব উদ্‌গ্রীব ছিল। যাঁরা নাটক কিংবা ছবি সঙ্গে যুক্ত তাঁরা ব্রডওয়ে অথবা ইউনিভার্সাল দেখা মানে তীর্থদর্শন বলে মনে করেন। বস্তু ইউনিভার্সাল স্টুডিয়ো ঘুরে দেখা একটা দারুণ অভিজ্ঞতা। বিখ্যাত সেইসব চলচ্চিত্রগুলো কীভা নির্মিত হয়েছিল জানার পর বিস্ময়ের শেষ থাকে না।

মোটেল থেকেই বাসে চেপে আমরা পৌঁছে গেলাম ইউনিভার্সাল স্টুডিয়োর দরজায় প্রবেশমূল্য ভালোই। গাইডের ব্যবস্থা আছে। এক একটা দলকে নিয়ে একজন গাইড চত্বরটা ঘুরি দেখান। ইটি, জস, নাইট রাইডার, কে আই টি টি অথবা মায়ামি ভাইসেস-এর মতো বিখ্যাত ছ কীভাবে তৈরি হয়েছিল ওই স্টুডিয়োতে তা জানা দারুণ চমকপ্রদ ব্যাপার। ছবির মতো রাস্তা। দুপা বাড়িঘর। আদল আছে কিন্তু বাস করা যায় না কারণ ঘরের পেছনের দেওয়াল নেই। রাস্তা থে বোঝা যায় না। সাইনবোর্ড পালটে পৃথিবীর যে-কোনও বড় শহর তৈরি করে ফেলা যায় এ নিমেষে। সিকি কিলোমিটারের ওই সেটে যাদের প্রয়োজন পরিচালক তাদেরই নিয়ে আসেন, নিশ্চি শুটিং করা যায় কারণ কৌতূহলী জনতার ভিড় নেই। আমরা ট্রাম ট্যুর নিয়েছিলাম। দিনদুপুরে হঠা ঝড় উঠল। মড়মড় করে গাছ পড়ল। প্রবল জলোচ্ছ্বাস পাহাড় কাঁপিয়ে নেমে এল। ট্রাম চল আরম্ভ করলে সব ঠিকঠাক। সেই যে হাঙরকে নিয়ে বিখ্যাত ছবি জস, কে ভেবেছিল তা তো হয়েছে একটি মাঝারি পুকুরে। পুকুরের প্রান্তে বিশাল বোর্ডে সমুদ্রের ছবি এঁকে তা জলের স এমন ভাবে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে যে সমুদ্র বলেই ভ্রম হয়। যন্ত্রচালিত একটি হাঙরকে এখন সেই পুকুরে ঘুরিয়ে দর্শকদের মজা দেওয়া হয়। স্টার ট্র্যাক অ্যাডভেঞ্চার কি একটা বড় টেবি তৈরি হয়েছিল? এসব দেখে-দেখে এক সময় অবাক হওয়া বোধটা চলে গেল। মনে হল এটা স্বাভাবিক। মানুষ তার বুদ্ধি নিয়ে ছবি বানিয়ে আমাদের মনে যে বাস্তবের ছবিটা তুলে ধরে সেটা তো ছবি দেখার সময় সত্যি। কিন্তু আমরা একটা জিনিসের ব্যাখ্যা করতে পারিনি। আমাদের ট্রা এক গুহায় ঢুকল। হুঁশিয়ারি দেওয়া হল ওপাশ থেকে দুরন্ত গতিতে ট্রেন আসছে। আমরা তা আসতে দেখলাম। দেড়শো মাইল গতিতে ইঞ্জিনটা ছুটে এসে ধাক্কা খেল আমাদের পাশের থামে হুড়মুড়িয়ে উঠল পৃথিবী। থাম উলটে গেল। আমাদের ট্রাম হেলে গেল। আগুন উঠল ছিটকে বিশাল ইঞ্জিন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। এসব চোখের সামনেই দেখলাম। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলেন কেউ কেউ। আগুনের হলকা গায়ে লাগছে। গাইড তাড়াতাড়ি ট্রামটাকে গুহা থেকে বের করে এ বললেন, 'ঠিক এক মিনিটেই ইঞ্জিন থাম আগের চেহারায় ফিরে যাবে।' কী করে ওই টুকরো হ যাওয়া লোহা জোড়া লাগে এবং ইঞ্জিনের চেহারা নেয় এক মিনিটের মধ্যে তা ওঁরাই জানেন। জানত চাইলে হাসেন। কিংবা সেই ভাঙা কাঠের সাঁকোর ওপর দিয়ে যখন ট্রাম যাচ্ছে তখন একটার প একটা কাঠ খুলে পড়ছে সাঁকো থেকে। শেষমেষ বাদবাকিটা ধসে গেল। ট্রামটা বেঁচে গেল শে মুহূর্তে। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই সাঁকোটা আবার আগের চেহারা ফিরে পেল। কারিগরি বিদ্যা যেখা পৌঁছেছে আমাদের নজর তাকে ম্যাজিক বলে ভুল করে।

কলকাতার টালিগঞ্জের স্টুডিয়োগুলোর কথা মনে পড়লে সেই একই ধরনের কষ্ট বুকে জমে আধুনিক প্রয়োগবিদ্যার চূড়ান্ত সুযোগ নিয়ে এরা ছবি বানাচ্ছে আর আমরা এখনও প্রাগৈতিহাসিব যুগে পড়ে আছি। এখানে রোজ নতুন-নতুন আবিষ্কার হচ্ছে আর পরিচালকরা তার সুযোগ নিচ্ছেন আমাদের ছবিতে একটা সামান্য স্পেশ্যাল এফেক্ট করতে বোম্বে ছুটতে হয়। কী পরিমাণ প্রতিভ থাকলে সত্যজিৎ রায় ওই পরিবেশ থেকে সত্যজিৎ হন তা এখানে এলে বোঝা যায়।

স্টুডিয়োতে যাওয়ার আগে আমরা চেক আউট করে মোটেলের অফিসঘরে জিনিসপত্র

রেখেছিলাম। ফিরে দেখলাম নূপুর এসেছেন তাঁর গাড়ি নিয়ে। আজ শাড়ি পরে এসেছেন। দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছে। আজ রাত্রে আমরা ওঁর বাড়িতে থাকব। আমাদের অভিজ্ঞতার কথা শুনতে-শুনতে চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছিলেন। হঠাৎ বললেন, 'চল, তোমাদের সমুদ্রের ধারে নিয়ে যাই। কার কপালে কী আছে দেখা যাক।'

অরিজিত জিজ্ঞাসা করল, 'সেটা কীরকম?'

নূপুর হাসলেন, জবাব দিলেন না। আমরা সমুদ্রের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওপাশে জাপান। সামনে প্রশান্ত মহাসাগর। বাংলা কবিতা এবং গানেও এই সমুদ্রের কথা বলা হয়েছে। চুপচাপ, বড় শান্ত মনে হল। আমার দেখা সমুদ্রের চেহারার সঙ্গে খুব একটা মিল নেই। মনে হল দিঘাতেও বেশি ঢেউ দেখেছি। সমুদ্রের ধার ঘেঁষে দোকানপাট, রেস্টুরেন্ট মাছ ধরার ব্যবস্থা। খানিকটা জায়গা যাকে বলে একেবারে জমজমাট। নূপুর আমাদের নিয়ে এলেন সেখানে। নানান রকমের স্যুভেনির বিক্রি হচ্ছে। নূপুর দাঁড়ালেন যে দোকানের সামনে সেখানে কাচের জারের পেছনে ফিলিপিন মেয়েরা দাঁড়িয়ে। জারের মধ্যেও ঝিনুকের মতো দেখতে কিছু স্তূপীকৃত। পেছনে একটা নোটিস বোর্ডে লেখা আছে, 'পাঁচ ডলারের বিনিময়ে ঝিনুক তুলুন। কোন না কোনও সাইজের একটি কিংবা দুটি মুক্তো আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে সেই ঝিনুকের পেটে।' তারপর কোন সাইজের মুক্তোর কী দাম হতে পারে সেই তালিকা। দেখলাম পাঁচ থেকে পঞ্চাশ ডলারের মধ্যে দাম ছড়ানো রয়েছে। পাঁচ ডলার দিলে একবারই একটি ঝিনুক দেখা যাবে।

মুক্তোছড়া চাই না কন্যা, চাই না মোতির হার। এ কথা চিরকাল বলে এসেছি। কিন্তু এখানে, এই প্রশান্ত মহাসাগরের পাশে দাঁড়িয়ে কৌতূহল হল। অরিজিত পকেট থেকে পাঁচ ডলার বের করে ভদ্রমহিলার হাতে দিতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন ঝিনুকটি আপনি তুলে দেখতে চান?'

অরিজিত একটু বড়সড় ঝিনুক দেখিয়ে দিতেই ভদ্রমহিলা চিমটি দিয়ে সেটিকে তুলে চোখের সামনে রাখলেন। তারপর ছুরি দিয়ে চাপ দিতে লাগলেন পেটের খাঁজে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঝিনুকটি দু-টুকরো হল। পেটের ভেতর খোঁচাতেই চিকচিক করে উঠল। এবং একটা মটর দানার মতো মুক্তো বেরিয়ে এল। সঙ্গে-সঙ্গে ভদ্রমহিলা একগাল হেসে অরিজিত-এর হাতে সেটিকে তুলে দিলেন। ওই মুক্তোর দাম কত? জানা গেল বাজারে ছয়-সাত ডলার পাওয়া যাবে। সুব্রত মুক্তো পেল পনেরো ডলারের। আমার খুব লোভ করছিল সেইসঙ্গে ভয়। যদি আমার ভাগ্যে এক ডলারের মুক্তো ওঠে যা কাউকে দেওয়া যায় না। না বলা সত্ত্বেও সবাই এমন অনুরোধ করতে লাগল যে পাঁচ ডলার খরচ করতে হল। মাঝারি সাইজের ঝিনুক তুলে তার বুক বিদীর্ণ করা হল। কিন্তু এ কি, ভদ্রমহিলা তন্নতন্ন করে খুঁজে একটাও মুক্তো পেলেন না। চাপা গলায় তিনি তাঁর সঙ্গিনীকে বললেন সেকথা। সঙ্গিনী ছুটে গেল ভেতরে। আমি হেসে বললাম, 'আমার কপালটা কীরকম আর একবার বোঝা গেল!' নূপুর বললেন, 'এ হতেই পারে না।'

আমি বললাম, 'হয় এবং হল। নিজের চোখেই তো দেখলেন।'

এই সময় ভেতর থেকে এক বৃদ্ধ ফিলিপিনি হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এসে অদ্ভুত ইংরেজি উচ্চারণে আমাকে বললেন, 'জেন্টলম্যান, কোথাও কিছু ভুল হয়েছে। তুমি এই ঘটনার কথা কাউকে বোলো না। ট্রাই অ্যানাদার ঝিনুক, পয়সা লাগবে। না।' কথাগুলো বলার সময় তাঁর চোখ চারপাশে ঘুরছিল যা দেখার মতো। তিনি চাইছিলেন কেউ শুনতে না পাক। আমি মাথা নাড়লাম, 'ঢের হয়েছে। আর ঝিনুক তোলার ইচ্ছে আমার নেই।'

বৃদ্ধ সেই মুহূর্তে ভেবে নিয়ে বললেন, 'তাহলে দাঁড়াও, পাঁচ সেকেন্ড।'

তিনি ভেতরে চলে গেলেন এবং পরমুহূর্তেই বেরিয়ে এলেন একটা ছোট্ট প্ল্যাসটিকের কৌটো হাতে নিয়ে। আমার দিকে সেটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমাকে এটি উপহার দেওয়া হল। দারুণ দামি মুক্তো। ষাট ডলার তো হবেই। কিন্তু একটাই অনুরোধ, আমার ঝিনুকের বুকে মুক্তো পাওয়া

যায়নি এ কথাটা কাউকে বলো না।'

এও আমার কপাল। উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে গেলে কিছুই পাই না, নির্লিপ্ত হওয়া মাত্র সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো সেটা এগিয়ে আসে, জলের দাগ রেখে আবার ফিরে যায়। কিন্তু এটা কীরকম ব্যাপার হল? সব ঝিনুকে মুক্তো থাকবেই এমন গ্যারান্টি দিয়ে এরা দোকান খুলেছেন কী করে? জলের ধারে হাঁটতে-হাঁটতে নূপুর সেটা বোঝালেন। এই সমুদ্রে মুক্তোর চাষ করা হয়। ঝিনুকের পেটে একটা বালির কণা ঢুকে গেলেও এক সময় সেটি মুক্তোর চেহারা নিয়ে নিতে পারে। সেই আর্টিফিসিয়াল মুক্তোওয়া ঝিনুকগুলোকে ওরা নিয়ে আসে এইসব দোকানে। প্রশ্ন হল, পাঁচ ডলারে একটা ঝিনুক খুলে খদ্দেরকে দশ পনেরো ডলারের মুক্তো দিলে তো ব্যবসায় ক্ষতি। ওরা নিজেরাই শুধু মুক্তো বিক্রি করে অনেক লাভ করতে পারে। নূপুর জানালেন, শতকরা পঁচানব্বুইটি ঝিনুকে যে মুক্তো থাকে তার বাজার দর এক ডলারের বেশি নয়। মূল্যবান মুক্তো পাওয়া যাবে এমন ঝিনুক ওরা এখানে আনে না। শুধু খদ্দেরদের চমক দেওয়ার জন্যে চার-পাঁচটা মিলিয়ে রাখে। সুব্রত তেমন একটাই পেয়েছিল। কিন্তু আমি নাকি সত্যি ভালো লাভ করেছি।

দীর্ঘপথ গাড়ি দিয়ে আমরা চলে এলাম নূপুরের বাড়ি। পাড়াটি সুন্দর। হলিউডের ছবিতে মধ্যবিত্ত পাড়াগুলো এরকমই দেখেছি। তবে রাস্তার নাম, কোনও-কোনও সাইনবোর্ডে স্প্যানিশ শব্দের ব্যবহার দেখছি। লস এঞ্জেলসে স্পেন দেশের উপস্থিতি প্রবল। সম্ভবত আমেরিকার এই সমুদ্রতটে স্পেনিয়রাই প্রথম আড্ডা গেড়েছিল জাহাজে চেপে এসে। ইংরেজির পরেই স্প্যানিশের তাই দাপট এখানে। লস এঞ্জেলসের কাছাকাছি শহরগুলোর নামেই সেটা মালুম হয়। সান ডিয়াগো শহরে জলজ প্রাণীর চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়ে এরকম প্রচুর নাম দেখেছি।

দোতলা বাড়ি, একতলাটা চমৎকার গোছানো। জিনিসপত্র রেখে সেখানেই হাত-পা ছড়িয়ে বসার পর নূপুর তাঁর মেয়েকে ডাকলেন। দ্বিতীয়বারে তার সাড়া পাওয়া গেল। একসময় সে এসে সিঁড়িতে দাঁড়াল। এত সুন্দরী কিশোরী আমি খুব কম দেখেছি। নূপুর তাকে বাংলায় আমাদের পরিচয় দিলেন। মেয়েটি ইংরেজিতে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করল। জলের মাছকে ডাঙায় তুললে যেমন হয় তেমন অবস্থা তার। কী করছিল জিজ্ঞাসা করতে হেসে বলল, সিনেমা দেখছিলাম। নূপুরের এক মেয়ে। কোডাইতে পড়ে। ছুটিতে বেড়াতে এসেছে। ও নিজের ঘরে ফিরে গেলে জানতে পারলোম মেয়েকে ভারতীয় আবহাওয়ার সঙ্গে রপ্ত করাতেই নূপুর তাকে কোডাইতে পড়তে পাঠিয়েছে। পড়াশুনোয় ও ভালো শুধু সিনেমা দেখার নেশা খুব। বাংলা বলতে চায় না। পড়তে পারে না। আমেরিকায় পড়াশুনো করলে যা হত ভারতবর্ষের অন্যতম দামি স্কুলে গিয়ে তার চেয়ে বেশি অভারতীয় হয়ে গেছে।

নূপুরের ইচ্ছে ছিল আমাদের নিয়ে রাতে লস এঞ্জেলস দেখাতে বের হয়। কিন্তু কথায়-কথায় আড্ডা এমন জমে উঠল যে সেই ইচ্ছেটাকে বাতিল করতে হল। হঠাৎ নূপুর আমাকে বললেন, 'সমরেশ, আমাকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখুন।'

এরকম অনুরোধ শুনলেই আমি শঙ্কিত হয়ে পড়ি। প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব গল্প আছে। তাঁর কাছে সেই গল্প খুবই মূল্যবান। কিন্তু লেখক হিসেবে আমার কাছে সেই গল্প কতটা আবেদন করছে তা অনেকেই ভেবে দেখেন না। আমি হেসে বললাম, 'আগে শুনি, তারপর বলব লিখতে পারব কি না।'

ছিমছাম ডাইনিং টেবিলে পানীয়ের গ্লাস হাতে বসে নূপুরের গল্প শুনলাম। কেবলই মনে হচ্ছিল এই মধ্যবয়সিনী সুন্দরীকে আমি বাল্যে যখন দেখেছি তখন কি ঘুণাক্ষরেও ভেবেছিলাম এঁর ওপর দিয়ে এমন ঝড় বয়ে যাবে। এবং এত ঝড়ের পরেও ভদ্রমহিলা এত উচ্ছল, হাসিখুশি থাকবেন?

নূপুর প্রথমেই বললেন, 'আমার দুটি সন্তান। একটিকে দেখলেন, আর একটি এখন সরকারের হেফাজতে। ও অসুস্থ। এমন একটা অসুখ যা কোনওদিন সারবে না। শুধু তাই নয় সামান্য একটু

ইনফেকশন হলেই মারা যাবে। এখন ওর বয়স প্রায় কুড়ি। কথা বলতে পারে না কিন্তু গান বাজনা চমৎকার বোঝে। সরকার ওকে নিয়েছে ওর অসুখটা সম্পর্কে পরীক্ষানিরীক্ষার জন্যে। ইনফেকশন-ফ্রি ঘরে ওকে রেখেছে। আমাকে চিনতে পারে কিন্তু সেটা খুবই সাময়িক। মা ডাকটা ওর মুখে আমি শুনতে পাব না। ও বেঁচে আছে এইটুকুই। ভারতবর্ষ হলে অনেকদিন আগেই মরে যেত। এদেশের চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং সরকারি ব্যবস্থায় আমার ছেলে এখনও জীবিত। এটুকুই।'

খুব অবাক হয়েছিলাম। নূপুরের যে ছবিটা এতক্ষণ আমার কাছে ছিল তা একদম বদলে গেল। যেন মাথায় ওপর নেমে আসা ভারটাকে এত হাতে সরিয়ে দিয়ে আবার হাসার চেষ্টা করলেন নূপুর, ঠিক আছে। এই সবই তো জীবনের অঙ্গ। তাই না?'

সেই রাত্রে, অনেক রাত পর্যন্ত আমরা নূপুরের গল্প শুনেছিলাম। জলপাইগুড়ির মতো ছোট মফস্‌সল শহরে বড় হয়ে ওঠা একটি সাধারণ মেয়ে কলকাতায় এসে যে স্বপ্ন দেখেছিল তা পূর্ণ হতে যাচ্ছিল মনের মতো স্বামী পেয়ে। কিন্তু সেই স্বামীর সঙ্গে একদা ভারতবর্ষ ছেড়ে অনেক দেশ ঘুরে আমেরিকায় বসতি স্থাপনের নিরন্তর চেষ্টায় যে দুর্গতি তার হিসেব উনি আগে করেননি। কিন্তু প্রাণপণ লড়াই-এর পরেও ঈশ্বর নির্মম হন কখনও-কখনও। সেই গল্প আমার কাছেও বিস্ময়ের।

নূপুর চেয়েছিলেন আমরা ওঁর কাছে কিছুদিন থাকি। যে-কোনও বাঙালি মেয়ের মতো ভালোমন্দ রেঁধে খাওয়ানোর শখ ওঁর। কিন্তু আমরা বেরিয়ে পড়তে চাইলাম। পরদিন দুপুরে নূপুরই আমাদের পৌঁছে দিয়ে গেলেন গ্রে-হাউন্ড বাস স্টপে। আমরা পশ্চিম থেকে পুবে বাসে চেপে পাড়ি দেব এতে ওঁরও বিস্ময় ছিল। আমাদের সামনে এখন গোটা আমেরিকার ম্যাপ। এখন রয়েছি প্রশান্ত মহাসাগরের গায়ে। মরুভূমি, পাহাড়, কাউবয়দের দেশ পেরিয়ে পৌঁছব আটলান্টিক সাগরের তীরে। আর এই যাত্রাপথের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চাইব আমাদের আগামী সিরিয়ালে।

এখন বেলা বারোটা। নূপুর চলে গিয়েছেন। কলকাতা থেকে কেনা গ্রে-হাউন্ড বাস কোম্পানির টিকিট কাউন্টারে দেখিয়ে আমরা সেটাকে চালু করেছি। একটা বইতে অনেকগুলো কুপন। অনেকটা চেক বই-এর মতো। এক মাসের মধ্যে সেগুলো ফুরিয়ে গেলে আবার পাওয়া যাবে। এক একটা কুপনে এক একটি গন্তব্যস্থলে পৌঁছনো যাবে। আমাদের প্রথম যাত্রাবিরতি লস ভেগাসে। সারা দেশে গ্রে-হাউন্ড কুকুরের ছাপ মারা বাসগুলো ঠিকঠাক সময় মেনে অনবরত ছুটোছুটি করছে। পয়সা যাদের কম অথচ দেশ দেখার যাদের শখ তাদের দারুণ উপকারে আসে এই বাসযাত্রা।

আজ সকালে একটি দুঃসংবাদ পেয়েছি। অরিজিতের ট্র্যাভেলার্স চেকগুলোর হিল্লে হয়নি। এখানকার আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক বারংবার চেষ্টা করেও কলকাতার ট্র্যাভেলার্স চেক ইসুকারী সংস্থাকে ধরতে পারেনি। কেবলই রিং হয়ে যাচ্ছে সেখানে। ওরা নম্বরগুলো সঠিক না বললে এরা টাকা দিতে পারছে না। কলকাতার টেলিফোন সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এদের মিলছে না। আমেরিকান এক্সপ্রেস অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন কনফারমেশন পেলে যে কোনও ব্রাঞ্চে রিপোর্ট করলেই তারা টাকা দিয়ে দেবে। এখন আমাদের শহরই প্রধান অন্তরায়। এই সময় বাসটিকে আসতে দেখলাম গম্ভীর ভঙ্গিতে। ভারী বাসের গায়ে ছুটন্ত কুকুরের ছবি আঁকা। ঝাঁপিয়ে পড়ল বলে।

॥ ৭ ॥

গ্রে-হাউন্ড বাসের ভারিক্কি চেহারা দেখে যে ভক্তি হয়েছিল তা আরও বেড়ে গেল ড্রাইভারের ব্যবহারে। বাস থামামাত্র আগে সেই ভদ্রলোক নামলেন দরজা খোলার পরে। ক'জন যাত্রী এখানে নামলেন, ক'টি আসন খালি আছে তা তিনি জানেন। হাত তুলে বললেন, 'আমি দশ জনকে সঙ্গি করতে পারি। দশ জন চলে আসুন।'

আমরা অপেক্ষায় ছিলাম। টিকিট-বই থেকে লস ভেগাস ছাপমারা পাতাটি ছিঁড়ে নিয়ে বললেন, 'আপনার নিজের জায়গাটি নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে মহাশয়।'

বাসের ভেতরটা শীততাপনিয়ন্ত্রিত। আসনগুলো আরামদায়ক। নানান চেহারার মানুষ ইতিমধ্যেই বসে আছেন। সুব্রতর একটু জানলাবাতিক আছে। তার ভাগ্যে সেটা জুটেও গেল। এত বড় একটি বাসের কর্মী মাত্র একজন, তিনিই ড্রাইভার এবং কন্ডাক্টর। বাসপিছু খরচ সম্ভবত কম। এখন প্লেন এবং ট্রেনের ভাড়া এত বেড়ে গিয়েছে যে সাধারণ মানুষের ভরসা এই বাস কোম্পানিগুলো। শুনেছি এরা নাকি যাত্রীদের নিরাপত্তা, আরাম আর সময়ের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। দেখা যাক।

দরজা বন্ধ করে মাথার কাছ থেকে মাইক্রোফোনের মাউথপিস টেনে নিয়ে ড্রাইভার বললেন, 'আমাদের পরবর্তী স্টেশন লস ভেগাস। লস ভেগাসের ডাউনটাউনে পৌঁছতে পাঁচ ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট লাগবে। পথে পড়বে সান বেমারডিমো, বারস্টো। যাঁরা সিগ্যারেট খেতে চান তাঁরা স্মোকিং সিটে বসে থাকবেন। ধন্যবাদ।'

বাস চালু হল। মসৃণ-গতিতে বাস লস এঞ্জেলস ছাড়িয়ে হাইওয়েতে পড়ল। কোনওরকম ঝাঁকুনি নেই, শরীর আসনে বিছিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে আছি। আমার বাঁ-দিকে জানলার ধারে এক বৃদ্ধা বসে। সাদা চামড়ার মানুষদের অনেকেরই মুখের ভাষা না শুনলে তার জাত বোঝা মুশকিল। বৃদ্ধা উসখুস করছিলেন। তাঁর হাতে ব্যাগ থেকে একটা বই বের করে পড়ার চেষ্টা করলেন। তারপর বই বন্ধ করে আমার দিকে তাকালেন, আমি হাসলাম।

সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর ঠোঁট বিস্তৃত হল, 'যাক, আপনি তাহলে গোমড়ামুখো নন।'

'মানে?' আমি হকচমিয়ে গেলাম।

'বাসে ওঠার পর থেকেই আমি প্রার্থনা করছি আমার পাশে যেন কোনও গোমড়ামুখো না বসে। আসল ব্যাপারটা হল, কথা না বলে আমি থাকতে পারি না।'

হেসে বললাম, 'আপনার সঙ্গে আমার বেশ মিল দেখতে পাচ্ছি।' উনি খুব খুশি হলেন, 'সত্যি? আমি ক্যাথরিন। সান ডিয়াগোতে থাকি।'

'আমি সমরেশ। ভারতবর্ষের মানুষ।'

আমাদের কথা স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজিতে হচ্ছিল। ভদ্রমহিলার পূর্বপুরুষ স্পেন দেশ থেকে এসেছেন। ইংরেজি বলেন আমাদের মতোনই। ফলে সুবিধে হচ্ছিল।

ক্যাথি বললেন,'আমি কখনও এশিয়াতে যাইনি। আর যাবই বা কী করে? প্রত্যেক বছর লস ভেগাসে গিয়ে চার-পাঁচ হাজার ডলার হারলে আর কোথাও যাওয়া যায়? একটা স্কুলে পড়িয়ে আর কত টাকা পাই বলুন?'

'আপনি প্রতি বছর লস ভেগাসে হারতে যান?'

'হারতে কি আর যাই? গিয়ে হারি!'

'হারেন যখন তখন যান কেন?'

'যাওয়ার আগে প্রত্যেকবার ভাবি জিতব, তাই।' খুব হাসলেন ক্যাথি। তারপর ফিসফিস করে বললেন, 'আসলে ওই স্লট মেশিনগুলো আমাকে খুব টানে। তা ছাড়া, কার জন্যে টাকা জমাব বলো? তুমি এর আগে ওখানে গিয়েছ?'

'আজ্ঞে না। এই প্রথমবার।'

'সাবধানে খেলবে। তবে বিগিনার্স লাক বলে একটা কথা আছে। প্রথমবারে আমি বারোশো জিতেছিলাম। তোমার কোনও চিন্তা নেই, আমিই সব বলে দেব। তোমার নামটাকে একটু ছোট্ট করে বলা যায়?'

'আপনার যা ইচ্ছে।'

আমি বন্ধুদের দিকে তাকালাম। সুব্রত একমনে জানলার বাইরের পৃথিবী দেখছে। অরিজিতের পাশে যিনি বসে তাঁর সোনালি চুলের বাহার দেখতে পাচ্ছি। অত সুন্দর চুল যার তার মুখ সুন্দরতর হতে বাধ্য। অরিজিতকে হাসতে দেখলাম। এই দুর্লভ ব্যাপার ঘটল যখন তখন সুন্দরীর সঙ্গে নিশ্চয়ই আলাপ হয়েছে। আমার সন্তোষদার মুখে শোনা একটা গল্প মনে পড়ল। সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর দুই বন্ধুর সঙ্গে একবার জার্মানি গিয়েছিলেন। তিন জনের মধ্যে সন্তোষদাই সুদর্শন। ওঁরা উঠেছিলেন যে বাড়িতে তার মালিকান ছিলেন ছিমছাম। সন্তোষদার মনে হয়েছিল জার্মানিতে এসে ছিমছাম কেন, আসলি সুন্দরীদের সঙ্গে আড্ডা জমাবেন। যে ক'দিন ছিলেন ভুলেও সেই মালিকানের সঙ্গে ভাব করেননি। ফেরার দিন তাঁর কথা মনে পড়ল। কারণ, এই ক'দিনে কোনও জার্মান সুন্দরী সন্তোষদাকে পাত্তা দেয়নি। কিন্তু তখন খুব দেরি হয়ে গিয়েছে। বিদায় নিতে এসে দলের সবচেয়ে খাটো চেহারার মানুষটির গলা জড়িয়ে আদর করে গেলেন ছিমছাম মালিকান। সন্তোষদাকে পাত্তা দিলেন না। ওই দুঃখ সন্তোষদা অনেককাল বহন করেছিলেন। অরিজিতের পাশের সোনালি সুন্দরীটিকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল কিন্তু চলন্ত বাসে হেঁটে এগিয়ে যাওয়াটা অভদ্রতা হবে। এই সময় ক্যাথি আমার বাহুতে টোকা দিলেন, 'ওই দ্যাখো, মরুভূমি।'

এর আগে মরুভূমি দেখেছি সিনেমার পরদায় আর প্লেন থেকে। এখন পর্যন্ত রাজস্থানে যাওয়ার সুযোগ ঘটেনি। অতএব জানলার বাইরে একটা জলজ্যান্ত মরুভূমি দেখে আমি দিশেহারা হবই। দুপাশের আদিগন্ত বালির বুক ভেদ করে চওড়া রাস্তাটা চলে গিয়েছে। এখান থেকে দেখলে মোটেই ভয়ানক মনে হয় না। নাভাদার এই মরু অঞ্চল কিন্তু খুব নিরীহ নয় অন্তত এই শীততাপনিয়ন্ত্রিত বাসে বসে যেমনটি দেখছি। এমনিতেই আমেরিকার রাস্তায় মানুষের চলাফেরা কম, মরুভূমিতে আশা করাই বোকামি

একনাগাড়ে যাত্রা না হলে আমরা মাঝেমধ্যে নামতে পারতাম। পথের গায়ে মাঝে মাঝেই বিশ্রামাগার, মোটেল, চা-জলখাবার পাওয়ার খোঁজ দেওয়ার চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ ক্যাথি নীচু গলায় বললেন, 'তুমি তো প্রথমবার যাচ্ছ, তাই একটা কথা বলি, লস ভেগাসের মেয়েদের সম্পর্কে আগ্রহী হয়ো না

আমরা ভাবনা কোথায় ছিল আর কোথায় নিয়ে এলেন ক্যাথি। বৃদ্ধার দিকে তাকালাম। হয়তো এককালে সুন্দরী ছিলেন কিন্তু সময় দাঁত বসিয়েছে চামড়ায় নির্দয়ভাবে। হঠাৎ মনে হয় এই সাদা মহিলার সঙ্গে আমার জলপাইগুড়ির সেনপাড়ার কনকমাসির কোনও ভেদ নেই। কলকাতায় যাওয়ার সময় কনকমাসি ঠিক একই গলায় আমাকে সতর্ক করেছিলেন।

হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন? ভয়ের কিছু আছে?'

'নিশ্চয়ই' চোখ বড় করলেন ক্যাথি, 'তোমার পয়সা কি সস্তা? পয়সা যদি খরচ করতে হয় তাহলে গরিবদুঃখীকে দান করবে তাতে মনে তৃপ্তি আসবে। কোনও মেয়ের শরীরের জন্যে ইডিয়ট ছাড়া কেউ খরচ করে না। তা ছাড়া এখন ওইসব মেয়েদের শতকরা নব্বইজনের শরীরে এইডসের সম্ভাবনা আছে। জানো?'

যেন নতুন কথা শুনলাম এমনভাবে ঘাড় নাড়লাম। ক্যাথি আশ্বস্ত হলেন। বললেন, 'তুমি কোথায় উঠছ?'

বললাম, 'জানি না। আমার দুই বন্ধু সঙ্গে আছে।'

'ও আমি উঠছি তাজমহলে। একশো ডলার দিনে। ওখানেই চলে এসো!'

একশো ডলার! গলা শুকিয়ে গেল। আমরা পঁচিশ ডলারে তিনজন এক ঘরে থাকার পার্টি। ব্যাপারটা ভদ্রমহিলাকে বোঝানো যাবে না।

বিকেল হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ মরুভূমির বুক ফুঁড়ে সাইনবোর্ড হাজির হতে লাগল। সস্তায় হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট, ক্যাসিনোর নেমন্তন্ন। আপনাকে এমন একটা রাত দেব যা সারা জীবন

মনে রাখবেন। বুঝলাম লস ভেগাস এসে গেছে। কিন্তু সেটা যে এখনও মাইল তিরিশেক দূরে তা পরে বুঝলাম। অন্ধকার হতেই মাঝে-মাঝে নিয়ন সাইন দেখা যাচ্ছিল। ওই ক্যাসিনোর বিজ্ঞাপন। তারপরেই মরুভূমির অন্ধকার। গাড়ির ভেতর একটা হালকা আলো জ্বলছে। চুপচাপ গ্রে-হাউন্ড এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ দূরে আকাশের পটভূমিতে অজস্র হিরেকে জ্বলতে দেখলাম। ক্যাথি নড়েচড়ে বললেন, 'ওই হল লস ভেগাস। কী সুন্দর, তাই না?'

সুন্দর শব্দটির তলায় অনেকগুলো দাগ টানতেই ওঁরা লস ভেগাস শহরটিকে গড়েছেন। শহরে ঢোকার সময় সেইরকম মনে হয়। একজন জুয়াড়ি বলেছিলেন, 'সুন্দর এবং বীভৎস।' দ্বিতীয় শব্দটির অর্থ বোঝার সময় এখনও হয়নি। আমি শুধু বাগ্‌রহিত হয়ে দেখছিলাম ছবির মতো একটা শহর যার রাস্তায় একটাও মানুষ নেই। রাত সাতটাতেও দিনের আলোকে হারিয়ে দিয়ে রাতের আলো জ্বলছে। এক-একটা বাড়ি মানে এক-একটা ক্যাসিনো। বিজলি আলোর এমন বাহার আমি কখনও দেখিনি।

প্রথমে পড়ল ট্রপিকানা, তারপর রিভেইরা। এক মিনিট দাঁড়িয়ে কিছু যাত্রী নামিয়ে বাস ছুটল ডাউনটাউনের দিকে। ট্রপিকানা এবং রিভেইরা যেমন লস ভেগাসের একটা পাড়া তেমনি ক্যাসিনোর নামও। চোখে পড়ল ট্র্যাম্প, তাজমহল, সিজার ইত্যাদি পৃথিবীবিখ্যাত ক্যাসিনো। হঠাৎ মনে হবে একটা স্বপ্নপুরীতে চলে এসেছি যার কোথাও মানুষ নেই। ক্যাথি বললেন, এই শহর দিনে ঘুমোয়, রাত্রে জাগে। এই সময়টা এদের কাছে ভোরের মতো। একটু বাদে সব জমজমাট হয়ে যাবে।'

ডাউনটাউনের গ্রে-হাউন্ড বাস টার্মিনাস তেমন বড় নয়। আসন ছেড়ে মাথার ওপর থেকে সুটকেস নামিয়ে এগোচ্ছি। চার-পাঁচ জন যাত্রীর সামনে অরিজিত এবং সেই সোনালি চুলের মেয়েটি। এখনও তার মুখ দেখতে পাচ্ছি না। সুব্রত আমার সামনে এল, 'খুব জমিয়ে গল্প করতে-করতে এলি'

'পিসিমা মাসিমারা আমাকে সবসময় পছন্দ করেন। কিন্তু সামনে দেখেছিস?'

ততক্ষণে স্বর্ণকেশী বাস থেকে নেমে পড়েছে। অরিজিতকে দেখলাম গম্ভীর মুখে এক পাশে দাঁড়াতে। মেয়েটি চলে যাচ্ছে রাস্তার দিকে। তার মুখ আর দেখা হল না আমার। পরে অরিজিতকে প্রশ্ন করে জেনেছি ওদের কথা হয়েছিল গন্ধ নিয়ে। মেয়েটি ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি কোনও আফটার সেভ ব্যবহার করো?' অরিজিত নামটা বলেছিল। বাস। সুব্রত বলেছিল, 'ওটা একটা ইঙ্গিত ছিল বন্ধুত্ব তৈরি করার।' কী জানি!

বাস থেকে নেমে ক্যাথি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি, আমার হোটেলে যাবে?'

বললাম, 'তাজমহল তো একটু আগে ছাড়িয়ে এলাম। আমার মনে হয় বন্ধুরা এদিকে থাকতেই পছন্দ করবে! তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।'

ক্যাথি মাথা নাড়লেন, 'ঠিক আছে। সময় পেলে ওখানকার ক্যাসিনোতে চলে এসো।' ভদ্রমহিলা একটা ট্যাক্সি নিয়ে তাজমহলের দিকে চলে গেলেন।

সুব্রত বলল, 'চল, একটা গরিবি মোটেল খোঁজা যাক।'

বাস টার্মিনাস থেকে বেরিয়ে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। এখন দু-একজন মানুষ দেখা যাচ্ছে, সামনেই একটা বিরাট হোটেল, হোটেল নাভাদা। তার আকৃতি এবং সাজসজ্জা আমাদের কলকাতার যে-কোনও পাঁচতারার চেয়ে কম নয়। এ দিকে কাছাকাছি কোথাও কোনও মোটেলসাইন দেখতে পাচ্ছি না। অরিজিত বলল, 'দূর! এই রাত্রে আর খোঁজাখুঁজি করতে ইচ্ছে করছে না। ওই হোটেলটায় ঢুকে দেখা যাক।' সুব্রত আঁতকে উঠল, 'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? চেহারা দেখে বুঝতে পারছ না? পকেট খালি হয়ে যাবে।'

এটা আমারও বিশ্বাস। একটি ডলার আমাদের কাছে এখন কুড়ি টাকার চাইতেও মূল্যবান। কিন্তু আশেপাশের কোনও মোটেল নেই। হলিডে-ইন আছে কিন্তু তার মূল্য আমরা জানি। শেষপর্যন্ত

অরিজিতের জেদেই আমরা হোটেল নাভাদার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। বাঁ-দিকে বিরাট হলঘর। সেখানে রঙিন আলোয় ক্যাসিনোয় কিছু মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে। স্লট মেশিনের হাতল টানার শব্দ কানে আসছে। ডানদিকে রিসেপসন। সেখান থেকে ডাক ভেসে এল, 'এই যে ভদ্রমহোদয়গণ, আমি কি কোনও সাহায্যে আসতে পারি?'

রিসেপসনিস্ট ছেলেটি বেজায় মোটা। গায়ের চামড়া তামাটে। তার সামনে পৌঁছে অরিজিত বলল, 'আমরা একটা ঘর পেতে পারি।'

'অবশ্যই। সেই জন্যেই তো দাঁড়িয়ে আছি। কদিন থাকবেন?'

'এখনও ঠিক করিনি।'

'ঠিক করলে জানাবেন। ক'জন আছেন? তিন জন? হুম্। দুটো খাট আছে, এক জনকে ম্যানেজ করে নিতে হবে। এটা অবশ্য নিয়ম নয়। একুশ ডলার দিন আর এইখানটায় নামধাম পাসপোর্ট নাম্বার লিখে সই করে ফেলুন।'

তিন জনেই হকচকিয়ে গেলাম। একুশ ডলার? ঠিক শুনছি তো? অরিজিত জিজ্ঞাসা করল, 'কত ডলার দিতে হবে বললেন?'

'একদিনের জন্যে একুশ ডলার।'

অরিজিত চটপট দিয়ে দিল। সইসাবুদ করার পর রিসেপসনিস্ট দুটো চাবি দিয়ে বলল, 'ওই লিফটে উঠে সোজা আটতলায় চলে যান। বাইশ নম্বর ঘর। আটশো বাইশ। আপনারা তিনজন আছেন? একটু বেআইনি, তবু, ঠিক আছে। এই তিনটে কুপন রাখুন। চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে। যদি থাকাটা বাড়ান তাহলে কাল এসে আবার কুপন নিয়ে যাবেন। আপনাদের রাতটা ভালো কাটুক।'

অরিজিত জিজ্ঞাসা করল, 'এগুলো কীসের কুপন?'

ছেলেটি বলল, 'এই হোটেলের পক্ষ থেকে, এই একটু—।'

লিফটে চেপে আটতলায় পৌঁছলাম। পরিচ্ছন্ন গোলকধাঁধার মতো দামি কার্পেটে মোড়া করিডোর। ঘরের চাবি খুলে আমরা বেশ পুলকিত। বিশাল ঘর। দুটো চমৎকার চওড়া বিছানা। টিভি টেলিফোন থেকে বাথরুমের বেশ স্বচ্ছন্দ ব্যবস্থা। ঘরের লাগোয়া ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সমস্ত লস ভেগাসকে বুকে হিরে নিয়ে জ্বলতে দেখলাম। চোখ জুড়িয়ে গেল।

অরিজিত ততক্ষণে সোফায় বসে কুপন পরীক্ষা করছিল। সুব্রত আমার পাশে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী ব্যাপার রে? পঁচিশ ডলারে মোটেলে যে ঘর পাওয়া গেছে এ তো তার চারগুণ ভালো। একুশ ডলারে কী করে দিচ্ছে?'

এই সময় অরিজিত কুপন হতে এগিয়ে এল, 'আরও আছে। আজ রাত্রে আমরা বিনিপয়সায় ডিনার খেতে পারব চারটে রেস্টুরেন্টে। কাল সকালের ব্রেকফাস্ট এবং দুপুরের লাঞ্চ ফ্রি। আর এতেও যদি কারও খিদে না মেটে তাহলে সে এক প্লেটের দাম দিয়ে দুই প্লেট খাবার পাবে এই কুপন দেখালে। এরকম ব্যাপার জীবনে শুনিনি।'

নতুন কেউ লস ভেগাসে এলে এইরকম বিস্মিত হবেন। আমরা তিনটে মানুষ মাথাপিছু সাত ডলারে তিনবেলা পেটভরতি উপাদেয় খাবার খেয়েছি এবং তারকা হোটেলে আরামে থেকেছি। কলকাতাতেও তো এমন কল্পনা করা যায় না। সুব্রত কুপনগুলো থেকে আবিষ্কার করল গোটা ছয়েক ক্যাসিনো বলছে সেখানে গিয়ে ওই কুপন দেখালে তারা রকমারি গিফট দেবে। এ তো এক কথায় স্বর্গের চেয়েও লোভনীয়।

উত্তরটা খানিক পরে পেয়েছিলাম। পৃথিবীর অন্যতম নামি জুয়োর শহর হল লস ভেগাস। এখানে এসে থাকা-খাওয়াটা কোনও ব্যাপারই নয়। তাজমহল অথবা সিজারে থাকতে গেলে মাথাপিছু একশো ডলার লাগে। কারণ ওখানকার যা ব্যবস্থা তা আমেরিকার যে কোনও শহরে অন্তত দৈনিক পাঁচশো ডলারের হোটেলের সমান। এই ঢালাও ছাড় দেওয়া হয়েছে কারণ এই শহরের প্রধান রোজগার

জুয়ো থেকে এবং এরা আশা করেন যে আপনি এখানে থাকলে জুয়ো খেলবেনই। আর কে না জানে একশোজন জুয়াড়ির মধ্যে একজন লাভের মুখ দেখেন আর বাকি নিরানব্বুই জনের পকেটের ডলার এদের তহবিলে জমা হয়। লস ভেগাসে সরকারি ব্যবস্থা চমৎকার কিন্তু ক্যাসিনোর মালিকরা স্থির করেছেন তাঁরা কোনও মতেই এখানে অপ্রিয়কাণ্ড ঘটতে দেবেন না। তাঁদের নিজস্ব রক্ষীবাহিনী সর্বদাই সজাগ। রাত তিনটেতেও স্বচ্ছন্দে হেঁটে বেড়ানো যায়। এঁরা নাকি একবার বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, আপনি লস ভেগাসে বেড়াতে আসুন। ডলার হয় আপনার নয় আমাদের পকেটের ভার বাড়াবে কিন্তু তৃতীয় কারোর হাতে পড়বে না। কিন্তু বঙ্গসন্তানের পক্ষে এত সুযোগ সুবিধে একসঙ্গে পেলে হজম করতে একটু মুশকিল হবেই।

দশটা নাগাদ আমরা সেজেগুজে নীচে নামলাম লস ভেগাসে মোটেই ঠান্ডা নেই। গরমও লাগছে না এই মরুশহরে। নাভাদা হোটেলের এই ক্যাসিনোর স্লট মেশিনগুলোর সামনে তেমন ভিড় নেই। তাসের আসরে কিছু লোক আছেন। গ্ল্যামারের দিক দিয়ে এটি নিশ্চয়ই চোখে পড়ার মতো নয়। আমরা রাস্তায় নামলাম। মানুষজন দেখতে পাচ্ছি। পুজোর সময় মণ্ডপে-মণ্ডপে ঘোরার যে জনতা দেখা যায় এঁদের মনে হল সেই মেজাজে ক্যাসিনোগুলোতে ঢুঁ মারছেন। গ্রে-হাউন্ড টার্মিনাসের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম এক বাস বৃদ্ধা মহিলা নামলেন। এঁদের অনেকেই ভালো করে হাঁটতে পারছেন না। কিন্তু জুয়ো খেলার নেশায় ছুটে এসেছেন।

অরিজিত আর সুব্রত ঠিক করল আজ রাত্রে ডিনার খেয়ে বিশ্রাম নেবে। কাল ঘুরবে। সামনেই ক্রাউন নামের একটি ক্যাসিনো। সেখানকার রেস্টুরেন্টে আমাদের ডিনার খাওয়ার কথা। ঢুকে দেখলাম এদের ক্যাসিনো বেশ রমরমে। ভিড়ও বেশ। একপাশের ডায়াসে সুন্দরী স্বল্পবসনা গায়িকা প্রেমের গান গাইছেন চমৎকার গলায়। আমরা দামি রেস্টুরেন্টে ঢুকে টেবিল নিতে ওয়েটার হাসি মুখে কুপন নিয়ে গেল। তার পোশাক আমার চেয়েও মূল্যবান। খাবার এল। সুস্বাদু। খাওয়ার শেষে একটি ছাপা কাগজ দিয়ে গেল ওয়েটার তাতে লেখা, এই রেস্টুরেন্ট আপনাকে পেয়ে গর্বিত। ধন্যবাদ।

অরিজিত বলল, 'এইভাবে খালি হাতে খেয়ে যেতে খারাপ লাগছে। কিছু দিয়ে যাই ওয়েটারকে। কত দেওয়া যায়?'

আমেরিকান কোনও দামি রেস্টুরেন্টে কখনও খাইনি এর আগে। কলকাতা হলে দশ টাকা দিলেই চলত। এখানে তো এক ডলারও দেওয়া যায় না। অতএব অরিজিত একটা পাঁচ ডলারের নোট প্লেটে রেখে উঠে দাঁড়াল। আমরা ক্রাউনের ক্যাসিনো ঘুরে দেখলাম। রঙিন আলোয় মোড়া ক্যাসিনোর স্লট মেশিনগুলোর গায়ে এক সেন্ট থেকে দশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ, এক ডলার, পাঁচ এবং পঞ্চাশ ডলারের ছাপ মারা আছে। প্রতিনি সারিতে ডলার ভাঙিয়ে টোকেন দেওয়ার ব্যবস্থা। সেখান থেকে টোকেন নিয়ে নিজের বাজেট অনুযায়ী স্লট মেশিনের সামনে বসে যাও। টোকেন গর্তে ফেলো এবং হাতল ধরে টানো। সঙ্গে-সঙ্গে সামনে নানারকমের ছবি এবং অক্ষর ভেসে উঠবে। কোন কোন ছবি বা অক্ষর সমান্তরাল এলে কত পাওয়া যাবে তা মেশিনের গায়ে লেখা আছে। দেখলাম তেমন ভাগ্যবান হলে পঁচিশ সেন্টের টোকেনে এক হাজার ডলারও পাওয়া যায়।

ওপাশে রুলেট খেলা হচ্ছে। তার পাশে রামি। খেলোয়াড়দের পোশাক দেখলেই বোঝা যায় ওড়াবার মতো প্রচুর টাকা তাঁদের আছে। ক্রাউন থেকে বেরিয়ে আমরা দাঁড়ালাম। এত তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরতে ইচ্ছে করছিল না আমার। লস ভেগাসে এখন সবে সন্ধে। সুব্রত বলল, 'একা একা ঘুরবি, যদি কিছু হয়ে যায়? দরকার কী? কাল সকালেই বরং—।'

ওদের সঙ্গে নাভাদা হোটেল পযন্ত এলাম আমি। ওরা লিফটে উঠে গেলে ক্যাসিনোর চারপাশে তাকালাম। আমার কাছের একটা স্লট মেশিন থেকে পয়সা পড়ছে। এক মাঝবয়সি ভদ্রলোক যিনি হাতল টেনেছেন তিনি নির্লিপ্ত চোখে সেই পয়সা পড়া দেখছেন। টুং টাং আওয়াজটা বড় মধুর। আমি এগিয়ে গেলাম বার কাউন্টারে। এখানে একটার দাম দিয়ে দুটো বিয়ার পাওয়া যায়। পাশের

লম্বা টুলে পা ঝুলিয়ে বসেছিল এক কালো প্রৌঢ়। চোখাচোখি হতে লোকটা হাসল। কেমন দালাল গোছের হাসি; 'পাকিস্তান?'

'না। ভারতবর্ষ।' 'তাই? আমি নিউ দিল্লিতে ছিলাম কিছুদিন। আজই এখানে আসা হল?'

বিয়ার খেতে-খেতে মাথা নাড়লাম, 'হ্যাঁ।'

'আমি স্যাম। এখানেই থাকি। কত নম্বরে আছ?'

'আটশো বাইশ।'

'ও, তিন জন?'

অবাক হলাম, জানল কী করে? মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম।

'তোমার বন্ধুরা কোথায়?'

'ওরা আজ রাত্রে বেরুবে না।'

'সে কী? আনন্দ করতে হলে এই শহরে এখনই তো সেরা সময়। তোমার কোনও সমস্যা হলে আমাকে বলো। স্যাম নামটা মনে রেখো।'

'এখানকার সবচেয়ে বড় ক্যাসিনো কোনটা?'

'লিজার, ট্যাম্প, তাজমহল। একশো ডলারের স্লট আছে ওদের। জ্যাকপট পঞ্চাশ হাজার ডলার। অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ শোনো, ওই মেশিনে যেও না।'

'কেন?'

'কক্ষনো জিতবে না। তোমার ভাগ্য পরীক্ষা করবে পঁচিশ সেন্টের মেশিনে।' লোকটা আর একটু এগিয়ে এল, 'যে মেশিন থেকে একবার পেমেন্ট পাবে সেটার দখল ছাড়বে না অন্তত আরও তিরিশটা দান। বুঝেছ?'

'বুঝলাম।'

'রামি খেলতে জানো।'

'জানি।'

'তাহলে ওই বোর্ডে যাও। কম স্টেক। পাঁচ ডলার পয়েন্ট।'

মানে একশো টাকা। কলকাতায় পঞ্চাশ পয়সা পয়েন্টে রামি খেলতে হলে দুবার চিন্তা করতে হয়। আমাকে পাগলা মশায় কামড়ায়নি। হঠাৎ স্যাম ঘুরে বসল, 'হাই, জিনা। তুমি কোত্থেকে? কতদিন পরে দেখছি।'

দেখলাম মোটাসোটা একদা সুন্দরী এক সাদা মহিলা, যার মুখে প্রচুর রঙের প্রলেপ, এগিয়ে এসে স্যামের গালে চুমু খেলেন, 'আরে স্যাম, আঙ্কল স্যাম তুমি এখনও একইরকম আছ? একটুও পাল্টাওনি।'

স্যাম হাসল, 'কফিনে যাওয়ার পর পালটাব। দেখতে পাবে না। তা কী ব্যাপার? কোথায় হাওয়া হয়ে গিয়েছিলে এই পনেরো বছর?'

'কেন, জানো না? আমি বিয়ে করেছি। ডালাসে আছি। মাস তিনেক আগে স্বামী মরে গেল। তাই ভাবলাম একবার পুরোনো জায়গাটা ঘুরে আসি।'

'খুব ভালো করেছ।' স্যাম আমার দিকে তাকাল, 'এই হল জিনা। যৌবনে, তা ধরো, পনেরো বছর আগে, ওর সময় পাওয়ার জন্যে লোকে তিন-চারশো ডলার খরচ করত। হঠাৎ হাওয়া হয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। বিয়ে করেছিল, শুনলে তো।'

জিনা এবার আমাকে দেখল, 'এটি কে?'

'ভারতবর্ষে থাকে। ভালো লোক। কেমন লাগছে বলো?'

জিনা মাথা নাড়ল, 'ভালো না। নিজেকে মানাতে পারছি না।'

'ঠিক।' স্যাম মাথা নাড়ল, 'যেখানে যৌবনে কেউ মাতিয়ে বেড়ায় সেখানে প্রৌঢ় অবস্থায়

কখনই ফিরে আসা উচিত নয়। নিজেকে আউটসাইডার মনে হয়।'

'তুমি কি করে আছ এখানে?'

'আমি? সারদিন ঘুমিয়ে থাকি আর সন্ধের পরে এই টুলে বসে বিয়ার খাই। তাকিয়ে দেখি ছেলেছোকরারা আমার কাজটাই করছে। নতুন মেয়েরা তোমার জায়গা নিয়েছে। কিন্তু একটা কথা জিনা, আমাদের সময় ব্যবসাটায় সততা ছিল, একন সেসব গোল্লায় গেছে।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। জানি এই দুই প্রাক্তন ব্যবসায়ী এখন শুধু স্মৃতি হাতড়াবে। দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে রাস্তায় হাঁটছিলাম। একটার পর একটা ক্যাসিনো সামনে পড়ছে। সেখানে কতরকমের বিনি পয়সায় কিছু পাইয়ে দেওয়ার বিজ্ঞাপন। সিজার, ট্র্যাম্প চোখে পড়ল। ঢুকলাম তাজমহলে। ইন্দ্রসভা দেখিনি। কিন্তু শ্বেতপাথরের এই ক্যাসিনোতে দেড়খানা ফুটবল মাঠ ঢুকে যায়। এখানকার খদ্দেরদের চেহারা আলাদা। দশ ডলার ভাঙিয়ে কুড়িটা পঞ্চাশ সেন্টের টোকেন নিয়ে একটা স্লটের সামনের টুলে বসলাম। এক দুই তিন করে আটটা টোকেন গিলে ফেলল মেশিন। হাতল টানছি, কোনও নম্বরই অর্থবান হচ্ছে না। চারটে সাত একসঙ্গে ঘুরে এলে দু-হাজার ডলার পাওয়া যাবে। নয় নম্বর টোকেন ফেলে টানতেই শব্দ হল। ঝন ঝন। আঃ। পয়সা পড়ছে। কুড়িটা টোকেন। অর্থাৎ দশ ডলার। তার মানে আমার লাভ সাড়ে দশ ডলার। টোকেন কুড়িয়ে পকেটে ফেললাম। একসঙ্গে দুটো টোকেন ফেললে পেমেন্ট হলে দ্বিগুণ হবে। সুন্দরী স্বল্পবসনা বুকের নীচে ট্রে ঝুলিয়ে জিজ্ঞাসা করে গেল কোনও পানীয় চাই কিনা। জানতাম না এগুলো বিনামূল্যে পাওয়া যায়, তাই না বললাম। টোকেন ফেলছি এবং কোনও সাড়া নেই। হাতে যখন মাত্র দুটো অবশিষ্ট তখন শব্দ হল। পঞ্চাশটি পড়ল। মানে পঁচিশ ডলার। আমার লাভ ষোলো ডলার। এখন হোটেলে ফিরে গেলে কীরকম হয়। পাশের মেশিনে যিনি বসে ছিলেন তিনি হাসলেন, 'তোমার কপাল দেখছি খুব ভালো। কেন তুমি এক ডলারের মেশিনে বসছ না। বসা উচিত।'

তাই? উঠে পড়লাম। পঞ্চাশের টোকেন এক ডলারে পরিবর্তন করিয়ে নিলাম চেঞ্জ কাউন্টার থেকে। এক ডলারের মেশিন। একটা টোকেন মানে কুড়ি টাকা। ছাব্বিশটা আছে। মাঝে-মাঝে পাচ্ছি, মাঝে-মাঝে যাচ্ছে। একসময় সত্তর ডলার হল। কিছুক্ষণ বাদেই পকেট খালি। উঠছি, পকেটের নোট ভাঙিয়ে টোকেন কিনছি। রাত তখন তিনটে। এমন ঘোরের মধ্যে সময় কেটেছে কোনও দিকেই খেয়াল নেই। এখানকার মেশিনের ওপরে সাহায্যকারিণী আছে। তারাই টোকেন এনে দেয়। আবিষ্কার করলাম আমি সাড়ে চাড়শো হারছি। শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরেও ঘাম বেরিয়ে গেছে। হঠাৎ শীত-শীত করতে লাগল। এত টাকা হেরেছি? আমি এখন কী করব? উঠে দাঁড়াতেই সুন্দরী সাহায্যকারিণী আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল, 'এ কী এত তাড়াতাড়ি হাল ছেড়ে দিচ্ছেন? আরও কিছুক্ষণ চেষ্টা করুন!'

আমি হাসলাম। মনে-মনে বললাম, অনেক হয়েছে। আমি উঠতেই এক শীর্ণা বৃদ্ধা এসে আমার টুলে বসলেন। বাইরে বেরুবো বলে সবে হাঁটতে শুরু করেছি এমন সময় ঝনঝন শব্দ শুরু হল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম এতক্ষণ যে মেশিনে আমি টোকেন ঢালছিলাম তার ওপরের লাল আলোটা দপ-দপ করছে। আমাকে দাঁড়াতে দেখে সেই সাহায্যকারিণী চিৎকার করে উঠল, 'আপনাকে বললাম আর একটু খেলুন, দেখুন, ওই মেশিনে একটা ডলারের টোকেন ফেলতেই সেমি জ্যাকপট পেমেন্ট হচ্ছে।' সেমি জ্যাকপট মানে দশ হাজার ডলার। বৃদ্ধা পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন। ক্যাসিনোর বড় কর্মচারীরা ছুটে এসেছে। তারা বৃদ্ধাকে চেকে পেমেন্ট দেবে ট্যাক্স কেটে রেখে।

তখন রাত সাড়ে তিনটে। দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে লস ভেগাসের রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। নির্জন সুনসান রাত। কিন্তু আলোকিত, বড্ড বেশি আলোকিত। আর একটা টোকেন ফেললেই আমি দশ হাজার ডলার পেয়ে যেতাম। সারা রাত ধরে এখন একটার-পর-একটা টোকেন ফেলে গিয়েছি তখন মেশিনটা উগরেছে কম, গিলেছে বেশি। আর একটা? ওই বড়লোক বৃদ্ধার চেয়ে আমার কাছে এখন দশ হাজার ডলারের দাম অনেক বেশি। কিন্তু তা তো হল। আমার জীবনভর এই একটা

ব্যাপার এতবার ঘটছে যে এখন বেশিক্ষণ মন মোচড় মারে না। মাথায় পাক খাচ্ছে আমার যে সাড়ে চারশো ডলার কমে গেল। এতদিনের প্রোগ্রাম সামনে, প্রতিটি মুহূর্তে ডলারের প্রয়োজন। বিদেশ বিঁভুইতে কেউ তো আমার মুখ দেখে দান করবে না।

নাভাদা হোটেলে ফিরে এলাম। সেই বারের কাউন্টারের সামনে স্যাম পা ছড়িয়ে বসে। দেখলেই বোঝা যায় ভালো নেশা হয়েছে। তার পাশের টুলে জিনা। সে-ও দুলছে। আমাকে দেখেই স্যাম হাত নাড়ল, 'কত হারলে?'

'সাড়ে চারশো।' খুব বিরক্ত হলাম।

'আহা রে। জিনা, আমার বন্ধুটি হেরেছে। জিনা?' স্যাম এবার আমার দিকে তাকাল,'তুমি মেশিন পরিবর্তন করেছিলে?'

'হ্যাঁ। পঞ্চাশ থেকে একে গিয়েছিলাম।'

'তাই বলো। মেশিন পালটালে এই জিনার মতো দশা হবেই। হেরে ভূত হয়ে গেছে ও। বেশ এই মেশিনে মানে লস ভেগাসে করে খাচ্ছিল, পালটে চলে গেল বিয়ে করে ডালাসে। এখন ফিরে এসেছে ধুপসি মোটা হয়ে যৌবন হারিয়ে। যাক গে, মেশিনে বোসো না আর, ইচ্ছে হলে সিজারে গিয়ে রেস খেলো, তাও ভালো।'

স্যামের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওপরে উঠে এলাম একা। চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে দেখলাম সুব্রত আর অরিজিত গভীর ঘুমে। ওরা কেউ এখনও আমার অবস্থা জানে না। বিছানায় চুপচাপ শরীর এলিয়ে দেখছি ঘুম আসছে না। মাথায় একটাই চিন্তা পাক খাচ্ছে। আমাকে জিততেই হবে, যে করেই হোক।

॥ ৮ ॥

চোখ মেলতেই আকাশটাকে দেখতে পেলাম। ঘষা কাচের মতো আকাশ। বিশ্রী। আমার মুখ ব্যালকনির দিকে ফেরানো ছিল। ব্যালকনির দরজাটা খোলা। ঘরে কেউ নেই। বাইরে এখন না রোদ না ছায়া। ওরা কোথায় গেল?

বিছানা ছাড়তেই বুঝলাম শরীরে আলস্য জমেছে। ঘড়িতে এখন বারোটা। অর্থাৎ দুপুর বারোটা এবং আমি এতক্ষণে বেঘোরে ঘুমাচ্ছিলাম। তারপরেই মনে পড়ল কাল প্রায় ভোরে এই ঘরে ফিরেছি সাড়ে চারশো ডলার খুইয়ে। চিনচিন করে উঠল কিছু। সুব্রতরা নিশ্চয়ই আমাকে ঘুমোতে দেখে বেড়াতে বেরিয়েছে।

একেবারে স্নান সেরে সঞ্চয় নিয়ে বসলাম। যা টাকা আছে তাতে কোনওমতে হয়তো চলে যাবে। কলকাতা থেকে নিয়ে আসা সিগারেট শেষ হতে চলেছে। এখানে এক প্যাকেট মাঝারি সিগারেট কিনতে দেড় ডলার বেরিয়ে যায়। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না কী করে কাল রাত্রে অতগুলো টাকা হারলাম। হারের সময় এমন একটা ঘোর তৈরি হয় যে পরে তার হদিশ পাওয়া যায় না।

এই সময় অরিজিতরা ফিরল। সুব্রত প্রথম প্রশ্ন, 'কত হারলি?'

হাসতে চেষ্টা করলাম, 'সামান্য।'

অরিজিত বলল, 'ইম্পসিবল। ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছে প্রচুর হেরেছে। নিশ্চয়ই গল্প শোনাবে, ভালো জিতছিলাম, জিততে-জিততে হেরে গেলাম।'

আমি কিছুই বললাম না। সুব্রত বিভিন্ন ক্যাসিনোয় ঘুরে কুপন দেখিয়ে গিফট নিয়ে এসেছে। পার্স, কলম, অ্যাশট্রে। ওদের ব্রেকফাস্টও বিনা পয়সায় খাওয়া হয়ে গিয়েছে। অতএব আমি একাই নামলাম। নাভাদার রেস্টুরেন্টে কুপন দেখিয়ে একটা হট ডগ আর কফি পেটে পুরলাম। স্যাম এখন

নেই। তাদের টেবিলে বেশ ভিড়। এই সময় সুব্রত নেমে এল, 'কোথায় যাবি?'

'জুয়ো খেলতে।'

'কাল কত হেরেছিস রে?'

'বেশি না।' আমি অঙ্কটা বলতে চাইছিলাম না।

আমরা হাঁটতে-হাঁটতে সিজারে ঢুকলাম। এটি খুব অভিজাত ক্যাসিনো। জুলিয়াস সিজারের শ্বেতপাথরের মূর্তি সামনে। না, স্লট মেশিনে আর বসব না। স্যামের উপদেশ মনে পড়ল। ঘুরতে-ঘুরতে একপাশে রেস গ্যালারি আবিষ্কার করলাম দর্শকদের বসার জন্যে গ্যালারিতে উলটোদিকে বড় পর্দায় রেস দেখানো হচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় যত রেস হয় সবই এক সঙ্গে এখানে দেখিয়ে দর্শকদের কাছ থেকে বেটিং নেওয়া হয়। সুব্রতর আপত্তি সত্ত্বেও আমি বেছে নিলাম লস এঞ্জেলস রেসকোর্সকে। তার কাগজপত্রও জুটে গেল। দৌড় লেখার আগে আমাকে এক অগ্রজ সাহিত্যিক রেসের মাঠ চিনিয়েছিলেন। তারপর কতরকম ফরমুলা, কত সমীক্ষা, তুকতাক জেনেছি রেস রেতার জন্যে। তার সবগুলো কাজে লাগিয়ে সুব্রতকে বললাম, 'এই রেসে তিন নম্বর ঘোড়া জিতবে।'

সুব্রত বলল, 'ঠিক আছে, চুপচাপ বসে দ্যাখ ওটা জেতে কি না।'

আমরা দেখলাম। তিন নম্বর দ্বিতীয় হল। সুব্রত বলল, 'দেখলি, তোর কিছু টাকা বেঁচে গেল। চল এখান থেকে।'

আমার মাথায় তখন জেদ চেপেছে। পরের বাজিতে এক নম্বর ঘোড়া কলকাতার রেসুরেদের থিওরি অনুযায়ী জেতা উচিত। দশ ডলার খেললে ষাট ডলার পাওয়া যাবে। আমি উঠে কাউন্টার থেকে টিকিট কিনে নিয়ে এলাম। এসে দেখি সুব্রতর পাশে একটি মধ্যবয়সিনী বসে আছেন। তিনি সুব্রতকে জিজ্ঞাসা করছেন কত নম্বর জিততে পারে। সুব্রত, যে কখনও রেসের মাঠে যায়নি, বোঝেও না। সে গম্ভীর গলায় জবাব দিল, এক নম্বর।

এখানে বিনি পয়সায় বিয়ার, পেপসি, কোক নিয়ে সুন্দরীরা ঘুরছেন। আমরা একের পর এক কোক খেয়ে যেতে লাগলাম এবং এক নম্বর জিতল। ষাট ডলার নিয়ে ফিরে আসামাত্র সুব্রত আমার কাছ থেকে পঞ্চাশ নিয়ে নিল, 'ওটা আমার কাছে থাক, তুই মূল নিয়ে লড়ে যা।'

এই সময় সেই মহিলাটি সুব্রতর কাছে ছুটে এলেন, 'তুমি আমাকে বললে তবু আমি খেললাম না, কত বড় গাধা আমি। এবার কে জিতবে, প্লিজ, বলো।'

সুব্রত মাথা নাড়ল, 'দেখুন, আমি রেসের কিছু বুঝি না।'

'আঃ, বাজে বকে না। প্লিজ বলো না।'

সুব্রত আমার দিকে তাকাল। পরের রেসের কোনও ঘোড়া জিতবে আমি ধরতে পারছি না। কিন্তু তার পরেরটা সাত নম্বরের জেতার সম্ভাবনা আছে। মহিলাকে সুব্রত সেইকথাই জানিয়ে দিল। তিনি খুশি, খুব খুশি।

সেই বিকেলে আমরা যখন বেরিয়ে এলাম সুব্রতর কাছে তখন সাড়ে তিনশো ডলার। দুদিনে আমার হার মাত্র একশো। একশো ডলারকে মাত্র বলে ভাবতে খুব ভালো লাগছিল তখন।

সন্ধ্যেটা খুব ভদ্রলোক হয়ে কাটালাম আমরা। কোনও জুয়ো নয়, ঘুরে-ঘুরে দেখা। সুব্রতর খুব ইচ্ছে একটা আইসব্যালে দেখার। ক্যাসিনোর বাইরের বিজ্ঞাপন বলছে সুন্দরী নর্তকীরা বিবসনা হয়ে নাচবেন। টিকিট কেটে ভেতরে ঢোকা হল। ছোট-ছোট টেবিল। টেবিলে বিনা মূল্যে পানীয় দেওয়া হচ্ছে। সামনে মঞ্চে নৃত্যনাটক শুরু হল। প্রথম দর্শনের নগ্নতার চমক কেটে গেলে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। ছেলেমেয়েগুলো শরীরের প্রতিটি হাড়কে যেন ইচ্ছেমত বেঁকাতে পারে। বরফের ওপর স্কেটিং করতে-করতে ওরা এখন এমন এক একটা কম্পোজিশন করছিল যে ভালো না লেগে উপায় নেই। ওই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল সৌন্দর্যই শরীরের সবচেয়ে বড় পোশাক।

আমেরিকায় বেড়াতে এসে কারও যদি পয়সা কমে যায়, ফেরার দিনটি একটু দেরি থাকে,

তাহলে তাঁর পক্ষে লস ভেগাস হল আদর্শ জায়গা যদি তিনি জুয়ো থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেন। সুব্রত একটি পয়সাও জুয়োর পেছনে ব্যয় করেনি এই জুয়োর শহরে এসে। অরিজিত পাঁচ ছয় ডলার হেরে বলেছে, 'ধুত্তোর।'

এই শহরের চরিত্র এবং সৌন্দর্য একেবারে আলাদা। শুটিং-এর পক্ষে চমৎকার। মনোজের গল্পে এই পশ্চিম উপকূল ছিল না। আমরা ওর পুরো উপন্যাসটি সিরিয়ালে তুলত চাই না। দুটি চরিত্র এবং তাঁদের কেন্দ্র করে কিছু ঘটনা যাতে এই দেশটার ছবি পাওয়া যাবে। খোঁজ নিয়ে জানলাম, লস ভেগাসে শুটিং করত হলে ইনসিওরেন্সে যা প্রিমিয়াম গুণতে হবে তা আমাদের বোম্বাই ছবির বাজেটেও সম্ভব নয়। ভদ্রলোক আমাদের বোঝালেন, 'ধরুন, আপনারা একটা নির্জন ফুটপাতে শুটিং করছেন, এমন সময় একজন নাগরিক ইচ্ছে করে এসে আপনাদের ক্যামেরায় স্ট্যান্ডের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল। তাকে ক্ষতিপূরণ কে দেবে? মোটা টাকা চাইবে সে। আপনাদের শুটিং দেখতে গিয়ে কোনও ড্রাইভার অন্যমনস্ক হলে অ্যাকসিডেন্ট অনিবার্য। তখন কে ক্ষতিপূরণ দেবে?'

দুপুর আড়াইটেয় গ্রে হাউন্ডে চড়ে বসলাম। এবার আমাদের কুপনের গায়ে ছাপ পড়েছে ফ্ল্যাগ স্টাফ নামক এক শহরের। ক্যাসিনো এলাকাগুলো ছাড়াতেই লস ভেগাস শেষ। এবার চারপাশে বালি। এমন বালির রাজত্বে কোন বিশ্বকর্মা অথবা ময়দানব ছাড়া এই শহর তৈরি করা সম্ভব নয়। লাফিন, বুলহেড সিটি হয়ে অ্যারিজোনার কিংম্যান শহরে ঢুকলাম সন্ধে সাড়ে ছটায়। কিছুক্ষণ যাত্রারবিরতি। গ্রে হাউন্ডের নিজস্ব রেস্তোরাঁয় বেশ ভিড়। সুব্রত আলুভাজা আর দুধ খেয়ে দিব্যি থাকে আর আমরা হটডগের দিকে হাত বাড়াই। অনেকক্ষণ পেট ভরতি থাকে। একটু একটু শীত লাগছে। জানলাম ফ্ল্যাগস্টাফে পৌঁছুতে রাত দশটা বেজে যাবে। ওখানেই কোন মোটেলে রাত কাটিয়ে পরের দিন গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে যাব আমরা। ছেলেবেলা থেকে আমেরিকান সিনেমায় গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের ছবি দেখেছি। ভয়ঙ্কর সুন্দর প্রাকৃতিক শিল্প সারা পৃথিবীর মানুষকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে।

দশটায় মনে হল ফ্ল্যাগস্টাফে গভীর রাত। কনকনে ঠান্ডা। টার্মিনাসের গরম থেকে বেরিয়ে প্রায় দিশেহারা। রাস্তায় একটাও লোক নেই যে জিজ্ঞাসা করব মোটেল কোথায়। অতএব তিনজনে কাঁপতে-কাঁপতে চলেছি। মিনিট দশেক বাদে নিওন সাইন চোখে পড়ল। পঁচিশ ডলারে এক রাত। একতলায় ব্যারাক বাড়ির মতো মোটেল। ঘরও ছোট। কিন্তু আমাদের শুয়ে পড়া ছাড়া কোনও কাজ নেই। একটাই টয়লেট অতএব অপেক্ষা করা ভালো। আমি ঠান্ডাটা আরও একটু বুঝবার জন্যে দরজার বাইরে পা দিলাম। লম্বা বারান্দা। একটা ভোলভো গাড়ি এসে দাঁড়াল। দুবার মৃদু হর্ন বাজল। ঠিক পাশের দরজা খুলে একজন সুন্দরী বেরিয়ে এগিয়ে গেলেন। চাপা স্বরে কথা হল। না, না, আপত্তি। তিনি ফিরে এসে দরজায় তালা দিয়ে গাড়িতে উঠে গেলেন। সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় সুন্দরী আমার দিকে তাকিয়ে ঘাড় কাত করে হাসলেন। ঠান্ডা বড্ড বেশি লাগল, ঘরে ফিরে এলাম।

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন নামকরণের মধ্যেই সোচ্চার প্রশংসা রয়েছে। তবু বলা যায় গ্র্যান্ড শব্দটিকে নির্বাচিত করা হয়েছিল বিকল্প কিছু না পেয়ে। ফ্যান্টাস্টিক অথবা মার্ভেলাস ইত্যাদি বলা যায় কিন্তু মানুষের তৈরি কোনও শব্দই যেন এই প্রাকৃতিক বিস্ময়ের সঠিক বিশ্লেষণ নয়। গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের অস্তিত্ব প্রথম জানা যায় পনেরোশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দে যখন স্পেনীয় পর্যটক গার্সিয়া লোপেজ এই অঞ্চলে আসেন। অবশ্য তখন গ্র্যান্ডের ভয়ানক চরিত্র সম্পর্কে বিশদ জানা যায়নি। গ্র্যান্ডের সঠিক আবিষ্কার হল আঠারোশো উনসত্তরে। জন ওয়েলেসলি পাওয়েল তাঁর একটা হাত নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অভিযান চালান। অন্যহাতটি তিনি খুইয়েছিলেন জনযুদ্ধের সময়ে। আটানব্বুই দিনে এক হাজার মাইল ধরে গ্র্যান্ডের খাড়ি কলোরাডো নদীর তীর ধরে হেঁটে ছিলেন ভদ্রলোক। আঠারোশো পঁচাত্তরের পাওয়েলের অভিযানের কাহিনি প্রকাশিত হওয়ার পর মানুষের আগ্রহ বাড়তে থাকে ক্যানিয়ন সম্পর্কে। এক বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে প্রকৃতির খেয়ালে তৈরি এই রহস্যঘন ভয়ঙ্কর সুন্দর আকর্ষণ করতে থাকে সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষদের।

ক'দিনের জন্যে বেড়াতে গিয়ে ক্যানিয়নকে পুরোপুরি দেখা সম্ভব নয়। হাঁটাপথে জলের অভাব, মরুভূমির আবহাওয়ার সঙ্গে অদ্ভুত গোলকধাঁধার জন্যে হাতে বেহিসেবি সময় থাকা দরকার। যাদের পকেটে ডলার একটু বেশি তাঁরা ঈগলের চোখে ক্যানিয়নকে দেখতে পারে। এয়ার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন বিজ্ঞাপন দেয় এই বলে, 'গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন অ্যাজ দি ঈগল সিস ইট।' অথবা 'গ্র্যান্ড ক্যানিয়নকে দেখার একমাত্র পথ হল উড়ে চলুন।' দু-ঘণ্টা ধরে ক্যানিয়নের ওপর উড়ে চলার দক্ষিণা হল একশো পনেরো ডলার। এক ঘণ্টার একটি সংক্ষিপ্ত উড়ানের মূল্য পঁয়তাল্লিশ ডলার।

ফ্ল্যাগস্টাফ শহর থেকেই ক্যানিয়নের একটা অংশ ঘুরিয়ে দেখানোর জন্যে বাস ছাড়ে। আমরা তিনজন ছাড়া যাত্রী জনা দশেক। আমাদের ড্রাইভার কাম গাইড ভদ্রলোকটি বেশ রসিক। গাড়ি ছাড়ার আগে মাইক্রোফোনে বললেন, 'প্রিয় ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলারা, আমরা এখন এক আদিম সৌন্দর্যের সন্ধানে চলেছি। আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ আছে, আপনারা ওখানে যাবেন ক্যামেরা নিয়ে। আর ফেলে আসবেন আপনাদের পায়ের ছাপ।' হ্যারি বেশ জনপ্রিয় হয়ে গেল।

ফ্ল্যাগস্টাফ, ছাড়িয়ে মিনিট পঁয়তাল্লিশ নির্জন পথে চলার পর একটা ছোট্ট জায়গায় বাস দাঁড়াল যার সামনে বিশাল প্রেক্ষাগৃহ। ওপরে বোর্ডে লেখা আছে, 'গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন, দি হিডেন সিক্রেটস।' হ্যারি জানাল ক্যানিয়নকে চোখে দেখার আগে পরদায় একটু পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে এই গোবিন্দপুরে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মোশন পিকচার সিস্টেমে দারুণ ছবি দেখানোর ব্যবস্থা আছে। অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত কিথ মেরিলের অনবদ্য সৃষ্টি হল এই ছবি। প্রবেশ মূল্য ছয় ডলার। ইম্যাক্স হল প্রেক্ষাগৃহের নাম। ভেতরে ঢুকে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। দেওয়াল জুড়ে টানটান সত্তর ফুট লম্বা পর্দায় ছয় ট্র্যাকের ডলবি আওয়াজে চৌত্রিশ মিনিট ধরে দেখানো হল গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের নানান রহস্য। দর্শক এবং ছবিকে একাত্ম করার আধুনিক কারিগরি ব্যবস্থা এত সক্রিয় যেন মনে হয় আমি ক্যানিয়নের কোনও খাঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছি অথবা কলোরাডো নদীতে ভেসে বেড়াচ্ছি।

দুপুরের একটু আগে নির্জন পাহাড়ি অঞ্চলে হ্যারি যেখানে গাড়ি দাঁড় করাল তার সামনে একটা রেস্টুরেন্ট, পাশের দোকানের ওপর লেখা, ইন্ডিয়ান আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস। আমরা জানতাম কলম্বাস সাহেবের ভুলের কারণে এখনও আমেরিকান আদিবাসীদের ইন্ডিয়ান বলে চিহ্নিত করা হয়। হ্যারি আমাদের বলছিল, 'এই গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের প্রথম আদিবাসীরা আসে এগারো হাজার বছর আগে। তাদের আমরা বলি পালিও ইন্ডিয়ান। এক থেকে বারোশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ক্যানিয়নের অধিবাসী ছিল আনাসাজি এবং কোকোনিনো ইন্ডিয়ানরা। আনাসাজিরা হরিণ, খরগোস, ভেড়া শিকার করে বেঁচে থাকত। তাদের কেউ-কেউ ঝুড়িও তৈরি করত। পরবর্তীকালে এরাই গ্রাম তৈরি করল, সেচ ব্যবস্থা আবিষ্কার করে চাষবাসে মন দিল। আনাসাজি এবং কোকোনিনোদের মধ্যে ক্রমশ বন্ধুত্ব তৈরি হয়। নিজেদের মধ্যে দেওয়া নেওয়া করত তারা। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রচণ্ড খরার পর এই গ্রামগুলো প্রায় ধ্বংস হয়। আজকের হোপি ইন্ডিয়ান আদিবাসীদের পূর্বপুরুষ হল আনাসাজিরা। ক্যানিয়নের পশ্চিমাংশের আদিবাসীদের বলা হয় হুলাপাই এবং হাভাসাপাই ইন্ডিয়ান। এরা কারবাট ইন্ডিয়ানদের বংশধর। ক্যানিয়নদের পূর্বদিকে রয়েছে যে আদিবাসীরা তাদের বলা হয় ন্যাভোজোস।

বাস ছাড়ার পর একটা দৃশ্য প্রায়ই দেখতে লাগলাম। মাঝে-মাঝে রাস্তার ধারে টেবিল পেতে তার ওপর হাতে তৈরি গয়নাগাঁটি, পাখা, অ্যাশট্রে ইত্যাদি নিয়ে দু-তিন জন বসে আছে। আশে পাশে ঘরবাড়ি নেই। একদম ফাঁকা। হ্যারি জানাল এরাই হল ইন্ডিয়ান। থাকে ক্যানিয়নের গ্রামে। নিজেদের তৈরি জিনিসপত্র গাড়ির যাত্রীদের বিক্রি করার জন্যে এখানে এমন দোকান সাজায়। পোশাক দেখে চেনার উপায় নেই। রেড ইন্ডিয়ানদের যে ছবি দেখেছি তার সঙ্গে কোনও মিল নেই। না মাথায় পালক না সেই পোশাক।

হঠাৎ চোখের সামনে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন তার বিশাল ব্যাপ্তি নিয়ে এসে দাঁড়াল। পাথর কেটে মাইলের পর মাইল ধরে কোনও ভাস্কর পাহাড়ে শিল্প তৈরি করে গেছেন। নীল আকাশের পটভূমিকাতে সেই পাথরে একটুও নোংরা নেই। নীচে, অনেক নীচে বয়ে যাচ্ছে কলোরাডো নদী। আঠারোশো মাইল লম্বা কলোরাডো নদী গ্র্যান্ড ক্যানিয়নকে জড়িয়ে রেখেছে পাকে-পাকে। ওই নদীতে নৌকো বাওয়া রীতিমতো কষ্টকর। জলের স্রোত ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল বেগে ছোটে। একটু জোরে বাতাসে বইলে পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে যে ভয়ংকর শব্দ তৈরি হয় তা নদীর জলের শব্দের সঙ্গে মিশে বুক হিম করে দেয়।

হ্যারির বাস গিয়ে থামল ডেজার্ট ভিউ পয়েন্টে। সিনেমায় দেখা সেই উনবিংশ শতাব্দীর গ্রামগুলোর সঙ্গে চমৎকর মিল। হোপি হাউস, এল ট্রাভর হোটেল, এবং বিভিন্ন স্পট থেকে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের পর্বতচূড়া দেখার ব্যবস্থা রাখা আছে এখানে। হ্যারি আমাদের কাছে চূড়াগুলোর বর্ণনা দিচ্ছিল। হঠাৎ মনে হল নিজের কান ঠিক আছে তো। একটা ফলকের ওপর চূড়ায় ছবি এঁকে পাশে নাম লেখা হয়েছে। পাঠক, বিশ্বাস করুন, আমি পর্বতশিখরগুলোর নাম পড়লাম, বিষ্ণু, রাম, সলোমন এবং সেবা। সলোমন এবং সেবার নামে নামকরণ মেনে নিতে পারি কিন্তু বিষ্ণু এবং রাম! এই এত হাজার-হাজার মাইল দূরে ভারতবর্ষের দুটি ধর্মীয় চরিত্রের নামে পর্বতের নাককরণ কে করল। হ্যারিকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল, 'এগুলো আমরা নিয়েছি ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে।'

অনেকক্ষণ ধরে রেড ইন্ডিয়ান অথবা আমেরিকান আদিবাসীদের ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান বলতে শুনে বিরক্ত হচ্ছিলাম। একটু শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন ইন্ডিয়ান?'

হ্যারি সরল ভঙ্গিতে হাত নেড়ে ক্যানিয়ন দেখাল, 'ওই ওখানে যারা থাকে।'

'ওখানে যারা থাকে তারা ইন্ডিয়ান হবে কেন?'

'মানে?' হকচকিয়ে গেল হ্যারি।

আমি আমার পাশপোর্ট বের করলাম। ন্যাশনালিটি ইন্ডিয়ান। হ্যারির চোখের সামনে সেটি ধরে বললাম, 'এই পাশপোর্ট বলছে, আমি ইন্ডিয়ান। আর ওরা যদি পাশপোর্ট নিতে যায় তাহলে লেখা হবে, আমেরিকান। নয় কি?'

হ্যারি আমতা-আমতা করল, 'তুমি ইন্ডিয়া থেকে এসেছ বলে ইন্ডিয়ান। কিন্তু এদের আমরা চিরকাল ইন্ডিয়ানই বলে এসেছি।'

'ভুল বলেছ। তোমাদের উচিত ওদের আমেরিকান আদিবাসী বলা।'

আমাদের এই কথাগুলো অন্যান্য টুরিস্টরা আগ্রহ নিয়ে শুনছিলেন। তাদের কেউ-কেউ উঁকি মেরে আমার পাশপোর্ট দেখে গেলেন। ওঁদের কাছে তথাকথিত ইন্ডিয়ানদের যে চেহারা এতকাল ছিল তার সঙ্গে আমার মিলছে না। হ্যারির মতো ওরাও বেশ ফাঁপরে পড়লেন।

সুব্রত খুব চিন্তিত ছিল ওই নামগুলো নিয়ে। বলল, এ নিয়ে গবেষণা হওয়া দরকার। হয়তো দেখা যাবে সত্যি একসময় ভারতীয় হিন্দুরা এখানে এসেছিল।'

অরিজিত বলল, 'বরং উলটোটাই ভাবা ভালো। কোনও আমেরিকান ভারতবর্ষে গিয়ে ওই নামগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। ভালো লেগেছিল। চূড়াগুলোর নাম তিনিই দিয়েছেন।'

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে সেই জায়গাটা বেশ উঁচুতে। একটু মাথা নামিয়ে তবেই পর্বতমালা তার খাদ অথবা নদীর সুতোর মতো জল দেখতে হয়। প্রচণ্ড হাওয়া বইছে। একটা মিনারে উঠে আরও খানিকটা খোলা পর্বতমালা দেখলাম। এই মিনার অথবা ওয়াচ টাওয়ারটির গঠন চমকপ্রদ। আমাদের দেশের মিনারগুলোর সঙ্গে ভালো মিল আছে। দক্ষিণ-পশ্চিমের আদিম অধিবাসীরা যেসব মিনার তৈরি করেছেন তারই আদলে এটি তৈরি। নির্জন শান্ত এই জায়গাটিতে যেন সময় স্থির হয়ে আছে। যদিও সকাল হয়, সকাল গড়িয়ে দুপুর পেরিয়ে সন্ধে নামে তবু মার্কিন শহরের কোনও গন্ধ বা তাপ এখানে পৌঁছয় না। ফ্রেড হার্ভে ট্র্যান্সপোর্টেশন কোম্পানির এই ডেজার্ট ভিউ ট্যুর

আমাদের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা।

আমরা ফ্ল্যাগস্টাফে ফিরেছিলাম সন্ধের মুখে। মোটেলে বাড়তি ভাড়া দেব না বলে জিনিসপত্র নিয়েই বেরিয়েছিলাম। হ্যারিকে বলতে সে আমাদের নামিয়ে দিল গ্রে-হাউন্ড বাস স্ট্যান্ডে। রাত ন'টা পঁয়ত্রিশে পরের বাসটি পাওয়া যাবে। গ্রে-হাউন্ডের রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। থরে-থরে নানান খাবার সাজানো। খিদেও পেয়েছে খুব। সুব্রত তার আলু-ভাজা এবং দুধ নিঃশব্দে নিয়ে নিল। বিপাকে পড়লাম আমরা হট ডগ নেই। কিন্তু পেট ভরাবার জন্য বিকল্প খাবারগুলোয় মন ভরছে না। দেখলাম একটা ট্রেতে একদম সাদা ভাত আর তার পাশে আমাদের গ্রাম্য ঝোলের মধ্যে গরুর মাংস ভাসছে। কেন জানি না ওই মাংসটি বার্গারে, স্যান্ডউইচে খেতে কোনও অসুবিধে হয় না কিন্তু ভাতে মেখে খাওয়ার ইচ্ছে একটুও হয় না। রেখে ঢেকে খেলে হয়তো মনটাকে একটু আড়াল করা যায়, তাই। অরিজিত চিকেন স্যান্ডউইচ আর কফি নিল। নিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'ডিনারের পক্ষে এর চেয়ে বেশি কিছু খাওয়া উচিত নয়। তোমরা যে কী করে এত এত গপগপ করে গেলো!' আমি একটা মুরগির ঠ্যাঙ ভাজা আর মিষ্ক সেক নিলাম। আমাদের দেশে সব কিছুর মতো মুরগির শরীরের মাংস খুঁজতে হয়। আমেরিকান মুরগির শরীরে হাড় খুঁজে পেতে সময় লাগে। এইসব কথা বোধহয় প্রশংসার মতো শোনাচ্ছে আর আমেরিকার প্রশংসা করলে বিপাকে পড়তেই হবে। সেই বস্তি বাড়ি আর কোঠা বাড়ির সেন্টিমেন্টকে আমরা বাদ দেব কি করে?

আমরা এখনও অ্যারিজোনায়। পাহাড় অর মরুভূমির দেশ। ভাবতে অবাক লাগে মাত্র শতিনেক বছর আগেও এখানে কেউ বাস করতে আসত না। এই ভয়ংকর জায়গায় পা দিতে সাহস হত না সাধারণ মানুষের। কিন্তু লোভ বড় মারাত্মক জিনিস। সোনা রূপো তামা আর টিনের আকর্ষণ তাদের টেনে আনল এই পাহাড়ি এলাকায়। খুব দ্রুত ধনী হয়ে যাওয়া কিছু মানুষ জমি খুঁড়ত আরও বড়লোক হবে বলে। এখন এসব ইতিহাস। শুধু এখনও পড়ে আছে কিছু ভূতুড়ে শহর সেইসব প্রাচীন কাঠের বাড়ি বুকে নিয়ে। অ্যালবারকুর্কে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

উটা এবং কলোরাডো জুড়ে এই যে পাথুরে পাহাড় তার আয়তন পাঁচশো ষাট কিলোমিটার জুড়ে। এখানে অনেক জায়গায় তাপমাত্রা আটচল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ওঠে, বৃষ্টি হয় মাত্র বছরে দুবার। ব্রিহাম ইয়ং নামের একজন সাহসী মানুষ এমন জায়গায় পাকাপাকি বাসের কথা ভাবেন। মূলত তাঁরই উদ্যোগে আঠারোশো সাতচল্লিশে সল্টলেক সিটির জন্ম। একদিকে সল্টলেক সিটি অন্যদিকে লস এঞ্জেলস, মাঝখানের এই বারেশো ছয় কিলোমিটার কিন্তু এতদিন পরেও আদিম, রহস্যময়।

এই রাতের গ্রে হাউন্ড বাসটিতে সম্ভবত আমাদের জন্যেই তিনটি আসন ফাঁকা ছিল। লক্ষ করেছি প্রবীণরা সাধারণত বাসের প্রথম দিকে বসার চেষ্টা করেন। পেছনদিকটা দখল থাকে তরুণদের। আজ তাদের সংখ্যা বেশি ফলে একটু বেপরোয়া চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। কানে তার গুঁজে গান শুনতে-শুনতে হাত-পা নাচাচ্ছে তারা। একটি অল্পবয়সি মেয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। তার হাত থেকে সেটা টেনে নিয়ে টানতে লাগল একটা কালো ছেলে। মেয়েটা তাকে গালগাল দিয়ে ফেরত নেওয়ার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই নিয়ে হুড়োহুড়ি। বুঝলাম রাতটা এইভাবেই যাবে। গাড়ি ছাড়ার আগে ড্রাইভার মাইক্রোফোন জানিয়ে দিলেন, 'কেউ যদি কোন ড্রাগ, আফিম ইত্যাদি সেবক করেন তাহলে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে। একটু পরেই আমরা নিউ মেক্সিকো প্রদেশে প্রবেশ করব। সেখানে বাসে বসে সিগারেট খাওয়া নিষেধ।'

ঘোষণা শেষ হওয়ামাত্র তরুণদের মুখ থেকে নানারকম আওয়াজ বের হল প্রায় একসঙ্গে। কান ফাটাবার পক্ষে সেটি চমৎকার। বাইরে অন্ধকার। বাস ছুটে চলেছে এখন অ্যালবারকুর্কের দিকে। শহরটির নাম খুব শুনেছি। একে ঘোস্ট টাউনও বলা হয়। অ্যালবারকুর্কের পরেই টেক্সাসের শুরু। টেক্সাস শব্দটির সঙ্গে আমরা আমেরিকান ছবির দৌলতে পরিচিত হয়েছি।

সেই ঘোড়ায় চাপা কাউবয়দের দল। গরমে প্রচণ্ড তাপ আর শীতে ঠান্ডার অত্যাচার তুঙ্গে। মাইলের-পর-মাইল জুড়ে প্রায় সমতলে ঝড়ো বাতাস সবসময় বয়ে যাচ্ছে। জল এখানে খুব দামি পানীয়। এরকম প্রাকৃতিক পরিবেশে একমাত্র রেড ইন্ডিয়ানরা জানত কীভাবে বেঁচে থাকা যায়। বুনো ঘোড়া, মোষ ধরে খাবার জোটানো এদের বেঁচে থাকার একটা অন্যতম উপায় ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনীয় দখলদার বাহিনীর সঙ্গে এরা যুদ্ধ করেছে অস্তিত্ব বাঁচাতে।

এদের কিছু পরেই অজস্র ঘোড়া আর মোষকে নিয়ন্ত্রণ করতে যে রাখালদলকে দেখা গেল তাদের নামকরণ করা হল কাউবয় হিসেবে। বুনো চরিত্রের এই কাউবয়দের সঙ্গে রেড ইন্ডিয়ানদের লড়াই হত জমি দখলের জন্যে। এই কাউবয়রা বাইরের সাদাদের আধিপত্য সহজে মেনে নেয়নি।

কিন্তু বন্যতার স্থায়িত্ব বেশিদিন হয় না। রেড ইন্ডিয়ান এবং কাউবয়দের যুগ একসময় শেষ হল। এখন টেক্সাস হয়ে গিয়েছে চাষের স্বর্গরাজ্য। প্রায় দু-শো হেক্টর জমি চাষ করে মাত্র একজন মানুষ। হয়তো ফসলের প্রয়োজনে। প্রতিবছর দু-একমাসের জন্যে কিছু বাইরের লোক ভাড়া করে কিন্তু বাকি সময় সে একা। এইভাবেই মাইলের পর মাইল ধরে টেক্সাসের চেহারা পালটে গিয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে চাষবাস আজ বর্ধিষ্ণু চেহারা নিয়েছে। সেই কাউবয়দের যুগ শেষ। তবু কিছু লোককে এখন সখের অনুকরণে মাততে দেখা যায়। পুরোনো স্মৃতি বয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা।

রাত যত বাড়তে লাগল বাসের ভেতর তত কথা কমতে লাগল। আমাদের আশেপাশের তরুণের দল এখন চুপচাপ। টয়লেটে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতে দেখতে পেলাম জোড়ায়-জোড়ায় ঘনিষ্ঠ হয়ে ঘুমোচ্ছে তারা। দুজনের জন্যে একটি আসনের বেশি প্রয়োজন নেই তাদের। সবাই যে প্রেমিক-প্রেমিকা এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। হয়তো একটা দল, হয়তো ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের বাসেই আলাপ। আমার ভাবনা সঠিক হল যখন দেখলাম ভোর পাঁচটায় অ্যালবারকুর্কেতে পৌঁছে ছেলেরা হইহই করে নেমে গেল। মেয়েরা গম্ভীর মুখে বসে রইল খানিক। তারপর জোড়া আসন পাওয়ায় যে যার মতো ঘুমিয়ে পড়ল।

দীর্ঘ বাস যাত্রায় একধরনের ক্লান্তি আসে। এই যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাসে বসে আছি, কতক্ষণে নামব তার জন্যে উদ্বেগ, এতে মনে বেশ চাপ পড়ে। সুব্রতর ইচ্ছে ছিল অ্যালবারকুর্কে শহরে একদিন থাকার। কিন্তু আমরা আর একটু এগিয়ে অ্যামারিল্লোতে পৌঁছতে চাইলাম। সম্ভবত ক্লান্তির মাত্রা বাড়তে শুরু হওয়ায় যতটা পারা যায় এগিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। ঠিক দুপুর সাড়ে বারোটায় যখন অ্যামারিল্লোতে বাস ঢুকল তখন আকাশ মেঘলা, দুপাশে আধুনিক শহর। কিন্তু যেটা বিস্ময়ের সেটা হল আমরা কোনও ফুটপাত দেখতে পাচ্ছি না। ওগুলো যে পুরু বরফে ঢাকা তা বুঝতে সময় লাগল। বাস থেকে নামামাত্র কনকনে ঠান্ডার অক্টোপাশ জড়িয়ে ধরল। ওভারকোট পরা অবস্থাতে হিহি করে কাঁপতে-কাঁপতে টার্মিনাস বিল্ডিং-এর উত্তাপে ঢুকে পড়লাম। না, আমাদের কোনও ধারণাই ছিল না এক রাতের যাত্রার শেষে এমন তুষারমোড়া শহর অপেক্ষা করছে। অরিজিত বলল, 'এখানে থাকাটা বেশ ইন্টারেস্টিং হবে।'

এখন দুপুর কিন্তু রোদ নেই। খবর নিয়ে জানা গেল কাছাকাছি যে মোটেলটি আছে সেখানে পৌঁছতে গেলে আমাদের সিকি মাইল হাঁটতে হবে। অগত্যা উত্তাপ ছেড়ে বাইরে বেরুলাম সুটকেশ হাতে। চারপাশে এখনও ঝুরুঝুরু বরফ পড়ছে। শহরের সবটাই বরফে ঢাকা। ফুটপাতের ওপর অন্তত ইঞ্চি চারেক বরফ জমে পাথর হয়ে আছে। আমার চামড়ার জুতো এই বরফে চলার পক্ষে আদর্শ নয়। হাঁটতে গিয়ে প্রতি পদে পিছলে পড়ার সম্ভাবনা। মিনিট খানেক চলার পরে দেখলাম কোথাও কোনও মানুষ নেই। এমনকী রাস্তায় গাড়িও চলছে না। সুনসান বরফের ওপরে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল যদিও আরও দুজন পরিচিত মানুষ কাছেই রয়েছে। খানিকক্ষণ চলার পরে হাঁটা বেশ মুশকিল হয়ে পড়ল। অথচ মোটেলের কোনও চিহ্ন চোখে পড়ছে না। কাউকে জিজ্ঞাসা

করার কোনও উপায় নেই। ইচ্ছে হচ্ছিল বাস টার্মিনাসে ফিরে যাই। এইসময় একটা গাড়িকে প্রচণ্ড জোরে ছুটে আসতে দেখলাম। এবং জীবনে প্রথম জলের বদলে গাড়ির টায়ারের চাপে বরফের কুচি ছিটকে আসতে দেখলাম। ঠিক যে ভাষায় কলকাতার পথচারী এই অবস্থায় গালাগালি দেয় সেই ভাষা ব্যবহার করলাম নিজের অজান্তে।

মিনিট দশেক বাদে আমরা মোটেলের দজায়। কেমন ভূতুড়ে-ভূতুড়ে চেহারা। দরজা ঠেলে ভেতের ঢুকে আধা অন্ধকারের রেস্টুরেন্ট চোখে পড়ল। সেখান চার-পাঁচজন বসে পান করছে। ডানদিকে কাউন্টার। সেখানে প্রায় মোমে গড়া মূর্তির মতে এক শীর্ণা মহিলা বসে। অরিজিত তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে ঘর চাইল। তিনি নিঃশব্দে একটা খাতা এগিয়ে দিলেন। নামধাম লেখার পর ভদ্রমহিলা ওই একইভাবে একটি চাবি সামনে রাখলেন। চোখে পড়ল পাশেই লেখা আছে ঘরভাড়া দৈনিক পঁচিশ ডলার। অরিজিত একটা পঞ্চাশ ডলারের নোট রাখল সামনে। ভদ্রমহিলা ভাড়া কেটে বাকিটা ফেরত দিলেন। এ পর্যন্ত একটাও কথা হয়নি। অরিজিত জিজ্ঞাসা করল, 'ঘরটা কোন দিকে?'

ভদ্রমহিলা যন্ত্রের মতো একটা হাত তুলে দেখিয়ে দিলেন। রেস্টুরেন্টের পাশ দিয়ে যে দরজা সেটা একটা খোলা উঠোনে পড়েছে। সেখানে বরফের স্তূপ। সেটি পারো হয়ে গেলে আর একটা বাড়ি। দরজায় নম্বর লেখা। কোথাও কোনও শব্দ নেই। ঘরের দরজা খুলছিল অরিজিত। আমাদের মনে হয়েছিল রিসেপশনের মোমের মূর্তিটা বোবা। হয়তো তিনিই এই মোটেলের মালিক। এইসময় একটা গুলির আওয়াজ হল। মোটেল কাঁপিয়ে সেই আওয়াজ বরফের গায়ে ধাক্কা মারতে লাগল। আমরা তিনজনেই চমকে উঠলাম।

॥ ৯ ॥

শব্দটা যেন বরফের ওপর গড়িয়ে একসময় খাঁখাঁ চুপ মেরে গেল। আমরা তখনও বারান্দায়, পায়ের তলায় চাপ বরফ। ঠান্ডা তীব্র, খোলা আকাশ থেকে গুঁড়িগুঁড়ি বরফ ঝরছে। সেই তীব্র শীতে আর এক ধরনের ঠান্ডা শিরশির করে উঠল। কোথাও আর কোনও শব্দ নেই, কোনও মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে না। কী ভয়ংকর চুপচাপ চারধার।

অরিজিত ততক্ষণে দরজা খুলে ফেলেছিল। আমরা নিঃশব্দে ঢুকে পড়লে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হল। ঘরটি ছোট। দুটো খাট আছে কিন্তু চলাফেরার জায়গা কম অরিজিতের একটু বাথরুম বাতিক আছে। যে-কোনও নতুন জায়গায় থাকতে হলে সে আগে বাথরুমটা দেখে নেয়। অপছন্দ হলে সুন্দরতম শোওয়ার ঘরেও তাকে রাখা মুশকিল। বেশ আশঙ্কা নিয়েই বললাম, 'এই ঠান্ডায় আর ঘর খুঁজতে যেতে পারব না। খারাপ হলেও মানিয়ে নিতে হবে।

অরিজিত কাঁধ নাচাল। যাক। আর ঠান্ডায় হাঁটতে হবে না। এতক্ষণ যে ধড়াচূড়া পরে আছি সেগুলো থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার। আমি কিছুতেই প্যান্ট পরে শুতে পারি না। পাজামা পাঞ্জাবির আরাম আমায় টানছিল। কিন্তু এই ঘরে রুমহিটার দেখতে পাচ্ছি না, গরম হাওয়া পাঠাবার ব্যবস্থা আছে কি না তাও বুঝতে পারছি না। সুটকেস খুলে দেখলাম পাঞ্জাবি পাজামা কনকন করছে। ঘরে কোনও জানলা নেই তবু এই অবস্থা। এইসময় অরিজিত ঘোষণা করল, 'ঘরের ভেতরে সিগারেট খাওয়া চলবে না। দমবন্ধ হয়ে যাবে।'

আমেরিকায় আসার পর সিগারেটের প্রতি ওর বিদ্বেষ যেন বেড়ে গিয়েছে। এই একটি ব্যাপার নিয়ে প্রায়ই ঝামেলা হচ্ছে আমাদের মধ্যে। সুব্রত বিড়বিড় করল, 'স্নানটান করা যাবে না মনে হচ্ছে। কিন্তু করা দরকার ছিল।'

ঘরে একটি টিভি আছে। সেটিকে চালু করামাত্র একদল ঘোড়সওয়ার ছুটে গেল। তারপর বন্দুকের শব্দ। পুরোনো আমেরিকান ছবি দেখানো হচ্ছে। সুব্রত বলল, 'ওই শব্দটা কীসের? আমার তো বন্দুকের বলে মনে হল।'

বললাম, 'যাই হোক, আমি ঘর থেকে নড়ছি না।' ততক্ষণে পাজামা পাঞ্জাবি পরে আমি লেপের নীচে সেঁদিয়ে গেছি। ওরেব্বাস, কী কনকনে বিছানা।

ওরা দুজন ওইভাবেই চুপচাপ বসে রইল খানিক। ঠান্ডা যে প্রচণ্ড আলস্য এনে দিচ্ছে তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। শুয়ে-শুয়েই টিভিতে দেখলাম এখন এখানে তাপমাত্র মাইনাস দশ ডিগ্রি। প্রায় লাফিয়ে ওঠার মতো অবস্থা আমাদের। এবার সুব্রত হাসল, 'যাই বলো, কলকাতায় বসে জিরো ডিগ্রি শুনে কীরকম শিরশির করত। কিন্তু মাইনাস টেন দেখছি তেমন মারারাত্মক নয়। যাই, একটু পরিষ্কার হয়ে আসি।' সে হাত ছুড়ে নিজেকে গরম করতে-করতে ব্যাগ নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল।

টিভি থেকে চোখ সরিয়ে অরিজিত জিজ্ঞাসা করল, 'চিত্রনাট্যের ব্যাপারটা কিছু ভাবলে? সুবিধে অসুবিধেগুলো খেয়াল রেখো।'

বললাম, 'ধরো, এখানে এই অ্যামারিল্লোতে আমাদের শুটিং করতে হচ্ছে। এই মাইনাস দশে। পারবে? এসব জায়গায় তো সামারে এলে আলাদা কোনও চরিত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। এলে এইরকম শীতে আসতে হয়। আমাদের ছেলেমেয়েরা মরে যাবে।'

অরিজিত বলল, 'তা নয়। এই যে লস এঞ্জেলস থেকে এই পর্যন্ত এলাম, জায়গাগুলোর সঙ্গে ঘটনা মিশিয়ে কীভাবে কমপ্যাক্ট চিত্রনাট্য করবে?'

বললাম, 'এখনও ভাবিনি। আগে ঘুরে দেখি।'

বুঝলাম ও বিরক্ত হল। নিজের কম্পিউটারের ব্যাবসার মতো সব কিছুই দ্রুত সেরে ফেলতে যে অভ্যস্ত তার পক্ষে একটু বিরক্ত হওয়ার স্বাভাবিক। দেখলাম সে টেলিফোন তুলে নিয়ে ডায়াল করছে, 'বুবু বলছি। অ্যামারিল্লো থেকে। হ্যাঁ প্রচণ্ড ঠান্ডা। না, টাকা যা আছে হয়ে যাবে। ট্র্যাভেলার্স চেকের ব্যাপারটা এখনও ঝুলে আছে। কবে যাচ্ছিস? ও। এখান থেকে ফ্লোরিডা? অনেকদূর। দেখি। ঠিক আছে।'

এইসময় সুব্রত তাজা হয়ে বাথরুম থেকে বের হল। ওর হাতে সদ্য ধোওয়া গেঞ্জি। সেটাকে এক জায়গায় মেলে দিল চমকে উঠলাম, 'তুই এই ঠান্ডায় গেঞ্জি ধুলি?'

'বাধ্য হয়ে। কত ময়লা করব?' সুব্রত বিছানায় বসে লেপ টেনে নিল।

অরিজিত বলল, 'একটু আগে সিদ্ধার্থর সঙ্গে কথা হল। ওরা আজ রাত্রে ফ্লোরিডায় যাচ্ছে গাড়ি নিয়ে। কাল পৌঁছোবে। থাকবে নিউ ইয়ার পর্যন্ত। আমাদের বলছে সরাসরি ওখানে চলে যেতে। ফ্লোরিডায় গৌতমদার বাড়ি। বনানীর জামাইবাবু। আমিও চিনি। খুব জমাটি মানুষ।'

সুব্রত বলল, 'ফ্লোরিডা তো দারুণ জায়গা। দাঁড়াও, ম্যাপ দেখি। আমরা আছি অ্যামারিল্লোতে। এর পরে বড় শহর হল ডালাস যেখানে কেনেডিকে খুন করা হয়েছিল। তারপর শ্রেভেপোর্ট, জ্যাকসন, মন্টগোমারি হয়ে একেবারে আমেরিকার নীচের লেজে, মায়ামি। দূরত্ব প্রচুর। মাঝে তিনটে রাত মোটেলে থাকতে হবে।'

অরিজিত জিজ্ঞাসা করল 'দূরত্ব কতটা?'

'প্রায় পনেরো শো মাইল।'

শিরশির করে উঠল শরীর। অতটা দূর ওই একঘেয়ে যাত্রা? তা ছাড়া এইভাবে দেশের নীচের দিকটায় যাওয়ার কথা ছিল না আমাদের। সে কথাই বললাম।

অরিজিত মাথা নাড়ল, 'সোজা গেলে আমরা যখন নিউ জার্সিতে পৌঁছোব তখন সিদ্ধার্থ থাকবে না। বাড়িতে তালা দেওয়া। আমরা থাকব কোথায়? এমনিতেই তো হিসেবের বাইরে খরচ হচ্ছে। তা ছাড়া মায়ামির বিচের কথা অনেক শুনেছি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিচ। ওখানে কখনও ঠান্ডা

পড়ে না। গৌতমদার কাছে আরামে থাকা যাবে।'

কিন্তু আমাকে আমেরিকার মধ্যপ্রদেশ বেশি টানছিল। যতটুকু বুঝতে পারছি সেখানে ঠান্ডা এখন তুঙ্গে। এখন যদি না যাই তাহলে আর কখনও ওই অভিজ্ঞতা হবে কি না যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কথাগুলো বলতেই দেখা গেল ওরা আমার সঙ্গে একমত নয়। শেষপর্যন্ত অরিজিত বলল, 'তোমার যদি মনে হয় ওপাশটা দেখা দরকার তাহলে তুমি ঘুরে নিউ জার্সিতে এসো। আমরা মায়ামি হয়ে সেখানে মিট করব।'

একসঙ্গে কলকাতা থেকে বেরিয়ে এভাবে আলাদা হতে ইচ্ছে করছিল না। ইতিমধ্যে বুঝে নিয়েছি একা যাওয়ার ঝামেলা কীরকম! আমরা তিনজন চুপচাপ শুয়েছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ল অনেকক্ষণ কিছু খাওয়া হয়নি। কথাটা বলতে সুব্রত স্বীকার করল তারও খুব খিদে পেয়েছে কিন্তু এত ঠান্ডা যে বেরুতে ইচ্ছে করছে না।

যতক্ষণ চুপচাপ ছিলাম ততক্ষণ জোরদার ছিল না। কিন্তু এই একবার আলোচনা শুরু হল অমনি বোঝা গেল আর ব্যাপারটাকে চেপে রাখা যাচ্ছে না। অতএব তৈরি হতে হল। আর প্যান্ট কোট পরতে ইচ্ছে করছিল না। দামি শালটা জড়িয়ে নিলাম। সুব্রত বারংবার নিষেধ করছিল এমন ঝুঁকি না নিতে। বললাম, 'দেখাই যাক।'

দরজা খুলতেই মনে হল সারা শরীরে কেউ বরফ ঘষছে। অদ্ভুত একটা আলো নেতিয়ে আছে বাইরে, বরফের ওপরে। পাজামা পরেছি লম্বা জুতোর ওপরে। ঠান্ডা যেন কুলকুল করে ঢুকতে লাগল শরীরে। দৌড়ে, যতটা সম্ভব দৌড়নো যায়, আমরা মূল মোটেলের রেস্টুরেন্ট পৌঁছে গেলাম তখন প্রায় বিকেল। জনা দশেক মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। এদের কয়েকজনকে আমরা মোটেলে ঢুকে দেখেছিলাম। আমার শাল জড়ানো পাঞ্জাবি দেখে প্রত্যেকেই যেন কিঞ্চিৎ অবাক।

কাচের জানলার ধারে আমরা বসলাম। বাইরের রাস্তাটা নিঃসাড় বরফে মোড়া। ওপাশের বাড়িগুলোর জানলাদরজা বন্ধ। রাস্তায় কোনও লোক নেই। একজন মহিলা এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কী খাবার চাই? অরিজিত তাঁর সঙ্গে কথা বলে মেনু ঠিক করে দিল। তিনি জানতে চাইলেন আমরা বিয়ার বা হুইস্কি খাব কি না? না শুনে ওপাশের টেবিলের দুটি লোক কুতকুতে চোখে হাসল। বোঝা যাচ্ছে এদের এখন বেশ নেশা হয়ে গেছে। হয়তো কাছে পিঠে থাকে, সময় কাটাতে সারাদিন এখানে বসে মদ খায়। পোশাক ট্যুরিস্টদের মতো নয়। আমাদের সুতৃপ্তি বা বসন্তকেবিনে যেমন চায়ের কাপ নিয়ে অনেকেই সময় কাটায়। একজন আমার দিকে তাকিয়ে জোরে জোরেই কিছু বলল। মনে হল গায়ে পড়ে ঝামেলা বাধাতে চাইছে। কারণ সেই ভদ্রমহিলা লোকটিকে ধমক দিলেন। এরা ইংরেজিই বলছেন কিন্তু উচ্চারণের ধরনের জন্যে মানে বোঝা রীতিমতো মুশকিল। বেশ কিছুক্ষণ আগে একটা বন্দুকের গুলির আওয়াজ শুনেছি। এরকম প্রায় ভৌতিক পরিবেশে যতটা নির্লিপ্ত থাকা যায় ততই ভালো।

আমরা চিকেন স্যান্ডউইচ আর মুরগি ভাজা খেলাম। সুব্রত যথারীতি নিরামিষ। পরিমানেও বেশি নয়। কী করে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে ওই জানে। দাম দেবে বলে টাকা বের করে গোনার সময় অরিজিত একটু ফাঁপরে পড়ল। তার হিসেব মতো দশ ডলার বেশি হচ্ছে। নিশ্চয়ই রিসেপশনিস্ট মোমের পুতুল তাকে দশ ডলার বেশি দিয়েছে। ভদ্রমহিলাকে দাম মিটিয়ে দিয়ে রিসেপশনে গেল সে। মোমের পুতুল তখনও বসে। অরিজিত তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'ম্যাম, আপনি যখন ভুল করে আমাকে দশ ডলার বেশি দিয়েছেন। অনুগ্রহ করে ফেরত নিন।'

ওর বাড়িয়ে ধরা দশ ডলারের নোটটা তেমনি নিস্পৃহ ভঙ্গিতে নিয়ে ড্রয়ারে রেখে দিলেন। একটা ধন্যবাদও পাওয়া গেল না। আমরা আবার বরফের ওপর দিয়ে দৌড়তে লাগলাম ঘরে ফেরার জন্যে।

দোকানে গিয়ে জিনিস কিনলে যোগবিয়োগের মেশিন না থাকলে আমেরিকার সেলসম্যানরা

কীরকম বিপাকে পড়ে তা দেখলে অবাক হতে হয়। আমাদের ক্লাস ওয়ান টু-এর ছেলেমেয়ে যেসব যোগ বিয়োগ মুখে-মুখে বলে দেয় তা ওদের মেশিন দেখে জানতে হয়। প্রথম-প্রথম মনে হত কেউ মাথা ঘামাতে চায় না পরে বুঝেছি ছাত্র হিসেবে এদের বেশিরভাগ অংশটাই খারাপ, খুব খারাপ। সাধারণজ্ঞান বলতে আমরা যা বুঝি তা অধিকাংশ আমেরিকান ছেলেমেয়ের নেই। অনেকে নিজেদের দেশের ভূগোল অথবা ইতিহাস জানে না। অথচ প্রাথমিক পড়াশোনার ব্যাপারটা ওরা বিনিপয়সায় সারতে পারে। আমাদের দেশ থেকে বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাস করে এদেশের কলেজে ভরতির পরীক্ষায় পাস করে যারা পড়তে আসে তাদের প্রথম বছরে এদের সঙ্গে ভূগোল ইতিহাসও পড়তে হয়। নিজেদের স্কুলের বিদ্যা সম্পর্কে কলেজগুলোর ধারণা এতেই বোঝা যাবে। সাদাদের যখন এই অবস্থা তখন কালোরা আরও পিছিয়ে থাকবেই। এই মুহূর্তে একটি কালো ছেলের কথা মনে পড়ছে। ছেলেটির নাম নায়োরবি হার্ডি। বয়স সতেরো। থাকে হার্লেমে। নিউইয়র্ক টাইমসে ওর কথা পড়েছিলাম। গল্পটা এইরকম।

একটা ঝোড়ো বাতাস হার্লেমের পার্কের গাছগুলোকে নাড়িয়ে দরজা জানলায় ধাক্কা মারতেই নায়োরবি হার্ডি লাফিয়ে উঠল। তারপর জানলার বাইরে সতর্ক দৃষ্টি রেখে কিছু না পেয়ে বিড়বিড় করল, 'আমি ভেবেছিলাম কেউ আবার কিছু আরম্ভ করতে যাচ্ছে। এখানকার লোকজন খুব গোলমেলে।' সে দেখল সামনের রাস্তার এক কোণে কিছু ছেলে গুলতানি মারছে। সবাই কালো। হয়তো তারা ড্রাগ বিক্রি করছে। হয়তো কোথাও যাওয়ার নেই বলে ওই রাস্তার মোড়ে-মোড়ে দাঁড়িয়ে শুধুই গেঁজিয়ে যাচ্ছে।

তাকে প্রশ্ন করা হল, 'নায়োরবি, তোমরা কী করতে চাও?'

'আমার সব বন্ধুরা বড় হতে চায়। খুব দ্রুত অনেক টাকা রোজগার করে জিপ কিনতে চায়, সুন্দরী মেয়েমানুষ পেতে চায়।'

'তুমিও কি তাই চাও?'

'ইয়া। কিন্তু আমি সেইসঙ্গে বাঁচতেও চাই।'

নায়োরবি স্কুলে যায় না, তার নাম আর স্কুলের খাতায় নেই। বন্ধুবান্ধবরা প্রায়ই এত বেআইনি কাজ করে যে তাদের নাম পুলিশের খাতায় উঠে গেছে। এই অবস্থায় হার্লেমে তার সৎভাবে টিকে থাকা খুব কঠিন কাজ। বিপদ থেকে মুক্ত থাকা খুব মুশকিল হয়ে পড়েছে। তুমি হার্লেমে থাকো, কাজকর্ম নেই, বয়স অল্প, তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে না। সতরো বছর বয়সে নায়োরবি তার প্রজন্মের একজন প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে যারা নিউইয়র্কের একটি বিশেষ অঞ্চলের রাস্তায়-রাস্তায় ড্রাগ এবং অন্যান্য নেশার জিনিসের চক্রে যোগ দিতে বাধ্য। দিলে যেমন হারিয়ে যেতে হবে একদিন না দিলে বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে।

সাউথ ব্রঙ্কসের একটি যুবকেন্দ্রের কর্মী ভিনসেন্ট হিলিয়ার্ড নায়োরবির সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। তিনি বলেছেন, 'অনেকগুলো সুন্দর বিকল্প যা জীবনকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে, তার ব্যবস্থা না করতে পারলে আমরা নায়োরবিকে শিগগির হারিয়ে ফেলব। আমি নিশ্চিত সে একটি চমৎকার তরুণ। কিন্তু ওদের রাস্তাগুলো মোটেই ভালো নয়। তারা যে-কোনও তরুণ বা কিশোরকে পরিবর্তিত করে দিতে পারে।'

মেয়র ডেভিড ডিঙ্কিসন মনে করেন পুলিশের সংখ্যা বাড়িয়ে এইসব উদ্দেশ্যহীন তরুণদের অন্ধকার জগতের দিকে এগিয়ে যাওয়া বন্ধ করা যাবে না। তিনি ওইসব অপরাধগুলোকে মূলে আঘাত করতে চান। কিন্তু এই ইচ্ছেটার বাস্তব চেহারা দেওয়া খুব কঠিন কাজ।

মিস্টার হিলিয়ার্ড সেকথাই বললেন। প্রত্যেক সপ্তাহে তিনি বিপদে পড়া টিন এজার্সের দলগুলোর সঙ্গে আলোচনায় বসেন। শুধু নায়োরবি নয় ওর মতো প্রচুর ছেলেমেয়ের সঙ্গে প্রতিদিন হিলিয়ার্ড দেখা করেন। আঠারো বছরের গার্সিয়া বাড়ি থেকে বের হয় পোশাক এবং অস্ত্রে তৈরি

হয়ে, যে-কোনও বিপদের মোকাবিল করতে। ষোলো বছরের রুবেন জানে যখনই তার বন্দুকের প্রয়োজন হবে কোথায় গেলে তা পাওয়া যাবে। হিলিয়ার্ড এদের নিয়ে প্রতি সপ্তাহে আলোচনায় বসেন। পুলিশ যেসব ছেলেমেয়েকে অপরাধের জন্যে ধরেছে এবং যাদের অপরাধ মারাত্মক ধরনের নয় হিলিয়ার্ড তাদের নিয়ে কাজ করেন। প্রতি সেশনের শেষে তিনি তাঁর নবীন বন্ধুদের বলেন, 'এবার তোমরা ফিরে যাচ্ছ, যাওয়ার আগে এসো আমরা আলিঙ্গন করি।'

এই প্রস্তাবে সবচেয়ে টাফ ছেলেটিও বেশ মজা পায়। হিলিয়ার্ড তাদের জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমাকে শেষবার কে আলিঙ্গন করেছিল?'

প্রায় প্রত্যেকেই বলে ফেলে, 'মনে করতে পারছি না।'

হিলিয়ার্ড নায়োরবির সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তাঁর মতে, ছেলেটির সঙ্গে কথা বললে মনে হবে আমি দেবদূতের সঙ্গে কথা বলছি। কিন্তু ভালো করে ওর চোখ লক্ষ করলে বোঝা যাবে ও অনেক মানুষকে গুলিতে মরতে দেখেছে, অনেক অত্যাচারের সাক্ষী। নায়োরবির বাবা মৃত। মা, দুই বোন এবং ঠাকুমার সঙ্গে হার্লেমের দুই ঘরের ফ্ল্যাটে থাকে। মায়ের বয়স ছত্রিশ। তিনিই জোর করে হিলিয়ার্ডের কাছে ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন কারণ সে কিছুতেই স্কুলে যেতে চায় না। ভদ্রমহিলা বলেছিলেন, 'ও যেন কাউকে কেয়ার করি না এমন একটা মানসিকতা আঁকড়ে ধরেছে।' নায়োরবি স্বীকার করেছে ষোলো বছর বয়সেই সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সকাল এগারোটা থেকে ক্র্যাক বিক্রি করেছে। সেটা অবশ্য দুটো সপ্তাহের জন্যে এবং তখন পুলিশের হাত থেকে বাঁচার কায়দাগুলো জেনে গিয়েছিল। ওর কোনও বন্ধু গুলিতে মারা গিয়েছে কি না প্রশ্ন করা হলে নায়োরবি এমনভাবে তাকিয়েছিল যেন সে এমন বোকার মতো প্রশ্ন কখনও শোনেনি।

'আমি যার সঙ্গে বল খেলতাম তাকে ওই মুদির দোকানের সামনে গুলি করে মারা হয়। আর একজন, তার বয়স ছিল ষোলো, তাকে গুলি করা হয়, মাথা কেটে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখনও প্রত্যেক সোমবার আমি হাসপাতালে যাই কারণ সেখানে আমার এক বন্ধু গুলিতে আহত হয়ে শুয়ে আছে।

গার্সিয়া হিলিয়ার্ডের অফিসে এসেছিল বিচিত্র রং মেখে। তার জামায় লেখা ছিল, 'স্বাধীনতার রং সবুজ।' গার্সিয়া বলেছিল, 'তুমি স্বাধীন হবে না যদি তোমার পকেটে টাকা না থাকে। কিছু টাকা পকেটে না থাকলে তুমি ফালতু মানুষ।'

গার্সিয়া নিজের নতুন নামকরণ করেছে, টিটো। এটা রাস্তার ছেলেদের জন্যে। এটা গার্সিয়ার চেয়ে অনেক জোরাল শোনায় এবং তার ব্রঙ্কসের রাস্তায় কেউ নরম হলে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। বুবি ডাউন প্রোডাকসনের সেই গানটি, 'ইফ ইউ আর সফট ইউ আর লস্ট' গাইতে তার খুব ভালো লাগে।

হিলিয়ার্ড এইসব ছেলেদের নিয়ে ব্রঙ্কসের রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। আইলিন নামের একটি মেয়ে বলেছিল, 'আমাদের পাড়ায় সবাই ভাবে যেসব কালো এবং হিসপ্যানিক স্কুলে যেতে চায় তারা সাদাদের অনুকরণ করে সাদা সাজতে চায়।' হিলিয়ার্ড কিছু বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় পুলিশের পেট্রল গাড়িকে ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। পুলিশের মাইক্রোফোনে ধমক শোনা গেল, 'রাস্তা থেকে সরে যাও।' সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেরা উধাও। কিন্তু যখনই পুলিশের গাড়ি চলে গেল তখনই তারা ফিরে এল। নায়োরবি হেসে উঠল জোরে, 'এইভাবেই আমরা এখানে বেঁচে থাকি।'

কিন্তু হিলিয়ার্ড হাল ছাড়েননি। অপরাধ জগতের গন্ধ পাওয়া এইসব ছেলেমেয়ের দলকে তিনি ইস্ট সাইড সেটলমেন্ট হাউসের জেনারেল ইক্যুভ্যালেন্সি ডিগ্রি কোর্সে ভরতি করতে বদ্ধ পরিকর। প্রথম দিন নায়োরবি সেখানে এসেছিল দু-ঘণ্টা দেরিতে। হিলিয়ার্ড তাকে জন বন্ড নামের একজন শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। বন্ড নায়োরবিকে বললেন, 'তোমার ভেতরে নিশ্চয়ই

কিছু আছে নইলে আমরা এত লোক তোমার সম্পর্কে ইন্টারেস্ট নিচ্ছি কেন? হয়তো তুমি নিজে যেটা নিজের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ না এঁরা সেটা পেয়েছেন।'

পরের দিন নায়োরবি একেবারে ঠিক সময়ে বন্ডের কাছে উপস্থিত হয়েছিল।

প্রায় গল্পের মতো শোনালেও এগুলো সত্যি ঘটনা ব'রো-তেরো বছরের পরেই মার্কিন কিশোরদের মনে হয় হাতে ডলার না পেলে বেঁচে থেকে সুখ নেই। বেশিরভাগ মার্কিন পিতামাতা এ ব্যাপারে সন্তানদের প্রশ্রয় দেন না। সাদা ছেলেদের একটা বিরাট অংশ মনে করে দেশটা তাদের অতএব যা ইচ্ছে তাই করা যেতে পারে শুধু পড়াশোনা ছাড়া। আমরা যাদের সমাজবিরোধী বলি তাদের ভূমিকায় এদের নামতে কোনও অসুবিধা হয় না। হয়তো, একটু বড় হলে, আঠারোতে পৌঁছালে যে-কোনও পরিশ্রমের কাজ জুটিয়ে নিয়ে ঘণ্টা পিছু অথবা সপ্তাহ পিছু ডলার রোজগার করা থেকে কে আটকায় এদের? এই ব্যাপারে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরা পাল্লা দিচ্ছে সমানে। এই বেপরোয়া জীবনের ফল হল তেরো চৌদ্দ-বছরের বাবা-মা'কে দেখা যাচ্ছে অহরহ। অশিক্ষিত কালো বাবা মায়ের ধারণা স্কুলে পড়ে সাদারা। কালোদের ও পথে যেতে নেই। যেহেতু কালোদের শরীর ঈশ্বর শক্ত করে গড়েছেন তাই কলকারখানার কাজ দূর পাল্লার ট্রাক চালানো তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আর এই পরিশ্রম যে ছেলে করতে চায় না, যার কোনও প্রাথমিক শিক্ষা নেই তার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে অন্ধকার জগতের নায়করা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে ড্রাগ বিক্রি করলে ভালো পয়সা হাতে আসে। আর এই কাজটা যেহেতু নরম হয়ে করা যায় না তাই তাকে রোজ আরও বেশি নৃশংস হতে হবে।

এরই ফলে আজকের আমেরিকান ছেলেমেয়েদের খুব অল্প অংশই স্কুল এবং স্কুল ছাড়িয়ে কলেজে যেতে পারছে। একশো সেন্টে এক ডলার হলেও তার যোগবিয়োগ করতে বেশিরভাগ যন্ত্রের সাহায্য নিতে হচ্ছে। হ্যাঁ, আমারও মনে হয়েছিল এমন বিরাট সংখ্যক অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত তরুণের দল যদি প্রতিবছর নাগরিক অধিকার অর্জন করতে থাকে তা হলে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান রাষ্ট্রটি কীসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে? যতই কিছু ভালো ছেলেমেয়ে ওপরে উঠে যাক নীচের দিকটা যে একেবারে খাঁখাঁ হয়ে যাচ্ছে। আর এদের যে জায়গাগুলো দখল করা উচিত ছিল তা পূরণ করতে এতদিন মার্কিন সরকার উদার হাতে বিশ্বের অর্থনৈতিক অনগ্রসর দেশগুলোকে স্কলারশিপ বিলিয়েছে। সেইসব মেধাবী ছেলেদের বৃহদংশ আর ফিরে যায়নি বলেই আমেরিকা আমেরিকা।

অ্যামারিল্লোর মোটেলের ছোট্ট ঘরে চারপাশে স্তূপ বরফ নিয়ে আমরা তিনজন লেপমুড়ি দিয়ে টিভির সামনে বসে থাকা ছাড়া কোনও কাজ খুঁজে পাইনি। এই বরফে মানুষ দেখতে বেরুনো পাগলামি। দিন সরে যাওয়ামাত্র ঠান্ডা আরও হিংস্র হচ্ছে। লেপের উত্তাপে টিভির দিকে তাকিয়ে থাকা ঢের আরামের।

সুব্রত মাছ মাংস সিগারেটের মতো মদ্যপানও করে না। এই সুদর্শন আইনজ্ঞটিকে আমাদের মাসিমা পিসিমারা হিরের টুকরো ছেলে হিসেবে নেবেন। অরিজিত এবং আমি কলকাতায় নিয়মিত মদ্যপান করি না কিন্তু ও ব্যাপারে ততক্ষণই আপত্তি নেই যতক্ষণ পা এবং মাথা ঠিক থাকে। অদ্ভুত ব্যাপার, আমেরিকায় এসে দু-একটা রাতের পার্টিতে ছাড়া আমরা কেউ মদ খাবার কথা ভাবিনি। এখানকার বাঙালিদের পার্টিগুলোও অদ্ভুত। অতিথিকে আধপেগ ভালো হুইস্কি দেওয়া হল। তিনি সেটি ধীরে-ধীরে গলাধঃকরণ করা মাত্র গৃহিণী এসে ঘোষণা করবেন, ডিনার টেবিলে দেওয়া হয়েছে, ঠান্ডা হওয়ার আগে—! অর্থাৎ অতিথির যদি আরও পানের বাসনা থাকে তো সে গুড়ে বালি। খাওয়া শেষ হলে একটু দামি ওয়াইনের জন্যে অনুরোধ। এটাই রীতি। এটুকু একটি বালকের শরীরকেও স্বাভাবিক রাখে কিন্তু তবু বাঙালি ড্রাইভাররা তা এড়িয়ে চলেন। আজ এইরকম প্রচণ্ড ঠান্ডায় মনে হল মদ্যপান করলে ভালো হত। মোটেলের রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসলে সেটা সম্ভব। কিন্তু কে যাবে অতদূরে? এই বরফ ঠেঙিয়ে। মনোজের মুখে শোনা একটা গল্প মনে পড়ল। এক বাঙালি রাজনৈতিক নিউইয়র্কে বেড়াতে এসেছেন তাঁর আত্মীয়ের বাড়িতে। ভদ্রলোকের কট্টর রাজনৈতিক ধারণা সম্পর্কে

সবাই ওয়াকিবহাল। এককালে শ্রমিক আন্দোলন করে অনেক রেস্টুরেন্ট বন্ধ এবং শেষে হাতবদল করিয়ে এখন প্রায় প্রথম সারিতে চলে এসেছেন। প্রথম সন্ধ্যায় তিনি গম্ভীর মুখে তাঁর আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাড়িতে ভোদকা আছে?'

আত্মীয়ের সেলারে নানান দামি মদের বোতল। কখনও পার্টি হলে লাগবে বলে এখানকার বাঙালিরা যেমন জমিয়ে রাখেন। তিনি অপ্রস্তুত হয়ে মাথা নাড়লেন, 'না। তবে এনে দিতে পারি। কুড়ি মাইল দূরে একটা দোকান আছে।'

'কুড়ি মাইল? উঃ! তোমার স্টকে কী আছে?'

'চার রকমের স্কচ, জিন, ওয়াইন, শ্যাম্পেন।'

'ইন্ডিয়ান হুইস্কি নেই?'

'অ্যাঁ? না।' আত্মীয়টি খুবই দুঃখিত।

'ঠিক আছে, স্কচই দাও।'

তাঁকে আধ পেগ স্কচ ঢেলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হল, 'বরফ না জল?'

তিনি বললেন, 'দুটোই। আধ কেন, এক পেগ দাও।'

দেওয়া হল। আত্মীয়টি মদ্যপান করেন না। ভদ্রলোক বললেন, 'আসলে রাত্রে একটু পান না করলে, দিনভর এত খাটতে হয়। বাদাম কোথায়?'

'বাদাম?'

'বাদাম অথবা চানাচুর? মদ কি এমনি খাওয়া যায়?' বিরক্ত হয়েছিলেন ভদ্রলোক। বাড়িতে ও দুটোই ছিল না। আত্মীয়টিকে সেই রাত্রে বাদাম কিনতে ছুটতে হয়েছিল। আমাদের খোলা ছাড়ানো বাদাম গুজুদের দোকানে পাওয়া যায়। সেটা প্লেটে পেয়ে ভদ্রলোক খুশি হয়েছিলেন, 'এরা বুঝি এখানে এমনি মদ খায়? অদ্ভুত! উইদাউট ফুড ড্রিংক করলে লিভার খারাপ হয়ে যায়।'

মনোজ গল্পটা বলে খুব হেসেছিল। এখানে মানুষ এক আধ পেগ খায় শরীর গরম করতে। তাই জল বা চাটের প্রয়োজন হয় না। আমরা সাজিয়ে গুজিয়ে বসি প্রায় মাতাল হওয়ার জন্যে। পার্থক্য তো থাকবেই।

এখানকার টিভি সরকার শাসিত নয়। যা ঘটছে তা দেখবার সাহস এদের আছে। হঠাৎ টিভির দিকে তাকিয়ে উৎফুল্ল হলাম। এরকম ঘটনা এখানে ঘটে নাকি? একজন ভারতীয় হিসেবে আমার মনে যে-যে কারণে হীনম্মন্যতাবোধ জন্মায় তার একটিকে এখানে দেখে আনন্দিত না হয়ে পারলাম না। নিউ ইয়র্ক সিটির নতুন চ্যান্সেলার জোসেফ এ ফার্নাণ্ডেজ আবিষ্কার করলেন যে তাঁর অফিসের জানলাগুলো বেশ নোংরা। তিনি তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট অফিসারকে ডেকে পাঠালেন। অফিসারটি জানাল, 'ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক। কিন্তু যে সংস্থার ওপর বাড়িটি পরিষ্কারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারা বছরে মাত্র একবারই সেটা করে চুক্তি অনুযায়ী। সেই সময় আসতে এখনও দেরি আছে।'

ফার্নাণ্ডেজ সাহেবরা কম্পিউটারের একটি কর্ড খারাপ হওয়ায় মিস্ত্রি এসে সারিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যাওয়ার সময় সে কিছু নোংরা কার্পেটের ওপর ফেলে গিয়েছে। সেটা পরিষ্কার করার কথা বললে তাঁকে বলা হল কার্পেট পরিষ্কার করা হয় একদিন অন্তর। অতএব আর একটা দিন অপেক্ষা করতে হবে তাঁকে। এইসব অভিজ্ঞতা থেকে নিউ ইয়র্ক সিটির নতুন চ্যান্সেলারকে এগোতে হবে প্রচুর ধৈর্য নিয়ে। আজ যখন টিভিতে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, গতকাল নতুন দায়িত্বভার নেওয়ার পর তাঁর কী অভিজ্ঞতা হয়েছে তখন তিনি বললেন, 'নিয়মতন্ত্রের কড়াকড়ি কাজের স্বাভাবিক গতিকে শ্লথ করে দিয়েছে। যেমন, গতকাল তিনি তাঁর সেক্রেটারিকে বলেছিলেন কয়েকটা হলদে কালির কলম অর্ডার দিতে। একটা পাওয়া গিয়েছিল। আরও কিছু চাইলে সেক্রেটারি বলেছে,— 'চার সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে স্যার সবরকম নিয়ম মেনে জিনিস পেতে।'

চ্যান্সেলার সাহেব দর্শকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কীরকম উদ্ভট উপায়ে এখানকার

শাসনব্যবস্থা চালানো হচ্ছে বুঝতেই পারছেন। এরা যদি আমার সঙ্গেই এমন ব্যবহার করে তা হলে শিক্ষাবিভাগের অন্যত্র কী হচ্ছে ঈশ্বরই জানেন।'

ফার্নান্ডেজ সাহেব ফ্লোরিডার ডেড কাউন্টি স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। চ্যান্সেলার হিসেবে তিনি জানতে পারলেন নিউ ইয়র্ক স্কুল সিস্টেমের বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রায় পঞ্চাশ হাজার কাজের অর্ডার দেওয়া আছে যা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি লাল ফিতের কারণে।

কী আনন্দ হল শুনে। প্রাণ ভরে গেল। এ তো দেখছি আমাদের দেশের সঙ্গে চমৎকার মিলে যাচ্ছে। কাজের লোক ঠিক সময়ে কাজ করে না, একটা ফাইল এই টেবিল থেকে ও টেবিলে নড়তে পাঁচমাস সময় লাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার যাঁর হাতে বিভিন্ন খাতে লাখ-লাখ টাকা খরচের জন্য থাকে তখন তাঁর চেয়ারের পায়া ভেঙে গেলে সারাবার জন্যে টেন্ডার কল করে তিনমাস অপেক্ষা করতে হয়। কোনও উপায় নেই। আমেরিকা সম্পর্কে যে ধারণা এতকাল লালন করেছি, চ্যান্সেলার সাহেবের বক্তব্য শোনার পর বেশ গোলমাল হয়ে গেল। চুপচাপ দেখে যেতে যেতে সুব্রত আচমকা মন্তব্য করল, 'এরকম কি ডিফেন্স বা অন্যক্ষেত্রে হয়? কক্ষনো না। সেখানে সামরিক তৎপরতায় কাজ হয়। শিক্ষাবিভাগ বলেই এই চেহারা।'

ব্যাপারটা মেনে নেওয়া একটু অস্বাভাবিক ছিল কিন্তু শেষপর্যন্ত আমরা ঠিক করলোম এখান থেকেই দুটো পথে নিউ জার্সিতে যাব। এতে আর একটা উপকার হবে। অরিজিত এবং সুব্রত যেমন দেশের নীচের দিকটা দেখবে, সমুদ্রের ধারের মানুষজন এবং তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হবে তেমনি আমার কাছে আশপাশের জায়গাগুলো অজানা থাকবে না। পরে একসঙ্গে বসে অভিজ্ঞতা মিলিয়ে নেওয়া যাবে।

অরিজিতের কাছে গ্রে-হাউন্ড ট্রেইলওয়েস টাইমটেবল আছে। আমেরিকা এবং কানাডায় গ্রে-হাউন্ড বাস যেসব রুটে যাওয়া আসা করে তার বিশদ সময়সূচী ওতে পাওয়া যায়। একেবারে ঘড়ির কাঁটা মেনে ওরা চলে। এমন একটা সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার কথা ভারতীয় রেলওয়েও এখন কল্পনা করতে পারে না। টাইম টেবল ঘেঁটে দেখা গেল আমার বাস আছে সন্ধে সাতটা, দশটা চল্লিশে আর রাত তিনটেতে। সন্ধের বাস ছেড়ে গেছে এতক্ষণে, ভোর রাতের বাসে এইরকম ঠান্ডায় মরে গেলেও যেতে পারব না। সেক্ষেত্রে অপেক্ষা করতে হয় কাল দুপুর পর্যন্ত। কিন্তু সেখানেও বিপদ। আমি যেসব বড় শহরে রাত্রিবাসের জন্যে থামব সেখানে পৌঁছোব মধ্যরাত্রে। একা যাওয়ার পক্ষে সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। অতএব রাত দশটা চল্লিশের বাস ধরতে পারলে সব ল্যাঠা চুকে যায়। অরিজিতের ইচ্ছে করলে আজকের রাতটা এখানে থাকতে পারত কিন্তু আমি চলে যাচ্ছি বলেই হয়তো ওরাও ঠিক করল মায়ামির বাস এই রাতেই ধরবে। ওদেরটা আরও পরে, রাত বারোটায়।

আপাতদমস্তক নিজেকে মুড়লাম, ড্রয়ার, গেঞ্জি, উলিকটের গেঞ্জি, সার্ট, হাফ সোয়েটার, ফুল সোয়েটার, জ্যাকেট এবং ওভারকোট। হাতে গ্লাভস, মাথায় টুপি, পায়ে উলের মোজার ওপরে গোড়ালি ঢাকা জুতো। দরজা খুলে বাইরে পা দেওয়া মাত্র মনে হল আয়োজন ঠিক আছে, ঠান্ডা তেমন লাগছে না। স্যুটকেস নিয়ে বরফ ভেঙে রিসেপসনে এসে মোমের মূর্তিকেই পেলাম। ভদ্রমহিলার ডিউটি কখন শেষ হয়? তাঁকে চাবি ফেরত দিয়ে জানালাম আমরা আজ রাত্রেই ফিরে যাচ্ছি। তিনি কোনও মন্তব্য করলেন না।

তখন আকাশে চাঁদ ছিল। এমন পাণ্ডুর চাঁদ নজরুল ছাড়া কেউ দ্যাখেননি। চারপাশে থিকথিকে বরফ, পায়ের গোড়ালি ডুবে যাচ্ছে, শনশনে হাওয়ায় চাবুক খেয়ে খেয়ে সুটকেস হাতে আমরা তিনটে প্রাণী হাঁটছি। হঠাৎ গাল, ঠোঁট নাক কনকন করে উঠল। এবং তারপরেই এইসব আড়াল নস্যাৎ করে মেরুদণ্ডে কনকনানি ছড়াল। জানি না, জ্যোৎস্নারাতে বলেই কি না রাস্তার আলোগুলো নেবান কি না জানি না কিন্তু সেইসব ড্রাকুলাছবির পটভূমি মনে পড়ছিল। সুব্রত বলল, 'পাগল ছাড়া কেউ এই রাস্তায় এখন হাঁটবে না।' আমি হাসলাম কিন্তু দাঁতে দাঁত লেগে যে বাজনা বাজছিল

তাতে হাসিটা নিজেই টের পেলাম না। গুন-গুন করে গাইবার চেষ্টা করলাম। এটা একটা অদ্ভুত প্রেসক্রিপশন। খুব কাজে লাগে। যখনই কোনও বড় সমস্যায় পড়েছি আমি গুনগুন করেছি। এতে মন অন্যমনস্ক হয়, সমস্যাটা আর ভারি হয় না। 'তোরে না হেরিয়া ওরে উন্মাদ, পাণ্ডুর হল আকাশের চাঁদ।' গাইতে গাইতে শব্দগুলো পালটে দিলাম। তোদের হেরিয়া ওরে উন্মাদ, পাণ্ডুর হল আকাশের চাঁদ। গ্রে হাউন্ডের টার্মিনালে ঢোকার পর, সেই উত্তাপে দাঁড়িয়ে কনকনানি থামাতে-থামাতে মনে হয়েছিল এইরকম চাঁদ যেন এ জীবনে আর দেখতে না হয়।

বিশাল বন্ধ ঘরে গরম হাওয়া বইছে। অথচ সাকুল্যে আমাদের নিয়ে জনা সাতেক মানুষ। কেউ কোনও শব্দ করছে না। পাশের রেস্টুরেন্টের কাউন্টারের এক ভদ্রমহিলা চুপচাপ বসে। টিকিট কাউন্টারে শুধু একটি কালো ছেলে এক তরুণীর সঙ্গে গল্প করছে নীচু গলায়। এখানে টিকিটে ছাপ মারাতে হবে। কাছে যেতে কানে এল কালো ছেলেটি সাদা তরুণীকে বলছে, 'অ্যামারিল্লো একটা দারুণ জায়গা এ কথা তুমি শোনোনি কেন তাই বুঝতে পারছি না মিস! দশটা চল্লিশের বাসটা না ধরে তুমি বরং ভোরের বাস ধরো। আমরা সুন্দরভাবে রাতটা কাটাতে পারি। আর দশ মিনিটের মধ্যে আমার ডিউটি শেষ হয়ে যাবে। তারপর সবটাই আমার, কোনও চিন্তা নেই।'

তরুণী হাসল, 'শুনে খুব ভালো লাগছে কিন্তু আমাকে যেতেই হবে।'

'আহা, তবু, আর একবার চিন্তা করো। ইয়েস, কী চাই আপনাদের?' ছেলেটি আমাদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হল। প্রয়োজন মিটিয়ে আমরা চলে এলাম কিছুটা দূরে। তখনও ছেলেটি মেয়েটিকে বুঝিয়ে যাচ্ছে অ্যামারিল্লোর মহিমা। এটা ওরাই পারে। কেউ কাউকে চেনে না, হঠাৎ দেখা হল, হয়তো ভালো লাগল তারপর যখন কথা শুরু করল তখন মনে হবে কতকালের চেনা। ঠিক দশটা পঁয়ত্রিশে বাস এল।

খারাপ লাগছিল। কিন্তু মন শক্ত করে ড্রাইভারকে টিকিট দেখিয়ে বাসে উঠলাম। কেউ নামেনি। সবাই ঘুমাচ্ছে। পেছন দিকের আসনগুলো একদম ফাঁকা। বাসের ভেতর চমৎকার গরম। জানলার ধারে বসে বাইরে তাকালাম। কিস্যু দেখা যাচ্ছে না। এইসময় দেখলাম কাউন্টারে দাঁড়ানো সেই মেয়েটি তার ব্যাগ নিয়ে এগিয়ে আসছে জায়গা খুঁজতে-খুজতে। তাহলে ওর যাওয়াটা সত্যি জরুরি। পাশের জোড়া সিটে ধপ করে শরীর ছেড়ে দিয়ে মেয়েটি পকেট থেকে সিগারেট বরে করে আমার দিকে তাকাল, তাকিয়ে হাসল।

॥ ১০ ॥

ধড়াচূড়া পরা অবস্থায় আমার চেহারা নিশ্চয়ই হাস্যকর ছিল, আমি তাই মুখে ঘুরিয়ে নিলাম। এখনও নাক এবং গাল সিরসির করছে। এগুলো নির্ঘাত ফাটবে। আজ দাড়ি কামাইনি। এখানে থাকতে হলে আমি কখনও দাড়ি কামাতাম না। কিন্তু এখন বাসের গরমে এগুলোকে গায়ে রাখা মুশকিল হচ্ছে। অথএব খোলস খুলতে লাগলাম। সুটকেস খুলে সেগুলোকে ভেতরে ঢোকানোর পরিশ্রম করতে ইচ্ছে হল না। শুধু সোয়েটার পরে সিগারেট বের করে আগুন জ্বালাতেই কানে এল, 'এক্সকিউজ মি।'

তাকালাম। সুন্দরী নিজের সিট থেকে এগিয়ে এসেছেন সিগারেট মুখে। অতএব তাঁর মুখাগ্নি করতে হল। তিনি ধোঁওয়া ছেড়ে হাসলেন, 'থ্যাঙ্কস।' তারপর নিজের আসনে ধপ করে বসে পড়লেন। দেখলাম তাঁর অঙ্গে কোনও শীতবস্ত্র নেই। এমন হিমেল রাতে, বাসের ভেতরটা যতই আরামদায়ক হক না কেন যন্ত্রের কল্যাণে বাইরের দিকে তাকালে প্রাণ উড়ে যায়, তখন মেয়েটি সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বই-এর পাতা ওলটাচ্ছে? কি বই? এখানে এসে কোনও ছেলেমেয়েকে বহ

নিয়ে ঘুরতে দেখিনি। রাতযাত্রায় লোকে সাধাসারণ ক্রাইম ফিকশন পড়ে কিন্তু সেগুলো তো এমন মোটা হয় না। সুন্দরীর কোনওদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তার পাশের গাড়ির দেওয়ালে ছাইদানি রয়েছে, সেখানে সিগারেটের শেষ টুকরো আগুন সুদ্ধু রেখে ছিল একবারও না তাকিয়ে। আড়চোখে লক্ষ্য করে যাচ্ছিলাম। দেখলাম টুকরোটা ছাইদানির ভেতরে পড়ল না। কানায় লেগে আছে তারপর বাসের ঝাঁকুনিতে টুপ করে সুন্দরীর পাশে পড়ে গেল। অস্বস্তি হল। এই অবস্থায় সিগারেট নিভে যেতে পারে আবার উলটোও হওয়া সম্ভব। এবং সেটা হলে সুন্দরীর নিশ্চয়ই ভালো লাগবে না।

আমি কথা না বলে পারলাম না, 'এক্সকিউজ মি—'

সুন্দরী তাকালেন বেশ বিরক্ত হয়ে। হাতে বই ধরাই আছে।

'আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একবার উঠে দাঁড়াবেন?

কপালে ভাঁজ পড়ল, 'আপনার মতলবটা কি?'

'কোনও মতলব নেই। শুধু সিগারেটের আগুনকে আমি বিশ্বাস করি না।'

'মানে? সুন্দরী ঘাড় ঘুরিয়ে ছাইদানির দিকে তাকালেন।

'ওটা আপনার পাশে পড়েছে।'

শোনামাত্র চলন্ত বাসে যেভাবে লাফিয়ে উঠলেন তিনি তা দেখার মতো। আসনে পড়ে টুকরোটা গড়িয়ে গেছে পেছনের খাঁজের ভেতরে। আমি উঠে সেটিকে তুলে ছাইদানিতে ফেলে দিলাম, 'ব্যাস, হয়ে গেল।'

গলার স্বর পালটে গেল নিমেষেই, 'ও! সো নাইস অফ ইউ। আপনি না বললে নির্ঘাত আমার একটা কিছু হয়ে যেত। জানেন, আমার না, আগুনে কিছু হওয়ার ফাঁড়া আছে। ও ভগবান! আপনি কী ভালো!'

ফাঁড়া! যাচ্চলে। এ তো একেবারে আমাদের দেশী কথাবার্তা। ঠিক শুনলাম তো। ছেলেবেলায় পিসিমা আমাকে বলতেন, খবরদার, জলে নামবি না। জলে তোর বিরাট ফাঁড়া আছে। সেই ভয়ে আজ পর্যন্ত সাঁতারই শেখা হল না। হেসে বললাম, 'আপনার আগুনে আর আমার জলে।'

সুন্দরী আমার দিকে সরে এসে বললেন, 'তাই? জল কিন্তু হার্মলেস। সাঁতারটা শিখে নিতে পারলে কোনও ভয় নেই, শুধু আরাম। দু-বছর আগেও আমি ক্রশকাউন্ট্রি সাঁতার কাটতাম। কিন্তু আগুনের সঙ্গে কোনও রফা করা চলে না।'

সাঁতার তো সবাই শিখতে পারে না। যারা পারে তারা এগিয়ে যায়, আমার মতো কেউ-কেউ শুধুই হাবুডুবু খায়।' আমি হাসলাম।

'বাঃ। আপনি তো চমৎকার কথা বলেন। দর্শনের গন্ধ পাচ্ছি। আগুন নিয়ে কিছু বলুন। মানে মনে রাখার মতো কিছু।' সুন্দরী আরও সরলেন।

'আগুন। আগুনকে যে হাতের মুঠোয় লুকিয়ে রাখতে চায় সে ভুলে যায় একটু বাদেই তার আঙুলগুলো পুড়ে যাবে।'

সঙ্গে-সঙ্গে এমন জোরে হাতাতালি দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন সুন্দরী যে সামনের সিটের আধা-ঘুমন্ত মানুষেরা ফিরে না তাকিয়ে পারল না। সুন্দরী হাত বাড়ালেন, 'আমি অ্যান। আসছি সান ডিয়াগো থেকে।'

'আমি সমরেশ। বেড়াতে এসেছি এদেশে।'

'কোথায় দেশ আপনার?'

'আপনি নাম শোনেননি। ভারতবর্ষ।' ইংরেজিতে ভারতবর্ষ বলা যায় না। ইন্ডিয়া বলতে হয়। আজ যখন আমরা অনেক দিশি জায়গার ইংরেজি নাম বাতিল করে দিশি নাম চালু করছি তখন খোদ দেশটার বিদেশি নাম আঁকড়ে ধরে আছি কেন? বাংলাদেশ তো তা করেনি। আমরা এখন মিডনাপুর বা বার্ডওয়ান বলি না কিন্তু অবাঙালির কাছে ক্যালকাটা বেরিয়ে আসে। কিন্তু এই

অবস্থাটা বদলানো দরকার। ইংরেজিতে কেন আমরা ভারত শব্দটা চালু করব না? এইসব কথা ওই মুহূর্তেই আমার মনে এসেছিল।

সুন্দরী হাসলেন, 'দেশটা এশিয়ার কোথাও তাই না?'

ওঁকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমাদের অনেক শিক্ষিত ছেলেমেয়ে চট করে কঙ্গো কোথায় বলতে পারবে না। ভারত সম্পর্কে আলাদা করে ভাবার কোনও কারণ নেই আমেরিকার সাধারণ মানুষের। ওদের খবরের কাগজ বা টিভিতে ভারত খুব কম সময় হেডলাইনে এসেছে। অতএব সুন্দরীকে বোঝাতে হল, ভারত খুব প্রাচীন দেশ। সভ্যতার প্রাথমিক উত্থান সে দেশে হয়েছিল। আয়তন কম নয়। একদিকে চিন আর বাংলাদেশ অন্যদিকে পাকিস্তান। শোনামাত্র তিনি চোখ বন্ধ করে বললেন 'বুঝেছি। বাংলাদেশ কোথায় আমি জানি।'

হাঁ হয়ে গেলাম। মাত্র কুড়ি বছর আগে যে দেশ স্বাধীন হয়েছে, যার আয়তন ভারতের সঙ্গে তুলনায় আসে না তার কথা সুন্দরী জানে আর ভারত অজানা? সুন্দরী বললেন, 'সান ডিয়াগোতে আমাদের পাড়ায় চারজন বাংলাদেশি থাকে। ওরা যা রোজগার করে তার বেশিরভাগই দেশে পাঠায়। তাই স্যাটারডে নাইটে কোনও মেয়ে ওদের সম্পর্কে ইন্টারেস্ট দেখায় না। একটা রেস্টুরেন্টে ওদের একজন রান্না করে। ছেলেটা ভালো। ওয়ার্ল্ডের ম্যাপ এনে সে আমাকে তার দেশ দেখিয়েছিল।'

বিশ্বাস করুন, আমি অবাক হয়েছিলাম, ঈর্ষিত হইনি। এইসব সময়ে বাঙালি হিসেবে গর্ব হয় আমার। আমরা এপারে বসে যা পারিনি ওপারে ওঁরা তা পেরেছেন। এখন এই মুহূর্তে বাংলাদেশের এক বিরাট সংখ্যার মানুষ মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ এবং আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছেন জীবিকার সন্ধানে। দেশে বসে গরিব সংসারের বোঝা না বাড়িয়ে এঁরা বিদেশে গিয়ে অর্থ উপার্জন করছেন দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে। এই আমেরিকায় যত বাংলাদেশি আইনসম্মতভাবে বাস করেন তার দ্বিগুণ আছেন বাধ্য হয়ে বেআইনি হয়ে। মাঝে-মাঝে মার্কিনসরকার লটারির মাধ্যমে এদের নাগরিক করে নেন। একই অবস্থা কানাডায়। পশ্চিম বাংলার বাঙালিরা আমেরিকায় এঁদের তুলনায় সংখ্যায় অনেক কম। অথচ আজ পর্যন্ত কোনও বাঙালির বাড়িতে পার্টি হলে আমি বাংলাদেশিদের নিমন্ত্রিত হতে দেখিনি। আমাদের গ্রাম্য-রাজনীতি করা মানসিকতা অত হাজার মাইল দূরেও বেশ অটুট রেখেছি। এ কথা কে অস্বীকার করবেন একজন বাংলাদেশির বাড়িতে গেলে যে আদরযত্ন পাওয়া যায় তা এদেশীয় বাঙালিদের অনেকেই করতে পারেন না। অতএব কোনও বিদেশি যখন বলেন বাঙালিরা থাকেন বাংলাদেশে, তাঁদের জাতীয় গান রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কবি তখন মেনে নিতে বাধ্য আমরা। বাংলাদেশে লেখা গল্প উপন্যাসের মান সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ করেন কিন্তু কবিতা? খুব এগিয়ে গেছেন তাঁরা। বাংলাদেশের পাঠক আমাদের লেখা যে ভালোবাসা নিয়ে পড়েন তার এক ভাগ ভালোবাসাও এদেশের পাঠকের নেই ওদেশের সাহিত্য সম্পর্কে।

সুন্দরীর সঙ্গে আলাপ জমে গেল। সেই হিমেল রাত্রে দূরপাল্লার গ্রে-হাউন্ড বাসে চমৎকার সময় কেটে যেতে লাগল আমার। সুন্দরীর পুরো নাম অ্যান ব্রডি। আসল বাড়ি মেক্সিকোতে। বিয়ে করে এসেছিল সান ডিয়াগোতে। পাত্র বিমা কোম্পানির দালাল। ভালো রোজগার। কিন্তু বয়সে অন্তত পঁচিশ বছরের বড়। আমি এর আগে মেক্সিকোর কোনও মহিলার সঙ্গে গল্প করিনি। হঠাৎ আমার নিজের পিসিমার কথা মনে পড়ছিল। তিনি আমার দ্বিতীয় জননী। দশে বিয়ে এগারোতে বিধবা। তারপরে প্রায় পয়ষট্টি বছর পিতার সংসারে থেকে ভাই এবং ভাইপোকে বড় করতে সাহায্য করেছেন। এই রকম চরিত্র কিছুদিন আগেও বাংলাদেশের অনেক সংসারেই দেখা যেত। বাল্যবিবাহ উঠে গেছে অনেককাল, বিধবাবিবাহ স্বাভাবিক ঘটনা, একান্নবর্তী পরিবারও ভেঙে গিয়েছে তাই এইসব মানুষের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। পিসিমা কথা বলতে খুব ভালোবাসতেন। এই কারণে পিতামহ তাঁকে প্রায়ই ভর্ৎসনা করতেন কিন্তু তাতে চৈতন্য ফেরেনি তাঁর। কোনও কথা গোপনে রাখার অভ্যেস ছিল না। আত্মীয়স্বজনরা কোনও কথা নিজের মুখে না বলে সবাইকে জানাতে চাইলে তা পিসিমাকে

গিয়ে বলতেন। সন্দেহ থাকত না, সবাইকে না বলা পর্যন্ত পিসিমা শান্তি পাবেন না। এখন মেয়েদের মুখ অনেক চাপা। সহজে কথা বের করা মুশকিল। আজকের দুপুরে আপনি অন্যমনস্ক ভাবে কোনও রূঢ় কথা বললে তিনি তা সযত্নে চেপে রাখতে পারেন কুড়িটা বছর। কুড়ি বছর বাদে সময় সুযোগমত যখন সেটা বলবেন তখন আপনি কূল পাবেন না। পিসিমা এইটে কল্পনাই করতে পারতেন না। কেউ এক জিজ্ঞাসা করলে, পিতামহের ভাষায়, তিনি ভড়ভড় করে একশো বলতেন। অ্যান ব্রডির মধ্যে পিসিমার সেই ব্যাপারটা আছে। নইলে নিজের আসন ছেড়ে আমার পাশে বসে তিনি কেন বলবেন, 'এড লোকটা কিন্তু খারাপ ছিল না। আমার চেয়ে অত বড় বলে বিয়ের আগে মায়ের খুব আপত্তি ছিল। আসলে ও ছিল মায়ের বয়ফ্রেন্ড। বুঝলে?'

'আচ্ছা? ইন্টারেস্টিং।' হাসলাম আমি।

'ঠিকই। ওর সঙ্গে আলাপের তিন দিন আগে আমরা কয়েকজন বান্ধবী একটা সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। সমবয়সি ছেলেমেয়ের মধ্যে বিয়ে হলে যে সমস্যা হয় তাই ছবিটার বিষয়। ছবির একটি মেয়ে বলেছিল আমি কিন্তু সুখী। কারণ আমার স্বামী বয়সে অনেক বড়। আমি তার কাছে স্বামীর ভালোবাসা আর পিতার স্নেহ, দুইই পাই। হাউস থেকে বেরিয়ে এসে আমার মনে হল কথাটা ঠিক। আমার বাবা নেই। তার ভালোবাসা আমি পাইনি। যদি বিয়ে করি বয়সে বড়, যে জীবন সম্পর্কে আমার চেয়ে অনেক অভিজ্ঞ, এমন লোককেই বিয়ে করব। সঙ্গে-সঙ্গে টনিকে ডেকে বলে দিলাম তোমার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আঃ, কী বোকা ছিলাম তখন।' অ্যান ঠোঁট কামড়াল।

'টনি কে?' আমি গল্পের মধ্যে ঢুকে গিয়েছি এতক্ষণে।

'টনি এভার্ট। আমার থেকে এক বছরের বড়। কাজকর্ম জোটাতে পারেনি তখনও। মিষ্টি দেখতে। আমার সঙ্গে প্রেম করত। কাজ পেলেই বিয়ে করত।'

'টনিই তোমার প্রথম প্রেমিক?'

'না। তার আগে তিনজনের সঙ্গে ঘুরেছি। ভালো লাগেনি। ইনফ্যাক্ট টনির সঙ্গে আমি প্রথম ঘুমিয়েছি। তা টনি খুব দুঃখ পেয়েছিল, বুঝলে?'

'পাওয়ার কথাই।' নিশ্বাস ফেললাম আমি।

'কাউকে দুঃখ দিয়ে নিজে সুখী হওয়া যায় না।'

'একশোবার সত্যি।'

'তাই হল। এড লোকটা খারাপ না। বিয়ের পর ওর সঙ্গে চলে এলাম সান ডিয়াগোতে। ওখানকার সি ওয়ার্ল্ডে আমি একটা চাকরিও পেয়ে গেলাম। এড সিগারেট মদ খায় না। শুধু টিভি দেখে বাড়িতে থাকলেই। আমার আবার বেড়াতে যেতে খুব ভালো লাগে। এই নিয়ে ঝগড়া হত। দশ মাসের মধ্যে আমার একটা বাচ্চা হয়ে গেল। ছেলে। ও না হলে ভালো ছিল।'

'কেন?'

'এড আরও বুড়িয়ে গেল। আমার সম্পর্কে কোনও ইন্টারেস্ট নিত না। আমরা ছুটির দিনে রেস্টুরেন্টে খাওয়ার কথা ভুলেই গেলাম। সবচেয়ে খারাপ কথা ও শরীর সম্পর্কে ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলল। প্রেম হল আকাশের মতো। কিন্তু সেই আকাশটাকে দেখতে হলে মাটিতে দাঁড়াতে হবে। আর মাটি হল শরীর। এইটে কে বোঝায় ওকে।'

খুব করুণ গলায় বলল অ্যান। দেহহীন প্রেম মানে ফুলহীন গন্ধ আর দেহজ প্রেম মানে গন্ধহীন ফুল—এমন অনেক কথাই এর আগে শুনেছি। কিন্তু আকাশ আর মাটির এমন তুলনা প্রথম শুনলাম। সত্যি তো, প্রেমের জানলায় বসে আকাশ তো আর সারাজিবন দেখা যায় না। মাটিতে নামতেই হয়। আমি কোনও কথা বলছি না। বইটা কোলের ওপর বন্ধ করে রেখে অ্যান চুপচাপ বসেছিল। হঠাৎ চোখ খুলে বলল, 'এই, এত কথা আমি তোমাকে কেন বলছি?'

'আমি খুব ভালো শ্রোতা, তাই।'

হাসল অ্যান, 'তুমি খুব বুদ্ধিমান। হ্যাঁ, তারপর একদিন এড নিজেই আমাকে বলল, আমাদের আলাদা হওয়া উচিত। ওর কাছাকাছি বয়সের মেয়ে হলে আমি নাকি ওর সঙ্গে মানিয়ে যেতাম। ভাঁটার সঙ্গে জোয়ারের কখনই মেলে না। ঠিক দুপুরে ভোর বেশি দূরের বলে মনে হয় না কিন্তু বিকেল ফুরিয়ে গেলে দুপুরকে অনেক দূরের মনে হয়। কথাটা আমিও মেনে নিলাম ডিভোর্স হয়ে গেল।'

'ছেলে কোথায় এখন?'

'এডের কাছে। ও বেচারা একা থাকবে কী করে বলো?'

কী সহজে জীবন গড়া এবং ভাঙার গল্প শোনাল অ্যান। ওর ইংরেজি উচ্চারণ বুঝতে আমার একটুও অসুবিধে হচ্ছে না। আমাদের ইংলিশ মিডিয়ামে অভ্যস্ত মেয়েরা এর চেয়ে অনেক কায়দা করে ইংরেজি বলেন। জন্ম থেকে যাকে ইংরেজি বলতে হচ্ছে তার মাতৃভাষা ভিন্ন বলেই হয়তো আমার সুবিধে হচ্ছে তাকে বুঝতে। আমরা পাশাপাশি বসেছিলাম। একটি পূর্ণবয়স্কা সুন্দরী বিদেশিনী আমার পাশে। বাস ঘুমন্ত। শুধু সামনে তাকালে হেডলাইটের আলোয় রাস্তায় ছুটে যাওয়া দেখা ছাড়া অন্য কোনও প্রাণের সন্ধান নেই। এরকম মুহূর্তকে রোমান্টিক করে তুলতে অনেক ইংরেজি ছবিতে দেখেছি। কিন্তু আমার কেবলই মনে হচ্ছিল মেয়েটি খুব দুঃখী। কিন্তু এই দুঃখ নিয়ে অ্যান মেক্সিকোতে ফিরে না গিয়ে পূর্ব দিকে চলেছে কেন?

এই সময় ড্রাইভার ঝটপট আলো জ্বেলে দিলেন। লাউডস্পিকারে তাঁর গলা শোনা গেল, 'সামনে ওকলাহামা সিটি আসছে। মিনিট দশেক বাস দাঁড়াবে এখানে। যাঁরা একটু কফি-টফি খেয়ে নিতে চান তাঁরা সুযোগ পাবেন।'

ঘড়িতে এখন রাত তিনটে। এরই মধ্যে কখন এতটা সময় কেটে গেছে টের পাইনি। জানলার কাঁচ অস্বচ্ছ হওয়া সত্ত্বেও বুঝলাম আমরা একটা বরফে ঢাকা শহরে ঢুকে পড়েছি। রাস্তার আলোগুলো কেমন ভূতুড়ে। এই সময় মানুষের দেখা পাওয়া আশাই করা যায় না। বাস দাঁড়াল গ্রে-হাউন্ড বিল্ডিং-এর গা ঘেঁষে। দরজা খুলতেই কিছু যাত্রী পা বাড়ালেন। কফির চেয়ে টয়লেটে যাওয়া আমার জরুরি ছিল। আমি উঠে দাঁড়াতেই অ্যান জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার মাথা ঠিক আছে তো? এইভাবে বাইরে পা দিলে জমে যাবে না?'

সংবিৎ ফিরল। আবার ধড়াচূড়ো গায়ে তুললাম। অ্যানও উঠল। বাস থেকে নামতেই প্রচণ্ড কেঁপে উঠলাম। বাপস্। একেই বলে ঠান্ডা। ব্লোয়ার দিয়ে গরম হাওয়া ছড়িয়ে স্ট্যান্ডের বরফ সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু। এক দৌড়ে গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে তবে স্বস্তি। এই গ্রে-হাউন্ড আস্তানাটি বেশ বড়। গোটা ছয়েক গেট আছে। এক-একটি রুটের বাস এক-এক গেটে এসে থামে। অনেকটা প্ল্যাটফর্মের মতো।

কাউকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হয় না। চিহ্নগুলো বলে দিচ্ছে কোথায় রেস্টুরেন্ট, কোথায় টয়লেট। আমি টয়লেটের দিকে এগোলাম। এই একটি ব্যাপার আমার ঠিক বোধগম্য হয় না। আমাদের দেশের যে-কোনও বারোয়ারি টয়লেটে ঢুকলে অন্নপ্রাশনের ভাত বেরিয়ে আসে। বেশিরভাগ রেস্টুরেন্টেই অবশ্য এটির ব্যবস্থা নেই। বাস বা রেলের স্টেশনে যা আছে সেখানে ঢোকে কার সাধ্য। অথচ আমেরিকায় একেবারে উলটো অভিজ্ঞতা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে আমেরিকার সাধারণ মানুষের অধিকাংশই সাধারণ জীবনই যাপন করেন। কিন্তু পরিচ্ছন্নতাবোধ ওঁদের ঢের ঢের বেশি। বাতিল যা তা রাস্তায় ফেলে দেওয়ার কথা বেশিরভাগই চিন্তাও করতে পারেন না। বেসিনে গরম জল ছিল। আর তার পাশেই বোতাম টিপে হাওয়ায় হাত শুকোবার ব্যবস্থা। এমন একটা ঝকঝকে এবং আধুনিক টয়লেট ব্যবহার করার জন্যে আমাকে পয়সা খরচ করতে হল না। না দেখে এলে কারও মুখে এসব কথা শুনলে তাকে আমি দালাল ভাবতে পারতাম।

শ্যামপুকুর পাড়ায় রকে বসলেই গবুদার সঙ্গে দেখা হবেই। নোংরা পাজামা আর হ্যান্ডলুমের

পাঞ্জাবি। চোখে চশমা। এখন চুলে একটু সাদার ছোঁয়া। এমন এক বামপন্থী মানুষ খুব কম দেখেছি। ছাত্রাবস্থায় এস এফ করতেন। এখন পাড়ার নেতা। যে কোনও বিপদে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। চাকরি বাকরি করেননি। দু-তিনটে টিউশনি করে ভাইয়ের সংসারে টিকে আছেন। যখন অনেক বামপন্থীই ক্ষমতায় আসার পর গায়েগতরে মাংস লাগাতে পেরেছেন তখন গবুদার বুকের পাঁজর গোনা যায়। মানুষটি বোধহয় আজীবন কর্মীস্তরেই থেকে যাবেন, নেতা হওয়ার সৌভাগ্য হবে না। সেই বাসনা তাঁর আছে বলে মনে হয় না। গবুদার সঙ্গে আমার প্রায়ই তর্ক হত। বাম মানসিকতার একটু সমালোচনা শুনলে তিনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন। আমার মুখের ওপরে বলতেন, 'শুনুন সমরেশ, আমি আপনার সব লেখা পড়েছি। আগে মানুষের কথা থাকত। যেমন উত্তরাধিকার। একটা গল্পও মনে আছে যার শেষে মধ্যবিত্ত নায়ক ব্যাঙাচির মতো লেজ খসিয়ে ফেলেছিল। দারুণ। মানুষের লেখক হওয়ার সম্ভবনা ছিল আপনার। কিন্তু আপনি নিজেকে বিক্রি করেছেন।'

হেসে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কার কাছে?'

'এস্টাব্লিশমেন্টের কাছে। বুর্জোয়া কাগজের কাছে।'

'সেই কাগজ তো লক্ষ লক্ষ মানুষ পড়ে। তারা দাম দিয়ে কেনে।'

'ড্রাগও তো মানুষ দাম দিয়ে কেনে।'

'আমার লেখার কোন বিষয়টি আপনাকে এইসব ভাবতে সাহায্য করছে?'

'ওই বানানো গল্প, নারীপুরুষের সেন্টিমেন্ট নিয়ে ব্যাবসা। যা সত্য তা নেই লেখায়।'

'সত্যি কথা যদি লিখি, মানে এই বস্তির জানলার পাশে যে আস্তাকুঁড় তাহলে খুশি হবেন?'

'আপনার উদ্দেশ্যটা কী তা জানতে হবে আগে!'

এই গবুদার কাছে আমেরিকার প্রশংসা করা মানে নিজেকে বিক্রি করা। 'আরে মশাই, আপনি এই কলকাতার টাটা বিড়লার বাড়িতে গিয়ে দেখুন কী ঝকঝকে আধুনিক ব্যবস্থা, চোখ ট্যারা হয়ে যাবে। কিন্তু তা নিয়ে লেখার কী আছে?'

'আমাদের অনেক বামপন্থী নেতার বাথরুম কিন্তু আপনার শোওয়ার ঘরের থেকে সুন্দর।'

বিরক্ত হয়ে চলে গিয়েছিলেন গবুদা। লোকটিকে আমি পছন্দ করি। যা ওঁকে অতকাল বোঝানো হয়েছে তাই তিনি আঁকড়ে ধরে আছেন। আমেরিকা মানেই তাঁর কাছে খারাপ। কিন্তু আমেরিকার সাধারণ মানুষ যে আমাদের মতনই সাধারণ তা উনি ভাবতে পারেন না। আর সেই সাধারণ মানুষকে তাদের নাগরিক অধিকার থেকে বুর্জোয়া সরকার বঞ্চিত করতে পারে না এ সত্যও তার অজানা। ওদেশ বেড়াতে গিয়ে এটুকু বোঝা যায়, আমরা কতখানি বঞ্চিত।

বাইরে বেরিয়ে এসে রেস্টুরেন্টের দিকে পা বাড়িয়েই দেখতে পেলাম কাউন্টারের পাশে দাঁড়ানো অ্যানের সঙ্গে মশগুল হয়ে গল্প করছে এক বিশাল সাদা। লোকটার হাত দেখে মনে হচ্ছিল ঢাউস ট্রাক চালানোই ওর পেশা। লোকটা নিশ্চয়ই অ্যানের পূর্বপরিচিত নইলে অমন ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলতে পারে না। অস্বীকার করব না আমার একটু খারাপ লাগল। খানিকটা দূরত্ব রেখে কাউন্টারে পৌঁছে কফি চাইতেই অ্যানের গলা শোনা গেল। চিৎকার করে বলছে, 'হাই স্যাম, তোমার কফি আমার কাছে।'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই দেখলাম দু-হাতে দুটো কফির কাপ নিয়ে সে হাসি মুখে এগিয়ে আসছে। ট্রাক ড্রাইভারটি একই জায়গায় ফ্যালফ্যাল করে দাঁড়িয়ে দেখছে। কফি নিলাম। অ্যান বলল, 'তুমি টয়লেটে অনেক সময় নিয়েছ। চটপট খেয়ে নাও। বাস ছাড়তে বেশি দেরি নেই।'

আমি লোকটির কথা ভাবছিলাম। নিশ্চয়ই এখানে এসে দাঁড়াবে। কফিতে চুমুক দিয়ে বললাম, 'তোমার বন্ধু অপেক্ষা করছে।'

'বন্ধু?' অ্যান হেসে উঠল, 'বন্ধু হবে কেন? যেচে এসে আলাপ করল। আমি একা শুনে বলল ও খুব একা। দুজনে মিলে দু-একদিন যদি দোকা হওয়া যায় তাহলে ব্যাপারটা চমৎকার হয়।'

হাসিটা থামাল না অ্যান।

আমি হতবাক। অচেনা কোনও ভদ্র রমণীকে এমন প্রস্তাব করা যায়? অ্যান বলল, 'আমি চুপচাপ শুনছিলাম। কেন জানো?'

মাথা নেড়ে না বললাম।

'তুমি যতক্ষণ ফিরে না আসছে ততক্ষণ একা থাকলেই আর একজন এসে এই এক প্রস্তাব দেবে। আমার গায়ের রং যদি ধবধবে সাদা হত তাহলে দিত না। এইসব উজবুকদের ধারণা স্প্যানিশ বা মেক্সিক্যান মেয়েকে একলা পেলেই সে শুতে রাজি হয়ে যাবে। মুখের ওপর না বলে ঝগড়া করাটা বোকামি। এদের ট্যাকল করতে হয় একটু ভান দেখিয়ে। চলো।' খালি কাপ বাক্সে ফেলে দিল অ্যান। আমি ওকে অনুসরণ করলাম। কলকাতার রাস্তায় অ্যানকে দেখলে গায়ের চামড়ার তারতম্য ধরা আমাদের পক্ষে সম্ভব হত না। এদেশের জহুরিরা বেশ বোঝে।

বাসে কিছু নবীন যাত্রী উঠেছেন। ফলে তাদের জায়গা ছেড়ে দিতে অ্যান তার জিনিসপত্র আমার মাথার ওপর সিলিং-এ রেখে দিল। ধপ করে পাশে বসে বলল, 'স্যাম, এবার একটু ঘুমোনো যাক, কী বল?'

'মাপ করো, তুমি আমাকে স্যাম বলো না, আমার নাম সমরেশ।'

দু-তিনবার সে আমার নামটা উচ্চারণ করল। তারপর হাসল।

বাস চলতে আরম্ভ করতেই মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়ল। মাথা একপাশে হেলানো, চুলগুলি চমৎকার। আমার ঘুম আসছিল না। কফি খাওয়ার পর জড়তাও চলে গেছে। সিটের একপাশে রাখা অ্যানের মোটা বইটা তুলে নিলাম। যাচ্চলে। এ যে দেখছি রূপচর্চার বই। কসমেটলজি। পাতা উলটে বুঝলাম শৌখিন পড়ার জন্যে নয়, এ রীতিমতো পাঠ্যপুস্তক। কিছুই করার নেই, ঘুমও আসছে না, তাই পড়া শুরু করলাম। তুমি নিশ্চয়ই মনে রাখবে ঈশ্বর তোমার যে রূপ দিয়েছেন তাই হল স্বাভাবিক এবং সুন্দর। স্বাভাবিকের চেয়ে সুন্দর আর কী হতে পারে। একটা অধ্যায়ের শুরুটা এইভাবে হয়েছে। লেখক খুব বুদ্ধিমান নইলে রূপচর্চার বই লিখতে গিয়ে বিপরীত দিক দিয়ে শুরু করতেন না। তুমি যখন স্নান করে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াও তখনই দিনের মধ্যে তোমার সেরা রূপটি ফুটে ওঠে। কোনও মেকআপই তাকে ম্লান করতে পারে না। তাহলে আলাদা করে রূপচর্চার কী প্রয়োজন? এইবার সেই ব্যাখ্যায় আসা যাক।

এইরকম একটা বই স্বাভাবিক সময়ে আমি আধ পাতাও পড়তাম না কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক আমি বেশ কাটিয়ে দিলাম। একটা চোখকে কতরকমভাবে সাজানো যায় এবং প্রতিটি রকম থেকে তার আলাদা চরিত্র কীভাবে উঠে আসে তা না পড়লে জানতে পারতাম না। এই বই পড়ে পরীক্ষা দিয়ে যে ডিপ্লোমা পাওয়া যায় তার সুবাদে বিউটি পার্লারের চাকরি হয়। একেবারে শেষে চাকরি করার সময় কীরকম ব্যবহার খদ্দেরদের সঙ্গে করতে হবে তার কিছু টিপস আছে। যে প্রৌঢ়া মহিলাটি দুপুরবেলায় চুলে রং করাতে তোমার কাছে এসেছেন তাঁর পছন্দ লালচে রং। কিন্তু তার চামড়া দেখে মনে হচ্ছে কালো ভালো মানাবে। সরাসরি একথা তাকে কখনওই বলবে না। লালচে চুল খুবই ভালো তবে গতকাল মিসেস হাডসন কালো চুল করালেন। খুব মিষ্টি দেখাচ্ছিল তাকে। গল্প করার ঢঙে কথাগুলো বলে তুমি লাল রঙের দিকে হাত বাড়াবে। যদি দ্যাখো ভদ্রমহিলা তাঁর মত বদলাচ্ছেন তো ভালো কিন্তু কখনই জোরজবরদস্তি করবে না। মন রেখো, সিদ্ধান্তটি তিনি বাড়িতে বসেই নিয়েছেন। অনেক মহিলা তোমার কাছে নিজের সংসারের বা প্রতিবেশীর নানান গল্প করবেন। তুমি যখন কাজ করছ তখন তো তিনি মুখ বন্ধ করে বসে থাকতে পারেন না। সেই গল্পগুলো এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে অন্য কান দিয়ে বের করে দেবে। কখনই আর একজন খদ্দেরকে শোনা গল্প শোনাতে যেও না। মনে রেখো, এলাকাটা যত বড়ই হক না কেন, কথার গতি বাতাসের থেকে বেশি। তোমার খদ্দের কিন্তু তোমার ওপরই বিরাগভাগজন হবেন যার জন্যে তুমি চাকরি

খোয়াতে পারো।

বইটি আমার পছন্দ হল। এখন পৃথিবীর নানান বিষয় নিয়ে কত না বই চমৎকারভাবে লেখা হচ্ছে, আমরা তার কোনও খবরই রাখি না।

কাঁধে চাপ পড়ছে। বাসের গতির সঙ্গে যে ঈষৎ দুলুনি তাতেই অ্যানের মাথা চলে এসেছে আমার কাঁধের ওপর। বালিশের কাজ করছে এখন কাঁধ। কী নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে চলেছে মেয়েটা। কয়েক ঘণ্টা আগেও আমরা কেউ কাউকে চিনতাম না। অবশ্য দশ বছর একসঙ্গে থেকেও কি আমরা পরস্পরকে চিনতে পারি? আজকাল কলকাতায় মা-বাবা সম্বন্ধ করার পর ছেলেমেয়েকে দুদিন পরস্পরকে চেনার জন্যে মেশার সুযোগ দেন। কতটা চেনা যায় তাতে? আমাদের দুই সহপাঠী এবং সহপাঠিনী এখনও বিয়ে করেনি। ছেলেটি প্রস্তাব দিয়েছিল। মেয়েটি বলেছিল ভেবে দেখি। ভাবতে-ভাবতে পঁচিশ বছর কেটে গেল এখনও তার ভাবা শেষ হল না। যেহেতু মেয়েটি অন্য কাউকে বিয়ে করেনি তাই ছেলেটিকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। ব্যাপারটা বিশ্বাস করা কঠিন কিন্তু সত্যি। আবার অফিসের দুটি মানুষ সকালে পরিচিত হয়েছে। পরের সপ্তাহে তারা সই করে বিয়ে করেছ এই খবরও জানি। মেয়েটি আমার পরিচিত। এত তাড়াতাড়ি কী করে সম্ভব হল শুনে সে বলেছিল, অচেনা একটা লোককে বাড়িতে ডেকে এনে মন্ত্র পড়িয়ে বাসরঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তখন আমাদের দেশের মেয়েরা তো বলে না এত তাড়াতাড়ি কী করে সম্ভব?

টুলসা হয়ে স্প্রিংফিল্ডে পৌঁছোলাম সকাল সাড়ে দশটায়। ইতিমধ্যে ঘুম ভেঙেছে অ্যানের। চুলটুল ঠিক করে নিয়েছে সে। একটু সাজুগুজু হয়ে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কোথায় নামছ জানা হল না?'

'স্প্রিংফিল্ড।' সে হাসল। একটু লজ্জা-লজ্জা হাসি। তুমি?'

'আমি তো যাব অনেক দূর। কিন্তু একটানা বারো ঘণ্টা জার্নি করে এখন বেশ ক্লান্তি লাগছে। এখানে একটু রেস্ট নিয়ে গেলে কেমন হয় তাই ভাবছি।'

'খুব ভালো হয়। চলো চলো, নেমে পড়ো।'

সারারাত ঘুম নেই। ঘণ্টা চারেক টানটান ঘুমাতে চাই। স্প্রিংফিল্ডের দেখলাম একই দশা। বরফ চারপাশে তবে ঠান্ডাটা অতটা নয়। সুটকেস নিয়ে অ্যানের সঙ্গে গ্রে-হাউন্ড বিল্ডিং-এ ঢুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় যাবে।'

'ওকে আমি টেলিফোন করেছিলাম আমাকে রিসিভ করার জন্যে।'

'কাকে?'

'টনি। টনি এভার্ট। আরে যার কথা তোমাকে রাত্রে বললাম।'

মনে পড়ল। অ্যানের প্রেমিক যে খুব দুঃখ পেয়েছিল।

'সে এখানে থাকে বুঝি?'

'হ্যাঁ। আমি ঠিক করেছি টনিকেই বিয়ে করব।'

'সে এখনও অবিবাহিত?'

'না। বিয়ে করেছিল। কিন্তু ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। আলাপ হলে দেখবে ছেলেটা সত্যি খুব ভালো। যে মেয়েটা ওকে ছেড়ে গেছে সে নিশ্চয়ই খুব বোকা।'

আমি আর অবাক হচ্ছিলাম না। অ্যান নিজেও তো একদিন টনিকে ছেড়েছিল। অবশ্য সেই জন্যেই নিজের বোকামি সংশোধন করতে এতদূরে ছুটে এল।

যেসব যাত্রী এখানে নেমেছেন তারা নিজেদের ঢেকেঢুকে বেরিয়ে গেলেন। হালকা রোদ উঠেছে বাইরে। দুজনে দাঁড়িয়ে আছি এনক্যুয়ারির সামনে। টনির দেখা নেই। খুব উশখুশ করছে অ্যান। টনি নাকি সময় সম্পর্কে খুব সচেতন, এমন হওয়ার কথা নয়। আধ ঘণ্টা চলে গেল। ও পাবলিক টেলিফোনে চলে গেল। খানিক বাদে ফিরে এসে বলল, 'বেজে যাচ্ছে। ও অ্যানসারিং

মেসিন কেন রাখেনি কে জানে।'

'নিশ্চয়ই এখন পথে আছে।' সান্ত্বনা দিলাম আমি।

ইতিমধ্যে খোঁজ নিয়ে জেনেছি গ্রে-হাউন্ড বিল্ডিং থেকে দুশো গজ হাঁটলেই মোটেল পাওয়া যাবে। দৈনিক বাইশ ডলার। অতএব আমার একটা হিল্লে হচ্ছে। কিন্তু অ্যানকে একা ফেলে যেতেও পারছি না। শেষপর্যন্ত জিজ্ঞাসা করলাম—'তুমি ঠিকানা জানো?'

বাচ্চা মেয়ের মতো মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল সে।

'তাহলে সেখানে গেলে হয় না?'

'কিন্তু ও স্পষ্ট বলল স্টেশনে আসবে।' অ্যানের গলায় হতাশা।

'হয়তো কোনও জরুরি কাজে আটকে গেছে।'

'আমার কাছে আসার চেয়েও জরুরি? তাহলে তো আমার এখানে আসাই উচিত হয়নি। ঠিক আছে, আমি এখানে ওর জন্যে অপেক্ষা করব। বোর্ডে দেখছি ঘণ্টা তিনেক বাদে লস অ্যাঞ্জেলসে ফেরার বাস আছে। তার মধ্যে না এলে আমি ফিরে যাব। তুমি বরং মোটেলে চলে যাও, সারারাত ঘুমোওনি।'

খুব খারাপ লাগছিল। বললাম, 'একবার ওর ঠিকানায় গিয়ে—।'

'না।'

অগত্যা সুটকেস তুলে নিয়ে হাত বাড়ালাম, 'মনে থাকবে তোমাকে।'

সে হাসল। তারপর হাত বাড়িয়ে বলল, 'বাই সামারেশ।'

এবার আর আমি সংশোধন করিয়ে দিলাম না। অনেকটাই তো মনে রেখে বলেছে। দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় আবার তাকালাম। একটি পাথরের মূর্তির মতো অ্যান দাঁড়িয়ে আছে। একটা স্বপ্নের আয়ু এখন মাত্র তিন ঘণ্টা। বুকের ভেতরটা যাওয়া-আসা করছে সহজ গতিতে।

মোটেলটি দোতলা, লম্বা। পাশে খানিকটা খোলা দরজা। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই দেওয়ালে শ্রীকৃষ্ণের ছবি দেখতে পেলাম। কাউন্টারের লোকটি নিশ্চিত ভারতীয়। হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি ভারত থেকে এসেছেন?'

লোকটি মাথা নড়ল, 'না। মরিসাস।'

॥ ১১ ॥

ঘুম ভাঙার পর আমি অনেকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইলাম। এই ঘর অন্ধকার, দরজা বন্ধ, জানলায় ভারী পরদা টাঙানো তাই বাইরের পৃথিবীর অবস্থা কীরকম বোঝার উপায় নেই। কিন্তু শুয়ে শুয়েই মনে হয়, আমি একা। আমার সঙ্গিরা এখন মায়ামির পথে। আমি যে স্প্রিংফিল্ডে নেমে একটি হোটেলে শুয়ে আছি এ কথা কারও জানার কথা নয়। এখন আমাকে পরিচিত কেউ খুঁজে বের করতে পারবে না।

মাঝে-মাঝে আমার মাথায় অন্যরকম মতলব আসে। মতলব শব্দটিতে একটু খারাপ গন্ধ থাকায় ইচ্ছে বলাই ভালো। এই আমি, এতকাল একরকম জীবন কাটালাম। আমার চারপাশের পরিচিত মানুষেরা আমাকে তাদের মতো করে জানে। যেসব দায় আমার আছে সেগুলোর ব্যবস্থা করে দিয়ে হঠাৎ যদি উধাও হয়ে যাই, যদি বহুদূরে একেবারে অচেনা কোনও পরিবেশে নতুন করে জীবন শুরু করি তাহলে কেমন হয়? এক জীবনে দুটো জীবনের স্বাদ। সেখানে আমি লেখক নই, পুরোনো কোনও স্মৃতি না টেনে একেবারে নতুন মানুষ। ধরা যাক, আটচল্লিশে কেউ মারা গেল। তার কাছে যেমন কোনও কিছু আশা করা বোকামি, এবং মেনে নিতে হয়, তেমনি প্রথম জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে

আর একটি জীবন বাকি কুড়ি বা পঁচিশ বছরের জন্যে করলে কেমন হয়? যাকে বলেছি সে হেসেছে। বলেছে, হবে না। তোমার আটচল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা কোথায় যাবে? সেগুলো তো আর মন থেকে সরাতে পারবে না। তারই নির্দেশ তোমাকে ওই পঁচিশ বছরেও নিয়ন্ত্রণ করবে। আজ শুয়ে-শুয়ে এই কথাই ভাবছিলাম। এখন যদি এখানে কোনও একটা কাজ জুটিয়ে থেকে যাই! না, অসম্ভব। এদেশে প্রথম প্রয়োজন তোমার পরিচয়পত্র। কথায়-কথায় দরকার। আমার পাশপোর্টে ভিসার মেয়াদ ফুরোতে দেরি হবে না। তারপর আমি অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। কেউ-কেউ ওই অবস্থায় শিকাগোয় চলে যায়। সেখানে নাকি মামলামকদ্দমা করে অনেক বছর থাকা যায়। তাই, জীবন পালটাতে গেলে সেটা ভারতেই করতে হবে যা নিতান্তই অসম্ভব।

আমি দেখেছি উলটোপালটা ভাবতে পারলে সময় বেশ কেটে যায় কিন্তু আমার খিদে পাচ্ছিল। এদেশে আসার পর এত খিদে কখনও পায়নি। ঘড়ি দেখলাম। চারটে বাজে। বিছানা ছেড়ে ধড়াচূড়ো পরতে একটুও ইচ্ছে করছিল না। দরজা খুলতেই মনে হল মরে যাব! বাপস, কী ঠান্ডা! রোদ নেই। দিন ধুঁকছে অনেকক্ষণ। একটা ময়লাটে আলো নেতিয়ে আছে বরফের ওপর। আপাদমস্তক ঢাকা একটি মানুষ হেঁটে গেল মোটেলের সামনে দিয়ে। হঠাৎ মনে হয়, কলকাতায় কিছু শেকড়হীন ছেলে যাদের জ্বালায় পাড়ায় বাস করা যায় না, মেয়েরা হাঁটতে পারেন না, রাজনৈতিক নেতারা যাদের ব্যবহার করে লাভবান হন, যাদের শোধনের কোনও উপায় নেই, তাদের সবাইকে তুলে নিয়ে এসে যদি এই বরফ পরিষ্কার করার কাজে লাগতে বাধ্য করা হত তাহলে একটু শিক্ষিত করা যেত।

এখন চারধার সেই স্বপ্নপুরীর মতো। রাক্ষুসী সমস্ত মানুষকে খেয়ে নিয়েছে। সন্ধে হলে সে আবার বেরুবে, সন্ধানে। এখনও চারপাশে মানুষের ভয় তিরতির করে কাঁপছে। একা-একা বরফে পা ফেলে অনেকটা চলে এলাম। দূরে ফুড লেখা নিওন সাইনটা দেখতে পাচ্ছি। বড় রাস্তার দুপাশে বাড়িঘর কম। একটা গ্যাস স্টেশন সামনেই। কোনও গাড়ি নেই। গ্যাস লিখে রাখা হয়েছে। আমাকে দাঁড়াতে দেখেই সম্ভবত কাচের ঘরের দরজাটা খুলে গেল। একটা ভারী চেহারার লোক চিৎকার করে উঠল, 'হা-ই!'

জবাবে হাই বলাই বিধেয়। বলে আমি এগিয়ে গেলাম লোকটার দিকে। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'নো কার?'

'নো। টুরিস্ট।'

'হা। কাম নি। কাম ইন। ডু ইউ হ্যাভ এনি আর্মস?'

আর্মস? দ্রুত ঘাড় নেড়ে না বললাম। লোকটা আমার চোখ ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। আমি কিন্তু অবাক হলাম। ওই বিশাল শরীরে সার্টের ওপর একটা পাতলা সোয়েটার ছাড়া এই ঠান্ডায় সে কিছুই পরেনি।

দরজা বন্ধ করে সে আমাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল, 'যার কাছে বন্দুক ছুরি থাকে তাকে এই ঘরে ঢোকানো নিষেধ। আমি মার্ক, তোমার নাম কী?'

আমি টুপি আর মাফলার খুললাম, 'সমরেশ। ভারত থেকে এসেছি।'

'ভারত? তাজমহল। তাই না? গুড। এই ঠান্ডায় কোথায় যাচ্ছ? আমি শেষবার কথা বলেছি তিন ঘণ্টা আগে। খুব বিশ্রী আবহাওয়া।' মার্কের ইংরেজি বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না।'

'খিদে পেয়েছে। ওপাশের মোটেলটায় আছি। খেতে বেরিয়েছি।'

'আ। ওদিকে মিখাইলের ফাস্টফুডের দোকান আছে। ব্যাটা চোর। হট ডগ খেলে মনে হবে কুকুরের ল্যাজ চিবাচ্ছ। ব্যাটাকে পুলিশে দেওয়া উচিত। তোমার হাতে যদি সময় থাকে তাহলে একটু অপেক্ষা করো, ভালো জায়গা দেখাব। খেয়ে বলবে তৃপ্তি হল। কফি খাবে?' জিজ্ঞাসা করেই মার্ক উঠে গেল কোনায়। সেখানে জারে কফি রয়েছে। একটা বোতাম টিপে সেটিকে গরম করে আমার এক গ্লাস এগিয়ে দিল, 'আসল ব্যাপার হল তৃপ্তি। সব করেও যদি তৃপ্তি না পাওয়া যায়

তাহলে করাটাই বৃথা। তুমি একা?'

'হ্যাঁ। এখানে আমি একা।' মার্ককে আমার ভালো লাগছিল। লোকটার চেহারা অরণ্যদেবের জলদস্যুদের মতো। বোঝাই যাচ্ছে কথা বলতে ভালোবাসে।

'আর পাঁচ মিনিট। তারপরেই আমার ছুটি।'

'এখানে তুমি কাজ করো?'

'ইয়া। ছ'মাস। তুমি কী করো?'

'লিখি। তবে এখানে এসেছি একটা টিভির ছবির জন্যে।'

'শুটিং করবে?'

'হ্যাঁ। ভেবেছিলাম ওয়েস্ট থেকে ইস্ট কোস্ট পর্যন্ত।'

কথা শেষ করতে দিল না মার্ক, 'ফালতু পরিশ্রম হবে। শোনো, আমেরিকায় দুইরকম শহর আছে। সানফ্রানসিসকো অথবা নিউইয়র্ক। রাস্তাঘাটে মানুষ দেখতে পাবে। বাকি জায়গায় খুঁজতে হবে। প্রায় সবকটা শহরের চেহারা একরকম। সাইনবোর্ড না দেখালে বোঝাতে পারবে না কোনও শহরের ছবি তুলেছ। দুটো শহরকে নিলেই আমেরিকা ধরা যায়।'

কথাগুলো আমার খুব মনে ধরল। স্থানীয় কিছু দ্রষ্টব্য, যেমন ডিজনিল্যান্ড, ইউনিভার্সাল স্টুডিও ছাড়া লস এঞ্জেলস্ আর ওয়াশিংটনের তফাতটা কোথায়? লাস ভেগাস অথবা গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের আলাদা চরিত্র নিশ্চয়ই আছে কিন্তু তাদের সঙ্গে বাকি আমেরিকার কোনও মিল নেই। আমাদের টিভি সিরিয়ালের পটভূমি বাছতে পরে মার্কের এই মন্তব্য খুব সাহায্য করেছিল। কফি খেতে-খেতে গল্প করছিলাম। যদিও কফির স্বাদ খুব তেতো। এরা চিনি খেতেই চায় না। আজকাল কলকাতাতেও দেখেছি আধ চামচের বেশি চিনি নিলে অনেকের চোখ বড় হয়। তবু খিদের মুখে এই তেতো কফি খারাপ লাগছে না।

পাঁচ মিনিটের মাথায় বরফ ডিঙিয়ে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। মার্ক বলল, 'নিক এসে গিয়েছে। চলো, এবার যাওয়া যাক।' সে তার ওভারকোট আর টুপি পরে নিল। নিক ছোকরা রোগা, অল্পবয়সি। মার্ক তার সঙ্গে জরুরি কথা সেরে আমায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বরফে পা দিয়েই মার্ক বলল, 'হাঁটবে হিলের ওপর চাপ রেখে। বুঝলে।'

এতক্ষণে সেটা বুঝে গিয়েছি। আবার গুঁড়িগুঁড়ি তুষার ঝরা শুরু হয়ে গেছে। আমার ওভারকোটের ওপরটা সাদাটে হয়ে যাচ্ছে। মিখাইলের ফাস্ট ফুডের দোকানের সামনে দিয়ে আমরা হেঁটে এলাম। দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমরা চুপচাপ হাঁটছি। মার্কের পায়ের ছাপ বরফের ওপর। নিজেদের ইয়েতি ভেবে নিতে অসুবিধা হচ্ছে না। বড় রাস্তা ছেড়ে মার্ক যখন ডানদিকে ঝুকল তখন আমি একটা অস্বস্তিতে আক্রান্ত হলাম। এটা সেই মধ্যবিত্তজনিত অস্বস্তি যা কলকাতা আমাদের উপহার দিয়েছে। মার্ককে আমি চিনিই না। লোকটা একটা ঘুষি মারলে আমি অজ্ঞান হয়ে যাব। ওর যদি কোনও বদ মতলব থাকে তাহলে? পকেটে ডলার, ট্র্যাভেলার্স চেক এবং আমার পাশপোর্ট রয়েছে। গ্রে-হাউন্ডের টিকিট সুটকেসে রেখে এসেছি। কিছু একটা হয়ে গেলে একেবারে ফতুর হয়ে যাব।

কিন্তু এসব ভাবনা সত্ত্বেও আমাকে মার্কের পেছনে হাঁটতে হচ্ছিল। চোখে পড়ল ডান দিকের বাড়ির দরকায় নিওনে লেখা, 'দি নোট'। তার দরজা ঠেলে মার্ক ঢুকতেই আমি অনুসরণ করলাম। আধা অন্ধকারে জড়ানো বেশ বড় হলঘরে টেবিল পাতা। সেখানে কিছু নারী-পুরুষ বসে। একপাশে লম্বা বার কাউন্টার। মার্ক ঢুকতেই চারপাশ থেকে হাই হাই শুনতে পাচ্ছি। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে মার্ক কাউন্টারের এপাশে একটা লম্বা টুলে গিয়ে বসে টুপি খুলে ফেলল। আমাকে ইশারায় তার পাশের টুলে বসতে বলে হাত তুলে কাউকে ডাকল। সামনের দেওয়াল জুড়ে নানান ধরনের মদের বোতল। একটি প্রৌঢ় মোটাসোটা মহিলা হাসতে-হাসতে এগিয়ে এসে বললেন, 'হাই মার্ক। কী ভালো

লাগছে তোমাকে দেখে।' মহিলাটিকে আমি আগে সিনেমায় দেখেছি। একদা সুন্দরী এই ধরনের মহিলা সাধারণত সম্পত্তির মালিকান হন।

মার্ক তাকে বলল, 'তোমাকে না দেখলে আমার মদ হজম হয় না সে কথা তুমি ভালো করেই জানো মার্থা। কিন্তু আমার এই বন্ধুটির খুব খিদে পেয়েছে।'

'তাই?' ভদ্রমহিলা এগিয়ে এলেন আমার দিকে। মাঝখানে কাউন্টার। হেসে বললেন, 'আমার এখানে এসেছেন বলে ধন্যবাদ। কী দেব আপনাকে?'

মার্ক বলল, 'আঃ। সবচেয়ে ভালো জিনিসটা দাও।'

মার্থা একটা আঙুল চিবুকে রেখে চোখ বন্ধ করলেন, 'আচ্ছা। এখন সামান্য কিছু মুখে দাও, খানিক বাদে ডিনার দিলে চলবে?'

ঘাড় নাড়লাম, অসুবিধে হবে না। মার্থা সঙ্গে-সঙ্গে শরীর দুলিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। আমি শঙ্কিত হলাম। এদের খাবারে আমি এখনও অভ্যস্ত হইনি। কী দেবে কে জানে। মার্ক তখন ষাঁড়ের মতো গলায় বলল, 'জোসেফ, চোখের মাথা খেয়েছ মনে হচ্ছে।' কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়ানো শুটকো প্রৌঢ় ততক্ষণাৎ একপাত্র হুইস্কি এগিয়ে দিল মার্কের সামনে। মার্ক তাকে বলল, 'আমার এই বন্ধুটি কি শুকিয়ে থাকবে?'

যোশেফ খুব বিনীতভাবে আমার দিকে তাকাল, 'স্যার। আপনি কী পছন্দ করেন?'

'ভোদকা উইদ টনিক।' এই বস্তুটি আমাকে সহজে কাবু করবে না। মাথা নেড়ে দ্রুত চলে গেল যোশেফ। ফিরে এল গ্লাস নিয়ে। কলকাতায় এক গ্লাস জল ছাড়া মদ খাওয়ার কথা চিন্তা করতে পারি না। সঙ্গে টুকটাক কিছু থাকা চাই। এখানে ঝাড়া হাত-পা। কিন্তু অসুবিধেও হয় না।

এই সময় একটি মেয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল প্লেট হাতে। তাতে দুটো মুরগির ভাজা ঠ্যাঙ রয়েছে। মার্ক বলল, 'ওকে। খারাপ হলে দাম দেব না মনে রেখো।'

মেয়েটি আমার সামনে প্লেট নামিয়ে হাসল, 'এই মুরগিটার চরিত্র খুব খারাপ ছিল। ভাজা হওয়ার পর একটু ভালো হয়েছে কি না পরখ করে বলবেন?'

বেশ মজা লাগল কথাটা শুনে। সামান্য মুখে দিয়ে বললাম, 'মেয়েরা তো খুব সহজে নিজেদের বদলে ফেলতে পারে, এই মুরগিটাও পেরেছে।'

সঙ্গে-সঙ্গে আবার ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে উঠল মার্ক, 'ঠিক জবাব, জবাব ঠিক!' আশেপাশের দু-তিনজন উঠে এল ওই হাসিতে। তারা জানতে চাইল হাসির কারণ কী। মার্কের মুখে প্রশ্ন এবং উত্তর শুনে সেই সব নেশা-হওয়া মানুষগুলো আমার হাত জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানাতে লাগল। একজন বলেই ফেলল, 'এতদিনে নাতালির মুখ বন্ধ হয়েছে। ওর কথার খোঁচায় সারা মনে ঘা হয়ে গিয়েছিল।'

আমার পরিবেশনকারিনির নাম তাহলে নাতালি। সে চোখেমুখে লাল করে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল আমার দিকে। এবার বলল, 'মুরগিটার চরিত্র খারাপ ছিল কেন জানেন? খাঁচায় একটাও মোরগ ছিল না। বদলে গেল বলছেন যখন তখন মনে হচ্ছে এতদিনে খোঁজ পেয়েছে।'

বললাম, 'ঠিক বলেছেন। এই জন্যে ঘটকীকে কি ধন্যবাদ দেব?'

সঙ্গে-সঙ্গে আবার হাসির ফোয়ারা উঠল। মেয়েটি রাগি বেড়ালের মতো ছিটকে চলে গেল ভেতরে। এক প্রৌঢ় এগিয়ে এসে যোশেফকে বলল, 'হাই যো, আমার উপহার হিসেবে ওকে এক পাত্র দিয়ে দেবে। এই নাও দাম।'

তার দেখাদেখি আরও একজন এগিয়ে গেল। তারপর আরও। যোশেফ দামগুলো যোগ করে আমার সামনে এসে বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'স্যার, ছ'টা ভোদকা উইদ টনিকের দাম পেয়েছি। তার সঙ্গে আপনি আর একটা বেশি ধরতে পারেন।'

মার্ক বলল, 'সেটি আবার কার?'

যোশেফের সরু ছোট্ট মুখটা একবার ভেতর দিকটা দেখে নিল, 'আমার স্যার।'

মার্ক মাথা দোলাল, 'খুব সাহস বেড়েছে দেখছি।'

যোশেফ কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে গেল।

সমস্ত ব্যাপারটা এত আকস্মিকভাবে ঘটল যে আমি ঠিক কী করব বুঝতে পারছিলাম না। নাতালি মেয়েটি নিশ্চয়ই খুব মুখরা। ওর মুখের জ্বালায় এইসব ক্রেতারা নিশ্চয়ই টুঁ শব্দ করতে পারত না। আজ আমার কথায় মেয়েটি জব্দ হয়েছে ভেবে একটু উল্লসিত হতেই পারে। আমি যোশেফকে বললাম, 'আপনি আমাকে দুটো ভোদকা দেবেন বাকিটা মার্ককে।'

মার্ক আপত্তি করতে চাইল, কিন্তু আমি রাজি হলাম না।

মুরগি শেষ করে চারপাশে তাকালাম। ঘরটা একটু-একটু করে ভরছে। পাশের দেওয়ালে একটা টিভি সেটে বেস-বল খেলার ধারাবিবরণী শুরু হবে মনে হল। আমি মার্ককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এরা সবাই এই পাড়ার মানুষ?'

'বেশিরভাগই।' মার্ক বলল, 'এখানে সবাই সবাইকে চেনে।'

'এরা কী কাজকর্ম করেন?'

'প্রায় সবাই চাকরিজীবী।' শুধু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে মার্ক বলল, 'না, ওরা আসেনি। ওদের ব্যাবসা আছে। ছোটখাটো।'

এইসময় মার্থা ফিরে এলেন কাউন্টারে। মোটাসোটা মহিলার হাসিটি খুব সুন্দর। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি ঠিক করেছেন। নাতালির এটা প্রয়োজন ছিল।'

আমি বোকা-বোকা মুখ করে তাকিয়ে আছি দেখে বললেন, 'ভেতরের ঘরে বসে কাঁদছে। এই প্রথম ওকে কাঁদতে দেখলাম। অত সুন্দর দেখতে যুবতী মেয়েটার কোনও ছেলে-বন্ধু নেই, ভাবতে পারেন। শুধু ওই মুখের জন্যে। এই আমি, কবরে পা বাড়াতে চলেছি, তবু ছেলে-বন্ধুর ভিড় সামলাতে হিমসিম হচ্ছি। জো, তুমি কি জেলাস হচ্ছ?'

খানিটকা দূরে দাঁড়ানো রোগা মানুষটা ঘাড় নেড়ে না বলল।

মার্থা খুশি হলেন, 'গুড বয়।' তারপর আমাকে জানালেন, 'জো আমার স্বামী।'

'আচ্ছা!' হাসলাম। শিবরাম এঁদের নিয়ে চমৎকার গল্প লিখতে পারতেন। অবশ্য নাতালির মতো একটি মুখরাকে নিয়ে লিখেও গেছেন। সেই যাকে ঠান্ডা করতে হর্ষবর্দ্ধনকে গুলি ছুড়তে হয়েছিল। কিন্তু কোনও মেয়ে কাঁদছে আমার জন্যে, এটা ভালো কথা নয়। এই সময় একটি যুবক খুব বিনীতভঙ্গিতে সামনে এসে দাঁড়াল, 'মার্থা, নাতালি ঠিক আছে?' মাথা নাড়ালেন মহিলা, 'না। কাঁদছে।'

'কাঁদছে?' নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারল না যুবক।

'হ্যাঁ। যাও না ভেতরে। এরকম চান্স আর কখনও পাবে না।' মার্থা হাসলেন।

যুবক আমার দিকে ঘুরে বলল, 'আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ রইলাম।' তার পর একটু ঘুরে ভেতরের দিকে চলে গেল।

মার্ক হাসল, 'ও হল নাতালির একনম্বর প্রেমিক। আর সবাই কেটে পড়েছে। ও দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে আছে কিন্তু পাত্তা পাচ্ছে না নাতালির কাছে।'

যাক। তবু কারও উপকার করলাম।

হঠাৎ মার্থা আমার দিকে ঝুঁকে এলেন, 'আপনার দেশ কোথায় যেন?'

'ভারত।'

'অনেক দূর?'

'এখান থেকে তো নিশ্চয়ই।'

'ইংরেজিতে সবাই কথা বলে?'

'না। তবে কেউ-কেউ ইংরেজি জানে।'

'মেয়েরা আমার মতো বার রেস্টুরেন্ট চালায়।'

'খুব কম। পাহাড়ি অঞ্চলে দু-একজনকে দেখেছি।'

'মেয়েরা কী করে?'

'আগে সংসার ছাড়া কিছু করার সুযোগ পেতেন না তাঁরা। এখন সবই করছেন।'

'আপনাদের দেশের মেয়েরা সুন্দরী?'

'ও, নিশ্চয়ই।'

'আমার চেয়েও?'

মার্থার বয়স অবশ্যই পঞ্চাশ। শরীর মোটা হলেও সাজগোজের দৌলতে একটা চেকনাই আছে। আমাদের দেশের নব্বুইভাগ মহিলাই ওই বয়সে পৌঁছে সাদা শাড়ি ধরে ফেলেন। পঞ্চাশ বছর আগে জামা না পরলেও চলত। প্রেম করার কথা এখনও ভাবতে পারেন না। ইদানীং প্রায়ই মনে হয় পঞ্চাশ পেরিয়ে যাওয়া মহিলারা যদি নিজেদের সম্পর্কে সতর্ক থাকেন তাহলে খুব ভালো বন্ধু হতে পারেন। কারণ তাঁদের অভিজ্ঞতা অনেক গভীর। কিন্তু একথা বললে লোকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাবে। 'অভিজ্ঞান' লিখেছিলেন বলে সমরেশ বসুকে তো কম গালাগালি শুনতে হয়নি। যেন চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত বুকে প্রেম থাকবে আর তার পরেই সেটাকে ছুড়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিতে হবে। কেউ যদি রেখে দেন তাহলে তিনি চরিত্রহীনা হবেন? অদ্ভুত ব্যবস্থা!

মার্থাকে বললাম, 'সৌন্দর্য কখনও তুলনা করা যায় না। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত, কোনটা বেশি সুন্দর তা কি কেউ বলতে পারে?'

মার্থা মাথা নাড়তে লাগলেন, 'কী ভালো, কী ভালো! মন ভরে গেল। কতদিন এদেশে আছ? একা একাই ঘুরে বেড়াচ্ছে?'

দু-দুটো প্রশ্ন। জবাব দিলাম। মার্থা বলল, 'একটু বাদে আমরা ডিনার খাব। কিন্তু তোমার কাছে দাম নেব না। তুমি ভেতরে চলে এসো।'

মার্ক বলল, 'বাঃ, আমি দরজার বাইরে পড়ে রইলাম?'

ভেতরে যাওয়ার আগে মহিলা মার্কের দিকে চোখের কোনায় তাকিয়ে বললেন, 'আজ পর্যন্ত তোমাকে বাদ দিয়ে আমি কিছু করেছি?'

এই সময় সারা ঘরে উত্তেজনা ছড়াল টিভি। খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। বেসবল এদেশে প্রচণ্ড জনপ্রিয় খেলা। ফুটবল কেউ দেখে না, ক্রিকেটের চল নেই। বেসবলই ধ্যানজ্ঞান। খেলা হচ্ছে পিটসবার্গে, রেডস অর পাইরেটস নামের দুটো দলের মধ্যে। এই ঘরের দর্শকরা ইতিমধ্যে দুটো দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। বিলি হ্যাচার এবং ম্যারিওনো ডানকান নামের দুটি খেলোয়াড় দারুণ খেলছে। হ্যাচার ডানকান চিৎকারে কানে তালা লাগার উপক্রম। এখন কারও কোনদিকে মন নেই। কে বলবে বাইরে, বরফের পাহাড় জমে উঠেছে। এরই মধ্যে মার্ক জিজ্ঞাসা করল, 'ভারতে বেসবল হয়?'

মাথা নেড়ে না বললাম। মার্ক এমনভাবে তাকাল যেন আমরা কোনও অসভ্য দেশের মানুষ। চিৎকার করে বললাম, 'আমরা হকি, ক্রিকেট খেলি।'

হঠাৎ মনে হল, ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে গানটি কি হকি খেলা সম্পর্কে প্রয়োগ করা যায় না?

খেলা চলাকালীন মাঠে গোলমাল বাধতেই সেটা সংক্রামিত হল এঘরে। হঠাৎ দুমদাম মারপিট লেগে গেল। চেয়ার গড়াতে লাগল। চিৎকার চেঁচামেচির সঙ্গে ঘুষোঘুষি। মার্থা কাউন্টারের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগলেন। তাঁর দোকান ভেঙে যাচ্ছে। মার্ক চুপচাপ বসে রইল। হঠাৎ দরজা ঠেলে দুজন পুলিস অফিসারের আবির্ভাব হতেই গোলমাল আচমকা থেমে গেল। সুড়সুড় করে বেরিয়ে যেতে লাগল দর্শকরা। কয়েক সেকেন্ডেই ঘর ফাঁকা। একজন অফিসার এগিয়ে এলেন, 'মার্থা, হাজারবার বলেছি এইসব খেলার সময় টিভি অন্য চ্যানেলে নিয়ে যাবে। এই শেষবার ওয়ার্নিং দিচ্ছি।'

মার্থা নেমে দাঁড়ালেন, 'শোনে নাকি হতভাগারা!'

'নেক্সট টাইম এই যুক্তি শুনব না। কেমন চলছে মার্ক?'

মার্ক হাতে ওলটাল। কিছু বলল না মুখে। অফিসার আমার দিক তাকালেন, 'নতুন মনে হচ্ছে। গোলমালে আপনি ছিলেন না?'

'না। বেসবলে আমার আকর্ষণ নেই।'

'সে কী?' আপনি কোনও গ্রহের মানুষ?' অফিসার যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, 'শো মি ইওর আইডি!'

অগত্যা পাশপোর্ট বের করে দিলাম। সেটি পরীক্ষা করে ফিরিয়ে দিয়ে মন্তব্য করলেন, 'হুম। ল্যান্ড অফ গ্যান্ডি। শি ওয়াজ কিল্ড, তাই না?'

'হ্যাঁ। যেভাবে প্রেসিডেন্ট কেনেডি নিহত হন।'

অফিসার চোখ ছোট করে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় উঠেছ?'

'মোটেলে।'

'হুম।' ওঁরা আর দাঁড়ালেন না।

শূন্য রেস্টুরেন্টে তখন জো টেবিল চেয়ার ঠিকঠাক করছে। হঠাৎ ভেতর থেকে চিৎকার ভেসে এল। এবং সেই যুবক পড়ি কি মরি করে দৌড়ে এল বাইরে। তার পেছন-পেছন নাতালি, 'ধরো-ধরো ওকে। পুলিশ কোথায় গেল?'

যুবক আর দাঁড়ায়নি। নাতালি কথা শুরু করার আগে সে রাস্তার বাইরে। মার্থা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে মানে? আমি কাঁদছিলাম আর ও এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। তা থাকুক বসে। এখানে গোলমাল শুরু হতেই বলল, একটা চুমু খেতে পারে কি না। আমার মন এত খারাপ ছিল যে মাথা নেড়ে দিয়েছিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে চুমু খেতে লাগল। সেটা খেয়াল হতে নিজেকে সরাতে চাইছি অমনি আমার জিপারে হাত রাখল? এত বড় আস্পর্দা? আমাকে ওর সঙ্গে শুতে হবে?' চিৎকার করল নাতালি।

'তোমাকে ও খুব ভালবাসে নাতালি।'

'ঝাড়ু মারো অমন ভালোবাসার মাথায় যা জিপার খোঁজা ছাড়া কিছু জানে না। পুরুষগুলোর সব সময় একটাই ধান্দা। দু-চক্ষে দেখতে পারি না। বাড়ি গিয়ে স্নান না করা পর্যন্ত সারা শরীর ঘিনঘিন করবে।' কথাগুলো বলেই নাতালি এবার আমার দিকে তাকাল। তারপর বড়-বড় পা ফেলে সামনে এল, 'এই যে। আমাকে জব্দ করার জন্যে মার্ক তোমাকে এনেছে, না? সত্যি কথা বলো?'

ভয়ে-ভয়ে জবাব দিলাম, 'সত্যি কি তুমি জব্দ হয়েছ?'

'না। হইনি। অত সোজা না।'

'এ কথাটাই তো আমি সবাইকে বোঝাতে চাইছি।'

'কী বোঝাতে চাইছ?'

'তুমি অন্য ধাতুতে গড়া। এত বড় আমেরিকায় তোমার মতো মেয়ে দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। তবে হ্যাঁ, তোমার কাউন্টার পার্ট ভারতে প্রচুর আছে।'

'সত্যিই?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো আমার সে দেশেই যাওয়া উচিত।'

'চলে এসো। তোমাকে মাথায় করে রাখব আমরা। তোমার মতো মেয়েকে আমরা সতীসাবিত্রীর একটা রূপ বলে থাকি।'

'সতী মানে কী?'

'যে একজন ছাড়া অন্য পুরুষের ছায়া মাড়ায় না।'

'কিন্তু, কিন্তু আমার তো সেই একজন নেই।'

মার্থা এবার কথা বললেন, 'ঠিক আছে, এ নিয়ে পরে কথা বলা যাবে। এখন চলো, সবাই মিলে ডিনার করা যাক।'

খাবার সত্যি ভালো। আমেরিকানরা ভাত এবং মাংসের ঝোল খায় তা এই প্রথম জানলাম। খাওয়ার টেবিলে নাতালি আমার দিকে মাঝে-মাঝেই আড়চোখে তাকাচ্ছে। যে দেশের মেয়েরা বিয়ের আগে কুমারী আছে জানলে তার শারীরিক অক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ করা হয় সেদেশে নাতালি তো অদ্ভুত ব্যতিক্রম।

খাওয়ার পরে মার্থা এবং জো-এর কাছে বিদায় নিয়ে আমরা তিনজন বেরিয়ে এলাম। ওদের তুলনায় আমার পোশাক অনেক ভারী। কিন্তু এই নিশুতি রাত্রে যেন ঠান্ডা আরও ধারালো হয়ে দাঁত বসাচ্ছে। নির্জন বরফ-মাখা রাস্তায় একটা গাড়ি পর্যন্ত নেই। এদেশে নেড়ি কুকুর নেই, থাকলেও এই আবহাওয়ায় বেরুত না। মার্ক যাবে আমার মোটেল ছাড়িয়ে। খানিকটা যাওয়ার পর নাতালি দাঁড়াল। আমার দিকে ঘুরে বলল, 'কদিন আছ এখানে?'

'কাল সকালে চলে যাব।' কাঁপতে-কাঁপতে বললাম। মুখ থেকে ধোঁয়া বেরুল।

'গুডনাইট।' মেয়েটা একা বাঁ-দিকের রাস্তা ধরল।

খুব খারাপ লাগছিল। মার্ক হাঁটা শুরু করে হাসল, 'মেয়েটা বোকা!'

'কেন?'

'কবে বারো-তেরো বছর বয়সে দুটো কালো লোক ওকে ধর্ষণ করেছিল সেই স্মৃতি ভুলতে পারছে না। পুরুষ দেখলেই ওদের কথা ভাবে। এই করতে-করতে একদিন খিটখিটে বুড়ি হয়ে যাবে।' মার্ক কাঁধ নাচাল।

মোটেলের সামনে এসে মার্ক হাত বাড়াল, 'তা, কেমন কাটল সময়?'

'খুব ভালো। তুমি না নিয়ে গেলে এসব অজানা থেকে যেত।'

'হাউ ওয়াজ দ্য ফুড?'

'ভালো। খুব ভালো।'

'গুডনাইট।' মার্ক হাত ছাড়িয়ে হাঁটা শুরু করল।

মোটেলের বিছানায় লেপের তলায় শুয়ে আমার মনে হল এ দেশের মানুষের আবেগ বড্ড কম। মার্থা, নাতালি এবং মার্কের মতো এমন সহজ গলায় বিদায় নিয়ে যেতে পারতাম কি আমি যেখানে আর কোনওদিন দেখা হবে না। হয়তো এটাই ঠিক, আবেগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আবর্জনার মতো পা জড়িয়ে ধরে।

পরদিন গ্রে-হাউন্ড ধরলাম ওই সকাল সাড়ে দশটাতেই। সেন্ট লুইস হয়ে ইন্ডিয়ানাপোলিসে এলাম রাত ন'টা পনেরোতে। একদিনের পক্ষে অনেকটা বাসে থেকেছি। এই পথটুকু একেবারে মুখ বুজে কাটাতে হয়েছে। বাসটা ছিল ফাঁকা। জানলার বাইরের বরফ আর কতক্ষণ দেখা যায়। আমি ক্রমশ দেশের মাঝখানে চলে আসছি। ফলে ঠান্ডা বাড়ছে। কিন্তু জিরো ডিগ্রির নীচে তাপমাত্রা নেমে গেলেও আমি তো বেশ মানিয়ে নিয়েছি। ইন্ডিয়ানাপোলিসে মোটেলে রাতে কাটালাম। আজ এত রাত্রে কোথাও যাইনি। একটা নিউ ইয়র্ক টাইমস পড়ে আছে ঘরে। আসার আগে যিনি ছিলেন তিনি নিয়ে যাননি আর ঘর পরিষ্কার করার সময় এরাও সরায়নি। তারই পাতায় চোখ রাখলাম। হঠাৎ একটি বিজ্ঞাপন আমার নজর কাড়ল। বিজ্ঞাপনের আকারে ওপরে পঁচিশে ফেব্রুয়ারি, উনিশশো তিরাশিতে গর্ভনর মারিও ক্যুমোর উক্তি উদ্ধৃত, 'আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি কোঅপারেটিভ সোসাইটির প্রয়োজনীয় মেরামতির ব্যাপারে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।' তারপরেই দুই বৃদ্ধার ছবি। হাতে পোস্টার। তার ওপর লেখা, 'গর্ভনর, আপনি কি আপনার প্রতিজ্ঞা ভুলে গেছেন?'

নিউ ইয়র্কের একটি কোঅপারেটিভ হাউসিং স্টেট, যা কি না পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কোঅপারেটিভ হিসেবে স্বীকৃত, তার নাগরিকেরা এই বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। বিজ্ঞাপনের ভাষা, বিনয় এবং সমস্যা মনে রাখার মতো।

গর্ভনর, আপনি কি জানেন, সরকারের তত্ত্বাবধানে কোঅপারেটিভ সোসাইটির বাড়ি তৈরির দাম আড়াই মিলিয়ন ডলার থেকে আধ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে?

আপনি কি জানেন, সবরকম খরচ দেওয়া এখানকার বাসিন্দারা বাড়ি তৈরির ডিজাইন এবং কনস্ট্রাকশনের গাফিলতির জন্যে অসুবিধেতে রয়েছেন? যেমন, মাটির তলা দিয়ে জল, ইলেকট্রিক, গ্যাস ইত্যাদির বিলিব্যবস্থায় ভুল আছে?

আপনি কি জানেন,—এই ভুলের জন্যে যদি সব বানচাল হয়ে যায় তাহলে এই সোসাইটির পঞ্চান্ন হাজার মানুষ যাঁদের মধ্যে বৃদ্ধ এবং শিশুরা আছেন, সঙ্গে-সঙ্গে গৃহহীন হয়ে যাবেন?

আপনি কি জানেন, এ ব্যাপারে উপযুক্ত কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা অচলাবস্থায় এসে পৌঁছেছে? এবং কাজ স্থগিত রয়েছে।

আপনি কি জানেন, আমাদের বাড়ির ব্যাপারে খরচ প্রায় শতকরা একশো পঁচিশ ভাগ বেড়েছে এবং সরকার কোনও কাজই করছেন না?

গর্ভনর, দয়া করে আমাদের হিমশিতে ফেলে রাখবেন না। নির্বাচনের আগে আপনি আশ্বাস দিয়েছিলেন আমাদের প্রয়োজনে পাশে থাকবেন।

আপনাকে আমাদের প্রয়োজন এখনই।

এইরকম একটি গণতান্ত্রিক আবেদন দেখে অবাক না হয়ে পারিনি। আমাদের দেশে নির্বাচনের আগে নেতারা কতরকম আশ্বাস দেন। পরে যখন তাঁদের দর্শন পাওয়া যায় না তখন এইরকম বিজ্ঞাপন ছাপা হলে কি কোনও প্রতিক্রিয়া হবে?

সকালে গ্রে-হাউন্ড বাসস্ট্যান্ডে এসে ম্যাপের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল ডেটনের পরে কলম্বাস ওয়াহিও পড়বে। সঙ্গে-সঙ্গে মনে এল আমাদের দুই বন্ধুর কথা। সঙ্গের ডায়েরি দেখে টেলিফোন করলাম। প্রায় ছ'ঘণ্টার দূরত্বে টেলিফোন বাজল। প্রভাতের গলা শুনতে পেলাম। পরিচয় দিতেই তিনি উল্লসিত, 'আরে, কোত্থেকে বলছেন? ইন্ডিয়ানাপোলিস? সেখানে কী করছেন? আসুন, চলে আসুন। কখন আসছে বাস? চারটে কুড়ি? ঠিক আছে, গ্রে-হাউন্ড স্ট্যান্ডে আমরা থাকব। বেশ জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে।'

॥ ১২ ॥

বাসে চেপেছি সকাল দশটা চল্লিশে। দুপাশের রস্তায়, শুকনো গাছের ডালে, খোলা মাঠে বরফের পরিমাণ যেন বেড়েই চলেছে। এই বরফ দেখতে-দেখতে চোখ খারাপ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। কলকাতায় বসে বরফের ছবি দেখে বেশ আনন্দ হয়। কল্পনা করতে ভালো লাগে এস্কিমোদের সঙ্গে ইগলুতে বাস করছি। কিন্তু বাস্তব বড় নির্মম।

আমি যে বাসটি চেপেছি সেটি আসছে লস এঞ্জেলস থেকে। এক-একটা শহরে কিছুক্ষণ জিরিয়ে ছুটে চলেছে নিউ ইয়র্কের দিকে। সময় লাগে প্রায় সত্তর ঘণ্টা। বাসে উঠেই লক্ষ করেছি একটি বাইশ তেইশ বছরের ছেলে সমানে বিড়বিড় করে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে উঠে দাঁড়াচ্ছে। বেশ ক্ষুব্ধ বলে মনে হচ্ছে ওকে। কোনও কারণে ড্রাইভার গতি কমিয়েছিল অমনি সে চিৎকার করে গালাগালি দিতে লাগল। এরকম অভিজ্ঞতা আগে হয়নি। বাসে সবাইকে ভদ্রভাবেই বসে থাকতে দেখেছি। আমার পাশে যিনি বসেছিলেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ছেলেটির সমস্যা কী?'

'একটানা জার্নি করে ওর নার্ভ ফেল করেছে। খুব কম মানুষ ওই দূরত্ব একটানা যায়। আট ঘণ্টা অন্তর বাসের ড্রাইভার পালটানো হয়। একঘেয়েমি চূড়ান্ত অবস্থায় গেলে এরকম হয়। ইন্ডিয়ানাপোলিসে ড্রাইভার ওকে অনুরোধ করেছিল একদিন থেকে যেতে। তাহলে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে তে। ছেলেটার কাছে নাকি পয়সা নেই। থাকলেই তো খরচ।' ভদ্রলোক জানালেন।

আমি ছেলেটিকে দেখলাম। টলতে-টলতে আমার পাশ দিয়ে টয়লেটে গেল। যাওয়ার সময় বিড়বিড় করছিল, 'বরফ, বরফ আর বরফ। পাগল হয়ে যাব আমি।' টয়লেট থেকে বেরিয়েই চিৎকার করল, 'হেই ম্যান, জোরে চালাতে কেউ শেখায়নি তোমাকে? নেক্সট টাইম আমি এই বাস কখনই চড়ব না। কারও কিছু বলার আছে?' চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে সে অন্যান্য যাত্রীদের দিকে তাকাতে-তাকাতে নিজের জায়গায় ফিরে গেল। কেউ কোনও জবাব দিল না। ছেলেটার মনের অবস্থা বোধহয় সবাই বুঝতে পারছিল। এই আমি, মাঝে-মাঝেই মোটেলে রাত কাটিয়ে চলেছি, আমারই কেমন একঘেয়ে লাগতে শুরু করেছে। ছেলেটার তো হতেই পারে।

আমার ডান দিকের সিটে একটি ছেলে গম্ভীরভাবে সিগারেট খাচ্ছিল। চিবুকে যত্নে রাখা দাড়ি। প্যান্ট, জ্যাকেটে আমেরিকান ছাপ। গায়ের রং মেক্সিকানদের মতো। কিন্তু অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ করছি ওর পায়ের জুতো বাটা কোম্পানির একটি বিশেষ প্রোডাক্টের মতো। ছেলেটা যখন সোজা দাঁড়িয়ে মাথার ওপরের র‍্যাক থেকে হাত ব্যাগ টেনে কিছু বের করছিল তখন ব্যাগের গায়ে যে ছাপটি দেখলাম তা কলকাতায় কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে অহরহ দেখেছি। সন্দেহ বাড়ছিল। ছেলেটা ব্যাগ থেকে একটা হেডফোন গোছের জিনিস বের করে মাথায় লাগিয়ে সিটে বসে চোখ বন্ধ করে গান শুনতে লাগল। ওর বাটা কোম্পানির জুতো নাচছে।

সামান্য ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার লাইটারটা পেতে পারি?'

ছেলেটার কানে কথাটা ঢুকল না। আমি ওর পাশের খালি সিটে বসে প্রশ্নটা আবার করতেই সে নড়েচড়ে সোজা হল। হেডফোন খুলে আমার প্রশ্নটা শুনল তারপর নিতান্ত অনিচ্ছায় আমাকে লাইটার দিল। সিগারেট ধরিয়ে বললাম, 'কী বরফ, ভাবা যায় না?'

'এদেশে থাকতে হলে এসব মেনে নিতেই হবে।' চোস্ত ইংরেজিতে বলল ছেলেটি।

'আপনি কতদিন আছেন এখানে?'

'দুবছর। কিন্তু এর মধ্যেই নিজেকে এদেশের সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে নিয়েছি।'

'আপনার দেশ?'

'আমেরিকা!' ছেলেটা কাঁধ ঝাঁকাল।

'এখানে আসার আগে?'

'ওঃ! হরিবল! ইন্ডিয়াতে ছিলাম। কীভাবে ছিলাম এখন ভাবতেই অবাক লাগে।' কথাগুলো বলে ছেলেটা আমার দিকে তাকাল, 'আপনি এশিয়ান। বাংলাদেশ থেকে?'

'না। কলকাতা থেকে।'

'মাই গড।' ছেলেটা হেডফোন মাথায় আটকাতে যাচ্ছিল।

এবার পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'কখনও দেশে ফিরবেন না?'

সে কিন্তু ইংরেজিতেই জবাব দিল, 'না। কখনও না।'

'কেন?'

'আমি এখানেই থাকতে চাই, তাই।'

'গ্রিন কার্ড পেয়েছেন?'

'সেটা আপনাকে বলতে আমি বাধ্য নই।' ছেলেটা চোখ বন্ধ করল। আমি ফিরে এলাম নিজের আসনে। খুব রাগ হচ্ছিল। একসময় কলকাতা থেকে প্রচুর ছেলে বম্বে যেত সিনেমায় নামবে বলে। বেশ কিছু সফল মানুষের দৃষ্টান্ত ছিল যাঁরা একসময় বম্বের ফুটপাতে শুয়ে থাকতেন পয়সার

অভাবে এবং পরবর্তীকালে ফিল্মলাইনের কেউকেটা হয়েছেন। এদের দেখে যারা গিয়েছে তাদে নিরানব্বুই ভাগ হারিয়ে গিয়েছে হতাশায়। ঠিক তেমনি আমেরিকার হাতছানিতে আকৃষ্ট হয়ে কি তরুণ-তরুণী চলে আসে এদেশে। কলেজে পড়ার ছাড়পত্র একটু ভালো ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় বসলে পেয়ে যায়। ক'জন ফিরে যায় জানি না। এই ছেলেটি কেমনভাবে এসেছে তাও জানা নেই। তবে ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পর আর যখন নবীকরণ করা সম্ভব হয় না তখন চোরের মতে এদেশে লুকিয়ে থাকতে হয় এদের। পরিশ্রম করলে আমেরিকায় এখনও ডলার রোজগার করা যায় কিন্তু বৈধ ছাড়পত্র না থাকলে অর্ধেক মাইনে দিয়ে এদের ব্যবহার করার মতো প্রতিষ্ঠানের অভা নেই। এবং সেইসব প্রতিষ্ঠান চালায় এশিয়ানরাই। ছেলেটি এখন আমাকে খুব অপছন্দ করছে। যে আমেরিকান তা বোঝাবার জন্যে একটি কালো ছেলের পাশে উঠে এল। একদম মার্কিন কায়দা কথা বলতে লাগল সে, সম্ভবত আমাকে শুনিয়ে।

ডেটনে গাড়ি থামল মিনিট দশেকের জন্যে। দত্ত পরিবারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে নিলাম। আমি ঠিক সাড়ে চারটেয় পৌঁছব। বরফের জন্য দশ মিনিট দেরি হবে। জানলায় ওয়াহিওতে এখন এই দুপুরে তাপমাত্রা মাইনাস দশ। হাড় হিম হয়ে যাওয়ার মতো খবর। ডেটন থেকে মা পৌনে দু-ঘণ্টার পথ। কিন্তু এত বরফ পড়ছে যে সরকারি গাড়ি সেগুলো রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলতে না-ফেলতেই আবার জমে যাচ্ছে। ফলে আমাদের বাস চলেছে বেশ সতর্ক হয়ে। আর এই কারণে সহযাত্রী ছেলেটি আরও অস্থির হয়ে উঠল। ভয় হচ্ছিল, নিউইয়র্কে পৌঁছোবার আগে ছেলেটি পুরো পাগল না হয়ে যায়!

গ্রে-হাউন্ড বাসে শীততাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু নেব্রাস্কা অঞ্চলে মাঝে-মাঝে দুর্ঘটনার কথা শোনা যায়। তাপমাত্রা সেখানে সামারেই জিরোতে থাকে। শীতে তো কথাই নেই দুটি শহরের ব্যবধানও প্রচুর। মাঝপথে যদি কোনও বাসের তাপযন্ত্র খারাপ হয়ে যায় তাহলেই হয়ে গেল। গেল বছর নাকি বাসসুদ্ধ মানুষ ঠান্ডায় জমে মরে গিয়েছিল ওইরকম দুর্ঘটনার কারণে। এখানে বাসের ঘেরাটোপে বসে ভাবছি সেরকম কিছু হলে অবস্থা আদৌ সুখকর হবে না।

ওয়াহিও শহরে ঢুকলাম। নির্জন চুপচাপ শহর। তবে গাড়ি দেখতে পাচ্ছি বিস্তর। মনে হচ্ছে এখানে বরফ সরাবার ব্যবস্থা ভালো। রাস্তায় কোনও গাড়ি হর্ন বাজায় না। গ্রে-হাউন্ড বিল্ডিং-এ নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়ায় অপেক্ষা করছি ওঁদের জন্যে। পাঁচটা বাজতে চলল। উদ্বিগ্ন হয়ে দু-তিনবার বাইরে উঁকি মারতে গিয়েছিলাম। সারা শরীরে কাঁপুনি হতে ছুটে ফিরে এসেছি। পাঁচটা নাগাদ তনুশ্রী এলেন। আপাদমস্তক শীত পোশাকে ঢাকা। চিনতে অসুবিধে হয়। প্রথমেই সংলাপ, 'কেমন জম্পেশ শীত পড়েছে বলুন তো! আপনার নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগছে!'

ওঁর গাড়িতে উঠতে গিয়ে দেখলাম বর্ষায় কলকাতার রাস্তায় যেমন কাদা জমে তেমনি এখানে বরফের কাদা জমে আছে। সাবধানে না হাঁটলে আছাড় খেতে হবে। গাড়ির ভেতর বেশ গরম আরাম তনুশ্রী বললেন, 'বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাইওয়েতে এমন জ্যামে পড়েছিলাম যে আসতে দেরি হয়ে গেল।'

'আপনাদের বাড়ি কি অনেক দূরে?'

'পঁয়তাল্লিশ মিনিট।'

'বাঙালি কেমন আছে এখানে?'

'প্রচুর। আপনি আসবেন জেনে গিয়েছে অনেকেই।'

'এর মধ্যেই!'

'আমাদের পেটে কথা থাকে না।' তনুশ্রী হাসলেন, 'ফিরে গিয়ে লিখবেন?'

'এখনও ভাবিনি।'

'অদ্ভুত!'

'বুঝলাম না।'

'আপনারা বাঙালি লেখকরা কদিনের জন্যে এখানে এসে কী দ্যাখেন জানি না কিন্তু ফিরে গিয়ে এত ভুলভাল লেখেন যে পড়া যায় না। যার বাড়িতে তাঁরা এসে ওঠেন পরে সমালোচনা শুনতে-শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। না বুঝে লিখবেন না।'

আমি জানি না কোন লেখক কী ভুল করেছেন কিন্তু বুঝলাম এঁরা ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। তনুশ্রীদের বাড়ির চারপাশে বরফ। রাস্তায় দুপাশের বাড়িগুলো এই সন্ধেবেলায় ভূতুড়ে ছবির মতো দেখাচ্ছে। গ্যারাজের সামনে পৌঁছে রিমোট টিপে দরজা খুলে গাড়ি ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন ভদ্রমহিলা। গ্যারাজে গরম হাওয়া চালু ছিল। আমার কোনও কষ্ট হল না। প্রভাত দাঁড়িয়েছিলেন। মনে হল নিজের বাড়িতে এলাম। পুরো বাড়িটা গরম রাখার ব্যবস্থা আছে। স্নান সেরে পাজামা পাঞ্জাবি পরে কী যে আরাম লাগল তা বোঝাতে পারব না! আমাকে যে ঘরটি দেওয়া হল তার জানলার বাইরেই যেন নর্থ পোল।

কয়েকদিন ছিলাম ওয়াহিওতে। দত্ত পরিবার পালা করে ছুটি নিচ্ছিলেন আমাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্যে। এই কয়দিনে ওখানকার বাঙালিদের জীবনযাপনে অংশ নিয়েছি। এইটে পরবর্তীকালে চিত্রনাট্য লেখার সময় খুব সাহায্য করেছে। ওখানকার বাঙালিদের সঙ্গে মিশেছি। প্রত্যেকেরই খুব নিজের লোক বলে মনে হয়েছে। ব্যবহারে এত আন্তরিকতা আমরা এদেশে হারিয়েছি।

দত্ত পরিবারের একটি দিন এভাবেই কাটে। ভোর চারটের সময়, বাইরে যখন মাইনাস পঁয়ত্রিশ, প্রভাত বড় ছেলে রাণাকে ঘুম থেকে তুলে দেন। রাণার বয়স বড়জোর সতেরো। খুব মেধাবী ছাত্র। পোশাক পরে রাণাকে নিয়ে প্রভাত বের হন। যখন বরফ থাকে না তখন রাণা একাই যায়। ছেলেকে বরফে গাড়ি চালাতে দেবেন না বলে প্রভাত সঙ্গি হন। ওইসময় দূরের একটা মোড়ে খবরের কাগজের ভ্যান আসে। রাণা তার কোটার কাগজগুলো নিয়ে গাড়িতে তোলে। তারপর ওই ঠান্ডায় বাড়ি-বাড়ি বিলিয়ে আসে। প্রত্যেকের বাড়ির সামনে কাগজ রাখার জায়গা আছে। সেলোফেনে মুড়ে কাগজ ফেলে দেয় সেখানে। সাড়ে পাঁচটায় ফিরে আসে বাড়িতে। ততক্ষণে তনুশ্রী উঠে চায়ের জল আর ব্রেকফাস্ট তৈরি করছেন। ছেলে মেয়েরা তৈরি হচ্ছে স্কুলের জন্যে। সাতটায় প্রভাত বেরিয়ে গেলেন ছোট মেয়ের সঙ্গে। আটটায় তনুশ্রী। বাসে অনেক দূরের পথ। নিজের গাড়ি ছাড়া নড়ার কোনও উপায় নেই। একটা সামান্য জিনিস কিনতে দুই মাইল দূরের সুপার মার্কেটে ছুটতে হয়। পাড়ার দোকান বলে কোনও বস্তু নেই। সারাদিন গাড়িটা পড়ে থাকে চুপচাপ। বিকেলে প্রথমে দশবছরের মালিনী ফেরে। চাবি ঘুরিয়ে বাড়িতে ঢুকে সে নিজের খাবার নিয়ে টিভির সামনে বসে যায়। এর পর রাণা। তার দায়িত্ব একটু বেশি। প্রয়োজনে কার্পেট এইসময় পরিষ্কার করে ফেলে। দত্তদম্পতি কাজ থেকে ফেরেন সন্ধের মুখে। এসেই এক প্রস্থ চা খাবার। ছেলেমেয়েদের খোঁজ খবর। তারপর প্রয়োজন হলে বাজারে যাওয়া। এই ঠান্ডাতেও গাড়ি বের করতে হয়। বাজারের প্যাকেট নিয়ে বাড়ি ফেরার পর সেগুলো সাজিয়ে রাখার দায়িত্ব কর্তার, গিন্নি তখন রান্নায় লেগে যান। আধুনিকতম রান্নার যন্ত্রপাতি থাকলেও প্রস্তুতি তো হাতেই করতে হয়। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চার পাঁচটি পদের বাঙালি রান্না শেষ। খাওয়াদাওয়ার শেষে বাসন ধোয়ার পালা। চেষ্টা করে বেসিন পর্যন্ত যেতে দেননি আমাকে ওঁরা।

এ বাড়িতে পার্টি ছাড়া মদের ব্যবস্থা নেই, সিগারেট কেউ খান না।

খাওয়দাওয়ার পাট চুকলে পড়াশুনা শুরু। ঘুমাতে যান বারোটায়। মাঝে-মাঝে মনে হত এঁরা পুতুলের মতো জীবনযাপন করছেন। একেবারে যন্ত্রচালিত পুতুল। কিন্তু সেটা ভুল তার প্রমাণ এঁদের আড্ডাগুলো। নিয়মিত নাটক নৃত্যনাট্য করে যাচ্ছেন ওয়াহিওর বাঙালিরা। সেখানে ভিড়ও বেশ হয়। পুজো হয় সবকটা। আর বিস্ময়ের ব্যাপার, বাংলাদেশের কিছু পরিবার এঁদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ। তবু যে কষ্ট এদেশের মেয়েদের করতে হয় আমাদের কলকাতায় তা চিন্তা করতে পারি না। আমাকে

এক কলকাতাবাসিনী বলেছিলেন আমি আমেরিকায় যাব না পাকাপাকীভাবে থাকতে কারণ সেখানে বাড়িতে কোনও পাঁচুর মাকে পাব না। ভোর হতে মধ্যরাত পর্যন্ত পরিশ্রম করা আমার দ্বারা পোষাবে না।'

একদিন একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা হল। রাণার বন্ধু একটি সাদা আমেরিকান কিশোর এল বাড়িতে। বেচারা সাহস দেখাতে গিয়ে বেশি শীতবস্ত্র পরেনি। রাণা দরজা খুলে দেখল সে ঠকঠক করে কাঁপছে। সঙ্গে-সঙ্গে সে চিৎকার করে তার মাকে ডাকল। তনুশ্রী দেখলেন অবস্থা। ঠান্ডায় ছেলেটির চুলগুলো সোজা এবং আঠালো হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ওর মাথা গরমজলে ধুইয়ে মুছিয়ে চিরুনি দিয় আঁচড়ে দিলেন তিনি। ছেলেটি মিন মিন করে জিজ্ঞাসা করল, 'আন্টি আপনাকে কত দিতে হবে?

এই নিয়ে আমরা খুব হাসিহাসি করেছিলাম। ছেলেটি প্রশ্ন করছিস সিরিয়াস হয়ে। কারণ সে জানত তনুশ্রী মহিলাদের সৌন্দর্য-বিষয়ক পড়াশুনা করছেন। তাঁর জীবিকা হবে এটাই। যে কাজটি তিনি করলেন সেটি তাঁর জীবিকার অঙ্গ। অতএব দক্ষিণা দেওয়া কর্তব্য। পিসি মাসিদের স্নেহ বা অনাত্মীয় নারীর কাছে স্নেহ পাওয়ার সুযোগ তার হয়নি।

আমি সুমিত্রা, ছবি, তনুশ্রীদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম এখানে কেন আছেন? টাকার জন্যে? হ্যাঁ, টাকার জন্যেই ওঁরা গিয়েছেন সেটা স্বীকার করেছেন। এ কথাও সকলে জানেন যা সম্পত্তি ওঁদের হয়েছে তা বিক্রি করে দেশে ফিরে গেলে কোনও কাজ না করে রাজার মতো থাকতে পারবেন। কিন্তু ফেরা সম্ভব নয়। ইচ্ছেও নেই। নিজেরা বাড়িঘর করে একটু-একটু করে মানিয়ে নিয়েছেন পরিবেশের সঙ্গে। দূষণমুক্ত আবহাওয়া, পরিষ্কার রাস্তা, টাটকা খাবার, প্রয়োজনীয় জিনিস ঠিকঠাক পাওয়া তাঁদের অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। লোডশেডিং, ভিড়, নোংরা আর হাহাকার দেশের প্রতি টানকে ভোঁতা করে দিয়েছে।

'যদ্দিন সামর্থ থাকবে, নিকট আত্মীয়রা বেঁচে থাকবেন তদ্দিন দু-বছরে একবার দেশে যাব। ঝি চাকর নেই, প্রচুর খাটতে হয় তবু অনেক শান্তিতে আছি মশাই।'

দেখেছি, যখনই কোনও দম্পতি সান্ধ্য আসরে নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন তখনই কিছু না কিছু উপহার সঙ্গে আনেন। এটা যেন নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। ক্রিসমাসের আগের সন্ধ্যাবেলায় ওখানে থাকার সুবাদে আমার ভাগ্যেও কম জোটেনি। কলকাতায় আমরা এই ব্যবস্থা চালু করলে কেমন হয়? পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়ে বউকে বাড়িতে রেখে যাওয়া চলবে না। দ্বিতীয়বার এক কাণ্ড করলে ভদ্রলোককে সামাজিকভাবে বয়কট করা হবে। দেখেছি, ওয়াহিও এলাকার আশি নব্বুইটি বাঙালি পরিবার পরস্পরকে চেনেন। কারও বাড়িতে কলকাতা থেকে অতিথি গেলে নিমন্ত্রণের ধুম পড়ে যায়। এঁদের সঙ্গে নিউ জার্সি অথবা নিউ ইয়র্কের একটু পার্থক্য আছে। এখানে এখনও বাঙালিদের দলাদলি শুরু হয়নি। সম্পর্ক তাই অটুট।

সুব্রতরা যেদিন সিদ্ধার্থর সঙ্গে মায়ামি থেকে নিউ জার্সিতে ফিরল সেইদিন আমি রওনা হলাম। সন্ধের একটু বাদেই বাস ছাড়ল। পিটসবার্গ, হ্যারিসবার্গ, ফিলাডেলফিয়া হয়ে নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটন। রাতটা ঘুমিয়েই কাটিয়েছি। শুধু পিটসবার্গ শহরে চোখ খুলেছিলাম। একটা নদীর দুপাশে এমন চমৎকার সাজানো শহর খুব একটা দেখা যায় না।

ম্যানহাটনের পোর্ট অথরিটিতে বাস আমাকে নামিয়ে দিল ভোর সাড়ে ছটায়। তখনও সকাল হয়নি। নিউইয়র্কে বরফ নেই। কিন্তু ঠান্ডা খুব। পোর্ট অথরিটিতেই যাওয়ার সময় চুরিটা হয়েছিল। দেখলাম এই ভোরে কালোমানুষরা নেই তেমন। বোধহয় পরিশ্রান্ত হয়ে যে যার বাড়িতে ফিরে গিয়েছে। সুটকেস নিয়ে টিউব ধরার জন্যে এগোলাম। এই ভোরে ম্যানহাটনের মাটির তলায় মানুষ নেই বললেই সত্যি বলা হয়।

এর আগে যখনই পাতাল রেলে চেপেছি তখনই সঙ্গে কেউ না কেউ ছিল। মাটির তলায়

এত লাইন বিভিন্ন দিকে গিয়েছে যে পথ হারালে খারাপ অবস্থা হবে। অবশ্য একবার কয়েন ঢুকিয়ে ভেতরে গেলে যতবার ট্রেন বদলাও আর টিকিট কিনতে হবে না। মনে ছিল এইট অ্যাভিন্যু এক্সপ্রেস ধরতে হবে। পঞ্চাশ, উনষাট, বাহাত্তর নামের স্টেশনগুলো ওপরে রাস্তার নামের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে তৈরি। শেষ পর্যন্ত একশো পঁচাত্তর বা জর্জ ওয়াশিংটন বাস স্টেশনের গায়ে পৌঁছোতে টিউব থেকে নেমে পড়লাম। সারাটা পথে তিনজনের বেশি সঙ্গী ছিল না কামরায়।

ওপরে উঠে আসতেই ঠান্ডা হাওয়ার ধাক্কা খেলাম। সিগারেট অসাড় লাগছে। এত বরফের দেশ পেরিয়ে শুকনো জায়গায় এসে এ কী দুর্দশা! জর্জ ওয়াশিংটন বাস টার্মিনাসটি ঠিক হাডসন নদীর গায়ে, নিউ জার্সিতে ঢোকার মুখে। এখান থেকে এত রুটের বাস ছাড়ে যে ধন্দে পড়তে হয় কোনও বাসটি সিদ্ধার্থর ক্রোস্টার শহরে ঢুকবে। ওখান থেকে চৌদ্দর টি বাসে এখানে একবার এসেছিলাম। সেই বাসটির সন্ধান পাচ্ছি না। এই সকালে দু-চার জন মানুষ যাঁরা নিউ জার্সিতে যাবেন তাঁদের জিজ্ঞাসা করে ভালো জবাব পাচ্ছি না। সিদ্ধার্থ একবার বলেছিল নিউ ইয়র্কের উত্তরে নিউ জার্সির একটি শহর হল ক্রোস্টার। ঘনঘন বাস বেরিয়ে যাচ্ছে। তাদের মাথায় কোনও জায়গার নাম লেখা নেই। অনুসন্ধান অফিস এখন বন্ধ। শেষ পর্যন্ত একজন হদিস দিলেন কুড়ি নম্বর বাসে আমি যেতে পারি। কুড়ি নম্বরে উঠলাম। ড্রাইভার ডলার নিয়ে টিকিট দিলেন। ফাঁকা বাস। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ক্রোস্টারে যাবে তো? তিনি বললন, 'সিওও'। র অক্ষরটি না বলতেই ইনি অভ্যস্ত।

আরামদায়ক বাসে বসে আমার মনে পড়ল কলকাতার রাস্তাতেও এই দৃশ্য প্রায়ই ঘটে। কোনও নতুন মানুষ যখন বারংবার গন্তব্যস্থলে এসে গেল কি না জিজ্ঞাসা করেন তখন অনেকেই হেসে থাকেন। আমার অবস্থাও তো সেইরকম! মনে আছে ক্রোস্টারের রেলরোড ক্রসিং স্টপ থেকে জর্জ ওয়াশিংটন আসতে ঠিক আধঘণ্টা লেগেছিল। উদ্বিগ্ন হয়ে বাইরে তাকিয়েছিলাম। এদের সব রাস্তাই একরকম। একবার মনে হচ্ছে ঠিক পথে যাচ্ছি আবার গুলিয়ে যাচ্ছে। ফোর্ট লি, এঙ্গেলউড, ক্রেসকিল ছোট-ছোট শহর। এগুলো কি পথে পড়েছে? আর একবার এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভারকে মনে করিয়ে দিতে তিনি নীরবে ঘাড় নাড়লেন। নরউড, হ্যারিংটন পার্ক। এবার মনে পড়েছে, হ্যারিংটন পার্ক ক্রোস্টারের আগের শহর। একটু নিশ্চিন্ত হলাম। ছোট-ছোট শহর পার হতেই আবার কাঁচা মাঠ অথবা জঙ্গল। মানুষের দর্শন পাওয়া দুর্লভ ব্যাপার। চলছি তো চলছি। হঠাৎ বাস থেমে গেল, ড্রাইভার ঘোষণা করলেন, 'ক্রোস্টার'।

ঝটপট নেমে পড়লাম, বাস বেরিয়ে গেল। এখন ঘড়িতে আটটা। শীত একই রকমের। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে মনে হল জঙ্গলের ভেতরে রয়েছি। দুপাশে কিছুটা জায়গা ছেড়ে যে বাড়িগুলো তার দরজা জানলা বন্ধ। গাছগাছালিই বেশি। এরকম কোনও জায়গা সিদ্ধার্থর বাড়ির কাছে ছিল কি না বুঝতে পারছি না। মানুষের সন্ধানে সামান্য হাঁটতেই একটা মোড় চোখে পড়ল। মোড়ের একধারে গাড়ি পার্ক করে যিনি তাতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর পরনে ইউনিফর্ম। দূর থেকে লক্ষ করলাম যেসব গাড়ি ওই মোড় দিয়ে যাচ্ছে তাদের ড্রাইভারদের অনেকেই ওঁর দিকে হাত নাড়ছে। লোকটাকে পুলিশ বলে মনে হল না। সাহায্য চাইবার জন্য এগিয়ে যেতেই তিনি হাসলেন। হাত নেড়ে বলনে, 'গুডমর্নিং।'

সুটকেস নামিয়ে বললাম, 'গুডমর্নিং।' দয়া করে বলবেন আমি কীভাবে ক্রোস্টারের ওয়েস্ট স্ট্রিটে যেতে পারি? আমি এখানে নতুন।'

ভদ্রলোকের বয়স অন্তত সত্তর। এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালেন, 'আপনি অন্তত কুড়ি মিনিট দূরে আছেন। গাড়ির সময় এটা। আপনি কী করে এখানে এলেন?'

'বাসে। আমি ক্রোস্টারে নামব বলেছিলাম।'

'ঠিকই। এটিও ক্রোস্টার স্যার। কুড়ি নম্বরে বদলে চৌদ্দর টি-তে উঠলে ওদিকে নামতে পারতেন। আপনি নাগরিক না গ্রিনকার্ড হোল্ডার?'

'আমি ট্যুরিস্ট। বেড়াতে এসেছি।'

'দেশ কোথায়?'

'ভারত।'

'আচ্ছা! আমি ভারতের কথা অনেক শুনেছি। বিশেষ করে মিসেস গান্ধির কথা। কিন্তু স্যার, আপনি সিগারেট খাচ্ছেন কেন? নিজেকে ধ্বংস করছেন আপনি!' বৃদ্ধ খুব গম্ভীর মুখে কথাগুলো বলে ঘুরে দাঁড়ালেন। ওপাশ থেকে এক মহিলা গাড়ি চালিয়ে আসছিলেন, হাত নেড়ে বললেন, 'হাই জন!' বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, 'হাই!'

সিগারেটের কথা শুনে একটু মেজাজ বিগড়েছিল, বললাম, 'কীভাবে ওয়েস্ট স্ট্রিটে পৌঁছতে পারি দয়া করে বলবেন?'

'ট্যাক্সি ডাকতে পারেন। ওপাশে টেলিফোন আছে। নইলে হাঁটুন। যারা সিগারেট খায় তাদের আমি একদম পছন্দ করি না। কত পয়সা বাজে খরচ হয় বলুন তো? আর তার বদলে ফুসফুসের কী হাল হচ্ছে! পকেটে প্রচুর ডলার থাকলে ট্যাক্সি ডাকুন।'

'প্রচুর তো নেই।'

'দেখুন স্যার, আমি আরও দশ মিনিট এখানে থাকব। সাড়ে সাতটা থেকে আটটা কুড়ি পর্যন্ত ছুটির দিন বাদ দিয়ে এখানে এসে দাঁড়াই আমি। ওদিকে একটা স্কুল আছে, বাচ্চারা এই রাস্তা পেরিয়ে যখন যায় তখন তাদের সাহায্য করি। হাই জো।' কথা বলতে বলতেই আর একটি গাড়ির দিকে হাত নাড়লেন জন।

'আপনি এখানে অনেকদিন আছেন?'

'আজন্ম। চাকরি ছাড়ার পর সারাদিন না ঘুমিয়ে এই কাজটি করি। এরা আমাকে খুব ভালোবাসে। বিশেষ করে বাচ্চারা। একটু আগে এলে দেখতে পেতে তাদের। ওয়েল, তুমি ট্যুরিস্ট, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি একটি শর্তে।'

'বলুন!'

'তুমি ওই সিগারেটটা ফেলে দাও, আমি তোমাকে পৌঁছে দেব।'

পুতুলের মতো হুকুম মান্য করলাম। বুড়ো যেন খুশি হল, 'পকেটে প্যাকেট নেই তো?' ছিল, বের করে দেখালাম। তিনি সেটা নিয়ে খানিকটা হেঁটে জঞ্জাল ফেলার বাক্সে ফেলে এলেন। এত আফসোস হচ্ছিল! সদ্য খুলেছিলাম প্যাকেটটা।

মিনিট দশেক বাদে ওঁর গাড়িতে আমি। কথা বলতে ভালোবাসেন ভদ্রলোক। জানলাম স্বামী স্ত্রী ছাড়া বাড়িতে তিনটি কুকুর আছে। ছেলেমেয়ে দূরে-দূরে। উনি সকালে বের হন নিয়মিত ঠিক সময়ে শিশুসেবা করতে, স্ত্রী বের হয়ে বিকেলে, শিশুদের ছুটির সময়ে। এইজন্যে মেয়র ওঁদের সংবর্ধনা দিয়েছেন। বললেন, 'প্রত্যেকদিন নিয়ম করে যদি তুমি বাচ্চাদের কোনও কাজে লাগতে পারো তাহলে দেখবে রাত্রে চমৎকার ঘুম হবে। কিন্তু দোহাই, সিগারেট খেয়ে কোনও শিশুর কাছে যেও না। বেচারার ক্ষতি হয়ে যাবে।'

সিদ্ধার্থর বাড়ির সামনে আমাকে নামিয়ে তিনি বললেন, 'যদি সময় পাও ওইখানে যে-কোনও সকালে চলে এসো। যতদিন না মরছি ততদিন দেখা পাবে। বাই!'

সুব্রত এবং অরিজিতের কাছে ওদের মায়ামি সফরের বর্ণনা শুনলাম। ফ্লোরিডা অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং আবহাওয়া দেশের অন্য অঞ্চল থেকে একদম আলাদা। ঠান্ডা কী তা ভালো করে জানে না ওখানকার আমেরিকানরা। অনেকেরই ভারী শীতবস্ত্র নেই। অতলান্তিকের তীরে এই অঞ্চলটি থেকে খানিকটা গেলেই উলটোদিকে গাল্ফ অফ মেক্সিকো। ফলে আবহাওয়ায় বাড়াবাড়ি নেই। ছবির মতো জায়গা। নিজস্ব দ্বীপ আছে এমন মানুষের অভাব নেই। কিন্তু এবার সমস্ত রেকর্ড ভেঙে ফ্লোরিডায় বরফ পড়েছিল। মানুষজন নাজেহাল। রাস্তায় যেটুকু বরফ জমেছিল তা সরানো

মুশকিল হয়েছিল বরফ সরানোর গাড়ি হাতের কাছে মজুদ না থাকায়। ফ্লোরিডা সারা দেশের কমলালেবুর জোগান দেয়। এই আচমকা তুষারপাতে তার ক্ষতি হয়েছে মারাত্মকভাবে। সুব্রত বলেছিল, 'অ্যামারিস্রোতে আমরা যে দেখেছি তার কাছে অবশ্য কিছুই নয়।' তবু গৃহহীন কিছু মানুষ নাকি মারা গিয়েছেন।

দুদিন ধরে আমরা হিসেব নিকেশ করলাম সিদ্ধার্থর বাড়িতে বসে। এত অভিজ্ঞতা একসঙ্গে চিত্রনাট্যে ঢোকানো মুশকিল। দ্বিতীয়ত, শহরগুলোর চেহারা মোটামুটি একইরকম বলে শুটিং-এর জন্য এত জায়গায় ছোটা অর্থহীন হবে। শুধু একটি দৃশ্যের জন্যে পঁচিশজনের ইউনিট নিয়ে লস ভেগাসে যাওয়ার কোনও অর্থ নেই। এই নিউ জার্সির এক প্রান্তে অতলান্তিক সমুদ্রের গায়ে ওই নামের একটি শহর আছে যেখানে একইরকম ক্যাসিনো সাজানো। অনেক ভেবেচিন্তে আমরা চিত্রনাট্যের একটা খসড়া করলাম।

ওয়াশিংটন থেকে খবর এসেছিল সরকারি দপ্তর আমাদের সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী, একটা সময় স্থির হয়েছে তার জন্যে। গ্রে-হাউন্ডের টিকিটের মেয়াদ তখনও শেষ হয়নি। আমি রমেনকে ফোন করলাম। জুলি, রমেনের বাঙালি স্ত্রী, ফোন ধরল। আমরা আসছি শুনে উচ্ছ্বসিত। বললেন, 'বাস থেকে নামতেই আমাদের কাউকে দেখতে পাবেন।' মনোজ যখন ছবিটি করবে ভেবেছিল তখন ওর নায়িকার চরিত্রে নির্বাচন করেছিল রমেনের মেয়ে জয়ন্তীকে। সেইসময় আমি ওঁদের পরিচিত হয়েছিলাম। মনোজের মৃত্যুর পর বেচারা খুব ভেঙে পড়েছিল। এর মধ্যে কয়েকবার বলে গিয়েছে। বয়স বেড়েছে মেয়েটার। এখন নিশ্চয়ই ওই চরিত্রে ভাবা যাবে না।

বাস থেকে নামবার আগে আমরা যে ওয়াশিংটনকে দেখেছি তার চেহারায় বেশ গাম্ভীর্য আছে। রাজধানী হওয়ার অহঙ্কার স্পষ্ট। রাস্তায় লোক নেই, গাড়ি প্রচুর।

একটা উল্লসিত চিৎকার শুনলাম। তাকাতেই দেখলাম জয়ন্তী ছুটে আসছে। এই ঠান্ডাতেও স্কার্ট পরনে। ওপরে অবশ্য জ্যাকেট রয়েছে। এই একটি বাঙালি মেয়ে যে এত বছর এদেশে থেকেও কী করে এতখানি সারল্য ধরে রাখতে পারে তা বিস্ময়ের। মুখোমুখি হতেই অনর্গল প্রশ্ন যার উত্তর দিতে তাল রাখতে পারছি না। হঠাৎ খেয়াল হতেই বলল, 'এ মা, আপনারা নিশ্চয়ই বিরক্ত হচ্ছেন, জার্নি করে টায়ার্ড তো হয়েছেনই।'

দেখলাম আমার সঙ্গীরা ওকে পছন্দ করে ফেলেছে। নিজের লাল গাড়িতে তুলল আমাদের জয়ন্তী। গাড়ির নাম্বার প্লেটে সংখ্যার বদলে লেখা জয়ন্তী। স্বচ্ছন্দে গাড়ি চালাতে-চালাতে আমাদের খবর নিচ্ছিল। চাকরি করে সে। আমরা আসছি বলে ছুটি নিয়েছে। হেসে বলল, 'জানো, আমি একটা বাড়িও কিনেছি। তোমাদের দেখাব।'

ওইটুকু মেয়ে আমেরিকায় বাড়ি গাড়ি কিনেছে ভাবতেই অবাক লাগে। নতুন বাড়িতে সে মাঝে-মাঝে একা গিয়ে থেকে আসে। মা-বাবার বাড়িতে নাচের স্কুল তার। ভারতীয় নাচ শেখায় প্রতি রবিবার। ছাত্রী মন্দ না।

রমেন পাইনকে আমি একজন একশোভাগ ভদ্রলোক বলে মনে করি। শিক্ষা রুচি ভদ্রতাবোধের সঙ্গে হৃদয় খুব কম ক্ষেত্রে যুক্ত হয়। রমেন সেই ব্যতিক্রম। এককালে কলকাতার টিভিতে খবর পড়ত। প্রায়ই ছুটে আসে এখানে। ভয়েস অফ আমেরিকার চাকরিতে সুনাম আছে কিন্তু ওখানকার জীবনে খাপ খাওয়াতে পারে না। জুলি খোলামেলা মানুষ। হইচই করতে ভালোবাসেন। সবাইকে নিয়ে মানিয়ে থাকতে চান। আমেরিকা তাকে স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে। দেশে ফেরার কোনও তাগিদ নেও ওঁর। রাত্রে অরিজিত বলল, 'পিংকি চরিত্রে মনোজবাবুর নির্বাচন ঠিক ছিল। ওকে এখনও মানিয়ে যাবে।'

হ্যাঁ। এ কথা আমার মনেও এসেছিল। এতগুলো বছরকে একটু কাছে ঘেঁষতে দেয়নি মেয়েটা। আমাদের একটা বড় সমস্যা সমাধান হল।

পরদিন জয়ন্তী আমাদের নিয়ে গেল সরকারি দপ্তরে। সিনক্লেয়ার নামের এক চিনে আমেরিকান আমাদের সঙ্গে কথা বললেন। যাবতীয় সাহায্য তিনি দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এর মধ্যে অন্যতম হল অনুমতি আদায় করে দেওয়া। একজন অফিসার সবসময় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। আমরা কোথায়-কোথায় শুটিং করব তার বিশদ বিবরণ আগাম দিতে হবে। পুলিশের অনুমতি পাওয়া যাবে ইনসিওরেন্স থাকলে। যে কোনও রাস্তায় ক্যামেরা বসিয়ে আমরা শুটিং করতে পারি না। কোনও পথচারী যদি আমাদের যন্ত্রপাতিতে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যান তাহলে তাঁকে মোটা টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অতএব এটা মনে রাখা দরকার। তা ছাড়া ওয়াশিংটন শহরে নানান জায়গার জন্যে নানানরকমের পুলিশ আছে। একটির অনুমতি অন্য জায়গায় কাজে লাগবে না। তবে সিনক্লেয়ার সাহেব এসব সমস্যার দায়িত্ব নিচ্ছেন। আমরা কোনও আর্থিক অনুদানের কথা বলিনি এবং ওঁরাও সেই বিষয়ে কোনও প্রস্তাব দেননি।

ভালোয়-ভালোয় এটা চুকে গেল বলে আমরা খুশি হলাম। যদি সরকারি অনুমতি না পাওয়া যেত তাহলে জে এস কে এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশনের দরজা শুটিং পার্টির জন্য বন্ধ হয়ে যেত। আমরা তো এর পরের বার ট্যুরিস্ট হিসেবে আসছি না।

আমরা ওয়াশিংটন শহরের সর্বত্র ঘুরলাম। শহরের মধ্যেই দুটো নদী, পোটোম্যাক আর অ্যানাকোস্টিয়া। ম্যাডিসন প্লেসের গায়ে হোয়াইট হাউসের সামনে শুটিং করব ঠিক করলাম। প্রেসিডেন্ট বুশ সাহেবের বাড়ির চারপাশে কাঠের নিরাপত্তার ব্যবস্থা। ভিয়েতনাম যুদ্ধে যাঁরা মারা গিয়েছে তাঁদের নাম লেখা দেওয়ালটাও পছন্দ হল। স্মিথসোনিয়ান, ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারির সামনের রাস্তাটাকে নির্বাচিত করা হল। মনুমেন্ট বা ক্যাপিট্যাল আমাদের আকর্ষণ করছিল। কিন্তু যেহেতু আমরা একটা শহরের ওপরে ডকুমেন্টারি ছবি করছি না, চরিত্রগুলো কাহিনীর প্রয়োজনে যেখানে যেতে পারে তার বাইরে যাওয়া সম্ভব নয় তাই অনেক কিছুই হয়তো শেষ পর্যন্ত বাদ দিতে হবে।

কিছু সাদা ছেলেমেয়ে এবং কালো ছেলেকে দরকার সিরিয়ালে যারা পিঙ্কির সূত্র ধরে আসবে। জয়ন্তী কথা দিল, একটি সাদা মেয়েকে সে জোগাড় করে দেবে। মেয়েটি রবীন্দ্রসঙ্গীত জানে। আমরা খুশি হলাম।

ঘণ্টা পাঁচেক বাসে চেপে আমরা আবার ফিরে এলাম নিউ ইয়র্কের পোর্ট অথরিটিতে। ঠিক করেছিলাম অরিজিত-এর হারানো সুটকেসটার হদিশ পাওয়া গেল কি না খোঁজ করতে হবে। সেই একই পথে হেঁটে পৌঁছোলাম পুলিশ স্টেশনে। ডায়েরি করার কাগজপত্র দেখাতে জানা গেল সুটকেস পাওয়া গেছে হার্লেমের রাস্তায়। তালা ভাঙা এবং এমন ভাঙাচোরা অবস্থায় যে ভিখিরিও ছুঁয়ে দেখবে না। মালপত্তরের আশা না করাই ভালো। বেরিয়ে আসছি একটা সিড়িঙ্গে গোছের লোক পিছু নিল। একটু নির্জনে এসে সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের সুটকেস ছিল ওটা?'

মাথা নাড়লাম, 'হ্যাঁ। লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'কয়েকটা প্যাকেট ছিল। ঠিক কী জিনিস ছিল ওতে?'

'ইসবগুল। হালকা জোলাপ।'

'মাইগড! শোনো, তোমরা তাড়াতাড়ি এখান থেকে কেটে পড়ো।'

'কেন?'

'চার্লি জানতে পারে সুটকেসটা তোমাদের ছিল তাহলে তোমরা বিপদে পড়বে। খাবার মনে করে সে একটা পুরো প্যাকেট খেয়ে ফেলেছিল। সাতদিন ধরে টয়লেট আর খাট করেছে।' লোকটা হাসল।

'তুমি চার্লিকে চেন?'

প্রশ্নটা শোনামাত্র লোকটা উলটোদিকে হাঁটতে লাগল। টিউবে ওঠার আগে আমরা খুব ভয়ে-ভয়ে ছিলাম। পরে এই নিয়ে খুব হাসাহাসি করেছি কিন্তু অরিজিত আর ওই তল্লাট মাড়ায়নি।

এখন সমস্ত প্রাথমিক কাজ শেষ। চিত্রনাট্য সম্পূর্ণ করতে হবে। সেইসঙ্গে টাকার ব্যবস্থা। কীভাবে কী করব এখনও জানা নেই, কিন্তু আমরা স্থির করলাম পিছিয়ে যাব না। সিদ্ধার্থ বললেন, 'এই কাঠবিড়ালটিকে মনে রাখবেন স্যার, আমিও আপনাদের সঙ্গে আছি।'

॥ ১৩ ॥

সত্যি কথাটা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, পেশাদারি চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য যে আকাশ পাতাল তা কাজে নেমে টের পেয়েছিলাম। আমরা শিল্প এবং সাহিত্যের তিনজন মানুষ একত্র হয়েছিলাম অন্য মিডিয়ামে কিছু কাজ করব বলে। কলকাতার নানান অসুবিধে সত্ত্বেও আমাদের চেষ্টায় খামতি ছিল না। কিন্তু এবার খুব গোলমালে পড়লাম। কলকাতায় যখন আমরা সিরিয়ালের কাজ করি তখন পরিচালক থেকে চা দেওয়ার ছেলেটিকে ধরে অন্তত কুড়িজন মানুষের প্রয়োজন হয় যাঁরা ক্যামেরার পেছনে থাকবেন। কোনও জটিল দৃশ্য থাকলে সংখ্যাটি বাড়ে। বিশেষ করে রাত্রে শুটিং থাকলে।

যে চিত্রনাট্যটি শেষপর্যন্ত আমরা তৈরি করলাম তাতে রাতের দৃশ্য প্রচুর। কিন্তু কুড়িজন টেকনিক্যাল হ্যান্ডস নিয়ে বিদেশে পাড়ি দেওয়ার সামর্থ্য আমাদের নেই। এর ওপর অভিনেতা অভিনেত্রী আছেন। ঠিকই ছিল রমাপ্রসাদ বণিক সিরিয়ালটি পরিচালনা করবে কারণ ওর ওপরে আস্থা রাখার মতো কাজ ইতিমধ্যেই সে করে দেখিয়েছে। কিন্তু চিত্রনাট্যের চূড়ান্ত রূপ দিতে রমাপ্রসাদ হিমসিম খেয়েছিল। আমার সাজানো গল্পটি যা আমি কিছুটা মনোজের 'এই দ্বীপ এই নির্বাসন' থেকে নিয়েছি, কিছুটা দেখা জীবন থেকে, রমাপ্রসাদ তাতে কলকাতার চোখ দিয়ে অনেক অসঙ্গতি দেখতে পাচ্ছিল। অথবা সে এমন দৃশ্য ভাবছিল যা আমেরিকায় অবাস্তব। বারংবার মনে হয়েছিল একবার ঘুরে এলে ওর পক্ষে সুবিধে হত কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি আমাদের ছিল না। ঠিকই ছিল, মনোজের উপন্যাসের মাত্র দুটি চরিত্র নিয়ে আমরা কাজ করব। এর কারণও ছিল। এই দ্বীপের নায়ক নায়িকা শৈবাল এবং টিয়া। যাদের ঘিরে কয়েকটি উপকাহিনী। সেই উপকাহিনীর একটি হল প্রলয় ঘোষ এবং তার মেয়ে পিংকির সংঘাত। আমরা অনুমতিও নিয়েছি সেইরকম। তাছাড়া শৈবাল বা টিয়ার সমস্যা আমাদের সিরিয়ালের বিষয়ও নয়। প্রলয় ঘোষ জীবনের অনেকটাই মধ্যবিত্ত বাঙালি হিসেবে খড়্গপুরে কাটিয়েছেন। পরিণত বয়সে শিশুকন্যা এবং স্ত্রীকে নিয়ে আমেরিকায় গিয়ে নিজেকে আমেরিকান ভাবতে আরম্ভ করেন। এঁরাই আমাদের সিরিয়ালের কেন্দ্রীয় চরিত্র।

এই সময় সুদীপ্ত এল আমেরিকা থেকে। ওখানে নাটক নিয়ে পড়াশুনা করা এই ছেলেটি কিছুদিন আগেও আমাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। নাটক লেখার হাতও ছিল। আমি এবং রমাপ্রসাদ স্থির করলাম সুদীপ্তকেই চূড়ান্ত চিত্রনাট্য লেখার ভার দেব। সুদীপ্ত রাজি হল। সেইসঙ্গে ঠিক হল স্যুটি-এর সময় সে রমাপ্রসাদকে সাহায্য করবে সহকারী হিসেবে। ওই দেশে দু-বছর থাকার অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে বেশ মূল্যবান। বলাই বাহুল্য ওর যাতায়াতের প্লেনভাড়া আমাদের দিতে হচ্ছে না।

কুড়িজন টেকনিক্যাল হ্যান্ডস কমিয়ে কতটায় নামানো যায় তাই ছিল চিন্তার বিষয়। প্রথমে ঠিক ছিল ক্যামেরা চালাবে বিবেক ব্যানার্জি। কিন্তু কোনও কারণে সে যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। অন্য যে কোনও বিভাগে একজনের অনুপস্থিতিতে শুটিং বন্ধ থাকে না কিন্তু ক্যামেরাম্যানের ক্ষেত্রে তা বলা যায় না। আমরা সেই কারণেই যীশু দাশগুপ্তকে নির্বাচন করলাম। ঠিক হল রমাপ্রসাদকে বন্ধুর মতো পরিচালনায় সাহায্য করা ছাড়াও যীশু দুটো এপিসোডের ক্যামেরাম্যান হবে।

পরিচালক এবং ক্যামেরাম্যানদ্বয় ঠিক হওয়ার পর আমরা তাদের সঙ্গে বসলাম। সমস্যা

খুলে বললাম। বিবেক প্রশ্ন করল, 'আমরা ক্যামেরা এবং অন্যান্য সরঞ্জাম কি এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছি না আমেরিকা থেকে ভাড়া করছি?'

এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম। বৈদেশিক মুদ্রায় বেশি খরচ করার সামর্থ্য আমাদের নেই। ক্যামেরা ভি সি আর এখান থেকে নিয়ে যাব। কিন্তু আলোর সরঞ্জাম, ট্রলি এত ভারী এবং পলকা যে এদেশ থেকে নিয়ে যাওয়া বোকামি হবে। যীশুর সঙ্গে কথা বলে বিবেক জানাল একজন দক্ষ আলোর লোক পেলেই সে ম্যানেজ করে দেবে। এবং ক্যামেরায় তাদের কোনও সহকারীর দরকার নেই। এখানে শুটিং করতে কয়জন মানুষের প্রয়োজন হয়। এই ছয়জনের কাজ একজন করে দেবে। শুটিং-এর ব্যবস্থাপনা, ইউনিটের থাকা খাওয়ার দিকে নজর দেওয়ার জন্যে শংকর ঘোষ এবং কিশোর সাউ যথেষ্ট। তবে সেইসঙ্গে ভানুকেও নেওয়া হল প্রয়োজনে আলোর দায়িত্বে যে এল সেই লালুকে সাহায্য করবে। অর্থাৎ পরিচালক ক্যামেরাম্যান দুইজন, আলো ও প্রোডাকশনের চারজন ছাড়া সুদীপ্ত, আমাদের ইউনিট এই আটজনে এসে দাঁড়াল। খবরটা চাউর হতে অনেকেই হেসেছিলেন। এমন অবাস্তব ব্যাপার কলকাতার শুটিং-এ কেউ কখনও দ্যাখেনি।

সুদীপ্ত চিত্রনাট্য শেষ করতেই প্রয়োজন হল তার যথার্থ অনুবাদের। আমরা দিল্লির নেটওয়ার্ক-এর জন্যে হিন্দিতে সিরিয়ালটি করছি। মদনসুদনজি এলেন। কলকাতার হিন্দি নাটকগুলোতে অনেকদিন আছেন। ভালো অনুবাদ করেন। দারুণ মজার মানুষ। মুখে জোকস-এর ফুলঝুরি। ঠিক হল ইনিও যাবেন। কারণ শিল্পীদের হিন্দি উচ্চারণে তদারকি করা ছাড়া প্রয়োজনে নতুন দৃশ্য লেখা অথবা সামান্য পরিবর্তনে ওঁর সাহায্য লাগবেই।

এবার শিল্পী নির্বাচন। নিউইয়র্ক ছাড়ার আগে আমরা সিদ্ধার্থকে অনুরোধ করেছিলাম জনা কুড়ি মানুষের থাকার জন্যে ক্লোস্টারে একটা বাড়ি ভাড়া করতে। তখন কাগজে প্রায়ই এক সপ্তাহ পঞ্চাশ ডলারে একটি ঘর ভাড়া দেওয়ার বিজ্ঞাপন থাকত। কাজে নেমে সিদ্ধার্থ জানালেন, কুড়িজন শুনে কোনও ল্যান্ডলর্ড রাজি হচ্ছেন না। শেষতক তিনি ঠিক করেছেন একটি হোটেলের চারটি ঘর সাপ্তাহিক ভাড়ায় নেবেন। এবং বাকিরা তাঁর বাড়িতেই থাকবে। তিন সপ্তাহের শুটিং-এ পয়সা বাঁচানোর জন্যে এই ব্যবস্থা মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় ছিল না আমাদের। ওয়াশিংটন থেকে জয়ন্তী জানাল টেলিফোনে, তার নিজস্ব বাড়িতে যত জন ইচ্ছে থাকতে পারে আর বাকিরা অতিথি হবে তার বাবা রমেন পাইনের বাড়িতে। অর্থাৎ আমাদের থাকতে হবে মিলেমিশে, কিছুটা কষ্ট স্বীকার করে। শিল্পীরা যদি এই ব্যবস্থায় অখুশি হন।

প্রলয় ঘোষের চরিত্রে রমাপ্রসাদের গোড়া থেকেই পছন্দ ছিল দীপংকর দে-কে। দীপংকর ভালো হিন্দি বলেন এবং আমাদের বন্ধুমানুষ। ঠিক হয়েছিল কলকাতা থেকে আমরা মাত্র তিনজন শিল্পী নেব। বাকিদের, একমাত্র জয়ন্তী ছাড়া, নির্বাচন করবে সুদীপ্ত নিউইয়র্ক থেকে। জয়ন্তীর বান্ধবীকেও পাওয়া যাচ্ছে। সুদীপ্ত টেলিফোনে তার যে বান্ধবীর সঙ্গে নিউইয়র্কে কথা বলল তাঁর কাজ কাস্টিং করা। ছবি এবং নাটকের জন্যে। সে অভয় দিল কালো এবং সাদা চরিত্রের অভিনেতা অভিনেত্রীদের পেতে অসুবিধা হবে না। বড় ছবি বা সিরিয়ালে অভিনয় করতে হলে উঠতি ছেলেমেয়েদের একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট পেতে হয়। ছোট-ছোট কাজ করে তারা সেই পয়েন্টে পৌঁছোয়। পয়েন্ট পাওয়ার জন্যে আমাদের সিরিয়ালেও তারা কাজ করবে কম পয়সায়। অন্যান্য ভারতীয় চরিত্রের শিল্পীদের আমরা ওখান থেকেই ব্যবস্থা করে নেব। দীপংকরের সঙ্গে আমরা শকুন্তলা এবং মনোজ মিত্রকে নিলাম।

সবাইকে ডেকে আমাদের পরিকল্পনা এবং অসুবিধের কথা বলা হল। দেখা গেল প্রত্যেকেই বলছেন তাঁরা পূর্ণ সহযোগিতা করবেন এবং একটি পরিবারের মতো থাকবেন। অপেশাদার হলেও আমাদের প্রচণ্ড শক্তি যুগিয়েছিল ইউনিটের প্রতিটি মানুষের এই ভালোবাসা। প্রত্যেকেই জানতেন এই সিরিয়ালের মাধ্যমে আমরা একটা পবিত্র কাজ করতে যাচ্ছি। দেশত্যাগী ভারতীয়দের জীবনযাপন

সম্পর্কে এদেশের মানুষকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে অনেক ভ্রান্তি দূর করতে পারব। সেই সঙ্গে শ্রদ্ধা জানানো হবে এক অত্যন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ মৃত শিল্পীলেখককে যাঁর স্বপ্ন ছিল এই বিষয় নিয়ে ছবি করার।

এই অবধি যখন এগিয়ে গিয়েছি তখনও টাকার সুরাহা হয়নি। যাওয়া-আসার প্লেনভাড়া, সবার দক্ষিণা ইত্যাদি না হয় ভারতীয় টাকায় দেওয়া যাবে। সেই ব্যবস্থা না হয় ধার করেও মেটানো সম্ভব। কিন্তু ডলার পাব কোথায়? দীপংকর হঠাৎ প্রস্তাব দিল, 'আমাদের থাকাখাওয়া ইত্যাদির খরচ তো আমাদের এফ টি এস থেকেই করতে পারি।' একটা পথ দেখা গেল। এই সময় নিউজার্সি থেকে সিদ্ধার্থ জানাল, এরকম একটা বিষয় নিয়ে সিরিয়াল হচ্ছে তা ওখানে জানাজানি হয়ে যাওয়ার পরে অনেকেই সাহায্যের হাতে বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত। এন আই আর থেকে নাগরিক হয়ে যাওয়া বাঙালিরা আমাদের এগিয়ে যেতে অনুরোধ করছেন। এই ব্যাপারটাই আমাদের আরও সাহসী করে তুলল। এখন আমরা আবেগের ঢেউ-এ ভাসছি।

যেতে হলে পাশপোর্ট করা দরকার। সুদীপ্ত ছাড়া আমার আর অরিজিতের ভিসার প্রয়োজন নেই। গতবারে নেওয়া ভিসায় সময় এখনও শেষ হয়নি। রমাপ্রসাদ, শংকর, শকুন্তলা এবং বিবেকের পাশপোর্ট আছে। বাকিদের করানো দরকার। কিশোর বা ভানু আমাদের সঙ্গে গোড়া থেকেই সংশ্লিষ্ট। কিন্তু এদের সম্পর্কে বিশদ জানা ছিল না আমাদের। দেখা গেল অনেকেরই সেইসব প্রাথমিক তথ্য নেই যা পাশপোর্টের জন্যে দাখিল করতে হয়। এই পাশপোর্টের নিয়ে আমাদের কম ঝামেলায় পড়তে হয়নি। যাত্রা শুরুর তিনদিন আগে মনোজ মিত্রের পাশপোর্টসংক্রান্ত ফাইল উধাও হয়ে গেল পাশপোর্ট অফিস থেকে। মনোজ মিত্র মাথা নেড়ে বললেন, আমায় বাদ দিন। আমার ভাগ্যে বাইরে যাওয়া নেই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবই পাওয়া গেল। আজকাল মার্কিন দূতাবাস তাদের দেশে যাওয়ার ব্যাপারে বিদেশিদের বেশ খুঁটিয়ে দ্যাখেন অবিবাহিতা বা অবিবাহিত ট্যুরিস্টদের সহজে যেতে দেন না। ব্যক্তিগত ইন্টারভিউতে তাঁদের সন্তুষ্ট করতে হয়। দেশের জনসংখ্যা কমানোর জন্যে ওঁরা এখন বেশ সচেষ্ট। আমাদের ব্যাপারে অবশ্য তেমন কোনও অসুবিধে হল না। আমরা অঙ্গীকার করলাম, যাদের নিয়ে ওদেশে যাচ্ছি তাদের ঠিকঠাক ফিরিয়ে আনব। ভিসা পাওয়া গেল।

মনে রাখতে হবে, আমাদের দলের বেশ কিছু সদস্য এর আগে প্লেনে চড়েননি, পশ্চিমবাংলার বাইরে যাননি এবং অনেকেই ইংরেজি বলতে পারেন না। তাঁরা শুধু নিজেদের কাজটা ঠিকঠাক জানেন। দেখলাম, আমেরিকায় যাচ্ছেন বলে তাঁদের কোনও বাড়তি উত্তেজনা নেই। যেন সিমলা অথবা শ্রীনগর শুটিং করতে যাচ্ছেন।

দিন সাতেক আগে অরিজিত চলে গেল ওয়াশিংটন। মার্কিন কর্তাদের সঙ্গে আর একবার কথাবার্তা বলা ছাড়া সুদীপ্ত এবং জয়ন্তীর নির্বাচিত শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলবে, প্রয়োজনে পরিবর্তন করবে। দল নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমার ওপর। আমরা ক্যামেরা নিলাম বন্ধুবর সুশীল দাসের কাছ থেকে। ভদ্রলোক এমন একটা উদ্যোগ হচ্ছে জেনে নানাভাবে সাহায্য করলেন। সাধারণত দেশের ভেতরে শুটিং-এর সময় যন্ত্রপাতি দেখভালের জন্যে এবার উদার হলেন। আমরা ভেবেছিলাম সরঞ্জাম ওখান থেকে নেব কিন্তু টুকিটাকি এমন অনেক জিনিসের প্রয়োজন হবে যা শেষপর্যন্ত এখান থেকেই নিতে হল।

এইসব ব্যাপার আমরা প্রচার করতে চাইনি। টিকিট, ভিসা ইত্যাদির পর্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও স্থির ছিল অরিজিত ওদেশ থেকে আমায় সবুজ সংকেত জানালে আমরা রওনা হব। যেসব সাহায্য পাব বলে প্রতিশ্রুত হয়েছি সেগুলো সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার ছিল। এই কারণেই প্রচার করতে চাইনি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এর আগে পশ্চিমবাংলা থেকে কোনও চলচ্চিত্র বা সিরিয়াল বিদেশে গিয়েও শুটিং করার ঝুঁকি কেউ নেননি। নতুন কিছু করলেই তো এদেশে প্রচুর প্রচার পাওয়া যায়। কাজট ঠিকঠাক শেষ না করে আসা পর্যন্ত আমরা কোনওরকম প্রচার চাইনি।

দিন দুই আগে ফোন এল, সব ভালো, যাত্রা শুরু করা যেতে পারে।

আমরা সন্ধের ফ্লাইটে বোম্বে যাব, সেখান থেকে শেষ রাত্রে পানামা নিয়ে যাবে আমেরিকায় ফ্র্যাঙ্কফুর্ট হয়ে। প্রতিটি সদস্যকে বলা হল বিকেল পাঁচটায় দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছে যেতে। আমরা প্রচার চাই বা না চাই, খবর চাপা থাকেনি। তার প্রমাণ পাচ্ছিলাম একটার-পর-একটা ভৌতিক টেলিফোনে। টেনশন বাড়াবার পক্ষে সেগুলো যথেষ্ট। বাঙালির স্বভাবে অন্যকে বিরক্ত করার যে প্রবণতা আছে এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না।

এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলা দরকার। আমাদের দল দুভাগে থাকবে নিউজার্সিতে। শুটিং স্পট বিভিন্ন জায়গায়। ভারতীয়দের সঙ্গে ওদেশের শিল্পীরা যুক্ত হলে সংখ্যাটি মন্দ হবে না। এতগুলো মানুষকে নিয়ে যাওয়া-আসার কী ব্যবস্থা হবে আগে চিন্তা করিনি। ওখানকার বাঙালিরা বলেছিলেন গাড়ির অভাব হবে না। প্রতিটি পরিবারেরই দু-তিনটি গাড়ি আছে। কিন্তু এইটে যে অবাস্তব তা পরে বুঝেছি। কুড়িজন মানুষ নিয়ে চারটে গাড়ি শুটিং স্পটে যেতে পারে কিন্তু তার চালক চাই। ওদেশের মানুষের হাতে সময় নেই বাইশ দিন ধরে আমাদের ড্রাইভার হওয়ার। আমাদের কারও-কারও আন্তর্জার্তিক ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে কিন্তু ওদেশের রাস্তার অনভিজ্ঞতা গাড়ি চালানোর পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবেই। এর ওপর চারটে গাড়ির আলাদা পেট্রল খরচ তো আছেই।

অনেকেই বলেছিল একটা মাঝারি ভ্যান ভাড়া করে ড্রাইভার রাখতে। মাঝারি ধরনের ভ্যানের সাপ্তাহিক ভাড়া বেশি নয়। কিন্তু ড্রাইভার? অসম্ভব। তাঁরা প্রতিঘণ্টায় যত ডলার নেবেন তা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। ঠিক সেই কারণে ওদেশীয় ফিল্মের টেকনিক্যাল মানুষদের আমরা নিয়োগ করতে পারছি না। কানাডার ফুয়াদ চৌধুরী, যে মনোজের সময় থেকেই এই প্রজেক্টে আগ্রহী ছিল, এবারও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। কিন্তু তাকে তার ছুটির বদলে ডলারে যেটা পারিশ্রমিক হিসেবে দিতে হত তা আমাদের সাধ্যতীত। এইসময় কামাল এল কলকাতায়।

নীরদ সি চোধুরীকে আন্তর্জাতিক নাগরিক বলা হয়। তিনি যতখানি বাঙালি ততখানি ইংরেজ, আবার যতখানি ইংরেজ ঠিক ততখানিই বাঙালি। ওঁর ব্যাপারটা আমরা এখন বুঝতে পারি। কামালকে নয়। সে জগন্নাথ কলেজ থেকে ধানমুণ্ডি যেভাবে কাউকে জিজ্ঞাসা না করে যেতে পারে ঠিক সেইভাবে গড়িয়াহাট থেকে শ্যামাবাজরে যায়। কনটপ্লেস থেকে চিত্তরঞ্জন পার্ক যত সচ্ছন্দভাবে যায় তার থেকে বিন্দুমাত্র কমে ম্যানহাটন থেকে কুইন্সে পৌঁছোয় না। পৃথিবীর প্রায় সব বড় শহরে ওর বন্ধু আছে এবং তাদের কাছে নির্দ্বিধায় খবর না দিয়ে উঠতে পারে। পিতৃসূত্রে সে মুসলমান কিন্তু আল্লা, যীশু অথবা ভারতীয় দেবদেবতা নিয়ে নির্বিকার রসিকতা করে যায়। কামাল অত্যন্ত ভাবপ্রবণ। উপেক্ষা সহ্য করতে পারে না। কল্পনাবিলাসী। গত সাতবছর ধরে ওকে আমি অজস্র পরিকল্পনা করতে শুনেছি ব্যবসাবিষয়ক এবং কোনটাই অর্ধেক পথের বেশি এগোয়নি।

প্রথমবার যখন আমেরিকায় যাই তখন ওর সঙ্গে পরিচয়। সেটাও নাটকীয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ওঁর টেলিফোন নম্বর দিয়ে বলেছিলেন, আলাপ করতে পারো। এক সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক থেকে ফোন করেছিলাম। পরিচিত হওয়ার পরে বলল, আমি আসছি। সেটা মনোজকে বলতেই সে মাথা নাড়ল অবিশ্বাসে, অসম্ভব। ভুল শুনেছেন। ওটা বোস্টনের ফোন নম্বর। বোস্টন এখান থেকে পাঁচ ঘণ্টার পথ। ভাবলাম হয়তো তাই, ভুলই শুনেছি। ভোরবেলায় বেল বাজাল কামাল। দরজা খুলতেই লম্বা চওড়া লোকটি শিশুর মতো হেসে বলল, 'আমি কামাল। তুমি সমরেশ? রান্নাঘরটা কই? কফি খাওয়া দরকার।' তখনও গৃহকর্ত্রী ওঠেননি। অনেক মহিলাই তাঁর রান্নাঘর সম্পর্কে স্পর্শকাতর হন। কামাল যেভাবে সহজ হয়ে কফি বানাতে লাগল তাতে আমি আতঙ্কিত হয়েছিলাম। জেনেছিলাম তার বাড়ি ঢাকায়। থাকে বোস্টনে। তার নাকি কোনওদিনই বাবা-মা নেই। ওঁদের সে বন্ধু ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না। ঢাকার বাড়িতে মতভেদ হওয়ায় সে বেরিয়ে এসেছে অনেককাল। ঢাকায় গেলে সে নিজের বাড়িতে ওঠে না। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলল, 'নিজের

শব্দটির অর্থ যতদিন আমি না বুঝতে পারছি ততদিন ওবাড়িতে উঠব না।' কামাল বিবাহিত কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। এ ব্যাপারে তার ব্যাখ্যা, আমি ওকে চেয়েছিলাম কিন্তু ও আমাকে চায়নি। ছোট্ট কথা, তাতেই অনেক।

এই কামাল আমাকে কিছুটা মুগ্ধ করেছিল। কারণ, সে চলে যাওয়ার পর আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফোন আসতে লাগল, কামাল তাদের জানিয়েছে আমি সেখানে যেতে পারি এবং আমি যেন বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে তাদের আতিথ্য নিই। এই নিমন্ত্রণকারীদের মধ্যে একজন ভালো গায়িকাও ছিলেন।

বছর খানেক পরে কামাল একদিন সোজা আমার কলকাতার শোওয়ার ঘরে চলে এল। ওকে দেখে মনেই হচ্ছিল না যে মাত্র একটি সকাল আমরা কাটিয়েছি একসঙ্গে। ঈশ্বর আল্লা এবং যীশু তার বন্ধু। কিন্তু প্রায়ই এঁদের সঙ্গে ঝগড়া হয়। কারণ এই তিনজন কোথায় থাকেন তাই কোনও কেতাবে হদিশ পাচ্ছে না সে। বলল, আমার এক দেবী আছে কিন্তু স্বর্গ নেই, স্বর্গের সন্ধান করছি। ওঁর কথাবার্তা এমনি বেশ হেঁয়ালি শোনায়, কিন্তু যখন বলে তখন মনে হয় বিশ্বাস থেকেই বলছে।

ঢাকার বিষয়সম্পত্তি নিয়ে ওর সই ভাইদের অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রায় কোটি টাকার সম্পত্তি। কিন্তু সে তার অংশ নিতে রাজি নয় এবং সইও দেবে না। এরপর সে আবার ফিরে এল মাস ছয়েক বাদে। মত পরিবর্তন করেছে। ঢাকায় যাবে। ভাইদের শেষবার সুযোগ দেবে। কিন্তু আমাকে সঙ্গে যেতে হবে।

রাজি হয়েই সঙ্গী হলাম। দেখলাম ঢাকায় ওর বেশ খাতির। বিশেষ করে মেয়ে মহলে। অথচ কারও সঙ্গে কামালের তথাকথিত প্রেম নেই। ভাইরা আমাকে মধ্যস্থতা করতে বললেন। অনেক রাত ধরে আলোচনা চলল। বিষয়সম্পত্তি ভাগাভাগি হবে। কামালের উলটোপালটা কথায় আলোচনা ভেঙে গেল। আমিও ওর ওপর বিরক্ত হচ্ছিলাম। যে কদিন ছিলাম কামাল তার গর্ভধারিণীর সঙ্গে কথা বলেনি। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলেই বলল, 'উনি আমার বন্ধু। বন্ধুর মতো কথা বললে নিশ্চয়ই বলব।' সেইসময় অনেকেই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। এক ভদ্রমহিলা এলেন খবর পেয়ে কাগজের জন্যে ইন্টারভিউ করতে। বেশ ছিমছাম রুচিশীলা মহিলা।

এরপরে বছর তিনেক কামালের দর্শন পাইনি। শুনেছি ও কানাডায় আছে কারও সঙ্গে সম্পর্ক রাখছে না। নিজেকে হারিয়ে ফেলতে তৎপর। হঠাৎ একটা চিঠি পেলাম। তিনমাস ভ্যাঙ্কুভারের হাসপাতালে শুয়ে আছে। এর পরে সব চুপচাপ। বছরখানেক আগে হঠাৎ সে কলকাতায় হাজির। সঙ্গে সেই সাংবাদিক মহিলা। হেসে বলল, 'স্বর্গ খুঁজছিলাম, পেয়ে গেছি। নীনাই আমার স্বর্গ। আমরা বিয়ে করেছি।'

বিস্মিত হয়েছিলাম। আমি জানতাম নীনা বিবাহিতা। জানলাম, তাঁর স্বামীর সঙ্গে বিরোধ হওয়ায় তাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল। এ ব্যাপারে কামালের কোনও ভূমিকা নেই। সে কিছুদিন আগে কানাডা থেকে ঢাকায় পৌঁছে হঠাৎ নীনার দর্শন পায়। নীনা তখন পুত্রকন্যা নিয়ে পিত্রালয়ে একটু বিব্রত। নীনার সঙ্গে ওর আলাপ একদিনই, যেদিন নীনা আমার সাক্ষাৎকার নিতে আসে। কামাল জিজ্ঞাসা করে নীনার কোনও বয়ফ্রেন্ড আছে কিনা। একজনের সঙ্গে একসময় মৃদু সখ্যতা হয়েছিল। কিন্তু সে বিবাহিত, ঘোর সংসারী এখন। দ্বিতীয় দিনে কামাল তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। বিয়ের পর নীনাকে ছেলেমেয়ে নিয়ে কানাডায় চলে যেতে হবে কামালের সঙ্গে। ভদ্রমহিলা দুঃসাহসী, রাজি হয়ে গেলেন। ওরা বিয়ে করে সন্তানদের নিয়ে চলে গেল ভ্যাঙ্কুভারে। সেখানে গিয়ে নীনা ক্রমশ ধাতস্থ হল। কাজকর্ম পেল। বড় মেয়ে কাজ করছে। এবারে কলকাতায় আসার দুটো কারণ, ছোট ছেলেকে দার্জিলিং-এ পড়াতে চায়, বড় মেয়েটা একটি ছেলের প্রেমে পড়েছে, ঢাকায় গিয়ে সেটা পাকা করে আসবে।

এমন নাটক আমাকে বিহ্বল না করে পারেনি। দেখলাম কথাবার্তার মধ্যেই দুজনে বেশ তর্ক

করছে। আমার এক পরিচিত পরিবারের মেয়ে বিয়ের পর টরেন্টোতে গিয়েছিল। শোনা যাচ্ছে, মেয়েটি স্বামীর দ্বারা অত্যাচারিতা। ফোন, এমনকি বাড়িতে চিঠি দিতেও দেন না স্ত্রীকে। মেয়েটি কোনওক্রমে লুকিয়ে একদিন চিঠি দিয়েছে, তাকে উদ্ধার না করলে সে মরে যাবে। ঘটনাটি শুনে কামাল বলল, কোনও চিন্তা নেই। আমরা ওকে টরেন্টো থেকে ভ্যাঙ্কুভারে নিয়ে আসছি। এই দুটো জায়গায় যাওয়া-আসার বিমানভাড়া ভারতীয় টাকায় কুড়ি হাজার। ওরা চলে যাওয়ার পর খবর এল, নীনা টরেন্টোতে গিয়ে মেয়েটিকে কোনওমতে উদ্ধার করে ভ্যাঙ্কুভারে নিয়ে গেছে। কেউ যদি বলে বোম্বেতে একটি অপরিচিত মেয়ে বিপদগ্রস্ত তাহলে কলকাতা থেকে কোনও বাঙালি তাকে উদ্ধার করতে যাবে? ভ্যাঙ্কুভার এবং টরোন্টোয় দূরত্ব বম্বে-কলকাতার অনেক বেশি। আমরা অবাক হয়েছিলাম।

দিন পনেরো আগে কামাল এল কানাডা থেকে। ইতিমধ্যে সে এদেশ থেকে চামড়ার জিনিসপত্র বানিয়ে ওদেশে রপ্তানির অনেক চেষ্টা করেছে। কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের মিল না থাকায় তার কোনওটাই চূড়ান্ত রূপ পায়নি। এবারও আসা সেই উদ্দেশ্যে। আমাদের পরিকল্পনার কথা শুনে সে জানাল সাহায্য করবে। তার ক্রেডিট কার্ড দেখিয়ে আমাদের অনেক ডলারের খরচ বাঁচাতে পারে। তা ছাড়া চারটে গাড়ি নিয়ে কোনও লাভ হবে না। একটা ভ্যানভাড়া করে সে বাইশ দিন ধরে আমাদের সঙ্গে থেকে ড্রাইভারের কাজটি করে দেবে। এই জন্যে তার যে আর্থিক ক্ষতি হবে তার অর্ধেক পেলেই সে খুশি। হিসেব করে দেখা গেল ভারতীয় মুদ্রায় সেটা দিতে আমাদের অসুবিধে হবে না। ওই এক বিকেলেই কামাল তার স্বভাব অনুযায়ী আমাদের টিমম্যান হয়ে গেল। কোন হোটেলে দল থাকবে সেটা নিয়েও সে মাথা ঘামাতে লাগল। ভ্যাঙ্কুভারে সে ফিরে যাওয়ার আগে জানিয়েছিল আপাতত নীনার সঙ্গে সে এক বাড়িতে থাকছে না। কারণ নীনার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের আলাদা করা দরকার। মেয়েটির সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছে সেই ছেলেটিও এখন একই পরিবারে থাকছে। এদের প্রশয় দিয়ে নীনা ক্ষতি করছে। ওদের ভালোর জন্যই নীনার একা হওয়া দরকার। এবং সেটা যতদিন নীনা না করছে ততদিন ভ্যাঙ্কুভারে যাবে কিন্তু আলাদা থাকবে। সে কথা দিল আমরা পৌঁছবার আগেই সিদ্ধার্থর বাড়িতে পৌঁছে যাবে।

নীনার সঙ্গে যে কোনও বিষয়েই এত তাড়াতাড়ি বিরোধ হোক আমি চাইনি। ব্যাপারটা ভালো লাগেনি তাই। আমি ওকে বোঝাতে চেয়েছিলাম, মেয়েটা তোমার মুখ চেয়ে বিদেশে গিয়েছে আর তুমি কেন এমন জেদি হচ্ছ? কামালের বক্তব্য, নীনা তার স্বর্গ কিন্তু সে যেটাকে ঠিক মনে করছে না তার সঙ্গে কখনই আপোস করবে না।

কামাল চলে যাওয়ার পর আমি একটু শঙ্কিত ছিলাম। কামাল নিশ্চয়ই বাইশ দিন আমাদের সঙ্গে থাকবে। কিন্তু শুটিং পার্টির কাজকর্ম বাইরে গিয়ে খুব একটা নিয়ম মেনে চলে না। কামালের সঙ্গে বিরোধ ঘটলে কী হবে? তখন আর কিছু ভাবার ছিল না। যাত্রার আগের রাত্রে কামালের ফোন পেলাম সিদ্ধার্থর বাড়ি থেকে। সব ঠিক হয়ে গেছে। সিদ্ধার্থ যে হোটেল ঠিক করেছিল সেটি বাতিল করেছে সে। হ্যাকেনস্যাক নামে নিউজার্সির একটি শহরে সে অনেক সস্তায় মোটেল পেয়েছে বলল, 'তোমার দলকে বলে দিও, এখানে আসছে কাজ করার জন্যে, আরাম করতে নয়।' আমার আশঙ্কা আরও বাড়ছিল। ও যেভাবে স্বভাব অনুযায়ী ব্যাপারটায় ঢুকে পড়েছে তা অনেকের পছন্দ হবে না।

নীনার সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি বিরোধ প্রমাণ করে সে অস্থির। কামালের অভ্যেস আছে মনস্তাত্ত্বিকের কাছে যাওয়ার। তাঁদের দিয়ে নিজের মন বোঝার। নীনার সঙ্গে টেলিফোনে ও যেসব কথা বলেছে রেকর্ড আমাকে শুনিয়েছিল সে যে অন্যায় কিছু করছে না তা প্রমাণ করতে। এই প্রথম আমি কোনও মানুষকে গোয়েন্দা কাহিনির বাইরে টেলিফোনের কথা রেকর্ড করে রাখতে দেখলাম। এটা নাকি নীনাও জানে। টেলিফোন কামালকে বেশিমাত্রায় টানে। যে বাড়িতেই যাক কারণে অকারণে সে টেলিফোন করবেই। সেটা লোকাল কিংবা লংডিস্ট্যান্স হোক, কামালের মাথা

কোনও দুশ্চিন্তা নেই। এই যে মানুষটা, যার হৃদয় আমাদের অনেকের চেয়ে ঢের বড় তার স্বভাব এবং আচরণের অসংলগ্নতা স্বাভাবিক মানুষকে বিব্রত করবেই। কিন্তু বিকল্প আর একটি চরিত্র আজ পর্যন্ত দেখতে পেলাম না। আমি জানি না বাইশ দিনে নিউইয়র্কে কি ঘটতে যাচ্ছে। কামাল সঙ্গে থাকায় যতটা ভরসা ঠিক ততটাই ভয়। আমি আশাবাদী হলাম। সেই অবস্থায় তা ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা খোলাও ছিল না।

কামালের সম্পর্কে এতটা লেখার প্রয়োজন ছিল। পরবর্তী সময়ে কামালের কাহিনি আমাদের অনেকখানি বিচলিত করেছিল। পাঠকের ওর সম্পর্কে ধারণা না থাকলে ওই আচরণের ব্যাখ্যা খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে।

যাওয়ার আগের রাত্রে আমার ভালো ঘুম হয়নি। কেবলই মনে হচ্ছিল একটা বিশাল ঝুঁকি নিচ্ছি যার পরিণাম ভালো হবে না। আমার অতীত থেকে আমার বর্তমান নিশ্চয়ই অনেক আলাদা কিন্তু এই ঝুঁকি নেওয়ার মতো পায়ের তলায় মাটি এখনও তৈরি হয়নি। এখনও সময় আছে এসব বন্ধ করার। আমার মধ্যবিত্ত মন বারংবার আমাকে সতর্ক করছিল। সকাল হল, আমি শেষপর্যন্ত বিছানা ছাড়লাম অরিজিত-এর ফোনে। নিউইয়র্ক থেকে সে বলল, 'আজ একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে বলে ফোন করলাম। সবাই যেন সুস্থ অবস্থায় পৌঁছয়।' দিনের আলোয় আর কোনও দ্বিধা মনে আসেনি। ঠিক পাঁচটায় এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলাম। কিশোর গুহ, আমাদের যাত্রার তত্ত্বাবাহক, সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

আমাদের ইউনিটের সবাইকেই দেখতে পাচ্ছি। সবাই খুব উত্তেজিত। মালপত্র বেশি না নিতে অনুরোধ করেছিলাম। আমেরিকায় সেপ্টেম্বর মাসে বেশি ঠান্ডা পড়ে না। এঁরা আমার অনুরোধ রেখেছেন। শংকর, আমার প্রোডাকশন ম্যানেজার, জানাল, প্লেন ঠিক সময়ে ছাড়ছে না। কখন ছাড়বে তাও বলতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। দেখা গেল একমাত্র শকুন্তলা ছাড়া সবাই পৌঁছে গেছে।

সময় যাচ্ছিল, শকুন্তলার দেখা নেই। প্লেনের সময়টাও ঘোষণা করা হচ্ছে না। রমাপ্রসাদ শকুন্তলার বাড়িতে টেলিফোনের পর টেলিফোন করে যাচ্ছে কিন্তু সেখানে কেউ রিসিভার তুলছে না। হঠাৎ ঘোষণা করা হল সাড়ে আটটায় বোম্বের প্লেন ছাড়বে। নির্দিষ্ট সময়ের দুঘণ্টা পরে। অথচ আমরা শকুন্তলার হদিশ পাচ্ছি না। রমাপ্রসাদ প্রচণ্ড নার্ভাস। ভদ্রমহিলা একটি বড় চরিত্রে কাজ করবেন। পাঁচটায় যাঁর আসার কথা তিনি আটটা পনেরো বাজলেও দেখা দেবেন না, এ কেমন কথা। তাঁর তো সরাসরি এয়ারপোর্টে চলে আসার কথা। সিকিউরিটি পেরিয়ে রমাপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করল, 'কী হবে সমরেশদা?'

আমি তখন মনে-মনে আমেরিকায় দেখে আসা বাঙালি বয়স্কা মহিলাদের মুখ মনে করার চেষ্টা করছি যাঁকে ওই চরিত্রে মানায়। আবার মানালেই চলবে না তাকে অভিনয় করতে হবে। এর পরের সমস্যা, এঁরা সবাই চাকরি করেন। ছুটি জমিয়ে রাখেন বিশেষ প্রয়োজনের জন্যে। শুট বললেই বাইশ দিন ছুটি কেউ পাবেন না। তাহলে? ভদ্রমহিলা যাচ্ছেন না বলে এদের বলতে পারি না আমরা যাব না। খোঁজ নিয়ে জানলাম পরের প্লেন বোম্বে যাবে দশটায়। কী একটা কারণে আজ বিভ্রাট ঘটেছে। হিসেব করলাম, বোম্বের পানামা ফ্লাইট ধরার জন্যে সাড়ে বারোটায় রিপোর্ট করার কথা। পরের প্লেনে বোম্বে পৌঁছে এয়ারপোর্ট পরিবর্তন করে সেটা সম্ভব নয়। আমরা যখন প্লেনের ভেতরে, ছাড়ার তোড়জোড় হচ্ছে তখন এয়ারলাইন্সের একজন কর্মী আমার কাছে এসে জানালেন, শকুন্তলা এইমাত্র এসে পৌঁছেছেন। যেহেতু এই প্লেনে আর কোনও আসন খালি নেই তাই ওঁকে পরের প্লেনে পাঠানোর চেষ্টা হচ্ছে। উনি খুব কাঁদছেন।

এটাকে আনন্দ সংবাদ বলে ভাবব কি না বোঝার আগেই প্লেন টেক অফ করল। বোম্বেতে পৌঁছে শুনলাম দমদম থেকে দশটার ফ্লাইট ছাড়তে আরও দেরি হবে। সম্ভবত বারোটার আগে নয়। বোম্বে পৌঁছাবে প্রায় আড়াইটে। ওখান থেকে এয়ারপোর্ট বদল করে আসতে আরও তিনটে পনেরো। পানামা ছাড়বে ঠিক পৌনে তিনটের সময়। বোর্ডিং কার্ড নেওয়া, সিকিউরিটি এবং কাস্টমস

চেকিং-এ তো ভালো সময় লাগে। অর্থাৎ শকুন্তলার কোনও সম্ভবনা নেই দলের সঙ্গে যাওয়ার। নিউইয়র্কে পৌঁছে ফোন করতে হবে সে আসছে কি না জানতে। পরে এলে রমাপ্রসাদকে সেইভাবে শুটিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে। না এলে? আমরা ভেবে পাচ্ছিলাম না।

পানামা কাউন্টারে আমি বলেছিলাম শকুন্তলার কথা। সে যে প্লেন মিস করেছে এবং পরের প্লেনে একা আসছে এসব খবর পানামের অফিসাররা গম্ভীর মুখে শুনেছিলেন। পুরো দলটা যখন সব গণ্ডি পেরিয়ে পানামের আরামদায়ক আসনে গিয়ে বসেছি তখন মনে হচ্ছিল কেউ আনন্দিত নয়। প্রত্যেকেই গম্ভীর। এমনকী আমেরিকান এয়ারহোস্টেস যখন ভানু এবং কিশোরকে পানীয় দিয়ে গেল তখন তারা হাত বাড়াল না। এই অতিসাধারণ ঘরের ছেলেদুটোর সংকোচ থাকতে পারে, জীবনে প্রথম প্লেনে চেপে বিদেশে যাওয়ার আকস্মিকতা বিহ্বল করে দিতে পারে ওদের কিন্তু অন্যান্যরা? দীপংকর বলল, 'দূর! ভালো লাগছে না। প্রথমেই বাধা পড়ল। দায়িত্ব তো প্রত্যেকের নিজস্ব।'

প্লেন ছাড়ার সংকেত হল। কিন্তু প্লেন ছাড়ছে না। এক দুই করে পনেরো মিনিট চলে গেল নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে। যাত্রীরা সবাই উশখুশ করছে। হঠাৎ দেখলাম শকুন্তলাকে। বিশাল প্লেনের শেষপ্রান্তে এয়ারহোস্টেসের সঙ্গে এদিকে হেঁটে আসছে সে। তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ হল।

আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'বসুন।'

শকুন্তলা ঝড়ে বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে ধপ করে বসে দুহাতে মুখ ঢাকল। আমি নিজের আসনে ফিরে যাওয়ামাত্র প্লেনের ইঞ্জিন চালু হল। আমরা ভারতবর্ষের মাটি ছাড়ছি। রমাপ্রসাদের গলা শুনতে পেলাম, 'বেঁচে গেলাম।'

আমি ভদ্রমহিলার দিকে তাকালাম। দু-হাতে মুখ ঢাকা, কাঁধদুটো কাঁপছে। এইসময় ওঁকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। তাকিয়ে দেখলাম, পেছনের আসনে শ্রীমান ভানু এবং কিশোরের হাতে পানীয়ের গ্লাস। আমি চোখ বন্ধ করলাম।

॥ ১৪ ॥

বম্বে এয়ারপোর্টে পথখরচের জন্যে ডলার নিয়েছিলাম আমরা। দলের অনেকেই সেই প্রথম ডলারের নোট চোখে দেখেছিল, বলা যায় আইনসম্মত মালিক হয়েছিল। এক ডলারের চেয়ে এক পাউন্ড মূল্যবান এবং এদের একটির বিনিময়ে কুড়ি থেকে তিরিশপঁয়ত্রিশ ভারতীয় টাকা পাওয়া যায়। বাহরিনের দিনার অবশ্য আরও দামি কিন্তু সেটা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রচলিত মুদ্রায় পড়ে না বলে আলোচনায় ওঠেনি। মনোজ মিত্র ডলারের নোটটি সামনে ধরে বলেছিলেন, 'সাহেবদের দেখছি ভক্তিশ্রদ্ধা প্রচুর। আমার বাবা জানলে খুব খুশি হবেন।'

দীপংকর বলল, 'এর মধ্যে আপনার বাবা এলেন কী করে?'

মনোজ মিত্র তাঁর অদ্ভুত হাসিটি হাসলেন, 'আমি প্লেন ধরতে সরাসরি বাড়ি থেকে বেরুতে পারিনি। বাবা পাঁজি দেখে বলেছেন দুপুরের পর যাত্রা নাস্তি। অতএব সেই সময়ে বাড়ি ছেড়ে এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তখন তো আর এয়ারপোর্টে এসে বসে থাকা যায় না। বিধর্মী এবং নাস্তিকের দেশে যাচ্ছি বলে এইসব অনুশাসন। কিন্তু তিনি যদি এই ডলারটি দেখতেন তাহলে খুব খুশি হতেন।'

মনোজদা আমাদের দেখালেন। ডলারের ওপর বড় বড় অক্ষর ছাপা, 'ইন গড উই ট্রাস্ট।' দীপংকর মাথা নেড়েছিল, 'উঁহু বাবা, ঈশ্বরভক্তি ছাড়া এত ক্ষমতা পাওয়া যায় না।' তারপর আলোচনা উঠেছিল, আমেরিকানরা কতখানি ঈশ্বরমুখী? এ ব্যাপারে আমার কোনও জ্ঞান ছিল না। কিন্তু আমার বেশ মজা লাগছিল। এতদিন ডলার খরচ করেছি অনেক কিন্তু কখনও নোটের ভেতরের লেখাপত্র

নিয়ে মাথা ঘামাইনি।

প্লেনের পেছন দিকটা এখন আমাদের দখলে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছি। সময়কে জয় করতে করতে প্লেন উড়ছে ফ্র্যাঙ্কফুর্টের দিকে। এখন ভোর হওয়ার কথা আমাদের ঘড়ি অনুযায়ী ফলে ঘুম আসছে না। টয়লেট থেকে ফিরছি মনোজদা ইশারায় কাছে ডাকলেন। পাশের আসনে বসা মাত্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুজোর উপন্যাস ভেবেছেন?'

এমন প্রশ্ন আশা করিনি। সবে পুজো সংখ্যার উপন্যাস শেষ করে জমা দিয়েছি, আর কদিন বাদেই সেগুলো বাজারে বেরুবে। এখন কীসের ভাবাভাবি? মনোজদা বললেন, 'সামনের বছরেরটা এখন থেকে আপনারা ভাবেন না?'

'না। আপনার কি ঘুম আসছে না?'

মাথা নেড়ে না বললেন মনোজদা, 'দেশে একটা নাটক লিখতে বলেছেন সাগরদা। কিছুতেই মাথায় আসছে না। দু-তিনটে প্লট, আচ্ছা, একটা শুনবেন?'

দেশ ছেড়ে বিদেশ যাওয়ার শুরুতেই প্লেনে বসে কেউ এমন ভাবনা ভাবতে পারে তা আমার জানা ছিল না। বিশেষ করে মনোজদার এই প্রথম বিদেশ যাত্রা। এককালে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে কিছু গল্প চালু ছিল। পাজামা পাঞ্জাবি পরা সুভাষদা তিরিশের বি বাসে রড ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। চেনাজানা কেউ তাঁকে দেখে প্রশ্ন করল, 'দমদমের দিকে যাচ্ছেন সুভাষদা?' সুভাষদা মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ ভাই।'

'কোথায়?' ছেলেটি ঘনিষ্ঠ হতে চাইল।

'এই একটু মস্কোয়।'

সামান্য উত্তেজনা নেই, দমদম আর মস্কোয় কোন ফারাক নেই বোঝানোর জন্যেই এই গল্প। মনোজদাকে দেখে সেরকমটাই মনে হচ্ছিল। ওদিকে দীপংকর চোখ বন্ধ করে বসে আছে। শকুন্তলা উঠে ইস্তক চুপচাপ। আমি মনোজদার আগামী নাটকের গল্প শুনতে লাগলাম। অনেকটা বলে মনোজদা বললেন, 'দূর! জমছে না। ঠিক কি না?'

মনোজদার সঙ্গে আমার বয়সের ব্যবধান বেশি নয়। একই কলেজের ছাত্র ছিলাম আমরা। কিন্তু সেই একষট্টি সালে ওর লেখা নীলকণ্ঠের বিষ নাটকটি অভিনয় করেছি এবং সেই থেকেই সংযোগ। পরে ভদ্রলোক অধ্যাপক হলেন, মঞ্চাভিনেতা এবং পরিচালক এবং হঠাৎই সফল ফিল্মঅ্যাক্টর। কিন্তু লোকটার স্বভাব চরিত্র বদলালো না। ঘরকুনো স্বভাবের জন্যে ওঁকে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমাকে কম চেষ্টা করতে হয়নি।

আমাদের পেছনে বসেছিলেন মদনসুদনজি। হঠাৎ মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'এ মনোজদা, এক সর্দারজিকো স্টোরি ইয়াদ আ গিয়া।' সঙ্গে-সঙ্গে নাটক ছেড়ে মনোজদা বলে উঠলেন, 'বেশ বেশ, বলে ফেলুন।' মদনসুদনজির স্টকে কয়েকশো চমৎকার জোকস আছে। একটু অশালীন হলেও ওঁর বলার ভঙ্গিতে চমৎকার শোনায়। আমি উঠে যাচ্ছিলাম দেখে তিনি তড়িঘড়ি বলে উঠলেন, 'নেহি নেহি, এটা বিলো এইটটিন, আপনি থাকতে পারেন।'

আসলে কেউই ঘুমাচ্ছিল না। দীপংকরের কাছে যেতেই সে বলল, 'আজ সকালে একটা দারুণ কবিতা পড়লাম। জয় গোস্বামীর লেখা। সুনীলদা শক্তিদার পর এই জয় ছেলেটা সত্যি ভালো লিখছে। দেশের কবিতাটা পড়েছ?' মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম।

দীপংকর অভিনেতা। কিন্তু ও নিজে কবিতা লেখে। বিষণ্ণ চুয়াল্লিশ নামে একটি কবিতার বই বেরিয়েছে ওর। তাতে সত্যি ভালো লাইন লিখেছে সে। কিন্তু বিদেশ যাত্রার এমন সময়ে সে হঠাৎ একেবারে নিজের ভাবনা ভাবতে বসল? কিছু-কিছু মানুষের কাছে কবিতাভাবনা তো নিজেকে নিয়ে মগ্ন থাকা।

সেই রাত্রে ভানু কি কিশোরের মধ্যেও আমি উত্তেজনা দেখিনি। যীশু দাশগুপ্ত সাদা ওয়াইনের

বোতল শেষ করে বলেছিল, 'খেতে খারাপ নয় কিন্তু খায় কেন বলতে পারেন?' জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কেন? মৌজ হচ্ছে না?'

যীশু কাঁধ কাঁপিয়ে বলেছিল, 'দূর! বিন্তিবালাকে এবার লাল দিতে বলি।'

'বিন্তিবালা?'

'ওই যে! ঠিক আমাদের সন্তোষপুরের বিন্তিবালার মতো দেখতে।' দূরে দাঁড়ানো এয়ারহোস্টেসকে দেখাল যীশু। বললাম, 'আর খেতে হবে না। নইলে কাল ঠ্যালা বুঝবি।'

শকুন্তলা আমায় দেখে পাশে বসতে বলল। এই প্রথম আমি ওর সম্পর্কে একটু কৌতূহলী হলাম। সঙ্গে-সঙ্গে ফোঁস করে উঠল সে, 'ওই লোকটার জন্য, সমরেশদা, আপনাকে কি বলব, আমি কেঁদে ফেলেছিলাম।'

'কোন লোকটার জন্যে?'

'আমার মেয়েদের বাবা। বিকেলে এয়ারপোর্টে টেলিফোন করে জানলেন প্লেন দেরিতে ছাড়বে। ব্যস, হুকুম হল এত তাড়াতাড়ি এয়ারপোর্টে গিয়ে বসে থাকতে হবে না। আমি যত বলি পাঁচটায় রিপোর্টিং কে শোনে সে কথা। বেশি-বেশি।' শকুন্তলার নিঃশ্বাসের শব্দ কানে এল। জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর?'

'উনি জ্ঞান দিলেন নটার আগে প্লেন ছাড়বে না। আমায় এয়ারপোর্টে নিয়ে এলেন যখন তখন আপনারা প্লেনে উঠে বসলেন। এত রাগ হল। উনি খোঁজ নিয়ে এসে বললেন আর একটা প্লেন দশটায় ছাড়বে। আমি সঙ্গে-সঙ্গে সিকিউরিটি চেক করিয়ে ভেতরে গিয়ে বসে রইলাম।' মুখ গম্ভীর শকুন্তলার।

'তারপর?'

'উনি সান্ত্বনা দিলেন বোম্বেতে পৌঁছে এয়ারপোর্ট চেঞ্জ করার সময় যাতে সাহায্য পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু ভেতরে ঢোকার পর তিনি হাওয়া। আর আমি শুনেছি কেবলই প্লেন ছাড়ার সময় পিছিয়ে যাচ্ছে। একা-একা কাঁদতে লাগলাম। আমি আমেরিকায় এর আগেও গিয়েছি কিন্তু সবচেয়ে যেটা অন্যায় সেটা হল আমি দলের সঙ্গে যেতে পারছি না এবং শেষ পর্যন্ত না যেতে পারলে আমার জন্যে আপনাদের বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে। ছি-ছি।' গজরাতে লাগল শকুন্তলা।

'তারপর?'

'বোম্বেতে এসে দেখলাম এয়ারপোর্টে আমাকে রিসিভ করতে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। মাঝরাত্রে এয়ারপোর্ট চট করে ফাঁকা হয়ে গেল। কী করে কোথায় যাব বুঝতে পারছিলাম না। স্রেফ জেদে পড়ে পরের ফ্লাইট ধরেছিলাম, তখন কান্না পাচ্ছিল সেইজন্যে। এইসময় একজন যাত্রী আমাকে চিনতে পারলেন। তিনিই যেচে আমাকে লিফট্ দিলেন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট পর্যন্ত। ঘড়ি অনুযায়ী আমার প্লেন ধরার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। গাড়ি থেকে নামতেই মনে হল মুখে চোঙা লাগিয়ে কেউ যেন আমার পদবি ধরে ডাকছে। জানান দিতেই পানামের সেই অফিসারটি ছুটে এলেন, 'আপনার জন্যে আমরা অপেক্ষা করছিলাম। এটাই শেষ ডাক ছিল। জলদি চলুন, আপনার প্লেন এখনই টেক অফ করবে।' তিনি আমার সুটকেস তুলে নিয়ে দৌড়ালেন। ওঁর পেছন-পেছন কীভাবে বোর্ডিং কার্ড নিয়েছি, সিকিউরিটি, কাস্টমস ইমিগ্রেশন পেরিয়েছি এখন আর বলতে পারব না।' শকুন্তলা থামল খানিক। তখনও তাকে ঠিক ধাতস্থ বলে মনে হচ্ছিল না। পানামা কর্তৃপক্ষের বদান্যতায় আমরাও বেঁচে গেলাম। শকুন্তলা জিগ্যেস করল, 'সবাই খুব রেগে গেছে না?'

মাথা নাড়লাম, 'আপনি পৌঁছে যাওয়ার পর সব ঠিক হয়ে গেছে।'

আমাদের ইউনিটের অধিকাংশ সদস্যই মাসে দু-একবার কোনও না কোনও শুটিং উপলক্ষ্যে কলকাতার বাইরে যান। এই যাওয়ার ব্যাপারটা ওঁদের অভ্যেসে এমনভাবে পৌঁছে গেছে যে আর

কোনও উত্তেজনা হয় না। মনে হয় বোম্বে ছাড়ার পরেও সেই অভ্যেসই কাজ করছিল। সকাল নটায় ফ্র্যাংকফুর্টে নেমে যখন দেখা গেল প্রত্যেকের ঘড়ি তিন ঘণ্টা এগিয়ে তখনই বিস্ময় থাবা বাড়াল। ঘণ্টা দেড়েক ট্রানজিট লাউঞ্জে কাটাতে হয়েছিল আমাদের। প্লেনে ওঠার সময় থেকেই বিবেক যেভাবে ক্যামেরা কোলে নিয়ে বসেছিল নিজের ছেলেকেও অত যত্ন কেউ করে না। ট্রানজিট লাউঞ্জেও দেখছি সেটা ওর কোলে। জিজ্ঞাসা করতে জানাল যন্ত্রটি এত ডেলিকেট যে সামান্য অযত্ন পেলে শুটিং বরবাদ করে দিতে পারে। আমাদের অনেকেই সেই প্রথম একটি বিশাল এয়ারপোর্ট এবং তার সুদীর্ঘ চলন্ত পথ দেখল। ডিউটি ফ্রি শপে সিগারেট ইত্যাদি কিনে এসে দীপংকর জানাল সে ঠকে গিয়েছে। পার্ক স্ট্রিটে এর চেয়ে অনেক কম দামে সে বিদেশি সিগারেট কিনে থাকে। মনোজদা মদের কাউন্টারগুলো ঘুরে এসে বললেন, কী মদ কী মদ, এত মদ মানুষের খাওয়ার জন্যে তৈরি হয়, ভাবা যায় না।' মদনসুদনজি চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করতেই বললেন, 'সমরেশদা, একটা লোকের থাকার জন্যে বাড়ির দরকার ছিল অথচ পকেট বিলকুল খালি। হঠাৎ সে একদিন সমুদ্রের ধারে একটা ডাব পেয়ে গেল গেল যার মধ্যে জিন থাকে। সে ডাবের মালিক হতেই জিন বাইরে বেরিয়ে এসে কুর্নিশ করে বলল, 'হুকুম করুন কী করতে হবে।' লোকটা বলল, 'আমাকে একটা ভালো বাড়ি দাও।' জিন ভেংচে উঠল, 'আপনি তো খুব বুদ্ধু। আমি যদি আপনাকে বাড়ি দিতে পারব তাহলে ওই ডাবটার মধ্যে নিজে থাকতে যাব কেন?'

হাসলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে কার কী ভূমিকা?'

'খুব সিম্পল। ডিউটি ফ্রি শপগুলো হচ্ছে জিন, এয়ারপোর্ট হল ডাব। আর আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমাকে দেওয়ার ক্ষমতা এই জিনের নেই।' মদনসুদনজি হাসল।

ফ্রাংকফুর্ট থেকে ওড়ার আগে বিবেক তার ক্যামেরা নিয়ে এক প্রস্থ ঝামেলায় পড়ল। সরকারি অফিসাররা তাকে ক্যামেরা বহন করতে দেবেন না এবং সে ছাড়ার পাত্র নয়। ওই নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ তর্ক চলল। প্রথমে ইংরেজিতে তারপর একজন জার্মানে অন্যজন বাংলায়। শুনেছি এর আগে ডিউটি ফ্রি শপগুলোয় ঢুকে ভানু এবং কিশোর তাদের নিজস্ব বাংলায় জার্মান কর্মচারীদের সঙ্গে বাক্যালাপ করে এসেছে। বুঝতে এবং বুঝিয়ে দিতে অসুবিধে পর্যন্ত হয়নি। অফিসাররা নাছোড়বান্দা। তাঁরা ক্যামেরার সবকিছু খুলে দেখতে চান। কিন্তু বাংলা বলা আরম্ভ হওয়ার পর দেখলাম ওঁদের উৎসাহে ভাটা পড়ল। আমরা রক্ষে পেলাম।

ভরদুপুরে কেনেডি এয়ারপোর্টে নেমে দেখলাম ইমিগ্রেশনের সামনে বিশাল লাইন। এর আগের দুবারে কখনই এমন অভিজ্ঞতা হয়নি। ভানু বলল, 'দাদা, আমাদের পাড়ায় কেরোসিনের দোকানেও এত বড় লাইন পড়ে না।' প্রায় বত্রিশ ঘণ্টা যাত্রার পরে দেড়ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা সত্যি যন্ত্রণাদায়ক। একইসঙ্গে অনেকগুলো প্লেন নামায় এমন বিপত্তি। মজাও লাগছিল। একই লাইনে দাঁড়িয়ে নরওয়ের যাত্রী খোশগল্প করছেন জার্মান যাত্রীর সঙ্গে। শুনেছিলাম কলকাতার অফিস ভিসা দিলেও দেশে ঢুকতে দেওয়ার আসল মালিক হল ওই চৌকো বাক্সে বসে যাঁরা পাসপোর্ট পরীক্ষা করছেন তাঁরা। ওখান থেকেই অনেককে ফেরত পাঠানো হয়।

ইতিমধ্যে তাঁরা একজনকে আটকেছেন। তাঁদের চেঁচামেচি শুনতে পেয়েছি। আমাদের কারও ক্ষেত্রে এমন হলে বিপদ অনেক। একজন না থাকলে শুটিং করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। ভেতরে ঢোকার জন্যে ফর্ম ভরতি করে সবাইকে দিয়েছি। একমাত্র যীশু দাশগুপ্ত বলল, 'সমরেশদা, আফটার অল সন্তোষপুরের ছেলে, আমাকে আটকাবার কথা স্বপ্নেও ভাববেন না।'

প্রথমে এগিয়ে গিয়ে নিজের ছাড়পত্র নিয়ে জানালাম দলের কেউ-কেউ ইংরেজি জানে না, তাদের সাহায্য করার জন্য আমি দাঁড়াতে পারি কি না। অফিসার সম্মতি জানালেন। শুটিং করতে এসেছি, কিসের শুটিং কাগজপত্র কোথায় জেনে নেওয়ার পর ভদ্রলোক আর ঝামেলা করছিলেন না। যারা ইংরেজি জানে তাদের অনেকেই চলে এল ওই লাইনে। শুধু যীশু এগিয়ে গেল পাশের গেটে যেখানে একজন মঙ্গোলীয় ধাঁচের অফিসার বসে। আমি দূর থেকে দেখলাম যীশুর হাতের

ফর্ম ভদ্রলোকের কাছে পৌঁছোনোমাত্র এক ঝলক দেখেই তিনি সেটা ছুড়ে ফেলে দিলেন মাটিতে। যীশুকে খুব অসহায় দেখাচ্ছিল। ভদ্রলোক নেক্সট বলে হাঁকতেই সে আবার ফিরে গেল ভিড়ে। আমি এবার একটু হতভম্ব। সন্তোষপুরের কোনও কায়দা এবার ওর মুখে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু ওকে সঙ্গে না পেলে আমাদের সর্বনাশ। যীশুকে এদিকে আসতে দেওয়া হচ্ছে না। অফিসারকে বলে ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী বলল তোকে?' যীশু কাতর গলায় বলল, 'একটা কথাও বুঝতে পারলাম না। কি উচ্চারণ বাবা। মনে হল হবে না বলছে।'

ফর্মটি সে ইতিমধ্যে কুড়িয়ে নিয়েছিল। দেখলাম সেটি সঠিকভাবে লেখা হয়নি। দ্বিতীয় ফর্ম জোগাড় করতে গিয়ে দেখি মনোজদা সেখানে দাঁড়িয়ে। মাথা নেড়ে হাসলেন, 'বলবেন তো, এদেশে আসতে হলে অন্যভাষাও শিখতে হয়। পড়তেই পারিনি তো ফিল-আপ করব কী করে?' প্রত্যেকেই এমন নার্ভাস যে উলটো পিঠে ইংরেজি রয়েছে সেটা কারও চোখে পড়েনি।

ভিজিটার্স লাউঞ্জে পৌঁছে যীশু হাত জোড় করেছিল, 'ভুলে গেলাম, টোটালি ভুলে গেলাম আমি কে। এখন থেকে একেবারে গাঁয়ের ছেলের মতো যা বলবেন তাই শুনব।'

পানামা আমাদের জন্যে গাড়ির ব্যবস্থা করেছিল। শুনেছিলাম লিমুজিন আসবে। কিন্তু একটা বড় ভ্যানের সঙ্গে মার্সেডিজ পেয়ে গেলাম। গাড়িদুটোয় মালপত্র তুলতে-তুলতে শংকর বলল, 'এই তাহলে আমেরিকা, সমরেশদা?'

'মানে?'

'দিল্লি বম্বের মতনই তো। আমি তো খুব উত্তেজিত ছিলাম অন্য কিছু দেখব।'

'এয়ারপোর্টের বাইরেটা তো একইরকম হওয়া উচিত।'

রমাপ্রসাদ কাছে এল, 'সমরেশদা, এখানে শুটিং করতে দেবে?'

'প্রচুর টাকা লাগবে ইনসিওরেন্সের জন্যে।'

রমাপ্রসাদ গম্ভীর হল। তার মাথায় নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে কোনও কম্পোজিশন এসে গিয়েছে। গাড়ি চলতে আরম্ভ করলে পরিশীলিত ইংরেজিতে মনোজদা মার্সেডিজের ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি যদি একটা সিগারেট ধরাই তাহলে আপনার কি খুব অসুবিধে হবে।'

লোকটা মাথা নেড়ে জবাব দিল, 'বিন্দুমাত্র না।'

মনোজদা আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'সবদেশেই ভালো মানুষ আছে, কী বলেন?'

কেনেডি এয়ারপোর্ট থেকে নিউজার্সির ক্লোস্টার শহরে পৌঁছতে যে আমেরিকা তাই আমাদের দলের নবাগতদের অবাক করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। যদিও তারা শুধু রাস্তাঘাটের অভিনবত্ব এবং গাড়ির মিছিল দেখেছে তবু এতদিন দেখা বিদেশি ছবির সঙ্গে চমৎকার মিল পেয়ে উত্তেজিত না হয়ে পারেনি। হাডসনের ওপর দিয়ে আসবার সময় কেউ-কেউ গঙ্গা-গঙ্গা বলে উঠলেও সেই রসিকতায় অধিকাংশই সায় দেয়নি। সত্যি বলতে কি পৃথিবীর বড়-বড় শহরগুলোর অধিকাংশই বুকে নদী নিয়ে আছে। সেটা হাডসন টেমস সিন অথবা গঙ্গা, যাই হোক না কেন। টেম দেখেও আমার গঙ্গার কথা মনে পড়েছিল। ওরা কী যত্নে রেখেছে নদীটাকে আর আমরা কি অবহেলায়!

সিদ্ধার্থর বাড়ির সামনে পৌঁছনোমাত্র আন্তরিক অভ্যর্থনা পাওয়া গেল। সবাইকে জড়িয়ে ধরে সিদ্ধার্থ বলল, 'শেষ পর্যন্ত আপনারা এলেন। দারুণ ব্যাপার। ছবিটা এমনভাবে বানান যাকে লোকে দেখে আমাদের বুঝতে পারে।' সিদ্ধার্থ আমাদের আগমনকে স্মরণীয় করার জন্যে শ্যাম্পেনের বোতল খুলল। দলের অনেকেরই আমাদের সামনে পান করতে সংকুচিত ছিল। দেশীয় মতে পান করার ধরনের সঙ্গে মিলছেও না। সিদ্ধার্থর বাড়ি ছোট নয় কিন্তু এতগুলো মানুষের জমায়েত এরা আগে নিশ্চয়ই হয়নি। অরিজিত এবং কামাল আমাদের জানাল থাকা হবে দুই ভাগে। হ্যাকেনস্যাকে

যে মোটেলটি ঠিক করা হয়েছে সেখানে আমাকে থাকতে হবে বেশিরভাগকে নিয়ে।

এরই ফাঁকে রমাপ্রসাদ আমায় জানাল, 'সমরেশদা, স্পটগুলো দেখিয়ে দিন। নইলে শুটিং করবে কীভাবে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

একটানা যাত্রার পরেই তার মাথায় এখন শুটিং-এর ভাবনা। ওকে আশ্বস্ত করলাম। আগামীকাল আমরা চিত্রনাট্য অনুযায়ী জায়গাগুলো দেখে নেব। এতদূর প্লেনে ওড়ায় অনেকেরই শরীর খারাপ হতে পারে। সেই কারণেই বাকিদের দুদিন বিশ্রাম দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে। সেই সময়ে রমাপ্রসাদ দেখার কাজটি সারতে পারে। রমাপ্রসাদের দিদি থাকেন টেরি টাউনে। তিনি জেনে গেছেন ভাই আসছে। স্বভাবতই ইচ্ছে ছিল ভাই তাঁর সঙ্গে থাকুক। কিন্তু আমরা স্থির করেছিলাম কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ দল ছেড়ে যেতে পারবে না। ইতিমধ্যে কামাল এসে তাগাদা দিল। ডিনার প্যাক করে আমরা সদ্য ভাড়া করা ভ্যানে উঠলাম। কামাল চালাচ্ছে ভ্যান। বেশ ফূর্তিতে আছে এখন। নিউ জার্সির এই অঞ্চলটি বেশিরকমের নির্জন। সুন্দর রাস্তা চুপচাপ পড়ে আছে। যীশু পেছন থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা এদেশে কি মানুষ নেই?'

বললাম, 'এটা কি গাঁয়ের লোকের মতো প্রশ্ন?'

'হ্যাঁ। রাস্তায় এখন পর্যন্ত একটাও পুরুষ দেখতে পেলাম না, মহিলা দূরের কথা।'

কামাল আমাকে নীচু গলায় বলল, 'যীশু তো বেশ দিলখোলা। ওকে ফর্টি সেকেন্ড স্ট্রিটে নিয়ে যেতে হবে।'

হ্যাকেনস্যাকের মোটেলটি বেজায় বড়। লম্বা দোতলা বাড়িটির সামনে অনেকখানি খোলা চত্বর গাড়ি রাখার জন্যে। ঢোকার মুখেই অফিস এবং সেখানে যথারীতি প্যাটেলদের সংসার। আমেরিকায় মোটেল সাম্রাজ্যের অনেকটাই এখন গুজরাতিদের দখলে। কামাল সেখান থেকে চাবি সংগ্রহ করে মোটেলের সামনে ভ্যানটিকে নিয়ে এল। মনোজদা দীপংকর শংকর এল, শকুন্তলাকে রেখে এসেছি সিদ্ধার্থর আস্তানায়। চারটে ঘরের কে কোনটাতে থাকবে ঠিক করে দেওয়ার পর জিনিসপত্র তোলা হচ্ছিল। ঘরগুলো বেশ বড় এবং চারজনের জন্যে দিব্যি জায়গা আছে। এখন সন্ধে রাত। গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে বিবেক তদারকি করছিল যাতে মালপত্র ঠিকঠাক ওঠে। ও একটু কায়দা করা পোশাক পরে। এখনও বিয়ে করেনি যদিও বয়স তার মতই বাড়ছে। আমি দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। পেছনের ঘরগুলোয় জোর গুলতানি চলছে। হঠাৎ নীচের কোনও ঘর থেকে একটি যুবতী বেরিয়ে এল। জিনস এবং গেঞ্জিতে এমন ফিগার প্লেবয় ম্যাগাজিনে দেখা যায়। ওপর থেকে দেখলাম বিবেক যুবতীটিকে স্বপ্নের চোখে দেখছে। ওর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় যুবতী হেসে বলল, 'হাই।' বলল, কিন্তু দাঁড়াল না। বিবেক এতই হতভম্ব যে সাড়া দিতে পারলে না। সে চুলে হাত বুলিয়ে হেঁটে যাওয়া যুবতীর শরীরের নাচন দেখতে লাগল। ওপর থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী হল বিবেক?'

আমাকে দেখতে পেয়ে সে বিব্রত হাসি হাসল, 'মানে আমি, কী স্মার্ট!'

কে স্মার্ট সেটা বুঝে নিতে হল। মালপত্র তোলা হয়ে গিয়েছিল। বিবেককে ওপরে চলে আসতে হল। আমি এবং কামাল একেবারে কোণের ঘরে। নিতাইও একসঙ্গে। এই সময় মদনসুদনজি আমাদের ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও কৌন থি?'

'কে?'

'আপ বাহার আইয়ে।'

অতএব বারান্দায় গেলাম। ছেলেরা এবার বারান্দায় দাঁড়িয়ে। নীচে ইতিমধ্যে একটি বিশাল ট্রাক এসে দাঁড়িয়েছে। ট্রাকের ড্রাইভার এক কালো যুবতী গল্প করছে। মাঝে-মাঝে তার দৃষ্টি বারান্দা ছুঁয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা ভালো লাগল না। ছেলেদের বললাম ঘরে ফিরে যেতে। বিদেশে এসে একটা সামান্য মন্তব্যও বিপদ ডেকে আনতে পারে।'

ঘণ্টাখানেক বাদে মদনসুদনজি আবার এলেন, 'মনে হচ্ছে ইনি একটি বন্দর?'

'বন্দর?'

'হাঁ জি। পোর্ট।'

'আপনি একবার দেখেই বুঝে গেছেন?'

বিধানরায়জি তো পেশেন্টকে দূর থেকে দেখেই বুঝতেন। কিন্তু এখন আর কোনও ভয়ের চান্স নেই। ছেলেরা ঘর থেকে বের হবে না।'

মদনসুদনজি হাসলেন।

কামাল জিজ্ঞাসা করল, 'টায়ার্ড তো হবেই। কিশোরকে বলি ডিনার দিয়ে দিতে। নিশ্চয়ই সবার ঘুম পেয়ে গেছে?' কামাল উঠে দাঁড়াল।

'নেহি নেহি জি। সবাই এখন ঘরে-ঘরে ঘুম ভাঙার গান দেখছে।'

'সেটা আবার কী?'

মদনসুদনজি গম্ভীর মুখে টিভির কাছে চলে গেলেন। নব ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে চ্যানেল দেখতে লাগলেন। কোথাও খবর হচ্ছে, কোথাও বিজ্ঞাপন, কোথাও সিনেমা। শেষতক হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'কেয়া জি! নেতা বলে আপনার ঘরকে এরা নিরামিষ করে রেখেছে?' মদনসুদনজি চেয়ার টেনে বসলেন, 'পাশের তিনটে ঘরে স্পেশাল চ্যানেলে যে ছবি চলছে তা দেখলে ঘুম ভেঙে যাবে কবরে যে শুয়ে আছে তারও। বাপস। ব্লু ফিল্মের কথা এতদিন শুনে এসেছি, চোখে যা দেখলাম তা বর্ণনার অতীত।'

যাচ্চলে! এতদূর উড়ে এসে সবাই বিশ্রাম না নিয়ে এই কাণ্ড করছে? জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওরা আপনার হাঁটুর বয়সি, ওদের সঙ্গে এসব দেখলেন?'

'কী বলব! আপনি আমাকে ওই ঘরে দিয়েছেন। ওরাই তো মেজরিটি। আর হাঁটুর বয়স আমার চেয়ে কম একথা কে বলল আপনাকে?'

কামাল তড়িঘড়ি বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে জানাল তিনটি ঘরের দরজাই ভেতর থেকে বন্ধ। শব্দ করে খুলিয়ে দেখেছে চ্যানেল ঘুরে গেছে টিভির। ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করাই ভালো। প্রত্যেকেই তো প্রাপ্তবয়স্ক।

খাওয়া-দাওয়ার পর যখন বিছানায় শুয়েছি তখন যীশু এবং বিবেক এল, 'কী সমরেশদা, ঘুমোচ্ছেন। আমরা ভাবলাম একটু বেরুব।'

'তোমাদের ঘুম পাচ্ছে না।'

'দূর!'

'আজ শুয়ে পড়ো বাবা। কাল দেখা যাবে। এখানে অসুস্থ হলে দেখতে হবে না।'

'আপনার না এনার্জি শেষ হয়ে গেছে।' ওরা চলে গেল।

এবার কামাল টেলিফোনে হাত দিল। সিদ্ধার্থর বাড়িতে ফোন করে প্রথমে জেনে নিল সেখানে সব ঠিক আছে কি না। তারপর আবার নম্বর চাইল অপারেটরের কাছে। লং ডিস্ট্যান্স কল। সেটা পাওয়ার আগে নিজের কার্ডের নম্বর জানাল। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'ভয় নেই, তোমাদের বিল বাড়াচ্ছি না।' এরপরে যে সংলাপ তা লেখার কোনও প্রয়োজন নেই। অসন্তুষ্ট স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে গেলে যে-যে শব্দ ব্যবহার করতে হয় কামাল তাই করল। ঘরে যে আরও দুজন মানুষ রয়েছে তা ওই সময় খেয়ালে ছিল না ওর। বোঝা গেল নীনা তাকে অবিলম্বে কানাডায় ফিরে যেতে বলছে। ও নতুন দায়িত্বের কথা বলে ক্রমাগত বুঝিয়ে গেল। শেষপর্যন্ত পালটা প্রস্তাব দিল নীনাই আসুক আমেরিকায়। শুনতে-শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না, তবে তার আগে মনে ভয় ঢুকেছিল, কামাল চলে গেলে কী হবে!

আমরা এখানে আসার আগেই নিউইয়র্কের বাঙালিদের একটি অন্যতম সংস্থার কর্ণধার সুপ্রিয় ঘোষ অরিজিতকে অনুরোধ করেছিলেন যদি ওঁদের সংস্থার সাহায্যার্থে একটা অনুষ্ঠান করে দিতে

পারি তাহলে ওঁরা উপকৃত হবেন। শুটিং আরম্ভ হয়ে গেলে কোনওদিকেই তাকানো যাবে না। মনোজদা এবং দীপংকর এই আবেদনে সাড়া দিয়ে সাজানো বাগান নাটকটি সদলে করবে বলে ঠিক করেছিল। চরিত্র প্রচুর। তাই বিবেক যীশুকেও দরকার হল। একদিনের রিহার্সাল, পরের দিন স্টেজ। আমরা এই ফাঁকে শুটিং স্পট দেখে বেড়াচ্ছি। কোনটা রমাপ্রসাদের পছন্দ হয়, কোনটা হয় না। ম্যানহাটনের অতি ব্যস্ত অঞ্চলটির বেশ কিছু জায়গায় সে কাজ করবে বলে ঠিক করল। সেইসঙ্গে হাডসন নদীর ধারে, স্ট্যাচু অব লিবার্টিতে যাওয়ার পথে স্টিমারে, ক্লোস্টারের কে মার্টে শুটিং হবে। আজকেই ঠিক করলাম টেরি টাউনে রমাপ্রসাদের দিদির বাড়িটি হবে আমাদের মূল দুটো চরিত্রের বাসস্থল। দিদির দেখা পেয়ে তো বটেই বাড়িটি দেখেও রমাপ্রসাদ খুব খুশি।

ওয়াশিংটন থেকে নিজের ছোট্ট লাল গাড়ি চালিয়ে জয়ন্তী একাই এসে হাজির। আমার দেখা পাওয়া মাত্র এসে জড়িয়ে ধরল। পাঁচঘণ্টা গাড়ি চালানোর পরিশ্রমে নয়, ও কাঁপছিল অন্য ধরনের উত্তেজনায়। কোনওরকমে জিজ্ঞাসা করল, 'সমরেশদা, আমি পারব তো?'

বললাম, 'মনোজের কথা মনে করার চেষ্টা করো। ঠিক পারবে। ও তোমাকে এই চরিত্রে নির্বাচন করেছিল। তুমি যা, সেইরকম বিহেভ করো দেখবে অসুবিধে হচ্ছে না।'

জয়ন্তী জানাল জ্যানিস আসছে ক'দিন বাদে। আমাদের পরিকল্পনা মতো প্রলয় ঘোষ এবং পিংকির দৃশ্যগুলো আগে তুলে নেব। ইতিমধ্যে সুদীপ্ত সাদা কালো চরিত্রের অভিনেতাদের নির্বাচন করতে সাহায্য করবে।

প্রথম দুদিন শুটিং-এর চেষ্টা হয়নি। দলের বেশিরভাগই শ্রুতি নাটকের রিহার্সালে ব্যস্ত। বাঞ্ছারামের চরিত্রটি মনোজদার অজস্রবার করা, দীপংকরও সিনেমার যে চরিত্রটি করেছিল সেটি স্বচ্ছন্দে করছে কিন্তু অন্যদের অনুশীলনের প্রয়োজন হচ্ছে। ব্যাপারটার সঙ্গে সম্মানের প্রশ্নও জড়িয়ে ছিল। যে দর্শক দেখতে আসবেন তিনি একদিনের রিহার্সালের অজুহাত শুনতে চাইবেন না। জানলাম টিকিট হচ্ছে দশ ডলার করে।

ছুটির দিনে দুপুরবেলায় কুইন্সের একটা স্কুলের হলে অনুষ্ঠান। প্রায় শ'ছয়েক দর্শক যখন মুগ্ধ হয়ে মনোজদা দীপংকরের অভিনয় দেখলেন তখন আমি শেষ সারিতে বসে। ওঁদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে গেল অনভ্যস্ত অরিজিত, রমাপ্রসাদ, শকুন্তলারা। এমনকি বিবেক এবং যীশুকেও অভিনেতা বলে মনে হচ্ছিল। অনুষ্ঠানের পর এক ভোজসভায় ওঁরা আমাদের দক্ষিণাবাবদ পাঁচশো ডলার দিতে এসেছিলেন কিন্তু আমরা সবিনয়ে সেটা ওঁদের তহবিলেই ফিরিয়ে দিলাম।

রাত্রে সিদ্ধার্থদের বাড়িতে না গিয়ে মোটেলে ফিরে এলাম সরাসরি। কামাল আর আমি অফিসে ঢুকলাম চাবি নিতে। গুজরাতি ভদ্রলোকটি বেশ হাসিখুশি। তাঁকে আমি সেই বিশেষ চ্যানেলটির কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি জানালেন, 'এই ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই স্যার। এখানে সাধারণত ট্রাক ড্রাইভাররা রাত কাটাতে আসে। ওরা যদি ওই চ্যানেল টিভিতে না পায় তাহলে এই মোটেলে কেউ আসবে না। আর আমেরিকায় এটা বেআইনি নয়। না দেখতে চাইলে অন্য চ্যানেল ঘোরান।'

কামাল তাঁকে এবার সেই মেয়েটির কথা জিজ্ঞাসা করল। ভদ্রলোক একটু গম্ভীর হলেন, 'স্যার। আপনারা ভারতবর্ষ থেকে আসছেন, আমার দেশের লোক। আপনার ছেলেদের শুধু একটা কথাই মনে করিয়ে দেবেন এইসব মেয়েদের অর্ধেকের এইডস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ওঁরা যেন ভারতবর্ষে এইডস ক্যারি করে না যান।'

অর্থাৎ মদনসুদনের অভিজ্ঞ চোখ মিথ্যে কথা বলেনি। বাইরে বেরিয়ে দেখলাম ছেলেরা ভ্যান থেকে নেমে মোটেলের দিকে যাচ্ছে। হঠাৎ চোখ পড়ল নীচতলার এক নম্বর ঘরের দরজা খুলে গেল। আলো থেকে বেরিয়ে এল সেই মেয়েটি। সেই একই পোশাক, জুতোর শব্দ তুলে ছেলেদের পাশ কাটিয়ে সচেতন-উদাসীন হয়ে হেঁটে আসতে আসতে মুচকি হাসল বিবেকের দিকে তাকিয়ে, 'হাই!'

বিবেক থতমতো হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে জানান দিল। 'হা-ই।'

মেয়েটি শরীর দুমড়ে বলল, 'সরি। আজ আমার এক বন্ধু এসেছে টেক্সাস থেকে। কাল বিকেলে কী করছ? আমরা ডিনার খেতে পারি। ওকে!' সে চলে গেল অফিসের দিকে। দলের সবাই দেখলাম বিবেকের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত। ওপরে উঠে এসে বিবেক আমায় বলল, 'কী স্মার্ট মেয়ে, দেখলেন?'

আমি তাকে একটু আগে শোনা গুজরাতি ভদ্রলোকের উপদেশ শোনালাম। সঙ্গে-সঙ্গে ওর হাসি নিবে গেল, 'সর্বনাশ!' দেখলাম দলের সবাই এবার এইডস নিয়ে শোনা নানান কাহিনি আলোচনা শুরু করল। বুঝলাম কাজ হয়েছে। আমি তাড়া দিলাম সবাইকে বিছানায় যাওয়ার জন্যে। আগামীকাল বারোটায় আমাদের প্রথম দিনের শুটিং শুরু হবে টেরি টাউনে।

অরিজিত আমাদের আগে এখানে পৌঁছে ম্যানহাটনের একটি কোম্পানির সঙ্গে কথা বলে রেখেছিল যাতে শুটিং-এর দিন সকালে আমরা প্রয়োজনীয় আলো, রিফ্লেক্টার ইত্যাদি পেতে পারি। এগুলো সাধারণত সাপ্তাহিক ভাড়ায় দেওয়া হয়। পুরো দলটাকে সকাল সাড়ে ন'টায় টেরি টাউনের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে হাডসনের পাশ দিয়ে আমরা ম্যানহাটনের এক প্রান্তের সেই দোকানটিতে পৌঁছলাম সাড়ে দশটায়। বিশাল দোকান। সামনেই দুটো স্টুডিয়োভ্যান দাঁড়িয়ে। তাতে আধুনিক শুটিং সরঞ্জাম তোলা হচ্ছে। রিশেপসনে আমাদের পরিচয় দেওয়া মাত্র দেখলাম কর্মীদের মধ্যে কানাকানি শুরু হয়ে গেল। সবাই শক্তমুখে তাকিয়ে। আমরা ম্যানেজারদের সঙ্গে দেখা করে যেসমস্ত জিনিস চাই তার একটা তালিকা দিলাম। ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'আমি খুব দুঃখিত। আপনাদের মালগুলো দিতে পারছি না। শুধু আমি কেন, ম্যানহাটনের কোনও দোকানদারই দিতে পারবে না।'

'কেন?' আমরা আকাশ থেকে পড়লাম। ওগুলো ছাড়া শুটিং করা অসম্ভব ব্যাপার। 'আমাদের ইউনিয়ন থেকে আপত্তি করছে। ওদের কাজ না দিলে মাল বের করতে দেবে না।'

শুটিং স্পটে শিল্পীদের ততক্ষণে সংলাপ পড়ানো শুরু হয়ে গেছে।

॥ ১৫ ॥

আমরা ভদ্রলোককে বোঝাতে চাইলাম, ইউনিয়নের লোকদের কাজে নিতে আমাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের আর্থিক সামর্থ্য বেশি নয়। ম্যানেজার বললেন, 'এ কথায় ওরা সন্তুষ্ট হবে না। আমিও অসহায়। দুজন লাইটম্যানকে যদি তোমরা দৈনিক দুশো ডলার করে দাও তাহলে একটা রফা হতে পারে।'

অরিজিত ভদ্রলোককে বোঝাতে চেষ্টা করল, 'আমরা ফিল্ম তৈরি করছি না। ইউম্যাটিকে সুট করে টিভিকে দেব। এতে লাভের সম্ভাবনা বেশি নেই। তা ছাড়া প্রত্যেকের সাহায্যে আমরা কাজটা করছি, দেওয়ার মতো ডলার ইচ্ছে থাকলেও দিতে পারব না।'

ম্যানেজার চারপাশে তাকালেন। তাঁর কাচের ঘরে বসে কথা বলছিলাম আমরা। সেখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি কর্মচারীদের অনেকেই আমাদের লক্ষ করছে। ম্যানেজার বললেন, 'এখানকার ইউনিয়ন খুবই শক্তিশালী। আমি চাইলেও জিনিস বের করতে দেবে না।'

'কিন্তু আপনি আশ্বাস দিয়েছিলেন বলেই আমরা শুটিং-এর ব্যবস্থা করে ওগুলো নিতে এসেছিলাম। পুরো ইউনিট আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে!'

'বুঝলাম। যখন আশ্বাস দিয়েছিলাম তখন জানতাম না ইউনিয়নের কেউ কাজ পাচ্ছে না আমি সত্যি দুঃখিত। ঠিক আছে, তোমরা এক কাজ করো, ওয়াল্টারের কাছে যাও।' বৃদ্ধ একেবারে নীচু গলায় উপদেশ দিলেন।

'ওয়াল্টার কে?'

'জার্সি সিটির তিনশো এগারো ওয়াশিংটন স্ট্রিটে ফিল্ম ট্র্যাকস নামে একটা বড় শুটিং সরঞ্জামের কোম্পানি আছে। ওয়াল্টার চাউমো হল তার ম্যানেজার। লোকটা রাশিয়ান এবং কিছুটা বেপরোয়া। হাডসনের ওপারে বলে নিউইয়র্কের ইউনিয়নগুলোর দাপট ওখানে কম। আমি ওকে ফোন করে দিচ্ছি, তোমরা চলে যাও।'

অগত্যা ম্যানেজারের ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। মুখের ওপর না হলেও কিছু বিদ্রূপ শুনতে হল রাস্তায় নামার আগে। সেখান থেকে হাডসন অতিক্রম করলাম সুড়ঙ্গ দিয়ে। আমাদের মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। কলকাতায় টিভির জন্যে শুটিং করলে চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নগুলো কোনও বাধা দেয় না। এখানে তেমনটা হলে কাজ না করে ফিরে যেতে হবে আমাদের। এদের দুজন লোককে আট ঘণ্টার দৈনিক চুক্তিতে নিলে না খেয়ে থাকতে হবে। এরকম সমস্যার কথা আগে কেউ আভাসও দেয়নি।

ফিল্ম ট্র্যাকস একটি বিশল গুদামঘর। সদ্য শুটিং করে আসা ভ্যান থেকে জিনিসপত্র নামাচ্ছিল কয়েকজন। তাদের একজনকে এশিয়ান বলে মনে হল। এগিয়ে গিয়ে আলাপ করতেই জানলাম লোকটার বাড়ি এলাহাবাদে। ভাসতে-ভাসতে এখানে পৌঁছেছে। আমাদের সমস্যা শুনে সে উপদেশ দিল, 'তোমরা সবাইকে বলবে হোম ভিডিয়ো করবে। ওয়াল্টারকে অবশ্য সব কথা খুলে বলো। ও ইউনিয়নের সঙ্গে লড়াই করতে পারে। ওই তো ওয়াল্টার মাল নামাচ্ছে।'

অতবড় একটি সংস্থার ম্যানেজার শ্রমিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছেন এমন অভিজ্ঞতা সত্যিই অভিনব। এলাহাবাদের ছেলেটি তাঁকে ডেকে দিতেই হাত ঝাড়াতে-ঝাড়তে এগিয়ে গেলেন ওয়াল্টার। তাঁর শরীর বিশাল কিন্তু মুখটি হাসিতে ভরা, 'হেলো! ভারত থেকে এসেছ? একটু আগে বব ফোনে বলল তোমাদের কথা। কী-কী জিনিস চাই বলো?'

অরিজিত তাঁকে তালিকাটি দিতেই তিনি মাথা নাড়লেন, সব পেয়ে যাবে। তোমরা অফিস ঘরে গিয়ে বসো, আমি আসছি।'

বিরাট গোডাউনটি পার হয়ে যাচ্ছি যখন তখন গোলমাল কানে এল। একটি কালো ছেলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে রাগি চেহারার সাদা ঝগড়া করছে ওয়াল্টারের সঙ্গে। ঝাগড়ার ভাষা অবশ্যই শালীন নয়। দোকানের একজন সাধারণ কর্মচারী কি করে ক্ষমতাবান ম্যানেজারকে অশ্লীল গালাগাল দিতে পারে তা ভাবা মুশকিল। ওয়াল্টারও সেই একই শব্দাবলি ফিরিয়ে দিচ্ছে। অফিসঘরে একটি মোটাসোটা মহিলা বসেছিলেন। তিনি আমাদের আপ্যায়ন করে কেন এসেছি জেনে বললেন, 'আপনারা এর মধ্যে সমস্যায় পড়ে গেছেন। বাইরে ওয়াল্টারের সঙ্গে ঝগড়াটা ওই একই কারণে হচ্ছে। তবে ওয়াল্টারকে ভয় দেখিয়ে কিছু করা যাবে না।'

এই সময় ওয়াল্টার ফিরে এলেন, 'ফ্রান, এঁরা ভারত থেকে এসেছেন, হোম ভিডিয়ো করবেন। এঁদের আমি জিনিসপত্র দেব।'

ফ্রান বললেন, 'খুব সাধু সিদ্ধান্ত।'

ওয়াল্টার হাসলেন, 'ইয়ার্কি মেরো না। ওরা আমাকে ইউনিয়ন দেখাচ্ছে। কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না, ইউনিয়ন। আরে হোম ভিডিয়োর বাজেট কত? একটা গরিব চাষিকে যদি বলা হয় হাতি পুষতে তাহলে সে কি পারবে? সে গরু পুষতে পারে। চলো, আমরাই হাতে-হাতে জিসিনগুলো তোমাদের ভ্যানে তুলে দিই।'

এখন পর্যন্ত ঘটনা যেভাবে ঘটছে তাতে ভাড়ার কথা তুলতে পারিনি। আমাদের গোটা তিনেক রিফ্লেক্টার, চারটে আলো স্ট্যান্ড সমেত, কাটার এবং নানারকম সরঞ্জাম চাই। সেইসঙ্গে একটি ট্রলি যাতে ক্যামেরাম্যান বসবে ক্যামেরা নিয়ে। তাঁর আসন উঁচু-নীচু করা যায়, চারপাশে ঘোরানো সম্ভব সহজ গতিতে, লাইন পেতে তার ওপর ট্রলি চালাতে হয় না। ওয়াল্টারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যখন আমরা ওই বস্তুগুলো ভ্যানে তুলছি তখনও, দূর থেকে গালাগালি ভেসে আসছিল। আমাদের

টালিগঞ্জের যেসব জিনিস নিয়ে আমরা কাজ করি এগুলো তার তুলনায় অনেক বেশি আধুনিক। বিবেক ব্যবহার শিখে নিচ্ছিল ওয়াল্টারের কাছ থেকে।

একটা লিস্ট তৈরি করে ওয়াল্টার আমাদের নিয়ে ফিরে এলেন তাঁর অফিসে। তিন সপ্তাহের জন্যে আঠারোশো ডলার চাইলেন তিনি। কিন্তু দরাদরির পরে সেটা পনেরোশোতে স্থির হল। ব্যাগ খুলে টাকা বের করতেই ওয়াল্টার আঁতকে উঠলেন, 'আরে! তোমাদের ক্রেডিট কার্ড নেই?'

অরিজিত বলল, 'না। আমরা ভারতীয়। এখানে ক'দিনের জন্যে এসেছি!'

'মাই গড! তোমাদের কেউ বলেনি আমেরিকায় ব্যবসায়ীরা নগদ টাকায় বিশ্বাস করে না। যে যত ধার নেওয়ার যোগ্য সে তত মূল্যবান লোক। ঠিক আছে, টাকা না হয় নিয়ে নিচ্ছি কিন্তু এই যে মালপত্রগুলো তোমরা একুশ দিন রাখবে, যদি ভেঙে যায়?'

'ভাঙলে তোমাকে নিশ্চয়ই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।'

'নিশ্চয়ই। আর সেটা তোমরা দিতে পারবে না। কিংবা যদি তোমরা আদৌ ফেরত না দাও, আমি তো সঙ্গে পাহারাদার পাঠাচ্ছি না, আমার ক্ষতি কে সামলাবে?'

'এ ব্যাপারে তোমাকে আমরা লিখিত—।'

'ওসব ব্যক্তিগত লেখার কোনও দাম নেই হে। তোমাকে এই মালগুলোর একটা ইনসিওরেন্স করাতে হবে। প্রিমিয়ামর বেশি নয় কিন্তু ভেঙে গেলে বা হারিয়ে গেলে সেটার দায়িত্ব ইনসিওরেন্স কোম্পানির।'

'কোথায় সেটা করতে হবে?'

'ফ্রান তোমাকে সাহায্য করবে।'

এবার ফ্রান আমাদের উপদেশ দিলেন। মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই টিউব পাব। টিউবে চেপে হাডসনের তলা দিয়ে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে গিয়ে ওয়াল স্ট্রিটের আঠাশ নম্বর বাড়িতে পৌঁছতে হবে। সেখানে মিসেস স্কট আমাদের সাহায্য করবেন। তিনি একজন এজেন্ট।

বিবেক আর কামালকে ফিল্ম ট্র্যাকসে রেখে আমি অরিজিত হাঁটতে শুরু করলাম। মনে-মনে জানছি, একটু দেরি হবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুটিং আটকাবে না। আজকের আবহাওয়াও বেশ সুন্দর। ওয়াল স্ট্রিটের মিসেস স্কটের অফিসে পৌঁছে একটি মাঝারি চেহারার মধ্যবয়সি মহিলার দর্শন পেলাম। অফিস না বলে বাড়ির ড্রইংরুম বলাই ভালো। খুবই আপ্যায়ন করলেন মহিলা। তালিকাটি নিয়ে কম্পিউটারে ফেলে হিসেব নিকেশ করে বললেন, 'একটু কমেই করে দিচ্ছি। একুশ দিনের জন্যে মাত্র এক হাজার দিতে হবে আপনাদের।'

এক হাজার। আমাদের মুখ থেকে কথা সরছিল না। এত ডলার প্রিমিয়ার দিয়ে কভারেজ নিতে হবে। আমরা অনুরোধ করতে লাগলাম যাতে অঙ্কটা কমানো যায়। ভদ্রমহিলা কিছুতেই রাজি নন। কিন্তু তাঁর মুখ থেকে হাসি নিবছিল না। এত বিনয়ী অথচ কঠোর ব্যবসায়ী আমি খুব কম দেখেছি। যেন, আপনার মেয়েকে খুব পছন্দ হয়েছে, আমার পুত্রবধূ করে নিয়ে যাবই, নগদ এক পয়সাও চাই না শুধু ওই পঞ্চাশ ভরি সোনার এক রত্তি কম দিতে পারবেন না।

শেষপর্যন্ত হয়তো দিয়েই দিতাম। ঘড়িতে তখন আড়াইটে বাজে। এখনই কাগজপত্র নিয়ে ওয়াল্টারের কাছে পৌঁছে সইসাবুদ করে শুটিং স্পটে ফিরলে দিনের আলো পাব কিনা সন্দেহ। এইসময় একটা টেলিফোন এল। মিসেস স্কট বললেন, 'ফ্রান কথা বলতে চাইছে তোমাদের সঙ্গে।'

অরিজিত টেলিফোন ধরল, 'হ্যালো। হ্যাঁ। না, এখনও হয়নি। এক হাজার। ও। কী নাম বললে? দাঁড়াও, লিখে নিই।' অরিজিতকে কিছু লিখতে দেখলাম। তারপর ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে বলল, 'মিসেস স্কট, আমাদের পক্ষে অঙ্কটা বেশ বেশি হয়ে যাচ্ছে। যদি প্রয়োজন হয় পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

লক্ষ করেছিলাম, আমরা পৌঁছোনোর আগেই মিসেস স্কট আমাদের জন্যে একটা ফাইল তৈরি

করে ফেলেছিলেন। এত দ্রুত কাজ কলকাতায় হয় না।

বাইরে বেরিয়ে এসে অরিজিত বলল,'তাড়াতাড়ি ছোট, ম্যাডিসন স্কোয়ারে যেতে হবে।'

'ওখানে কী ব্যাপার?'

'ফ্রান বলল দুশো ষাট ম্যাডিসন স্কোয়ারে ট্রেলর কোম্পানির সঙ্গে সে এর মধ্যে কথা বলেছে। ওরা এর চেয়ে কমে করে দেবে।'

ওয়াল স্ট্রিট থেকে ম্যাডিসন স্কোয়ার কত দূর জানা নেই। টেলর অ্যান্ড টেলর বন্ধ হয়ে যাবে চারটের সময়। সেখান থেকে ওয়ান্টারের দোকানে যেতে হবে ছুটি হয়ে যাওয়ার আগে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম আমাদের যেতে হবে থার্টি ফোর্থ স্ট্রিটের কাছে। টিউব বা বাস না ধরে আমরা প্রথমবার ট্যাক্সি নিলাম প্রশস্ত এবং আরামদায়ক আসনে বসেও অস্বস্তি। টপাটপ মিটার পালটে যাচ্ছে। নির্দিষ্ট ঠিকানায় নেমে টিপস সমেত পনেরো ডলার ড্রাইভারের হাতে দিতে হল। কলকাতায় হলে পনেরো টাকার বেশি মিটারে উঠত না। আমাদের পক্ষে ওদেশে ট্যাক্সিতে চড়া বিলাসিতা বললে কম বলা হয়।

লিফটে চেপে দুশো যাট ম্যাডিসন স্কোয়ারের পাঁচতলায় উঠে টেলর অ্যান্ড টেলর কোম্পানির রিসেপশনে পৌঁছে গেলাম। যিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন তাঁর নাম বোরিস পিসম্যান। খবর দেওয়া হল। সুন্দর সাজানো অফিসঘর। একটু বাদেই এক সুদর্শন যুবক বেরিয়ে এলেন, 'আমি বোরিস, আমার সঙ্গে কারও দরকার আছে?'

আমরা এগিয়ে যেতেই তিনি করমর্দন করে ভেতরে নিয়ে গেলেন। এই মানুষটি শব্দগুলো উচ্চারণ করলেন এত স্পষ্টভাবে যে ওঁকে মার্কিন বলে ভাবতে পারছিলাম না। নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বোরিস জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলুন, কী করতে পারি?' আমি নিঃসন্দেহ হলাম, লোকটি বিদেশিদের মতো ইংরেজি বলেন।

আমরা সমস্যার কথা বললাম। উনি কিছু কাগজপত্র দেখলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, তিন সপ্তাহের জন্যে দেড়শো ডলার কি আপনাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব?'

তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়লাম, খুবই সম্ভব। এর পরের দশ মিনিট গেল কাগজপত্র তৈরি এবং ডলার নেওয়াতে। শেষ পর্যন্ত দু-কপি ইনসিওরেন্সপেইড কাগজ আমাদের হাতে তুলে দিয়ে বোরিস বললেন, 'আগামী এক মাস এইসব যন্ত্রপাতির ব্যাপারে আপনারা নিরাপদ। যদি মনে করেন টোকিয়োয় কিংবা কলকাতায় ওগুলো ওই সময়ের মধ্যে শুটিং-এর জন্যে নিয়ে যাবেন তাও নিতে পারেন। ক্ষতিপূরণের দায় আমাদের।'

এ প্রশ্ন যদিও ওঠেই না কিন্তু আমরা কোনও কূল পাচ্ছিলাম না। তিন সপ্তাহের জন্যে যেখানে এক হাজার চাইছিলেন এক এজেন্ট সেখানে এক মাসের জন্যে বিশ্বব্যাপী কভারেজ পাওয়া যাচ্ছে মাত্র দেড়শোতে? বোরিসকে সরাসরি ব্যাপারটা জানালাম। কাঁধ নাচিয়ে মিষ্টি হাসলেন, 'অন্যের সমস্যা আমি কী করে জানব বলুন? আমার কোম্পানির আইনমাফিক আমি যেটা করেছি সেটাই ঠিক। আশা করি বিদেশে এসে আপনাদের কাজ ভালোভাবে হবে।'

এবার অরিজিত ওঁকে আর একটি অনুরোধ করল। ইতিমধ্যে আমরা জেনে গেছি আটলান্টিক সিটি, ম্যানহাটনের কিছু অংশে শুটিং করতে হলে সেই জায়গার নামে ইনসিওরেন্স করা আছে কি না পুলিশ জানতে চাইবে। এ বাবদ যে ঢালাও দর আছে তা দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। বোরিস জানালেন আমরা যদি আগামীকাল ওঁর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করি তাহলে জানিয়ে দেবেন কমপক্ষে কত ডলার দিলে কাজটা হবে। বোরিস নিজের পরিচয় জানালেন, তিনি জন্মসূত্রে রাশিয়ান। আমেরিকায় আছেন দীর্ঘকাল। এখন আমেরিকার নাগরিক। ওঁর ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ।

সময় বেশি ছিল না হাতে। আমরা আবার ট্যাক্সি নিলাম। সাড়ে আটশো যেখানে বাঁচছে সেখানে পনেরো কুড়ি ডলার খরচ করা যেতে পারে এবং দোকান বন্ধ হওয়ার আগে ওয়ান্টারের

কাছে পৌঁছনোটা খুব জরুরি।

তবু সময় রাখা যায়নি। আমাদের ভ্যান বাইরে দাঁড়িয়ে, দোকানে সদর দরজা বন্ধ। কামাল জানাল ওয়াল্টার তাঁর অফিসে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন, বাইরে দিয়ে একটু ঘুরে সেখানে পৌঁছতে হবে। পাড়াটা ইতিমধ্যে নিঝুম হয়ে এসেছে যদিও দিনের আলো রয়েছে চমৎকার।

আমাদের দেখে ওয়াল্টার হাসলেন, 'পেয়ে গেছ? দাও। তোমাদের কপাল খুব ভালো। আচ্ছা, তোমাদের কোনও কার্ড আছে? মানে, কোনও সংস্থা থেকে পরিচয়ের স্বীকৃতি জানানো কার্ড?' অরিজিতের কাছে কলকাতার ওইরকম একটি কার্ড ছিল। হাত বাড়িয়ে সেটি নিয়ে জেরক্স মেশিনে ঢুকিয়ে ওয়াল্টার বললেন, 'মালপত্র সবই তো ভ্যানে তোলা হয়ে গেছে। ভালোভাবে শুটিং করো। সমস্যা হলে আমায় জানিও। ইউনিয়ন আর কোনও ঝামেলা করবে না। ব্যাটাদের খুব ধমকেছি।'

হঠাৎ ফ্রান জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছ, সকাল থেকে তো তোমরা উত্তেজিত হয়ে ঘুরছ, কিছু খাওয়াদাওয়া কি হয়েছে?'

চট করে ভদ্রমহিলাকে দেখে নিলাম। মোটাসোটা এই মহিলাই বোরিসের সন্ধান দিয়েছেন আমাদের। বললাম, 'একদিনের খাওয়ার চেয়ে হাজার গুণ জরুরি ছিল এই কাজটা। কিন্তু ম্যাডাম, তুমি বললে বলে মনে হচ্ছে আমরা বিদেশে নেই।'

ফ্রান তখনই উদ্যোগ নিচ্ছিল আমাদের কফি খাওয়াতে। বিনীতভাবে তাঁকে থামালাম। আমাদের এখনই টেরি টাউনে ফিরতে হবে। শরৎচন্দ্র আবার প্রমাণ করলেন মহিলারা পৃথিবীর যে দেশেই জন্মান না কেন তাঁরা মাতৃভাব ছেঁটে ফেলতে পারবেন না।

তখন সূর্যদেব মাটি থেকে আলো তুলে নিয়ে গাছের মাথায় বাড়ির দেওয়ালে রেখেছেন সামান্য সময়ের জন্যে। অফিস ছুটির পর গাড়ির দঙ্গল ছুটছে শহরের বাইরে যাওয়ার জন্যে। কলকাতায় যাকে আমরা জ্যামজট বলি প্রায় সেইরকম অবস্থা। একটাই পার্থক্য, গাড়িগুলো শামুকের গতিতে এগোচ্ছে। তাড়াহুড়ো করেও কামাল কোনও কাজের কাজ করতে পারছিল না। কিন্তু তার জেদ ছিল অন্ধকার নামার আগেই টেরিটাউনে পৌঁছাবেই। দূরত্বটা যথেষ্ট যদিও।

নিউ ইয়র্কের রাস্তায় পদে-পদে পুলিশ। তাদের লাল চোখ সর্বত্র। একটু নিয়ম ভেঙেছ কি গিয়েছ। আমি গা এলিয়ে বসেছিলাম। আজ আর শুটিং করার কোনও সম্ভাবনা আছে বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু না হোক, মনে এখন চমৎকার শান্তি। শেষ পর্যন্ত এইসব সরঞ্জাম পেয়ে গেছি। ওয়াল্টার এবং বোরিসের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়াটা যখন কপালে ছিল তখন একদিন নষ্ট হলেও শুটিং শেষ পর্যন্ত ভালোভাবেই শেষ হবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছিল। হঠাৎ কামাল রাস্তা ছেড়ে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারপর সে যে কাণ্ডটা করল তা আমরা কলকাতায় করে থাকি। বড় রাস্তার জ্যাম এড়াতে কলকাতার সরু গলিগুলো অনেকখানি এগিয়ে দেয়। সে সেইভাবে চলল। হয়তো রাস্তা একটু বাড়ল কিন্তু সেইসঙ্গে এল গতিও। দু-দুবার পুলিশের লালচোখ এড়াল সে। তারপর আবার হাডসনের পাশের রাস্তায় পড়ে প্রায় উল্কার গতিতে ছুটে চলল। এইসব রাস্তায় গাড়ির গতি নির্দিষ্ট করা আছে। কিন্তু কামাল তা মানছে না। তাকে সতর্ক করতেই বলল, 'আরে দাঁড়াও না, মামুরা টের পাবে না।' হঠাৎ-হঠাৎ সে গতি কমাচ্ছিল এবং আমরা তখনই পুলিশের দেখা পাচ্ছিলাম। নিউ ইয়র্ক শহরকে ভালো না জানলে কেউ এরকম লুকোচুরি খেলতে পারে না। শেষ পর্যন্ত আমরা যখন টেরিটাউনে পৌঁছলাম তখন সূর্যদেব অদৃশ্য কিন্তু টেরিটাউনে মায়াময় এক আলো ছড়ানো। জায়গাটা সামান্য পাহাড়ি ধরনের। রমাপ্রসাদের দিদির বাড়ি একটু উঁচুতে। সেই বাড়ির সামনের লনে বসে ইউনিটের সবাই গল্প করছিল। আমাদের দেখে সাড়া পড়ে গেল।

গাড়ি থেকে নেমে কামাল চিৎকার করল : 'তোমরা নিশ্চয়ই লাঞ্চ করেছ? গুড। আমরা

আজ সারাদিন কিছু খাইনি। কিন্তু তাতে কোনও পরোয়া নেই। আজ অন্তত পাঁচ মিনিটের জন্যে কাজ করে ফেললে মন ভালো হয়ে যাবে।'

এ কথা আমারও। কিন্তু আমি ভাবছিলাম কামালের কথা। এরই মধ্যে প্রোডাকসন্সকে নিজের মনে করে নেওয়াটা কম কথা নয়।

বিবেক এবং রমাপ্রসাদ আলোচনা করল। এই আলো বেশিক্ষণ থাকবে না। ঝুপ করে অন্ধকার নামার আগে একটা ছোট্ট দৃশ্য নেওয়া যেতে পারে। আলোর সরঞ্জাম এনেছি কিন্তু এই বাড়ির ইলেকট্রিক কারেন্ট নিয়ে পরীক্ষার জন্যে সময় দিতে হবে বলেই আজ ঘরের মধ্যে কাজ করতে চাইল না ওরা। শিল্পীদের তিনজনেরই মেকআপ নেওয়া ছিল। একবার রিহার্সালের পর সবাই প্রস্তুত হল। দৃশ্যটি হল—প্রলয় ঘোষ বাল্টিমোর থেকে স্ত্রীকে নিয়ে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরছে। প্রলয়ের বয়স পঞ্চান্ন, স্ত্রীর পঁয়তাল্লিশ। নিজেদের বাড়ির লনের সামনের রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করাতেই ওপরের ঘরর দরজা খুলে গেল। পিংকি বেরিয়ে এসে তার মাকে হাত নাড়ল। মিসেস' ঘোষ ততক্ষণ গাড়ি থেকে নেমেছেন। পিংকি বাইরে বেরুবার পোশাকে তরতর করে নেমে এসেছে নীচে। প্রলয় গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল, 'কোথায় যাচ্ছ?' পিংকি সঙ্গে-সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেল, 'তিমি দেখতে।'

দৃশ্যটি শিল্পীদের দিয়ে এর আগেই রিহার্সাল করিয়ে রেখেছিল রমাপ্রসাদ। আগে প্রলয় এবং তার গাড়ি থামা এবং সেই অ্যাঙ্গেলের শটগুলো নেওয়া হবে। জয়ন্তী খুব উত্তেজিত। আমায় প্রণাম করে বলল, 'সমরেশদা, এত নার্ভাস লাগছে?'

বললাম, 'তুমি যা তাই করো। মনোজের মুখটা মনে আনো। ও চেয়েছিল তুমিই পিংকি করবে। তোমার বাবা এতদিন আমেরিকায় থেকেও মধ্যবিত্ত বাঙালির গোঁড়ামি আঁকড়ে আছেন। তুমি সেটাকে খুব অপছন্দ করো। এইটুকু মনে রেখে সংলাপ বলবে।'

দীপংকর এবং শকুন্তলার কোনও অসুবিধে হল না। হাততালির শব্দ বাজল প্রথম শট ও.কে. হওয়া মাত্র। দীপংকর এগিয়ে এসে বলল, 'তাহলে আমেরিকাতেও শুটিং করছি। তোমরা আসছ না দেখে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কামালের টেলিফোন পেয়ে ব্যাপারটা জানতে পারলাম। যাক, আমি ঠিক আছি তো?'

কাঁচাপাকা চুলের দীপংকরকে বললাম, 'একদম ঠিক।'

আলো যাওয়ার আগেই জয়ন্তীর দৃশ্য তোলা হল। মেয়েটার ভাবভঙ্গি চরিত্রের সঙ্গে চমৎকার মিলে যাচ্ছে। আমেরিকায় থাকার অভ্যাসটা খুব কাজে লেগে গেল ওর। বড় শিল্পীদের সঙ্গে অভিনয় করার সময় নতুনদের যে জড়তা আসে তা ওর ছিল না। কারণ দীপংকরদের প্রায় কোনও ছবিই সে দেখেনি ওয়াশিংটনে। এবার যখন ক্যামেরা জায়গা পরিবর্তন করে একসঙ্গে ওদের ধরল এবং দীপংকরের প্রশ্নের জবাবে জয়ন্তী যেভাবে বলল, তিমি দেখতে, তখনই বুঝে গেলাম, ওর সম্পর্কে আর কোনও ভয় নেই। মেয়েটি শেষ পর্যন্ত চমৎকার পাল্লা দিয়ে গিয়েছে।

রমাপ্রসাদের দিদি ঠান্ডা প্রকৃতির মানুষ। প্রথমদিন থেকেই তাঁর সাজানো বাড়ি আমরা লণ্ডভণ্ড করেছি কিন্তু ওঁর মুখের হাসি নেবেনি। এই একই ব্যাপার দেখেছি সিদ্ধার্থর স্ত্রী বনানীর ব্যবহারেও। আগেরবার লোকেশন দেখতে আসার সময় বলেছিলেন, 'সমরেশদা, আপনারা কিন্তু আমার গেস্ট হয়ে থাকবেন।' এতগুলো মানুষকে এক বাড়িতে রাখা অসম্ভব বলে মোটেল নিয়েছি। কিন্তু বনানী তাঁর কথা থেকে সরেননি, 'এতগুলো মানুষ সারাদিন কাজের পর একটু ঝোলভাত খেতে পাবে না, তা কি হয়? আমি রান্না করে রাখব, আপনারা কাজ শেষ করে এখানে খেয়ে তারপর মোটেলে ফিরবেন। মোটেলে থাকতে হচ্ছে আপনাদের এটাই আমার লজ্জা।'

আমরা মেনে নিয়েছিলাম। সিদ্ধার্থ এবং বনানী তাঁদের সমস্ত প্রাইভেসি বিসর্জন দিয়ে আমাদের একটু আরামে রাখার জন্যে যে পরিশ্রম করেছেন তা কলকাতায় বসে আমরা কখনই করতাম না। ভদ্রমহিলা ভোর পাঁচটায় উঠে চা বানাতেন। আমাদের ইউনিটের যাঁরা ওই বাড়িতে ছিলেন তাঁদের

ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করে স্বামী মেয়েকে সামলে অফিসে যেতেন। অফিসে পৌঁছেই আঘণ্টা অন্তর টেলিফোন করে জিজ্ঞাসা করতেন কারও কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না। বিকেলে বাড়ি ফিরে রান্না শুরু করতেন পুরো ইউনিটের জন্যে। কোনওদিনই রাত বারোটার আগে নিজের ঘরে ঢুকতে পারেননি। অবশ্য আমাদের ইউনিটের শংকর তাঁকে সাহায্য করত। ওখানকার রান্নাঘরের আধুনিক ব্যবস্থায় শংকর যেভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল তা দেখে যীশু ঠাট্টা করে বলত, 'নিয়ে এলেন ভারত থেকে প্রোডাকশন ম্যানেজার আমেরিকা তাকে রাঁধুনি বানিয়ে দিল!' ঠিকই, কিন্তু শংকরের ওই ভূমিকা ছাড়া ইউনিটকে সচল রাখা মুশকিল হত।

টেরি টাউন থেকে সিদ্ধার্থর বাড়িতে ফিরে এসে সবাই উৎসবের মেজাজে ছিল। ইতিমধ্যে যীশু, কিশোর জেনে গেছে ক্রোস্টারের কোথায় কি পাওয়া যায়। কে মার্টসে ঢুকে স্বচ্ছন্দে জিনিস কিনে আনছে তারা। সিদ্ধার্থর স্বভাব হল সবাইকে আপ্যায়ন করা। ডিনারের আগে পানীয় বিতরণ তার মধ্যে একটি। নিষেধ করলেও শুনত না। তাই সেখানে পৌঁছোনোর মিনিট দশেকের মধ্যেই ডিনার প্যাক করে শংকর ভ্যানে তুলে দিত। কামাল সেই সময় বসে থাকত টেলিফোন নিয়ে। বনানীর অনুরোধে আজ খাওয়াদাওয়া ওঁর বাড়িতেই হল। দীপংকর পানীয় কিনে আনল সিদ্ধার্থর নিষেধ সত্ত্বেও। মনোজদা কখনই মদ স্পর্শ করেননি আগে। সবার অনুরোধ এক গ্লাস সামনে নিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, এটা কি বিদেশি?'

দীপংকর অন্যমনস্ক হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এটা স্কচ!'

'তাহলে এখানেও বিদেশি! আমেরিকায় এসে আমেরিকান জিনিস খাওয়া উচিত।'

সিদ্ধার্থ বললেন, 'খেতে পারবেন না। খুব কড়া। তবে মশাই, অদ্ভুত লোক তো আপনি। এতদিন এখানে আছি কখনই মনে হয়নি স্কচ বিদেশি।'

মনোজদা বললেন, 'হেঁ-হেঁ, আপনার মনে পাপ নেই তাই মনে হয়নি।'

মনোজদা যখন চুমুক দিচ্ছিলেন তখন সেটা দেখার মতো দৃশ্য ছিল। বেশ কয়েক বছর আগে, সমরেশ বসু, সুনীলদা, শীর্ষেন্দুদা, বুদ্ধদেব গুহ, সঞ্জীব এবং আমি ভুটানের কাছে এক চা-বাগানে গিয়েছিলাম। সমরেশদার জন্মদিন বলে মধ্যরাত্রে শ্যাম্পেনের ব্যবস্থা করেছিলেন নাডু রায়। মনোজদাও দলে ছিলেন এবং সমরেশদার অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁকে পান করানো যায়নি। সে কথা মনে করিয়ে দিতে মনোজদা বললেন, 'বাবা বাড়ি থেকে বেরুবার সময় বললেন, বিদেশে সব নিয়ম মানা হয়তো সম্ভব হবে না তবে আর পাঁচজনে যা করবে তুমিও তাই করতে পারো।' এক গ্লাসেই ডিনার অবধি থেকে ফুরফুরে গলায় বলেছিলেন, 'পৃথিবীতে কতরকম বিস্ময় আছে, না? আমরা তার তুলনায় কী ক্ষুদ্র! একটা গান হোক, বিবেকানন্দের গান।'

পরের দিন ভোর ছ'টায় বেরুতে হবে। আটটা থেকে শুটিং। মোটেলে ফিরে এসে সবাইকে শুয়ে পড়তে বললাম। কামাল ঘরে-ঘরে বলে এল আজ রাত্রে টিভির ঘুম ভাঙানোর গান যেন কেউ না শোনে। আলো নিবিয়ে শোওয়ামাত্র টেলিফোন বাজল। কামাল উঠল। ভাবলাম সিদ্ধার্থর বাড়ি থেকে কেউ করেছে। একটাই চিন্তা, সুদীপ্তর সেই কাস্টিং ডিরেক্টার এখনও কারও হদিস দেয়নি। রিসিভার তুলে কামাল বলল, 'ও তুমি। বল।'

অর্থাৎ কানাডা থেকে নীনার ফোন। প্রথমদিকে ওর গলা স্বাভাবিক ছিল বলে ঘুম আসছিল অনায়াসে। হঠাৎ কামালের গলা বেশ উঁচুতে উঠল, 'অসম্ভব। তোমার কথা সবসময় শুনব তা তুমি আশা করতে পারো না। বিয়ের সময় আমি স্পষ্ট বলেছি আমার কাজে তুমি ইন্টারফেয়ার করবে না। না না, মিথ্যে কথা আমি অপছন্দ করি।' ঘুম চলে গেল। এ তো দেখছি দাম্পত্যকলহ এবং লং ডিসটেন্স বলে সেটি বেশ মূল্যবান। কামাল তখন বলছে, 'আমি সমরেশকে কথা দিয়েছি তাই

থাকব। আমাদের শুটিং আজ শুরু হয়েছে। কীভাবে কত ঝামেলার মধ্যে দিয়ে যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়েছে তুমি জানো? আর এই অবস্থায় আমি কানাডায় ফিরে যেতে পারি?' শুনে আমি শঙ্কিত। একী কাণ্ড। নীনা ওকে ফিরে যেতে বলছে না কি? আমরা তো একেবারে জলে পড়ে যাব তাহলে। কামাল বলল, 'নীনা, তুমি আমার স্বর্গ, আমাকে বুঝতে চেষ্টা করো, আচ্ছা, তুমি চলে এসো, এখানে। আমাদের বিরাট দল, সবার সঙ্গে আলাপ হবে। খুব ভালো ছেলে এরা। তোমার সময় শুটিং দেখে আরামে কেটে যাবে। আসছ? গুড। কবে আসবে? পরশু? কাল ফোন করে জানিয়ে দিও।' চুপচাপ নিশ্বাস ফেললাম। যাক, বাঁচা গেল। কামালকে তাহলে ফিরে যেতে হচ্ছে না।

ভোর পাঁচটায় ঘুম ভাঙতেই দেখলাম মদনসুদনজি আমাদের ঘরে চুল আঁচড়াচ্ছেন। কামাল বাথরুমে। নিতাই ঘুমাচ্ছে। আমায় উঠতে দেখে মদনসুদনজি হাসল, 'আজ রাত্রে আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম।'

কোনও বয়স্ক মানুষ যখন স্বপ্ন দেখেন তখন তার বিষয় সাধারণত দুঃখজনকই হয়। কিন্তু মদনসুদনজি বললেন, 'মনে হল, কেউ যেন আমাদের ঘরে এসে ইংরেজিতে কিছু চাইছে। খুব মিষ্টি গন্ধ বের হচ্ছিল তার শরীর থেকে।'

নিতাই চোখ খুলেছিল, বলল, 'স্বপ্নে আপনি গন্ধ পর্যন্ত পেয়ে গেলেন?'

'জি হ্যাঁ। কিন্তু মেয়েটার মুখ দেখাই হয়নি।' মদনসুদনজি কথা শেষ হওয়ামাত্র যীশু ঘরে ঢুকল। এই ভোরেও খাটো প্যান্ট আর গেঞ্জি পরনে, 'বাথরুম এখানেও ফুল! মাইরি সমরেশদা, আর এখানে বেশি রাত করব না। উলটাপালটা স্বপ্ন দেখছি।'

নিতাই উঠে বসল, 'তুমিও স্বপ্ন দেখেছ?'

'হ্যাঁ, ভোর বেলায় মনে হল একটি মেয়ে ফিসফিস করে কথা বলছে। খুব কাতর গলায় অনুরোধ করছে। মেয়েদের ওই গলা শুনলে মনটা কীরকম হয়ে যায়!'

'মেয়েটাকে কীরকম দেখতে?'

'মুখ দেখার কথা মনে ছিল না।'

'তোদের বাথরুমে এখন কে ঢুকেছে?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'বিবেক। মিনিমাম আধঘণ্টা। একটু আগে রমাপ্রসাদ বের হল।' প্রায় নাটকীয় ভঙ্গিতে রমাপ্রসাদের প্রবেশ হল, 'সময় নষ্ট কোরো না। তৈরি হও।'

যীশু বলল, 'বাথরুম দাও। নিজে তো সাত তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছ!'

'ইচ্ছে করে উঠেছি নাকি? হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। চোখ বন্ধ করে শুনলাম একটি মেয়ে খুব করুণ গলায় বলছে গিভ মি থার্টি ডলারস। স্বপ্ন ভেবে চোখ বন্ধ করেই ছিলাম হঠাৎ কী মনে হতে চোখ খুলতে দেখি বিবেকদা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে একা পাথরের মতো।' রমাপ্রসাদ জানাল।

সঙ্গে-সঙ্গে মদনসুদনজি বললেন, 'আরে, মেরা স্বপ্ন আপ দেখা?'

এইসময় কামাল বাথরুম থেকে বের হল। তিনটে মানুষ একই ঘরে শুয়ে প্রায় একরকম স্বপ্ন ভোরবেলায় দেখতে পারে? কামালের সঙ্গে অনেক দেশের মনস্তাত্ত্বিকের আলাপ আছে। মাঝে-মাঝে তাঁদের সামনে হাজির হয় সে। শুনে বলল, 'দূর। নিশ্চয়ই ওদের ঘরে কোনও মেয়ে এসেছিল। না এলে তিনজনে প্ল্যান করে গুল মারছে।'

পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে বিবেকের দেখা পেলাম। তাজা কিন্তু একটু যেন কীরকম! সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভোরে স্বপ্ন দেখেছ?' প্রশ্ন করার সময়েও জানতাম কেউ আসতে পারে না। এদের সঙ্গে এমন কোনও নারীর ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয়নি যে ভোররাত্রে মোটেলের ঘরে আসবে।

কিন্তু-কিন্তু করা বিবেক বলল,'স্বপ্ন নয়, বাস্তব। কঠিন বাস্তব। আমার বিশ ডলার হাওয়া হয়ে গেল। কীরকম বোকার মতো নোটটা দিয়ে দিলাম। ইস, হাত কামড়াচ্ছি এখন।'

আমরা নড়েচড়ে বসলাম। বিবেক জানাল দরজা ধাক্কানোর শব্দে তার ঘুম ভাঙে। বাকি তিনজন তখনও গভীর ঘুমে। বাইরে থেকে কেউ কিছু বলছে শুনে দরজা খোলে সে। সঙ্গে-সঙ্গে নীচের সেই মেয়েটি হুড়মুড়িয়ে ভেতরে চলে এসে বলে, 'হেল্প মি, প্লিজ, হেল্প মি।' তার মা নাকি প্রচণ্ড অসুস্থ। দেখতে যেতে হবে। বিবেক যদি এখনই একশো ডলার ধার দেয় তাহলে সন্ধেবেলায় সে অবশ্যই শোধ করে দেবে। মেয়েটি এমন কাতর হয়ে উঠেছিল সে বিবেক তাকে একটি কুড়ি ডলারের নোট দেয়। পাওয়া মাত্রই মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে যে বিবেকের চিন্তা করার সময় ছিল না। মেয়েটি বলে গেছে আজ সন্ধেবেলায় অবশ্যই সে ডলার শোধ করার জন্যে অপেক্ষা করবে। বাকি তিনজনের স্বপ্ন দেখার রহস্য এখন পরিষ্কার হল। শুটিং-এ বেরুবার সময় আমরা ম্যানেজারকে এ ব্যাপারে নালিশ জানিয়ে গেলাম।

টেরি টাউনে রমাপ্রসাদের দিদির বাড়ির সামনে ক্যামেরা বসিয়ে যখন দিনের প্রথম শটটি নেওয়া হচ্ছে তখন হঠাৎ পাশের বাড়িতে বার্গলার এলার্ম বেজে উঠল। টানা, পাড়া চমকে দেওয়া কুঁই কুঁই শব্দ। রমাপ্রসাদের দিদি চিৎকার করে বললেন, 'তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে আসুন, এখনই পুলিশ আসবে।'

॥ ১৬ ॥

ব্যাপারটা ঠিক বুঝে ওঠার আগেই রমাপ্রসাদের দিদি আবার অনুরোধ করলেন রিফ্লেক্টার ক্যামেরা সরিয়ে ফেলতে। একটানা অ্যালার্ম তখনও বেজে যাচ্ছিল। অদ্ভুত অস্বস্তিকর শব্দ। এবং তারপরেই মাথায় ঘূর্ণি আলো জ্বেলে পুলিশের দুটো গাড়িকে এদিকে ছুটে আসতে দেখলাম। লালু কিশোররা ততক্ষণে রাস্তা থেকে আমাদের শুটিং-এর সরঞ্জাম সরিয়েছে। পুলিশের গাড়ি দুটো সামনের বাড়ির দরজায় থামল। দুজন পুলিশ অফিসার আমেরিকান ছবির কায়দায় গাড়ি থেকে নেমে যেদিক থেকে অ্যালার্মের আওয়াজ ভেসে আসছিল সেদিকে এগিয়ে গেলেন। এইসময় রমাপ্রসাদের জামাইবাবু বেরিয়ে এলেন বাড়ির ভেতর থেকে। পেশায় ডাক্তার এই ভদ্রলোকের সঙ্গে এখনও আমাদের আলাপ জমার সুযোগ হয়নি। তিনি ইংরেজিতে বললেন, 'আরে! আপনারা কাজ বন্ধ রেখেছেন কেন? ও অনর্থক ভয় পেয়ে আপনাদের সতর্ক করেছে। আপনারা যতক্ষণ অন্যায় না করছেন ততক্ষণ ভয়ের কোনও কারণ নেই।'

এই সময় অ্যালার্ম বন্ধ হল। পুলিশ অফিসাররা একটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। চারপাশে তাকালেন। একজন এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে, 'কী হচ্ছে এখানে?' ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন, 'এঁরা শুটিং করছেন। কী হয়েছিল? চোর-টোর এসেছিল নাকি?'

কাঁধ ঝাঁকালেন অফিসার, 'নাঃ। একটা জানলা হঠাৎ খুলে গিয়েছিল। তা শুটিংটা কীসের? কার বাড়ি এটা?'

'বাড়িটা আমার। শুটিং একটা হোম ভিডিয়োর।'

'হোম ভিডিও? তার জন্যে এত সরঞ্জাম!'

'এরা সঠিক ছবি চান।'

আবার কাঁধ নাচালেন ভদ্রলোক। তারপর নিজের গাড়িতে ফিরে গেলেন। দুটো গাড়ি নীচে নেমে যেতেই আমাদের স্বস্তি ফিরে এল। কাজ আরম্ভ হল। শুধু দীপংকর বলল, 'কলকাতায় এমন অ্যালার্ম বাজলে পাড়ার ছেলেরা ছুটে আসবে, পুলিশের দেখা পাওয়া যাবে না।'

মনোজদা বললেন, 'সল্টলেক অবশ্য কলকাতার মধ্যে পড়ে না।'

'মানে?'

'সেখানে তথাকথিত পাড়ার ছেলে নেই, পুলিশ নেই। জিলা চব্বিশ পরগনা তো! ব্যাপারটা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল!'

শুটিং-এর মধ্যে ডুবে গেল সবাই। কাজ নেই আমার আর কামালের। এই তল্লাটে থাকলে কথাও বলা যাবে না। সাইলেন্স প্লিজের ধমকে মাঝে মাঝেই পাড়া কাঁপাচ্ছে রমাপ্রসাদ। ভয় হচ্ছিল তাতে না পুলিশ এসে হাজির হয়। টেরি টাউনে শুটিং করতে ইনসিওরেন্স লাগে কি না খোঁজ করিনি। কলকাতায় কোনও বাড়ির ব্যক্তিগত মিটার থেকে কারেন্ট নিয়ে শুটিং করা আইনসঙ্গত নয়। এখানেও সেই ব্যবস্থা চালু আছে কি না জানা নেই। অতএব পুলিশ যত দূরে থাকে তত মঙ্গল। কিন্তু কাজে ডুবে গেলে রমাপ্রসাদের বাস্তবজ্ঞান ফিরিয়ে আনা খুব মুশকিল। এখানে একটা কথা বলা দরকার। সিরিয়ালের ভাষা হল হিন্দি। দীপংকর এবং শকুন্তলা হিন্দিতে অভ্যস্ত হলেও জয়ন্তীর কাছে সেটা নতুন ভাষা। মাঝে-মাঝে কলকাতায় গেলে হিন্দি শব্দ কানে এসেছিল বটে কিন্তু ওয়াশিংটনে হিন্দি বলার কোনও প্রয়োজন হয় না তার। মদনসুদনজি তাকে যত হিন্দি বলা অভ্যাস করান না কেন সে গোলমালে পড়ে যাচ্ছে ক্যামেরার সামনে এসে। বাঁ হাতের মুঠোয় কাগজে লেখা পরের সংলাপ ধরে রাখছে বেচারা। সুযোগ পেলেই বাংলায় লেখা হিন্দি শব্দ ঝালিয়ে নিচ্ছে। অবশ্য পিংকির হিন্দি সংলাপ খুবই কম। আমেরিকায় বড় হয়ে ওঠা কোনও মেয়ে স্বাভাবিকভাবেই বাড়িতে সিকি ভাগ মাতৃভাষা বলে। ইংরেজি বলার সময় জয়ন্তীকে মনে হচ্ছে মনের কথা বলছে।

আমি আর কামাল বাড়ির বাইরে ভ্যানে বসেছিলাম। শংকর এসে বলল, 'সমরেশদা, লাঞ্চের ব্যবস্থা কী হবে?'

কামাল বলল, 'এ নিয়ে তোমায় চিন্তা করতে হবে না।'

শংকর রেগে গেল, 'এতদিন এটাই আমি করেছি।'

কামাল বলল, 'যাও। বাজার থেকে খাবার কিনে নিয়ে এসো।'

'বাজারটা কোথায়?'

'মাইল দুয়েক দূরে।'

'কীসে যাব?'

'সেই জন্যে বললাম ফিরে যাও ভেতরে, ওদের চা কফি দাও।'

শংকর একটু ক্ষুণ্ণ হলেও কিছু না বলে ফিরে গেল। যে ছেলে কলকাতায় শুটিং হলে আমাদের চিন্তা করতে দেয় না সে এখানে কি অসহায়। ভ্যান চালিয়ে কামাল আমাকে নিয়ে চলে এল জমজমাট এলাকায়। এসে জিজ্ঞাসা করল, 'ফ্রায়েড রাইস আর মুরগিভাজা লাঞ্চ হিসেবে কীরকম হবে?'

'দারুণ। কিন্তু আমার বাজেট মাথাপিছু সাড়ে তিন ডলার।'

'দেখা যাক।' কামাল একটা চিনে দোকানে ঢুকল। বেশ বড় দোকান। একটি চিনে তরুণী কাউন্টারে দাঁড়িয়ে। কামাল তাকে অর্ডার দিতে সে জানাল মিনিট পনেরোর মধ্যে ডেলিভারি দিতে পারবে। এরপরে কামালের সঙ্গে তার শুরু হল দরকষাকষি। যেভাবে নিউ মার্কেটে মেয়েরা ব্যাগের দাম কমান কামাল ঠিক সেই ফরমুলায় বিতর্ক চালাল। এখন পর্যন্ত কলকাতার কোনও রেস্টুরেন্টে আমি কাউকে দরাদরি করতে শুনিনি। মেয়েটি বলেছিল প্রতি প্লেট পাঁচ ডলার পড়বে। কামাল প্লেটের সংখ্যা এবং অনেকগুলো দিনের প্রয়োজনের কথা বলে তাকে শেষ পর্যন্ত তিন ডলারে নামাল। মেয়েটি অম্লানবদনে জানাল সে ক্যাশমেমো দিতে পারবে না। কামাল বলল সেটা গোল্লায় যাক।

আমেরিকায় ব্যবসায়ীরা সবাই সৎ তা আমি নিশ্চয়ই বলব না। এক নিউ ইয়র্ক শহরের বিভিন্ন অংশে একই জিনিসের বিভিন্ন রকম দাম আমি নিজে দেখেছি। কিন্তু এগুলো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস নয়। আলু রুটি বা দুধের দাম কোথাও কমবেশি নেই। কিন্তু ক্যাশমেমো ছাড়া জিনিস কম দামে দেওয়ার ব্যবস্থা চালু আছে দেখে অবাক হলাম। পুলিশ যদি জানতে পারে তাহলে আমাদেরও ধরবে। কামাল আমাকে আশ্বস্ত করল। যেহেতু খাবারের দোকান তাই স্টকের হিসেব নেই। তা

ছাড়া চিনারা বেশ দুঃসাহসী। এদের সঙ্গে খোদ আমেরিকানদের তুলনা করা ঠিক নয়।

সিদ্ধার্থর বাড়ি থেকে খাবার তুলে এনে রাত্রে যখন মোটেলে যে যার ঘরের ভেতর ঢুকছি তখন সাইরেন বাজিয়ে পুলিশের গাড়ি এল। এক দুই করে গোটা পাঁচেক। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছিলাম আমরা। কিছুক্ষণ বাদে পুলিশরা কয়েকটা ঘর সার্চ করে গাড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছিল। তাদের একজনের মুঠো সেই সুন্দরী মেয়েটির কবজি ধরা। মেয়েটি একটু বাধা দিচ্ছে না। তাকে তুলে নিয়ে পুলিশরা চলে গেলে গুজরাতি ম্যানেজারকে এদিকে আসতে দেখলাম। এক নম্বর ঘরের দরজায় তালা দিয়ে সে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসল।

নেমে এলাম নীচে, কী ব্যাপার?'

'ওকে ধরে নিয়ে গেল।'

'কেন?'

'বেশ্যাবৃত্তি করার অভিযোগে।'

'এর আগে ধরেনি?'

'প্রায়ই ধরে। দিন দশেক বাদে আবার ফিরেও আসে।' ম্যানেজার বলল, 'তবে আজ ওর সঙ্গে কাউকে পায়নি বলে কালই ছাড়া পাবে।'

'এরকম মেয়েকে মোটেলে রেখেছেন কেন?'

'কিছু করার নেই। ও সারা মাসের ভাড়া দেয়। এখানে থাকুক আর জেলে থাকুক। একেবারে পার্মানেন্ট বোর্ডার। যত দিন জেলে থাকে ততদিন আমাদের কোনও ঝামেলা নেই। যখন এখানে থাকে তখন খদ্দের বাড়ে।'

'কিন্তু আপনারা কি অন্যায়কে প্রশ্রয় দিচ্ছেন না?'

গুজরাঠি ভদ্রলোক হাসলেন, 'কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায় আজও বুঝলাম না। আমার হোটেলে ঘর ভাড়া নিয়ে এর বউ ওর স্বামীর সঙ্গে সারা দিন থাকছে। সেটা অন্যায় নয়? এদের মধ্যে বেশিরভাগ ভারতীয় আর বাংলাদেশি। তাহলে? এই মেয়েটা তো পেটের জন্যে করছে। কিন্তু ওর সঙ্গে কারও কখনও ঝামেলা হয়নি। ওকে তাড়াবার মতো কোনও অজুহাত আমি পাইনি।'

'আপনি মেয়েটিকে আমাদের এক সহকর্মীর কুড়ি ডলারের কথা বলেছেন?'

'বলেছিলাম। ও অস্বীকার করল। বলল, ওর মা মারা গিয়েছেন চার বছর আগে, মায়ের নাম করে সে ধার করতে যাবে কেন?'

'মেয়েটি মিথ্যেবাদী। ও ডলার নিয়েছে।'

'প্রমাণ না থাকলে আমি তো কিছুই করতে পারি না স্যার।'

আমরা যখন কথা বলছি তখন একটি মাঝবয়সি মহিলাকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। পরনে প্যান্ট ও গেঞ্জি। সামান্য স্থূলকায়া। মহিলা এসে ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এক নম্বর ঘরটার চাবি আজ রাত্রের জন্য পাওয়া যাবে? ও তো আগামী কালের আগে ফিরছে না।'

'কেন? কী দরকার?' ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করল।

'আমার বোন এসেছে দুটো বাচ্চাকে নিয়ে। ওরা শুতে পারত।'

'নতুন ঘর ভাড়া নিতে বলো তোমার বোনকে।'

মহিলা পত্রপাঠ ফিরে গেলেন। গুজরাতি ভদ্রলোক বললেন, 'দেখলেন তো মজা, পয়সা খরচ করতে কেউ রাজি নয়।'

'ইনি কে?'

'এই মোটেলের রুমকিপার। আপনারা বেরিয়ে গেলে ঘর পরিষ্কার, বিছানা ঠিক করা এর কাজ। চারবার বিয়ে হয়ে গেছে এর মধ্যে। আচ্ছা, সেটা তো অন্যায় নয়, তাই না?' গুজরাতি ভদ্রলোক হেসে ফিরে গেলেন ব্রিজের অফিসরুমের দিকে। ওপরে উঠে বিবেককে বললাম, 'সরি,

তুমি তোমার ডলার ফিরে পাওয়ার আশা ছেড়ে দাও। তিনি অস্বীকার করেছেন কিছু নিয়েছেন বলে।'

ঘরে ঢুকে দেখলাম কামাল টেলিফোনে কথা বলছে। কামাল এবং টেলিফোন এত স্বাভাবিক ছবি যে মাথা ঘামালাম না। রিসিভার নামিয়ে রেখে কামাল বলল, 'সমরেশ, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।'

'কী কাজ?'

'কাল রমাপ্রসাদ সবাইকে ন'টার মধ্যে টেরি টাউনে চায়। আমি ভ্যান চালিয়ে যাব সেখানে। তোমাকে এয়ারপোর্টে যেতে হবে।'

বুঝতে পারলাম নীনা আসছে। তাকে রিসিভ করতে নিশ্চয়ই কারও যাওয়া দরকার। কিন্তু এই হ্যাকেনস্যাক থেকে এয়ারপোর্টে যেতে হলে ট্যাক্সির প্রয়োজন। সেখান থেকে ফিরে সিদ্ধার্থর বাড়ি অথবা টেরি টাউনে যেতে হলে অন্তত শ'খানেক ডলারের দরকার। এই খরচ কে দেবে? কামাল বোঝাচ্ছিল যাওয়া উচিত তারই। কিন্তু সে গেলে শুটিং বানচাল হয়ে যাবে। টেরি টাউনের ঠিক উলটোদিকে ওই এয়ারপোর্ট। এটি নিউ জার্সির কাছে হলেও শুটিং-স্পট থেকে বেশ দূরে। প্লেন নামছে ঠিক নটা দশে।

একশো ডলার না এক ঘণ্টা সময় কোনটা বেশি দামি বুঝতে পারছিলাম না। রমাপ্রসাদ বলল, 'সমরেশদা, এভাবে সময় নষ্ট করলে তো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শুটিং শেষ করতে পারব না। আমাদের ফেরার দিন ঠিক হয়ে আছে।'

এ কথাটা আমার চেয়ে কেউ ভালো জানে না। কিন্তু যীশু লালুরা বলল যদি এক ঘণ্টা সময় বেশি খরচ হয়ে যায় ওরা আর একটু পরিশ্রম করে তা পূর্ণ করে দেবে কিন্তু কামালদার বউ আসছে অথচ তিনি এয়ারপোর্টে যাবেন না তা কী করে হয়। দেখলাম কমাল এতে খুশি হল। এয়ারপোর্টে যাওয়ার বাসনা ওর ভালোই ছিল।

ভ্যানে চেপে আমরা ঠিক ন'টায় এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলাম। রমাপ্রসাদ গম্ভীর। ছেলেদের বললাম ভ্যানেই অপেক্ষা করতে। কেনেডি এয়ারপোর্টের সঙ্গে এটির কোনও তুলনাই চলে না। দমদম আর বাগডোগরার মধ্যে যে পার্থক্য তাই চোখে পড়ল। ভেতরে গিয়ে জানলাম ভ্যাঙ্কুভারের ফ্লাইট আধ ঘণ্টা দেরিতে আসছে। কামাল বলল, 'আমি খুব দুঃখিত, আমার জন্যে শুটিং-এর দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

বলতে হল, 'ঠিক আছে, একদিনই তো।'

কামাল বলল, 'আসলে নীনা কোনওদিন নিউ ইয়র্কে আসেনি তো, একটু নার্ভাস হবেই। এখানে অবশ্য আমদের অনেক পরিচিত বাড়ি আছে নীনাকে দেখতে চায়, ও তাদের সঙ্গে চমৎকার থাকতে পারবে।'

ভ্যাঙ্কুভারের প্লেন এল। যাত্রীদের দেখতে পেলাম। কিন্তু নীনা কোথায়? হঠাৎ কামাল ছুটে গিয়ে যার সঙ্গে হাত মেলাল তাকে দেখে আমি স্তব্ধ। ঢাকায় বা কলকাতায় আমি একটি স্নিগ্ধ বঙ্গ ললনাকে দেখেছিলাম। তার পোশাক এবং আচরণে চমৎকার রুচি ছিল। কামালের সামনে দাঁড়িয়ে যে কথা বলছে তার পরনে কালো স্কার্ট, ওপরে লাল ফুলহাতা সোয়েটার। মাথার চুল মুড়িয়ে কাটা। শ্যামলা দুটো পা বেশ সরু। নীনা আমার সামনে এসে বলল, 'কেমন আছেন?'

'ভালো। আপনি?'

'খুব খারাপ। আপনার বন্ধু গেল না বলে আমাকে আসতে হল। কাল সারা রাত ঘুমাতে পারিনি। অনেকটা পথ ড্রাইভ করে মেয়ে পৌঁছে দিয়েছিল এয়ারপোর্টে। বিশ্বাস করুন আমি এখানে আসতে চাইনি।' নালিশের গলায় বলল নীনা।

'ঠিক আছে। এসেছেন, ভালোই হয়েছে। ইউনিটের সঙ্গে হইচই করে থাকবেন। সুটকেস কোথায়?'

লাগেজ পেতে একটু দেরি হল। দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ করছি কামালের সঙ্গে নীনার কথাবার্তা খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে না। বাইরে বেরিয়ে নীনা বলল, 'আমাকে হোটেলে নিয়ে চলো। আমি টায়ার্ড, অনেকক্ষণ ঘুমোব।'

কামাল আমার দিকে তাকাল। আবার মোটেলে ফিরে শুটিং-স্পটে যেতে হলে দ্বিগুণ পথ পাড়ি দিতে হবে। সে জবাব দিল না। ভ্যানে যারা বসেছিল তারা এইরকম এক বাংলাদেশি বউদিকে দেখবে আশা করেনি। আলাপ করিয়ে দেওয়ার সময় কেউ কিছু বলেনি। নিতাই কামালের পাশের আসন ছেড়ে দিল নীনার জন্যে। আমি ওর পেছনে।

ভ্যান চালু হওয়ামাত্র নীনা জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছ এখন?'

'প্রথমে ক্লোস্টারে। দীপংকর শকুন্তলা আছে ওখানে। ওদের নিয়ে টেরি টাউনে। আজ শুটিং -এর খুব দেরি হয়ে গিয়েছে।'

'আমার জন্যে দেরি হলে এয়ারপোর্টে আসার কোনও দরকার ছিল না।'

কামাল চুপ করে গাড়ি চালাতে লাগল।

'তোমার কাজটা কী এখানে?' নীনা আবার জিজ্ঞাসা করল।

'যে কয়দিন রমাপ্রসাদের দিদির বাড়িতে কাজ হবে সে ক'দিন সকালে ভ্যান চালিয়ে ইউনিটকে পৌঁছে দিতে হবে। আবার কাজ শেষ করে ফিরিয়ে আনা।'

'তার মানে তুমি এদের ড্রাইভার?' নীনা মুখ ফেরাল।

কামাল গম্ভীর হয়ে গেল, 'সমরেশ আমার বন্ধু।'

'তাহলে আমাকে নিয়ে এলে কেন? তুমি এইসবই করো।'

'আশ্চর্য! এটা করতে আমি চুক্তিবদ্ধ।'

'চুক্তি?' নীনা গজগজ করল, 'আমাকে যখন বিয়ে করেছিলে তখন সেটা চুক্তি ছিল না? কোনও দায়িত্বটা পালন করেছ তুমি?'

আমি ভয় পাচ্ছিলাম। কামালের পক্ষে এইসব কথা শুনতে-শুনতে স্থির মনে গাড়ি চালানো সম্ভব নয়। ভদ্রমহিলার নিশ্চয়ই জ্বালা আছে কিন্তু সেটা প্রকাশের সঠিক সময় এটা নয়। কিছুই শুনতে পাইনি এমনভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তারপর নীনা, ঢাকা থেকে ভ্যাঙ্কুভারে গিয়ে কেমন লাগছে?'

'ভালো। এখানে মেয়েদের স্বাধীনতা আছে। আমি চাকরি করছি।' আমার দিকে ফিরে বলল নীনা। টুকটাক কথা বলে আমি ওকে অন্যমনস্ক রাখতে চাইছিলাম। হঠাৎ বলল, 'সমরেশদা, আমি যদি একটু চুপ করে থাকি তাহলে কিছু মনে করবেন? আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।'

সিদ্ধার্থর বাড়িতে পৌঁছে দেখলাম আমরা অন্তত দু ঘণ্টা লেট। বনানী এবং সিদ্ধার্থ অফিসে। দীপংকররা তৈরি। নীনা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'টেলিফোন কোথায়?'

সেটা দেখিয়ে দিতেই নীনা রিসিভার তুলল। কামাল দৌড়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে ফোন করছ?'

'ওয়াশিংটনে। আমার এক বান্ধবী আছে। ওকে বলছি এক্ষুনি এসে আমাকে নিয়ে যেতে। যথেষ্ট অপমানিত হয়েছি, আর নয়।' কানেকশন পেয়ে গেল নীনা, 'হেলো, আমি নীনা। নিউইয়র্কে। হ্যাঁ। তুমি এখনই আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারো? কেন? উঃ। এই তিনদিন আমি কোথায় থাকব? ও, বলার সময় মুখে যা আসে বলো আর করার সময় অজুহাত দেখাও।' ঝট করে রিসিভার রেখে দিল নীনা।

আমরা প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে টেরি টাউনে পৌঁছোলাম। সবাইকে নামিয়ে দিয়ে কামাল আমাকে বলল, 'আমি নীনাকে এক বন্ধুর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসছি।'

সেদিন চারটের সময় রমাপ্রসাদ মাইলখানেক দূরে একটা পার্কে শুটিং করবে বলে ঠিক

করেছিল। সেটা মনে করিয়ে দিলাম ওকে। ওরা চলে গেল।

দীপংকর আমায় আলাদা ডেকে বলল, 'কামালের কেস খুব খারাপ। যে করেই হোক সামলাও নইলে শুটিং-এর বারোটা বাজবে।'

এ নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। কিশোরের আন্তর্জাতিক ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে। দীপংকর এবং অরিজিতেরও তাই। কিন্তু কেউই ভ্যান চালাবার সাহস পাচ্ছে না। ড্রাইভার ভাড়া করার কথা আমি ভাবতে পারছি না। এদিকে দিল্লি থেকে একটা জরুরি ফোন এসেছে। অবিলম্বে অরিজিতকে সেখানে যেতে হবে এয়ারফোর্সের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে। সে চলে গেলে সমস্ত দায়িত্ব আমার কাঁধে।

সাড়ে চারটের সময়ও কামাল ফিরল না। এর মধ্যে অবশ্য দুবার টেলিফোনে বলেছে নীনা কোথাও থাকতে চাইছে না। ইউনিটের সবাই বুঝে গেছে নীনা আসার পরই কামালের আচরণ পালটেছে। একটাই অভিযোগ, এরকম হতে পারে জেনেও কামালদা কেন বউদিকে নিয়ে এলেন। পার্কের শুটিং ফেলে রাখা যায় না। অগত্যা সিদ্ধার্থর গাড়ি দীপংকর চালিয়ে নিয়ে যাবে ঠিক হল। এই সময় কামাল একাই ফিরে এল। খুব গম্ভীর । জানাল নীনাকে সে সিদ্ধার্থের বাড়িতে রেখে এসেছে বলে দেরি হল। নীনা সেখানে বিশ্রাম নিচ্ছে। আমরা একটু হালকা হলাম।

এর পরের কদিন নীনা এবং কামালের মতবিরোধ শুধু তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। নীনা যে-কোনও সুযোগেই ইউনিটের অনেককেই কামালের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছে। সে ভুল করেছে বিয়ে করে, ডিভোর্স চায়। এমনকী বাংলাদেশেও ফিরে যেতে আপত্তি নেই। কারণ জিজ্ঞাসা করলে জানাত, কামাল তাকে সময় দেয় না। নিরাপত্তা দেয়নি। বিয়ে করে কানাডায় এনে ছেড়ে দিয়েছে। এমন বিয়ে সে চায়নি। এই ব্যাপারটা সবার ওপরেই চাপ আনছিল। কামালের ওপর তো বটেই। অথচ কামাল যদি ওকে নিয়ে একটু আলাদা হত সঙ্গে-সঙ্গে নীনার মুখের চেহারা আর পাঁচটা সুখী মেয়ের মতো পালটে যেত। স্বামী একটি বিশেষ কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জেনেও এমন আচরণ করার কোনও যুক্তি আমি খুঁজে পাইনি। মাঝখান থেকে আমরা হাসিখুশি দিলদরিয়া কামালকে খিটখিটে হয়ে যেতে দেখলাম।

রমাপ্রসাদ তাগাদা দিচ্ছিল স্থানীয় শিল্পীদের ব্যাপারে। টেরি টাউনের শুটিং স্পটে সুদীপ্ত একদিন একজনকে নিয়ে এল। লম্বা ছিপছিপে খুব ভদ্র চেহারার একটি কালো ছেলে। হার্লেমেই থাকে। কিন্তু ও চাকরি করে। অভিনয় করা ওর নেশা। জানাল সে ক্যারাটে জানে এবং ধর্মে বৌদ্ধ। আমেরিকার কালো ছেলেদের অনেকেই মুসলমান হয়েছে কিন্তু বৌদ্ধ হয়েছে বলে জানতাম না। রমাপ্রসাদের পছন্দ হল ছেলেটিকে। বছর পঁচিশেক বয়স। সম্মানদক্ষিণার ব্যাপারে কথা বলতে গেলে জানাল, 'সুদীপ্ত আমাকে সব বলেছে। এই নিয়ে পরে কথা বলা যাবে।' দেখলাম সুদীপ্ত এবং জয়ন্তীর সঙ্গে কথা বলে ও আরাম পেত। আমাদের ইংরেজিতে মার্কিন উচ্চারণ না-থাকায় ও কান খাড়া করে থাকত। ওকে আপন করে নিতে আমাদের ছেলেদের বেশি সময় লাগেনি।

প্রলয় ঘোষ ঘোরতর কালোবিদ্বেষী যদিও ওঁর গায়ের রং সাদা নয়। জীবনের অর্ধেকের বেশি সময় ভারতবর্ষে কাটিয়ে আমেরিকায় এসে সাহেব হলেও ভেতরে-ভেতরে পাতি বাঙালি। বাবার অভ্যেসগুলো আঁকড়ে আছেন কিন্তু মুখে প্রকাশ করেন না। ওঁর মেয়ে পিংকি যে এখানে বড় হয়েছে সে বাবার এই আচরণ মেনে নিতে পারে না। প্রলয় যখন খড়্গপুরে ছিলেন তখন তাঁর বড় মেয়ে মাটির বয়স পনেরো ষোলো। সেই মাটি একটি ছেলের প্রেমে পড়ে সবার অলক্ষে এবং গর্ভবতী হয়। জানতে পেরে প্রলয় তাকে প্রচণ্ড প্রহার করে বন্দি করে রাখেন। বস্তুত প্রহার করা ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা তিনি জানতেন না। কুমারী মেয়ে গর্ভবতী হয়েছে এই খবর আত্মীয় প্রতিবেশীরা জানলে তিনি কী করে মুখ দেখাবেন সেই ভাবনা তাঁকে পাগল করে তুলেছিল এবং তারই প্রকাশ ঘটছিল প্রহারের মধ্যে দিয়ে। পিংকি তখন চার-পাঁচ বছরের। দিদি কেন মার খাচ্ছে

সে বোঝেনি কিন্তু দিদির কান্না আর বাবার রুদ্রমূর্তি মনে গেঁথে গিয়েছিল। সুযোগ পেয়ে মাটি পালিয়ে যায় এবং প্রলয় খোঁজখবর করে এসে ঘোষণা করেন যে সে মারা গিয়েছে। পিংকির মনে হয় দিদির মৃত্যুর জন্যে বাবাই দায়ী।

নিউইয়র্কে এত বছর থেকেও প্রলয় বলেন, 'পিংকি, তুমি কোনও ভারতীয় ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারকে বিয়ে করতে পারো, সাদাদের সঙ্গে সম্পর্ক হলেও আপত্তি নেই কিন্তু কখনওই কোনও কালোকে নয়।' পিংকির ঠোঁট মুচড়ে ওঠে কিন্তু মুখে কিছু বলে না। হাডসন নদীতে হঠাৎ একটা তিমি ঢুকে পড়েছিল। হাডসনের জলে তিমিটি বাঁচবে না বলে ওকে আবার সমুদ্রে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। পিংকি তার সাদা বান্ধবী জ্যানিসের সঙ্গে হাডসনের ধারে তিমি দেখতে গিয়েছিল। সেখানে তিনটি সাদা ছেলে ওদের বিরক্ত করে। ওদের সঙ্গে যেতে বলে। তখন জন ওদের রক্ষা করে। সেই থেকে জনের সঙ্গে পিংকির বন্ধুত্ব হয়। আজ যখন প্রলয় এবং তাঁর স্ত্রী বাড়িতে নেই তখন জন আচমকা পিংকির সঙ্গে দেখা করতে আসে। পিংকি খুশি হয়। ওরা যখন গল্প করছিল তখনই প্রলয় ফিরে আসে। মেয়ের সঙ্গে নিজের বাড়িতে একটা কালো ছেলেকে দেখে প্রলয় উন্মাদ হয়ে যান। মেয়েকে মারতে ছুটে যান তিনি। জন তাঁকে বাধা দেয়। জনের শক্তির কাছে অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে প্রলয়। পিংকি শান্ত গলায় বলে, 'ওকে ছেড়ে দাও জন। উনি আমাকে মারতে চাইবেন, মারুন। আমার দিদিকে উনি খুন করেছিলেন, আমাকেও না হয় করুন।'

জনের শুটিং শুরু হল এইরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য দিয়ে। রমাপ্রসাদকে আমি বলেছিলাম হালকা কোনও দৃশ্য প্রথমে নিয়ে ওকে অভ্যস্ত করাতে। কিন্তু রমাপ্রসাদ যখন ওকে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে শুটিং শুরু করল তখন দেখলাম ছেলেটা দিব্যি আচরণ করছে। একটু জড়তাও নেই।

ঘরের ভেতরের শুটিং-এ নানান অসুবিধে ছিল। প্রথমত লোকাভাব। যতগুলো লাইটম্যান থাকলে আলোর কাজ পাওয়া যায় তাদের সবার হয়ে লালু এবং ভানু লড়ে যাচ্ছে। এই কারণেই বিবেকের খুঁতখুঁতানি যাচ্ছিল না। কোনও দৃশ্যই একবার নিয়ে সে খুশি হচ্ছিল না। দেখলাম জন ঠান্ডা মাথায় রমাপ্রসাদ এবং বিবেক যা চাইছে তা করে চলেছে বারংবার। বুঝলাম চরিত্রটি নিয়ে আর দুশ্চিন্তা নেই।

টেরি টাউনের শুটিং শেষ হল। রোজ সকালে নিজেই হার্লেম থেকে চলে আসে জন। বিকেলে ফিরে যায়। কোনও কোনও দিন রাত বেশি হলে তাকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে হয়। নীনা দুদিন মোটেলে ছিল কামালের সঙ্গে। তারপর ওয়াসিম নামে এক বাংলাদেশি ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়ে আছে। শুটিং-এর ফাঁকে রোজই কামালকে সেখানে হাজিরা দিতে হয়। আর মধ্যরাত্রে মোটেলে বসে টেলিফোনে কামাল তার সঙ্গে ভালোভাবে কথা শুরু করে ঝগড়ায় পৌঁছয়।

এবার ম্যানহাটানের রাস্তায় শুটিং। শোনা গেল রিফ্লেক্টার নামানো চলবে না। দৃশ্যটি ছিল, পিংকি এবং জন হাঁটছে, একটি কালো ভিখিরি এসে পয়সা চাইল। জন দিতে রাজি হল না। ছেলেটি তাকে হেইটম্যান বলে গালাগালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। সুদীপ্ত হাসিখুশি একটি কালো ছেলেকে নিয়ে এল। সে পেশাদার অভিনেতা। চরিত্রটি কী করবে জেনে নিজের ব্যাগ খুলল সে। দেখলাম একটা কালো ছেঁড়া কোট রয়েছে ব্যাগে। চটপট আয়না বের করে মেকআপ করে নিয়ে কোটটি পরে রমাপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করল ঠিক আছে কি না। রমাপ্রসাদ সামান্য পরিবর্তন চাইলে সেটা করে নিল। রাস্তায় যারা হাঁটাচলা করছে তাঁরা দাঁড়িয়ে পড়ছে না শুটিং দেখার জন্যে। শুধু ছেলেটি যখন চিৎকার করে বলছে, 'এই যে মার্টিন লুথার কিং, চেয়ে দেখো আমাদের কী অবস্থা' তখন দুই কালো পথচারী মন্তব্য করল, 'ইটস নট হিজ ফল্ট।'

রমাপ্রসাদ ওকে বলামাত্র কোট খুলে ব্যাগে পুরে মেকআপ তুলে নিল ছেলেটি। সুদীপ্ত বলেছিল ওকে পঞ্চাশ ডলার দিতে। দেওয়া হল। আবার যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে জানিয়ে সে চলে গেল নিজের কাজে।

সমস্ত ব্যাপারটাই আমাদের কাছে বিস্ময়ের। কলকাতার কোনও শিল্পী এমন আচরণের কথা ভাবতেই পারেন না। পেশাদার শব্দটার অর্থ ওরা পুরোপুরি মান্য করে।

আমরা কোথাও বেশিক্ষণ কাজ করছিলাম না। সবসময় ভয় হচ্ছিল এই বুঝি পুলিশ এসে বাধা দেয়। সরকারি অনুমতিপত্র থাকলেও পুলিশের কথাই শেষ কথা। যেমন, ইতিমধ্যে জানতে পেরেছি আটলান্টিক সিটিতে শুটিং করা যাবে না। ওই ক্যাসিনোটাউনে শুটিং করতে গেলে অন্তত পাঁচ হাজার ডলার ইনসিওরেন্স প্রিমিয়াম দিতে হবে যা আমাদের সামর্থ্যের বাইরে। অথচ আমাদের এই সিরিয়ালের প্রথম দৃশ্যই দেখা যাবে প্রলয় তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে। ছুটি কাটাতে এক বেলার জন্যে সেখানে এসেছেন ওঁরা। প্রলয় ক্যাসিনোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চেয়ে দ্যাখো, এই হল আমেরিকা। কোথাও কোনও দুঃখ নেই, ফুর্তি আনন্দ আর জীবন এখানে। ভারতবর্ষে থাকলে ভাবতে পারতে এসব। সারাজিবন রান্নাঘরে কাটাতে হত। তবু কেন যে এখনও দেশ দেশ বলে কাঁদো বুঝতে পারি না।' সমুদ্রের ধার এবং আমেরিকার আকাশচুম্বী বাড়ির প্রয়োজন দৃশ্যটির জন্যে। কি করা যায় বুঝতে পারছিলাম না। কামাল জানাল আমরা যখন ওয়াশিংটনে শুটিং করতে যাব তখন পথেই পড়বে বালটিমোর নামের একটি জায়গা। সমুদ্র এবং বাড়িঘর পাওয়া যাবে সেখানে তবে শুটিং করা যাবে কি না তা সে জানে না।

আজ নীনাকে ভ্যাঙ্কুভারের প্লেনে তুলে দিয়ে বেশ মনমরা কামাল। দীপংকর অদ্ভুত কথা বলেছিল, 'কোনও-কোনও দম্পতি ঝগড়া না করলে নিজেদের প্রেম ব্যক্ত করতে পারে না। এরা সেই ধরনের নয়তো? এত কাণ্ডের পরেও কামাল বলছে, নীনা তার স্বর্গ। বোঝো!'

আমি আর বুঝতে চাইনি।

ঠিক হল হাডসনের ধারে তিমি দেখতে গিয়ে পিংকির সঙ্গে সাদা ছেলেদের এবং জনের আবির্ভাবের দৃশ্যটি আমরা ওয়াশিংটন থেকে ফিরে এসে তুলব। সুদীপ্ত তিনটে ছেলেকে ঠিক করে রাখল।

ভোরবেলায় রওনা হয়ে গেল জয়ন্তী শংকর আর নিতাইকে সঙ্গে নিয়ে তার লাল গাড়ি চালিয়ে। দুপুরে আমরা ওয়াশিংটনের দিকে যাত্রা করলেই অরিজিত ফিরে যাবে দিল্লিতে। আমাকে আলাদা ডেকে বলল, 'ঠিকঠাকই তো এগোচ্ছে, বাকিটা শেষ না করে ফিরো না। আমরা কোনওভাবেই হারতে রাজি নই।'

আমি হাত মেলালাম। কিন্তু এখন দায়িত্বের ভার আমার চেয়েও অনেক বেশি বেড়ে গেছে সেটা টের পেয়ে নিজেকে অসহায় মনে হতে লাগল।

॥ ১৭ ॥

আমেরিকার মানুষদের সামগ্রিক জীবনযাত্রার ধরন এক হবে এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। এক স্পেনীয় এবং এক ওলন্দাজ পরিবার সমানভাবে বাস করতে পারেন না। ব্রিটেন থেকে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে এদের প্রচুর পার্থক্য থাকবেই। কিন্তু আপাতচোখে এইসব সাদা চামড়ার মানুষদের সাদা আমেরিকান হিসেবে চিহ্নিত করতে কয়েক প্রজন্ম পরে বহিরাগতদের সুবিধে বোধ হয়। একইভাবে আফ্রিকার বিভিন্ন অংশ থেকে ধরে আনা কালো মানুষদের এখন এক চোখে দেখার প্রবণতা আছে। যেহেতু এই দুই শ্রেণি সংখ্যায় বেশ ভারি তাই এঁদের মূল স্রোত বলা হয়। গত তিরিশ-চল্লিশ বছরে আমেরিকায় আসা এশিয়ানরা নিজেদের ওই মূল স্রোতের সঙ্গে মেশাতে পারেননি যদিও তাঁদের অনেকেই নাগরিকত্ব পেয়ে গেছেন। সাদা আমেরিকান মানেই তাঁদের জীবনযাপনের ফরমুলা এক নয় অথচ আমরা সেরকমটাই ভেবে নিতে ভালোবাসি। প্রথম প্রজন্মের বাঙালিরাও

নিজেদের অনেকটাই তারা ইতিমধ্যে পার করে এসেছেন। দ্বিতীয় প্রজন্মের মানুষ, যারা ওখানে জন্মেছে অথবা শৈশবে গিয়ে বড় হয়েছে তারা বাবা মায়ের খাত বাতিল করে মূলস্রোতের খাতে ঢুকে পড়লেও মিশে যেতে পারেনি। তেল এবং জলের পার্থক্য থেকে গেছে যদিও ওরা পাশাপাশি এগিয়ে যাচ্ছে। হয়তো তৃতীয় প্রজন্ম এলে এই ব্যবধান ঘুচে যাবে। এই ব্যাপারটি নিয়ে লেখা এক অভিনব বই আমার হাতে এসেছে। কানাডার টরেন্টোর রবীন্দ্রনাথ টেগোর লেকচারারশিপ ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে ঋতেন্দ্র কুমার রায় এবং জোসেফ টি ও'কোনেল সংকলন করেছেন, 'বেঙ্গলি ইমিগ্রান্টস, এ কম্যুনিটি ইন ট্র্যাসজাকসন।' আটান্ন পাতার এই বইটি অনেক বছর বাদে আমাদের উত্তরাধিকারীদের নিশ্চয়ই পেছন দিকে তাকাতে সাহায্য করবে।

ওয়াশিংটনে পৌঁছেছি সন্ধের মুখে। শহরকে পাশে রেখে পোটোম্যাক নদী পেরিয়ে চলে এসেছি সুন্দর ছবির মতো একটি পাড়ায় যেখানে রমেন পাইন বাস করেন। তাঁর সঙ্গে এতক্ষণ ওই বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল। আমার দেখা শতকরা একশো ভাগ কিছু ভদ্র ব্যক্তি আছেন। যাঁদের একজন এই রমেনবাবু। চুরাশি সালে যখন এদেশে প্রথমবার এসে শহরে ডালহৌসি পাড়ার ওয়াশিংটন হাউস হোটেলে একা-একা হাঁপিয়ে উঠছিলাম তখন এক রাত্রে মরিয়া হয়ে টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে বাঙালির নাম খুঁজেছিলাম। সেখানে পাইন উপাধি পেয়ে টেলিফোন করি এবং একঘণ্টার মধ্যে রমেনবাবু এসে হাজির হন আমার হোটেলে। পরে জেনেছি দূরত্বটা কলকাতা বর্ধমানের। ঘনিষ্ঠতা সেই থেকে। ওয়াশিংটনে শুটিং-এর আয়োজন ওঁর ভরসায়। ইউনিটের বেশিরভাগ সদস্য থাকবে জয়ন্তীর বাড়িতে। গাড়ির সময়ে চল্লিশ মিনিটের পথ। বাকিরা রমেনবাবুর কাছে। দিনের খাওয়া যত্রতত্র, রাত্রে এখানেই।

সবাই গুছিয়ে বসার পর আলোচনা শুরু হয়েছিল। রমেনবাবু পড়াশুনা নিয়ে থাকেন, চাকরি করেন ভয়েস অফ আমেরিকায়, কথা বলেন ধীরে, একটু বেশি সময় দিলেই বোঝা যায় এত বছর বাদেও মানুষটি কলকাতার জন্যে কষ্ট পাচ্ছেন। পরিষ্কার বললেন, 'কলকাতা যদি আমাকে একটা হাজার চারেকের চাকরি দিত তাহলে ওখান থেকে চলে আসার কথা কল্পনাও করতাম না। টিভিতে খবর পড়েছি, লোকে সেসময় ট্রামেবাসে দেখলেই চিনত। বিভিন্ন আড্ডায় চুটিয়ে সময় কাটিয়েছি। কবিতা নিয়ে তর্ক করতে-করতে মধ্যরাত কেটে গিয়েছে, আহা কী দিন ছিল সেসব। এখানে মশাই বাড়ি হয়েছে, গাড়ি আছে আর আমি কেন বেঁচে আছি তাই বুঝতে পারি না।'

এর আগের বার প্রশ্ন করেছিলাম, দেশে ফিরে যাচ্ছেন না কেন? উত্তরটা জানা ছিল। একজন ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার ইচ্ছে করলেই বিদেশ ছেড়ে দেশে ফিরে নিজের প্রফেসনে কাজ করতে পারেন। রমেনবাবুদের মতো সংস্কৃতিমনা সেই অর্থে ননপ্রফেসনাল মানুষের পক্ষে শুধু কবিতা বলে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এদেশের স্কুল কলেজে পড়াতে যাওয়ার একটা বয়সসীমা আছে। ওঁর এককালের অভ্যেস এখন আইনকানুনের বেড়া ডিঙিয়ে আবার চালু হবে সেই ভরসা নেই। অতএব জীবিকার জন্যে তাঁকে ওয়াশিংটনে থাকতেই হবে। কলকাতায় ফ্ল্যাট কিনেছেন, প্রায়ই পালিয়ে আসছেন কিন্তু পাকাপাকি আসবেন সেইসময় যখন মানুষের রোজগারের বয়স থাকে না। ওঁর স্ত্রী জুলি এদেশকে ভালোবেসেও ওদেশেই থেকে যেতে চান শেষদিন পর্যন্ত নানান কারণে। মেয়ে জয়ন্তী বাবা এবং মায়ের দুটো ভাবনাই পেয়েছে।

এতগুলো মানুষকে অতিথি হিসেবে পেতে আমরা কলকাতার মানুষেরা অভ্যস্ত নই। পছন্দ করব কি না সন্দেহ। একবেলাই যেখানে যথেষ্ট সেখানে কয়েকদিন ধরে শোওয়ার ঘরেও প্রাইভেসি থাকছে না। যেখানে-সেখানে অচেনা কিছু মানুষকে বরদাস্ত করা কম কথা নয়। তার ওপর বাড়িতে কাজের লোক নেই, বাজার করা থেকে বাসন ধোওয়া নিজের হাতে করতে হচ্ছে, এঁদের মুখ এত খুশিতে উজ্জ্বল হয়েছিল কী করে তাই আমি অবাক হয়ে দেখতাম। রমেনবাবুকে এর আগে বিষণ্ণ দেখেছি। জয়ন্তী বলল, 'তোমাদের পেলে বাবা কথা বলেন নইলে মুখে কুলুপ।' এই একা থাকা

মানুষটি এতগুলো লোককে পেয়ে এবং প্রথম পরিচিত হয়ে যেন ছুটির ঘণ্টা শুনতে পাওয়া বালকের মতো আনন্দিত। রাত্রে পানীয়ের গ্লাস হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'মূল স্রোতের কথা বলছিলেন, হ্যাঁ. অফিসে ওঁদের সঙ্গে আমাদের বেশ সদ্ভাব। কেউ-কেউ বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠান হলে নেমন্তন্ন করেছেন কিন্তু বলেছেন, খাবার আমার ড্রিংক তুমি ক্যারি করো। গিয়েছি প্রথম-প্রথম। কেমন কাঠ-কাঠ লাগত। হাসি আছে কথা আছে কিন্তু সব কিছুতেই ব্যবধান থাকত। সেইরকম অনুভূতি হয়নি কোনও কালো আমেরিকানের বাড়িতে নেমন্তন্ন রাখতে গিয়ে। ওরা আমাদের মতনই খোলামেলা, রাখঢাক নেই। কিন্তু এবার মুশকিলটা হয় আমাদেরই। কিছুক্ষণ বাদেই মনে হয় বাড়ি ফেরা যাক। কোথাও একটা অভাববোধ তৈরি হয়।' রমেনের কাছে জানা গেল মেলামেশার এই ধরন অটুট আছে বাংলাদেশিদের ক্ষেত্রেও। একই ভাষায় কথা বলা, একই গান প্রিয় দুজনের কাছে, কেউই সেই অর্থে ধর্মের ধ্বজা বহন করতে চান না তবু দুজনের মাঝখানে একটা অদৃশ্য সীমারেখা ঝুলতে থাকে। আর এই কারণেই শেষপর্যন্ত ফাঁক থেকে যাচ্ছে। অথচ উলটো দিকে কোনও বাঙালির সঙ্গে সাদা আমেরিকান মহিলার বিয়ে হলে দেখা যাচ্ছে ভদ্রমহিলা সক্রিয় হচ্ছেন স্বামীর জীবনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে। শাড়ি পরা থেকে বাঙালি রান্না খাওয়ার মধ্যে দিয়ে সেই প্রচেষ্টা প্রাথমিক প্রয়াস অনেকেই দেখেছেন। তবে এসব ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান স্বামীদেবতাটি। আমেরিকান স্ত্রী নিয়ে তিনি একটু একা থাকতেই পছন্দ করেন বেশি।

খাওয়া-দাওয়ার পর নীচের তলার ঘরে আবার আড্ডা জমল। মনোজ মিত্র রমেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পাশের বাড়িতে কে থাকেন?'

'কেন বলুন তো? রমেনবাবু বিস্মিত।

'এ যে দেখছি আমাদের সল্টলেকের চেয়ে খারাপ অবস্থা। পাইকপাড়ায় থাকতাম, সেখানে পাড়া ছিল, অনেককেই চিনতাম। সল্টলেকে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে না। কারও নাম জানি না। গল্প করতে হলে চেনা লোকের বাড়িতে বসে চেপে যেতে হয়। শেষে গায়ে পড়ে এর ওর সঙ্গে আলাপ করে নিলাম। আমার সিনেমার পরিচয়টা অবশ্য তাতে কাজে লাগল।'

রমেনবাবু বললেন, 'এখানে গায়ে পড়ে কথা বলতে গেলে ওরা পুলিশ ডাকতে পারে। প্রত্যেক বাড়ির সামনে এক টুকরো সবুজ খোলা লন দেখতে পাবেন। সেই লনে আপনি আমি দাঁড়িয়ে গল্প করতে পারি না, ওটা অপরাধ। অগত্যা কোনও বঙ্গসন্তানের কাছে যেতে হবে আপনাকে। তা খুব কাছের বঙ্গসন্তান থাকেন তিরিশ মাইল দূরে। যাওয়ার আগে একটি টেলিফোন না করে গেলে দেখা পাবেনই এমন কথা নেই। সল্টলেকে যেটা পারছেন এখানে সেটা সম্ভব নয়।'

দীপংকর এখানে এসেছে এমন খবর অনেকেই পেয়েছেন। নিউ জার্সিতে দেখতাম প্রায়ই ওঁর ফোন আসছে। মহিলারা চিত্রাভিনেতার সম্পর্কে উৎসাহী হবেন এটাই স্বাভাবিক। কেউ-কেউ ওঁকে নেমন্তন্ন করতেন। এ ব্যাপারে আমরা আগে থেকে কথা বলে নিয়েছিলাম। কাজের অসুবিধে করে কেউ ব্যক্তিগত নেমন্তন্ন রাখতে যাবে না। দীপংকর সেটা মেনে চলত কিন্তু তার অনুরাগিণীদের উৎসাহ তাতে কমত না। আড্ডার মধ্যেই তার টেলিফোন এল। রমেনবাবু রিসিভার তুলে কথা বলে নিলেন, 'হ্যাঁ, এসেছেন না, ঘুমাননি, কোত্থেকে বলছেন? ও, আপনি? নিন কথা বলুন।' রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে রমেনবাবু বললেন, 'নিউইয়র্ক থেকে এক ভদ্রমহিলা টেলিফোনে আপনার ইন্টারভিউ নেবেন। এটি বেতারে সম্প্রচারিত হবে। কথা বলুন।' দীপংকরের বোধহয় এমনভাবে ইন্টারভিউ দেওয়ার অভিজ্ঞতা আগে হয়নি। সে বেশ সহজভাবেই প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেল। তারপর জানাল এখানে মনোজ মিত্র ও সমরেশ মজুমদার হাজির আছেন। ভদ্রমহিলা বললেন শ্রুতিনাটকের দিন নাকি আমাদের তিনি কিছু প্রশ্ন করেছেন যা রেকর্ডেড হয়ে গেছে। অর্থাৎ ইন্টারভিউ সারা।

ইন্টারভিউ শেষ হলে মনোজদা, জিজ্ঞাসা করলন, 'এই দ্বীপে একা থাকতে ভালো লাগছে?'

দীপংকর অবাক, 'দ্বীপ মানে?'

'নয়তো কী? দ্বীপের মতনই তো অবস্থা। বন্ধুবান্ধবহীন থাকা।'

'ভালো কি আর লাগে। লাগাতে হয়। আমার বাড়ির পেছনে একটা ডেক আছে। সেখানে বিকেলে বসে গাছপালা দেখতে-দেখতে মনটা বেশ তাজা হয়ে যায়। সুনীল, শক্তি, জয় গোস্বামীর কবিতা পড়ি একা একাই। তখন অবশ্য আর নিজেকে একা বলে মনে হয় না।'

'বিপদ আপদ হলে?'

'কী ধরনের? চোর ডাকাত? পুলিশ আসবে পাঁচ মিনিটে। অসুস্থ হলে অ্যাম্বুলেন্স আসবে চটপট। এরা মশাই সব ব্যবস্থা রেখেছে। এমনকী বাড়িতে একটি বাচ্চাকে স্বচ্ছন্দে রেখে যেতে পারেন। শুধু তাকে টেলিফোন নম্বর দিয়ে যেতে হবে।'

আমাদের আড্ডা ভাঙতেই হল। কাল সকালেই রমাপ্রসাদরা এসে যাবে জয়ন্তীর বাড়ি থেকে। ন'টায় শুটিং শুরু হবে এই বাড়ির সামনে। রমেনবাবু অভয় দিয়েছেন, পুলিশ এখানে কোনও ঝামেলা করবে না। আলো নিবিয়ে পাশে শুয়ে মনোজদার গলা শুনতে পেলাম, 'ও সমরেশবাবু।'

'বলুন!'

'এ কী কাণ্ড মশাই। এটা আমেরিকা? এখানে থাকলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হত।'

হাসলাম, 'ভাগ্যিস থাকছেন না, বাংলাভাষায় নাট্যকারের বড় অভাব, অভাবটা আরও বাড়ত।'

সকাল নটায় কাজ শুরু হল। আজ ঘরের ভেতরে যাব না। রাস্তায় ঘুরে কাজ হবে। নিউ জার্সি থেকে আলোর সরঞ্জাম বয়ে আনা হয়নি গাড়িতে জায়গা ছিল না বলে। জয়ন্তী ভরসা দিয়েছে তার পরিচিত এক টিভি কোম্পানি থেকে সে ওগুলো ব্যবস্থা করে দেবে। এগারোটার মধ্যে লোকেশন প্যাক আপ করে আমরা চললাম মূল শহরে। আরলিংটন মেমোরিয়াল ব্রিজে শুটিং শুরু করে চারপাশে তাকাচ্ছি। লিঙ্কন মেমোরিয়াল খানিকটা দূরে। পুলিশ এসে বাগড়া দিতে পারে। এর আগে শুনেছি ওয়াশিংটন শহরে চাররকমের পুলিশ কাজ করেন। তাঁদের ক্ষমতা এক একটি পরিধিতে। সরকারি চিঠিপত্র তাদের কতটা ঠাণ্ডা রাখবে বুঝতে পারছি না। রমাপ্রসাদকে বলেছি দ্রুত কাজ সারতে। কিন্তু আলো, যন্ত্র, অভিনেতা অভিনেত্রী যদি একই ছন্দে না চলে তাহলে পরিচালককে রিটেক করতেই হয়। সেক্ষেত্রে অধৈর্য হয়ে কোনও লাভ নেই।

এই দুপুরবেলায় জগা পাগলাদের দেখতে পেলাম। একটু নিম্নমুখী হলেও রসিকতাটি কিন্তু উপভোগ্য। ভরদুপুরে খাটো প্যান্ট পরে মধ্যবয়সী পুরুষ-মহিলারা জগিং করতে বেরিয়ে পড়েছেন। সমানে ছুটছেন তাঁরা। মধ্যরাত্রেও কাজ শেষ করে এঁরা একবার জগিং-এ বের হন। এই জগিং বিলাসীদের বাঙালিরা জগা পাগলা নাম দিয়েছেন। অফিসে একঘণ্টা লাঞ্চ ব্রেক হল, একটু জগিং করে নেওয় যাক, এইরকম ভাবখানা। স্বাস্থ্যরক্ষা করার জন্যে আকুল প্রয়াস।

কাজ করতে করতে লিঙ্কন মেমোরিয়ালের সামনে আসতেই পার্ক পুলিশের দর্শন পেলাম। তিনি জানালেন এখানে শুটিং করা চলবে না। কাগজপত্র দেখিয়েও তার মন ভেজানো যাচ্ছিল না। তাঁকে নিয়ে তাঁর অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগে দেখলাম যীশুর হাত ক্যামেরা। সে ওই সুযোগে কিছু কাজ এগিয়ে নিচ্ছে। দূর থেকে ওয়াশিংটন মনুমেন্টকে ধরতে চেষ্টা করছে চরিত্রগুলোকে সামনে রেখে। রমাপ্রসাদ সচেতন যাতে ব্যাপারটা ডক্যুমেন্টারি ছবি হয়ে না দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত অনুমতি পাওয়া গেল। ভিয়েতনাম মেমোরিয়ালের যে দেওয়ালটি খুবই বিখ্যাত তার সামনে কাজ করতে পারি কিন্তু কোনও অবস্থাতেই চারজনের বেশি লোককে সেখানে দিয়ে যাওয়া যাবে না। হুকুম মানতেই হল। কামাল সেই অফিসারকে গল্পে এমন ভোলাল যে চারের জায়গায় আটজন পৌঁছে গেল সেখানে, নইলে কাজটা করা যেত না।

এই তল্লাটে ট্যুরিস্টদেরই ভিড়। আমরা চলে এলাম হোয়াইট হাউসের সামনে। বুশ সাহেবের বাড়ির দরজা তখন টুরিস্টদের জন্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ক্যামেরা খুলতেই পুলিশ জানাচ্ছে, এখানে নয়, অন্য জায়গায় যাও। রমাপ্রসাদের জেদ সেখানে কাজ করবেই। শেষপর্যন্ত প্রেসিডেন্ট পার্কে ক্যামেরা রেখে কাজ শুরু করা হল, সামনেই হোয়াইট হাউস। বাইরে থেকে আন্দাজ করা যাবে না ভেতরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতখানি। কিন্তু কোনও পুলিশ এবার আমাদের বাধা দেয়নি। পার্কে শুটিং হচ্ছে কিন্তু দর্শকের ভিড় নেই, কলকাতায় ভাবা যায় না।

বিকেলে ফেরার পথে জয়ন্তীর ঠিক করে রাখা একটা ডিপার্টমেন্টাল শপে ঢোকা হল শুটিং-এর জন্যে। তিনতলা জুড়ে দোকানপত্তর, আলোর ফোয়ারা সর্বত্র, এমন একটা শপিং কমপ্লেক্স আমাদের দেশে নেই। ম্যানেজার মহিলা সানন্দে মত দিলেন। বাড়তি আলোর দরকার হল না। আমরা যখন কাজ করছি তখন লক্ষ করলাম একটি সুন্দরী তরুণী ঠায় দাঁড়িয়ে দেখে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ বাদে যীশু এবং বিবেকের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় হয়ে গেল তারপর রীতিমতো ঘনিষ্ঠতা। যীশু আমার কাছে এসে কিন্তু-কিন্তু করে বলল, 'সমরেশদা, একটি সাদা আমেরিকান মেয়ের চরিত্র আছে, তার অভিনেত্রী পেয়ে গেছেন?'

তখনও আমি বেকিকে দেখিনি। বেকি জয়ন্তীর বান্ধবী। অমন এক চমৎকার আবিষ্কার জয়ন্তী আমাদের জন্যে করে রেখেছিল তখনও জানতাম না। যীশুকে বললাম, 'এখনও দেখা পাইনি, কথা শুনেছি।'

যীশু ওর সেই সরল হাসিটা মুখে ছড়িয়ে বলল, 'যাক, কোনও প্রব্লেম নেই। ওটা নিয়ে ভাববেন না।'

'মানে?' এবার আমার ঈষৎ অবাক হওয়ার পালা।

'ওই যে মেয়েটিকে দেখছেন, কেমন দেখছেন? অনেকটা সোফিয়া লরেন, অডি হেপবার্ন, এলিজাবেথ টেলর পাঞ্চ করা মনে হচ্ছে না? খুব ভালো মেয়ে। ওর মা বাবার ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে। একদম একা থাকে। খুব কষ্ট। ওর ভীষণ ইচ্ছে টিভি বা সিনেমায় অভিনয় করবে। আমার কাজ দেখছিল অনেকক্ষণ ধরে। আলাপ হতেই, নাম শুনতেই ভীষণ খুশি। বলল যদি তোমরা আমাকে অভিনয়ের একটা সুযোগ দাও তাহলে—। বুঝতেই পারছেন! নো প্রব্লেম।' যীশু দাশগুপ্ত আকর্ণ হাসল।

মেয়েটিকে আর একবার ভালো করে দেখলাম। সুন্দরী বলতে আমি বাধ্য। কলকাতার রাস্তাঘাটে শুটিং হলে এই জাতের সুন্দরী মেয়েরা কখনই ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে শুটিং দ্যাখে না। বললাম, 'ঠিক আছে, তুই ওকে জয়ন্তীর বাড়ির নম্বর দে। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে যোগাযোগ করলে জানিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু আমাদের মূল শুটিং নিউইয়র্কে। ওয়াশিংটন থেকে ও কি সেখানে যাবে?'

যীশু চোখ বড় করল, 'সব কথা হয়ে গেছে। ও কলকাতায় থাকলে গ্রুপ থিয়েটারের মেয়ে হয়ে যেতে পারত। ভোর পাঁচটায় ডাকলে হাজির, আবার গ্রুপের দাদা রাত এগারোটায় রিহার্সাল শেষ করলে লাস্ট বাসে ঢুলতে-ঢুলতে বাড়ি ফেরে। সেই মেয়েদের মত এর স্ট্যামিনা।'

কয়েক মিনিটে এত আবিষ্কার। বললাম, 'ঠিক আছে, বলে দে।'

যীশু চলে যাচ্ছিল, আমি ডাকলাম, 'যীশু, তোর, মানে তোদের ব্যাপারটা—।'

মুহূর্তে ওর মুখে একটা ছায়া এল এবং চলে গেল, বলল 'দাও, কোর্টে গিয়ে দিয়ে দিয়েছি। এখন পুরোপুরি দাদাদের বোন হয়ে গেছে ও।' যীশু চলে গেল।

এই যীশুকে আমি অনেক বছর আগে প্রথম কফিহাউসে দেখি। ঝকঝকে ছেলে ছিল। সিনেমার আলো সরবরাহের ব্যাবসা করত। কিন্তু অত্যন্ত বিনয়ী মনে হত। তেরো পার্বণের সময় ওর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হল। মুক্তবন্ধে ওকে দিয়ে অভিনয় করিয়েছিল রমাপ্রসাদ। একটি ভদ্র বিনয়ী ছেলে নিয়মভাঙার খেলায় মেতেছে তখন। রাত দুটো পর্যন্ত মদ খায়, বেপরোয়া জীবন যাপন করে

কিন্তু দেখা হলে নিজের ভাই-এর চেয়েও বেশি বিনীত হয়। এরই মধ্যে প্রেম এবং বিবাহ। ওর বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়েছি, চমৎকার লেগেছে ওদের। তারপরেই শুনেছি গোলমাল হয়েছে, বিচ্ছিন্ন হচ্ছে ওরা। খুব খারাপ লেগেছিল। অনুযোগ করতেই বলেছিল, 'দোষ আমার দাদা। আফটার অল আমি তো কলকাতার যীশু, কাচকে স্টিল ভেবেছিলাম।'

এই যীশুকে দিয়ে রমাপ্রসাদ আজ অভিনয় করাল। শকুন্তলার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে ও যা হিন্দি বলছিল তা সামলাতে মদনসুদনজি হিমসিম খাচ্ছিলেন। চলন্ত সিঁড়িতে, দোকানগুলোর ঘোরান বারান্দায় কাজ করে এলে রমাপ্রসাদ ওকে বলল, 'ভালোই হয়েছে।' দর্শক যখন তোমার মুখে অন্য কারও চোস্ত হিন্দি শুনবে তখন তো তোমাকেই তারিফ করবে।'

যীশু চিন্তিত গলায় বলল, 'আর একবার গোলমাল হবে। আমি যা নই তাই ভেবে নেয় কেউ-কেউ। সেই ভাবনার মান বজায় রাখতে একটা জীবন কতবার খরচ করব? যাকগে, সমরেশদা, মেয়েটি আজ রাত্রেই টেলিফোন করছে।'

মেয়েটি অবশ্য কোনওদিন টেলিফোন করেনি। হয়তো এই কারণে যীশুর সারাজিবন আফসোস থাকবে। দেখা গেল জয়ন্তীদের যে টেলিফোন নম্বর যীশু জানত সেটি ভুল। শেষ সংখ্যাটি লিখতে ভুল করেছিল সে। মেয়েটি সারাজিবনে আর যোগাযোগ করতে পারবে না।

পরের দিন সহজেই জয়ন্তীর সৌজন্যে আলোর সরঞ্জাম পেয়ে গেলাম। কোনও ইউনিয়ন নেই, টাকা জমা রাখতে হল না। নিউইয়র্ক আর ওয়াশিংটনের মধ্যে পার্থক্য বিরাট। ইনসিওরেন্সের কথাও কেউ বলল না। অবশ্য জয়ন্তীর সঙ্গে স্টুডিওর মালিকের পরিচয় এই সহজ হয়ে যাওয়ার মূল কারণ। বিকেল থেকেই শুটিং শুরু করল রমাপ্রসাদ জয়ন্তীর বাড়িতে। রাত এগারোটায় ওয়াশিংটন পর্ব সমাপ্ত। আজ সকালে বেকি এসেছে। লম্বা, মিষ্টি চেহারার সাদা মেয়ে। খুব হাসে। ওর কাছে এই ব্যাপারটা খুব মজার। বলল, 'স্কুলে নাটক করেছি, এসব ব্যাপারের অভিজ্ঞতা আমার একদম নেই। ভুল করলে দেখিয়ে দিও।' রাতে রমাপ্রসাদ জানায় বেকি কাজ দেখে সে খুব খুশি। আজ কাজ ছিল জয়ন্তীর আর বেকির। জয়ন্তী এসেছে বেকির বাড়িতে। বেকির মা বাবা আলাদা হয়ে গেছেন। নিঃসঙ্গতা রোগে ভুগছে মেয়েটা। আর নিজের বাবার ভণ্ড আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ জয়ন্তী। দুজনের সমস্যা দুরকম।

আমরা সংলাপের ব্যাপারে কোনওরকম সমঝোতা করিনি। বিদেশি চরিত্রগুলো ইংরেজি বলেছে। তাদের সঙ্গে ভারতীয় চরিত্ররা যখন কথা বলেছে তখন দর্শকের সুবিধের জন্যে হিন্দি ব্যবহার করা হয়নি। অনেক সময় সংশয় এসেছে এদের আমেরিকান উচ্চারণ ভারতীয় দর্শকের পক্ষে কতটা বোধগম্য হবে! কিন্তু ভরসা পেয়েছি এই কারণে যে আমাদের দেশে আমেরিকান ছবি তো খুব ভালো চলে।

আজ বিজয়া দশমী। আগেই বলেছিলাম এই দিনটি সবার ছুটি। রমেনবাবুর ইচ্ছে ছিল সারাদিনে চুটিয়ে আড্ডা মারার। জুলি বউদির বাসনা আমাদের নিয়ে ওয়াশিংটনের এক পুজো মণ্ডপে যাওয়া। এখানে সপ্তমী-অষ্টমী এক শনি-রবিবারে হলে নবমীদশমী পরের শনি-রবিবারে পালন করা হয় ছুটি নেই বলে। দলের সবাই দেখলাম দুর্গাঠাকুরের মুখ দেখার জন্যে ব্যস্ত। দশমী বলে কথা। অতএব আড্ডা বাতিল। দুপুরে আমরা রওনা হলাম ভ্যান এবং দুটি গাড়ি নিয়ে। মাইল চল্লিশেক পাড়ি দিয়ে একটি স্কুলবাড়ির সামনে পৌঁছে দেখলাম পার্কিং প্লেসে গাড়ি রাখার জায়গা নেই বলতে গেলে। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। পুজো হচ্ছে মাটির নীচে হল ঘরে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে বিশাল করিডোর পেরিয়ে সেই হলঘরে ঢুকতেই কানে ঢাকের বোল এল। হঠাৎ সারা শরীরে কাঁটা ফুটল। অদ্ভুত এক আবেগে আক্রান্ত হলাম। কয়েকশো বঙ্গসন্তান দারুণ সেজেগুজে ওই হলঘরে মেলা জমিয়েছেন। এক কোণে দেবীর সুন্দর মূর্তির সামনে আরতি হচ্ছে। ঢাক বাজছে টেপরেকর্ড

থেকে মাইকে। একপাশে বাংলা বই বিক্রি হচ্ছে।

যেন পঙ্গপালের দল ধানখেত ছেড়ে উড়ে যাচ্ছে, বেরুবার সময় রমেনবাবুদের বাড়ির অবস্থা ওইরকম ছিল। কিন্তু ওঁদের মুখ দেখে সেটা বোঝার উপায় ছিল না। আমরা এখন ফিরে চলছি নিউইয়র্কের দিকে। পথে কামাল আমাদের নিয়ে গেল হাইওয়ে ছেড়ে বালটিমোরে। সমুদ্রের ধারে সুন্দর সাজানো শহর। প্রতিদিনই কার্নিভাল হচ্ছে ওখানে। রমাপ্রসাদ ওর ইউনিট নিয়ে সমুদ্রের ধারে ডেকের ওপর চলে গেল। মালপত্র নামানো হচ্ছে ভ্যান থেকে এমন সময় এক পুলিশসাহেব দেখা দিলেন, 'এসব কী হচ্ছে?'

'শুটিং করব।'

'কার অনুমতিতে?'

চিঠি দেখালাম। সাহেব মাথা নাড়লেন, 'এক্ষুনি তোমরা বিচ-কেয়ারটেকারের সঙ্গে দেখা করো। ওই যে ওইখানে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।'

দেখতে পেলাম। মধ্য পঞ্চাশের এক রাগি মহিলা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছেন। কামাল তাঁকে খুব বিনীতভাবে চিঠিটা দেখাল। একবার নজর বুলিয়ে তিনি চমৎকার করলেন, 'ওয়াশিংটন ভেবেছেটা কী? আমাদের জানানোর প্রয়োজন নেই? নো, ইম্পসিবল, আমার এখানে প্রচুর ভিজিটার্স, এখানে শুটিং করতে দিতে পারি না।'

'সরকারি অনুমতি—।'

'সরকারকে বলুন আমাদের জানাতে তারপর ভেবে দেখব।'

'বুঝতেই পারছি গোলমাল হয়েছে কোথাও। আমরা ভারত থেকে এসেছি, এই সুন্দর সমুদ্রতটের ছবি আমাদের দেশের লোককে দেখাতে চাই। আপনি যদি সদয় না হন তাহলে বালটিমোরের নাম ভারতীয়রা জানতেই পারবে না।'

'এটা কি সিনেমা হচ্ছে?'

'না। ভিডিয়ো।'

'ঠিক আছে, আপনাদের পাশপোর্ট দেখি। আধঘণ্টার জন্যে অনুমতি দিলাম। তার মধ্যে কাজ শেষ না করলে পাশপোর্ট ফেরত পাবেন না। হ্যাঁ, ওই ডেকের ওপর কাজ করবেন।'

পাশপোর্ট জমা দিয়ে ছুটে গিয়ে রমাপ্রসাদ এবং বিবেককে শর্তটা জানালাম। রমাপ্রসাদ কাঁধ ঝাঁকাল, 'এমন করে শুটিং করা যায় না। প্রতিপদে যদি বাধা আসে। দূর!'

দীপংকর বলল, 'আরে চেষ্টাই করো না। এমন দারুণ স্পষ্ট কোথাও পাবে। ভাই বিবেক, তুমি একটু খুঁতখুঁতানি কমিয়ে ক্যামেরা চালাও।'

বিবেক বলল, 'খারাপ হলে তা সবাই ক্যামেরাম্যানকেই দোষ দেবে।'

আমার আর কামালের তখন ত্রিশঙ্কু অবস্থা। ম্যাডাম চোখ রাঙাচ্ছেন আর এরা শিল্পের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাচ্ছে। কাজ শুরু হল। আধঘণ্টা, পঁয়তাল্লিশ মিনিট নিয়ে মাথা ঘামাবার ছেলে রমাপ্রসাদ নয় যদি সে কাজে ডুবে যায়। অর্ধেক কাজও হয়নি। ডেক থেকে সরে বাঁধানো পাড়ের ওপর দাঁড়ালাম। হঠাৎ দেখি ম্যাডাম আসছেন। হয়ে গেল। ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসে প্রথমে পাশপোর্ট ফেরত দিলেন। তারপর বললেন, 'শোনো, আমি ভেবে দেখলাম তোমাদের কাজ করতে দেওয়া উচিত। জায়গাটা খুব সুন্দর, তাই না?'

তাড়াতাড়ি মাথা নাড়লাম, 'খুব, খুউব।'

অনুমতি পাওয়া গিয়েছে জানার পর কোনও কাজের বহর আরও বেড়ে গেল। কার্নিভাল, জাগলারদের খেলা, বিচে শুয়ে থাকা সুন্দরীদের মাঝখান দিয়ে চরিত্রদের সংলাপ বলিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়ার শুটিং হল নির্বিবাদে। পুলিশরাও জেনে গিয়েছে ম্যাডাম অনুমতি দিয়েছেন। যীশু বলল, 'কিছু দৃশ্য টিভি দেখাতে দেবে না। এই বালতিগুড়ির মেয়েরা বড্ড কম কাপড়ে বিকিনি বানায়।'

বালতিগুড়ি! সর্বনাশ। বালটিমোরের নাম সবার মুখে বালতিগুড়ি হয়ে গেল।

বিগম্যাকে লাঞ্চ সেরে সোজা নিউ জার্সিতে ফেরার কথা ছিল। কামাল বলল, 'ঘণ্টা খানেক ঘুরে গেলে আটলান্টিক সিটি পেয়ে যাব। সেখানে শুটিং করবে নাকি?

ওখানে যে কাজ করার কথা ছিল তা আমরা বালটিমোরে করে নিয়েছি। তা ছাড়া শুটিং করা ওখানে বেআইনি যদি ইনসিওরেন্স না করা থাকে। আমাদের নেই। কিন্তু কামালের উস্কানিতে রমাপ্রসাদ বলল, 'চলুন না, ঝুঁকি নেওয়া যাক। সংলাপ বলানোর দরকার নেই, আমরা যদি পারি ক্যাসিনোর ছবি নেব। না পারলে নেব না।'

ইস্টকোস্টের একটি দর্শনীয় জায়গা আটলান্টিক সিটি। পোর্ট অথরিটি থেকে অনেকগুলো বাস রোজ যায় সেখানে ট্যুরিস্ট নিয়ে। ভাবলাম এদের জায়গাটা ঘুরিয়ে আনি।

পৌঁছোতে-পৌঁছোতেই সন্ধে হয়ে গেল। লস ভেগাসের মিনি সংস্করণ। দূর থেকেই দেখছি ক্যাসিনোর আলো জ্বলছে। সামনেই সমুদ্র। ঘণ্টাখানেক সময় দেওয়া হল সবাইকে। অন্ধকারে শুটিং করা যাবে না, ঘুরে দেখুক সবাই। দীপংকর মনোজদা আর শংকর আমার সঙ্গে চলল। সিজারে ঢুকলাম আমরা। সেই একইরকম কয়েকশো স্লট মেশিন। আধঘণ্টা বাদে দীপংকর পঞ্চাশ ডলার জিতছে, মনোজদা তিরিশ। শংকর হারছিল। আটদশ ডলার খুইয়ে সে মনোজদার কাছে ধার চাইল। মনোজদা দিতে রাজি নয়, শংকর ছাড়বে না। শেষপর্যন্ত সে পাঁচ ডলার নিয়ে ফিরে যেতেই দেখা গেল মনোজদা আর পেমেন্ট পাচ্ছেন না। দেওয়ার টাকা তো গেলই উলটে পাঁচ ডলার হার হল। বাকি কদিন এই শোক ভুলতে পারেননি মনোজদা। বলতেন, 'ওই গাবুকে ধার দিয়ে আমার কপাল গেল। কী শনিরে বাবা।' দীপংকর জিতল ষাট ডলার। সময় বেশি নেই। সবাইকে টেনেটুনে যখন ভ্যানের কাছে আনলাম তখন জানা গেল রমাপ্রসাদ লালুকে নিয়ে ক্যাসিনোর ভেতর ঘুরে-ঘুরে ছবি তুলে ফেলেছে। এমনকি সমুদ্রের ধার থেকে নিওন আলো-জ্বলা ক্যাসিনো বাড়িগুলোকেও ধরেছে ওরা। এডিটিং-এর পরে আটলান্টিক বালটিমোর মিলে যে ছবি দাঁড়াল তা দেখে আমিই হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

মধ্যরাত্রে মোটেলে ফিরে মালপত্র নামাচ্ছি, সবাই ক্লান্ত, হ্যাকেনস্যাকের চারপাশ নিঝুম, হঠাৎ এক নম্বর ঘরের দরজা খুলে গেল। দেখলাম সেই সুন্দরী আবার ফেরত এসেছেন। বিবেককে দেখেই মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলেন। বিবেক বলল, 'বাঁচা গেল!'

হাডসন নদীর ধারে একটা গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য ছিল। সকাল থেকেই আমরা ক্যামেরা সাজিয়ে তৈরি। তিনটি সাদা ছেলে আসবে নিউইয়র্ক থেকে। সুদীপ্তর কাস্টিং ডিরেক্টার তাদের পাঠাবেন। নটায় আসার কথা, দশটা বেজে গেল। উদ্বেগ বাড়ছে। ইংরেজি উপন্যাসে একসময় উড্‌স-এর বর্ণনা পাওয়া যেত। নদী অনেক নীচে, চারপাশের গাছপালায় পরিবেশ সেইরকমের। পাশের রাস্তায় গাড়ি বেশি চলে না। কিন্তু পুলিশ এল। কেন করছ, কতক্ষণ লাগবে জিজ্ঞাসা করে জানিয়ে গেল একঘণ্টার মধ্যেই প্যাকআপ করতে হবে। ইনসিওরেন্স নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করল না।

সাড়ে দশটা নাগাদ ছেলে তিনটে এল সুদীপ্তর সঙ্গে। গাড়ি থেকে নেমেই ক্ষমা চাইল দেরি হওয়ার জন্যে। ওরা গতরাত্রে শুটিং করেছে তিনটে পর্যন্ত, আবার এখান থেকেই যাবে আর-একটা ছবিতে কাজ করতে। দৃশ্যটি বুঝে নিয়ে দেখলাম নিজেরাই রিহার্সাল দিয়ে পোশাক পালটে নিল। জয়ন্তী এসেছে তিমি দেখতে হাডসনের ধারে। সেখানে বেকির অপেক্ষা করার কথা। ওরা যখন কথা বলছে তখন তিনটে সাদা আমেরিকান ছেলে ওদের বিরক্ত করবে। টেপ চালিয়ে জয়ন্তীকে নাচতে বলবে। জয়ন্তী রাজি না দেখে ওরা উল্লসিত চিৎকারে হাত ধরে টানাটানি করছে যখন তখন টনি এগিয়ে আসবে। তিনটে সাদা ছেলেকে বেদম মেরে ভাগিয়ে দিয়ে সে যখন চলে যাবে তখন বেকি কান্নায় ভেঙে পড়বে আর জয়ন্তী প্রথমবার দেখা টনিকে বলবে ধন্যবাদ।

এটুকু লিখতে যত সহজ লাগল কাজটা তার একশো গুণ কঠিন ছিল। রমাপ্রসাদ যা চাইছিল তা তিনবার রিহার্স করে শুটিং শুরু হল। গোলমাল হচ্ছিল মারপিটের দৃশ্য। ব্যাপারটা বাস্তব করতে বারবার টেক করতে হচ্ছিল। বাংলা ছবির মারপিট দৃশ্য হাস্যকর হয় এটা সবার মাথায় ছিল। বিবেক কাজ শেষ করতে সাদা ছেলেরা প্রস্তাব দিল ওরা অন্য একটা কম্পোজিশন করছে সেটাও তোলা হোক। এবার যীশু ক্যামেরা নিল। ক্যামেরাম্যানকে দেখলাম ঘুরে-ঘুরে নীচু-উঁচু হয়ে মারপিটের শট নিচ্ছে। টানা নেওয়ার পর কাট টু কাট। তিনজনের একজন রোগা, একজন মোটা, তৃতীয়জন বেশ মস্তান চেহারার। প্রত্যেকেই নিজের চরিত্রে চোস্ত। একসময় কাজ শেষ হল। ওরা রমাপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করল সে খুশি কি না। খুশি হয়েছে জেনে বলল, 'যদি কখনও আমাদের প্রয়োজন হয় খবর দেবেন। আমরা এখনও পার্শ্বচরিত্রে কাজ করে যাচ্ছি। আর পারিশ্রমিক দিতে হবে না, আপনারা শুধু যাতায়াতের খরচটা দিন।'

বদান্যতার কারণ জিজ্ঞাসা করতে মাস্তান ছেলেটি বলল, 'আমি শুনেছি ইন্ডিয়া একটা দারুণ জায়গা। সেখানকার মানুষ আমাদের দেখবে এটাই তো সবচেয়ে বড় পুরস্কার।'

এই সময়গুলোয় ভারতীয় হিসেবে বেশ লজ্জায় পড়তে হয়। আমরা তো ভারতবর্ষের মানুষ হিসেবে আজকাল গর্বিত হতে পারি না। তবু বিদেশিদের কেউ-কেউ যখন প্রশংসা করে তখন মনে হয় যে যা নয় তার জন্যে প্রশংসা পেলে অস্বস্তি বেড়ে যায়। টনি আমাদের সঙ্গে ছিল। বলল, 'ওরা সত্যি ভালো কাজ করল।'

'তোমার সঙ্গে আগে আলাপ ছিল?'

'মোটেই না। কিন্তু এই সাদারা অন্য ধরনের।'

সাদারা শব্দটা কানে বাজল। হঠাৎ মনে হল, ভারতীয়দের সঙ্গে আমেরিকানদের মেলামেশার ফাঁক নিয়ে আমি একটু বেশি ভেবেছি। কলকাতায় ট্রামেবাসে কোনও বিহারবাসীকে ভুল করতে দেখলে স্বচ্ছন্দে খোট্টা বলতে তো বাধে না আমাদের।

॥ ১৮ ॥

হাতে সময় বেশি নেই, খুব দ্রুত আমাদের শুটিং শেষ করতে হচ্ছিল। নিউইয়র্ক সিটি জার্সির বঙ্গ সমাজের সঙ্গে আমার একটু-আধটু পরিচয় থাকা সত্ত্বেও আমি এ ব্যাপারে তাঁদের বিরক্ত করতে চাইনি। এঁরা প্রত্যেকেই কাজের মানুষ এবং মোটামুটি আগে থেকেই ছুটিগুলো কাটানোর ব্যবস্থা করা থাকে। সিদ্ধার্থর মতো একজন বন্ধুর ওপর আমরা যে অত্যাচার করেছি তা সবাই সহ্য করবেন এমন আশাও করতে পারি না। কিন্তু এবার প্রয়োজন হল। চিত্রনাট্যে একটি পার্টির দৃশ্য ছিল যেখানে প্রলয় গিয়েছেন। এই পার্টির দৃশ্যটা কারও বাড়ির হলঘরে করতে হবে এবং সেখানে অতিথিদের প্রয়োজন। যেহেতু আমার পরিচয় বাঙালিদের সঙ্গেই তাই তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হল ওই পার্টিতে আসবার জন্যে। মদনসুদনজি ভরসা দিলেন ওঁদের দিয়ে তিনি হিন্দি বলার কাজ চালিয়ে নেবেন যাতে পরে ডাবিং-এর সময় অসুবিধায় পড়তে না হয়।

এর আগে নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সিতে যে দুবার গিয়েছি অনেকেই আমাকে নৈশভোজে নেমন্তন্ন করেছেন। সেখানে মোটামুটি একই মুখ, একই রকমের খাওয়া। শুধু আলোলিকা-ভাবানীর বাড়িতে একটু ব্যতিক্রম ছিল। এবার কাজের চাপে নেমন্তন্ন এলেও নিতে চাইনি। সিদ্ধার্থকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল অতিথিদের পার্টিতে আমন্ত্রণ জানাতে। কারও এদিন সময় হয় তো কারও অন্যদিন। শেষ পর্যন্ত একটা ছুটির দুপুর থেকে কাজ হবে বলে ঠিক হল। সুজন এবং শমিতা দাশগুপ্ত সাগ্রহে অনুমতি দিয়েছিলেন তাঁদের বাড়ি ব্যবহার করতে।

ভাবলাম সবকিছুই সুন্দরভাবে এগোচ্ছে। নিউ জার্সির বাঙালিদের একটি সংস্থা কল্লোল। তার সদস্যা কুমকুম আমাদের সিরিয়ালে অভিনয় করেছেন। প্রথমে যে শ্রুতিনাটক করেছিলাম তাতেও তাঁর অংশ ছিল। তিনি অনুরোধ করেছিলেন তাঁর বাড়িতে নৈশভোজ করতে। সেখানে বেশ কিছু অচেনা মুখ। তাঁরা জানতে চাইলেন কে-কে পার্টির দৃশ্যে নিমন্ত্রিত। সিদ্ধার্থর ওপর দায়িত্ব ছিল বলে আমরা বিশদ জানতামও না। কিন্তু কেমন একটা অস্বস্তি হল। সেখানেই এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ যার কবিতা পাঠের ভঙ্গি আমাদের খুব ভালো লেগেছিল। তাঁকে পার্টির দৃশ্যে আমন্ত্রণ জানাতে তিনি সাগ্রহে সম্মতি দিলেন। এইটেই সম্ভবত ভুল হয়েছিল।

ঠিক ছিল বেলা এগারোটার মধ্যে আমরা সুজন-শমিতার বাড়িতে পৌঁছে কাজ শুরু করব। কিন্তু তার আগে নিউ ইয়র্কের রাস্তায় কাজ করার কথা। সেই কাজ শেষ করে ঘণ্টা খানেক পথ গাড়ি দিয়ে যখন ওঁদের বাড়িতে পৌঁছোলাম তখন অতিথিরা খুব স্বাভাবিকভাবেই বিরক্ত। সবাই সেজেগুজে অপেক্ষা করছেন। আমরা ক্ষমা চেয়ে কাজ শুরু করলাম। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই অখুশির আঁচ পাওয়া গেল। এক ভদ্রমহিলা আমাকে একলা পেয়ে অনুযোগ করলেন, কেন ওই বিশেষ সুন্দরীকে এখানে আমি আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তিনি বিরোধী ক্লাবের সদস্যা। দেখলাম মহিলার সঙ্গে অনেকেই দূরত্ব রাখছেন। তখন এ নিয়ে ভাবার সময় না। এমনিতেই সময় বেশি নেই, গৃহকর্তাকে কথা দিয়েছি রাত ন'টার মধ্যে তাঁর বাড়ি ছেড়ে দেব। কিন্তু একেবারে নতুন শিল্পী এবং তার ওপর ভাষাটা যখন হিন্দি তখন কাজ দ্রুত এগোতে পারে না। তবু ছেলেরা পাল্লা দিয়ে অভিনয় করে গেলেন দীপংকরের সঙ্গে। সময় না থাকায় মহিলাদের দৃশ্যগুলো অল্পে শেষ করতে হল। সংলাপ কমাতে হল এবং যে-কোনও পরিচালক এমন কাজ করতে যখন বাধ্য হন তখন তাঁর কষ্ট শিল্পীদের চেয়ে কম হয় না।

এই ঘটনার পরে আমার কাছে অদ্ভুত সব কথাবার্তা ভেসে এল ফোনে যা থেকে আমার ধারণা হতেই পারে কয়েক হাজার মাইল দূরে গাড়ি দিয়ে, আমেরিকান নাগরিকত্ব নিয়েও বাঙালির চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো একটুও নষ্ট হয়নি। বাঙালি ঈর্ষাকাতর এবং সন্দেহ করতে ভালোবাসে। তিন জন বাঙালি এক জায়গায় গেলেই দুটো দল হয়ে যায়। এসব সত্য সবার জানা। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সেই গ্রাম্য মানসিকতা এখনও স্বচ্ছন্দে বেঁচে আছে ওখানকার এপার বাংলার বাঙালিদের মধ্যে এর প্রমাণ পাচ্ছিলাম ফিরে আসার পরেও। আমরা একটি পুজোমণ্ডপে শুটিং করার কথা ভেবেছিলাম। আলোলিকার লেখায় পড়লাম ওঁরা এই কারণে আমাদের কাছে ডলার চাইবেন বলে ভেবেছিলেন! অথচ একেবারে লাভের আশা না করে সাধ্যের বাইরে গিয়ে আমরা ওঁদের ছবি এদেশের মানুষকে দেখাতে চেয়েছি। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই অনেক আছেন। যেমন শমিতা দাশগুপ্ত। নির্যাতিতা ভারতীয় মেয়েদের পাশে দাঁড়ানোর জন্যে এই ভদ্রমহিলা মানবী নামের একটি সংস্থা তৈরি করে যেভাবে লড়ে যাচ্ছেন তা দেখে শ্রদ্ধায় মন ভরে যায়।

সিদ্ধার্থর বাড়ির সামনে শুটিং হচ্ছিল। নির্জন রাস্তা। সার দেওয়া বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। হঠাৎ সাইরেন বাজাতে-বাজাতে তিনটে পুলিশের গাড়ি হাজির। দুই অফিসার তেড়ে এলেন, 'এই যে, কী হচ্ছে এখানে?'

বিনীতভাবে জানালাম, 'আমরা টিভির জন্যে শুটিং করছি।'

একজন বললেন, 'তোমরা ওই বাড়ির সামনে রিফ্লেক্টার রেখেছ। উনি বিরক্ত হয়েছেন। এমন কাজ তোমরা কিছুতেই করতে পারো না।'

দ্বিতীয়জন বলল, 'অনুমতি নিয়েছ?'

বললাম, 'হ্যাঁ, মশাই নিয়েছি। তা ছাড়া আমরা কাউকে একটুও বিরক্ত করছি না। রাস্তায় কোনও গাড়ির আটকে যাচ্ছে না।'

অফিসার মাথা নাড়লেন, 'ওসব ছাড়ো। দেখি কাগজটা।'

ওটা আমি সবসময় সঙ্গে রাখতাম। অতএব হাসিমুখেই ওয়াশিংটন থেকে পাওয়া কাগজটি দেখালাম। তিনি যেন কষ্ট করে সেটা পড়লেন। তারপর সেটা ফিরিয়ে দিয়ে হাত বাড়ালেন, 'ইনসিওরেন্স?'

'মানে? এখানে শুটিং-এর জন্যে ইনসিওরেন্স করতে হয় নাকি?'

'আজ্ঞে হয়। আইন না জানা কোনও অজুহাত নয়। আমাদের এই ক্রোস্টার শহরের নিজস্ব নিয়মকানুন আছে। বুশ সাহেব তোমাকে অনুমতি দিলেও এখানকার নিয়মটা ভাঙা চলবে না। ঠিক আছে, তোমরা মেয়রের অফিসে গিয়ে অনুমতি নিয়ে এসো। ততক্ষণ আমি কিছু বলছি না কিন্তু শুটিং করা চলবে না।'

'মেয়রের অফিস কোথায়?'

'আশ্চর্য! তুমি ক্রোস্টারে এসে মেয়রের অফিস দ্যাখোনি?'

'দেখতে হবে তা ভাবিনি। যদি দয়া করে দেখিয়ে দাও—'

সিদ্ধার্থ চুপচাপ শুনছিল। গম্ভীর গলায় বলল, 'সমরেশ, আসুন।'

গাড়িতে মেয়রের অফিসে যেতে-যেতে সিদ্ধার্থ বিড়বিড় করল, 'অদ্ভুত ব্যাপার। আপনারা নিউইয়র্কে শুটিং করলেন, কে মার্টের সামনে করলেন কিছু বলল না কেউ আর আমার বাড়ির সামনেই ঝামেলা।'

সেই কারণেই মেয়রের অফিসে যে যার আসনে বসে কাজ করছে দেখে অবাক হইনি। ভারপ্রাপ্ত মহিলা বললেন, 'খুব অন্যায় করেছ তোমরা শুটিং করে।'

বললাম, ,'এখনও করিনি। করব-করব ভাবছিলাম।'

'ও। ঠিক আছে, এই ফর্মটা ভরতি করে তিনশো ডলার জমা দাও।'

তিনশো ডলার? আমার মাথায় বাজ পড়ল। মিষ্টি হাসলেন ভদ্রমহিলা, 'এতেই সব কভার হয়ে যাবে। তোমরা তিন ঘণ্টা শুটিং করতে পারবে। বিনা অনুমতিতে ক্রোস্টারে শুটিং করা যায় না।'

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করল, 'যদি আমি আমার বাড়িতে মানে বাড়ির ভেতরে শুটিং করি? তোমার কিছু বলার আছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। সেটাও নিষিদ্ধ যদি আগাম অনুমতি না নাও। ঘণ্টা পিছু একশো ডলার, মিনিমাম তিনশো।'

ফাঁপরে পড়লাম। রমাপ্রসাদ ওদিকে ক্যামেরা সাজিয়ে বসে আছে। সময় নষ্ট হচ্ছে। এদিকে তিনশো ডলার দেওয়ার সামর্থ্য আমাদের নেই। হঠাৎই ভদ্রমহিল নীচু গলায় বললেন, 'তোমাদের একটা কথা বলি কিন্তু আমি বলছি ভুলে যাও। মনে হচ্ছে তোমাদের ফান্ড নেই। পাশের শহরে চলে যাও, সেখানে এইসব নিয়ম নেই শুধু মেয়র অনুমতি দিলেই হয়ে যাবে।'

সিদ্ধার্থ চনমনিয়ে উঠল, 'আচ্ছা, আমার বাড়ির সামনের রাস্তাতেই নিতে হবে এমনকী জরুরি কিছু আছে?'

বললাম, 'বিন্দুমাত্র নয়।'

'তাহলে এক্ষুণি চলুন। পাশের শহরে যাই।'

'পাশের শহর কতদূরে?'

'মিনিট আটেক।'

পাশের শহরে পৌঁছেছি আট মিনিটের মধ্যেই। মেয়রের অফিসের সামনে গাড়ি থেকে নেমে আমি আর সিদ্ধার্থ এগোচ্ছি। এক ভদ্রলোক অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রৌঢ়, কিন্তু ভালো স্বাস্থ্য। জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাদের কোনও সাহায্য করতে পারি।'

সিদ্ধার্থ বলল, 'আমরা মেয়রের সঙ্গে কীভাবে দেখা করতে পারি?'

'প্রয়োজনটা কী?'

'এরা আমার বন্ধু। ইন্ডিয়া থেকে একটা টিভি শুটিং করতে এসেছেন। আমি ক্লোস্টারে থাকি। সেখানে শুটিং করতে অনেক ঝামেলা। তাই আপনাদের মেয়রকে বলব যদি এখানে শুটিং করার অনুমতি দেন?'

'কতজন লোক আছে শুটিং টিমে?'

'জনা কুড়ি।'

'হুম। ট্র্যাফিক জ্যাম না করাই ভালো। করতে হলে অল্প সময়ের জন্যে। হ্যাঁ, ওদিকে একটা সুন্দর পুকুর আছে, ওটাও দেখতে পারেন। আপনার ক্লোস্টারের চেয়ে খুব খারাপ জায়গা এটা নয়।' ভদ্রলোক হাত বাড়ালেন, 'আপনারা স্বচ্ছন্দে যতক্ষণ খুশি কাজ করতে পারেন।'

হাতে হাত মিলিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি?'

'আমি এই শহরের মেয়র।'

ভদ্রলোকের ব্যবহারে আমরা চমৎকৃত। বারংবার ধন্যবাদ দিলাম তাঁকে। পাশাপাশি দুটো শহরের আইনকানুনের তফাত কী করে এমন হল আমি জানি না। তা ছাড়া শহরের মেয়র হেঁটে-হেঁটে চারধার দেখছেন এমন অভিজ্ঞতাও আমার নেই। কাজ শুরু হয়ে গেল। আমাদের অবস্থা বসতে দিলে শুতে চাওয়ার মতো। রাস্তায় পার্কে শুটিং-এর মালপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাজ হচ্ছে। পুলিশ এখানেও আছে কিন্তু কেউই কোনও প্রশ্ন করছে না। বোঝা গেল মেয়রের অফিস থেকে নির্দেশ চলে গেছে ওঁদের কাছে।

এখানেই জয়ন্তী এবং টনির সেই দৃশ্যটি তোলা হল যেখানে টনি বলছে তাকে জয়ন্তী কেন বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইছে না? জয়ন্তী মুখ নামিয়ে জবাব দিল, 'আমার বাবা কোনও কালোকে বাড়িতে নিয়ে যেতে পছন্দ করেন না।'

টনি অবাক হয়ে বলল, 'কেন? তিনি কি সাদা?'

মাথা নাড়ল জয়ন্তী, 'না। কালো।'

ওরা দুজনে চমৎকার অভিনয় করল। এরই ফাঁকে টনি এসে দাঁড়াল আমার পাশে। ছেলেটিকে আমার খুব ভালো লাগত। সে বলল, 'তোমাদের সিরিয়ালে এমন একটা বিষয় জায়গা পাচ্ছে জেনে খুব ভালো লাগছে।'

বললাম, 'অনেক ধন্যবাদ। আমরা ভারতীয়রা চিরকাল সাদাদের এইরকম ব্যবহারের বিরোধী। ছেলেবেলায় আঙ্কল টমস কেবিন নামে একটি বই পড়েছি। খুব জনপ্রিয় ছিল বইটি। আঙ্কল টমের জন্যে সেসময় কান্না পেত। পড়েছ বইটা?'

টনি মাথা নেড়েছিল, 'হ্যাঁ পড়েছি। মার্টিন লুথার কিং সম্পর্কে কী ধারণা?'

'আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করি। সারাজিবন লড়াই করে আদর্শের জন্যে তাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। তুমি হয়তো জানো না নেলসন ম্যান্ডেলা যেদিন কলকাতায় গিয়েছিলেন সেদিন তাঁকে সম্মান জানাতে লক্ষ-লক্ষ মানুষ মিছিল করে গিয়েছিল।'

'দারুণ ব্যাপার তো।' টনির চোখ চকচক করল।

'কিন্তু টনি, একটা ব্যাপার আমাকে খুব ভাবাচ্ছে।'

'বলো।'

'গতবার এসে দেখেছি, এবারও দেখলাম, কালোদের একটা বড় অংশ রীতিমতো ভীতিকর হয়ে উঠেছে। রাস্তাঘাটে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা ওরা যেভাবে দাঁড়িয়ে থাকে তাতে মনে হয় কাজকর্ম নেই। আইনভাঙার প্রবণতাও খুব। কেন?'

টনি মুখ ফেরাল, 'এর অনেক কারণ। এক কথায় বলা যাবে না।'

সে আর কথা বাড়াতে চাইল না।

দুপুরের পরে কামাল ভ্যান চালিয়ে নিয়ে এল ম্যানহাটনের একপাশে। জয়ন্তী আর টনির কিছু দৃশ্য তোলা হবে। কেউ বাধা দিচ্ছে না। মায় পাতাল রেলস্টেশনে নেমেও শুটিং হল। রমাপ্রসাদ বেশ সাহসী হয়ে উঠেছে। খানিকটা এগোতেই আমরা থমকে গেলাম। বিশাল চওড়া রাস্তার দু-দিকে দিয়ে গাড়ি ছুটছে মাঝখানে অনেকটা চওড়া বাঁধানো চত্বরে তিনতলা বাড়ির সমান ওটা যে রিফ্লেক্টার তা বুঝতে সময় লাগল। দুপাশে আকাশ ছোঁয়া আধুনিক বাড়ি। এর ঠিক মাঝখানে ক্যামেরা সাজানো হয়েছে। চারখানা ক্যামেরা। কয়েকটি তাঁবু ফেলে তাতে শিল্পীদের মেকআপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুটিং জোনে দোকানের সেট পড়েছে। পথচারীরা দূরের দুই ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আমেরিকান ছবির শুটিং দেখছেন। এই এলাহি ব্যবস্থা করতে কত খরচ হয়েছে তা আমরা কল্পনা করতে পারব না। ইনসিওরেন্স কোম্পানিকে অন্তত হাজার দশেক প্রিমিয়াম দিতে হয়েছে কয়েক ঘণ্টার জন্যে। অথচ মজার ব্যাপার হল দুপাশের ট্র্যাফিক ওই শুটিং এর জন্যে এক সেকেন্ডের জন্যেও আটকে থাকছে না। যীশু চাপা গলায় বলল, বিবেকদা, ক্যামেরা বাক্সে ঢোকান, এরা দেখলে নিশ্চয়ই হাসাহাসি করবে। কি এলাহি ব্যাপার। কল্পনা করা যায় না।'

সত্যি, ওই বিশাল শুটিং ব্যবস্থার আয়োজন মার্কিন প্রযোজকদের পক্ষেই করা সম্ভব। চিৎকার চেঁচামেচি নেই অথচ কাজ হচ্ছে দ্রুতগতিতে। কিন্তু শুটিং দেখার সময় আমাদের হাতে নেই। ভ্যানে উঠে সবাই চলে এলাম ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ছাড়িয়ে সাউথ ফেরিতে। এখান থেকেই প্রতি দশ মিনিট অন্তর স্টিমার ছাড়ছে স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে যাওয়ার জন্য। রমাপ্রসাদের চিত্রনাট্যে স্ট্যাচু অফ লিবার্টির একটা ভূমিকা আছে। স্ট্যাচুর ছবি তুলতে গেলে সাউথ ফেরির হোয়াইট হল স্ট্রিট থেকে ক্যামেরা চালালে পুতুলের মতো দেখাবে। লিবার্টি আইল্যান্ডে পর্যটকদের নিয়ে যাওয়া হল আলাদা লঞ্চে। কিন্তু আমরা স্থির করলাম স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের স্টিমারে উঠব। ওই স্টিমার স্ট্যাচুর গা ঘেঁষে যায়। ডেকে দাঁড়িয়ে টনি এবং জয়ন্তীকে নিয়ে শুটিং করলে চমৎকার পাওয়া যাবে।

তার আগে একটি ভারতীয় বাদামওয়ালার সঙ্গে জয়ন্তীদের দেখা হওয়ার দৃশ্য ছিল ওই সাউথ ফেরিতেই। আগে একদিন লোকটাকে দেখেও গিয়েছি। আজ তাঁকে খুঁজে পাচ্ছি না। অনেক খোঁজার পরে দর্শন পেলাম। একেবারে দিশিমতে কাঠের বাক্সর ওপর বাদাম সাজিয়ে বিক্রি করছে। শুটিং-এর কথা বলতে আপত্তি করল। দেশের লোক টিভিতে তার বাদাম বিক্রি করার ছবি দেখবে এটা সে কিছুতেই মানতে পারছিল না। লোকটার চেহারার সঙ্গে বিবেকের কিছুটা মিল ছিল। রমাপ্রসাদের অনুরোধে বিবেক যীশুকে ক্যামেরা দিয়ে বাদামওয়ালার ভূমিকায় নামল।

আকাশে এবার মেঘ জমছে। স্টিমারে ওঠামাত্র টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। এককালে সকরিকলি মনিহারিঘাটে স্টিমার চেপেছি। কিন্তু এই তিনতলা স্টিমারে গোটা পঞ্চাশেক গাড়ি স্বচ্ছন্দে পার হচ্ছে। কোথাও এক ফোঁটা ময়লা নেই। আর এখানে সিগারেট জ্বালানো নিষিদ্ধ। আলো বড্ড কম। বিবেক খুঁত-খুঁত করছে। স্টিমার ক্রমশ স্ট্যাচু অফ লিবার্টির কাছে পৌঁছে গেল। এতকাল ছবিতে দেখেছি, এখন একেবারে সামনাসামনি। আমার কিন্তু তেমন প্রতিক্রিয়া হল না। যা কিছু অচল, অতিরিক্ত রকমের বিখ্যাত তা আমাকে কখনই টানে না। প্যারিসে মোনালিসার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল এই সেই ছবি। যাঃ!

স্ট্যাটেনে পৌঁছেও আমরা স্টিমার থেকে নামিনি। বিবেক আর একবার লিবার্টিকে পিছনে রেখে টনি ও জয়ন্তীর দৃশ্য গ্রহণ করতে চায়। বৃষ্টি থেমেছে কিন্তু সন্ধে হয়ে আসছে। অতএব এই স্টিমারেই ফেরা দরকার। ফিরতি পথে মোটামুটি সন্তুষ্ট হল সে কাজ করে। সাউথ ফেরি থেকে স্টিমার ছাড়া প্রচুর নৌকো ছাড়ে বিভিন্ন দ্বীপে যাওয়ার জন্যে। আর, খুব ভালো লাগল পরিচিত দৃশ্য দেখে। আমাদের তীর্থস্থানের পাণ্ডাদের মতো সেইসব নৌকোয় ওঠার জন্যে প্রায় হাত ধরে টানাটানি করে দালালরা। কিছু জীবিকার ধরন পৃথিবীর সব জায়গায় একইরকমের।

সন্ধে হয়ে গেছে। মেঘ সরে গেছে। আকাশে এখন একটি-দুটি তারা। কিন্তু আকাশ দেখতে

গেল ঘাড় ব্যথা হয়ে যায়। আকাশচুম্বী বাড়িগুলোর আড়াল সরিয়ে ফাঁক খুঁজতে হয়। রমাপ্রসাদ নিউ ইয়র্কের আকাশ থেকে শহরের ছবি তুলতে চেয়েছিল। টিকিট কেটে আমরা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে ঢুকলাম। একশো আট তলায় এক মিনিটের কম সময়ে লিফটে ওঠা এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। শরীরেও মৃদু ঝাঁকুনি লাগে। তারপর সিঁড়ি ভেঙে ছাদে পা দিলেই যে অভিজ্ঞতা তার কোনও বিকল্প নেই। মাথা ঝুঁকিয়ে পনেরো কুড়ি পঞ্চাশ তলা বাড়ির ছাদ দেখতে হয়। নীচে হিরের মতো আলো জ্বলছে। আন্দাজে, আলো দেখে বুঝতে হয় ওইটে ব্রুকলিন ব্রিজ, ম্যানহাটন ব্রিজ। এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং শুধু পাল্লা দেয়। রাস্তায় যে গাড়িগুলো ছুটছে সেগুলো পিঁপড়ের চেয়ে বড় নয়। হাওয়া বইছে উত্তাল। অত উঁচুতে উঠলে মন বড় হতে বাধ্য। পাশে দাঁড়িয়ে এক জোড়া মানুষ যে কুইক ফিক্স লাগানো চুম্বনে আবদ্ধ সেদিকে তাকাতেও ইচ্ছে হয় না।

আগামীকাল শেষ দিন। মোটেলে ফিরে এসে হিসেব করছিলাম। বেলা একটার মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে এবং তারপর সবার ছুটি। ওই একবেলায় যা দেখার দেখে নাও। সবাই কামালকে ধরছে গাইড করার জন্যে। সকাল আটটায় এই সিরিয়ালের অন্যতম একটা দৃশ্য তুলতে হবে টনি এবং জয়ন্তীকে নিয়ে। ইচ্ছে করেই শেষ দিনের জন্যে কাজটা রেখেছে রমাপ্রসাদ। টনি ম্যানহাটন থেকেই ফিরে গিয়েছিল হার্লেমে। কথা আছে সকাল সাড়ে সাতটায় সে সিদ্ধার্থর বাড়িতে পৌঁছে যাবে। রাত এগারোটায় সুদীপ্তর টেলিফোন এল, 'সমরেশদা, এইমাত্র টনির ফোন পেলাম। ও আর আমাদের সঙ্গে শুটিং করতে রাজি নয়। কাল আসবে না বলছে।'

চমকে উঠলাম, 'সে কী? কেন? কী হয়েছে?'

'খুলে বলল না। শুধু বুঝলাম ও অপমানিত বোধ করছে।'

'অসম্ভব। কে ওকে অপমান করল?

'জানি না। আমাদের কেউ-কেউ রাস্তার কালোদের দেখে কালুয়া-কালুয়া বলে। হয়তো এতদিন একসঙ্গে থেকে মানে বুঝেছে। খুব রেগে গেছে আমাদের ওপর।'

'তুমি ওকে টেলিফোনে ধরো। বলো, আমি একবার কথা বলতে চাই। কাল সকালে যেন অবশ্যই আসে। আমার সঙ্গে কথা বলার পর ও যা ইচ্ছে তাই করতে পারে।'

রমাপ্রসাদের মুখ শুকিয়ে গেছে। আমার মাথায় বজ্রপাত। আগামীকালের দৃশ্যটি তুলতে না পারলে সিরিয়াল সম্পূর্ণ হবে না। পরশু দেশে ফিরতে হবেই। হাতে সময় নেই। এরকম সময়ে ছেলেটা বেঁকে বসল কেন? এতদিন তো বেশ সহজভাবে ও আমাদের সঙ্গে মিশছিল। আজ বিকেলেও ওর মধ্যে তেমন কোনও পরিবর্তন দেখিনি। জল্পনা করে কোনও লাভ নেই। আমরা ঘুমোতে পারছিলাম না।

ভোরবেলায় সিদ্ধার্থর বাড়িতে পৌঁছে দেখি সুদীপ্তর পাশে গম্ভীরমুখে দাঁড়িয়ে আছে টনি। দলের সবাই বেশ উত্তেজিত কিন্তু আমি টনিকে আলাদা ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার কী হয়েছে? সুদীপ্তকে কী বলেছ?'

টনি শক্ত মুখে বলল, 'আমি দুঃখিত কিন্তু আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।'

'কিন্তু কেন?' আমার খুব রাগ হচ্ছিল।

'আমি তোমাদের আগে জানতাম না, জানার পরে আর নয়।'

'কী জেনেছ তুমি আমাদের সম্পর্কে?'

টনি আমার মুখের দিকে তাকাল, 'তুমি অস্বীকার করতে পারো, তোমরা ভারতীয়রা প্রচণ্ড পরিমাণে রেসিস্ট?'

'তার মানে?'

'তোমরা জাতপাত মানো। নীচু জাতের মানুষদের ওপর অত্যাচার করো, তাদের পুড়িয়ে মারো। প্রতি বছর ভারতবর্ষে জাত নিয়ে দাঙ্গায় মানুষ মারা যায়। মিথ্যে কথা?'

হতভম্ব হয়ে গেলাম। কিন্তু অস্বীকার করতে পারলাম না, 'প্রতি দেশেই কিছু অশিক্ষিত প্রাচীন ভাবনার মানুষ থাকে। কিন্তু তাদের সংখ্যা অল্প, খুব অল্প।'

'তোমরা যদি শিক্ষিত হও তাহলে এটা থামাচ্ছ না কেন? প্রতিবাদ করেছ?'

'নিশ্চয়ই করা হয়।'

'মিথ্যে কথা। তোমাদের সঙ্গে কাজ করছি বলে আমার খারাপ লাগছে।'

'আমাদের ব্যবহারে সেটা মনে হয়েছে?'

'না। কিন্তু তোমরা কালোদের সম্পর্কে মোটেই শ্রদ্ধাশীল নও। ভ্যানে বসে অনেকেই কালুয়া কালুয়া করে।'

'ব্যাপারটা খুবই সাময়িক।'

'মোটেই না। তোমাদের দেশের ভালো ছেলেরা আমেরিকায় পড়তে বা কাজ করতে এসে আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করে, তাই তো?'

'হ্যাঁ। তবে প্রত্যেকেই নয়।'

'যারা করে তারা সাদা চামড়ার মেয়ে খোঁজে। আমাকে তুমি একটা কেস দেখাও যেখানে কোনও ভারতীয় ছেলে কালো মেয়েকে বিয়ে করে দেশে নিয়ে গেছে?'

হকচকিয়ে গেলাম। একটি উদাহরণও মনে পড়ল না। আমেরিকান মেয়ে বলতে আমরা সাদা চামড়ার মেমসাহেবই বুঝি। আবছা-আবছা মনে পড়ছিল একটি বাঙালি মেয়ের কথা যে কালো আমেরিকানকে বিয়ে করেছে। কিন্তু তার বিশদ বিবরণ মনে এল না। টনি হাসল। ব্যঙ্গের হাসি, 'তোমাদের গায়ের চামড়া কালো কিন্তু তোমরা সাদাদের ভক্ত। নেলসন ম্যান্ডেলার মিছিয়ে লক্ষ লক্ষ লোক কলকাতায় পা মিলিয়েছিল বলে শুনিয়েছ কিন্তু তাদের একজনও কি কোনও কালো মেয়েকে বিয়ে করে নিজের মায়ের কাছে নিয়ে যাবে? কক্ষনো না। তোমাদের এই সহানুভূতি জানানোটা পুরোটাই ভণ্ডামি।'

'তোমাকে এসব কথা কে বলল?'

'আমার হার্লেমের বন্ধুরা। কাল রাত্রে ওরা আমাকে খবরগুলো দিয়েছে।'

'তুমি এই সিরিয়ালে কী ভূমিকায় অভিনয় করছ? প্রথম দৃশ্যেই একটি ভারতীয় মেয়েকে সাদা ছেলেরা যখন বিরক্ত করেছিল তখন তুমিই তাদের মেরেছ, মেয়েটিকে বাঁচিয়েছ। তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ার পর মেয়েটি তার বাবার সঙ্গে সংঘর্ষে গিয়েছে কারণ তার বাবা কালোবিদ্বেষী। তোমার কি মনে হয় এগুলো তোমাদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে?'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে টনি বলল, 'আমি এই গল্পের শেষ জানি না।'

'জানো না মানে? তুমি চিত্রনাট্য শুনেছ।'

'হ্যাঁ। তাতে আছে মেয়েটি দেশে ফিরে যাচ্ছে। আমি চাকরি নিয়ে দূরে চলে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে মেয়েটির সম্পর্কের পরিণতি দেখানো হচ্ছে না।'

'সেটা আমাদের সিরিয়ালের প্রয়োজনেই দেখানো হচ্ছে না। কিন্তু প্রতিবাদের কথা বলা হয়েছে। সব কিছুই এক ফরমুলায় ঘটে না।'

'কিন্তু আমার মুখে প্রতিবাদের সংলাপ নেই কেন?'

আধ ঘণ্টা ধরে আমরা কথা বললাম। টনিকে বোঝাচ্ছিলাম যেভাবে পারি। কিন্তু সেইসঙ্গে বুঝতে পারছিলাম আমি নিজেই ঠিক নেই। এই আমি নিশ্চয়ই ব্যক্তিগতভাবে জাতপাত নিয়ে মাথা ঘামাই না, ধর্মের গোঁড়ামি দূরের কথা সেই ধরনের কোনও আচরণে বিশ্বাসী নই, সাদা মেয়ের বদলে সুগঠিতা কালো মেয়ের প্রতি বেশি আকর্ষণ বোধ করি কিন্তু আমার চারপাশের যাঁরা তাঁদের সপক্ষে কথা বলার চেষ্টা তো ভান ছাড়া কিছু নয়। আমরা যে সিরিয়ালটি করছি তার বক্তব্যের সঙ্গে আমরা আদর্শগত একমত হলেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুটিয়ে যাব। আমার বোঁন কিংবা মেয়ে

কোনও কালো আমেরিকানকে বিয়ে করতে চাইলে কি রাজি হতে পারব? আমি যেহেতু একজন বঙ্গসন্তান তাই চেহারা অন্যরকম হবে কী করে? বাঙালি ঘরের বাইরে আদর্শের বুলি কপচায়, ঘরে ঢুকে চোখ বন্ধ করে। ময়দানের মিছিলে যে বাঙালি বিক্ষোভে আকাশের দিকে হাত তোলে বাড়ি ফিরে এসে কোনও বিক্ষুব্ধকে দেখলে সেই হাতের আঙুল ছড়িয়ে চড় মারতে দ্বিধা করে না। এখনকার অনেক মধ্যবয়স্ক বাঙালি বাড়ির বাইরে অশ্লীল শব্দ ব্যবহারে হ্যা-হ্যা করে হাসে কিন্তু বাড়িতে ছেলের সামনে সাধু সেজে থাকে। এই ভান করা আমাদের রক্তে মিশে গেছে। ফলে টনিকে বোঝাতে আমার কিছু সময় লাগলেও শেষপর্যন্ত সে নিমরাজি হল কাজটা শেষ করতে। ইউনিটের সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

শেষ দৃশ্যটি ওকে বলে ঘোষিত হওয়ামাত্র আবেগে ভেসে গেল সবাই। এ ওকে জড়িয়ে ধরতে লাগল। এতদিন বিদেশে বাস করেছে সবাই অনেক কষ্ট মানিয়ে নিয়ে। কলকাতায় শুটিং করতে যত লোকের প্রয়োজন হয় তার অর্ধেক ইউনিট নিয়ে পুরো কাজ শেষ করার মধ্যে যে জেদ ছিল তাই আবেগ তৈরি করল। কিশোর, ভানু এবং লালু এই তিনজন কর্মী পনেরোজনের কাজ করেছে ভোর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত। আমাদের হাতে ডলার ছিল না, স্বাচ্ছন্দ্য কিনতে পারিনি তাই, কিন্তু তাই নিয়ে কোনও শিল্পী একটুও বিব্রত করেননি। তবু কোথাও আটকে না গিয়ে আমার যে শেষ দৃশ্যটিও তুলে নিতে পারলাম তার জন্যে আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম।

আজ সবার ছুটি। শুধু সন্ধের পর সিদ্ধার্থর বাড়িতে চুটিয়ে আড্ডা। কাল দুপুরে ছুটতে হবে কেনেডি এয়ারপোর্টে। কামালের ভ্যানে সবাই ছুটল ম্যানহাটন। এতদিন শুটিং-এর প্রয়োজনে সবাইকে ভ্যানে তোলা হল। শংকর ঘোষ ঘোষণা করল প্রত্যেকে পৌঁছে গেছে। কামাল ছুটল কুইন্সের দিকে, সুদীপ্তকে পৌঁছে দিতে। এতদিন দলের সঙ্গে থেকেছে সুদীপ্ত। এখন থেকে একা হয়ে যাবে। তার মন খুব খারাপ। অর্ধেকটা পথ যাওয়ার পর সে বলল, 'একটা রাত তাই বা কম কী। আমি আজও তোমাদের সঙ্গেই থাকব। কাল থেকে তো একা হতেই হবে।' অতএব ভ্যান ফিরল নিউজার্সির দিকে। কেউ-কেউ অনুরোধ করল ফর্টি সেকেন্ডে স্ট্রিটের ওপর দিয়ে ফেরার জন্যে। সেটা বেশ ঘুরপথ হবে কিন্তু কামাল আপত্তি করল না। ফর্টি সেকেন্ড স্ট্রিটের মোড়ে গাড়ি আসা মাত্র তাকিয়ে দেখতে পেলাম ফুটপাত থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল একটা মূর্তি। দু-হাত আকাশে তুলে থামাতে চাইল আমাদের। কামাল গাড়ি থামাতেই মূর্তিটি ভ্যানের দরজা খুলে চুপচাপ উঠে পেছনের একটা আসনে বসে পড়ল। আমরা হতভম্ব। মদনসুদনজি।

চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। আধঘণ্টা আগে আমরা যখন এই জায়গা ছেড়ে গিয়েছি তখন ভদ্রলোক ভ্যানে ওঠেননি। জানতেও পারেননি ভ্যান চলে গেছে। যখন জানলেন তখন খেয়াল হল সিদ্ধার্থর বাড়ির টেলিফোন নম্বর ওঁর কাছে নেই। কীভাবে ফর্টি সেকেন্ড স্ট্রিট থেকে ক্রোস্টারে যেতে হয় তাও জানেন না। রাত বাড়ছে। কিছু কালো ড্রাগখাওয়া মানুষ ছাড়া জায়গাটা নির্জন। তাদের কেউ-কেউ এরই মধ্যে ওকে বিরক্ত করেছে। এরকম পরিস্থিতিতে ওখানে প্রায়ই নানান কাণ্ড ঘটে থাকে। মদনসুদনজি হেসে বললেন, 'একবার আমি ওড়িশার জঙ্গলে পথ হারিয়েছিলাম, সেইরকম ব্যাপার। তবে আপনাদের প্রোডাকশন ম্যানেজারকে এখানে রেখে গেলে ভালো করতেন।' প্রচণ্ড রেগে গিয়ে শংকরের দিকে তাকালাম। সে গুণে সবাইকে ভ্যানে তুলেছিল। চোখাচোখি হতে কাঁধ নাচাল। বিড়বিড় করে বলল, 'কেউ নাবালক নয়।'

সেই রাত শেষ রাত। সিদ্ধার্থর বাইরের ঘরে আড্ডা জমজমাট হচ্ছিল না। একটা বিষাদ প্রত্যেকের মনে ছায়া ফেলছিল। বনানী খাবার সরবরাহ করে চলেছেন সমানে। এই দম্পতির কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এঁরা পাশে এসে না দাঁড়ালে আমাদের স্বপ্ন, স্বপ্নই থেকে যেত। আড্ডার ফাঁকে কামাল আমাকে ডাকল। হাত ধরে বলল, 'তোমাদের কাজ শেষ হয়েছে বলে আমি খুব খুশি। কিন্তু তুমি নীনাকে ভুল বুঝো না। ওর মনটা সত্যি ভালো।'

আমি অবাক। কামালের মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তুমি ওকে সত্যি ভালোবাসো।'

কামাল হাসল, 'নীনা আমার স্বর্গ।'

আর কথা বলতে পারিনি। এই মানুষটি চব্বিশ ঘন্টা আমাদের পাশে না দাঁড়ালে শুটিং করতেই পারতাম না। এই কারণে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি তো ওর হয়েছেই, স্ত্রীর সঙ্গে বিরোধের চূড়ান্ত চেহারা আমরা দেখেছি। খোলা দিল বলেই বোধহয় বেচারা দিনরাত ঢেউ-এর ধাক্কায় টালমাটাল হয়।

আজ রাত্রে নিশ্চিন্তে ঘুম। মোটেলের বিছানায় শুয়ে ঘুমের মধ্যে মনোজ এল। সেই দাড়ি, সেই চকচকে চোখ, সেই সরল হাসি। উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'মনোজ আমি পেরেছি। আপনার ইচ্ছেটাকে একটা রূপ দিতে চেষ্টা করেছি।' মনোজ হাসল, 'আপনাকে তো আমি লিখেছিলাম, আপনি আমার ছবিটাকে আমার পরে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। তাই না?' স্বপ্ন ভেঙে গেল। আর ঘুম এল না। দরজা খুলে দোতলার বারান্দায় দাঁড়ালাম। নিঝুম চারধার। আলোগুলো ভুতুড়ে। মনোজের ইচ্ছে কি ঠিকঠাক শেষ করতে পেরেছি? জানি না কিন্তু অদ্ভুত আনন্দ হচ্ছিল। হঠাৎ দেখি এই মাঝরাত্রে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল নীচে। দরজা খুলে নামল সেই মেয়েটি। ভেতর থেকে কেউ বলল, 'ইউ আর এ গুড বেবি।'

হঠাৎ মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল, 'নো। আই অ্যাম স্পয়েল্ড, রটন, রটন, রটন।' বলে ছুটে গেল টলটলে পায়ে এক নম্বর ঘরের দিকে। গাড়িটা ফিরে গেল। আমি চোখ বন্ধ করলাম। কখনও-কখনও সব মানুষেরই সত্যি কথাটা উচ্চারণ করতে হয়।

দমদমে পা দিয়ে প্রতিবারই আনন্দিত হই। নিজের ঘরে ফিরে টেবিলে জমানো চিঠি দেখলে খুশি হই। খামের মুখ খুললাম। হাত কাঁপতে লাগল। রেজিস্ট্রি চিঠিটা সই করে রেখে দেওয়া হয়েছে আমার জন্যে। ভেতরে কি আছে কেউ জানত না। উকিলমশাই লিখেছেন, 'তাঁর মক্কেলের অনুমতি না নিয়ে তাঁর স্বামীর লেখা আমি সিরিয়ালে রূপ দিতে পারি না। কাজটা করে আমি অত্যন্ত অন্যায় করেছি।' আমার হাতের কাছেই মনোজের স্ত্রীর নিজের হাতে সই করা অনুমতিপত্র ছিল। পাশাপাশি রাখলাম। মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ। কোথাও ভুল হয়েছে। বারংবার এইরকম ভাবতে চেষ্টা করছিলাম।

আরও ভ্রমণ

পায়ে পায়ে পাহাড়ে

এই দু-কুড়ি বছরে দার্জিলিং-এ গিয়েছি অন্তত উনিশবার, কিন্তু সান্দাকফু যাওয়া হয়নি কখনও। পা থাকলেই যদি পাহাড়ে হাঁটা যায় তাহলে ঘুম থেকে সান্দাকফুর দূরত্ব এমন কিছু নয়, মাত্র একান্ন কিলোমিটার। জিপের রাস্তা শুনেছিলাম তৈরি হয়েছে কিন্তু সেটা প্রায় প্রাণ হাতে নিয়ে যাওয়া। যেতে হলে হেঁটে যাওয়াই শ্রেয় কিন্তু ওরকম ধু-ধু প্রান্তরে খাড়া-খাড়া পাহাড় ডিঙিয়ে কিলোমিটার ভাঙব, ভাবতেই অস্বস্তি হত। অথচ সান্দাকফু হল সেই জায়গা যেখান থেকে পুরো হিমালয়কে ১৮০°-তে দেখা যায়। এভারেস্ট এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন স্পর্শের মধ্যে চলে আসে। লোভ হত কিন্তু সাহসটাই হত না।

তাসের আড্ডায় আচম্বিতে আমরা পাঁচজন সেই সাহসটাই করে ফেললাম। চল্লিশ যখন ছুঁয়েছি, পঞ্চাশ আসতে দেরি হবে না। শরীরটা অকেজো হওয়ার আগে ঘুরে আসা যাক। পৃথিবীতে এত সুন্দর জায়গা যখন আর নেই এবং আমাদের পশ্চিম বাংলার সম্পদ বলে প্রচারিত তখন হাঁটা শুরু করা যাক।

পাঁচ জনের মধ্যে ছিলেন মুকুন্দ দাস। তাঁর ছাড়া আমাদের কারোর হাঁটার অভিজ্ঞতা নেই। এখন যা অবস্থা হয়েছে দুটো স্টপেজ যেতে ট্রামের শরণাপন্ন হতে হয়। রাজি হওয়ার পরও নার্ভাসনেস যাচ্ছিল না। প্রথমে ট্যুরিস্ট ব্যুরোর শরণাপন্ন হলাম। সরকারি প্রচারে কখনোই আমার তেমন আস্থা নেই। ওঁরা বলেছিলেন, অপূর্ব জায়গা, ট্রেকারদের স্বর্গ। কিন্তু হাঁটতে একটুও অসুবিধে হবে না। পথে অনেক পাহাড়ি গ্রাম পাবেন, রাত্রে শোওয়ার জায়গা পাবেন। সরকারি বাংলো এবং ইয়ুথ হোস্টেল আছে ছড়ানো। দার্জিলিং থেকে সেগুলোয় জায়গা রিজার্ভ করে রওনা হয়ে পড়ুন। তবে হ্যাঁ, সঙ্গে স্লিপিং ব্যাগ নেবেন। বারো হাজার ফুট উঁচু তো।

কলকাতায় লেপ লাগে না অতএব স্লিপিং ব্যাগ চোখে দেখিনি কখনও। নতুন কেনার মানে হয় না। আনন্দবাজারের বিশ্বদেব বিশ্বাস এগিয়ে এলেন। কিছু-কিছু সমতলের মানুষকে পাহাড় সবসময়ই চুম্বকের মতো টানে। কলকাতায় দেখলাম এরকম প্রচুর মানুষ ছড়ানো। বিশ্বদেব এঁদের একজন। সার্দান অ্যাভিনিউর একটি সংস্থা স্লিপিং ব্যাগ, রুকস্যাক এবং টেন্ট নামমাত্র মূল্যে ভাড়া দেন। বিশ্বদেব তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। দেখলাম প্রচণ্ড ভিড় সেখানে, সবাই পাহাড়ে যাচ্ছে। অতএব হাতে পেলাম না জিনিসগুলো। একটা দল পাহাড়ে যাচ্ছে, তারা শিলিগুড়ি রকেট বাস-টার্মিনাসে ওগুলো আমাদের দিয়ে কলকাতায় ফিরবে ঠিক হল।

এরপরে বাজেট। বিশ্বদেব যা হিসেব করলেন তাতে দেখা গেল পাঁচশো টাকা হলে এক একজন সান্দাকফু-ফালুট-রাম্মাম এবং রিম্বিক হয়ে কলকাতায় ফিরে আসতে পারবেন। বিশ্বদেব বললেন, ভরপেট খেয়ে কখনও হাঁটবেন না। সঙ্গে শুকনো ফল এবং গ্লুকোজ ডি নেবেন। বিস্কুট আর চিজ রাখবেন প্রচুর। হাঁটতে গেলে জুতো চাই। হান্টিং শু হলে ভালো হয়। মুকুন্দ পাঁচজনের জন্যে তাও যোগাড় করে নিয়ে এল।

নতুন ট্রেন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। বিকেলে শিলিগুড়ি পৌঁছোনো মানে দিনটাই নষ্ট। দার্জিলিং মেলই ভালো। ওয়েটিং রুমে স্নান সেরে নিয়ে পাঁচজনে রিকশায় উঠলাম।

রিকশায় আমার পাশে মদন, বিখ্যাত কুস্তিগীর গোবর গুহ ওর জ্যাঠামশাই। অবশ্য চেহারায় মালুম হয় না মোটেই। মদনের কৌতূহল সব খুঁটিনাটি ব্যাপারে। শহরটা দেখতে-দেখতে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা মশাই, শিলিগুড়ি শব্দটার মানে কী?'

ব্যাপারটা জানা ছিল। বললাম, 'শিলিগুড়ি মূল শব্দের বিকৃত উচ্চারণ। মূল শব্দ ছিল শ্যালিগ্রি। লেপচাদের ভাষা। নেপালিরা সেটাকে করল শিলগুড়ি। ইংরেজরা বলল শিলিগুড়ি। মূল কথাটার অর্থ, 'ধনুকে ছিলা পরাও।'

মদন বলল, 'বাঃ। যুদ্ধ-টুদ্ধ হয়েছে নাকি।'

ঠিক তাই।

তখন সিকিমের সপ্তম রাজা শুক পুট নামগেল-এর আমল। সেটা ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দ। ইংরেজ সৈন্যবাহিনীতে শিক্ষিত পাঞ্জাবি এবং গোর্খা রাইফেলধারী ছিল। লেপচারা প্রাণপণে লড়ে গেল ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে। গল্পে আছে সেই যুদ্ধে প্রচুর ইংরেজ সৈন্য মারা যায় কিন্তু লেপচাদের পক্ষে মাত্র একটি সৈনিক নিহত হয়। তার নাম ডুনো র‍্যাপগে। ডুনো লেপচাদের নায়ক হয়ে গেছে। একটা শুকনো গাছের খোলে লুকিয়ে ডুনো বিষাক্ত তির ছুড়ে ইংরেজ সৈন্যদের মেরে গেছে। ইংরেজরা প্রথমে তার হদিশ পায়নি। শেষপর্যন্ত অবশ্য ডুনো আবিষ্কৃত হয়। একজন প্রায় অশিক্ষিত সৈনিক কীভাবে এত বীরত্ব দেখাতে পারে তা ইংরেজদের বিস্ময়ে ছিল। ওই গাছের খোলে ডুনো সাতদিন লুকিয়ে ছিল কিন্তু তার শক্তি বিন্দুমাত্র কমেনি। কারণ অনুসন্ধানের জন্যে ডুনোর পেট কাটা হয়েছিল। দেখা গেল সে কোনও উত্তেজক খাবার খায়নি। কাচিক ন্যায়ম নামে এক উদ্ভিদের পাতা পাওয়া গিয়েছিল তার পেটে। অসম্ভব প্রাণশক্তি যোগায় এই পাতা। ডুনোর এই বীরত্বে লেপচারা উদ্বুদ্ধ হল। প্রতিটি মুহূর্তে ওরা লড়াই-এর জন্যে তৈরি থাকত। এমনকী রাত্রে ওরা ঘুমত হাঁটুতে বুক এবং হাতের মুঠোয় তরোয়াল নিয়ে।

শেষপর্যন্ত ইংরেজ সৈন্যদের তাড়িয়ে লেপচারা নেমে এল সমতলে। এখানে পঞ্চম পাঞ্জাবি রেজিমেন্ট তাদের প্রতিরোধের জন্যে অপেক্ষা করছিল। নতুন যুদ্ধ আসন্ন জেনে লেপচা কমান্ডার আদুপ দোলে চিৎকার করে বললেন, 'শ্যালিগ্রি'। কথাটার মানে ধনুকে ছিলা পরাও।

জায়গাটার নাম হয়ে গেল শ্যালিগ্রি। তারপর শিলগুড়ি এবং শিলিগুড়ি।

টাউন স্টেশনের কাছে রেলওয়ে ক্রসিং-এর কাছে আমাদের রিকশা দাঁড়িয়ে পড়েছে। মুকুন্দ ঘন-ঘন ঘড়ি দেখছে। সকাল দশটায় আমাদের স্লিপিং ব্যাগ দেওয়ার জন্য লোক আসবে। দেরি হলে মুশকিল হবে। চারধারে তাকিয়ে মদন বলল, 'সবরকম লোক আছে এই শহরে, না?'

'হ্যাঁ। প্রকৃত অর্থেই কসমোপলিটান টাউন। পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহৎ ব্যাবসাকেন্দ্র। আগে এখান থেকে কলকাতায় ট্রেনে যেতে লাগত পুরো একটা দিন। এখন সন্ধেবেলায় কলকাতা ট্রেনে চেপে ভোরে শিলিগুড়িতে নামছে। শহর বাড়ছে কিন্তু একটুও পরিকল্পনা নেই কোথাও। যে যেমন পারছে মাথা গুঁজছে। পাহাড় থেকে নেমে আসা মানুষ, ভারতবর্ষের নানান জায়গা থেকে ধান্দাবাজ মানুষ এখানে ভিড় করছে। পাশেই নেপাল আর বাংলাদেশ বলে চোরাই জিনিসের বিশাল কারবার এখানে। এত বার পশ্চিমবঙ্গের কোনও শহরে আছে কি না সন্দেহ। সিকিম ভুটানের সস্তায় তৈরি মদের ছড়াছড়ি। স্মাগলারদের একটা বাজার আছে এখানে।'

ছাড়া পেয়ে রিকশাওয়ালা জোর পায়ে প্যাডেল ঘোরাল। রকেট বাস টার্মিনাস পর্যন্ত মাত্র চার টাকা ভাড়া। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন শিলিগুড়ির মুখে কিন্তু আটাশ মাইল দূরের শহর জলপাইগুড়ি এখানে থাবা বসিয়েছে। এই বিশাল স্টেশন তৈরির পেছনে জলপাইগুড়ির লোকের দান ছিল বলেই কি এই সাম্রাজ্যবাদ। মালপত্র নামিয়ে আমরা স্লিপিং ব্যাগের অপেক্ষায় দাঁড়ালাম। ডুয়ার্স, আসাম, সিকিম এবং দার্জিলিং যাওয়ার এক মাত্র এইটে। পাশেই দার্জিলিং-এর বাস স্ট্যান্ড। খুব চিৎকার চেঁচামেচি সেখানে।

দুপুর গড়াল। সামনের হোটেল থেকে খাওয়া দাওয়া সেরেছি কিন্তু স্লিপিং ব্যাগের দেখা

নেই। মুকুন্দ ঘন-ঘন ঘড়ি দেখছে। স্লিপিং ব্যাগ ছাড়া যাওয়া বৃথা। অথচ ওদের দশটার মধ্যে আসার কথা ছিল। ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়লাম সবাই। এদিকে দুটো বেজে গেছে। দার্জিলিং-এর বাস স্ট্যান্ড ফাঁকা। এতদূরে এসে ফিরে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। কল্যাণ বলল, 'অত বড় দার্জিলিং শহরে স্লিপিং ব্যাগ চেষ্টা করলে পাওয়া যাবে না? গিয়েই দেখা যাক।'

চোখের সামনে বাস নেই অতএব ঢলে আসা সূর্য কাঁধে নিয়ে অ্যাম্বাসাডার ভাড়া করতে হল। সন্ধের আগে দার্জিলিং-এ পৌঁছতে চাই। খরচ বাড়ল প্রথম পায়েই, কী করা যাবে। কথা দিয়ে যারা কথা রাখে না, তাদেরও কখনও কখনও কারণ থাকে।

পকেট থেকে ম্যাপটা বের করে ফেললাম। দার্জিলিং থেকে সকাল সাড়ে সাতটার বাসে চেপে যাব মানেভঞ্জঙ্গ। সাত হাজার ফুট উঁচু। এখান থেকেই আমাদের ট্রেকিং শুরু হবে। প্রথম রাত্রিবাস টংলুতে। ওখানে ডি. আই. বাংলো আছে। উচ্চতা দশ হাজার ফুট। পরদিন সকালে টংলু থেকে বেরিয়ে বাইশ কিলোমিটার হেঁটে এগারো হাজার ন'শো উনত্রিশ ফুট উঁচু সান্দাকফুতে। একদিন সেখানে কাটিয়ে একুশ কিলোমিটার হেঁটে ফালুটে। সেটাও মোটামুটি একই উচ্চতা। তারপর পনেরো কিলোমিটার হেঁটে নেমে আসব রামাম ফরেস্ট বাংলোয়। রামাম থেকে উনিশ কিলোমিটার রিম্বিক। রিম্বিকের ছয় কিলোমিটার নীচে বাসবোতে থেকে বাস ধরে আমরা আবার দার্জিলিং ফিরে আসব। ঠিক সাত দিন লাগবে হাঁটাপথে বেড়িয়ে আসতে। কিন্তু ম্যাপটা যত দেখছি শরীর তত শিরশির করছে। এত রাস্তা আমি হাঁটব, এত রাস্তা। দশ হাজার পার হলেই নাকি ব্লিজার্ড বয়, বরফবৃষ্টি হয়। মেঘ ধুয়ে গেলে পায়ের তলায় বরফ জমে। সঙ্গীত বা খেলাধূলায় সাফল্য পেতে গেলে অনুশীলন অবশ্যই দরকার। একমাত্র গল্পলিখিয়েদের শুনেছি সে বালাই নেই। ট্রেকারদেরও কি তাই?

এর মধ্যে প্রায় দু-ঘণ্টা কেটেছে। আমরা কার্সং শহরে ঢুকেছি। এটাও লেপচা শব্দ। অর্থ ভোরের উজ্জ্বল তারা। শুকতারা। নেপালিরা শব্দটাকে উচ্চারণ করত খার্সাং। ইংরেজরা বানিয়ে নিল কার্সিয়াং। বিকেল ফুরিয়ে এল। পুরো দার্জ্যল্যাঙ্গ দেখা যাচ্ছে। দার্জিলিং-এর মূল উচ্চারণ। এই লেপচা শব্দটির মানে হল ভগবানের বাসস্থান। অর্থাৎ পৃথিবীর স্বর্গ। পরে সিকিমের ষষ্ঠ রাজা টেন্ডন নামগেল চৌরাস্তার ওপর অবজারভেটরি হিলে একটা মন্দির তৈরি করে নাম দেন দোর্জেলিং দোর্জের জায়গা, বজ্র।

১৮১৭ এবং ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে সিকিম এবং নেপালের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ দেখা দিয়েছিল। ব্যাপারটা ইংরেজ সরকারের কাছ পেশ করা হলে জে. ডব্লু. গ্রান্ট নামে একজন সাহেব এলেন মধ্যস্থতা করতে। গ্রান্ট সাহেব দার্জ্যল্যাঙ্গের আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে এত মুগ্ধ হন যে তিনি তখনকার গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ককে চিঠি লেখেন অবিলম্বে জায়গাটাকে দখল করতে। শুধু স্বাস্থ্যনিবাস নয়, তিব্বত-নেপাল-ভুটান এবং অধিকৃত ভারতভূমির ওপর ক্ষমতা বিস্তারের কেন্দ্র হিসেবে এর ভৌগোলিক অবস্থান মূল্যবান। কথাটা ইংরেজদের মনে ধরল এবং তারা সিকিমের সপ্তম রাজা শুক পুট নামগেল-এর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগল যাতে অর্থের বিনিময়ে দার্জ্যল্যাঙ্গ পাওয়া যায়। এই নামগেল পরিবার ছিলেন ভুটিয়া। যখন ইংরেজদের জালে জড়িয়ে পড়ে রাজা মাত্র তিনশো পাউন্ডের বিনিময়ে হস্তান্তরে সম্মত হলেন, তখন লেপচা প্রজারা সেটাকে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে চিহ্নিত করল। প্রথমে ঠিক ছিল টাকাটা বাৎসরিক খাজনা হিসেবে ইংরেজরা দেবে। কিন্তু ইংরেজ সরকার ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের পয়লা ফেব্রুয়ারি দার্জ্যল্যাঙ্গকে ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে নিয়ে এলে সে প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেল। ওরা টেন্ডল নামগেল প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটিকে অবজারভেটার হিল থেকে তুলে নীচের ভুটিয়া বস্তিতে সরিয়ে দিল। এবং তখন থেকেই ইংরেজরা দার্জ্যল্যাঙ্গকে উচ্চারণ করতে

লাগল দার্জিলিং। পরবর্তীকালে এখানে বাস করতে আসা নেপালিরা শহরটির নাম করত দার্লিং হিসেবে যদিও সেটা দার্জিলিংকে সরাতে পারেনি।

রোদের রং ফ্যাকাশে হলুদ, ক্যাভেন্ডার রেস্তোরাঁরা নীচে আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। সামনেই একটি নেপালি ট্রাফিক পুলিশ, পথে ট্যুরিস্টদের ভিড়। ঠিক আছে আমরা ডি. সি. চম্পকবাবুর সঙ্গে দেখা করব এবং তিনি আমাদের থাকায় জায়গা ব্যবস্থা করেছেন। সামনের একটা দোকান থেকে ডি.সি.-র বাড়িতে টেলিফোন করতেই দ্বিতীয় হোঁচট খেলাম। চম্পকবাবু দার্জিলিং-এ নেই, আগামীকাল ফিরবেন। এর মধ্যে সোয়েটার পরে নিয়েছিলাম প্রত্যেকে তবু যেন ঠান্ডা বেড়ে গেল। এখন হোটেল খুঁজতে হবে। হঠাৎ কী মনে হতে গাইড দেখে নম্বর বের করে টেলিফোন করলাম। সুন্দর একটি গলা আমার নাম শুনে উচ্ছ্বসিত হল, 'চলে আসুন আমার এখানে, চা খেতে-খেতে ঠিক করা যাবে কোথায় থাকবেন। একটু এগোলেই বাড়িটা দেখবেন। মিডো ব্যাংক। দু-নম্বর। কোনও অসুবিধে হবে না। এরকম সহজ আন্তরিক উদাত্ত কণ্ঠস্বর বড় একটা শোনা যায় না আজকাল।

ম্যালের ঠিক নীচে তাপসবাবুর বাড়ি। তিন পুরুষ আছেন দার্জিলিং-এ। কোনওদিন যে পরিচয় ছিল না তা পাঁচ মিনিট বাদে বোঝা মুশকিল হল। শ্রীমতী মুখার্জি লক্ষ্ণৌর মেয়ে, এমন মিশুকে দম্পতিকে পেয়ে ভালো লাগল। তাপস বললেন, কোনও চিন্তা করবেন না, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। চা শেষ হতে না হতেই অভিজিত চৌধুরী এলেন। বোধহয় ওঁর আনুকূল্যেই আমরা একটা চমৎকার ফ্ল্যাট পেয়ে গেলাম। মুকুন্দর মাথায় তখন স্লিপিং ব্যাগ ঘুরছে। তাপস সেটা শুনে টেলিফোনের ডায়াল ঘোরালেন, 'হ্যালো ইয়ুথ হোস্টেল! ক্যাপ্টেন মোক্তান? আমাদের পাঁচ জন বন্ধু এসেছেন কলকাতা থেকে, সান্দাকফু ট্রেক করবেন। স্লিপিং ব্যাগ দরকার। ও কে'! সংলাপ নেপালি ভাষায়। টেলিফোন নামিয়ে বললেন, 'ডান।'

পরদিন দুপুরে তাপসের সঙ্গে আমি গেলাম দার্জিলিং-এর ডি. সি. চম্পক চ্যাটার্জির অফিসে। পরিচয় পাওয়ার পর চম্পকবাবু জানালেন, আমি তো কোনও চিঠি পাইনি। অরুণ লিখলে—।'

আমি কী করব বুঝতে পারছি না। বাংলো যদি না পাওয়া যায় তাহলে সান্দাকফুতে যাত্রা করা বৃথা। চম্পকবাবু তাঁর অফিসকে নির্দেশ দিলেন রিজার্ভেশনের খাতা আনতে। দেখা গেল সান্দাকফুর ডি. আই. বাংলো আগামী এক মাস খালি নেই। একমাত্র টংলুর বাংলো এক রাতের জন্যে পাওয়া যেতে পারে। যেন দিল্লি যাব সেখানে জায়গা নেই তবে কানপুরে একদিন থাকতে পারেন। ডি আই বাংলো ছাড়া আছে ইয়ুথ হোস্টেল আর পি ডবুল ডি বাংলো। প্রথমটির দায়িত্ব ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের, পরেরটি একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের। সেদিন সকাল থেকেই দার্জিলিং-এর টেলিফোন মৃত হয়ে গেছে। তার ওপরে শহরে প্রচণ্ড জলাভাব দেখা দেওয়ার চম্পকবাবুকে ছুটতে হচ্ছে জলপাহাড়ে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে কথা বলতে। তাপস বললেন, 'চলুন চেষ্টা করে দেখি।'

ফরেস্ট অফিসে এক নেপালি ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ, সান্দাকফুর ইয়ুথ হোটেল খালি আছে, তবে সেটা বাসযোগ্য নয়। মানে দরজা জানলা নেই, জিরো ডিগ্রির বাতাসে বড় কষ্ট হবে। তবে রিম্বিক আর রামানের বাংলো বুক করে কাগজ দিচ্ছি। টাকা পয়সা ওখানেই দিয়ে দেবেন।'

তাপস তাকালেন, 'কী করবেন?'

বললাম, 'যা পাওয়া যাচ্ছে তাই নেওয়া যাক।'

ওখান থেকে বের হতে হতে পাঁচটা বেজে গেল। প্রচণ্ড হাওয়া বইছে তখন। গাড়ি নিয়ে আমরা ছুটে এলাম আর এক প্রান্তে। এসে দেখলাম ডি ডবলু ডি অফিস বন্ধ। তাপস একটু চিন্তা

করে আমায় নিয়ে নেমে গেলেন নীচে, ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে। ভদ্রলোক পরিচয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা হেঁটে যাবেন?'

মাথা নাড়লাম, 'হ্যাঁ।'

দাশগুপ্ত সাহেব বললেন, 'পারেন বটে! কিন্তু মুশকিল হল আমরা তো বাংলো ভাড়া দিই না। অফিসাররা না গেলে থাকতে দেওয়া হয়। তা আপনারা যখন যেতে চাইছেন তখন কয়েকজন অধ্যাপক যাবেন। ঠিক আছে আমি ওদের অনুরোধ করব যাতে ওঁরা দুদিন বাদে যান। কিন্তু অফিস বন্ধ হয়ে গেছে তাই ছাপানো ফর্মের অর্ডার দিতে পারছি না। নিজের প্যাডে বাংলোর চৌকিদার শ্রীগণেশকে উনি লিখে দিলেন আমাদের দুই রাত থাকতে দেওয়ার জন্যে। লিখে মন ভরল না। শ্রীগণেশ ছাপানো ফর্ম চেনে, সে লেখা বুঝবে না ভেবে তাঁর নেপালি পরিচারিকাকে দিয়ে দু-লাইন নেপালিতে তর্জমা করিয়ে দিলেন।

ইয়ুথ হোটেলে পৌঁছোতে রাত হয়ে গেল। সন্ধের পর দার্জিলিং-এ বড় একটা আলো জ্বলে না। ক্যাপিটাল সিনেমার ওপরের রাস্তা ধরে পাহাড়ের একদম চূড়োয় চমৎকার বাড়ি। ক্যাপ্টেন মোক্তান বছর পঞ্চাশের পাহাড়-পাগল মানুষ। হাত বাড়িয়ে বললেন, 'যে কোনও ট্রেকার আমার আত্মীয়। পাহাড়ে হাঁটুন, এর চেয়ে আনন্দ কোথাও পাবেন না।'

'স্লিপিং ব্যাগ পাওয়া যাবে?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি চাই যারা হাঁটতে এসেছেন তাঁরা আমার ইয়ুথ হোটেলে থাকুন। মেম্বার হলে ছ'টাকা আর সাধারণদের জন্যে আট। এখানকার পরিবেশ আপনাকে উৎসাহিত করবে।

এক রাত্রের জন্যে জায়গা বদলানোর কোনও মানে হয় না। আমরা পাঁচটা স্লিপিং ব্যাগ আর রুকস্যাক নিলাম। তাপস থাকায় কোনও আগাম জমা লাগল না। ক্যাপ্টেন মোক্তান বললেন, 'কোনও বাড়তি জিনিস সঙ্গে নেবেন না। সার্ট, প্যান্ট, ফুলস্লিভ সোয়েটার আর বাঁদুরে টুপি, এই যথেষ্ট। হাঁটার সময় দেখবেন গরম হবে। ড্রয়ার পরলে হাঁটতে কষ্ট হবে। বেড়াতে-বেড়াতে যাবেন, যদি কষ্ট হয় জিরিয়ে নেবেন। কোনওরকম মানসিক চাপকে আমল দেবেন না। সঙ্গে বিস্কুট আর চিজ রাখবেন। পথে কোনও ভারী খাবার খাবেন না। সান্দাকফু হল ট্রেকারদের স্বর্গ। ঘুরে আসুন।'

এই সব কথা শুনতে-শুনতে মনে হচ্ছিল সান্দাকফু যাওয়া এমন কোনও ব্যাপারই নয়। নাই বা থাকল আমাদের অভিজ্ঞতা। আস্তানায় ফিরে দেখলাম বন্ধুরা বাজার করে এনেছে। চিজ, পাউরুটি, মাখন, শুকনো ফল, চিনি চা থেকে শুরু করে কী যে নেই। সঙ্গে আনা হাঁড়ি কুঁড়ি রেখে যাওয়া ঠিক হল। ও সব বাংলোগুলোতে পাওয়া যাবে। মদন পৃথিবীর সমস্ত রোগ সারাবার ওষুধ এনেছে।

কাঁধে রুকস্যাক তাতে স্লিপিং ব্যাগ এবং ব্যক্তিগত জিনিস। ভোরবেলায় বাস স্ট্যান্ডের দিকে যেতে-যেতে প্রণব বলল, 'বিশ কেজি হবে। এই মাল নিয়ে হাঁটতে পারব?' দুই বগলের ফাঁকে রুকস্যাকের স্ট্র্যাপ ঢুকিয়ে হাঁটতে বেশ মজা লাগছিল। মুকুন্দ ঠাট্টা করল, 'এই জন্যে বাঙালি ডুবল। বিশ কেজি তাও বইতে পারবি না!' কিন্তু সমস্যা হচ্ছিল ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া বায়োয়ারি ব্যাগটা। ওটা কে বইবে? চাল ডাল আলু পেঁয়াজ ঢুকবে মানেভঞ্জন থেকে।

দার্জিলিং থেকে বাসে চেপে ঘুম। সোজা রাস্তা নেমেছে শিলিগুড়ির দিকে। বাঁ দিকে কালিম্পং আর টাইগার হিল। ডান দিকের পথ সুকিয়াপোখরির। মিনিট তিরিশেক লাগে। কদিন আগে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সুকিয়াপোখরির বাজার। আরও মিনিট দশেক বাদে আমরা মানেভঞ্জন পৌঁছে গেলাম। প্রায় এল প্যাটার্নের রাস্তার দুধারে দোকানপাট এবং গ্রাম। উচ্চতা সাত হাজার ফুট কিন্তু

ঠান্ডা নেই একটুও। তাপস বলেছিলেন, 'হাঁটাপথে যাবেন' রাস্তা চিনতে গাইড নিয়ে নেবেন। পেশাদার নয়, পোর্টার কাম গাইড। মানেভঞ্জন-এ পাওয়া যায় শুনেছি।'

কথাটা প্রণবের খুব মনে ধরেছিল। অতিরিক্ত সজাগ এবং আরামপ্রিয় মানুষ। আমাদের গায়ে যখন একটা ফুলস্লিভ সোয়েটার ওর শরীরে গোটা চারেক পুরু আচ্ছাদন। উত্তরমেরুতে ঘোরা যায় এমন একটা পোশাকও ওর ব্যাগে রয়েছে। মালপত্র নামিয়ে চা খাচ্ছি এই সময় ও একটি সুবোধ বালককে নিয়ে হাজির হল, 'এ হল রাম সিং, মুকুন্দ তুই এর সঙ্গে কথা বল।'

ছেঁড়া গরমের প্যান্টের ওপর খাকি জামা পরা ছেলেটা সরল হাসছিল। চোখ দুটো উজ্জ্বল। মুকুন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'তুম ফালুট গিয়া হ্যায়?'

দুবার মাথা নাড়ল রাম সিং।

'রাস্তাঘাট চিনতা হ্যায়?'

আবার দুবার। এবার মুকুন্দ আমাকে বলল, 'লোকটাকে সরল বলে মনে হচ্ছে, নিয়ে যাওয়া যাক কী বলেন?'

রাম সিং দৈনিক পঁচিশ টাকা নেবে। আমাদের সঙ্গে খাবে। ওকে সঙ্গে নিয়ে মুকুন্দ বাকি কেনাকাটা সেরে নিল। ঠিক সাড়ে দশটায় আমরা রওনা হলাম। আমাদের স্লিপিং ব্যাগ এখন বারোয়ারি বোঝার সঙ্গে রাম সিং-এর কাঁধে। হালকা লাগছে কিন্তু কল্যাণ বলল, 'ইনহিউম্যান ব্যাপার। অত মাল ওর কাঁধে চাপানো ঠিক হচ্ছে না।'

কিন্তু রাম সিং-এর এ ব্যাপারে কোনও তাপ উত্তাপ নেই। আগে চলল সে মানেভঞ্জন ছাড়িয়ে। ডানদিকের রিম্বিকের পথ ছেড়ে আমরা বাঁ-দিকের পাহাড়ে পা দিলাম। একদম খাড়া পথ। এই পথে জিপ যায়? ছোট-ছোট বোল্ডারে সাজানো পথটায় শুধু একটা জিপ দাঁড়াতে পারে। মিনিট দশেক হাঁটার পর বুকে চাপ পড়তে লাগল মনে হল নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। মুকুন্দ ছাড়া আমরা চারজনেই জিরোতে চাইলাম। রাম সিং ওই বোঝা নিয়ে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছেন। সঙ্গে মুকুন্দ।

ঘণ্টা খানেকের পথচলা বুঝিয়ে দিয়েছে আমাদের শরীরগুলোর সহ্যক্ষমতা কিছুই নেই। সাড়ে সাত হাজার ফুট উঁচুতে এখন দরদর করে ঘামছি, কুকুরের মতো হাঁপাচ্ছি। প্রণবের অবস্থা আরও করুণ। ওর অনভ্যস্ত জুতো এর মধ্যেই পায়ে ফোস্কা ফেলেছে। বলল, 'আগে জানলে কোনও শালা আসত। যে হাজার ফুট ওঠেনি তাকে দশ হাজার বারো হাজার যেতে হবে।'

যখন পথটা ঢালু হচ্ছে তখন যেন মনে হচ্ছে বেঁচে গেলাম। এর মধ্যে জিপের পথ ছেড়ে আমরা পায়ে চলা পথ ধরেছি। রাম সিং না থাকলে এই পথ চিনতে পারতাম না। দুই উরু টনটন করছে।

মুকুন্দ পিছিয়ে এসে বলল, 'রাম সিং বলছে এভাবে হাঁটলে টংলু পৌঁছোতে রাত হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি হাঁটতে হবে।'

একটা নাগাদ চোখের সামনে একটা খামার বাড়ি ভেসে উঠল। এতক্ষণ কোনও মানুষ তো দূরের কথা গরু ভেড়াও দেখিনি। পাহাড়ের পর পাহাড় গায়ে গা লাগিয়ে শুয়ে আছে। যে পথ ছেড়ে এসেছি কিছুক্ষণ চলার পর পিছু ফিরে তাকালে বিশ্বাসই হয় না ওখানে একটু আগে ছিলাম। দু-ধারে অজস্র রডোডেনড্রন ফুটে আছে। এত তার রঙের বাহার যে চোখে ধাঁধাঁ লাগে। ঘন জঙ্গল সরে গিয়ে খামার বাড়িটাকে দেখতে পেয়েই উৎসাহ বেড়ে গেল। গ্রামের নাম চিত্রে। কোনওরকমে বাড়িটার সামনে পৌঁছে খোলামাঠে বসে পড়লাম। দু-ঘর বাসিন্দা এই গ্রামের। কয়েকটা সবল ঘোড়া খেলা করছে। মুরগি ডাকছে সমানে। রাম সিং বাসিন্দাদের বেশ পরিচিত। ওরা আমাদের দেখেই চা এনে দিল। চল্লিশ পয়সার গ্লাস বড় আরামের। গ্রামবৃদ্ধ আমাদের উপদেশ দিচ্ছিলেন,

সমতলের মানুষ তাই হাঁটতে কষ্ট হবেই। আর একটু গেলেই মেঘমা। সেখানে ভালো রক্সি পাওয়া যায় তবে তুম্বা খাওয়াই ভালো। শরীর পুষ্ট করে কিন্তু নেশা কম হয়। আর হ্যাঁ, পথে যেন জল না খাই আর ভুট্টা চিবোই। কারণ লোকেতি নামের একটা ফুল এমন গন্ধ ছড়ায় যা মানুষকে অসুস্থ করে তোলে। অলটিটিউড সিকনেস। ভুট্টা তার ওষুধ।

প্রণব খুব ঘাবড়ে গেল। আমাদের সঙ্গে ভুট্টা নেই। একবার বসলে উঠতে ইচ্ছে করে না।

মেঘমায় যখন পৌঁছলাম তখন চারটে বাজে। মুকুন্দ এক বোতল রক্সি কিনে নিল। ওই একটাই বাড়িকে কেন্দ্র করে গ্রাম। চা খেয়ে টংলুর দিকে তাকালাম। মাত্র তিন কিলোমিটার কিন্তু আকাশ ছোঁয়া। শরীরে আর বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। হঠাৎ পেছন থেকে শুনলাম, 'হ্যালো'! তাকিয়ে দেখি একজন শ্বেতাঙ্গিনী হাসতে-হাসতে উঠে গেলেন পাশ কাটিয়ে। পথেও কয়েকজন বিদেশি ট্রেকারকে দেখেছি। প্রণব বলল, 'মাইরি ফিরে গিয়ে কাউকে বলবেন না মেয়েছেলের কাছে হেরে গেছি।'

মদন বলল, 'মেয়েছেলে বোলো না। ওটা অসভ্যতা।'

এই সময় ঝড় উঠল। হাওয়ার মুখ ছুঁচলো। যেন বিঁধিয়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলবে পাহাড় থেকে। দু-পা যাই তো দু-মিনিট থামি। সন্ধে পার হয়ে যখন টংলুতে পৌঁছোলাম তখন আমাদের শরীর প্রায় নিরক্ত। হুহু করে ঠান্ডা বাড়ছে। দশ হাজার চুয়াত্তর ফুট উঁচুতে ডি আই বাংলোটাকে ঠিক হানা বাড়ির মতো দেখাচ্ছে। প্রায় আছড়ে পড়লাম আমরা তার ভেতরে। শুধু রাম সিং হাসিমুখে বলল, 'সাব খানা পাকায়েগা?'

বাইরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। হাউহাউ করে হাওয়ারা ধেয়ে আসছে। রাত যত গড়াচ্ছে তত হাওয়ার দাপট বাড়ছে। আমরা পাঁচজন স্লিপিং ব্যাগের ভেতর সেঁধিয়ে ফায়ার প্লেসের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। রাম সিং চৌকিদারের বউ-এর কাছ থেকে কিছু কাঠ যোগাড় করেছে। একটু আগে মদন মোমবাতি জ্বালাবার চেষ্টা করেছিল। দশ হাজার ফুট উঁচুতে বরফ হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ট্যুরিস্টদের জন্যে এই বাংলোটি রেখেছেন। এটি কী অবস্থায় আছে তা দেখার প্রয়োজন কেউ বোধ করেন না। বাংলোর যে বাথরুমটি ছিল সেটি দীর্ঘকাল অকেজো। ছোট-বড় যে-কোনও প্রয়োজনেই আপনাক পাহাড়ে যেতে হবে। এইরকম হিমেল রাতে সেটা মৃত্যুদণ্ডের শামিল। জানলায় কাচ নেই, হুহু করে বাতাস ঢুকছে। দুটো ঘরে খাট আছে, বিছানাপত্র উধাও। শুনলাম সন্ধের পর চৌকিদার জ্ঞানে থাকে না।

প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। রাম সিং খিচুড়ি তৈরি করে আনল অথচ খেতে পারলাম না। মুকুন্দ রক্সি বের করল। টকটক, বিশ্রী গন্ধ কিন্তু শরীর গরম হল। স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে শুয়ে ক্রমশ শীত গেল কিন্তু মনে হচ্ছিল একটা খোপের মধ্যে আটকে আছি।

মুকুন্দর চিৎকারে ঘুম ভাঙল, 'দারুণ সূর্য উঠেছে, উঠে পড় সবাই।' মদন পাশ ফিরে শুল। কল্যাণও।

আপাদমস্তক গরম কাপড়ে মুড়ে রঙিন ছবি তুলে মুকুন্দ খাটের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনারা মশাই না এলেই পারতেন। এখানে এসেও যদি শুয়ে থাকেন তাহলে আসার কোনও মানে হয়?'

কল্যাণ ব্যাগের ভেতর থেকেই প্রশ্ন করল, 'পিক দেখা যাচ্ছে?'

'না। কিন্তু সূর্যটা—।' মুকুন্দকে থামিয়ে কল্যাণ বলল, 'সূর্য পৃথিবীর সব জায়গায় একরকম। ওটাকে দেখার কিছু নেই। আসলে কোন পরিবেশে সূর্যকে দেখছি সেটাই বিচার্য। আমার শরীর

খারাপ আজ হাঁটতে পারব না।'

মুকুন্দ ঝাঁপিয়ে উঠল, 'পারব না বললে হবে? সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে। কি কষ্ট হচ্ছে? পায়ে ব্যথা? ঠিক আছে, এই মলমটা—।'

সকাল আটটায় আবার রওনা হলাম। রাম সিং বলল যদি জোরে না হাঁটি তাহলে আজ সান্দাকফুতে পৌঁছোতে পারব না। টংলু থেকে সান্দাকফুর দূরত্ব বাইশ কিলোমিটার। মাত্র দু-হাজার ফুট উঁচু হলেও অনেকটা নামতে উঠতে হবে। জিপের পথ ছেড়ে ও আমাদের শর্টকাটে নিয়ে এল। টংলুতে দেখলাম দু-একটা সরকারি অফিস আছে। কিন্তু লোকজন চোখে পড়ল না।

ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর আমরা বেশ বর্ধিষ্ণু একটা গ্রামে গেলাম। জায়গাটার নাম জৌবাড়ি, নেপালের সীমানায়। এখানে ব্যক্তিগত মালিকানায় রাত্রিবাসের ব্যবস্থা আছে। বুঝলাম ভুল করেছি। টংলুর টঙে ওঠার কোনও মানে হয় না। মেঘমা থেকে অপেক্ষাকৃত আরামের পথে জৌবাড়ি আসা যায়। সময় বেশি লাগে না। সেই এলাম কিন্তু খামোকা কষ্ট হল।

প্রণব এবং কল্যাণের চেহারা দেখে নিজেরটার মালুম পাচ্ছি। ফ্যাকাশে মড়ার মতো দেখাচ্ছে। জৌবাড়ি ছাড়াতেই মন ভরে গেল। নীল ছায়া মেখে পাহাড় এখন পায়ের তলায়। আকাশ উপুড় হয়ে আছে তাদের গায়ে। যেন সেই, আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায়। পায়ে চলা এই পথের দু-ধারে অজস্র রডোডেনড্রন ফুটে আছে। এত তার রঙের বাহার যে চোখ ফেরানো যায় না। এখন আমরা নামছি তাই কষ্ট কম হচ্ছে। বাঁক ঘুরতেই শুনলাম, 'হ্যালো।' একটি তরুণ এবং বৃদ্ধ বিদেশিকে দেখলাম। অঙ্গে তেমন কোনও গরম পোশাক নেই। আলাপ হল, সান্দকফু থেকে ফিরছি। দুজনেই ব্রিটিশ।

গৈরিবাসে বেশ কয়েকঘর মানুষের বাস। উচ্চতা আট হাজার আটশো ফুট। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাজকর্ম হয়। গৈরিবাস থেকে কালপোখরি। একদম খাড়াই পথ। আকাশের দিকে নাক করে দেখতে হয়। এখানে কোনও থাকার জায়গা নেই। অভ্যাস না থাকলে এই পথে হাঁটা সত্যি ভীতিপ্রদ। কয়েক পা এগোলেই মনে হয় দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দুটো পা লোহার মতো ভারি। পিঠের দশ কেজি বোঝা ক্রমশ পনেরো থেকে বিশ হয়ে যায়। দু-ধারে প্রকৃতির রানির মতো সাজ দেখার মন থাকে না। কেবলই মনে হতে থাকে কতক্ষণে লক্ষ্যে পৌঁছব। সঙ্গীরা এগিয়ে গেলে প্রচণ্ড অসহায় বোধহয়। এই নির্জন মনুষ্যবিহীন পাহাড়ে আমি একা—এই বোধ অস্থিরতা আনে। প্রতিটি বাঁকের আগে আশা হয় এবার নিশ্চয়ই ঢালু পথ পাব। পায়ের মাপ কমে আসে, রাস্তাটা বড় হয়ে যায়।

কৈয়াকাটা হয়ে কালপোখরি পৌঁছোতে তিনটে বেজে গেল। বেশিরভাগ ট্রেকার এখানেই থেকে যান। লামার বাড়ি সেই আশ্রয়স্থল। গরম চা রুটি আর তারকারি পাওয়া যায়। এখান থেকে সান্দাকফু মাত্র সাত কিলোমিটার পথ। ঘণ্টা আড়াই হাতে আছে। প্রণবের মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে যে-কোনও মুহূর্তেই ও পড়ে যেতে পারে। ঠোঁট সাদা। কিন্তু সিদ্ধান্ত হল আজই সান্দাকফুতে পৌঁছোব। এখানে রাত কাটালে আগামীকালের ভোর সান্দাকফুতে পাব না। প্রণবের আপত্তি টিকল না।

বিবেকভঞ্জঙ্গ অবধি শুধু নেমে যাওয়া। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম সেখানে। দুই-তিন ঘর নিয়ে গ্রামটা। বেশ কিছু মুরগি চরছে। মদন বলল, একটা মুরগি কিনে নিয়ে যাই। পাহাড়ি মুরগির টেস্ট খুব।

একটা ষোলো-সতেরো বছরের ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলাম, মুরগি কার?

'আমার বউ-এর। কেন, কিনবে? ঠিক আছে, ওঁকে ডেকে দিচ্ছি।'

ওইটুকু ছেলের বিয়ে হয়ে গিয়েছে এবং ব্যাবসার কথা বউকে দিয়ে বলাচ্ছে। ভাবতে-না-ভাবতেই ছেলেটি যাকে ডেকে নিয়ে এল তাকে দেখে আমাদের চক্ষুস্থির। অন্তত পঞ্চাশ বছর বয়স হবে মহিলার। মুখের চামড়া কুঁচকে গেলেও শরীরের বাঁধন ঠিক আছে। মদন অবিশ্বাসের গলায় ছেলেটিকে বলল, 'তোমার বউ?'

ছেলেটা ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ। এবার মনে পড়ে গেল। দার্জিলিং-এর আদি অধিবাসী হল লেপচারা। তখন সিকিমের রাজাই এদের রাজা ছিল। নেপালিরা এল ব্রিটিশরা দখলে নেওয়ার পর। অত্যন্ত পরিশ্রমী লড়াকু কিন্তু সরল জাত ছিল লেপচারা। কিন্তু একটি সামাজিক প্রথার জন্যে কমে আসছে এদের সংখ্যা। পরিবারের কোনও পুরুষ মারা গেলে তার স্ত্রীকে আবার বিয়ে দেওয়া হত। প্রথমে ওই পুরুষটির কোনও অবিবাহিত ভাই থাকলে তাকেই পাত্র হতে হবে। ভাইদের বিয়ে হয়ে গেলে ভাইপোকে জায়গাটা নিতে হবে। ফলে দেখা গেছে প্রৌঢ়ার সঙ্গে সদ্য যৌবনে আসা তরুণের বিয়ে হচ্ছে। বিয়ের পর সেই রমণীর সন্তানেরা এই তরুণটিকে বাবা বলে মেনে নিতে বাধ্য। অনেক ক্ষেত্রে সেই প্রৌঢ়া সন্তানধারণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। ফলে ওই তরুণটির আর সন্তান হল না এবং প্রৌঢ়া স্ত্রী জীবিত থাকতে সে দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে না। প্রায় বাধ্যতামূলক জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে লেপচারা ক্রমশ সংখ্যায় কমে আসছে। হয়তো জমিজমা অন্য পরিবারে যাতে না যায় সেই কারণেই এই ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। ইংরেজ মিশনারিদের দৌলতে লেপচারা যখন ব্যাপকহারে খ্রিস্টান হয়ে গেল তখনও এই ব্যবস্থার বিলোপ হয়নি। ইদানীং শহরের শিক্ষিত লেপচারা এই প্রথা বাতিল করলেও গ্রামে যে চল আছে তার প্রমাণ পেলাম। দেড় কেজি ওজনের মুরগিটি রাম সিং-এর পিঠের বোঝার ওপর চাপল। দু-পা বাঁধা অবস্থায় সমানে চিৎকার করে যাচ্ছিল সেটা।

বিবেকভঞ্জন ছাড়ানো মাত্র ঠান্ডা যেন তিনগুণ বেড়ে গেল। অনেকক্ষণ থেকেই রোদ নেই। এবার শনশন করে হাওয়াদের সঙ্গে ঘন ফগ উঠে আসতে লাগল নীচ থেকে। মুহূর্তে চারধার ঢেকে গেল। দু-হাতে দূরের মানুষ দেখা যাচ্ছে না। বিশ্বেদেব এবং ক্যাপ্টেন মোক্তান বলেছিলেন, সান্দাকফু-এর আগের পথটাই সবচেয়ে খাড়াই। মিনিট পনেরো চলার পর হাড়ে-হাড়ে বুঝলাম সে কথা। অনবরত বাঁক নিয়ে পথটা খাড়াই উঠে গেছে। এখনও তিন কিলোমিটার পথ। প্রণব আর কল্যাণ হাঁটি-হাঁটি পা করে এগোচ্ছে। মদন রাম সিং-এর কাছে শেখা একটা শব্দ করে ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। দুটো পায়ে ফোস্কা পড়েছে, বুকে হাঁফ ধরেছে। চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী ফগে ঢাকা। কতটা উঠেছি তার হিসেব নেই। মনে হচ্ছিল পথ আর শেষ হবে না। ঠিক তখন ঝড় উঠল। কুচি-কুচি বরফ আছড়ে পড়ছিল শরীরের ওপর। মুহূর্তেই ফগেরা উধাও। কিন্তু পায়ের তলায় সাদা কাচ জমছে। আমার দুই হাতে কোনও সাড় নেই। নাকের অনুভূতি মরে গেছে।

মদনের চিৎকার শুনলাম। উল্লাস। রাস্তার পাশে একটা মাইলস্টোন ধরে চেঁচাচ্ছে, 'এসে গেছি।' তাকিয়ে সেই সন্ধের অন্ধকারে বৃষ্টি মেখে পড়লাম, সান্দাকফু জিরো। কিন্তু কোথায় সান্দাকফু? দু-ধারে সেই গম্ভীর জঙ্গল আর পাহাড়। কতক্ষণ চলেছি খেয়াল নেই হঠাৎ বাঁক ঘুরতেই একটা কাঠের বাড়ি চোখে পড়ল। বাড়িটার জানলা নেই, দরজা ভাঙা। পরপর আরও কয়েকটা। চকিতে সমস্ত শরীর আলোড়িত হল। আমরা পৌঁছে গেছি সান্দাকফু। এই সেই জায়গা যেখান থেকে হিমালয়কে ১৮০°-তে দেখা যায়। কাঞ্চনজঙ্ঘা আর এভারেস্ট পাশাপাশি ভেসে ওঠে। কিন্তু এখন আমাদের চারপাশে শুধু মেঘ আর অন্ধকার।

এগারো হাজার নশো উনত্রিশ ফুট উঁচুতে গোটা ছয়েক বাড়ির মধ্যে অবিশ্বাস্য সুন্দর যেটি সেটি ডি ডবলু ডি-র বাংলো। বাংলোর চৌকিদার গণেশ ওই আবহাওয়ায় তুরীয় অবস্থায় রয়েছে।

ছাপানো ফর্ম ছাড়া সে কোনও পাশ চেনে না। নেপালি চিঠিটা আমাদের বাঁচাল। বন্ধ ঘরের মধ্যে ঢুকে বিছানায় লুটিয়ে পড়লাম আমরা। শুধু মুকুন্দ রাম সিং-কে নিয়ে খাবারের ব্যবস্থা করতে লাগল। ফায়ারপ্লেসের আগুনে হাত-পা সেঁকে ঘণ্টাখানেকে বাদে শরীর যখন সুস্থ হল তখন প্রণব প্রথম কথা বলল, 'আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘার অর্ধেক এসে গেছি।'

রাত তিনটের সময় মুকুন্দ আমাদের ডেকে তুলল। সান্দাকফুর সূর্যকে চিনতে হলে নাকি এইসময় উঠতে হয়। স্লিপিং ব্যাগের খোলস থেকে বেরিয়ে আসতেই বুঝলাম ঠান্ডা কাহারে কয়। নেতা হিসেবে মুকুন্দর তুলনা হয় না কারণ সে এর মধ্যেই রাম সিং-এর সাহায্যে গরম কফি তৈরি করে রেখেছে। গরম জামা কাপড়ের ওপর দুটো কম্বল চাপিয়ে আমরা বাইরের ঘরে এলাম।

একটি নাটকের পরদা উঠছে, দর্শকরা উদগ্রীব, এইভাবে বসে আছি। হঠাৎ ঘুটঘুটে অন্ধকারের গায়ে একটা লাল বল ফুটে উঠল তারপর বলটা গড়িয়ে যেতে লাগল যেন আলো তাড়া করছে অন্ধকারকে। এমন দৃশ্য কোনওদিন দেখিনি। একটু পরেই পাতলা হয়ে এল অন্ধকার। আলোর রং পালটে যাচ্ছে ঘনঘন আর তারপরেই যেন লাল টোপর পরা ভদ্রমহিলা লজ্জায় মুখ তুললেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা। ক্রমশ তার সখীরা ছোট-বড় মাথা তুলে পাশাপাশি দাঁড়াল। আরও দূরে পৌরুষ নিয়ে এভারেস্ট। ওদের গায়ের বরফ স্পষ্ট দেখছি, বুঝি হাত বাড়ালেই ছোঁওয়া যায়।

আঠাশ হাজার একশো ছেচল্লিশ ফুট উঁচু পাহাড়টার আদি নাম কিংসুম জায়োঙ্গবু চু পবিত্র উজ্জ্বল কপাল। প্রথম এবং শেষ সূর্যের কিরণে ওর চূড়াকে লাল এবং সোনালি দেখায়। লেপচাদের কাছে এই পর্বত দেবতার মতো। কারণ তারা বিশ্বাস করে তাদের প্রথম পূর্বপুরুষকে ঈশ্বর ওই পবিত্র চূড়োর বরফ দিয়ে তৈরি করেছিল। পরে তিব্বতিরা এখানে এসে চূড়োর নাম রাখল খাচ্ছেন জোঙ্গা। অর্থ মহান বরফের শিখর। সিকিমিজ এবং ভুটিয়ারা একে মনে করে কুবের, সম্পদের দেবতা। ইংরেজরা এসে ওই তিব্বতি নামকে সহজ করল, কাঞ্চনজঙ্ঘা, পবিত্রের মধ্যে পবিত্রতম।

সান্দাকফুতে ট্রেকারদের জন্যে ভি আই বাংলো আছে, ইয়ুথ হোস্টেল আছে। মানুষের বাসযোগ্য নয় সেগুলো। হু-হু করে হিমবাতাস ঢোকে সেখানে। এত বিজ্ঞাপন ছাপেন ট্যুরিস্টবুরো কিন্তু অযত্নে অবহেলায় এই আবাসগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। একজন ট্রেকারকে বেড়াতে যাওয়ার লোভ দেখান, কিন্তু তার জন্যে সামান্য আরামের ব্যবস্থা নেই। পি ডবলু ডি বাংলো সাধারণের জন্যে নয়। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই জায়গাটিকে ওরা নজর দিতে পারেন না। খাবার নেই, জল আনতে হয় বহুদূর থেকে বয়ে, কেউ অসুস্থ হলে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে, দীর্ঘপথে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচবার জন্য কোনও আচ্ছাদন নেই—কী অবহেলায় নষ্ট করছি এই ট্যুরিস্টদের স্বর্গটিকে। তবু মানুষ যায়, প্রচুর বিদেশিকে দেখেছি দুদিনে। একটু দায়িত্ববোধের পরিচয় দিলে তো আখেরে আমাদেরই লাভ।

থাকার জায়গা নেই জেনে বাধ্য হলাম রুট পালটাতে। দুদিন ওখানে কাটিয়ে নেমে এলাম বিবেকভঞ্জঙ্গে। আশ্চর্য, নামতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু পিছু ফিরে তাকাতেই চমকে উঠছিলাম! ওই অত ওপরে আমরা উঠেছিলাম! গভীর জঙ্গলের পথে রাম সিং আমাদের নিয়ে এল। দুধারে বিশাল গাছ, তাতে নানান রঙের ফুল, কতরকমের পাখি ডেকে যাচ্ছে। রাম সিং আশ্বস্ত করল একমাত্র ভাল্লুক ছাড়া আর কেউ ভয় দেখাবে না এবং এ ব্যাপারে তারা খুব ভদ্রলোক। শুধু নামছি আর নামছি। ক্রমশ থাই এবং টো বিদ্রোহ শুরু করল। বিশাল জঙ্গলে আমরা ছাড়া কোনও প্রাণী আছে বলে মনে হচ্ছে না। বিকেল তিনটে নাগাদ জঙ্গল ফুঁড়ে একটা ঝকঝকে ফরেস্ট বাংলো বেরিয়ে এল। রিম্বিক। সাত হাজার পাঁচশো ফুট।

জঙ্গলের ঘ্রাণ বুক ভরে নেওয়া আর তুম্বা খাওয়া রিম্বিকের সবচেয়ে বড় আরাম। কাঠের

চোঙার মধ্যে একধরনের সরষে জাতীয় দানা গরম জলে ভিজিয়ে কাঠের স্ট্র দিয়ে টানলে মুহূর্তেই শরীর গরম। এত ভালো পানীয় আমি কখনই খাইনি। রোজ দুবার খেলে শরীর ফিরত বাধ্য, নেশা হয় ঢুলুঢুলু, চমৎকার।

রিম্বিকের নীচে গুম্বাডারা হয়ে ইনটেকে নেমে এলে বাস পাওয়া যায়। ভোর সাড়ে ছ'টায় ছাড়ে। সোজা দার্জিলিং-এ পৌঁছোয় সাড়ে দশটায়। ফিরে আসতে-আসতে আবার কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখলাম, হাড়ের মতো ফ্যাকাশে। মানেভঞ্জঙ্গ-এ বাস থামল। নমস্কার করে নেমে গেল রাম সিং। এই কদিনে আমাদের একমাত্র অবলম্বন। বাসটা দাঁড়িয়ে আছে। জানলা দিয়ে দেখলাম যেতে-যেতে রাম সিং তিনজন ট্রেকারদের সঙ্গে কথা বলছে। তারপর সে ঘাড় নাড়ল। ট্রেকাররা তাদের মাল তুলে দিলে রাম সিং-এর কাঁধে। বাড়ি না ফিরে আবার রাম সিং বোঝা নিয়ে হাঁটা শুরু করল সান্দাকফুর পথে। কোনও বিকার নেই, আগামী কয়েকটা দিনে পঁচিশ টাকার আশ্বাস অনেক বড় ওর কাছে।

নরওয়ের কবি সম্মেলন

এয়ারপোর্টে যে ছেলেটি আমাদের নিতে এসেছিল তাকে দেখতে সিনেমার নায়কের মতো। সঙ্গের মেয়েটিকে তার প্রেমিকা ভাবতে পারলে ভালো লাগত। এয়ারপোর্টটা তেমন বড় নয়। হালকা রোদ ছিল কিন্তু সেইসঙ্গে কনকনে ঠান্ডাও। ছেলেটি আমাদের অভিবাদন জানাল, 'আপনাদের মতো বিখ্যাত কবিদের পেয়ে আমরা খুব খুশি।"

চমকে তাকালাম। এ বলে কী! ইংরেজিতেই তো কথা বলল। এরা কি গদ্য-লেখককেও কবি বলে আমার পাশে যে ভদ্রমহিলা বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধি হয়েছিলেন তিনি হাসলেন। আমরা গাড়িতে উঠলাম। তখনও আমার জন্যে বিস্ময় অপেক্ষা করছিল।

গোড়াটা বলে নিই। অ লা চৌ, মানে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী এবং আর্ট কলেজের মাস্টারমশাই অমরদা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। নরওয়ের বার্গেন শহরে একটি আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন হচ্ছে এবং সেখানে আমাকে গল্প পড়তে যেতে হবে। আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ মশাই জানালেন, আমি একা নই, আমার সঙ্গে একজন কবি যাবেন, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান বন্ধুত্ব সমিতির উদ্যোগে আমাদের পাঠানো হচ্ছে।

বাংলা সাহিত্যে যারা লেখালেখি করেন তাঁদের অল্প-স্বল্প চিনি। দিন সাতেক সঙ্গী হবেন কোন কবি তা প্রথমে জানতে পারিনি। শেষ মুহূর্তে জানলাম তিনি চিত্রিতা দেবী। এই বর্ষীয়সী মহিলার নাম আমি নানা কারণে শুনেছি। খুব ছেলেবেলায় এঁর লেখা চোখে পড়েছে। উপনিষদ নিয়ে ওঁর কাজের কথা কানে এসেছিল। কিন্তু কবি হিসেবে তিনি প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন কি না সে ধারণা ছিল না। সেটা অবশ্য নিজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। দু-চারটে গল্প লিখছি মানে আমার সিং বেরিয়েছে বলতে পারি না, সাহিত্যের সিংহ তো অনেকেই আছেন।

এও না হয় গেল। নরওয়ের বার্গেন শহরে যে আস্তানায় আমাদের তোলা হল তা নেহাৎ মন্দ নয়। আর তারপরেই জানতে পারলাম ওখানে যা হচ্ছে তা হল কবি সম্মেলন। গদ্যলেখকের কোনও ভূমিকাই নেই সেখানে। যাকে বলে তলপেটে ঘুষি খাওয়া সেই অবস্থা আমার। এ জীবনে কবিতা লেখা আর আমার হল না। সবার সব হয় না, আমারও কবি হওয়া হয়ে ওঠেনি। বাঙালি মায়ের পেট থেকে পড়েই কবিতা লেখে, আমি কেন ব্যতিক্রম জানি না। এখন কবিদের কী রমরমা। তাদের একতা চোখে পড়ে বেশ। কিন্তু আমার হাত দিয়ে কিছুতেই কবিতার লাইন বের হতে চায় না। সুনীলদাকে সেই কারণে আমৃত্যু ঈর্ষা করব। একসঙ্গে দারুণ গদ্য আর মাথা খারাপ করে দেওয়া কবিতা যে ভদ্রলোক লিখতে পারেন তাঁর পাশে তো কলকাতার সব সুন্দরীরা ভিড় করবেই। যতই সাধ হোক, আমি কবিতা লিখতে পারিনি কখনও। এখন তো আর 'পাখিসব করে রব' লিখলে চলবে না। কবিতা এখন যথেষ্ট প্রাপ্তবয়স্ক। কুমুদরঞ্জন মল্লিকরা যে কবিতা লিখতেন তা থেকে অনেক চেহারা পালটিয়েছে। কিছু-কিছু পুরোনো মানুষের কবিতার নিদর্শন যদিও এখন কথাসাহিত্যের পাতায় পাই, কিন্তু তা মিউজিয়াম দেখানোর মতনই।

চিত্রিতা দেবীকে আমার সমস্যা বললাম। উনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। খুব সহানুভূতি নিয়ে বললেন, 'ওমা! আপনি কবিতা লেখেন না?'

মাথা নেড়ে না বললাম।

'তাহলে এলেন কেন?'

'আমি তো জানতামই না এটা কবি সম্মেলন। আমাকে কেউ বলেনি। ছি ছি ছি। কত বিখ্যাত কবি ছিলেন বলুন তো!'

'বিখ্যাত মানে?'

'সুভাষদা, নীরেনদা, শঙ্খ ঘোষ, সুনীলদা, শক্তিদা। বাংলা সাহিত্যকে কবি হিসেবে যাঁরা ঠিকঠাক পৌঁছে দিতে পারতেন এখানে।'

'তাহলে কী করবেন?'

'ফিরে যাব। যা নই তাতে ভাগ বসাব কেমন করে?'

'আপনি ফিরে গেলে এদের কোনও লাভ হবে না। এক কাজ করুন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ আছে আপনার কাছে?'

'আজ্ঞে না। ওসব নিয়ে খামোকা আসব কী জন্যে?'

'থাকলে তাই পড়ে দিতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রচার হয়ে যেত।'

সমস্যাটা উদ্যোক্তাদের জানালাম। তাঁরা বিব্রত। শুনলাম স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর সব বিখ্যাত কবি আসছেন এখানে। তাঁরা সকাল থেকে সন্ধে নিজের ভাষায় কবিতা পড়বেন। বাইরের আমন্ত্রিতদের বলা হচ্ছে ইংরেজিতে কবিতা পড়তে। অবশ্য এখানে ইংরেজি বুঝতে পারে বড় জোর দশ শতাংশ লোক।

হে পাঠক, স্বীকার করছি, সেই রাতটার কথা। কলকাতা থেকে কোপেনহেগেন হয়ে বার্গেনে পৌঁছনোর দীর্ঘ প্লেন যাত্রার যথেষ্ট ক্লান্তি, যা জেটল্যাগ হলেও হতেও পারে, উপেক্ষা করে হোটেলের ঘরে কাগজ কলম নিয়ে বসে গেলাম কবিতা লিখতে। মাইকেল রবীন্দ্রনাথ অথবা যে-কোনও বাঙালি কবি দয়া করে আমার ওপর ভর করুন। সেই কবিতা লেখা হয়ে যাওয়ার পর ইংরেজিতে অনুবাদ করতে হবে। দু-ঘণ্টা চেষ্টার পর বুঝলাম যার আটে হয় না তাঁর আশিতেও হবে না। আমি কলম বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। যা হওয়ার তা হবে।

বার্গেন শহরটা সমুদ্রের ধারে নয় কিন্তু সমুদ্রের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। সেই জল বেয়ে জাহাজ পর্যন্ত আসে। সারাদিন একাই পায়ে ঘুরে শহরটাকে দেখলাম। খুব ঠান্ডা আর চুপচাপ থাকা শহর। কোথাও কোনও অযথা হইচই ভিড় বা জনতার প্রশ্ন ওঠে না। রাত্রে আমাদের ডিনারে নিয়ে যাওয়া হল। শুনলাম নরওয়ের রাজা কবিদের সম্মানে ডিনার দিচ্ছেন। সেখানে বেশ কিছু কবির সঙ্গে আলাপ। কবিরা যেমন হন এঁরাও তেমন। একজনের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল। থাকেন ফিনল্যান্ডে। বউকে খুব ভয় পান। কবিতা লিখেই সংসার চালাবার চেষ্টা করছেন বলে বউ-এর লাথি ঝাঁটা খান। আকণ্ঠ সুরা পান করে তিনি বললেন, 'আমাদের বিয়েটা কেন ভাঙেনি বল তো? পারলে না তো? আমি বউকে প্রেম করার লাইসেন্স দিয়ে দিয়েছি। গত পাঁচ বছরে বেচারা পাঁচটা প্রেম করেছে। কোনওটাই টেকেনি। ব্যাড লাক। আচ্ছা, তুমি কী ধরনের কবিতা লেখো?'

সত্যি কথা বললাম, 'আসলে আমি কবিতা লিখতেই পারি না।'

'খুব সত্যি কথা। আমরা কেউ কবিতা লিখতে পারি না। লিখতে চেষ্টা করি। আমার তো মাঝে নুট হ্যামসনকেও বড় কবি বলে মনে হয়। নাম শুনেছ?'

'নিশ্চয়ই। আমার পূর্বসূরী গদ্যলেখকরা ওঁর কাছে বেশ ঋণী।'

কিন্তু এসব কোনও প্রলেপ দিচ্ছে না। পরদিন সকালে হাজির হলাম কবি সম্মেলনে শ্রীমতি চিত্রিতা দেবী দারুণ সেজে পৌঁছেছেন সেখানে। বিরাট প্রেক্ষাগৃহে গিজগিজ করছেন কবিরা। তালিকায় আমার নামও আছে, এবং সেটা সন্ধেবেলায়। সারাদিন আমাকে অবোধ্যভাষায় লেখা কবিতা শুনতে হবে। আমি চুপচাপ প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে এলাম।

ছিমছাম রাস্তাঘাট। গাড়ি এবং মানুষ কম। ঠান্ডা একটু হালকা ছায়া জড়িয়ে রেখেছে সর্বত্র। একটা বাস টার্মিনাসে পৌঁছে গেলাম হাঁটতে-হাঁটতে। এখন সকাল এগারোটা। এদের বাসে, যেমন হয়, কন্ডাক্টর নেই। ড্রাইভারই সব। আর বাসের চেহারা খুব লোভনীয়। ড্রাইভার উঠতে যাচ্ছিলেন, জিজ্ঞাসা করলাম, ওই বাস কোথায় যাচ্ছে? বোকার মতো প্রশ্ন তা উত্তরেই মালুম হল। আমার

পক্ষে এখানকার জায়গা জানা কী করে সম্ভব? তবে জানলাম যেতে দু-ঘণ্টা লাগবে। সেখানে থাকবে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ফিরতে আবার দু-ঘণ্টা। অর্থাৎ চারটের মধ্যে আমি এখানে পৌঁছে যাবই। আমার অনুষ্ঠান সন্ধে সাড়ে পাঁচটায়। উঠে বসলাম টিকিট করে।

বার্গেনি শহর ছেড়ে বাস পাহাড়ি গ্রামাঞ্চলে ঢুকে পড়ল। ঝকঝকে বাসের আরামদায়ক আসনে জানলার পাশে বসে আমি নরওয়ের প্রকৃতি এবং আকাশ দেখছিলাম। আমাদের উত্তরবঙ্গের প্রকৃতির সঙ্গে কোনও তফাত নেই শুধু এরা জানে কীভাবে সংরক্ষণ করতে হয়। সামনের রাস্তা একটু অসমান নয়, গর্তের কথা চিন্তা করা যায় না, ফলে বাসে বসে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি লাগছে না। বাসে ভিড় দূরের কথা, আমাকে নিয়ে যাত্রীর সংখ্যা দশ বারো। আস্তে-আস্তে তাও কমতে লাগল। মাঝে-মাঝে গভীর অরণ্য পড়ছে, আবার আদিগন্ত সবুজ ভ্যালি। যখন দু-ঘণ্টা কাটল তখন আমরা একটা ছোট গ্রামে পৌঁছে গিয়েছি। শেষযাত্রী আমিই।

ড্রাইভার আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। একটা গ্যাস স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। আমার হাতে এখনও পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময়। ঘড়ি মিলিয়ে নিলাম।

এদিকে বাড়িঘর বলতে গেলে নেই। জায়গাটা পাহাড়ি। একটা কালো রাস্তা আড় ভেঙে চলে গেছে ওপাশে। রাস্তাটা ধরে হাঁটতে লাগলাম ভারী ভালো লাগছিল। মাথার ওপর ফিনফিনে মশারির মতো রোদ্দুর, অল্প-অল্প ঠান্ডা বাতাস বইছে। আমার সমস্ত শরীরে শীতবস্ত্র। হঠাৎ বাঁক ঘুরতেই একটা জনপদ চোখে পড়ল রাস্তার দু-ধারে গোটা দশেক বাড়ি। একটা ছোট্ট মাঠ, বাচ্চারা খেলা করছে। তাদের চিৎকার আমার চেনা।

কাছে গেলাম। ওরা খেলা থামিয়ে আমাকে দেখল। যেন বিস্ময়কর কিছু দেখছে। আমার চা অথবা কফির তেষ্টা পেয়েছিল। একটা বাচ্চাকে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে রেস্টুরেন্ট কোথায় আছে বলতে পারো?'

ওরা এ ওর মুখের দিকে তাকাল তারপরে একসঙ্গে হেসে উঠল। বুঝতে পারলাম আমার কথা ওদের বোধগম্য হচ্ছে না। এইসব শিশুদের ইংরেজি শেখার কোনও প্রয়োজন নেই। এই পর্যায়ে ওদের মাতৃভাষা যথেষ্ট সম্পদশালী। আমাদের সরকার ঠিক উপেক্ষা করছেন। বাংলাভাষা যখন জীবনের ভাষা হয়ে ওঠেনি তখন ইংরেজিকে সরিয়ে দিতে চাইছেন। আমি এগোলাম। সুন্দর বাড়িগুলো। বেশিরভাগই একতলা, কটেজ ধরনের। সামনে বাগান আছে প্রত্যেকের। কোনও চায়ের দোকান চোখে পড়ছে না। এক ভদ্রমহিলাকে আসতে দেখলাম। ভালো স্বাস্থ্য। তাঁকে অভিবাদন করে জিজ্ঞাসা করলাম কফির দোকানের কথা। তিনি কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে যা বললেন তা বুঝতে পারলাম না আমি বিপন্নমুখ নিয়ে তিনি চলে গেলেন।

ইংরেজি বুঝুক বা না বুঝুক মানুষের বসবাসের কাছাকাছি জায়গায় কিছু দোকানপাট থাকবেই। তারই তল্লাশে পনেরোটা মিনিট কাটানোর পর আমার চোখে পড়ল একটি বাড়ির বারান্দায় একজন বৃদ্ধ বসে আছেন। আমি হাসতেই তিনি হাসলেন, আমি বললাম, 'আমার ভাষা আপনি বুঝতে পারবেন না এই যা দুঃখ।'

তিনি ভাঙা ইংরেজিতে জবাব দিলেন, 'দয়া করে দুঃখিত হবেন না।'

আমি আনন্দিত, 'এখানে কফির দোকান নেই?'

'আজ্ঞে না আমরা যে যার বাড়িতেই ওটা খেয়ে থাকি।'

'ও, অন্য কোনও দোকানও চোখে পড়ল না।'

'একটা কো-অপারেটিভ দোকান আছে। এখন সেটা বন্ধ। আপনি কি বার্গেন থেকে আসছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। হঠাৎ বেড়াতে চলে এলাম। আমি ভারতীয়।'

'তাই বলুন। আমি কখনও কোনও ভারতীয়কে চোখে দেখিনি। আপনার সমস্যা কী?'

'তেমন কিছু নয়। কফির দোকান খুঁজছিলাম।'

'পাবেন না। তবে আপনাকে এক কাপ কফি আমি বোধহয় খাওয়াত পারি।'

উনি আমাকে বারান্দায় বসালেন। ভেতরে গিয়ে সম্ভবত জল গরম করার ব্যবস্থা করে ফিরে এলেন, 'আপনি ট্যুরিস্ট?'

'না। এখানে কবি-সম্মেলনে এসেছি।'

'ও, আপনি কবি।'

'আজ্ঞে না। আমি গল্প লিখি। ওরা ভুল করে নিয়ে এসেছে।'

উনি হাসলেন, 'স্বাভাবিক ভুল। জীবনেও মানুষ যা নয় তাই হতে হয়।'

'আচ্ছা, এখানে তেমন লোকজন চোখে পড়ছে না কেন?'

'এখন কাজের সময়। সবাই কাজে গিয়েছে। আমরা এখানেই থাকি শুধু বিশ্রামের জন্য। ছুটির দিন এলে দেখা পেতেন।'

'কোথায় কাজ করে সবাই?'

'শহরে, বার্গেনেও যায় কেউ-কেউ।'

'আপনি একা থাকেন?'

'হ্যাঁ। আমার পূর্ণ বিশ্রামের বয়স। তা ছাড়া এই শান্তির জায়গা ছেড়ে আর কোথাও যেতে চাই না। তবে সপ্তাহে একদিন শহরে যেতে হয় শাকসবজি কিনতে। বাকিটা কো-অপারেটিভ থেকেই পেয়ে যাই।'

'আপনার স্ত্রী, ছেলে মেয়ে?'

'স্ত্রী গত হয়েছেন, তিন ছেলেই অসলোতে ভালো চাকরি করে, রবিবার সকালে তারা আমাকে ফোন করে।'

'তারা এখানেই আসেন না?'

'কখনও সখনও, প্রত্যেকেই খুব ব্যস্ত। দাঁড়ান, কফিটা আনি।' ঘড়ি দেখলাম। মিনিট পনেরো আছে হাতে।

বৃদ্ধি কফি নিয়ে এলেন। এক কাপ। জিগ্যেস করতে জানালেন, 'এখন আমার কফি খাওয়ার সময় নয়।'

'আপনার ছেলেদের কাছে যান তো?'

'বললাম তো, শহরে আমার ভালো লাগে না।'

'এখানে বন্ধুবান্ধব নেই?'

'কেউ-কেউ রবিবারে কথা বলেন। আসলে এই বাগান নিয়ে আমার চমৎকার সময় কেটে যায়। নিজের জন্যেও প্রচুর কাজ করতে হয়। দেখুন, কুড়ি বছর বয়সে প্রেমে পড়েছিলাম। ষাট পর্যন্ত সেই মহিলার সঙ্গী ছিলাম। পুরুষের যা কিছু কামনা-বাসনা তা মেটাতে চল্লিশ বছর যথেষ্ট সময়, তাই না? আমি এখন অন্যভাবে জীবন কাটাচ্ছি। ওই যে টিউলিপটা দেখছেন, সম্পূর্ণ ফুল হয়ে ফুটতে বেচারা তিনদিন সময় নিল। অথচ পাশেরটার লেগেছে আড়াই দিন আমার বাগানে তিনটে ভ্রমর ঘুরে বেড়ায়। দুটো পুরুষ একটি নারী। ফলে ওদের ঝগড়া লেগেই থাকে। আমি লক্ষ করেছি নারী পুরুষ দুজনকেই পাত্তা দিচ্ছে। এটা অবশ্য অন্যায় নয় নইলে পুরুষদের একজনের কী অবস্থা হত ভাবুন। বরফ পড়তে শুরু করলে এরা কোথায় যাবে? আমার গাছগুলো মরে যাবে, ভ্রমরদের কী দশা হবে? আমি ওদের জন্যে একটা শেল্টারের ব্যবস্থা করেছি। আপনি ঘড়ি দেখছেন?'

'আজ্ঞে আমার বাস ছাড়তে সাত মিনিট সময় আছে।'

'ঈশ্বর, ওই একটি শয়তানি করেছেন।'

'মানে?'

'মানুষকে জন্মাবার সময় যদি বলে দিতেন তুমি এতটা কাল বাঁচবে তাহলে সে সময়ের ঠিক ব্যবহার করতে পারত।'

'আপনার কোনও দুঃখ নেই?'

'আছে, বলব? হাসবেন না তো?'

'আমি গান গাইতে পারি না। কিছুতেই সুর আসে না গলায়। এই বিরাশি বছর বয়সে এটাই আমার একমাত্র দুঃখ। এবার আপনি উঠুন। কফি কেমন লাগল?'

উঠে দাঁড়ালাম, চমৎকার।'

উনি আমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। আমরা করমর্দন করলাম। উনি বললেন, 'আমরা এ-জীবনে আর পরস্পরকে দেখব না। কিন্তু মনে রাখব। তুমি একটু বেশি মনে রাখবে কারণ তোমার বয়স কম। কিন্তু এখন তোমাকে দৌড়াতে হবে। এখানে বাস বড্ড সময়ে চলে।'

আমি দৌড়ালাম। দৌড়াতে-দৌড়াতে খেয়াল হল বৃদ্ধের নাম জিজ্ঞাসা করা হলো না। আমার নামও তাঁকে বলিনি এমনকি কফির জন্য একটা ধন্যবাদও দিয়ে আসিনি তাঁকে।

সেই সন্ধ্যায় এক প্রেক্ষাগৃহ কবির সামনে এই ঘটনাটা বললাম। তারা চুপচাপ শুনলেন। শুধু সেই ফিনল্যান্ডের মাতাল কবি চোখ বন্ধ করে বললেন, 'নামে কী এসে যায়। মানুষ যা উচ্চারণ করে তাই তো কবিতা। অবশ্য যারা কবিতা লেখে তারাই কবি নয়।'

নিউইয়র্কে রহমান

এই লেখার শুরুতে দুটি মানুষের কথা একটু আলাদা করে বলে নেওয়া দরকার। এঁরা দুজনেই বাংলাদেশের মানুষ, থাকে নিউইয়র্কের ব্রুকলিন অঞ্চলে। একটু ভুল হল। দ্বিতীয় জন, যাঁর নাম সাহাবুদ্দিন, তিনি নিজেকে বাংলাদেশের মানুষ বলে মনে করেন না। তিনি দেশ ছেড়েছিলেন আটষট্টি সালে যখন দেশটার নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। তাঁর পাশপোর্টে নাগরিক হিসেবে পাকিস্তানের নাগরিক লেখা ছিল। এই বত্রিশ বছরে তিনি ঢাকায় যাননি একবারও, কিন্তু মীরপুরের আত্মীয়বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। এখন তিনি আমেরিকান পাশপোর্ট হোল্ডার। ব্রুকলিনের একটি অভিজাত বার কাম রেস্তোরাঁর মালিক।

প্রথমজনের নাম আব্দুর রহমান। স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন। চাকরির সন্ধানে জার্মানি গিয়েছিলেন একসময়। সেখান থেকে চলে এসেছিলেন মার্কিনমুলুকে। একটি সন্তানের পিতা আব্দুর এখন কোনও কাজকর্ম করেন না। কারণ ব্রুকলিনে দুটো বাড়ির মালিকানার কারণে ভাড়া আসে ভালোই। স্ত্রীও পার্ট টাইম চাকরি করেন।

আব্দুর রহমানের বয়স এখন চল্লিশের সামান্য ওপরে। ফরসা, ছোটখাটো চেহারার মানুষটির মুখে সবসময় যে হাসিটি লেগে থাকে, তাকে কষ্টার্জিত বলে ভাবার কোনও কারণ নেই। ওর পোশাকে কখনও অবহেলার ছাপ থাকে না। কথা বলেন নীচু গলায়। সমস্ত ব্যাপারে খুব সিরিয়াস। তবে টেনশনে ভোগেন। একটু ব্যতিক্রম কিছু ঘটলেই ওঁর টেনশন বেড়ে যায়। আব্দুরের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হল সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য। কয়েকবছর আগে এই ভদ্রলোক মার্কিনদেশের নাগরিকত্ব পেয়েছেন। অতএব তিনি বাংলাদেশি আমেরিকান।

এই দুটি মানুষের কথা বলতে হল কারণ গেল বছর আমার বেড়াতে যাওয়ার প্রাথমিকপর্ব এদের সঙ্গেই কেটেছিল।

আটানব্বুইতে যখন প্রবাসী বাংলাদেশিদের আমন্ত্রণে ওদেশে গিয়েছিলাম তখন আব্দুর রহমানের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে তিনি আমাকে তাঁর লেখা একটি বই দিয়ে পড়তে অনুরোধ করেছিলেন। সে সময় ওঁর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত। ওঁর বিনয়, সুব্যবহার, সাহিত্যপ্রীতি আমাকে কিছুটা মুগ্ধ করেছিল। তাই দেশে ফিরে আসার পরেও টেলিফোনে চিঠিতে যোগাযোগ ছিল। গেল বছর যখন ওদেশে গেলাম তখন আব্দুর রহমানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম এয়ারপোর্টে। অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। এতে আমার বেশ কিছু লাভ হল।

এর আগে যতবার মার্কিনদেশে গিয়েছি, সেই প্রথমবার যখন আমি আধাসরকারি অতিথি ছিলাম, সেবার ছাড়া বেশিরভাগ সময় থেকেছি কলকাতার বাঙালিদের বাড়িতে। এঁদের প্রত্যেকের বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি, হয় ইঞ্জিনিয়ার নয় ডাক্তার। শহরের বাইরে বর্ধিষ্ণু এলাকায় বিরাট বাগান এবং লনওয়ালা সুন্দর বাড়ির মালিক এরা। গ্যারেজে গোটা তিনেক গাড়ি, স্ত্রীরা বাঙালি রান্না চমৎকার রাঁধেন এবং বেশিরভাগের পুত্রকন্যারা বাংলা ভাষায় কথা বলে না, অতিথি দেখলে এড়িয়ে যায়। কিন্তু আসল সমস্যা হল, স্বামী-স্ত্রী যদি তাঁদের গাড়িতে তুলে শহরে বা কোনও বাজারে নিয়ে যান তাহলেই বাড়ি থেকে বেরনো সম্ভব হয়। নয়তো বসে থাকতে হয় শনিবার রাতের জন্য। কোনও পার্টিতে গৃহকর্তা নিয়ে যাবেন আদর করে, সেখানে প্রায় একই মুখ দেখতে হবে, একই কথা শুনতে হবে। এই বন্দিদশার কারণ হল এইসব ছবির মতো সুন্দর বাড়িগুলো এত নির্জনে যে হেঁটে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। একটু এগোলেই হাইওয়ে, সেখানে হাঁটার অনুমতি পুলিশ দেবে না। কাছেপিঠে রেস্টুরেন্ট বা দোকান খুঁজে পাওয়া মুশকিল। গাড়ি চালাতে না পারলে বন্দি

হয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করার থাকে না। আর ভারতবর্ষের ড্রাইভিং লাইসেন্সের কোনও মূল্য ওখানে নেই। এমনকি আন্তর্জাতিক লাইসেন্স নিয়ে গেলেও আজকাল ওদেশের পুলিশ সন্তুষ্ট হচ্ছে না। অথচ ওদের গাড়িতে গিয়ার নেই, কলকাতায় ট্র্যাফিকে গিয়ার চেঞ্জ করে গাড়ি চালানো যদি হায়ার সেকেন্ডারির অঙ্ক হয় তো ওদেশের ড্রাইভিং ক্লাস টু-এর।

এই অবস্থায় আব্দুর রহমানের বাড়ি মানে স্বর্গ পাওয়া। ওর বাগান নেই, কিছু গাছ আছে বাড়ির পেছনে। লন নেই, গ্যারাজে তিনটে দূরের কথা একটাও গাড়ি নেই। কিন্তু বাড়ি থেকে বেরুতেই ফুটপাত। দু-পা হাঁটলেই টিউব স্টেশনে নামবার সিঁড়ি। আর যতরকমের দোকানপাট সব চারপাশে থরে-থরে সাজানো। শুধু ফুটপাত ধরে হেঁটে দোকানের শো কেসগুলো দেখে সারাদিন দিব্যি কেটে যায়। কারও ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই, রাস্তায় হাঁটা যায় স্বচ্ছন্দে। নীচে নেমে পাতাল রেলের টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে বসলে নিউইয়র্কটাকে চষে ফেলা যায়।

শহরের মধ্যে এরকম এলাকায় কলকাতার বাঙালিরা থাকেন না কেন? থাকেন, যখন তাঁরা প্রথম চাকরি করতে নিউইয়র্কে পৌঁছন তখন সস্তায় ফ্ল্যাট, যানবাহনের সুবিধে খোঁজেন। এইসব এলাকায় ফ্ল্যাট পেলে ধন্য হয়ে যান। কিন্তু যেই পায়ের তলায় মাটি এল, আগে এসে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া দাদাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শহরের বাইরে লনওয়ালা বাড়ি কেনেন ধারের টাকায় যা প্রায় সারাজীবন ধরে শোধ করে যেতে হয়। কারণ ফ্ল্যাটে থাকলে স্ট্যাটাস বাড়ে না এইরকম ধারণা চালু আছে। তবে ফ্ল্যাটের ভাড়া বাড়ছে হু হু করে। দু-চার বছরে যারা ওখানে গিয়েছে তারা আর শহরের মধ্যে ফ্ল্যাট নিচ্ছে না ওই বেশি ভাড়ার জন্যে। নিউইয়র্ক থেকে ট্রেনে চেপে চলে যাচ্ছে এক দেড় ঘণ্টা দূরে। পাণ্ডববর্জিত সেসব জায়গায় গজিয়ে ওঠা ফ্ল্যাটের ভাড়া কম। ডেইলি প্যাসেঞ্জারির কষ্ট সহ্য করে তারা ডলার বাঁচান। এইটুকুই তাঁদের সান্ত্বনা।

আব্দুর রহমানের বাড়িতে এসে আমি খুব স্বস্তি পেলাম। ওঁর স্ত্রী খুব নরম মহিলা, বললেন 'দাদা, আপনার বই পড়তে খুব ভালো লাগে। আব্দুরের মেয়ের বয়স বছর আঠারো। পড়ছে এবং চাকরি করছে। চমৎকার বাংলা বলে, এমনকী জীবনানন্দের কবিতাও। অথচ ইংরেজি বলার সময় ওদেশীয় উচ্চারণ করে সহজেই। সেই লস এঞ্জেলস থেকে টরেন্টো হয়ে নিউইয়র্ক পর্যন্ত ঘুরে আমি মাত্র একটি পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালির চৌদ্দ বছরের সন্তানকে পেয়েছি যে রবীন্দ্রনাথের গোটা কবিতা চমৎকার আবৃত্তি করতে পারে। কুইনসের নীতিশ-শর্মিলার ছেলেটি নেহাতই ব্যতিক্রম।

গতবার গিয়েছিলাম গরমের সময়। নিউইয়র্কে গরম পড়ে বেশ। তবে লাস ভেগাসের মতো অসহ্য গরম নয়। সেখানে রাত এগারোটাতেও রাস্তায় স্বস্তিতে হাঁটা যায় না। তবে হিউমিডিটি কম থাকা সত্ত্বেও নিউইয়র্কের গরমে রাস্তায় হাঁটলে কপালে ঘাম জমে। আব্দুর রহমান আমাকে যে ঘরটি দিয়েছিলেন সেটি শীততাপনিয়ন্ত্রিত। অভ্যেস না থাকায় মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে মেশিন বন্ধ করে জানলা খুলে দিয়েছিলাম। ফুরফুরে বাতাস বইছে মধ্যরাত্রে। আধখানা চাঁদ আকাশে। সুনসান রাস্তা। মাঝে-মধ্যে একটা দুটো গাড়ি। আশেপাশের সব বাড়ির আলো নিভে গেছে। তবু ঘন অন্ধকার কোথাও নেই। জীবনানন্দের লাইনটাকে অন্যভাবে মনে এল, 'আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো এই অন্ধকার।'

সকালে ঘুম ভাঙল একটু দেরিতে। তৈরি হয়ে ওদের খাওয়া এবং বসার বড় ঘরটায় দেখি আব্দুর রহমান নেই। ওর স্ত্রী আমায় আপ্যায়ন করে যে চেয়ারটায় বসালেন তার সামনে টেবিলের পেছনে জানলা, জানলার ও পারে লতানো গাছ যা পেছনের বাগান থেকে উঠে এসেছে। রাত্রে ঘুমের অসুবিধে হয়েছে কি না, আমি যদি কলকাতায় ফোন করতে চাই তাহলে নির্দ্বিধায় করতে পারি ইত্যাদি বলার পরে তিনি চা দিলেন।

এই টেলিফোন নিয়ে কত ঘটনা ঘটে যায়। যারা কলকাতা থেকে ওখানে পৌঁছন তাদের

প্রথমেই মনে হয়, এই যে ভালোভাবে পৌঁছে সেই খবরটা দেওয়া দরকার। যে বাড়িতে উঠেছেন তার কর্তাকে মনের বাসনা জানালেন। তিনি তৎক্ষণাৎ লাইন ধরে দিলেন। কথা বলার সময় খেয়াল রাখতে হল ঘড়ির দিকে। আন্তর্জাতিক টেলিফোন, খরচটাও বেশি, কিন্তু গৃহস্বামীকে বলা যায় না টাকা নিতে। কিন্তু ওই বাড়িতে দিন দশেক থাকলে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করা খুব মুশকিল হয়ে যায়। কলকাতায় এসে কেউ যদি বাড়িতে উঠে বলে নিউইয়র্কে একটা ফোন করব তাহলে প্রথমবার অনুমতি দিতে অস্বস্তি হয় না, কিন্তু দ্বিতীয়বারে মন তেতো হয়ে যায়। বাল্টিমোরের পি কে ঘোষ প্রতিবছর এরকম বহু বাঙালিকে আতিথ্য দেন এবং তাঁর টেলিফোনের বিল এত বড় হয়ে যায় যে তিনি কয়েকটা কার্ড কিনে রেখেছেন। অতিথিদের কেউ ফোন করতে চাইলেই দশ ডলারের কার্ড এগিয়ে দেন। ওই কার্ডের নাম্বার টিপলে অপারেটর দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবেন যতক্ষণ না দশ ডলার শেষ হয়। এতে গৃহস্বামীর টেলিফোন বিল বাড়বে না। যিনি কার্ড নিচ্ছেন তিনি কার্ডের দামটা দিতে বাধ্য হচ্ছেন। পরের বার কার্ড চাইতে সংকোচ করছেন না। তবে তাঁরও মনে হচ্ছে ভালো করে কথা বলার আগেই কার্ডের আয়ু শেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রয়াত অভিনেতা শ্রদ্ধেয় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার একবার ওদেশ ভ্রমণের সুযোগ হয়েছিল। কার্ডটা হাতে নিয়ে তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'আমি এটি দিয়ে দশবার ফোন করব।' নাম্বার ঘুরিয়ে অপারেটারকে কলকাতার নাম্বার বলে তিনি কান খাড়া করে থাকতেন। যেই চেনা গলা পেতেন বলতেন, 'ভালো আছি।' বলেই লাইন কেটে দিতেন। ওঁর হিসেব মতো এইভাবে কথা বললে দশবার কেন, কুড়িবার কথা বলা যায়। কিন্তু সপ্তমবারে অপারেটার জানাল, তোমার আর ষাট সেকেন্ড বাকি আছে। খুব ক্ষেপে গিয়েছিলেন সত্যদা। তিনি ঘড়ি দেখে ফোন করছেন। ওঁর সঙ্গে অপারেটারের হিসেব মিলছে না। পরে শোনা গেল যে মুহূর্ত থেকে অপারেটর দেশের নাম্বার ঘোরাচ্ছে সেই মুহূর্ত থেকেই কার্ডের সময় কেটে যাচ্ছে। সত্যদা হতাশ গলায় বলেছিলেন, 'এ দেখছি ভয়ানক গ্যাঁড়াকল।'

আব্দুর রহমানের স্ত্রী যে প্রস্তাব দিলেন সেটা তো হাতে স্বর্গ পাওয়ার মতো। কিন্তু আমার তো এটা প্রথমবার নয়, বেশ কয়েকবার ওদেশে গিয়েছি বলে তাড়াহুড়ো করে কলকাতায় খবর পাঠানোর ইচ্ছেটা তেমন জোরালো নেই। আমি চা খাচ্ছিলাম। আব্দুর রহমানের স্ত্রী একগাল হেসে বললেন, 'আপনি যে চেয়ারটায় বসেছেন ওখানে বসেই ও লেখালেখি করে।'

আমি বললাম, 'তাই? তাহলে তো আমার এখানে বসা উচিত হয়নি।'

'এ কী কথা দাদা। আপনি বসেছেন বলে আমরা ধন্য। তবে অন্য কাউকে আমি ওই চেয়ারে বসতে দিই না।' আব্দুর রহমানের স্ত্রী বললেন, 'সারাটা সকাল ও ওই চেয়ারে বসে লেখে। যখন লেখা আটকে যায় তখন জানলার বাইরে হাত বাড়ায়।'

'জানলার বাইরে হাত বাড়ায় কেন?' আমি অবাক হয়ে দোতলায় জানলার বাইরে তাকালাম। আকাশ তো পৃথিবীর সবদেশে একই রকমের।

'ভালো করে দ্যাখেন, ওই লতাটায় কী ঝুলছে।'

দেখলাম। থোকা-থোকা আঙুর। দেখে মনে হল এখনও পাকেনি। বললাম, 'বাঃ! তোমাদের বাড়িতে আঙুর গাছ আছে দেখছি।'

'হ্যাঁ। হাত বাড়িয়ে একটা আঙুর ছিঁড়ে মুখে দেয়। কিছুক্ষণ পরে আবার লিখতে শুরু করে। মানুষটা খুব নরম। ওকে আমি কোনও কাজ করতে দিই না। শুধু ও মনের সুখে লিখুক। একটা লেখা যখন শেষ করে তখন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে যে কী আনন্দ হয় আমার তা' বোঝাতে পারব না আপনাকে।'

আমার খুব ভালো লাগল। নিউইয়র্ক শহরের মাঝখানে বসে একটি মানুষ বাংলা গল্প উপন্যাস লিখে যাচ্ছে আর তার স্ত্রী সে কারণে তাকে যত্ন করছে, এটা শুনলে আমার তো ভালো লাগবেই।

হ্যাঁ, হতেই পারে, সেই লেখার মান তেমন উঁচুতে নয়, প্রকাশকরা উদ্যোগ নিয়ে ছাপতে আগ্রহী নন, আব্দুর রহমানের যে বইগুলো বেরিয়েছে সেগুলো হয়তো তাঁরই টাকায় ছাপা, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। লেখালেখির আগ্রহটা তাঁর আকাশছোঁয়া, সেটাই আসল কথা।

তবে ভালোমানুষ আব্দুর রহমান আমাকে নিয়ে একটু মুশকিলে পড়ল। প্রথমত, আমি যে ক'দিন থাকব তিনি লেখালেখি করবেন না। আমার উপস্থিতিতে লেখালেখির কথা নাকি তিনি ভাবতে পারেন না। দ্বিতীয়, বেলা বারোটায় খেয়ে-দেয়ে আমি বের হই, তিনি সঙ্গে থাকেন। ফিরতে-ফিরতে মধ্যরাত হয়ে যায়। এটা তাঁর অভ্যেস নেই। মাঝে-মাঝেই বাড়িতে টেলিফোন করে খবরাখবর নিয়ে শান্ত থাকতে হত তাঁকে। আমি অনেক অনুরোধ করেছি তাঁকে সঙ্গী না হতে, কিন্তু তিনি রাজি হননি কারণ আমি হারিয়ে যেতে পারি। এদিকে নিউইয়র্কের পাতাল রেল যে আমার কাছে দমদম-টালিগঞ্জ হয়ে গেছে তা ভদ্রলোককে বোঝাতে পারিনি। খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে প্রথমে জ্যাকসন হাইটে বিশ্বজিতের দোকানে যেতাম। ওটা বাংলা বই আর সিডি ক্যাসেটের দোকান। চারপাশে ইংরেজির ভিড়ে একটা দ্বীপের মতো, আমাদের কাছে। কিছুক্ষণ গল্প করে এলোমেলো হাঁটা। কখনও অফ ট্র্যাক বেটিং সেন্টারে গিয়ে ঘোড়ার ওপর দুবার ডলার বাজি ধরা, কখনও শামার সঙ্গে ওর নতুন বাড়ি যেটা নিতে যাচ্ছে, দেখতে যাওয়া। অথবা জ্যাকসন হাইট, ম্যানহাটনের দোকানে রাস্তায় যেসব বাংলাদেশি ছেলেমেয়ে কাজ করছে অথবা কাজের জন্যে ঘুরছে তাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে খবরাখবর নেওয়া ছিল আমার কাছে নেশার মতো। আব্দুর রহমানের এসব ঠিক পছন্দ হত না। বিশ্বজিত যে ওঁকে লেখক হিসেবে পাত্তা দিচ্ছে না, অথচ মুক্তধারাই ওই শহরের সেরা বইয়ের দোকান, এটা ওঁকে খুব দুঃখিত করত।

এর ওপর নেমন্তন্ন। যিনি নিউইয়র্কের রাস্তায় ট্যাক্সি চালান সেই সিলেটের বঙ্গসন্তান রাত্রে তাঁর বাসায় আমাকে খাওয়াতে চান। তাঁর অভিজ্ঞতা শোনার বাসনা আমাকে পেয়ে বসে। যে ভদ্রমহিলা বাংলাদেশের বিখ্যাত গায়িকা কিন্তু নিউইয়র্কে থাকেন ছেলেমেয়েদের জন্যে, তাঁর বাড়িতে মধ্যরাত পর্যন্ত যে জমাটি আড্ডা সেখানে আমার সঙ্গী হতে হয় আব্দুর রহমানকে। এসব তিনি করেছেন আমার
ন্য নয়, বাংলা সাহিত্যকে ভালোবাসার কারণে, এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

সাহাবুদ্দিনকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন আব্দুর রহমানই। আমার ওই উড়ুক্কু জীবনযাপন দেখে-দেখে শেষ পর্যন্ত এক সন্ধেবেলায় বলে ফেললেন, 'চলেন দাদা, একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

আপার আপত্তি নেই। সেদিন আমরা বিকেল-বিকেল বাড়িতে ফিরে এসেছিলাম। আব্দুর রহমানের স্ত্রী খুশি হয়েছিলেন তাই, ভালো-ভালো রান্নার পরিকল্পনা করেছিলেন। স্বামী আবার দাদাকে নিয়ে বেরুবেন এটা তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না। কিন্তু সাহাবুদ্দিনের নাম শুনে দেখলাম আর আপত্তি জানালেন না।

রাত সাড়ে ন'টায় যখন আমরা একটা রেস্টুরেন্টের সামনে পৌঁছোলাম তার একটু আগে সূর্য ডুবেছে। রাস্তায় তখনও মরা আলো নেতিয়ে। রেস্টুরেন্টের বাইরে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলাম এটির আভিজাত্য আছে। অভিজাত রেস্টুরেন্ট মানে মোটা অঙ্কের বিল মেটাতে হবে। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। ডানদিকে বার কাউন্টার, সামনে সুন্দর হলঘর। তাতে কেতাদুরস্ত ওয়েটাররা খাবার পরিবেশন করছে টেবিলে-টেবিলে।

'ওয়েলকাম স্যার।' মধ্যবয়সি যে ভদ্রলোক হাসলেন কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে তাঁর শরীর ছোটখাটো। ছিপছিপে। ঠোঁটে হাসি। আব্দুর রহমান এগিয়ে গেলেন, 'দাদারে নিয়ে এলাম।'

'গুড', হাত বাড়ালেন ভদ্রলোক, 'আমি সাহাবুদ্দিন, আপনি আমার দোকানে আসছেন, আমি খুব খুশি। বসেন, এখানেই বসেন।'

লম্বা টুলগুলোর দুটোয় আমরা দুজন বসলাম। সাহাবুদ্দিন যে শুধু আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন

তা না, তাঁর চোখ রেস্টুরেন্টের সর্বত্র সমান নজর রাখছিল। দুটো লম্বা গ্লাসে গ্রিনলেবেল হুইস্কি ঢেলে সামনে রাখলেন তিনি।

হেসে বললেন, 'কেমন লাগছে আমার রেস্টুরেন্ট?'

'ভালো। বেশ ভালো।'

'থ্যাংক ইউ। আমার এখানে কোনও ফালতু খদ্দের পাবেন না। মোস্টলি শিক্ষিত আমেরিকানরা আসে; আর আসে ইন্ডিয়ান স্কলারস। আমি এ ব্যাপারে খুব প্রাউড।'

সাহাবুদ্দিন হাত বাড়ালেন। লক্ষ করিনি তখনই এক ভদ্রলোক দরজা ঠেলে ঢুকেছেন। করমর্দন করে সাহাবুদ্দিন তাঁকে বললেন, 'বসুন স্যার। আপনি কি এখনই ডিনার খাবেন?'

ভদ্রলোক প্রৌঢ়, মাথায় টাক। বললেন, 'কোনও তাড়া নেই।'

'আলাপ করিয়ে দিই। ইনি বি আর গুপ্তা, ইউনিভার্সিটিতে পড়ান। আর ইনি সমরেশ মজুমদার। আমাদের ভাষায় গল্প-উপন্যাস লেখেন।'

মিস্টার গুপ্তা করমর্দন করলেন, 'বাঃ। আজ আমার কী সৌভাগ্য, একজন লেখক যে এখানে রয়েছেন তা না এলে জানতেই পারতাম না। আপনার লেখার বিষয় কী মিস্টার মজুমদার?'

'রেস।' সাহাবুদ্দিন বললেন। 'হর্সরেস। দারুণ ব্যাপার।'

আমি অবাক হলাম। রেস নিয়ে আমি মাত্র দুটি উপন্যাস লিখেছি। অতএব আমার লেখার বিষয়বস্তু রেস একথা ওই দুটি বইয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও সামগ্রিকভাবে নয়।

সাহাবুদ্দিন বললেন, 'আপনার বই আমি কোথায় প্রথম পড়ি জানেন? গ্রেহাউন্ড বাস টার্মিনাসে। আমি তো এদেশে আসছিলাম আমাদের পাকিস্তান আমলে। তখন তো ইন্ডিয়ার বই বেশি দেখি নাই, টু স্পিক ইউ ফ্রাংকলি আমার রিডিং হ্যাবিট ছিল না। এখানে আসার পর স্ট্রাগল করছি খুব। মেমসাহেব বিয়া করছি। শি ইজ এ নাইস লেডি। তারপর বাংলাদেশ হল। এ ওকে মারে সে তাকে মারে। একটা নতুন দেশ তৈরি হওয়ার সময় নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি আমার ভালো লাগল না। আমি আর বাংলাদেশে যাই নাই। টোয়েন্টি ইয়ার্স ব্যাক, আমি এক রাত্রে পিটাসবার্গ থেকে নিউইয়র্ক আসছিলাম। গ্রে-হাউন্ড বাস টার্মিনাসে বাসের জন্য ওয়েট করছি হঠাৎ দেখি মলাট দেওয়া বই বেঞ্চির ওপর পইড়া আছে। এদেশে পেপার ব্যাক বাসায় নিয়া যায় না অনেকে। বইটা খুইল্যা দেখি বাংলায় লেখা। তাজ্জব ব্যাপার। এদেশে গ্রে-হাউন্ড বাস টার্মিনাসে বাংলা বই? পড়তে শুরু কইর‍্যা আর ছাড়তে পারি না। খুব ইন্টারেস্টিং। বইটার নাম দৌড়। আপনার লিখা।'

আমিও অবাক কম হইনি। মনে হয় সাহাবুদ্দিন ওই একটি উপন্যাসই পড়েছেন। অনর্গল তাই নিয়ে কথা বলে গেলেন। গুপ্তা সাহেব হাসছিলেন বাংলা শুনে। বললেন, একটু-একটু বুঝতে পারেন, বলতে পারেন না।

সেদিন থেকে সাহাবুদ্দিনের রেস্টুরেন্ট আমার রাতের আড্ডাখানা হয়ে গেল। গুপ্তা সাহেব আসেন। দেখলাম, এখানে এলে আব্দুর রহমান তেমন অস্বস্তি বোধ করেন না। দুটো হুইস্কি খেয়ে মাঝরাত পর্যন্ত শ্রোতার ভূমিকায় থাকেন হাসি-হাসি মুখ নিয়ে। সাহাবুদ্দিন সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জেনে ফেলেছি। ওঁর স্ত্রী সাদা আমেরিকান। পঁচিশবছর আগে অসুস্থ হয়ে হাসপাতাল ভরতি হয়ে সাহাবুদ্দিন ওঁকে দেখতে পান। ভদ্রমহিলা তাঁর এক আত্মীয়কে দেখতে হাসপাতালে যেতেন। আলাপটা হাসপাতাল থেকে রোগমুক্ত হয়ে আসার পরও চালু ছিল। ওই একটু হাঁটাহাঁটি, রেস্টুরেন্টে বসে কথা বলা, ব্যস। শেষ পর্যন্ত সাহাবুদ্দিন বিয়ের প্রস্তাব দেন। পরের দিনই মেয়েটির বাড়ি থেকে অনুরোধ আসে দেখা করার জন্যে। সাহাবুদ্দিন যান। সেখানে মেয়ের বাবা-মা দাদু দিদিমা বোনেরা ছিল। গল্প করে চা খেয়ে চলে আসার সময় মেয়ের দিদিমা বলেন, 'তোমার সঙ্গে কথা বলে তো ভালোই লাগল। কিন্তু বাবা, তুমি মুসলমান, ঢাকায় বাড়ি। অথচ বলছ তোমার পাশপোর্ট পাকিস্তানের। ম্যাপে দেখছি ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। এটা কীরকম ব্যাপার?

সাহাবুদ্দিনকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে হল। এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন, 'আমাদের মেয়ে এখানে বড় হয়েছে। তোমার দেশে গেলে মানাতে পারবে না। তা ছাড়া তোমার বাবা-মাকে আমরা জানি না। এরকম অজানা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া কি উচিত?'

সাহাবুদ্দিন জানালেন, তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এদেশেই থেকে যাবেন, মেয়েকে অপরিচিত পরিবেশে কখনই যেতে হবে না।

তবু সংশয় যাচ্ছিল না। কিছুদিন টানাপোড়েন চলল। শেষপর্যন্ত রাজি হলেন ওঁরা। বিয়ে হয়ে গেল। স্ত্রী সম্পর্কে সাহাবুদ্দিনের মন্তব্য, 'শি ইজ এ নাইস লেডি।'

গল্প শুনে অবাক হয়ে বললাম, 'আপনার স্ত্রীর পরিবারকে তো ভারতীয় বা বাংলাদেশি বলে মনে হচ্ছে, আমেরিকান বলে ভাবতে পারছি না।'

সাহাবুদ্দিন মাথা নাড়লেন। 'হ্যাঁ, ওঁরা খুব কনজারভেটিভ।'

সাহাবুদ্দিনের একটি ছেলে একটি মেয়ে। তারা ইন্ডিয়ান কারি রাইস খায়, কিন্তু বাংলা বলতে পারে না। বড়টা চাকরি করে, ছোটটা মেয়ে, পড়ছে। এ ব্যাপারে সাহাবুদ্দিনের বক্তব্য, 'কেন বাংলা শেখাব? যে ভাষাটা শিখে ওদের কোন কাজে লাগবে না, ব্যবহার করতে পারবে না তা জোর করে শেখানো মানে ওদের ওপর ট্যাক্সো চাপানো।'

আব্দুর রহমান জানালেন, 'সাহাবুদ্দিন স্থানীয় বাংলাদেশি অথবা পশ্চিমবাংলার বাঙালিদের সঙ্গে মেশেন না। এখানে ওঁদের যেসব সংগঠন আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না। কারও বাড়িতে যান না। এ ব্যাপারে ওঁরা বক্তব্য 'আমার ভালো লাগে না তাই যাই না। সিম্পল ব্যাপার। আব্দুর সাহেব একটু আলাদা। তাই ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখি দ্যাটস অল।'

'তার মানে কোনও-কোনওদিন আপনি একটাও বাংলা কথা বলেন না?'

'কেন? বলি। এভরিডে বলি। আমি গান গাই। শোন বন্ধু শোন, প্রাণহীন এই শহরের ইতিকথা। উত্তমকুমারের সব সিনেমা আমার দেখা। তার গান শুনে-শুনে মুখস্থ। তাই একা-একা গাই।'

মানুষটিকে আমার ভালো লাগল। এদিকে অধ্যাপক শ্রীগুপ্তাকে আমার বেশ রক্ত-মাংসের মানুষ বলে মনে হচ্ছে। অধ্যাপকসুলভ কোনও রকম উন্নাসিকতা নেই। প্রায়ই জুয়ো খেলেন। শুনেছিলাম নিউইয়র্কে এখন ক্যাসিনো নেই। আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অধ্যাপক গুপ্ত বললেন, 'ঠিকই শুনেছেন। আইন যেমন আছে তেমনি তার ফাঁক আছে। কাছেই সমুদ্র। সেখানে নৌকো রয়েছে আপনাকে আধমাইল দূরের আটলান্টিকের বুকে ভাসা জাহাজে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। জাহাজটি সেখানে স্থির হয়ে থাকে দিনরাত। আর তার ভেতর বিশাল ক্যাসিনো সাজিয়ে রাখা হয়েছে আমাদের মতো জুয়াড়িদের জন্যে। দেশের মাটিতে আইন আধমাইল দূরে অচল। যাবেন নাকি?

আমি কলকাতা শহরে কোনও কোনও অধ্যাপককে দিশি মদ খেতে দেখেছি কিন্তু তাঁরা কবিতা লেখেন। সেখানে তিনি অধ্যাপক নন, কবি। কবিরা একটু উলটোপালটা জীবনযাপন করলে লোকে মেনে নেয়। কিন্তু বেশিরভাগ অধ্যাপকই মনে করেন তাঁরা এমন কোনও কাজ করতে পারেন না, যা তাঁদের সম্পর্কে অশ্রদ্ধা তৈরি করতে পারে। আমাদেরও হয়েছে এমন অবস্থা যে অধ্যাপককে শুধু অধ্যাপক ছাড়া আমরা কিছু ভাবতে চাই না। একটু চিবিয়ে-চিবিয়ে জ্ঞানগর্ভ কথা বলবেন, তরল রসিকতা করবেন না, এরকম একটা ছবি আমরা যেমন দেখতে চেয়েছি ওঁরাও তেমনি তৈরি করেছেন। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছেন। কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় কম। কিন্তু একজন অধ্যাপক ভালো পড়ান, জুয়ো খেলেন, বারে বসে মদ খান, মেয়েদের সঙ্গে সময় কাটাতে আপত্তি নেই, এটা মেনে নেওয়া ছাত্রদের পক্ষে যেমন, কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষেও প্রায় অসম্ভব। ক্লাসের বাইরে ব্যক্তিজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার কেন তার নিজের থাকবে না, তা নিয়ে প্রশ্ন বড় একটা কেউ তোলেন না। তাই অধ্যাপক গুপ্তাকে আমার রক্ত-মাংসের মানুষ বলে মনে হচ্ছিল।

অধ্যাপক গুপ্তা আমেরিকায় এসেছেন বছর কুড়ি। তার আগে জার্মানিতে ছিলেন। বিয়ে করেছিলেন কিন্তু মনে মেলেনি বলে আলাদা হয়ে গেছেন। এখন একাই থাকেন। ওঁর সঙ্গে কয়েকদিন আড্ডার পর জানতে পারলাম, ভদ্রলোক ভোরে উঠেই হাঁটাহাঁটি করেন পাঁচ কিলোমিটার। ফিরে এসে নিজের বিষয়ের বই নিয়ে পড়াশুনো করেন সকাল ন'টা পর্যন্ত। তারপর ব্রেকফাস্ট বানিয়ে স্নান খাওয়া শেষ করে কলেজে যান পড়াতে। ক্লাস এবং লাইব্রেরি করে বাড়ি আসেন পাঁচটায়। তারপর সেজেগুজে বের হন সাড়ে ছ'টায়। কখনও জুয়ো খেলেন, পাবে-পাবে ঘুরে মদ খান, বান্ধবীদের সঙ্গে আনন্দ করেন এবং ফিরে যান সাড়ে এগারোটায়।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'দেখতে পাচ্ছি মাত্র পাঁচ ঘণ্টার বেশি আপনি ঘুমান না।'

'হ্যাঁ! ওর বেশি ঘুমিয়ে থাকলে সময়ের অপচয় হয়। আমাদের জীবন তো খুব বেশিদিনের জন্যে নয়। শরীর চালু রাখতে পাঁচ ঘণ্টার ঘুম যথেষ্ট।'

লক্ষ করেছি আব্দুর রহমান ছাড়া কোনও বাংলাদেশি বন্ধু যেমন সাহাবুদ্দিনের নেই তেমনই অধ্যাপক গুপ্তারও কোনও ভারতীয় বন্ধু নেই।

সাহাবুদ্দিনের কথাবার্তা চালচলন দেখে মনে হয় না তিনি বিন্দুমাত্র দুঃখে আছেন। স্ত্রী এবং সন্তান বাংলায় কথা বলেন না, বাংলা গান শোনে না বলে তাঁর কোনও আক্ষেপ নেই। কিন্তু স্ত্রীকে তিনি কয়েকটি বাঙালি রান্না শিখিয়ে দিয়েছেন। সেগুলো তিনি নাকি চমৎকার রাঁধেন। আমাকে বললেন, 'আপনার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিচ্ছি না। না দেওয়ার কারণ হল ও এ জীবনে বাংলা পড়বে না। অতএব আপনার পরিচয় ওর কাছে কোনও আলাদা মর্যাদা পাবে না।' একেবারে সোজাসাপটা কথা। আমার ভালো লেগেছিল।

একরাতে অধ্যাপক গুপ্তা বললেন, 'দিন পাঁচেক থাকব না।'

'কোথাও যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, একটু বরফের দেশে। ক্লাস ছুটি আছে, ঘুরেই আসি। আপনি যেন কবে কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন?'

'এখনও কিছুদিন আছি।' বলতে-বলতেই মনে হল প্রস্তাবটা করে দেখি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি একার উদ্যোগে যাচ্ছেন না কোনও দলের সঙ্গে?'

'দুটোই।' হাসলেন অধ্যাপক গুপ্তা, 'নিউইয়র্কে কিছু-কিছু ভ্রমণ সংস্থা মাঝেমাঝেই অন্যরকম ভ্রমণের ব্যবস্থা করে। এই পাঁচদিনের ট্রিপ। এখান থেকে প্লেনে যতটা যাওয়া সম্ভব গিয়ে বাকিটা স্টিমারে। লিমিটেড সিট, ডলার দিয়ে সদস্য হয়ে যাও যতক্ষণ সেই সংখ্যাটা পূর্ণ না হয়।'

'আমি কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছি মিস্টার গুপ্তা।'

'ওয়েল, এটা তো তাই। শহরের বাঁধাধরা জীবনের বাইরে।'

'খরচ কেমন?'

'বারোশো ডলার। এটা সবচেয়ে সস্তা।'

সঙ্গে-সঙ্গে মিইয়ে গেলাম। এত ঘোরাঘুরির পর ওই পরিমাণ ডলার দূরের কথা এর এক চতুর্থাংশই আমার পকেটে আছে। যদি আর এ যাত্রায় দেখা না হয় তাই করমর্দন করে আব্দুর রহমানের সঙ্গে রাত্রে বাড়ি ফিরে এলাম। শুয়ে-শুয়ে ভাবছিলাম এমন সময় কবে আসবে যেদিন ভারতবর্ষের একটা টাকা আমেরিকান এক ডলারের সমান হবে। এখন আমাদের চুয়াল্লিশ টাকায় মাত্র একটা ডলার পাওয়া যায়। অতএব বারোশো ডলার মানে প্রায় তিপ্পান্ন হাজার টাকা। তাই খরচ করে পাঁচদিনের জন্যে বেড়াতে যাওয়ার বিলাসিতা আমি করতে পারি না।

কিন্তু আমার জন্যে যে বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তা পরের দিন সকাল দশটা পর্যন্ত জানতাম না। বিশেষ ক্যুরিয়ার সার্ভিসে একটা খাম এল আমার নামে। খুলে দেখলাম তাতে একটা প্লেন

টিকিট এবং এস এস রুজভেল্ট নামের একটি জাহাজে থাকার ছাড়পত্র রয়েছে। কলম্বাস কোম্পানি নামের একটি ভ্রমণ সংস্থা জানিয়েছে আমি যেন অবশ্যই বিকেল আড়াইটের মধ্যে বিমানবন্দরে চলে আসি কারণ বিমান ছাড়বে ঠিক তিনটের সময়।

আমি হতভম্ব। কে পাঠাল এই টিকিট? এর দাম তো বারোশো ডলার। আব্দুর রহমান খুব অবাক হয়েছিলেন। তিনি সরাসরি সাহাবুদ্দিনকে ফোন করলেন। তারপর কথাবার্তা বলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। জানতে পারলাম কাল রাত্রে আমাদের কথাবার্তা নীরবে শুনেছিলেন সাহাবুদ্দিন। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও শুধু টাকার জন্যে যাচ্ছি না বলে ওঁর খারাপ লেগেছিল। দৌড় পড়ার স্মৃতি তাঁর কাছে মূল্যবান বলে তিনি টিকিটটি কিনে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি খুব খুশি কারণ এটাই ছিল আজকের যাত্রার শেষ টিকিট। উনি আব্দুর রহমানকে বলেছেন এখন যেন আমি ফোন না করি, কারণ ফোন করলেই আমি নিশ্চয়ই তাঁকে ধন্যবাদ জানাব। এতে ওঁর অস্বস্তি হবে। বরং ভালোভাবে ঘুরে এসে যেন যাওয়ার আগের রাত্রে ওঁর রেস্টুরেন্টে একটা ভালো ডিনার খেয়ে যাই। ব্যস।

আমার দ্বিধা হচ্ছিল কিন্তু আব্দুর রহমান জোর করলেন। ভালোবাসার দান উপেক্ষা করতে নেই। বললেন, যে মানুষটা কোনও বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে একটা ডলার চাঁদা দেয় না। সে আপনার জন্য বারোশো ডলার খরচ করেছে? আমি খুব খুশি।'

আব্দুর রহমান আমাকে এয়ারপোর্টে নামিয়ে দিয়ে গেল।

কানাডায় যেতে আমেরিকান নাগরিকদের ভিসার দরকার পড়ে না। কিন্তু আমাদের অবশ্যই ভিসা নিতে হয়। সাধারণত নায়েগ্রা ফলস ভালো করে দেখার জন্যে কানাডার অংশে যাওয়ার প্রয়োজন অনেকেই ওই ভিসা নিয়ে যান। এবার আমার নায়েগ্রা দেখার কোনও বাসনা ছিল না। দু-দুবার দেখা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। ফলে কানাডায় যাওয়ার ভিসা নেওয়ার প্রয়োজন হয়নি।

টিকিট এবং পাশপোর্ট হাতে নিয়ে সুদর্শনা এয়ারলাইনসের তরুণীটি বলল, 'আপনি কানাডায় যাচ্ছেন, কিন্তু ওখানকার ভিসা কোথায়?'

আমি ঘটনাটা জানালাম, কীভাবে এবং কেন আমি এয়ারপোর্টে এসেছি। যে কোম্পানি ডলার নিয়ে টিকিট পাঠিয়েছে, সেই কলম্বাস কোম্পানিকে তরুণী টেলিফোন করলেন। ওঁদের সঙ্গে কথা বলার পর তিনি বললেন, কলম্বাস এয়ারপোর্ট থেকে আপনার জন্যে ভিসার ব্যবস্থা করবে। ভিসা না পেলে কিন্তু পরের ফ্লাইটে আপনাকে ফেরত আসতে হবে।'

আমি বোর্ডিং হাতে পেলাম। তাতে লেখা জে এফ কে থেকে সাচ্‌স হারবার। জিজ্ঞাসা করে জানলাম এয়ারপোর্টটি কানাডার ব্যাঙ্কক আইল্যান্ডে। যেখানে এখনই ঠান্ডা মাইনাস পাঁচে, ভরদুপুরে। কলকাতা থেকে যা গরমজামা নিয়ে এসেছিলাম সেগুলো তেমন কাজে দেবে না বলে আব্দুর রহমান ওভারকোট, গ্লাভস, টুপি ইত্যাদি আমাকে জোগান দিয়েছিল। ভেতরে ফুল হাতা সোয়েটার থাকলে নিউইয়র্কের শীতকালে ওগুলো পরলে দিব্যি নাকি চলে যায়।

স্যুটকেশ নিয়ে নির্দিষ্ট গেটের সামনে পৌঁছতেই গলাটা কানে এল। সেখানে প্লেনে ওঠার ডাক শোনার জন্যে যেসব যাত্রীরা অপেক্ষা করছেন তাদের ভেতর থেকে এগিয়ে এলেন অধ্যাপক গুপ্তা। হাত বাড়িয়ে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি? কই কাল রাতে তো কিছু বললেন না!'

ঘটনাটা জানালাম।

গুপ্তা মাথা বাড়ালেন, 'তাই বলুন, আজ সকালে সাহাবুদ্দিন আমাকে ফোন করে কলম্বাস কোম্পানির টেলিফোন নাম্বার নিয়েছিল। কারণটা তখন ঠিক আন্দাজ করতে পারিনি। যাক গে, খুব ভালো হল, কটা দিন জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে।'

বললাম, 'আমি কিন্তু কিছুই জানি না। তা ছাড়া কানাডায় ঢোকার ভিসা আমার নেই।'

'এইটে সমস্যা হতে পারে। তবে কলম্বাস চেষ্টা করলে শর্তসাপেক্ষে এয়ারপোর্টে নামার পর

ভিসার ব্যবস্থা করতে পারে। স্পট ভিসা। ব্যাগ খুলে একটা রঙিন কাগজ বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, পড়ে ফেলুন।'

কিন্তু তখনই ডাক এল। বোর্ডিং কার্ড পাশপোর্ট দেখিয়ে উঠে পড়তে হল প্লেনে। আমাদের আসন পাশাপাশি নয়। পেছনে জানলার ধারে বসতেই এক নীলনয়না সুন্দরী এসে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁকে জানলার আসন ছেড়ে দিতে আমার খুব অসুবিধা হবে কি না। মহিলার চুল কোমর ছাড়ানো এবং কালো। গায়ের রং গমের মতো। নির্দ্বিধায় সরে এলাম। ধন্যবাদ জানিয়ে সুন্দরী জানলার পাশে বসে পড়লেন।

গুপ্তার দেওয়া কাগজটা বের করে চোখ রাখলাম। আমরা পৌঁছেছি কানাডার মাথায় ব্যাঙ্কস আইল্যান্ডে। জায়গাটির নাম 'সাচ্‌স হারবার'। লক্ষ করলাম বেশিরভাগ নামই ইংরেজিতে নয়, ব্র্যাকেটে কিছু-কিছু জায়গায় ইংরেজি নাম দেওয়া আছে। ওই সাচস হারবার থেকেই আমাদের জাহাজ ছাড়বে। দেখেশুনে মনে হল বারোশো ডলার এতটা ভ্রমণের পক্ষে নেহাতই কম। জাহাজ আর্টিক সমুদ্রের প্রান্ত ধরে কেপ প্রিন্স অ্যালফ্রেড হয়ে ব্যাঙ্কস অফ আইল্যান্ডটাকে পাক খেয়ে আবার ফিরে আসবে সাচস হারবারে। এই যাত্রা যে কত মনোমুগ্ধকর তার বর্ণনা দেওয়া আছে কাগজটায়।

ছেলেবেলায় পড়েছিলাম উত্তর মেরু যেতে আর্টিক সমুদ্র পার হতে হয়। উত্তর মেরুতে চিরস্থায়ী কঠিন বরফের বিশাল এলাকা রয়েছে। এই জাহাজ সেদিকে যাবে না। কিন্তু যেখানে যাচ্ছে সেখানে যে ওভারকোটের কোনও মূল্য নেই ছবি দেখে এটাই বুঝতে পারছিলাম।

প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা ওড়ার পর পাশের সুন্দরী বালিকার মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, 'কী ভয়ঙ্কর সুন্দর! এত বরফ আমি জীবনে দেখিনি। আমরা বোধহয় পৌঁছে গিয়েছি, তাই না?'

বললাম, 'আমি প্রথমবার এদিকে এসেছি। তা ছাড়া দেখছেন আপনি, আমি নই।'

'ও, তাই। আমি আপনাকে বঞ্চিত করেছি, না?'

'সুন্দরী মেয়েরা চিরকালই পুরুষদের বঞ্চিত করে', কথাটা বলতে গিয়েও না বলে কাঁধ ঝাঁকালাম। যেন কিছুই হয়নি।

'আপনি তো আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন।'

'তাই তো যাচ্ছি।'

'না না। কলম্বাসের ট্যুরের মেম্বার তো আপনি?'

'হ্যাঁ।'

সাড়ে চার ঘণ্টা পাশাপাশি ওড়ার পর সুন্দরীর খেয়াল হল। হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'ওয়েলকাম। আমি পামেলা, কলম্বাসের ট্যুর ম্যানেজার, ওই কাগজটা যদি আগে বের করতেন তাহলে এতক্ষণ অনেক কথা বলা যেত। আপনার নাম?'

'সমরেশ। ইন্ডিয়া থেকে আসছি।'

'ওহো। আপনিই সেই লোক।'

'মানে?'

'আজ সকালে যে শেষ টিকিটটি বিক্রি হয়েছে সেই এক ইন্ডিয়ান ভদ্রলোকের জন্যে যার কানাডার ভিসা নেই সেই ভদ্রলোক আপনি। তাই তো?'

হেসে বললাম, 'হ্যাঁ।'

'আমাদের কোম্পানির কানাডার শাখাকে ব্যাপারটা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওরা আপনার জন্যে চেষ্টা করবে।' সুন্দরী আমাকে আশ্বস্ত করলেন।

আজকাল প্লেনের পেট থেকে সুড়ঙ্গ ধরে হেঁটে আসা যায় এয়ারপোর্ট টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের ভেতরে। পুরোটাই শীততাপনিয়ন্ত্রিত বলে বাইরের আবহাওয়া কোনও সমস্যা হয় না। প্লেন গন্তব্যে

পৌঁছবার সময় পাইলট জানিয়ে দিয়েছেন এখন বাইরের তাপমাত্রা মাইনাস দশ। কাছে যেতেই শরীর শির-শির করে উঠল।

ইমিগ্রেশনের জন্যে লাইন দিয়েছিলাম অধ্যাপক গুপ্তার সঙ্গে। সেই সুন্দরী কোথায় গিয়েছিলেন জানি না, ফিরে এসে আমাকে বললেন, 'সমরেশ, আমার সঙ্গে আসুন।' অতএব যেতে হল। কানাডা সরকারের ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা ছাড়পত্র না দিলে কেউ এই এলাকার বাইরে যেতে পারবে না। আমাকে লাইন থেকে বের করে সুন্দরী খানিকটা হাঁটিয়ে যে ঘরটিতে নিয়ে গেল সেখানে একজন সাদা মোটাসোটা অফিসার বসে আছেন। ঢোকামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কী করে মনে হল যে আমেরিকার ভিসা নিয়ে ইন্ডিয়া থেকে এলেই আপনাকে কানাডিয়ান ভিসা দেওয়া হবে?'

বললাম, 'একথাটা আমার একবারও মনে আসেনি।'

'তাহলে ভিসা আগে নেননি কেন?'

'কারণ আমি জানতাম না এখানে আসব। বোর্ডিং কার্ড নেওয়ার সময় এয়ারলাইন্স থেকে আমাকে বলা হয়েছে, এখানে পৌঁছে ভিসার জন্য আবেদন করতে।'

'অসম্ভব।' হাত নাড়লেন ভদ্রলোক। 'আপনাকে ভিসা দিলে আপনি যে ফেরত যাবেন তার তো কোনও গ্যারান্টি নেই।'

'আমি এই বরফের দেশে থেকে কী করব?'

'এখানে থাকবেন কেন? যেখানে বরফ নেই কানাডার সেইসব জায়গায় চলে যাবেন। ইন্ডিয়া-পাকিস্তান-বাংলাদেশের হাজার হাজার লোক তো এখন এই কানাডায় জমিয়ে বসেছে। কোনও বিশ্বাস নেই।'

'কিন্তু আমি রোজগার করব কী করে? একমাত্র লেখা ছাড়া তো কিছু জানি না।'

'লেখা? আপনি কী লেখেন?'

'গল্প-উপন্যাস।' গম্ভীর মুখে বললাম, 'বাংলা ভাষায় যা এখানে চলবে না।'

'তা ঠিক।' ভদ্রলোক সুন্দরীকে বললেন, 'আপনারা তো বলেননি উনি লেখক? একজন লেখকের সঙ্গে আমরা এমন ব্যবহার করতে পারি না। কথাটা আগে বললে আমাকে এত কথা বলতে হত না।' আপনি দয়া করে এই ফর্মটা ভরতি করুন। কলম্বাস কোম্পানি গ্যারান্টি দিচ্ছে, আর আপনার পাশপোর্টটাও আমরা রেখে দিচ্ছি। তার বদলে দেশে ঢোকার জন্যে একটা অস্থায়ী পারমিট ইসু করছি। ফেরার সময় ওটা ফেরত দিলে পাশপোর্ট পেয়ে যাবেন।'

কলকাতা শহরের কর্পোরেশন অফিস, রাইটার্স বিল্ডিংস অথবা যে-কোনও সরকারি অফিসে একজন লেখকের চেয়ে একজন কালোবাজারিকে বেশি খাতির করা হয়। বাংলাদেশে লেখক বলে কাউকে চিনতে পারলে যেভাবে সাহায্যের হাত এগিয়ে আসে তাতে অবাক হতে হয়। আর সুদূর কানাডার এই বরফের দ্বীপে একজন বিদেশি যিনি আমার লেখা জীবনে পড়তে পারবেন না তিনি লেখক পরিচয় পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে যেভাবে নিজেকে বদলে ফেললেন, তাতে মনটা ভালো হয়ে গেল।

ইমিগ্রেশন অফিসারদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলে হলঘরে আসামাত্রই তাদের দেখতে পেলাম। অধ্যাপক গুপ্তা বললেন, 'যাক, ভিসা দিয়েছে আপনাকে। এখন চটজলদি যা-যা শীতবস্ত্র নিয়ে এসেছেন, পরে ফেলুন।'

'কেন?'

'বাইরে বাস দাঁড়িয়ে আছে। বাসটা এয়ারকন্ডিশনড কিন্তু হেঁটে গিয়ে তাতে উঠতে হয়। বাইরে তো মাইনাস।' ব্যাগ খুলে ভদ্রলোক ধড়াচূড়া বের করে পরতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁকে আর চেনা যাচ্ছিল না। আব্দুর রহমানের দেওয়া পোশাক পরে দলের সঙ্গে বাইরে এসে দেখলাম সবাই ছুটছে। আমিও পা চালালাম। বাসে ওঠার পর বুঝতে পারলাম, ওভারকোট, সোয়েটার,

সার্ট, উলিকটের গেঞ্জি থাকা সত্ত্বেও শরীরে ভয়ংকর শীতল ঢেউ যেন পাক খাচ্ছে। বাসের ভেতরকার গরমও যেন সেটাকে কমাতে পারছে না। গুপ্তা বললেন, 'প্রথমবার এই ঠান্ডায় হাঁটলে অনেকের কোল্ড স্ট্রোক হয়ে যায়। এখন আরাম করে বসুন।' বলে পকেট থেকে একটা চ্যাপ্টা বোতল বের করে মুখে ঢেলে ওটা এগিয়ে ধরলেন। আমি দিনের বেলায় কখনই মদ পান করি না। কিন্তু ওই কাঁপুনিটা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এক ঢোঁক শরীরে চালান করলাম। উষ্ণ স্রোতটা গলা দিয়ে নামতেই কাঁপুনিটা মিলিয়ে গেল। বেশ ভালো লাগল। এই প্রথম জল ছাড়া পান করলাম। একটুও কড়া বলে মনে হল না।

এত ঠান্ডার দেশে কী করে যে এমন সুন্দর রাস্তা এরা তৈরি করেছে আমি বুঝতেই পারছিলাম না। সাচস হারবার মূলত সামুদ্রিক ঠান্ডা জলের মাছ ধরার জন্যে বিখ্যাত। সীল, তিমি থেকে শুরু করে হরেকরকম বরফের মাছ ধরে এনে এখানে জমা হয়। তারপর তাদের কেটেকুটে টিনে ভরতি করে দেশে-বিদেশে রপ্তানি করা হয়। বাড়িঘর রয়েছে কিন্তু ঘনবসতি নয়। রাস্তায় গাড়ি দেখতে পাচ্ছি। এই সময় সুন্দরী মহিলাটি বাসের মাইকে কথা বললেন, সুস্বাগতম। মাত্র কয়েকটা দিনের জন্যে আপনারা এত কষ্ট করে যে ভ্রমণে এসেছেন তা যাতে সুন্দরভাবে শেষ হয় তার জন্যে কলম্বাস কোম্পানির তরফ থেকে আমি, পামেলা, আপ্রাণ চেষ্টা করব। প্রথমেই বলে রাখি, বাইরে এখন এই সময় যে ঠান্ডা পড়ে তার থেকে একটু বেশি পড়েছে। আমরা যাচ্ছি বন্দরে যেখানে আপনাদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমাদের জাহাজ 'রুজভেল্ট' অপেক্ষা করছে। রুজভেল্ট ছোট জাহাজ কিন্তু সবরকম প্রমোদের ব্যবস্থা সেখানে করেছে। পুরো জাহাজ শীততাপনিয়ন্ত্রিত। কিন্তু কানাডার আইন অনুযায়ী জাহাজ বন্দর এলাকা ছেড়ে একমাইল দূরে না যাওয়া পর্যন্ত ক্যাসিনো চালু হবে না। এই আইন মানতে আমরা বাধ্য। এই যাত্রায় মাত্র একবারই আপনাদের জাহাজ ছেড়ে বরফের রাজত্বে নামবার অনুমতি দেওয়া হবে এবং সেটা চারঘণ্টার জন্যে যেখানে পেঙ্গুইনরা রাজত্ব করছে। যারা ধূমপান করেন তাঁদের অনুরোধ করছি জাহাজের ভেতরে যে ধূপমানকক্ষ রয়েছে সেখানে গিয়ে ধূমপান করবেন।'

এ কথা শেষ হওয়ামাত্র একজন কালো ভদ্রলোক হাত তুললেন, 'আমি কি আমার ঘরে বসে চুরুট খেতে পারব না?'

পামেলা বললেন, 'মাত্র তিনটি কেবিন স্মোকার্স কেবিন হিসেবে নির্দিষ্ট। আপনি যদি তার একটিতে জায়গা পান তাহলে যেতে পারবেন। না হলে আপনাকে ধূমপান কক্ষে কষ্ট করে যেতে হবে।'

লোকটি বললেন, 'আমি ওই কেবিনে থাকতে চাই।'

'আপনার নাম, স্যার?'

'টমাস।'

বাস জাহাজঘাটায় পৌঁছল। আমরা রুজভেল্টের পাশে পৌঁছোলাম, ছোট্ট জাহাজ কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর। ওয়াকিটকিতে কথা বললেন পামেলা। এরপরেই জাহাজের পেট খুলে একটা সিঁড়ি নেমে এল। দুজন অফিসার আপাদমস্তক শীতবস্ত্রে ঢেকে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন। বাসটাকে প্রায় সিঁড়ির কাছে নিয়ে যাওয়া হল। পামেলা ঘোষণা করলেন, 'অনুগ্রহ করে একজন করে বাস থেকে নামবেন যাতে বাকিদের ঠান্ডায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে না হয়।'

যেহেতু আমি প্রায় শেষে উঠেছিলাম তাই নামবার সময় তৃতীয় ব্যক্তি হলাম। মদ্যপানের কারণেই কি না জানি না এবার কাঁপুনিটা এল না।

একজন অফিসার বললেন, 'টিকিট প্লিজ। আপনি একা?'

মাথা নেড়ে টিকিট বের করে এগিয়ে দিতে তিনি দেখে নিয়ে একটা প্ল্যাস্টিকের চাকতি

এগিয়ে ধরলেন, 'এটাকে সাবধানে রাখবেন। গো অ্যাহেড।'

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম অনায়াসেই। চাকতিতে লেখা আছে কেবিন নম্বর নাইন। ভেতরে ঢুকে সুন্দর ছোট্ট হলঘর দেখতে পেলাম। সেখানে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের একজন এগিয়ে এসে চাকতিটা দেখে সুটকেস নিয়ে নিলেন হাত থেকে। তাঁকে অনুসরণ করে প্যাসেজ দিয়ে হেঁটে আমি এক তলায় নেমে এলাম। পাশাপাশি বেশ কয়েকটি কেবিন। নয় নম্বরের চাবি খুলে সুটকেস ভেতরে রেখে লোকটি আমার হাতে চাবি দিয়ে দিলেন।

কেবিনে ঢুকে আমি মুগ্ধ। সামনেই বিরাট কাচের জানলা। জানলার ওপাশে সমুদ্রের জল স্থির। যেন সমুদ্রটাই কেবিনে ঢুকে পড়েছে। এসব দৃশ্য জীবনে দেখিনি। একটাই খাট। তাতে দারুণ বিছানা। লেপটি খুব মোলায়েম। ঘরে ছোট্ট আলমারি, একটা টেবিল চেয়ার ছাড়া টিভি রয়েছে। লাগোয়া ছোট টয়লেট কিন্তু স্নানের কোনও ব্যবস্থা নেই। ধরেই নেওয়া যায়, ভেতরটা শীততাপনিয়ন্ত্রিত হলেও এই ঠাণ্ডায় কেউ স্নান করবে না। দরজা বন্ধ করে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলাম। শুয়ে শুয়েই সমুদ্র দেখছি। নিস্তরঙ্গ জলরাশি। সেই জল যে কী পরিমাণ শীতল হবে কল্পনা করতে পারছি। টেবিলে নানারকমের রঙিন বুলেটিন সাজানো। এই জাহাজের কোথায় কী পাওয়া যাবে তার বিশদ বিবরণ। একটা কাগজে চোখ পড়ল, 'এস এস রুজভেল্ট, ১৯০৮'। আমরা যে জাহাজে উঠেছি তার নামকরণ করা হয়েছে বিরানব্বই বছর আগে নিউইয়র্ক বন্দর ছেড়ে আসা এই নামের জাহাজ থেকে। ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে এস এস রুজভেল্ট নিউইয়র্ক থেকে উত্তর দিকে যাত্রা শুরু করেছিল। বেশ কয়েকটা সপ্তাহের পর জাহাজটি গ্রিনল্যান্ডের পশ্চিমতীর থেকে একশো তিরিশ টন শুকনো তিমির মাংস, দুশো ছেচল্লিশটি স্লেজটানা কুকুর এবং উনপঞ্চাশটি এস্কিমো পুরুষ নারি শিশুকে তুলে নিয়ে আবার এগিয়ে গেল। গ্রিনল্যান্ড এবং এলেসমেয়ার দ্বীপের মাঝখানে বরফভরতি সমুদ্র দিয়ে কোনও মতে এগিয়ে তিনশো পঞ্চাশ মাইল দূরত্ব পার হয়ে কেপ শেরিড্যানে পৌঁছতে পারল। সেখান থেকে উত্তর মেরু মাত্র পঁচিশ মাইল।

আমাদের জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে গ্রিনল্যান্ড এবং এলেসমেয়ার দ্বীপ ছাড়িয়ে প্রায় সমান্তরাল রেখায়। রাত্রে এখনই এখানে মাইনাস একশো চল্লিশে তাপমাত্রা নেমে যায়। আমরা কেপ কেলেট-এর প্রিন্স এ্যালফ্রেড হয়ে ব্যাঙ্কস আইল্যান্ডকে একটা পাক দিয়ে প্রিন্স অফ ওয়েলস প্রণালীতে ঢুকে পড়ব। তারপর কেপ ল্যাম্বটন হয়ে আবার এই সাচ্‌স হারবারে ফিরে আসবে জাহাজটা। ওই প্রিন্স অফ ওয়েলস প্রণালীতে ঢুকে জাহাজ জায়গা বুঝে দাঁড়াবে অতি উৎসাহীদের বরফের ওপর বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ দিতে। আমার সঙ্গে যে পোশাক রয়েছে তা পরে ওখানে জাহাজ থেকে নামা মানে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া, তাই ওই চিন্তা করছি না।

এখানে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, বিকেলের চা-জলখাবার এবং ডিনারের যে নির্দিষ্ট সময় দেওয়া আছে তার মধ্যে খেতে অনুরোধ করা হয়েছে। এর বাইরে খেতে চাইলে আলাদা দাম দিতে হবে। মদ কিনে খেতে হবে।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ মনে হল আমি দুলছি। চোখ খুলতেই ভয়ে চিৎকার করতে গিয়ে সামলে নিলাম। একটা বিরাট ঢেউ যেন আমার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। জাহাজ চলছে। কেবিনে আলো জ্বলছে কিন্তু বাইরেটা এখনও আলোকিত দিনের আলোয়। জানলার কাচে সামুদ্রিক ঢেউ আছড়ে পড়ছে। মাইনাস সত্ত্বেও এখানে সমুদ্রের জল জমে বরফ হয়ে যায়নি। সূর্য কখন অস্ত যায়? শুনেছিলাম এদিকে ছয়মাস আলো থেকে বাকিটা অন্ধকার। একবার কোপেনহেগেনে রাত দুটোয় ঘুম থেকে উঠে রোদ দেখেছিলাম। কিন্তু বাইরের আলোর কোনও তেজ নেই। হঠাৎ দুটো মাছকে জল থেকে লাফিয়ে জানলার কাঁচের সামনে চলে আসতে দেখলাম। সঙ্গে-সঙ্গেই ডুবে যাচ্ছিল ওগুলো। ঘড়িতে এখন রাত সাড়ে ন'টা। দশটায় ডিনার বন্ধ হয়ে যাবে।

চটজলদি তৈরি হয়ে কেবিন থেকে বের হলাম। কোনও দামি জিনিস সঙ্গে নেই বলে চাবি দিলাম না। ম্যাপটার ওপর চোখ রেখে ডাইনিং রুমে পৌঁছে দেখি মাত্র তিনজন মানুষ সেখানে খাচ্ছেন। আমাদের দেশে যে কোনও ব্যাপারে শেষ সময়ে খুব ভিড় হয়। ইলেকট্রিক বা টেলিফোন বিল জমা দেওয়া বা খাওয়াদাওয়া, শেষ সময়ে তাড়াহুড়ো পড়ে যায়। কিন্তু বুঝলাম অধিকাংশই খাওয়া শেষ করেছেন।

খাবার নিয়ে একটা টেবিলে বসেছি এইসময় পামেলা এবং আর একজন তরুণী এলেন। সঙ্গিনীকে দেখে কলম্বাসের কর্মী বলে মনে হল না। কাউন্টার থেকে নির্বাচিত খাদ্যদ্রব্য নিয়ে এপাশে তাকাতেই পামেলা আমাকে দেখতে পেলেন। ওঁর মুখে হাসি ফুটল, সঙ্গিনীকে কিছু বলতেই তিনি বেশ অবাক চোখে আমাকে দেখলেন। ওঁরা এগিয়ে এলেন আমার দিকে। পামেলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বসতে পারি?'

'অবশ্যই।'

'ওরা বসলেন। পামেলা বললেন, 'কেমন লাগছে এখন?'

'আমার কেবিনে বসে পুরো ট্রিপটা কাটিয়ে দেওয়া যায়।'

'প্লিজ, সেটা করবেন না। ওপরে চলে যাবেন। ওখানে ক্যাসিনো আছে, বিলিয়ার্ড রুম, কার্ড রুম আছে। তা ছাড়া কাচের ঘরে গেলে আপনি চারপাশের আদিম প্রকৃতি দেখতে পাবেন। খুব ভালো লাগবে। ওহো, আলাপ করিয়ে দিইনি। ইনি টিনা মুরহেড। সাংবাদিক। আর ইনি।' পামেলার ভাষায় আমার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করলেন তাতে আমারই লজ্জা লাগল। আমি একজন গল্পকার শোনামাত্র কানাডার ভিসা দিতে দেরি করেননি অফিসার। সত্যি কথা বলতে কী, পামেলা এই প্রথমে চর্মচক্ষে কোনও গল্পকারকে দেখলেন।

টিনা বললেন, 'আমিও এই প্রথম কোনও ক্রিয়েটিভ লেখককে দেখলাম।'

বললাম, 'এ কী কথা, আপনি সাংবাদিক, কাগজে লেখেন—।'

'না। আমি কাগজে লিখিনি কখনও, আমি ইনটারনেট ম্যাগাজিন রিপোর্ট করি। ফ্রি ল্যান্স।'

কথা হচ্ছিল টুকটাক। এই দুই মহিলা এখন শীতবস্ত্র ছাড়াই বেশ সপ্রতিভ। টিনার জামা আবার একটু বেশি খোলামেলা। টিনা ভারতবর্ষের কথা জানতে চাইল। সেখানে কতগুলো ভাষা, সব ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি হয় কি না, কতগুলো বের হয়, ইত্যাদি। ইন্টারনেট ম্যাগাজিন ভারতবর্ষে কত জনপ্রিয় জানতে চাইলেন তিনি। আমার উত্তর তাঁকে একটু হতাশ করল।

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। পামেলা বললেন, 'আমাকে একটু অফিসে যেতে হবে। একটা রিপোর্ট তৈরি করতে হবে।'

টিনা বললেন, 'চলুন ওপরে যাই। আপনি সঙ্গে থাকলে ভালো থাকব।'

পামেলা হেসে ফেললেন শব্দ করে। আমি তাঁর দিকে তাকাতে তিনি বললেন, 'টিনা একা যাচ্ছে তো, ইতিমধ্যেই দুজন বৃদ্ধ ওকে সঙ্গ দিতে তৎপর হয়ে উঠেছেন। আপনি সঙ্গে থাকলে ওর সুবিধে হয়।'

এটা শুনে আমার কৌতূহল হল।

ক্যাসিনোরুমটি বেশ বড়। স্লট মেশিন, তাসের জুয়া থেকে যাবতীয় খেলা যা লাস ভেগাসের জুয়োঘরে থাকে তার মিনি সংস্করণ এটি। সুদৃশ্য, দামি পোশাক পরে নারীপুরুষেরা সেই জুয়ো খেলায় অংশ নিয়েছেন। দেখে কে বলবে বাইরে মাইনাস ডিগ্রি। টিনা জিগ্যেস করলেন, 'জুয়ো খেলবেন?'

হেসে বললাম, 'নষ্ট করার মতো ডলার পকেটে নেই।'

'নষ্ট কেন বলছেন? পকেট ভরেও তো যেতে পারে।'

'আমার জুয়োর লাক খুব খারাপ।'

টিনা হাসলেন, 'যার কার্ড লাক খারাপ তার নাকি ভালো হয়।'

এই সময় দুজন বৃদ্ধ হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এল। দুজনেরই বয়স সত্তরের ওপরে। একজন বলল, 'তুমি কোথায় ছিলে? বলো, তোমার জন্যে কী করতে পারি?'

'অনেক ধন্যবাদ। আপনারা চিন্তা করবেন না, আমি আমার অনেক পুরোনো এই বন্ধুকে পেয়ে গেছি। ওঁর মতো ভালো সঙ্গী আমি এখানে পেতাম না।'

টিনার কথা শোনামাত্র বৃদ্ধদের মুখের চেহারা বদলে গেল। টিনা আমাকে নিয়ে চলে এলেন স্লট মেশিনের সামনে। পাঁচ ডলার ভাঙিয়ে পাঁচটা টোকেন পাওয়া গেল। এক একটা টোকেন মেশিনের গর্তের ভেতর ঢুকিয়ে হাতল ধরে টানতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে মেশিনের তিনটি চাকতি ঘুরবে। ঘুরে যখন স্থির হল তখন যদি পাশাপাশি তিনটি চাকতির ছবি এক হয় তাহলে দশ থেকে একহাজার গুণ ডলার পাওয়া যাবে। আমার কপালে যা হওয়া স্বাভাবিক তা হল। পাঁচবারে পাঁচটি টোকেন বেরিয়ে গেল কিন্তু পাশাপাশি তিনটে দূরের কথা, দুটো চাকতির ছবি এক না। টিনা আমাকে আরও পাঁচবার হাতল টানতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি রাজি হলাম না। পাঁচ ডলার গিয়েছে, ওটাকে দশ ডলার করতে চাই না। টিনা পাঁচ ডলার ভাঙিয়ে টোকেন নিলেন। প্রথমবার টোকেন ফেলে টানতেই ঝনঝন আওয়াজ উঠল মেশিনের ওপরের লাল আলোটা জ্বলে উঠল। টিনা এক হাজার ডলার পেল।

টোকেন থেকে নোটে চেঞ্জ করে নিয়ে টিনা বললেন, 'এটা আপনার প্রাপ্য ছিল। আপনি যদি আর একবার টানতেন তাহলে আপনিই পেতেন।'

আমি হাসলাম, 'প্রত্যেককেই তো একসময় শেষ করতে হয়। আমার আফসোস নেই।'

ক্যাসিনো থেকে বেরিয়ে আমরা চলে এলাম গ্লাস ঘরে। জাহাজের ছাদের ওপর এই গ্লাস ঘর। কোনও আলো জ্বলছে না সেখানে। চারপাশ এবং ঘর কাচের। এখন আকাশে তারা জ্বলছে এত স্পষ্ট পরিষ্কার চেহারা তারাদের কখনও দেখিনি। সমুদ্রের ওপর হালকা অন্ধকার। জলের রং কালচে, উত্তর মেরু এখান থেকে বেশি দূরে নয়। গ্লাসঘরের শীততাপনিয়ন্ত্রিত আবহাওয়ায় এসে দেখলাম সমুদ্রের জলে মাঝে মাঝে কিছু ভেসে যাচ্ছে। জাহাজের সার্চ লাইটের আলো যখন জ্বলে উঠল তখন বুঝলাম ওগুলো বড় বড় বরফের চাঁই। দেখেই শীত করল। এখন চারপাশে হিমবাতাস শীত এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছে যে আকাশের তলায় দাঁড়ালেই সাধারণ শীতবস্ত্র পরা মানুষ মরে যাবে। গ্লাস ঘরের উষ্ণতায় দাঁড়িয়ে মনে হল, হঠাৎ যদি জাহাজের বিদ্যুৎ চলে যায় তাহলে কী হবে। টিনাকে কথাটা বলতেই ওঁর হাত আমার হাত আঁকড়ে ধরল। বললেন, 'চলুন, নেমে যাই।

টিনার কেবিন নাম্বার ছাব্বিশ। আমার থেকে বেশ দূরত্বে। ওঁকে কেবিনে দিয়ে চলে এলাম এসে দেখি আমার কেবিনের দরজা ভেতর থেকে চাবি ঘোরানো কিন্তু খুলল না। দরজায় শব্দ করলাম এবার দরজা খুলল। এক তরুণ এবং একটি মধ্যবয়সী মহিলা আমার কেবিনে দাঁড়িয়ে অথচ আমি নাম্বার ভুল করিনি। আমার সুটকেসটাকেও দেখতে পাচ্ছি।

মহিলা বললেন, 'এটা বোধহয় আপনার কেবিন।'

'হ্যাঁ।'

আসলে আমার কেবিন থেকে সমুদ্র ভালো করে দেখা যায় না বলে আমরা এখানে এসেছিলাম অসুবিধে করার জন্যে দুঃখিত। বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন তরুণকে সঙ্গে নিয়ে। তরুণের গালে লিপস্টিকের দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম কিছুক্ষণ। পৃথিবীর শেষ প্রান্তে এসে বৃদ্ধের মনে প্রেম জেগেছে এবং সেটা যে গোপন তাতে সন্দেহ নেই।

পরের দিন ব্রেকফাস্টের সময় ভদ্রমহিলাকে দেখলাম এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে। তরুণটি ধারে কাছে নেই। বুঝলাম ব্যাপারটা। ওঁর উদাসীন মুখ বড় নির্মম।

এই ভ্রমণ কাহিনি অসমাপ্ত। ইতিহাস বলছে মেরুর কাছাকাছি পৌঁছে অনেক জাহাজ দুর্ঘটনায়

কবলে পড়েছে বহুবার। কখনও জাহাজের সঙ্গে হিমবাহের সংঘাতে, কখনও আকস্মিকভাবে বৈদ্যুতিকযন্ত্র বিকল হয়ে যাওয়ায় এরকম দুর্ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক নয়। সেরকম কিছু যে হয়নি, কলম্বাস জাহাজ ঠিকঠাক ঘুরে এসেছিল এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।

সাহাবুদ্দিন চেয়েছিলেন আমাকে ওই ভ্রমণে পাঠাবেন। রাতে রেস্টুরেন্টে অধ্যাপক গুপ্তার মুখে ব্যাপারটা শোনার পর উনি খুব চেষ্টা করেন একটা টিকিটের জন্যে। কিন্তু ততক্ষণে সব টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। আমার আর যাওয়া হয়নি।

কয়েকমাস আগে অধ্যাপক গুপ্তার কাছ থেকে চিঠিতে এই ভ্রমণের বিশদ বিবরণ পেলাম। পেয়ে মনে হল সাহাবুদ্দিন টিকিট পেলে আমি যেতাম এবং গেলে কী হত। এই কাল্পনিক ভ্রমণ সঙ্গতকারণে শেষ করা উচিত নয়। কারণ আমরা যে স্বপ্ন দেখি তা কখনই নিয়ম মেনে শেষ হয় না।

এবার সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়েছি। খবরটা পেয়ে আব্দুর রহমান ফোনে জানিয়েছেন তিনি আমার জন্যে আগাম ওই ভ্রমণের টিকিট কেটে রাখবেন। সেপ্টেম্বরের কুড়ি তারিখে যাত্রা শুরু।

শুধু আব্দুর রহমান আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, কানাডায় ঢোকার ভিসা যেন আমি এখান থেকেই করিয়ে নিয়ে যাই। লেখকদের কোনও গুণই বাস্তবে মাপ করা যায় না।